প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৩৽

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

মেঘাবৃত রজনীতে প্রেমাস্পদের উদ্দেশে।

[illegible] শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। কার্ত্তিক, ১৩১৪। ৭ম সংখ্যা।

গোরা।

মহিম ঘরে ঢুকিতেই গোরা চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহিম হুঁকায় টান দিতে দিতে কহিল, ভারত উদ্ধারে ব্যস্ত আছ আপাতত ভাইকে উদ্ধার কর ত!

গোরা মহিমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহিম কহিলেন—"আমাদের আপিসের নতুন যে বড় সাহেব হয়েছে—তার ডালকুত্তার মত চেহারা—সে বেটা ভারি পাজি। সে বাবুদের বলে বেবুন্—কারো মা মরে গেলে ছুটি দিতে চায় না, বলে মিথ্যে কথা—কোনো মাসেই কোনো বাঙালী আম্লার গোটা মাইনে পাবার যো নেই, জরিমানায় জরিমানায় একেবারে শতছিদ্র করে ফেলে। কাগজে তার নামে একটা চিঠি বেরিয়েছিল—সে বেটা ঠাউরেচে আমারই কর্ম। নেহাৎ মিথ্যে ঠাওরায় নি। কাজেই এখন আবার স্বনামে তার একটা কড়া প্রতিবাদ না লিখ্‌লে টিক্‌তে দেবে না। তোমরা ত য়ুনিভর্সিটির জলধি মন্থন করে দুই রত্ন উঠেছ—এই চিঠিখানা একটু ভাল করে লিখে দিতে হবে। ওর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে even-handed justice, never-failing generosity, kind courteousness ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোরা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় হাসিয়া কহিল, "দাদা, অতগুলো মিথ্যা কথা একনিশ্বাসে চালাবেন?"

মহিম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। অনেক দিন ওদের সংসর্গ করেচি, আমার কাছে কিছুই অবিদিত নেই। ওরা যা মিথ্যে কথা জমাতে পারে সে তারিফ করিতে হয়। দরকার হলে ওদের কিছু বাধে না;—একজন যদি মিছে বলে ত শেয়ালের মত আর সব কটাই সেই এক সুরে হুক্কাহুয়া করে ওঠে, আমাদের মত একজন আর একজনকে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিতে চায় না। এটা নিশ্চয় জেনো ওদের ঠকালে পাপ নেই যদি না পড়ি ধরা!

বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া মহিম টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন—বিনয়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

মহিম কহিলেন—"তোমরা ওদের মুখের উপর সত্যি কথা বলে ওদের অপ্রতিভ করতে চাও! এম্‌নি বুদ্ধি যদি ভগবান তোমাদের না দেবেন তবে দেশের এমন দশা হবে কেন? এটা ত বুঝ্‌তে হবে, যার গায়ের জোর আছে বাহাদুরি করে তার চুরি ধরিয়ে দিতে গেলে সে লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে না। সে উল্টে তার সিঁধকাটিটা তুলে পরম সাধুর মতই হুঙ্কার দিয়ে মারতে আসে। সত্যি কিনা বল।"

বিনয়। সত্যি বই কি।

মহিম। তার চেয়ে মিছে কথার ঘানি থেকে বিনি পয়সায় যে তেলটুকু বেরয় তারি এক আধ ছটাক তার পায়ে মালিশ করে যদি বলি, সাধুজি, বাবা পরমহংস, দয়া করে ঝুলিটা একটু ঝাড়, ওর ধুলো পেলেও বেঁচে যাব; তা হলে তোমারি ঘরের মালের অন্তত একটা অংশ হয় ত তোমারি ঘরে ফিরে আস্‌তে পারে অথচ শান্তিভঙ্গেরও আশঙ্কা থাকে না। যদি বুঝে দেখ ত একেই বলে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌। কিন্তু আমার ভায়া চট্‌চে। ও হিঁদু হয়ে অবধি আমাকে দাদা বলে খুব মানে, ওর সাম্‌নে আজ আমার কথাগুলো ঠিক বড় ভায়ের মত হল না। কিন্তু কি করব, ভাই, মিছে কথা সম্বন্ধেও ত সত্যি কথাটা বলতে হবে। বিনয়, সেই লেখাটা কিন্তু চাই। রোস, আমার নোট্‌ লেখা আছে, সেটা নিয়ে আসি।

বলিয়া মহিম তামাক টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা বিনয়কে কহিল—"বিনু, তুমি দাদার ঘরে গিয়ে ওঁকে ঠেকাও গে। আমি লেখাটা শেষ করে ফেলি।"

৬

"ওগো শুনচ? আমি তোমার পুজোর ঘরে ঢুকচিনে, ভয় নেই। আহ্নিক শেষ হলে একবার ওঘরে যেয়ো— তোমার সঙ্গে কথা আছে। দুজন নূতন সন্ন্যাসী যখন এসেচে তখন কিছুকাল তোমার আর দেখা পাব না জানি সেই জন্যে বলতে এলুম। ভুলো না, একবার যেয়ো।"

এই বলিয়া আনন্দময়ী ঘরকর্‌নার কাজে ফিরিয়া গেলেন।

কৃষ্ণদয়াল বাবু শ্যামবর্ণ দোহারা গোছের মানুষ, মাথায় বেশি লম্বা নহেন। মুখের মধ্যে বড় বড় দুইটা চোখ সব চেয়ে চোখে পড়ে, বাকি প্রায় সমস্তই কাঁচাপাকা গোঁফে দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। ইনি সর্ব্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র পরিয়া আছেন; হাতের কাছে পিতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। মাথার সাম্‌নের দিকে টাক পড়িয়া আসিতেছে— বাকি বড় বড় চুল গ্রন্থি দিয়া মাথার উপরে একটা চূড়া করিয়া বাঁধা।

একদিন পশ্চিমে থাকিতে ইনি পল্টনের গোরাদের সঙ্গে মিশিয়া মদ মাংস খাইয়া একাকার করিয়া দিয়াছেন। তখন দেশের পূজারি পুরোহিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রেণীর লোকদিগকে গায়ে পড়িয়া অপমান করাকে পৌরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এখন না মানেন এমন জিনিষ নাই। নূতন সন্ন্যাসী দেখিলেই তাহার কাছে নূতন সাধনার পন্থা শিখিতে বসিয়া যান। মুক্তির নিগূঢ় পথ এবং যোগের নিগূঢ় প্রণালীর জন্য ইহার লুব্ধতার অবধি নাই। তান্ত্রিক সাধনা অভ্যাস করিবেন বলিয়া কৃষ্ণদয়াল কিছুদিন উপদেশ লইতেছিলেন এমন সময় একজন বৌদ্ধ পুরোহিতের সন্ধান পাইয়া সম্প্রতি তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ইঁহার প্রথম স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করিয়া যখন মারা যান তখন ইঁহার বয়স তেইশ বছর। মাতার মৃত্যুর কারণ বলিয়া রাগ করিয়া ছেলেটিকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া কৃষ্ণদয়াল প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে একেবারে পশ্চিমে চলিয়া যান এবং ছয় মাসের মধ্যেই কাশীবাসী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন।

পশ্চিমেই কৃষ্ণদয়াল চাকরীর জোগাড় করিলেন এবং মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে সার্ব্বভৌমের মৃত্যু হইল; অন্য কোনো অভিভাবক না থাকাতে স্ত্রীকে নিজের কাছে আনিয়াই রাখিতে হইল।

ইতিমধ্যে যখন সিপাহিদের ম্যাটিনি বাধিল সেই সময়ে, কৌশলে দুইএকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণরক্ষা করিয়া ইনি যশ এবং জায়গির লাভ করেন। ম্যাটিনির কিছুকাল পরেই কাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং নবজাত গোরাকে লইয়া কিছুদিন কাশীতে কাটাইলেন। গোরার বয়স যখন বছর পাঁচেক হইল তখন কৃষ্ণদয়াল কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বড় ছেলে মহিমকে তাহার মামার বাড়ী হইতে নিজের কাছে আনাইয়া মানুষ করিলেন। এখন মহিম পিতার মুরুব্বিদের অনুগ্রহে সরকারী খাতাঞ্জিখানায় খুব তেজের সঙ্গে কাজ চালাইতেছে।

গোরা শিশুকাল হইতেই তাহার পাড়ার এবং ইস্কুলের ছেলের সর্দ্দারি করিত। মাষ্টার পণ্ডিতের জীবন অসহ্য করিয়া তোলাই তাহার প্রধান কাজ এবং আমোদ ছিল। একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে" এবং "বিংশতি কোটি মানবের বাস" আওড়াইয়া, ইংরেজিভাষায় বক্তৃতা করিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন এক সময় ছাত্রসভার

ডিম্ব ভেদ করিয়া গোরা বয়স্কসভায় কাকলী বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল তখন কৃষ্ণদয়াল বাবুর কাছে সেটা অত্যন্ত কৌতুকের বিষয় বলিয়া মনে হইল।

বাহিরের লোকের কাছে গোরার প্রতিপত্তি দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল—কিন্তু ঘরে কাহারো কাছে সে বড় আমল পাইল না। মহিম তখন চাকরী করে—সে গোরাকে কখন বা "পেট্রিয়ট্ জ্যাঠা" কখন বা "হরিশ মুখুয্যে দি সেকেণ্ড" বলিয়া নানা প্রকারে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তখন দাদার সঙ্গে গোরার প্রায় মাঝে মাঝে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইত। আনন্দময়ী গোরার ইংরেজ-বিদ্বেষে মনে মনে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতেন— তাহাকে নানা-প্রকারে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু কোনো ফলই হইত না। গোরা রাস্তায় ঘাটে কোনো সুযোগে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করিতে পারিলে জীবন ধন্য মনে করিত।

এ দিকে কেশব বাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল; আবার এই সময়টাতেই কৃষ্ণদয়াল ঘোরতর আচারনিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এমন কি, গোরা তাঁহার ঘরে গেলেও তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। গুটি দুই তিন ঘর লইয়া তিনি নিজের মহল স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। ঘটা করিয়া সেই মহলের দ্বারের কাছে "সাধনাশ্রম" নাম লিখিয়া কাষ্ঠফলকে লট্‌কাইয়া দিলেন।

বাপের এই কাণ্ডকারখানায় গোরার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে বলিল—"আমি এ সমস্ত মূঢ়তা সহ্য করিতে পারি না—এ আমার চক্ষুশূল।"—এই উপলক্ষে গোরা তাহার বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল—আনন্দময়ী তাহাকে কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বাপের কাছে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইতে লাগিল গোরা জো পাইলেই তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বাধাইয়া দিত। সে ত তর্ক নয় প্রায় ঘুষী বলিলেই হয়। তাঁহাদের অনেকেরই পাণ্ডিত্য অতি যৎসামান্য এবং অর্থলোভ অপরিমিত ছিল; গোরাকে তাঁহারা পারিয়া উঠিতেন না, তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেবল হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি গোরার শ্রদ্ধা জন্মিল।

বেদান্ত চর্চ্চা করিবার জন্য কৃষ্ণদয়াল বিদ্যাবাগীশকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোরা প্রথমেই ইঁহার সঙ্গে উদ্ধত-ভাবে লড়াই করিতে গিয়া দেখিল লড়াই চলে না। লোকটি যে কেবল পণ্ডিত তাহা নয়, তাঁহার মতের ঔদার্য্য অতি আশ্চর্য্য। কেবল সংস্কৃত পড়িয়া এমন তীক্ষ্ণ অথচ প্রশস্ত বুদ্ধি যে হইতে পারে গোরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। বিদ্যাবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন একটি অবিচলিত ধৈর্য্য ও গভীরতা ছিল যে তাঁহার কাছে নিজেকে সংযত না করা গোরার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হরচন্দ্রের কাছে গোরা বেদান্তদর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। গোরা কোনো কাজ আধাআধি রকম করিতে পারে না সুতরাং দর্শন আলোচনার মধ্যে সে একেবারে তলাইয়া গেল।

ঘটনাক্রমে এই সময়ে একজন ইংরেজ মিশনারি কোনো সংবাদপত্রে হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া দেশের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। গোরা ত একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। যদিচ সে নিজে অবকাশ পাইলেই শাস্ত্র ও লোকাচারের নিন্দা করিয়া বিরুদ্ধমতের লোককে যত রকম করিয়া পারে পীড়া দিত তবু হিন্দুসমাজের প্রতি বিদেশী লোকের অবজ্ঞা তাহাকে যেন অঙ্কুশে আহত করিয়া তুলিল।

সংবাদপত্রে গোরা লড়াই সুরু করিল। অপর পক্ষে হিন্দুসমাজকে যতগুলি দোষ দিয়াছিল গোরা তাহার একটাও এবং একটুও স্বীকার করিল না। দুই পক্ষে অনেক উত্তর চালাচালি হইলে পর সম্পাদক বলিলেন আমরা আর বেশী চিঠিপত্র ছাপিব না।

কিন্তু গোরার তখন রোখ চড়িয়া গেছে। সে "হিন্দুয়িজ্‌ম্" নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল—তাহাতে তাহার সাধ্যমত সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্র ঘাঁটিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া গেল।

এমনি করিয়া মিশনারির সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়া গোরা আস্তে আস্তে নিজের ওকালতির কাছে নিজে হার মানিল। গোরা বলিল, আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামীর মত খাড়া করিয়া বিদেশীর আইন মতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের

সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিশ্র করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও-বোধ করিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্ব্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।

এই বলিয়া গোরা গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিল, টিকি রাখিল, খাওয়া ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচার করিয়া চলিল। এখন হইতে প্রত্যহ সকাল বেলায় সে বাপ মায়ের পায়ের ধুলা লয়, যে মহিমকে সে কথায় কথায় ইংরেজি ভাষায় "ক্যাড্" ও "স্নব্" বলিয়া অভিহিত করিতে ছাড়িত না, তাহাকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়ায়, প্রণাম করে; মহিম এই হঠাৎ ভক্তি লইয়া তাহাকে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, কিন্তু গোরা তাহার কোনো জবাব করে না।

গোরা তাহার উপদেশে ও আচরণে দেশের একদল লোককে যেন জাগাইয়া দিল। তাহারা যেন একটা টানাটানির হাত হইতে বাঁচিয়া গেল; হাঁফ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আমরা ভাল কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারো কাছে করিতে চাই না—কেবল আমরা ষোলো আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই!

কিন্তু কৃষ্ণদয়াল গোরার এই নূতন পরিবর্ত্তনে যে খুসি হইলেন তাহা মনে হইল না। এমন কি, তিনি একদিন গোরাকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ বাবা, হিন্দুশাস্ত্র বড় গভীর জিনিষ। ঋষিরা যে ধর্ম্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়। আমার বিবেচনায় না বুঝে এ নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভাল। তুমি ছেলেমানুষ বরাবর ইংরেজি পড়ে মানুষ হয়েচ, তুমি যে ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকেছিলে সেটা তোমার ঠিক অধিকারের মতই কাজ করেছিলে। সেই জন্যেই আমি তাতে কিছুই রাগ করিনি বরঞ্চ খুসিই ছিলুম। কিন্তু এখন তুমি যে পথে চলেচ এটা ঠিক ভাল ঠেকচে না। এ তোমার পথই নয়।"

গোরা কহিল, "বলেন কি বাবা? আমি যে হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম আজ না বুঝি ত কাল বুঝ্ব—কোনো কালে যদি না বুঝি তবু এই পথে চল্‌তেই হবে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ কাটাতে পারিনি বলেই ত এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, এমনি করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের ভিতর দিয়েই অবশেষে এর চরমে উত্তীর্ণ হব। যদি কখনো ভুলে অন্য পথের দিকে একটু হেলি আবার দ্বিগুণ জোরে ফিরতেই হবে।"

কৃষ্ণদয়াল কেবলি মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন—"কিন্তু, বাবা, হিন্দু বল্লেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খ্রীষ্টান যে-সে হতে পারে—কিন্তু হিন্দু! বাস্‌রে! ও বড় শক্ত কথা।

গোরা। সে ত ঠিক্। কিন্তু আমি যখন হিন্দু হয়ে জন্মেছি, তখন ত সিংহদ্বার পার হয়ে এসেছি। এখন ঠিক্‌মত সাধন করে গেলেই অল্পে অল্পে এগতে পারব!

কৃষ্ণদয়াল। বাবা, তর্কে তোমাকে ঠিকটি বোঝাতে পারব না। তবে তুমি যা বল্‌চ সেও সত্য। যার যেটা কর্ম্মফল, নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, তাকে একদিন ঘুরেফিরে সেই ধর্ম্মের পথেই আস্‌তে হবে—কেউ আট্‌কাতে পারবে না। ভগবানের ইচ্ছে! আমরা কি করতে পারি! আমরা ত উপলক্ষ্য!

কর্ম্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোহহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব সমস্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান ভাবে গ্রহণ করেন—পরস্পরের মধ্যে যে কোনো প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা অনুভবমাত্র করেন না।

৭

আজ আহ্নিক ও স্নানাহার সারিয়া কৃষ্ণদয়াল অনেকদিন পরে আনন্দময়ীর ঘরের মেজের উপর নিজের কম্বলের আসনটি পাতিয়া সাবধানে চারিদিকের সমস্ত সংস্রব হইতে যেন বিবিক্ত হইয়া খাড়া হইয়া বসিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন—"ওগো, তুমি ত তপস্যা করচ, ঘরের কথা কিছু ভাব না, কিন্তু আমি যে গোরার জন্যে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে গেলুম।"

কৃষ্ণদয়াল। কেন, ভয় কিসের?

আনন্দময়ী। তা আমি ঠিক বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্চে গোরা আজকাল এই যে হিঁদুয়ানী আরম্ভ করেছে এ ওকে কখনই সইবে না, এ ভাবে চল্‌তে গেলে শেষকালে একটা কি বিপদ্ ঘট্‌বে। আমি ত তোমাকে তখনি বলেছিলুম ওর পৈতে দিয়ো না। তখন

যে তুমি কিছুই মানতে না ; বল্লে গলায় এক গাছা সুতো পরিয়ে দিলে তাতে কারো কিছু আসে যায় না। কিন্তু শুধু ত সুতো নয়—এখন ওকে ঠেকাবে কোথায় ?

কৃষ্ণদয়াল। বেশ ! সব দোষ বুঝি আমার ! গোড়ায় তুমি যে ভুল করলে। তুমি যে ওকে কোনোমতেই ছাড়তে চাইলে না। তখন আমিও গোঁয়ার গোছের ছিলুম—ধর্ম্ম-কর্ম্ম কোনো কিছুর ত জ্ঞান ছিল না। এখন হলে কি এমন কাজ করতে পারতুম !

আনন্দময়ী। কিন্তু যাই বল, আমি যে কিছু অধর্ম্ম করেছি সে আমি কোনোমতে মানতে পারব না। তোমার ত মনে আছে ছেলে হবার জন্যে আমি কি না করেছি—যে যা বলেছে তাই শুনেছি—কত মাদুলি কত মন্তর নিয়েছি সে ত তুমি জানই। একদিন স্বপ্নে দেখলুম যেন সাজি ভরে টগর ফুল নিয়ে এসে ঠাকুরের পুজো করতে বসেচি—এক সময় চেয়ে দেখি সাজিতে ফুল নেই, ফুলের মত ধব্‌ধবে একটি ছোট্ট ছেলে ; আহা সে কি দেখেছিলুম সে কি বল্‌ব, আমার দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল—তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিতে যাব আর ঘুম ভেঙে গেল। তার দশ দিন না যেতেই ত গোরাকে পেলুম—সে আমার ঠাকুরের দান—সে কি আর কারো যে আমি কাউকে ফিরিয়ে দেব ! আর জন্মে তাকে গর্ভে ধারণ করে বোধ হয় অনেক কষ্ট পেয়েছিলুম তাই আজ সে আমাকে মা বল্‌তে এসেচে। চারিদিকে তখন মারামারি কাটাকাটি, নিজের প্রাণের ভয়েই মরি—সেই সময়ে রাত দুপুরে সে যখন আমাদের বাড়িতে এসে লুকোলো তুমি ত তাকে ভয়ে ভয়ে বাড়িতে রাখতেই চাও না—আমি তোমাকে ভাঁড়িয়ে তাকে গোয়াল ঘরে লুকিয়ে রাখ্‌লুম। সেই রাত্রেই ছেলেটি প্রসব করে সে ত মারা গেল। সেই বাপ-মা-মরা ছেলেকে আমি যদি না বাঁচাতুম ত সে কি বাঁচ্‌ত ! তোমার কি ! তুমি ত পাদ্রির হাতে ওকে দিতে চেয়েছিলে। কেন ! পাদ্রিকে দিতে যাব কেন ? পাদ্রি কি ওর মা বাপ, না, ওর প্রাণরক্ষা করেচে ? এমন করে যে ছেলে পেয়েছি সে কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে কম ! তুমি যাই বল, এ ছেলে যিনি আমাকে দিয়েচেন তিনি স্বয়ং যদি না নেন্ তবে প্রাণ গেলেও আর কাউকে নিতে দিচ্চিনে।

কৃষ্ণদয়াল। সে ত জানি। তা, তোমার গোরাকে নিয়ে তুমি থাক, আমি ত কখনো তাতে কোনো বাধা দিইনি। কিন্তু ওকে ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে তার পরে ওর পৈতে না দিলে ত সমাজে মান্‌বে না। তাই পৈতে কাজেই দিতে হল। এখন কেবল দুটি কথা ভাববার আছে। ন্যায়ত আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত মহিমেরই প্রাপ্য—তাই—

আনন্দময়ী। কে তোমার বিষয় সম্পত্তির অংশ নিতে চায় ! তুমি যত টাকা করেচ সব তুমি মহিমকে দিয়ে যেয়ো—গোরা তার এক পয়সাও নেবে না। ও পুরুষ মানুষ, লেখাপড়া শিখেচে, নিজে খেটে উপার্জ্জন করে খাবে—ও পরের ধনে ভাগ বসাতে যাবে কেন ! ও বেঁচে থাক্ সেই আমার ঢের—আমার আর কোনো সম্পত্তির দরকার নেই।

কৃষ্ণদয়াল। না, ওকে একেবারে বঞ্চিত করব না। জায়গিরটা ওকেই দিয়ে দেব—কালে তার মুনফা বছরে হাজার টাকা হতে পারবে। এখন ভাবনার কথা হচ্চে ওর বিবাহ দেওয়া নিয়ে। পূর্ব্বে যা করেচি তা করেচি—কিন্তু এখন ত হিন্দুমতে ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়ে দিতে পারব না—তা এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর !

আনন্দময়ী। হায় হায় ! তুমি মনে কর তোমার মত পৃথিবীময় গঙ্গাজল আর গোবর ছিটিয়ে বেড়াইনে বলে আমার ধর্ম্মজ্ঞান নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে ওর বিয়েই বা দেব কেন, আর রাগ করবই বা কি জন্যে ?

কৃষ্ণদয়াল। বল কি ! তুমি যে বামুনের মেয়ে।

আনন্দময়ী। তা হইনা বামুনের মেয়ে ! বামনাই করা ত আমি ছেড়েই দিয়েছি। ঐ ত মহিমের বিয়ের সময় আমার খ্রীষ্টানী চাল বলে কুটুম্বরা গোল করতে চেয়েছিল—আমি তাই ইচ্ছে করেই তফাৎ হয়ে ছিলুম, কথাটি কইনি। পৃথিবীসুদ্ধ লোক আমাকে খ্রীষ্টান বলে, আরো কত কি কথা কয়—আমি সমস্ত মেনে নিয়েই বলি—তা খ্রীষ্টান কি মানুষ নয় ! তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের একবার মোগলের একবার খ্রীষ্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্চেন কেন ?

কৃষ্ণদয়াল। ও সব অনেক কথা, তুমি মেয়ে মানুষ

সে সব বুঝবে না। কিন্তু সমাজ একটা আছে—সেটা ত বোঝ, সেটা তোমার মেনে চলাই উচিত।

আনন্দময়ী। আমার বুঝে কাজ নেই। আমি এই বুঝি যে গোরাকে আমি যখন ছেলে বলে মানুষ করেচি তখন আচার বিচারের ভড়ং করতে গেলে সমাজ থাক্ আর না থাক্ ধর্ম্ম থাক্‌বে না। আমি কেবল সেই ধর্ম্মের ভয়েই কোনো দিন কিছুই লুকোইনে—আমি যে কিছু মানচিনে সে সকলকেই জান্‌তে দিই, আর সকলেরই ঘৃণা কুড়িয়ে চুপ করে পড়ে থাকি। কেবল একটি কথাই লুকিয়েছি, তারই জন্যে ভয়ে ভয়ে সারা হয়ে গেলুম ঠাকুর কখন্ কি করেন। দেখ, আমার মনে হয় গোরাকে সকল কথা বলে ফেলি, তার পরে অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।

কৃষ্ণদয়াল ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আমি বেঁচে থাক্‌তে কোনো মতেই সে হতে পারবে না। গোরাকে ত জানই। এ কথা শুন্‌লে সে কিযে করে বস্‌বে তা কিছুই বলা যায় না। তার পরে সমাজে একটা হুলস্থূল পড়ে যাবে। সুধু তাই! এদিকে গবর্ণমেণ্ট্ কি করে তাও বলা যায় না। যদিও গোরার বাপ লড়াইয়ে মারা গেছে, ওর মাও ত মরেচে জানি কিন্তু সব হাঙ্গাম চুকে গেলে মেজেষ্টরিতে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এখন এই নিয়ে যদি একটা গোলমাল উঠে পড়ে তাহলে আমার সাধন ভজন সমস্ত মাটি হবে, আরো কি বিপদ ঘটে বলা যায় না।"

আনন্দময়ী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কৃষ্ণদয়াল কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—গোরার বিবাহ সম্বন্ধে আমি একটা পরামর্শ মনে মনে করেচি। পরেশ ভট্‌চাজ্ আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ত। সে স্কুলইন্‌স্পেক্টরি কাজে পেন্সন্ নিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে বসেছে। সে ঘোর ব্রাহ্ম। শুনেছি তার ঘরে অনেকগুলি মেয়েও আছে। গোরাকে তার বাড়িতে যদি ভিড়িয়ে দেওয়া যায় তবে যাতায়াত করতে করতে পরেশের কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হয়ে যেতেও পারে। তার পরে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

আনন্দময়ী। বল কি! গোরা ব্রাহ্মর বাড়ি যাতায়াত করবে? সে দিন ওর আর নেই।

বলিতে বলিতেই স্বয়ং গোরা তাহার মেঘমন্দ্র স্বরে "মা" বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণদয়ালকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গোরার কাছে গিয়া দুই চক্ষে স্নেহ বিকীর্ণ করিতে করিতে কহিলেন—"কি, বাবা, কি চাই?"

"না বিশেষ কিছু না, এখন থাক্‌"—বলিয়া গোরা ফিরিবার উপক্রম করিল।

কৃষ্ণদয়াল কহিলেন—"একটু বোস, একটা কথা আছে। আমার একটি ব্রাহ্মবন্ধু সম্প্রতি কলকাতায় এসেচেন তিনি হেদো তলায় থাকেন।"

গোরা। পরেশ বাবু নাকি!

কৃষ্ণদয়াল। তুমি তাঁকে জান্‌লে কি করে?

গোরা। বিনয় তাঁর বাড়ির কাছেই থাকে, তার কাছে তাঁদের গল্প শুনেছি।

কৃষ্ণদয়াল। আমি ইচ্ছা করি তুমি তাঁদের খবর নিয়ে এস।

গোরা আপন মনে একটু চিন্তা করিল, তার পরে হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা আমি কালই যাব।"

আনন্দময়ী কিছু আশ্চর্য্য হইলেন।

গোরা একটু ভাবিয়াই আবার কহিল—"না, কাল ত আমার যাওয়া হবে না।"

কৃষ্ণদয়াল। কেন?

গোরা। কাল আমাকে ত্রিবেণী যেতে হবে।

কৃষ্ণদয়াল আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ত্রিবেণী!"

গোরা। কাল সূর্য্যগ্রহণের স্নান।

আনন্দময়ী। তুই অবাক্ করলি গোরা। স্নান করতে চাস্ কলকাতার গঙ্গা আছে। ত্রিবেণী না হলে তোর স্নান হবে না—তুই যে দেশসুদ্ধ সকল লোককেই ছাড়িয়ে উঠ্‌লি!

গোরা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার কারণ এই যে সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়। যেখানে গোরা একটুমাত্র অবকাশ পায় সেখানেই সে তাহার সমস্ত

সঙ্কোচ, সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার সবলে পরিত্যাগ করিয়া দেশের সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনের সঙ্গে বলিতে চায়, "আমি তোমাদের, তোমরা আমার।"

৮

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল রাত্রির মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেছে। সকাল বেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মত নির্ম্মল হইয়া ফুটিয়াছে। দুই একটা শাদা মেঘ নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

বিনয় জাগিয়া উঠিয়া খোলা জানালা দিয়া আকাশে চাহিবামাত্রই আর একটি নির্ম্মল প্রভাতের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার নীচের ঘরের বিছানায় পরেশ শুইয়া আছেন; সুচরিতা শিয়রের কাছে বসিয়া; তাহার উদ্বেগনত মুখে কপালের দুই ধারে চুলগুলি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার চোখের বড় বড় পল্লব বৃদ্ধের অচেতন মুখের উপর স্নিগ্ধ ছায়া বর্ষণ করিতেছে, এক হাতে সে মাঝে মাঝে রুমাল ভিজাইয়া আস্তে আস্তে বৃদ্ধের কপালে বুলাইয়া দিতেছে। আর এক হাতে পাখা করিতেছে, এই স্নেহের দৃশ্য এই সেবার দৃশ্য এমন সুস্পষ্ট করিয়া তাহার মনে জাগিল, বিশেষতঃ সেই সেবাকুশল হাত দুই খানির মাধুর্য্য এমনি তাহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল যে, নিজের সম্বন্ধে সে নিজেই বিস্মিত হইল। ঘুমের মধ্যেও কি এই স্মৃতির ধারা ভিতরে ভিতরে বহিতেছিল? তাই চেতনার প্রথম অভ্যুদয়েই সেই স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে প্রকাশ পাইল!

সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণের মধ্যে এমন একটা উৎসাহের সঞ্চার হইল যে, তাহাকে আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দিল না। সে তখনি উঠিয়া মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইল। যেন আজ কি একটা হইবে, যেন আজ তাহার একটা বিশেষ দিন, এই ভাবে তাহার মনের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অথচ হাতে কোনো কাজ নাই, ঘরে কোনো লোক নাই। বিনয় আপনার উদ্যমের কোনো বিষয় না পাইয়া একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। গোরার বাড়ীর পথে কিছু দূর গিয়া কোনো মতেই সেখানে যাইতে ইচ্ছা হইল না। গোরার কাছে গেলে প্রতিদিন যে সকল কথার আলোচনা হইয়া থাকে, আজ সে সকল কথায় বিনয়ের কোনো রুচি রহিল না।

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্ম, সমাজ, ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি ছাড়া মানুষের আর যে কোনো বিষয়ে কোনো ভাবনা বা বেদনা থাকিতে পারে গোরার তাহাতে খেয়ালই ছিল না, সে যেন আর সমস্তকেই অবজ্ঞা করিত, সেই জন্য গোরার সঙ্গ বিনয়ের পক্ষে আজ কেমন যেন কর্কশ বোধ হইল। সে তখনি ফিরিয়া বাসায় আসিল। চাদর খুলিয়া রাখিয়া দোতলায় রাস্তার ধারের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল পরেশ। এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে সতীশের হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। সতীশ বিনয়কে বারান্দায় দেখিতে পাইয়াই হাত তালি দিয়া "বিনয় বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরেশও মুখ তুলিয়া চাহিয়া বিনয়কে দেখিতে পাইলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি নীচে যেমন নামিয়া আসিল, সতীশকে লইয়া পরেশও তাহার বাসার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সতীশ বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল,—"বিনয় বাবু আপনি যে সে দিন বল্লেন আমাদের বাড়ীতে যাবেন, কই, গেলেন না ত?"

বিনয় সস্নেহে সতীশের পিঠে হাত দিয়া হাসিতে লাগিল। পরেশ সাবধানে তাঁহার লাঠিগাছটি টেবিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইয়া চৌকিতে বসিলেন ও কহিলেন,—"সে দিন আপনি না থাক্‌লে আমাদের ভারি মুস্কিল হত। বড় উপকার করেচেন।"

বিনয় ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"কি বলেন! কিইবা করেচি?"

সতীশ হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বিনয় বাবু, আপনার কুকুর নেই?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "কুকুর? না, কুকুর নেই।"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কুকুর রাখেন নি কেন?"

বিনয় কহিল,—"কুকুরের কথাটা কখনো মনে হয় নি।"

পরেশ কহিলেন,—"শুন্‌লুম সে দিন সতীশ আপনার এখানে এসেছিল, খুব বোধ হয় বিরক্ত করে গেছে।

ও এত বকে যে, ওর দিদি ওকে বক্তিয়ার খিলিজি নাম দিয়েছে।"

বিনয় কহিল,—"আমিও খুব বক্‌তে পারি তাই আমাদের দুজনের খুব ভাব হয়ে গেছে। কি বল সতীশ বাবু ?"

সতীশ এ কথার কোনো উত্তর দিল না; কিন্তু পাছে তাহার নূতন নামকরণ লইয়া বিনয়ের কাছে তাহার গৌরব হানি হয় সেই জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এবং কহিল,—"বেশ ত ভালই ত! বক্তিয়ার খিলিজি ভালই ত! আচ্ছা বিনয় বাবু, বক্তিয়ার খিলিজি ত লড়াই করেছিল ? সে ত বাংলা দেশ জিতে নিয়েছিল ?"

বিনয় হাসিয়া কহিল,—"আগে সে লড়াই করত, এখন আর লড়াইয়ের দরকার হয় না, এখন সে শুধু বক্তৃতা করে। আর বাংলা দেশ জিতেও নেয়।"

এম্‌নি করিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। পরেশ সুকুলের চেয়ে কম কথা কহিয়াছিলেন,—তিনি কেবল প্রসন্ন শান্তমুখে মাঝে মাঝে হাসিয়াছেন এবং দুটো একটা কথায় যোগ দিয়াছেন। বিদায় লইবার সময় চৌকি হইতে উঠিয়া বলিলেন,—"আমাদের আটাত্তর নম্বরের বাড়ীটা এখান থেকে বরাবর ডানহাতি গিয়ে—"

সতীশ কহিল,—"উনি আমাদের বাড়ী জানেন। উনি যে সে দিন আমার সঙ্গে বরাবর আমাদের দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন।"

এ কথায় লজ্জা পাইবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না—কিন্তু বিনয় মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিল। যেন কি একটা তাহার ধরা পড়িয়া গেল।

বৃদ্ধ কহিলেন—তবে ত আপনি আমাদের বাড়ী জানেন। তা হলে যদি কখনো আপনার—

বিনয়। সে আর বলতে হবে না—যখনি—

পরেশ। আমাদের এ ত একই পাড়া—কেবল কলকাতা বলেই এত দিন চেনাশোনা হয় নি।

বিনয় রাস্তা পর্য্যন্ত পরেশকে পৌঁছাইয়া দিল। দ্বারের কাছে কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল। পরেশ লাঠি লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন—আর সতীশ ক্রমাগত বকিতে বকিতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল, পরেশ বাবুর মত এমন বৃদ্ধ দেখি নাই, পায়ের ধূলা লইতে ইচ্ছা করে। আর, সতীশ ছেলেটি কি চমৎকার! বাঁচিয়া থাকিলে এ একজন মানুষ হইবে—যেমন বুদ্ধি তেম্‌নি সরলতা।

এই বৃদ্ধ এবং বালকটি যতই ভাল হোক এত অল্পক্ষণের পরিচয়ে তাহাদের সম্বন্ধে এতটা পরিমাণে ভক্তি ও স্নেহের উচ্ছ্বাস সাধারণতঃ সম্ভবপর হইতে পারিত না। কিন্তু বিনয়ের মনটা এমন অবস্থায় ছিল যে, সে অধিক পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে নাই।

তাহার পরে বিনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিল—পরেশ বাবুর বাড়ী ত যাইতেই হইবে, নহিলে ভদ্রতা রক্ষা হইবে না। এই ভদ্রতা রক্ষা করিতে সে মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করে এমন তাহার ইচ্ছা ছিল না অথচ সেই বাড়ীতে যাইতে একটা বিপুল সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যেও কতবার পরেশ বাবুর দ্বারের কাছে গিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। কখনো এরূপ সমাজে বিনয় মেশে নাই। কেমন করিয়া কি করিতে হইবে, কিসে সেখানকার শিষ্টতার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে তাহা তাহার কিছুই জানা ছিল না। নিজেকে পাছে লেশমাত্র হাস্যকর বা অপরাধী করিয়া তোলে এই ভাবনা তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার সঙ্কোচ এই ছিল যে, তাহার মনের ভিতরকার কথাটা লইয়া ভদ্রমহিলার মুখের দিকে সে চাহিবে কি করিয়া ?

এ ছাড়া ভিতরে ভিতরে আর একটা বাধা তাহাকে টানিতেছিল। গোরার নিষেধকে সে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু কোনো মতে ভুলিতে পারিতেছিল না। গোপনে তাহা তাহাকে পীড়া দিতেছিল। সে যে ভারতবর্ষের নিষেধ! সব চেয়ে ভারতবর্ষকেই মানিবে বলিয়া ইহারা যে দল বাঁধিয়া কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু আজ বিনয়ের এ কি ঘটিল? ভারতবর্ষের বাধা তাহার কাছে অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে!

চাকর আসিয়া খবর দিল আহার প্রস্তুত—কিন্তু এখনো বিনয়ের স্নানও হয় নাই। বারোটা বাজিয়া গেছে। হঠাৎ এক সময়ে বিনয় সজোরে মাথা ঝাড়া দিয়া কহিল,—"আমি খাব না, তোরা যা!" বলিয়া ছাতা ঘাড়ে করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল—একটা চাদরও কাঁধে লইল না।

বরাবর গোরাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিনয় জানিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া হিন্দুহিতৈষীর আপিস বসিয়াছে;—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গোরা আপিসে গিয়া সমস্ত বাংলাদেশে তাহার দলের লোক যেখানে যে আছে সবাইকে পত্র লিখিয়া জাগ্রত করিয়া রাখে। এই খানেই তাহার ভক্তরা তাহার মুখে উপদেশ শুনিতে আসে এবং তাহার সহকারিতা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করে।

সেদিনও গোরা সেই আপিসের কাজে গিয়াছিল। বিনয় একেবারে যেন দৌড়িয়া অন্তঃপুরে আনন্দময়ীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ী তখন ভাত খাইতে বসিয়াছিলেন এবং লছ্‌মিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহাকে পাখা করিতেছিল।

আনন্দময়ী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—"কি রে বিনয়, কি হয়েছে তোর?"

বিনয় তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"মা বড় ক্ষিদে পেয়েচে, আমাকে খেতে দাও।"

আনন্দময়ী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"তবেই ত মুস্কিলে ফেল্লি। বামুন ঠাকুর চলে গেছে—তোরা যে আবার"—

বিনয় কহিল,—"আমি কি বামুন ঠাকুরের রান্না খেতে এলুম! তা হলে আমার বাসার বামুন কি দোষ করলে? আমি তোমার পাতের প্রসাদ খাব মা। লছ্‌মিয়া, দে ত আমাকে এক গ্লাস্ জল এনে!"

লছ্‌মিয়া জল আনিয়া দিতেই বিনয় ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন আনন্দময়ী আর একটা থালা আনাইয়া নিজের পাতের ভাত সস্নেহে সযত্নে মাখিয়া সেই থালে তুলিয়া দিতে থাকিলেন এবং বিনয় বহুদিনের বুভুক্ষুর মত তাহাই খাইতে লাগিল।

আনন্দময়ীর মনের একটা বেদনা আজ দূর হইল। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া বিনয়েরও বুকের একটা বোঝা যেন নামিয়া গেল। আনন্দময়ী বালিশের খোল সেলাই করিতে বসিয়া গেলেন, কেয়াখয়ের তৈরি করিবার জন্য পাশের ঘরে কেয়াফুল জড় হইয়াছিল তাহারই গন্ধ আসিতে লাগিল, বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের কাছে ঊর্দ্ধোত্থিত একটা হাতে মাথা রাখিয়া আধশোওয়া রকমে পড়িয়া রহিল, এবং পৃথিবীর আর সমস্ত ভুলিয়া ঠিক সেই আগেকার দিনের মত আনন্দে বকিয়া যাইতে লাগিল।

এই একটা বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেই বিনয়ের হৃদয়ের নূতন বন্যা আরো যেন উদ্দাম হইয়া উঠিল। আনন্দময়ীর ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তা দিয়া সে যেন একেবারে উড়িয়া চলিল; মাটির স্পর্শ তাহার যেন পায়ে ঠেকিল না; তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল মনের যে কথাটা লইয়া সে এ কয়দিন সঙ্কোচে পীড়িত হইয়াছে তাহাই আজ মুখ তুলিয়া সকলের কাছে ঘোষণা করিয়া দেয়।

বাড়িতে আসিয়া তাহার টেবিলের সাম্‌নে কাগজ কলম লইয়া বসিল—একটা কিছু লিখিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায় কিন্তু একলাইনও লেখা হইল না। কেবল ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে কতকগুলা ছবি আঁকিল; সে ছবির শিল্পকলা যে সাধারণের কাছে প্রকাশ করিবার নহে বিনয়ের ব্যবহারেই তাহার প্রমাণ হইল, কলম ফেলিয়া দিয়া কাগজখানা সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক্ পরেশ বাবুর বাড়ি যাইবই। তাই কোনমতে তিনটে না বাজিতেই মুখ ধুইয়া সাফ কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইল—কেবল জুতাটা সম্বন্ধে তাহার মনে অত্যন্ত দ্বিধা জন্মিল, বহুকালের নির্দ্দয় ব্যবহারে জুতাটা একটু ছিঁড়িয়া আসিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে সে সম্বন্ধে সে মনোযোগমাত্র করে নাই, আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল জুতাটা বদল করিতে পারিলে ভাল হইত, এ জুতা দেখিলে নিশ্চয় লোকে হাসিবে এমনো মনে করিতে পারে আমি কৃপণ;—এখনি গাড়ি করিয়া জুতার দোকানে গিয়া জুতা কিনিবার জন্য বিনয় ব্যস্ত হইল—বাক্স খুলিয়া দেখিল হাতে টাকা নাই, বাড়ি হইতে টাকা আসিতে আরো দিনদুয়েক দেরি আছে; সেই লেফাফার মধ্যে যে টাকা আছে সেটা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আবার লেফাফার মধ্যে রাখিয়া দিল। তখন কোঁচাটা লম্বা করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া জুতাটা যথাসম্ভব ঢাকিয়া চলিবার সঙ্কল্প করিয়া বিনয় বাহির হইল। কি কথা উঠিলে বিনয় তাহার কিরূপ উত্তর দিবে তাহাই সে মনে মনে

আওড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

বিনয় যে মুহূর্ত্তে ৭৮ নম্বরের দরজার কাছে আসিয়া পৌঁছিল ঠিক সেই সময়েই পরেশও বিপরীত দিক দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"আসুন আসুন, বিনয় বাবু, বড় খুসি হলুম।" এই বলিয়া পরেশ বিনয়কে তাঁহার রাস্তার ধারের বসিবার ঘরটাতে লইয়া গিয়া বসাইলেন। একটি ছোট টেবিল, তাহার এক ধারে পিঠওয়ালা বেঞ্চি, অন্যধারে একটা কাঠের ও বেতের চৌকি; দেয়ালে একদিকে যিশুখৃষ্টের একটি রং করা ছবি এবং অন্যদিকে কেশব বাবুর ফোটোগ্রাফ। টেবিলের উপর দুই চারি দিনের খবরের কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপরে শীষার কাগজ চাপা। কোণে একটি ছোট আলমারি তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। আলমারির মাথার উপরে একটি গ্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে।

বিনয় তাহার কোঁচার প্রান্ত সাবধানে জুতার উপরে ছড়াইয়া দিয়া বসিল। তাহার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল তাহার পিঠের দিকের খোলা দরজা দিয়া যদি কেহ ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করে।

পরেশ কহিলেন,—"সোমবারে সুচরিতা আমার একটি বন্ধুর মেয়েকে পড়াতে যায় সেখানে সতীশের একটি সমবয়সী ছেলে আছে তাই সতীশও তার সঙ্গে গেছে। আমি তাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসচি। আর একটু দেরি হইলেই ত আপনার সঙ্গে দেখা হত না।"

খবরটা শুনিয়া বিনয় একইকালে একটা আশাভঙ্গের খোঁচা এবং আরাম মনের মধ্যে অনুভব করিল। কোঁচাটার প্রতি আর তাহার দৃষ্টি রহিল না এবং পরেশের সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা দিব্য সহজ হইয়া আসিল।

গল্প করিতে করিতে একে একে পরেশ আজ বিনয়ের সমস্ত খবর জানিতে পারিলেন। বিনয়ের বাপ মা নাই; খুড়িমাকে লইয়া খুড়া দেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখেন। তাঁহার খুড়তুত দুই ভাই তাহার সঙ্গে এক বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত--বড়টি উকীল হইয়া তাহাদের জেলা কোর্টে ব্যবসায় চালাইতেছে, ছোটটি কলিকাতায় থাকিতেই ওলা-উঠা হইয়া মারা গিয়াছে। খুড়ার ইচ্ছা বিনয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটির চেষ্টা করে কিন্তু বিনয় কোনো চেষ্টাই না করিয়া নানা বাজে কাজে নিযুক্ত আছে।

এমনি করিয়া প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল। বিনা প্রয়োজনে আর বেশিক্ষণ থাকিলে অভদ্রতা হয় তাই বিনয় উঠিয়া পড়িল কহিল, "বন্ধু সতীশের সঙ্গে আমার দেখা হল না দুঃখ রইল তাকে খবর দেবেন আমি এসেছিলুম।"

পরেশ বাবু কহিলেন, "আর একটু বস্‌লেই তাদের সঙ্গে দেখা হত। তাদের ফেরবার আর বড় দেরি নাই।"

এই কথাটুকুর উপরে নির্ভর করিয়া আবার বসিয়া পড়িতে বিনয়ের লজ্জা বোধ হইল। আর একটু পীড়াপীড়ি করিলে সে বসিতে পারিত--কিন্তু পরেশ অধিক কথা বলিবার বা পীড়াপীড়ি করিবার লোক নহেন, সুতরাং বিদায় লইতে হইল। পরেশ বলিলেন, "আপনি মাঝে মাঝে এলে খুসি হব।"

রাস্তার বাহির হইয়া বিনয় বাড়ির দিকে ফিরিবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করিল না। সেখানে কোনো কাজ নাই। বিনয় কাগজে লিখিয়া থাকে--তাহার ইংরেজি লেখার সকলে খুব তারিফ করে কিন্তু গত কয় দিন হইতে লিখিতে বসিলে লেখা মাথায় আসে না। টেবিলের সাম্‌নে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকাই দায়--মন ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠে। বিনয় তাই আজ বিনা কারণেই উল্টা দিকে চলিল।

দুপা যাইতেই একটি বালককণ্ঠের চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইল "বিনয় বাবু, বিনয় বাবু!"

মুখ তুলিয়া দেখিল একটি ভাড়াটে গাড়ির দরজার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সতীশ তাহাকে ডাকাডাকি করিতেছে। গাড়ির ভিতরের আসনে খানিকটা শাড়ি খানিকটা শাদা জামার আস্তিন যেটুকু দেখা গেল তাহাতে আরোহীটি যে কে তাহা বুঝিতে কোন সন্দেহ রহিল না।

বাঙ্গালী ভদ্রতার সংস্কার অনুসারে গাড়ির দিকে দৃষ্টি রক্ষা করা বিনয়ের পক্ষে শক্ত হইয়া উঠিল, ইতিমধ্যে সেই খানেই গাড়ি হইতে নামিয়া সতীশ আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল—কহিল "চলুন আমাদের বাড়ি!"

বিনয় কহিল—"আমি যে তোমাদের বাড়ি থেকে এখনি আসচি।"

সতীশ। বা, আমরা যে ছিলুম না, আবার চলুন্!

সতীশের পীড়াপীড়ি বিনয় অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। বন্দীকে লইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সতীশ উচ্চস্বরে কহিল—"বাবা বিনয় বাবুকে এনেছি!"

বৃদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "শক্ত হাতে ধরা পড়েছেন, শীঘ্র ছাড়া পাবেন না। সতীশ তোর দিদিকে ডেকে দে।"

বিনয় ঘরে আসিয়া বসিল, তাহার হৃৎপিণ্ড বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। পরেশ কহিলেন "হাঁপিয়ে পড়েচেন বুঝি! সতীশ ভারি দুরন্ত ছেলে!"

ঘরে যখন সতীশ তাহার দিদিকে লইয়া প্রবেশ করিল তখন বিনয় নিজের ছেঁড়া জুতার উপর কোঁচার অগ্রভাগ মেলিয়া দিয়া সেই দিকে চোখ রাখিয়া বসিয়া ছিল। প্রথমে সে একটি মৃদু সুগন্ধ অনুভব করিল—তাহার পরে শুনিল পরেশ বাবু বলিতেছেন—"রাধে, বিনয় বাবু এসেছেন। এঁকে ত তুমি জানই।"

বিনয় চকিতের মত মুখ তুলিয়া দেখিল সুচরিতা তাহাকে নমস্কার করিয়া সাম্নের চৌকিতে বসিল—এবার বিনয় প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিল না।

সুচরিতা কহিল—"উনি রাস্তা দিয়া যাচ্ছিলেন। ওঁকে দেখ্বা মাত্র সতীশকে আর ধরে রাখা গেল না, সে গাড়ি থেকে নেমেই ওঁকে টেনে নিয়ে এল। আপনি হয় ত কোনো কাজে যাচ্ছিলেন—আপনার ত কোনো অসুবিধে হয়নি!"

সুচরিতা বিনয়কে সম্বোধন করিয়া কোনো কথা কহিবে বিনয় তাহা প্রত্যাশাই করে নাই। সে কুণ্ঠিত হইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না, আমার কোনো কাজ ছিল না, অসুবিধে কিছুই হয়নি।"

সতীশ সুচরিতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া কহিল—"দিদি চাবিটা দাও না। আমাদের সেই আর্গিনটা এনে বিনয় বাবুকে দেখাই।"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—"এই বুঝি সুরু হল! যার সঙ্গে বক্তিয়ারের ভাব হবে তার আর রক্ষে নেই—আর্গিন ত তাকে শুন্তেই হবে—আরো অনেক দুঃখ তার কপালে আছে। বিনয় বাবু, আপনার এই বন্ধুটি ছোট কিন্তু এর বন্ধুত্বর দায় বড় বেশি—সহ্য করতে পারবেন কি না জানিনে।"

বিনয় সুচরিতার এইরূপ অকুণ্ঠিত আলাপে কেমন করিয়া বেশ সহজে যোগ দিবে কোনো মতেই ভাবিয়া পাইল না। লজ্জা করিবে না দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াও কোনো প্রকারে ভাঙাচোরা করিয়া একটা জবাব দিল—"না, কিছুই না—আপনি সে— আমি—আমারও বেশ ভালই লাগে।

সতীশ তাহার দিদির কাছ হইতে চাবি আদায় করিয়া আর্গিন আনিয়া উপস্থিত করিল। একটা চৌকা কাচের আবরণের মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের অনুকরণে নীল রং করা কাপড়ের উপর একটা খেলার জাহাজ রহিয়াছে। সতীশ চাবি দিয়া দম লাগাইতেই আর্গিনের সুরে তালে জাহাজটা দুলিতে লাগিল এবং সতীশ একবার জাহাজের দিকেও একবার বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মনের অস্থিরতা সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমনি করিয়া সতীশ মাঝখানে থাকাতে অল্প অল্প করিয়া বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙিয়া গেল—এবং ক্রমে সুচরিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কথা কহাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল না।

সতীশ অপ্রাসঙ্গিক হঠাৎ এক সময় বলিয়া উঠিল "আপনার বন্ধুকে একদিন আমাদের এখানে আনবেন না?"

ইহা হইতে বিনয়ের বন্ধুসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল। পরেশবাবুরা নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন তাঁহারা গোরা সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। বিনয় তাহার বন্ধুর কথা আলোচনা করিতে করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। গোরার যে কিরূপ অসামান্য প্রতিভা, তাহার হৃদয় যে কিরূপ প্রশস্ত, তাহার শক্তি যে কিরূপ অটল তাহা বলিতে গিয়া বিনয় যেন কথা শেষ করিতে পারিল না। গোরা যে একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের মাথার উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে—বিনয় কহিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।

বলিতে বলিতে বিনয়ের মুখে যেন একটা জ্যোতি দেখা দিল, তাহার সমস্ত সঙ্কোচ একেবারে কাটিয়া গেল। এমন কি, গোরার মত সম্বন্ধে পরেশবাবুর সঙ্গে দুই একটা বাদ প্রতিবাদও হইল। বিনয় বলিল—"গোরা যে হিন্দু সমাজের সমস্তই অসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারচে তার কারণ,

সে খুব একটা বড় জায়গা থেকে ভারতবর্ষকে দেখ্‌চে। তার কাছে ভারতবর্ষের ছোট বড় সমস্তই একটা মহৎ ঐক্যের মধ্যে একটা বৃহৎ সঙ্গীতের মধ্যে মিলে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্চে। সে রকম করে দেখা আমাদের সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলে ভারতবর্ষকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিদেশী আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে তার প্রতি কেবলি অবিচার করি।"

সুচরিতা কহিল—"আপনি কি বলেন জাতিভেদটা ভাল?" এমন ভাবে কহিল যেন ও সম্বন্ধে কোনো তর্কই চলিতে পারে না।

বিনয় কহিল—"জাতিভেদটা ভালও নয় মন্দও নয়। অর্থাৎ কোথাও ভাল, কোথাও মন্দ। যদি জিজ্ঞাসা করেন, হাত জিনিষটা কি ভাল—আমি বল্‌ব সমস্ত শরীরেব সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লে ভাল। যদি বলেন ওড়বার পক্ষে কি ভাল? আমি বল্‌ব, না। তেম্‌নি ডানা জিনিষটাও ধরবার পক্ষে ভাল নয়।"

সুচরিতা উত্তেজিত হইয়া কহিল—"আমি ও সমস্ত কথা বুঝ্‌তে পারিনে। আমি জিজ্ঞাসা করচি আপ্‌নি জাতিভেদ কি মানেন?"

আর কারো সঙ্গে তর্ক উঠিলে বিনয় জোর করিয়াই বলিত—হাঁ মানি। আজ তাহার তেমন জোর করিয়া বলিতে বাধিল। ইহা কি তাহার ভীরুতা, অথবা জাতিভেদ মানি বলিলে কথাটা যতদূর পৌঁছে আজ তাহার মন ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকার করিল না—তাহা নিশ্চয় বলা যায় না।

পরেশ পাছে তর্কটা বেশি দূর যায় বলিয়া এই খানেই বাধা দিয়া কহিলেন—"রাধে তোমার মাকে এবং সকলকে ডেকে আন—এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

সুচরিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সতীশ তাহার সঙ্গে বকিতে বকিতে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

বিনয় একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত বিনয় বড় কাহারো সঙ্গে মেশে নাই। বলিতে গেলে জীবনে গোরাই তাহার একমাত্র বন্ধু ছিল। গোরা নিজের সমস্ত মত, উৎসাহ, সঙ্কল্প লইয়া বিনয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বিনয় সেই জন্য কেবল মত প্রকাশ এবং তাহা লইয়া তর্ক করিতেই পটু ছিল। প্রবন্ধ লেখা, সভাস্থলে বক্তৃতা করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু লোকজনদের সঙ্গে সাধারণ ভাবে আলাপ করা কিম্বা একটা শাদা চিঠি লেখা তাহার দ্বারা সহজে হইতে পারিত না। সেই জন্য বিনয় আজ যখন পরেশবাবুর বাড়ি আসিল তখন পাছে সুচরিতার সঙ্গে তাহার দেখা হয় এ ভয় তাহার মনে জাগিতেছিল—অথচ দেখা না হওয়ার নৈরাশ্য তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে সুচরিতার সঙ্গে আলাপ যখন তাহার কাছে অনেকটা সোজা হইয়া উঠিল তখন বিনয়ের বুকের মধ্য হইতে একটা যেন মস্ত ভার নামিয়া গেল। সে যে সুচরিতার সঙ্গে মুখামুখি বসিয়া এমন করিয়া কথা কহিতেছে ইহা তাহার কাছে প্রতিক্ষণেই একটা পরম বিস্ময়কর সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে ভাল করিয়া সুচরিতার মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিতেছিল না—পাছে তাহাদের কথার স্রোতে বাধা পড়ে—পাছে সুচরিতা কিছু মনে করে, পাছে তাহার নিজেরও মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু কি আনন্দ! পাখী প্রথম উড়িতে পারিলে যে আনন্দ—এও সেই রকম! একদিকে নিজের ডানার শক্তি অনুভব করা—আর একদিকে নীলাকাশের অনন্ত রহস্যের প্রথম আস্বাদ লাভ করা। বিনয়ের কাছে এই ছোট সামান্য ঘরের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আবির্ভূত হইল;—তাহার শরীর যদি স্বচ্ছ হইত তবে তাহার শরীরের সমস্ত রোমকূপ ভেদ করিয়া হর্ষ আলোকরশ্মির মত বাহিরে ছুটিয়া পড়িত।

পরেশবাবু বিনয়কে তাহার কলেজের পূর্ব্ব অধ্যাপকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন;—বিনয় একটা বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাহার উত্তর দিল—যেন তাহার সেই পূর্ব্বস্মৃতি তাহার কাছে মধুর। বিনয় মনে মনে বলিতে লাগিল—পরেশবাবু কি চমৎকার লোক—কি অমায়িক প্রকৃতি! আমি উঁহার চেয়ে বয়সে কত ছোট কিন্তু তবু আমাকে কতই সমাদর করিতেছেন! এখনকার ক্যালের লোকের মধ্যে এ রকম ভদ্রতা কিন্তু দেখা যায় না!

কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—বাবা, মা তোমাদের উপরের বারান্দায় আস্‌তে বল্লেন।

সুচরিতা দ্রুতপদে চলিয়া গেল এবং পরেশ বিনয়কে দোতলার বারান্দায় লইয়া গেলেন।

[ক্রমশ।

পোষাক পরিচ্ছদ।

আমাদের দেশের পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া একটা বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আমারো দুই একটি কথা বলিবার আছে। তাহা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না, বলিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ঋতুপর্য্যায়ে আবহবিপ্লব হইতে দেহ রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় পরিচ্ছদের প্রথম আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ হয় ত' মানুষের পশুপ্রকৃতিকে সংযত রাখিবার জন্য। ক্রমে পরিচ্ছদে অভ্যস্ত হইয়া নগ্নতা মানুষের নিকট বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। তখন মানুষের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি দেহকে সাজাইবার ভার গ্রহণ করিল। যাহা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিয়াছিল তাহা ক্রমশ নিতান্ত নিজস্ব হইয়া উঠিল।

প্রকৃতির যাহা সুন্দর সমস্তই মুক্ত নগ্ন। বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, ধরাতলে যাহারা ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য্যের আংশিক প্রকাশ, তাহারা যদি আপনার দেহ আবৃত করিতে বাধ্য হইয়াছে, তবে তাহাকে দেহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে। মনুষ্যদেহে অশোভন, অসুন্দর আদৌ কিছু ছিল না, দেহ যে দেশে যতখানি আবৃত হইয়াছে, সে দেশে ততখানি নগ্নদেহের প্রতি অবজ্ঞা ও অরুচি আসিয়া পড়িয়াছে। বিলাতের মহিলারা পাদগুল্ফ দেখিলে অশ্লীলদৃশ্য মনে করেন; আমাদের দেশে প্রায়নগ্ন দেহ কাহারো মনে কোনো কুভাব জাগ্রত করে না।

পরিচ্ছদ যখন মানুষের অনিবার্য্য, তখন তাহা অন্ততপক্ষে দেহের সহিত সমঞ্জস হওয়া উচিত। দেহ-সৌষ্ঠব, অঙ্গ-ঐশ্বর্য্য গুপ্ত বা লুপ্ত করিয়া দেয় যে পরিচ্ছদ তাহা প্রকৃতির প্রতি অত্যাচার, বিধাতার প্রতি অপমান। ভগবান যে দেহ চরমশিল্প বোধে প্রচার করিয়াছেন, তাহাকে ঘৃণ্য গোপ্য মনে করিয়া আমরা যদি আমাদের নিজহাতে গড়া উপাদানে তাহার উন্নতি করিতে চাহি, তবে আমরা বিধাতার কার্য্যে সংশোধক বিচারক বা সমালোচক হইয়া উঠি।

দেহ আত্মার আধার। পরিচ্ছদ দেহের আধার। পরিচ্ছদ, দেহ ও আত্মার মধ্যে এমন সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে যে পোষাকের চাপে দেহ আত্মা খর্ব্ব হইয়া না পড়ে। মানুষের কার্য্য প্রকৃতিকে সাহায্য করিবে, তাহা প্রকৃতিকে ছাপাইয়া চলিতে চাহিলেই বিরোধ হইতে আপনাকে বিনাশের পথে টানিতে থাকিবে।

অতএব ইহা স্থির যে পরিচ্ছদ ও দেহমনের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। যাহা সুন্দর তাহা চিরানন্দময়; মানুষের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি সত্যশিবসুন্দরের প্রতিফলন, তাই সে সুন্দরের ভিতর দিয়া মহাসুন্দরের আভাস পায়। সৌন্দর্য্য চিত্ত প্রসন্ন করে; চিত্তের প্রসন্নতা আত্মাকে নিৰ্ম্মল করে; নির্ম্মল আত্মা সুন্দরের উপভোগে সত্যশিবের অভিমুখী হয়। তাই আমাদের দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বস্তুকেও আমরা সুন্দর দেখিতে চাহি; মানুষের প্রত্যেক ক্ষুধিত প্রবৃত্তি সৌন্দর্য্য ভোগের জন্য লোলুপ হইয়া সুন্দরকে লক্ষ্য করিয়াই ছুটে, পথের মাঝে যাহা পায় তাহাই গ্রাস করে না। সৌন্দর্য্যের উপাসনা মানুষের নিত্যকালের উপাসনা; যে অবহিত হইয়া তাহা বুঝিতে পারে সে সৌন্দর্য্যের মাঝে শিব ও সত্যের আভাস পাইয়া ধন্য হয়। সৌন্দর্য্য জগদ্ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আনন্দময়ের আভাস দেয়। অতএব ইহাও স্থির যে পরিচ্ছদ সুন্দর হওয়া আবশ্যক।

যে দেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে পরিমাণ পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে দেশে সেই পরিমাণ পরিচ্ছদপারিপাট্যও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ভারত, মিশর, গ্রীস ও রোমে আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে সৌন্দর্য্য চর্চ্চা বা সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দিক হইতে আধ্যাত্মিকতা প্রস্ফুট হইয়াছিল; তাই দেখা যায় এই সকল দেশের পরিচ্ছদ বাহুল্যহীন তবুও সুন্দর, কারণ তাহারা দেহ মন ও পরিচ্ছদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপও শুধু ইহকাল লইয়াই এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠে নাই, তখন তাহার পোষাকও দেহকে ক্লিষ্ট পিষ্ট নষ্ট করিয়া উদ্দাম আস্ফালনের জন্যই রচিত হয় নাই, সে

দেহসৌন্দর্য্যকে ব্যক্ত-প্রস্ফুট করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিল। বর্ত্তমান যুগে প্রতীচ্যে যে সংগ্রামকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সকল জাতি নেশার পাকে ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে, তাহাদের এখন অধ্যাত্ম চিন্তার অবসর নাই; সকলে ইহা লইয়া মত্ত, পরত্রের ভাবনা কে করে? সুবিধা লইয়া ব্যস্ত, সৌন্দর্য্যচর্চ্চা এখন পরাহত। এই যে প্রতীচ্যের প্রচণ্ড বিক্ষোভ তাহা শান্তসমাহিত প্রাচ্যপ্রাচীরে আঘাত করিতেছে; কিন্তু তথাপি সৌভাগ্যবশে প্রাচ্য এখনো আধ্যাত্মিকতা হারায় নাই। যাহারা কর্ম্মেও জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারাও সুবিধার পোষাক ক্ষণিকের খোলসের মত অবসর পাইলেই পরিহার করে।

দেহের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে দ্বিবিধ পরিচ্ছদের। দেহযষ্টির প্রকৃত অনুকারী পিনদ্ধ পরিচ্ছদ বা প্রচুর শিথিল পরিচ্ছদ। প্রথমবিধ পরিচ্ছদ য়ুরোপের মধ্যযুগে স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি সুদূর পশ্চিমপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; দ্বিতীয়বিধ পরিচ্ছদ মিশর, গ্রীস, রোমে কিছুদিন গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহা প্রাচ্য ভূখণ্ডের চিরন্তন কালের নিজস্ব বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সৌন্দর্য্য আমাদের প্রয়োজনের অধিক, অথচ সৌন্দর্য্যই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

পিনদ্ধ পরিচ্ছদে দেহের প্রত্যেক অঙ্গরেখা আবৃত অথচ স্পষ্ট থাকে; মনুষ্যদেহের বিচিত্র উত্থানপতন, বিবিধ ঋজুবক্র গঠনলীলা, মুক্তভাবে প্রকট হইয়া মানুষকে মুগ্ধ করিয়া ললিত-সৌন্দর্য্যের চিন্তার ও উপলব্ধির অবসর প্রদান করে। শিথিলপ্রচুর পরিচ্ছদও ঠিক সেইরূপই দেহকে আবৃত করিয়াও ব্যক্ত করে। শিথিল পরিচ্ছদ দেহখানিতে গড়াইয়া জড়াইয়া ধরে, প্রতি অঙ্গের অবয়ব স্পষ্ট হইয়া উঠে। শিথিলপ্রচুর পরিচ্ছদের অধিক বাহার তাহার স্তরবিন্যাসে। স্তরে স্তরে স্তরে কুঞ্চিত গুম্ফিত হইয়া দেহলতাকে প্রচুরপুষ্পপল্লববিভূষণা লতাটির মত ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলে। এই প্রাচুর্য্য জগতের সঙ্গে মানুষের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। এই স্তরবিন্যস্ত কুঞ্চিত পরিচ্ছদ নয়নানন্দকর, তাই ইহা চিত্রকলার সাধনার ধন হইয়াছে। হায় হতভাগ্য বঞ্চিত য়ুরোপ, সৌন্দর্য্যস্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য, আনন্দ-অমরার আস্বাদ পাইবার জন্য, সত্যশিবসুন্দরের সহজ উপলব্ধির জন্য তোমাকে পরের দ্বারস্থ হইতে হয়।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিই ক্রমশঃ মানুষকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাচুর্য্যে, এবং প্রাচুর্য্য হইতে শোভনতার দিকে, শোভনতা হইতে আনন্দে, আনন্দ হইতে সত্যশিবের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। ইহাই উপলব্ধি করিয়া ভারত ধন্য হইয়াছে; য়ুরোপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই বলিয়াই দুই দিন অন্তর ফ্যাশান পরিবর্ত্তন করিতেছে, বিরাম নাই, তৃপ্তি নাই, ফ্যাশানের ফাসাদ মারাত্মক হইয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। য়ুরোপের মন দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, সৌন্দর্য্যের ঠিক মর্ম্মস্থানের রস-উৎসের সন্ধান তাহার মিলিতেছে না; তুচ্ছকে ধরিয়া সৌন্দর্য্যবোধের চরিতার্থতা মনে করিয়া প্রতারিত হইতেছে; ভুল ভাঙিলেই আবার অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। য়ুরোপের কলাকুশলগণ হয় সর্ব্ববাহুল্যরিক্ত নগ্নসৌন্দর্য্যের আরাধনা করিয়াছেন কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর কুঞ্চিত পরিচ্ছদের স্তুতি প্রচার করিয়াছেন। কোন শিল্পনিপুণ কলাবান য়ুরোপের কাটাছাঁটা চোঙাকৃতি পোষাক দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন নাই; চিত্রাঙ্কনে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই—কেবল এক মিস হেনরিয়েটা ভিন্ন, যিনি য়ুরোপীয় স্ত্রীপরিচ্ছদে সৌন্দর্য্যের বিকাশ লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বৈলাতিক মোহের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কোন কিছু চক্ষে সুন্দর শোভন বলিয়া লাগিলেও বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার খর্ব্বতা কুশ্রীতা ধরা পড়ে। বৈলাতিক পোষাক পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে পুরুষের পোষাক চোঙায়, ও স্ত্রীলোকের পোষাক অনাবশ্যক আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে; ইহাতে প্রাচুর্য্য যথেষ্ট, প্রয়োজনের অত্যন্ত অতিরিক্ত, কিন্তু দেহের সহিত সামঞ্জস্য নাই বলিয়া, দেহকে একেবারে গুপ্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহা আনন্দ দেয় না। সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য তাহা য়ুরোপীয় পোষাকে নাই। সেই একঘেয়ে চোঙা টুপি, চোঙা কুর্ত্তি, চোঙা পাজামা, চোঙা জুতা অথবা দৃঢ়পিনদ্ধ কর্শেট ও অনাবশ্যক মোটা কাপড়ের স্তূপ। এই প্রকার পোষাকে দেহের নমনীয়তা কমনীয়তা তিরোহিত হইয়া যায়, অঙ্গাবয়বের সুললিত গঠনলীলা গুপ্ত হইয়া

পড়ে, আড়ষ্ট বিকৃত নরনারী মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত ব্যথা পায়। সূক্ষ্মবস্ত্রের প্রাচুর্য্য যেমন স্তরবিন্যস্ত কুঞ্চনগত হইয়াও দেহকে, দেহের প্রত্যেক অবয়বের গঠনভঙ্গিকে গোপন করে না, মোটা কাপড় তেমন পারে না, ইহার প্রচুরতা দেহকে খর্ব্ব করিয়া আপনার চাকচিক্যময় মহার্ঘ্য মাহাত্ম্যই ঘোষণা করে। য়ুরোপের আবহ অবস্থা যখন মোটা কাপড় ব্যবহারে বাধ্য করিতেছে তখন তাহা শালীন শোভনভাবে যথাসম্ভব দেহের অনুকারী হইলেই সৌন্দর্য্য রক্ষা হয়, নচেৎ অন্য কোন উপায় নাই।

পরিচ্ছদ কেবল সুবিধার খাতিরে নিয়মিত হইলে সৌন্দর্য্য ত' নষ্ট হয়ই, আত্মাও সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারের নিকট খর্ব্ব হইয়া পড়ে; শুধু অসংযমের প্রলয়োৎসবে তাণ্ডব নৃত্যই পরম পুরুষার্থ নহে; ঐহিক জীবনের ধ্বংসস্তম্ভনচাকচিক্যলাভ অপেক্ষা মহত্তর অন্য কিছু লাভ আছে, যাহা ভুলিলে মানুষের চলিবে না, যাহা ত্যাগ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকিবে না। আত্মার বিকাশ ও আনন্দ, দেহের প্রকাশ ও আরাম, দেহ ও কালের সহিত সামঞ্জস্য যে পরিচ্ছদ সম্পাদন করিতে সক্ষম, তাহাকেই যথাসম্ভব কর্ম্মক্ষম করিয়া বরণ করাই শ্রেয়; তাহা আত্মার প্রেয় বলিয়াই শ্রেয়, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির প্রেয় বলিয়া নহে। জগৎ বিরোধময়; যে যত বিরোধের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারিবে সে তত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে। সেই সামঞ্জস্যের মধ্যে যদি চেষ্টা জাগ্রত দেখা যায়, তবে সে সামঞ্জস্য কারাগৃহের শান্তির মত। যাহা সহজ ও অক্লিষ্ট তাহাই শান্ত ও শুভ। এই সামঞ্জস্যকে গৃহসামগ্রী, জীবননির্ব্বাহপ্রণালী, শয়ন ভোজন প্রভৃতিতেও বিস্তৃত করিতে হইবে। সেই সামঞ্জস্য যদি চিরন্তন চিরাভ্যস্ত প্রথার সঙ্গে ঘটে তবেই তাহা সহজ স্বাভাবিক ও অক্লিষ্ট, নতুবা তাহা জাগ্রত চেষ্টাবিকৃতি—শৈলসঙ্কুল, সাগরের মত, তরণীভঙ্গের আশঙ্কা প্রতি পদে পদে। এই জন্য দেশে দেশে কালে কালে সৌন্দর্য্যের বিকাশ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন উপায়ে ঘটিয়াছে; এই জন্যই যাহা একের পথ্য, তাহা অপরের বিঘ্নকর। আমরা বৈলাতিক মোহে অনেক হারাইয়া পরানুকারী হইয়া ক্লিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু চক্ষুর আনন্দ শিল্পীর সাধনার বস্তু আমাদের পরিচ্ছদ আমরা যেন বিসর্জ্জন না দিই। আমাদের রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্ত্রীজাতির পোষাকের পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন; কিন্তু বৈলাতিকের কদর্য্য অনুকরণে আমার সজ্জা যাহা দেশীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আরো অশ্লীল, অধিকতর কুরুচির; তাহা দেখিয়া চিত্ত ব্যাহত হইয়া বিমুখ হয়। স্ত্রীলোকের লজ্জার অরুণিমা যখন সমগ্র দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, তখন আর কৃত্রিম আবরণ আবশ্যক বোধ হয় না, আবরণের সকল দৈন্য সকল অভাব তাহাতে পূর্ণ হইয়া উঠে। যদি পরিবর্ত্তন আনিতে হয়, তাহা বিদেশের ছাঁচে ঢালিয়া নহে, খাঁটি স্বদেশী চাই। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী রমণীর বা দক্ষিণের কোন কোন প্রদেশের বস্ত্র পরিধানভঙ্গী সহজে গৃহীত হইতে পারে—তাহা শালীনতাময় অতি সুন্দর। যদি সাংসারিক কর্ম্মের ব্যগ্র উৎসাহের খাতিরে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়, তবে তাহাও হিন্দুস্থানী পুরুষের রীতিতে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। পাজামা ব্যবহার—বিশেষত রমণীর—তাহা দেশী প্রথা হইলেও আমাদের দেশের অনুপযোগী এবং অশোভন, অসুন্দর, কুরুচিপ্রসূত। আমাদের জীবনের অনেক সুখ উহ্য হইয়াছে; কিন্তু এখনো রাস্তা ঘাটে বাহির হইলে বিচিত্র বর্ণের শিথিল পরিচ্ছদের উড্ডীন অঞ্চল দোলায়িত হইয়া যে আনন্দ উৎসবে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করে, তাহা ঘুচাইয়া শুধু একঘেয়ে চোঙা পোষাকের কালো আর কালো আর কালো আমাদের প্রাণকে প্রতিনিয়ত যেন মৃত্যুর বিভীষিকা না দেখায়। প্রকৃতি মুক্তহস্তে আমাদের দেশে বর্ণগন্ধগান ঢালিয়া দিয়াছেন, ধরিত্রীর শ্যামশোভা মুছিয়া আমরা যেন পবিত্র গোময় লেপন না করি। প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেহ মনকে ভূষিত করিতে পারিলেই প্রকৃতির ক্রোড়ে মানবের অবস্থানের সার্থকতা হয়। বাহিরের সহিত অন্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বাহিরকে সুন্দর সজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলে অন্তর আপনা হইতে সুন্দর সজ্জিত হইয়া উঠিবে; সকল কর্ম্মসংঘাতের মধ্যে প্রসন্নতা হারাইবে না; সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে উঠিয়া সত্যশিবসুন্দরের আনন্দাভাস উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও বরেণ্য হইতে পারিব।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্ণেগী কারু-বিদ্যালয়।

দাতাশ্রেষ্ঠ কার্ণেগীর নাম সর্ব্বজন বিদিত। তিনি আমেরিকায় কারুবিদ্যা শিক্ষার জন্য পিটস্‌বর্গ সহরকে ছয় কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই বিপুল দানের অমৃতফল স্বরূপ কার্ণেগী কারুবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

বর্ত্তমান খৃষ্টীয় বর্ষের ১১ই এপ্রেল মহা সমারোহে বিদ্যালয়ের নূতন প্রাসাদকল্প অট্টালিকা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে কারুবিদ্যার সকল বিভাগেরই শিক্ষা দেওয়া হইবে। ক্রিয়াসিদ্ধ (practical) বৈজ্ঞানিকশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া কামার, কুমার, ছুতার, চামার, প্লম্বর (যাহারা জলের কল, গ্যাসের কল বা ড্রেন ইত্যাদি মেরামত করে), যান্ত্রিক (mechanics) প্রভৃতি সকল কারু বিভাগ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বিভাগে শত শত ছাত্র পরম আগ্রহে শিল্পে শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের বহু শত শাখা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শাখা বিদ্যালয়গুলি প্রধান বিদ্যামন্দিরেরই নিকটে নিকটে অবস্থিত, এবং সকল বিদ্যালয় ৯৬ বিঘা জমী অধিকার করিয়া আছে।

দাতা কার্ণেগী ১৯০০ সালে কুবেরকল্প দান করেন; ৯০৫ সালে বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রথম লওয়া হয়। এক্ষণে াড়ে ৮০০ ছাত্র কারু শিখিতেছে।

বিদ্যামন্দিরের সম্মুখ দৃশ্য (frontage) লম্বায় আধ-াইল বিস্তৃত; পশ্চাৎভাগ অত বিস্তৃত নহে; ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও কার্য্যবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামন্দির বাড়িয়া চলিবে এমন আয়তন রাখা হইয়াছে। বিদ্যামন্দিরটি দেখিতে যেমন সুন্দর ও গম্ভীরপ্রভাবী (imposing) হইয়াছে, আলোক বাতাসের প্রাচুর্য্য ব্যবস্থায় তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদ এবং অগ্নিরোধক (fireproof) বলিয়া তেমনি নিরাপদ হইয়াছে।

কার্য্যগত বিজ্ঞান- (Applied Science) শাখায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্র শিক্ষা করে। প্রায় ৫০০ ছাত্র এই বিভাগের বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য দিবায় ও রাত্রিতে দুই সময়েই দেওয়া হয়। কর্ম্মনিযুক্ত লোকে দিনের বেলা অবসর পায় না, রাত্রিতে তাহাদের অবসর; তাহারাও যাহাতে শিক্ষার সুবিধায় বঞ্চিত না হয় এজন্য নৈশশিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কার্য্যগত বিজ্ঞানবিভাগের প্রধান প্রধান শাখার নাম লিখিত হইল:—ধাতববিদ্যা, ব্যবসায়িক রসায়ন, বৈদ্যুত-রসায়ন, সৌধ-নক্সা, রেলপথ নির্ম্মাণ, ম্যুনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচালন, বৈদ্যুত-যন্ত্রের গঠন ও পরীক্ষা, সাধারণ যন্ত্রগঠন, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালী, ধাতু গলাই ও শোধন, খনিজ বিদ্যা ইত্যাদি।

এই সকল কার্য্যকরী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে। কার্য্যসিদ্ধ পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে বক্তৃতা ও আবৃত্তি করিতে হয়। প্রায় সকল বিভাগেই অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কার্য্যগত বিজ্ঞানের নৈশশ্রেণীর শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর, কারণ শ্রমজীবীগণ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর রাত্রির বিশ্রামকাল হইতে অধিক সময় শিক্ষার জন্য ত ব্যয় করিতে পারে না, কাজেই অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগকে অধিক দিন শিক্ষা করিতে হয়।

কারু শিক্ষায় শিল্পসৌন্দর্য্য ও নক্সার (art and design) জ্ঞান খুব পুষ্ট হওয়া উচিত, এজন্য এই বিদ্যালয়ের একটি বিভাগে যেখানে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার নাম কার্য্যকরী নক্সা বিভাগ (School of Applied Design)। এই বিভাগ নূতন খোলা হইলেও সকলের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা এই দিকে ধাবিত হইয়াছে। স্থাপত্য-শিল্প প্রভৃতিতে নক্সার জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধির অনুশীলন অত্যাবশ্যক বলিয়া যে সকল লোক ইঞ্জিনিয়র বা ড্রাফ্‌ট্‌স্‌-ম্যানের কাজ করে তাহারাও রাত্রিকালে শিক্ষা পাইতে আসিয়া থাকে।

শিক্ষানবিশী বিভাগ সম্ভবপর বিবিধ কর্ম্মশালায় বিভক্ত। এই বিভাগের উদ্দেশ্য যুবকদিগকে যান্ত্রিকতা, আদর্শ নমুনার নক্সা করা, ছাঁচে ঢালাই করা, কামার ও রাজমিস্ত্রীর কাজ, গৃহপ্রাচীর বা সাইনবোর্ড চিত্র করা, প্লম্বর ও বৈদ্যুত-তারের কাজ করা প্রভৃতি শিখাইয়া কোন লাভজনক কাজের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া। কোন দোকানে শিক্ষানবিশী করিয়া যাহা শিক্ষা করা যায়, এই বিদ্যালয়ে সেই সময়ের মধ্যে তদপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে অধিকতর শিক্ষা দেওয়া হয়।

রাবণের রাজসভায় বন্দী ইন্দ্র।

এই বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ব্যবসায়ের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়া-সিদ্ধ (Theoretical and Practical) জ্ঞানশিক্ষা দিয়া চতুর কুশলী কারুকর করিয়া তোলা হয়। দোকানে বা কারখানায় কাজ শিখিলে শুধু ক্রিয়াসিদ্ধ শিক্ষা হয়, ঔপপত্তিক শিক্ষার অভাবে বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ ও চিন্তাশীলতার পরিমার্জ্জন হয় না। এই বিদ্যালয়ে সেই ক্রটির সংশোধন হয়। কর্ম্মকুশলতার সঙ্গে বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়া কারুকরদিগের প্রতিভা প্রকাশের অবসর ঘটে ও সুবিধা ঘটিলে তাহারা জীবনে প্রভূত উন্নতি করিতে পারে।

এই বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীবিভাগেও দিবা ও নৈশ অধিবেশন হয়। স্ত্রীলোকদিগকে পোষাক তৈয়ারি, নক্সা, ঘরকরণা গৃহস্থালীর কাজ, গৃহিণীপনা, হিসাব নিকাশ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রীলোক যে যে কর্ম্মের উপযোগী এমন সকলবিধ কর্ম্মই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত এই বিদ্যালয়ে আছে।

বিদ্যালয় গৃহে যন্ত্রসাহায্যে জল, হাওয়া, তাপ, আলোক প্রভৃতি যোগান হয়। ঘরের দেয়ালের মধ্যে মধ্যে নল আছে, তাহার ভিতর দিয়া গরম জল চালাইয়া ঘর গরম করা হয়, কারণ আমেরিকা শীতপ্রধান দেশ।

প্রতি বৎসর ছাত্রসংখ্যা বাড়িতেছে। শীঘ্রই বিদ্যা-মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে একজন অধিনায়ক, একজন অধ্যক্ষ ও ৬৬ জন অধ্যাপক ও শিক্ষক আছেন।

দাতা কার্ণেগী ৫ই এপ্রেল তারিখে ১৮ কোটি টাকা দান করেন, তন্মধ্যে ৬ কোটি টাকা কারুবিদ্যার জন্য এই বিদ্যালয়ের ভাগে পড়িয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত মধ্যে মধ্যে প্রায়ই Scientific American কাগজে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

এই বিদ্যালয়ের তুলনায় আমাদের দেশের কারু-বিদ্যালয়গুলি অতি ক্ষুদ্র বোধ হইবে। কিন্তু ধন-কুবেরের বসতিভূমি অলকাপুরী সদৃশ আমেরিকায় যাহা একের দানে পরিপুষ্ট হইতেছে, আমাদের দরিদ্রদেশে তাহা সমবেত দানে সাধিত করিতে হইবে। দানশৌণ্ডতা আমাদের দেশে নিতান্তই দুর্লভ, তাহার উপর প্রতিকূল রাজশক্তি আমাদের অভ্যুদয়ের শত অন্তরায় উঠাইতে ব্যস্ত; ইহা ক্ষোভের বিষয় হইলেও অপ্রতিকার্য্য বা নিরাশ্বাসজনক নহে।

বাংলায় বিদেশী রুটি-বিস্কুট।

আমরা এমন পরভাগ্যোপজীবী হইয়া উঠিয়াছি যে এখন হিতোপদেশের হিত-উপদেশ স্মরণ হয় যে 'যজ্জীবনং তন্মরণং, যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।' স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ নাকি ক্ষোভকাতর হইয়া বলিয়াছিলেন যে 'আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে ভারত মহাসাগর উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া ভারতবক্ষের উপরদিয়া একবার পাঁচ মিনিটের জন্য, সুনিশ্চিত হইবার জন্য দশ মিনিটের জন্য, প্রলয়তাণ্ডবে নাচিয়া যাক! ভারতের নাম পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে সকল কলঙ্কপ্রলেপসহ মুছিয়া ধুইয়া লুপ্ত হইয়া যাক।'* ইহা অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথ চিত্তের নিরাশ্বাসজনিত মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ! আমরা যে কিরূপ পরভাগ্যোপজীবী হইয়াছি তাহা সরকারি ব্যবসায় পত্রিকার হিসাবে বিদেশ হইতে বাংলায় রুটি বিস্কুটের আমদানি দেখিলে বুঝা যায়। আমরা শুধু বস্ত্রের জন্যই পরের দ্বারস্থ নহি, বিদেশী বণিক রুটি পিষ্টক গড়িয়া না মুখে ধরিলে পেট ভরে না। আমাদের মুখে মায়ের অন্ন আর রুচে না! অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি? তাহা ভবিতব্যতাই জানেন।

সরকারি পত্রে প্রকাশ যে বৈলাতিক খাদ্যের পরিষ্কার পারিপাট্যের জন্য ও যান্ত্রিক উপায়ে উহা প্রস্তুত বলিয়া উহার এদেশে আদর! এদেশে দেশীয় যে সব পিষ্টক কারখানা হইয়াছে, তাহার তৈয়ারি বিস্কুট-রুটির তুলনায় বিদেশীয় জিনিষ যে কত ভালো তাহা প্রকাশ হইয়াছে। এবং সেই তুলনায় সমালোচনা বৈদেশিক খাদ্য আমদানির সাহায্য করিয়াছে; অর্থাৎ বঙ্গবাবুরা দেশী খাদ্যের অপকৃষ্টতা দেখিয়া লেলিহান রসনায় বিলাতী টিনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমদানি বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বেশ্ কথা! বাঙালীর এই দুর্দ্দিনে এই বাক্য গৌরবের না লজ্জার, খ্যাতির না পরিহাসের, তাহা সরকারি পত্রিকা

* Let the Indian Ocean sweep over India for five minutes, to make the result doubly sure I would say for ten minutes.

পড়িয়া ঠিক বুঝা যায় না। পাঠকের চিত্তবৃত্তি অনুসারে ইহার টীকাভাষ্য হইবে, আমি বেচারা সংগ্রহকার আমি কিছু বলিতে চাহি না।

নিম্নে গত পাঁচ বৎসরে কোন বিদেশ হইতে কত বিস্কুট বাংলায় কত আসিয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

পরিমাণ।

ভারত বহির্ভূত ব্রিটিশ রাজত্ব হইতে মোট আমদানি।	১৯০২-০৩ পাউণ্ড	১৯০৩-০৪ পাউণ্ড	১৯০৪-০৫ পাউণ্ড	১৯০৫-০৬ পাউণ্ড	১৯০৬-০৭ পাউণ্ড
	১৬৩২০৬৮	৪১১৩২৩৫	৪০৪৫২৯০	৪৬৫১৪০৯	৫০৯৫৮০৬
অন্যান্য বিদেশ হইতে।	৫৮৩১৯	৬৭৩৬৮৮	২১৯৮৮৮	৫৫৩৯৬২	৫২৪৮৪৯
এতন্মধ্যে বাংলার অংশ।	৩৮৯৮৮৮	৭৭০৫৬৭	৯০২১৪০	৯৩৮৬৭২	৯৮৫২৭৯

মূল্য।

ভারত বহির্ভূত ব্রিটিশ রাজত্ব হইতে মোট আমদানি।	১৯০২-০৩ টাকা	১৯০৩-০৪ টাকা	১৯০৪-০৫ টাকা	১৯০৫-০৬ টাকা	১৯০৭-০৮ টাকা
	৬৫৯৩২৫	১৬৪২০১২	১৬৪৪৬৫৬	১৯৩৬০৭৫	২১৪৭৭১৫
অন্যান্য বিদেশ হইতে।	১৪৬৮৯	১৬২৭৫১	৫৫৪৮০	১৪৩০৪৩	১৩০৫৭৩
এতন্মধ্যে বাংলার অংশ।	১৯৫৫৫৮	৩৬৭০৬১	৪২২৫২২	৪১৪৫৭৯	৪৫৪৯০৮

বিস্কুট ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে অধিক লইয়াছে ব্রহ্মদেশ, তৎপরে বোম্বাই, তারপর বাংলা। কিন্তু তবু কি আমরা কম টাকাটা বিদেশের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। যে অষ্ট্রেলিয়া ভারতীয়কে তাহার মাটিতে পা দিতে দেয় না, তাহাকেই আমরা দিয়াছি বর্ত্তমান বৎসরে ৬৭৪৬৬৲ টাকা। ইহার মত লজ্জাহীনতার পরিচয় আর কিসে হইতে পারে?

ভারতে যদি কেহ বিস্কুটের কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার মনে রাখিতে হইবে যে ভারত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ, ময়দার কাই শীঘ্র গাঁজিয়া উঠে; এখানে গ্যাসভরা রুটি অঙ্গারাম্ল দিয়া তৈয়ার করা উচিত। এইরূপ প্রণালীতে রুটি গড়িতে হাত দিয়া ছুঁইবার আবশ্যক হয় না; এবং সরকারী পত্রিকা মনে করেন যে গোঁড়া হিন্দুরাও হাত দিয়া না-ছোঁয়া রুটি খাইতে কোন দ্বিধা করিবেন না। এবং তাঁহাদের ইহাও জানা উচিত যে বৈলাতিক রুটি-বিস্কুটও যান্ত্রিক উপায়ে তৈয়ারি হয়, হাত দিয়া ছোঁয়া হয় না। অতএব তাঁহাদের খাইবার আপত্তি কি থাকিতে পারে?

বাংলায় ৫৮ সহরে বিস্কুট রুটির কারবার আছে। ব্যবসায়ীগণ গ্যাসভরা রুটি গড়িতে আরম্ভ করিলে জিনিষ ভাল হয় ও লাভও বেশি হইতে পারে। বিস্কুট রুটির কারখানায় মুসলমান কারিগরই বেশী, তারপর হিন্দু; ক্রিশ্চান রুটিওয়ালা আসানসোল ও খড়্গপুর ব্যতীত অন্যত্র নাই।

কোকেন-অভ্যাস।

সমগ্র ভারতীয় মাদকনিবারিণী সমিতিতে শ্রীযুক্ত ডি, হুপার কোকেন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ তাহারই সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

উন্মাদ রোগের একজন বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন যে কোকেন নরসমাজের তৃতীয় শত্রু, সুরা প্রথম, অহিফেন দ্বিতীয়। চিকিৎসকেরা বলেন কোকেন-প্রভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে প্রথমে ইহার ব্যবহার সুরা বা অহিফেন-অভ্যাসের প্রতিকার কল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল: কিন্তু ব্যাধি অপেক্ষা ঔষধির অভ্যাস এক্ষণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

কোকা গাছ হইতে কোকেন হয়; উহা তিসির গাছের মত ঝোপ গাছ। দক্ষিণ আমেরিকায় এণ্ডিস পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ইহার খুব চাষ হয়; পেরু প্রদেশে ইহার শুষ্ক পাতা একটি প্রধান ব্যবসার সামগ্রী। আমরা যেমন উত্তেজক বলিয়া পান খাইয়া থাকি, দক্ষিণ আমেরিকগণ সেইরূপ কোকার পাতা প্রচুর ব্যবহার করে। প্রত্যেকের কাছে একটি বটুয়া ভরা কোকা পাতা ও চূণ থাকে; এবং মাঝে মাঝে কোকা পাতায় চূণ লাগাইয়া চর্ব্বণ করে।

তাহারা বলে যে এই পাতা খাইলে অল্প আহারেও অধিক পরিশ্রম করা যায়, এবং উঁচু পাহাড়ে উঠিতে নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয় না। কোন কোন য়ুরোপীয়, যাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, কোকার প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে ইহা মাদকদ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প অপকারী। কিন্তু কেহ কেহ ইহাও বলেন যে ইহাতে অভ্যস্ত হইলে বা অত্যধিক ব্যবহার করিলে ইহা অন্যান্য

মাদকের মতই প্রলাপ, চিত্তভ্রম ও অবশেষে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয় ঘটাইয়া থাকে।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোকার পাতার উত্তেজক পদার্থ কোকেন নামে আবিষ্কৃত হয়। ইহা শ্বেতবর্ণের দানাদার গুঁড়া, গন্ধহীন ও ঈষৎ তিক্তস্বাদ। ১৮৬০ সালে ইহার শরীর অসাড় করিবার ক্ষমতা পরিজ্ঞাত থাকিলেও ১৮৮৪ সালে প্রথম ইহা শরীর অসাড় করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ভিয়েনার ডাক্তার সি কোলার ইহা প্রথম ব্যবহার করেন। ১৮৮৪ সালে তিনিই প্রচার করেন যে কোকেন প্রয়োগে স্থানিক অসাড়তা উৎপন্ন হয়, এজন্য অস্ত্র-চিকিৎসায়, বিশেষতঃ চক্ষু অস্ত্র করিতে, ইহা বড় সুন্দর সাহায্যকারী হইতে পারে। তদবধি ইহা চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসকদিগের আদরের সামগ্রী হইয়া চিকিৎসকসমাজে সমাদৃত হইতেছে।

অন্যান্য গুণের মধ্যে আবিষ্কৃত হয় যে কোকেন খাইলে স্নায়ু সকলের আরাম, ইন্দ্রিয় সকলের উত্তেজনা এবং এক রকম নেশা উৎপন্ন হইয়া আনন্দকর মানসবিভ্রম উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ এই মাদকপ্রভাব শরীরে থাকে ততক্ষণ সেই আনন্দানুভূতি বোধ হয়, প্রভাব কমিয়া গেলেই আর এক মাত্রা সেবন করিয়া কৃত্রিম আনন্দানুভূতি প্রবাহিত রাখিবার অদম্য লালসা হয়। বয়স্ক পুরুষ জীবনসংগ্রামের ক্লান্তি অবসাদ দূর করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করে, বালকেরা জ্ঞান চর্চ্চার সুবিধার জন্য ইহার উত্তেজনা আকাঙ্ক্ষা করে, সুন্দরী ধনিকরমণীগণ বিলাসবিভব লীলাঠাটে ক্লান্ত হইয়া অবসাদ গোপন করিবার জন্য কোকেনের সেবা করে। কবির কথায় ইহার অভ্যাসের ফল হয়—

"একবার পানে আরো পিয়াসা,
দুবারে জড়তা বচনে,
তিনবারে তনু আর ত' বহে না,
মূরছে মুদিয়ে নয়নে!"

হায়, যাহারা দুর্ব্বলমনা তাহাদের কিছুতে চৈতন্য হয় না, অলীক আনন্দের সন্ধানে কোকেনের দাস হইয়া পড়ে।

কোকেন-অভ্যাস আমেরিকায় বহু বিস্তৃত। সমাজের দুই প্রান্ত ধনী ও দরিদ্র—ইহা দ্বারা বিষম আক্রান্ত। প্রতি বৎসর ইহার আমদানি বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা 'দিব্যদৃষ্টি' বা 'দীপ্তচক্ষু' নামে ধনীদিগের নিকট সমাদৃত হয়। কাফ্রি-গণ ইহার নস্য তৈয়ারি করিয়া ব্যবহার করে। কোকেন চিনির সহিত মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া নস্য হয়। কোকেন খাওয়া বা সূচীপিচকারী দ্বারা ত্বকের নীচে নিষিক্ত করা অপেক্ষা নস্য টানিলে শীঘ্র মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছে। এই অভ্যাসের ফলস্বরূপ বাতুলালয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে এবং সে দেশের আদিম অধিবাসী একেবারে ধ্বংসলুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইয়াছে। ১৯০২-০৩ সালের মধ্যে চারিটি কোকেন ব্যবহার নিষেধক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে; ইহাতে কিছু উপকার দেখা যাইতেছে। সেই আইনে ডাক্তারের ব্যবস্থা ব্যতীত কোকেন বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে; ডাক্তারের অনুমতি ব্যতীত এক ব্যবস্থার পুনর্গ্রহণ বারণ হইয়াছে; এবং ডাক্তারেরা অভ্যাস্তদিগকে কোকেনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না বিধি হইয়াছে।

ইংলণ্ডে এই অভ্যাস অজ্ঞাত নহে। কোকেনখোর সেখানে সহজে কোকেন পায় না; ডাক্তারের ব্যবস্থা লইয়া একাধিক ডাক্তারখানা হইতে ব্যবস্থা দেখাইয়া কোকেন সংগ্রহ করিয়া মৌতাত চালাইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ইহা বিষ-শ্রেণীভুক্ত; এজন্য যাহাকে তাহাকে শীঘ্র বিক্রয় করা হয় না।

বিংশ শতাব্দীর উগ্র সভ্যতার ধন্ধে পড়িয়া ভারতেও কোকেন অধিকার বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতা বোম্বাই ত ইহার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা আফিং গাঁজার সেবক প্রায় তাহারাই কোকেন-ভক্ত দেখা যায়। কোকেনখোরেরা স্বীকার করে যে ইহার এমনি উৎকট মোহিনী যে একবার খাইলেই ইহার অভ্যাস ছাড়া দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই মূল্যবান পদার্থ চিকিৎসকের শিশির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; ইহার মাদকত্ব সকলে কেমন করিয়া জানিল, এবং কেমন করিয়া নিরন্ন ভারতে এই ব্যয়সাধ্য নেশা এমন প্রসার প্রাপ্ত হইল। জনশ্রুতি যে এই আমিরি নেশা ভাগলপুর হইতে কলিকাতায় সংক্রমিত হয়। ভাগলপুর জেলাটা নাকি একেবারে কোকেনখোরের আড্ডা। আমি (বর্ত্তমান লেখক) জানি, ভাগলপুরের নিকটস্থ কোন প্রসিদ্ধ জমিদার দুনিয়ার সকল রকম নেশা করিয়া এমন পাকা নেশাখোর হইয়া উঠিয়াছিলেন যে নেশা তাঁহার নিকট হার মানিয়া লজ্জা পাইয়াছিল। অবশেষে নেশার সেরা কোকেনসেবা করিয়া তিনি

কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করেন। তাঁহা হইতেই হয় ত দেশের এই পরম অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে।

কলিকাতায় কয়েকজন মাড়োয়ারী ও মুসলমান ব্যবসায়ী কোকেন পাইকারী বিক্রয় করে। এক ড্রাম শিশির মূল্য ২৷৷০ টাকা। খুচরা বিক্রয় ছোট ছোট দোকানে ও পান-ওয়ালাদের দ্বারা হয়। (অনেকে পানের সঙ্গে কোকেন খায় জানি)। ২৷৷০ টাকার এক শিশি কোকেন খুচরা বিক্রয় করিয়া ৩৲ টাকা পাওয়া যায়। কোকেনের খরিদার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এ রোগ শনৈঃ শনৈঃ প্রসৃত হইতেছে। কলিকাতার মায়ে মারা বাপে খেদান রাস্তার ছেলেগুলো পয়সার অভাবে ছিঁচকে চুরি করিয়া মৌতাত সংগ্রহ করে। ১৯০১ সালে আলিপুরের প্রধান জেলখানায় ২০০ বালক অপরাধীর মধ্যে ৩৭ জন কোকেনখোর ছিল।

কোকেন ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গের আবকারী বিভাগের রিপোর্ট হইতে কোকেনের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বিপুল আমদানি জানা যায়। লুকাইয়া কোকেন বিক্রয়ের অপরাধে ১৯০২—০৩ সালে ৬৯ জন, ১৯০৩—০৪ সালে ১৯০, ১৯০৪—০৫ সালে ১৯৮ ও ১৯০৫—০৬ সালে ২১৪ জন শাস্তি পাইয়াছে। গত বৎসর ২১৪ জনের মধ্যে কলিকাতায় ১৮৮, ২৪ পরগণা ৮, হুগলি ৭, মুঙ্গের ও ভাগলপুরে ৪ জন করিয়া ৮ জন, পূর্ণিয়াতে ২ জন। গত বৎসর ডিটেক্‌টিভ বিভাগ ইংলণ্ড হইতে অন্যায় আমদানি দুই টিন কোকেন ধরিয়াছিল, সেই টিনের উপর লেবেল আঁটা লেখা ছিল 'ছাপান গান'। এইরূপ কত ছদ্মবেশে যে কোকেন ভারতে আসিতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? সেই ছদ্ম কোকেনের আমদানিকারের হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছিল এবং উপযুক্তই হইয়াছিল।

ফরাশী চন্দননগর, মোরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে গোপনে কলিকাতায় কোকেন চালান হয়। গত বৎসর যুক্তপ্রদেশে কোকেন আবকারী মাশুলের অধীন ছিল না; এজন্য এক আউন্স কোকেন যুক্তপ্রদেশে ৫০৲ টাকায় পাওয়া যাইত, কলিকাতায় সেই এক আউন্সের মূল্য ৯০৲ টাকা। গোপন আমদানিতে কলিকাতার ব্যবসায়ীরা প্রভূত লাভবান হইত। গত বৎসর একজন হিন্দুস্থানী পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক কলিকাতায় যায়; তাহাদের বিছানার মোট অসম্ভব ভারি বোধ হওয়ায় অনুসন্ধান দ্বারা তাহাদের বালিশের তুলার ভিতর হইতে কয়েক শিশি কোকেন বাহির হয়। খুচরা বিক্রয়ের জন্য ৬০ গ্রেণের অধিক রাখিবার নিয়ম নাই। খুচরা বিক্রেতারা পুরিয়া বাঁধিয়া কোকেন বিক্রয় করে; তাহাদিগের চুরি বিক্রয় ধরা দুষ্কর। কোকেনের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় খুচরা বিক্রেতারা কোকেনের সঙ্গে সোডা বা তদ্বিধ সাদা গুঁড়া মিশাইয়া পুরিয়া বাঁধিয়া বিক্রয় করে।

এই অভ্যাস কলিকাতার গণ্ডি পার হইয়া কলের মজুরদের মধ্যে বাহিরেও প্রসৃত হইতেছে। বর্দ্ধমানের সেকরারা রাত্রি জাগিয়া গহনা গড়িবার জন্য কোকেন ধরিয়াছে। মজঃফরপুরে ধনী ও মাতব্বর লোকের মধ্যে এ অভ্যাস অধিক দেখা যায়। সারণ ও মুঙ্গেরে অসৎ স্থানে পাপ উদ্দেশ্যে ইহার মাদকতার সহায়তা গ্রহণ করা হয়। ভাগলপুরে কোকেন স্কুলের বালকদিগকে উৎসন্ন দিতেছে। কোকেনের ব্যবসায় রোধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

বোম্বাই সহরে নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে কোকেন আক্রমণ করিয়াছে। ১৯০০ সালে বাংলা হইতে এই কুঅভ্যাস বোম্বাই সহরে প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি। ১৯০২ সালে প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোকেন বোম্বাই সহরে বিক্রয় হইয়াছিল। পাতার পুরিয়ায় পান-সুপারীর দোকানে প্রকাশ্যভাবে ইহা বিক্রয় হয়। ১৯০২ সালে প্রশ্ন উঠে যে ইহা মাদকশ্রেণীভুক্ত হইবে কি না। যে ম্যাজিষ্ট্রেট মহাপ্রভু বিচার করেন তাঁহার অপার বুদ্ধিতে স্থির হয় যে কোকেন মাদক নহে, কারণ ইহা ত পানীয় নহে। এই অদ্ভুত নৈয়ায়িকের বিচার হাইকোর্টে আপীল হওয়ায় রহিত হইয়া কোকেন মাদক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাহার বিক্রয় অনুমতিসাপেক্ষ করা হয়।

গত বৎসর দিল্লীতে ইহার খুব প্রচার হইয়াছে। ইহার আকর্ষণ হিন্দুমুসলমান, বালকবৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষ কাহাকেই বাদ দেয় নাই। প্রত্যহ হাজার শিশি বিক্রয় হইয়াছে এবং ধনীগৃহের দুলালগণ প্রত্যহ ৪।৬ শিশি উজাড় করিতে পটু। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ইহার বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে আফিমের প্রচলন বর্দ্ধিত হইতেছিল বলিয়া অহিফেন বিক্রয়ে কড়াকড়ি করা হয়। তখন রেঙ্গুনের বর্ম্মিজ ও চীনা আফিংখোরেরা আফিংসার ও কোকেনের শরণাগত হয়। কোকেনের বিক্রয়ে কড়াকড়ি হওয়ায় গোপন বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। গোপনবিক্রেতাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

কোকেনের সর্ব্বনাশী গ্রাস হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে ব্যক্তিগত ও সমবেত চেষ্টার আবশ্যক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা চেষ্টিত হইয়াছেন। ইহা এক্ষণে গাঁজা, ভাং, আফিং প্রভৃতির মত অনুমতি প্রাপ্ত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহ বিক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হয়। ১৯০২ সালে আরো ব্যবস্থা হইয়াছে যে প্রকৃত চিকিৎসা উপলক্ষ ভিন্ন অন্য কোন কারণে কোকেন বিক্রয় হইতে পারিবে না। এইজন্য বিশিষ্ট ঔষধ-বিক্রেতা ভিন্ন আর কাহাকেও কোকেন বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় না। খুচরা বিক্রেতারা ৬০ গ্রেণের অধিক এককালে রাখিতে পারিবে না।

যে পদার্থ সেবনে স্বাস্থ্যহানি এবং দুর্ব্বল লোকের প্রাণ-হানি হইতে পারে তাহার প্রসার নিবারণ জন্য সকল ভারত-হিতেচ্ছু মহাশয়ের কর্ত্তব্য। সময়ের একটি সাবধান-বাণী অনেককে রসাতলের পিচ্ছিলপথে রক্ষা করিয়া নিরাপদ করিতে সক্ষম হয়।

পুরাতন মালদহ।

যেখানে কালিন্দীস্রোত আসিয়া মহানন্দাস্রোতের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার অনতিদূরে—অপর তীরে—মালদহ। তাহা এখন "পুরাতন মালদহ" নামে পরিচিত। ইংরেজাবাদ মালদহ নামে পরিচিত হইবার পর, তাহার সহিত পার্থক্য-সূচনার জন্য এই নাম প্রচলিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজাবাদ আধুনিক নগর, মালদহ পুরাতন স্থান। তথায় প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন্ সময়ে এই পুরাতন নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার তথ্যাবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। সকল স্থানই কাল-ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি মালদহের অনতিদূর-বর্ত্তী সুবৃহৎ সরোবরাদি দর্শন করিলে, ইহাকে পুরাকালের সম্পন্ন নগর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।* প্রাকৃতিক সংস্থান এরূপ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অনুকূল। উভয় স্রোতস্বতীর সম্মিলন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই পুরাতন নগর এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রবেশদ্বার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এখনও মালদহ হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত একটি পুরাতন রাজপথের চিহ্ন নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটরা।

মালদহ নগরপ্রাচীর ও নগরতোরণে সুরক্ষিত ছিল। প্রাচীর নাই; তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে একালের লোকে "কাটরা" বলিয়া অভিহিত করিয়া-ছেন। "কাটরা" কত পুরাতন, অধিবাসিগণ তাহার কোনও সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন না। গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাকে নগরতোরণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। মধ্যস্থলে রাজপথ, তাহার উপর খিলানযুক্ত নগরতোরণ,—সুদৃঢ় প্রস্তরগঠিত বলিয়া এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ইহার পার্শ্বে এবং শিখরদেশে প্রহরী-মন্দির বর্ত্তমান ছিল। শিখরদেশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ভূগর্ভে প্রহরীমন্দির প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে, লতাগুল্মে ভগ্নাবশেষ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নগরের দক্ষিণাংশে আর একটি নগরতোরণের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় তোরণের রচনাপ্রণালীর তুলনা করিলে, দক্ষিণ-তোরণকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিতে হয়। প্রাচীন তোরণ পরবর্ত্তীযুগে "কাটরা" রূপে ব্যবহৃত হইত। বণি-কেরা তথায় বিবিধ পণ্যদ্রব্য সঞ্চিত করিয়া, তথা হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে লিপ্ত হইত। তৎসূত্রে এই নগরতোরণটি "কাটরা" নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। রাভেন্‌শা ইহাকে দুর্গদ্বার বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।† মালদহের ইতিহাসলেখক ইলাহিবক্স স্বপ্রণীত "খুরশেদ

---

* মালদহের অনতিদূরে উত্তর দক্ষিণ লম্বা অনেক সুবৃহৎ সরোবর হিন্দুকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

† "The Katrah or Fort Gate stands near the river, and leads to a strong enclosure, which appears, of late years, to have been used as a Sarai or resting place for travellers. It is said to have answered formerly as a place of safety for valuable merchandise landed at old Maldah, and intended for transmission to the Court at Panduah,' p. 42.

জাঁহা" নামক হস্তলিখিত পারস্যভাষানিবদ্ধ সুবৃহৎ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"হিজরী ৭৫৪ সালে (১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ গৌড়াধিপতি সামসুদ্দীন ইলিয়াসকে বশীভূত করিবার আশায় মালদহে সেনাসমাবেশ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবরোধ করিয়াছিলেন। তৎকালে নগরতোরণ সম্রাটের "সরাই" রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।" ফিরোজশাহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবরোধ করিবার কথা ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। তিনি মালদহে সেনাসমাবেশ করিবার কথা ইলাহিবক্সের পূর্ব্বেও লোকসমাজে সুপরিচিত ছিল। রিয়াজ-রচয়িতা গোলাম হোসেন সলেমী তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।* মালদহের একটি পল্লী এখনও "ফিরোজপুর" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে "কাটরাকে" দুর্গদ্বার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। তাহা এখন প্রশান্ত ভাবে ধ্বংসকালের প্রতীক্ষায় নীরবে দিন গণনা করিতেছে। পুরাকালে কত কলহ কোলাহল তাহাকে নিয়ত মুখরিত করিত, কত জয় পরাজয় তাহাকে রুধিরাক্ত করিত, কত বীর প্রতাপ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িত;—সে কাহিনী এখন জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর এই প্রদেশ দীর্ঘকাল মুসলমানের রাজধানীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তজ্জন্য বৌদ্ধ এবং হিন্দু যুগের পুরাতন নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।† এক সময়ে এই নগর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই বাদশাহ আরঙ্গজেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহার অদূরবর্ত্তী ইংরাজবাজার নামক স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। মালদহের প্রধান রাজপথের উভয়পার্শ্বে যে সকল অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে, তাহার কক্ষগুলি এরূপ ক্ষুদ্রায়তন যে তাহার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, ইহাতেই তৎকালের সমৃদ্ধির পরিচয় সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে।

নিমাসরাই।

মালদহের অনতিদূরে, মহানন্দার অপর তীরে, নিমাসরাই নামক একটি পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা আজ কাল মালদহের প্রসিদ্ধ আম্রের প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সেকালে এখানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রহরীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার শিখর দেশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যাহা আছে, তাহাতেই পর্য্যটকগণ তাহার প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। এই প্রহরীমন্দিরের বহির্ভাগে বহুসংখ্যক প্রস্তরকীলক সংযুক্ত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ তাহার প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পারেন না। দেখিলে মনে হয়,—মন্দির রচনা করিবার সময়ে এই সকল কীলক অবলম্বন করিয়া শ্রমজীবিগণ ইহাতে আরোহণ-অবরোহণ করিত, কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। রচনা কার্য্য শেষ হইবার পরেও এই সকল কীলক দূরীকৃত হয় নাই কেন? ইহাতেই বোধ হয়,—কীলকগুলি অবশ্যই অন্য কোনও প্রয়োজন সাধনের জন্য সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। সে প্রয়োজন কি? শত্রু সেনার আগমন সংবাদ প্রচারিত করিবার জন্য তাহাতে মশাল বাঁধিয়া দেওয়া হইত,—এইরূপ একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। প্রকৃত প্রয়োজন যাহাই হউক, তাহা যে প্রহরীমন্দিরের কার্য্য সাধনের জন্যই এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয় না। মহানন্দার উভয়তীরে এইরূপ দুইটি প্রহরীমন্দির দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, এক সময়ে এই স্থান সবিশেষ সুরক্ষিত ছিল। বিপ্লবযুগে প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানেও নগরপ্রাচীর এবং নগরতোরণ নির্ম্মিত হইত। ভারতবর্ষে সেরূপ সুরক্ষিত বাণিজ্যস্থানের অনেক নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। রাভেন্‌শা পুরাতন মালদহের সকল ধ্বংসাবশেষের পরিচয় প্রদান করেন নাই। এই স্থানে আরও অনেক ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। কতকগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

* Sultan Firuz Shah in the year 754 H set out for Lakhnauti, and after forced marches, reached close to the city of Pandua, which was then the metropolis of Bengal. The Emperor encamped at a place which is still called. "Firuzabad."—Riaz, p. 100.

† কোন কোন মুসলমান মসজেদে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির হইতে অপহৃত প্রস্তরাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন বিলুপ্ত হইয়াছে কেন, ইহাতেই তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

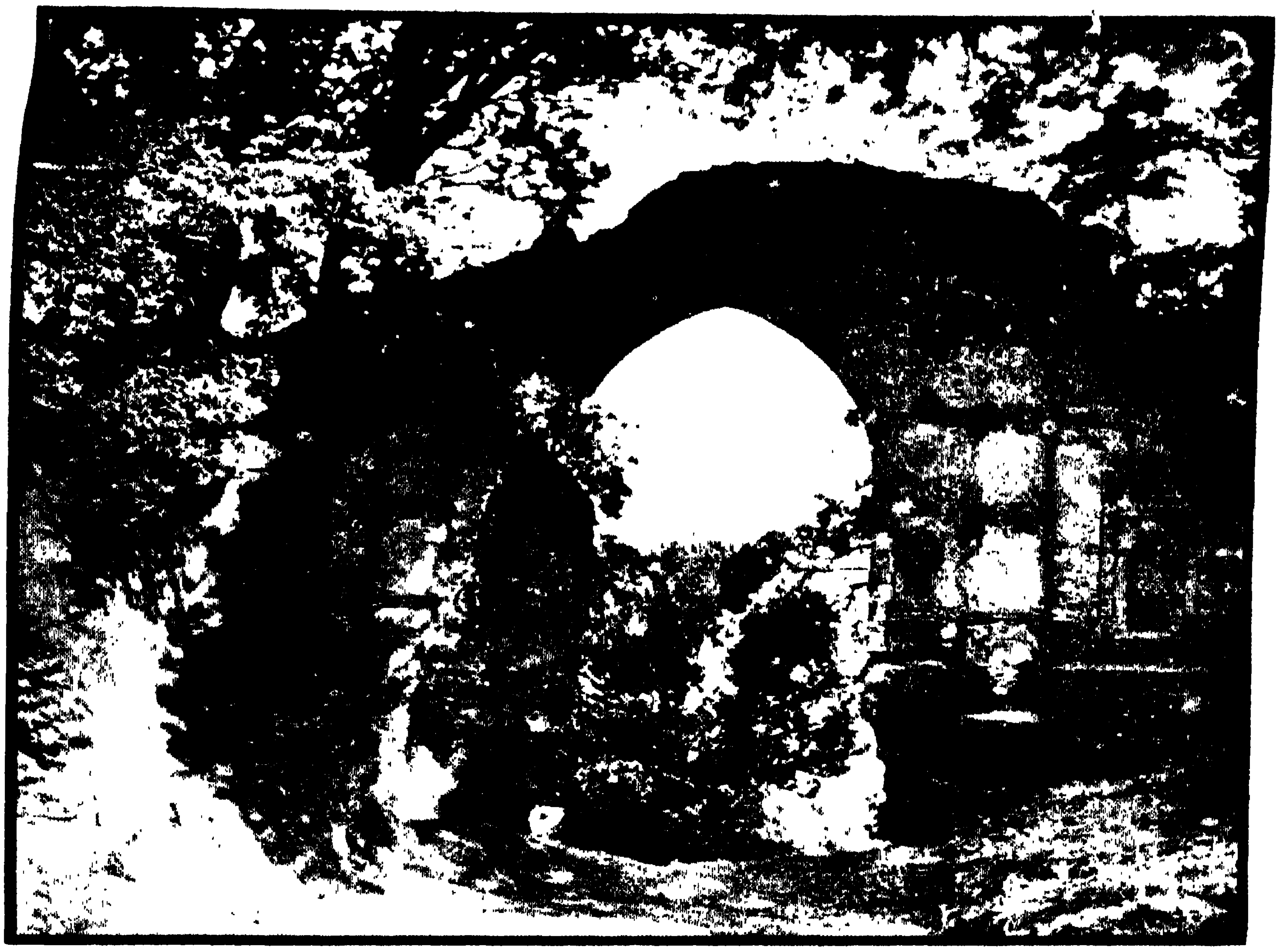

পুরাতন মালদহ। কাটরা।

পুরাতন মালদহ। দক্ষিণ নগরদ্বার

৺ সৰ্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

সোনা মস্‌জেদ।

তন্মধ্যে "সোনা মস্‌জেদ" একটি উল্লেখযোগ্য পুরাতন কীর্ত্তি। সেকালে এই প্রদেশে "সোনা মস্‌জেদের" ছড়াছড়ি হইয়াছিল। গৌড়ে "সোনা মস্‌জেদ" আছে;—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেও "সোনা মস্‌জেদ" আছে;—মালদহে না থাকিবে কেন? মালদহের লোকে মালদহের "সোনা মস্‌জেদ" বলিয়া যাহার নামকরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কিন্তু প্রসিদ্ধ "সোনা মস্‌জেদের" সমকক্ষ নহে। তাহা একটি সাধারণ সমাধি-মন্দির। প্রস্তরফলকে দেখিতে পাওয়া যায়,—হিজরী ৯৭৪ সালে (১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে) মাসুম নামক কোনও ব্যক্তি এই মস্‌জেদ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। মাসুম একজন বণিক্ বলিয়া রাভেন্‌শার গ্রন্থে উল্লিখিত। ইলাহিবক্সও "মাসুম সওদাগর" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই মস্‌জেদটি নগরের যে অংশে অবস্থিত, তাহা "মোগলটোলা" নামেও কথিত হইয়া থাকে। গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত সম্পন্ন জনপদ মোগলশাসনের অধীন হইয়াও প্রতিষ্ঠা রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল। মোগলশাসন সময়ে সওদাগরদিগের পক্ষেও এরূপ একটি সমাধিমন্দির রচনা করিবার সামর্থ ছিল। ইহার সাক্ষীরূপে মাসুম সওদাগরের সমাধিমন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। ইংরাজশাসন সময়ে তাহার জীর্ণসংস্কার সাধিত করাইবার উপযুক্ত মুসলমান সওদাগর মালদহ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালের করাল কবলে সকল পুরাকীর্ত্তিই দিন দিন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে!

সরবরী।

মালদহের একাংশের নাম "সরবরী"। তাহাকে কেহ কেহ সুসংস্কৃত করিয়া "শর্ব্বরী"রূপেও লিখিয়া থাকেন। এই নামের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব ছিল, তাহা এই অসঙ্গত সংস্কারস্পৃহায় ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। 'সরবরীর' প্রকৃত নাম কি ছিল, এবং তাহার সহিত কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব ছিল, ইলাহিবক্স তাহার পরিচয়-দানের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—"পুরাতন মালদহের এই মহল্লার প্রকৃত নাম "শির-বরী"। মুসলমান সাধুপুরুষ নূর কুতবের পুত্র হজরত আনওয়ার সাহেব গৌড়াধিপতি গণেশের আদেশে সুবর্ণগ্রামে নিহত হইলে, তাঁহার দেহ-বিচ্যুত মস্তক এই স্থানে সমাধিনিহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য ইহা একটি তীর্থ মধ্যে পরিগণিত।" কাটরার উত্তরে, রাজপথের পশ্চিমপার্শ্বে, অদ্যাপি এই "তীর্থস্থান" দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহের লোকে ইহাকে "মালদহের পীরের আস্তানা" বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—"এই পীরের নামানুসারেই মালদহের নাম মালদহ হইয়াছে।" ইতিহাসবিমুখ বাঙ্গালীর নিকট মুখে মুখে কত অলৌকিক কাহিনী ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ থাকে না।

চারিদিকে পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ,—তাহার কেন্দ্রস্থলে মালদহ অবস্থিত। সুতরাং পুরাতন ইষ্টক প্রস্তর সংগ্রহের পক্ষে মালদহ বিলক্ষণ সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কেবল ইষ্টক প্রস্তর কেন, মালদহের লোকে পুরাতন ফলকলিপি সংগৃহীত করিতেও ত্রুটি করে নাই। এইরূপে এই নগরে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক মস্‌জেদে পুরাতন ফলকলিপি সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে পর্য্যটকগণ নানা ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন। অনেকে এই সকল প্রাচীন ফলক-লিপি পাঠ করিয়া, আধুনিক মন্দিরকেও প্রাচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ভ্রমপ্রমাদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

শাঁক মোহন।

পুরাতন মালদহের "শাঁক মোহন" নামক মহল্লায় ইহার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে সেখ ফকির মহম্মদ ও তাঁহার পুত্র সেখ ভিখা যে মস্‌জেদ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ একটি পুরাতন ফলকলিপি সংযুক্ত আছে। এই ফলকলিপির পাঠোদ্ধারে নানা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। জেনারল কানিংহাম ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; সোসাইটির পত্রিকাতেও ইহার আলোচনা মুদ্রিত হইয়াছে; ওয়েষ্টমেকট সাহেব তাহার রহস্যোদ্ঘাটনের জন্য যখন ফলকলিপির পাঠোদ্ধারে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহা অস্পষ্ট বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইলাহিবক্সের গ্রন্থে এই ফলকলিপির একটি অবিকল প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—"গৌড়াধিপতি বার্ব্বক শাহের পুত্র ইউসফ শাহের প্রতিষ্ঠিত হিজরী ৮৭৬

সালের কোনও পুরাতন মস্‌জেদ হইতে এই ফলকলিপি সংগৃহীত হইয়া ফকির মহম্মদের মস্‌জেদে সংযুক্ত হইয়াছিল।” তোগরা অক্ষরে খোদিত ফলকলিপি সকলে পাঠ করিতে পারে না; অনেক লিপির প্রথমেই কোরাণোক্ত “সুরা” উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে লোকে ফলকলিপিকে পবিত্র শ্লোক মনে করিয়া পূজা করিত;—পরবর্ত্তীকালে মস্‌জেদ রচনা করিতে গিয়া, তাহার পবিত্রতা-বৃদ্ধির আশায়, তাহাতে পুরাতন ফলকলিপি সংযুক্ত করিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিত না। মালদহের এক মুসলমান কৃষক ধর্ম্মপালের একখানি তাম্রশাসনকে এইরূপে পূজা করিত। সে জীবিত থাকিতে তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত হয় নাই। তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে মালদহের কালেক্‌টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন দেখা গিয়াছিল,—মুসলমান কৃষক কত সন্তর্পণে সিন্দূর লেপন করিয়া ফলকলিপির অক্ষরগুলি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল! এই প্রবৃত্তি কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও, ইহার কল্যাণে অনেক পুরাতন লিপি অদ্যাপি সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। শাঁক মোহনের ফলক লিপি এইরূপে আবিষ্কৃত হইবার পর একটি নূতন ঐতিহাসিক গবেষণার সূত্রপাত হয়। সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—হিজরী ৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত বার্ব্বক শাহ গৌড়েশ্বর ছিলেন। হিজরী ৮৭৬ সালে তাঁহার পুত্রের ফলকলিপি কিরূপে বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে? ইলাহিবক্স এই সংশয়ের অবতারণা করিয়া তাহার কোন সদুত্তর প্রদান করেন নাই। অধ্যাপক ব্লকম্যান নানা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, এই ফলকলিপির সহিত প্রচলিত ইতিহাসের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে অসামঞ্জস্যের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল কেন, তাহাই বরং নিরতিশয় কৌতূহলের ব্যাপার। গৌড়ের অন্যান্য ফলকলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—যেখানে তাহা বাদশাহ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, সেখানে সে কথা স্পষ্টাক্ষরেই উল্লিখিত আছে। এই ফলকলিপিতে বার্ব্বক শাহ বাদশাহ বলিয়া উল্লিখিত; তাঁহার পুত্র কেবল বাদশাহের পুত্র বলিয়াই উল্লিখিত। সুতরাং এই ফলকলিপি খোদিত হইবার সময়ে বার্ব্বক শাহই বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার পুত্র একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া, আপন পরিচয় বিজ্ঞাপনের জন্য পিতার নাম উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন; স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন না বলিয়া, আপন নামের সহিত সেরূপ উপাধির সংযোগ করিয়া যান নাই!

ফুটি মস্‌জেদ।

মালদহের আর একটি দর্শনীয় মস্‌জেদের নাম “ফুটি মস্‌জেদ।” ইহার নিকটে সমাধি আছে। মস্‌জেদটি ফাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহার এরূপ অদ্ভুত নাম প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে যে ফলক-লিপি সংযুক্ত আছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—খান মওয়াজ্জাম নামক এক ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা। এই মস্‌জেদ ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অধ্যাপক ব্লকম্যান সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ইলাহিবক্স ইহার যেরূপ পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত অধ্যাপক ব্লকম্যানের উদ্ধৃত পাঠের কিছু কিছু ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মস্‌জেদটি এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পুরাকালে কোন মহল্লায় কিরূপ লোকের বসতি ছিল, এই সকল পুরাকীর্ত্তি দেখিয়া তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারা যায়। সেকালের বৃহৎ নগর একালে ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পুরাতন মস্‌জেদ ধরিয়া সীমা নির্ণয় করিতে গেলে, পুরাতন মালদহকে একটি বৃহৎ নগর বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হয়। অন্যান্য বৃহৎ রাজনগরের ন্যায় পুরাতন মালদহেরও নগরোপকণ্ঠ বর্ত্তমান ছিল। এখন তাহা জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কৃষকগণ যেখানে হলকর্ষণ করিতেছে, সেখানে হয়ত রাজপ্রসাদ বর্ত্তমান ছিল। যেখানে একদিন দিল্লীশ্বর শিবির সন্নিবেশ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবরোধ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানে হয়ত এক দরিদ্র কৃষক কুটীর প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়া নিত্য দুর্ভিক্ষের কঠোর পীড়নে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কপালে করাঘাত করিতেছে!

অভ্যন্তরের অবস্থা যেরূপ হউক না কেন, নদীবক্ষ হইতে পুরাতন মালদহের দৃশ্য এখনও বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। যেন একখানি চিত্রপট সুবিন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে! নদীতীরের সোপানাবলী ও দেবমন্দির তাহার শোভা আরও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। এই নগর অল্পকাল পূর্ব্বেও শিল্প বাণি-

জ্যের জন্য ভুবনবিখ্যাত ছিল। সে শিল্প দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইয়া গেল, সে বাণিজ্য এখন কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল! এই সকল কারণে পুরাতন মালদহে পদার্পণ করিলেই হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও যাহা দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! এখন এখানে ম্যালেরিয়া—অন্নাভাব—অশিক্ষিত মুসলমানগণের অসঙ্গত আস্ফালন—দুর্দ্দশার দুরতিক্রমণীয় দুঃস্বপ্নের মত নিরন্তর লোকচিত্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে!

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন।

পুরাতন মালদহ হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত যে রাজপথ প্রচলিত আছে, তাহা একটি পুরাতন রাজপথ। সম্প্রতি তাহার পুরাতন চিহ্নাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও স্থানে স্থানে পুরাতন ইষ্টকের আচ্ছাদন ও পথ-পার্শ্বস্থ ইষ্টকরচিত পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যাইত। এই পথ বাঙ্গালীর একটি চিরপরিচিত পুণ্যপথ বলিয়া কথিত হইতে পারে। এই পথে যুগযুগান্তর হইতে কত বিজয় যাত্রা বহির্গত হইত। এখন ইহা জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে অগৌরবে কালযাপন করিতেছে। উভয় পার্শ্বে, নিকটে এবং দূরে, যে সকল অতীতসাক্ষী সরোবর পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহাই এখন হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসন সময়ের একমাত্র পরিচয়-স্থল। এক সময়ে এই সকল পুরাতন সরোবরতীরে বহু-সংখ্যক মন্দির, বিহার, চৈত্য, সংঘারাম বর্ত্তমান ছিল। পরবর্ত্তী যুগের বিজেতৃগণ তাহা হইতে উপাদান সংগৃহীত করিয়া, প্রাসাদ প্রাচীর উপাসনালয় ও সমাধিমন্দির রচনা করায়, এখন যাহা আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক আকারে প্রতিভাত হইতেছে। তথাপি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এখনও এই সকল দৃশ্যমান অট্টালিকার ইষ্টক প্রস্তরের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের অনেক অভ্রান্ত স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এই বিশেষত্ব তাহাকে অনুসন্ধাননিপুণ পর্য্যটকগণের নিকট সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্মৃতিচিহ্ন সহজেই দৃষ্টিপথে পতিত হইত। ক্রমে সে সকল স্থানান্তরিত হইয়াছে। যে পারিয়াছে, সে অপহরণ করিতে ত্রুটি করে নাই। কতকগুলি কলিকাতায় পুঞ্জীকৃত হইয়াছে; কতকগুলি এখনও ইংরেজ-বাজারে সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে; কতকগুলি কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না! এই প্রদেশে যে বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহার কথা হিয়াঙ্গথ্-সাঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে এবং "রাজতরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। তাহা সহসা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া লোকলোচনের অন্তর্হিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। পরবর্ত্তীযুগে তাহার ইষ্টক প্রস্তর অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হইলে, অদ্যাপি অনেক নিদর্শন স্বস্থানে আত্মরক্ষা করিতে পারিত।*

পুরাকালের পৌণ্ড্রবদ্ধন নদীতীরেই অবস্থিত ছিল। এখন যাহা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত, তাহা নদীতীর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। কিন্তু নদী যে পুরাকাল হইতে এক স্থানেই প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। সচরাচর মহানন্দাতীরস্থ "বালিয়া নবাবগঞ্জ" নামক স্থান হইতে পর্য্যটকগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যাত্রা করিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ৫ মাইলের অধিক নহে। এখানে যে রাজপথ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক। তাহার পার্শ্বে পুরাতন নদীখাতের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন যাহা আছে, তাহা নগরতোরণ, সমাধিমন্দির, অথবা উপাসনালয়। তাহা একস্থানে প্রতিষ্ঠিত নহে। জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে, এখানে সেখানে, নানা স্থানে, দূরে দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী ছিল, তখন তাহার আয়তন অধিক ছিল। এখন সে পুরাতন রাজধানীর সীমানির্দ্দেশের সম্ভাবনা নাই।

মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার পর দিল্লীশ্বরের পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন অবরোধ করিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। সে অবরোধবিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর প্রাচীরে এবং রাজদুর্গে সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু দুর্গ বা দুর্গপ্রাচীরের কোন চিহ্ন বা পুরাতন পরিখা

* Its remains afford stronger evidence than do those of Gour, of its having been constructed mainly from the materials of Hindu buildings.—Ravenshaw's Gour, p. 44.

দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল স্থানই সমতল, কেবল পুরাতন অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষে কোন কোন স্থান ঈষৎ উচ্চভূমি বলিয়া প্রতিভাত হয়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এরূপ নিবিড় বনে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে পর্য্যটকগণ পদার্পণ করিতে পারিতেন না। রাভেন্‌শা যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাকীর্ত্তির চিত্র সংগ্রহের জন্য ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দুই শত কাঠুরিয়া লইয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও গজারোহণ ব্যতীত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিদর্শনের অন্য উপায় ছিল না। এক্ষণে সাঁওতালদিগের অধ্যবসায়ে বনস্থল পরিষ্কৃত হইতেছে, পর্য্যটকগণের আশ্রয়লাভের জন্য একটি ডাকবাংলাও নির্ম্মিত হইয়াছে। নিকট দিয়া নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে বলিয়া অনেক স্থান পরিষ্কৃত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে।

রাভন্‌শা লিখিয়া গিয়াছেন,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তিনক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ প্রস্থ ছিল। ইহা অবশ্যই অনুমান মাত্র। বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদির অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই রাভেনশা এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিকাংশ সরোবর উত্তর দক্ষিণ লম্বা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—তাহা হিন্দু শাসন সময়ের পুরাতন সরোবর। সরোবরগুলি প্রায় সমভূমির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। তাহাতেও প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন সরোবরে এখনও পদ্মবন দেখিতে পাওয়া যায়।*

রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইলে, প্রথমে যাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা একটি তোরণদ্বার। তাহার ভিতর দিয়া "বাইশ হাজারী" নামক জায়গীরে গমন করিতে হয়। তথায় মকতুম শাহ জালালের সমাধিমন্দির বর্ত্তমান আছে। শাহ জালাল একজন সুবিখ্যাত সাধুপুরুষ। তাঁহার জীবন-কাহিনীর সহিত অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

* Like Gour, it is covered with innumerable tanks, some of great age, and nearly all of them having their greatest length from north to south, as evidence of their Hindu origin.—Ravenshaw's Gour, p. 44.

"বাইশ হাজারী" ছাড়িয়া আর একটু উত্তরাস্যে অগ্রসর হইলে, আর একটি জায়গীর। তাহার নাম "ছয় হাজারী।" তথায় নুর কুতব আলম নামক সাধু পুরুষের সমাধিমন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার জীবন কাহিনীর সহিতও অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

এই দুইজন মুসলমান সাধুপুরুষের জীবন কাহিনীর সহিত এদেশের ইতিহাসের অনেক কাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং পর্য্যটকগণ ইতিহাসজ্ঞ হইলে, এখানে উপনীত হইবামাত্র, নানা পুরাতত্ত্ব স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে।

ক্রমে উত্তরাস্যে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্যান্য ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোনা মস্‌জেদ, একলক্ষী, এবং আদিনা সর্ব্বজন-পরিচিত। আদিনার এক মাইল পূর্ব্বদিকে "সাতাইশ ঘর" নামক পুরাতন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে যে সরোবর আছে, তাহা উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ। এই স্থান দুর্গবেষ্টিত ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। প্রাসাদ এবং সরোবরের অবস্থান দেখিলে, ইহাকেই পুরাতন রাজধানীর স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

মুসলমান-শাসন সময়ে একবার এক হিন্দুরাজা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া, গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইতিহাস-বিমুখ বঙ্গদেশে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে দেশের কবিকল্পনা লক্ষ্মণসেনের কাল্পনিক পলায়নকাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিতে লালায়িত হইয়াছে, সে দেশের সাহিত্যে এই হিন্দুনরপতি অদ্যাপি কবিকুলের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথা কেবল মুসলমান-লিখিত ইতিহাসেই, নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। পারস্য ভাষার বর্ণবিন্যাস শৈথিল্যে তাঁহার নাম কখন "গণেশ" কখন বা "কংস" বলিয়া প্রচারিত হইতেছে! এই হিন্দুনরপতি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সমাধিমন্দিরও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "সাতাইশঘর" নামক যে পুরাতন প্রাসাদ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত এই হিন্দুনরপতির সংস্রব ছিল।

এই সকল কারণে গৌড় অপেক্ষা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের গৌরব কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। রাজতরঙ্গিণীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কথা আছে। তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কথা। কবি কল্‌হন তাহা যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয় শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয়ে, ও প্রভুভক্ত গৌড়ীয় সেনাদলের অলৌকিক আত্মত্যাগকাহিনীতে ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কাহিনী নানা কারণেই বাঙ্গালীর গৌরব কাহিনী। তাহা সর্ব্বাংশেই বাঙ্গালীমাত্রের অকৃত্রিম গৌরব ঘোষণা করিবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হইলে, একদিকে যেমন পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির অপলাপ সাধনের অভ্রান্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ অন্যদিকে নানা পুরাকীর্ত্তির মধ্যে বাঙ্গালীর গৌরব সংস্পর্শে হৃদয়মন পুলকিত হইয়া উঠে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অদ্যাপি পুরাতন প্রস্তর শিল্পের যে সকল নিদর্শন বনচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা পৃথিবীর যে কোনও সভ্য দেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত। সে গৌরব কাহার? যাহারা বহুদূর হইতে বহুক্লেশে প্রস্তর সংগৃহীত করিয়া, বিচিত্র দেবমন্দির রচনা করিয়া, গঠনপ্রতিভার পরিচয় প্রদানে স্বজাতির নাম ভারতবিখ্যাত করিয়াছিল, তাহারা এখন তাহার গৌরব লাভ করিতে পারিতেছে না। যাহারা নিকটে উপকরণরাশি প্রাপ্ত হইয়া, মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জেদ রচনা করিয়া গিয়াছে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এখন তাহাদেরই গৌরব ঘোষণা করিতেছে। সকল গ্রন্থে তাহাদের কথাই প্রধান কথা;—সকল পর্য্যটকের মুখে তাহাদের কথাই একমাত্র কথা। যাঁহারা বাহ্য ছাড়িয়া অভ্যন্তর দর্শন করিবার জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল হিন্দুবৌদ্ধের বিলুপ্ত গৌরবের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বলিয়াই সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। এখন এই সকল পুরাকীর্ত্তির জীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে বলিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শনগুলি আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজরাজ ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকার সর্ব্বাঙ্গে কেবল মুসলমান গঠন কৌশলই পরিস্ফুট করিয়া রাখিতেছেন!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

লেখাপড়া।

পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত জ্ঞান আয়ত্ত করিবার জন্য পড়িতে শিক্ষা করা প্রয়োজন। স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান পরিবর্ত্তী বিদ্যার্থীদিগের জন্য সঞ্চয় করিতে হইলে লিখিবার প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহের জন্যও লেখাপড়া জানিতে হয়। যদিও লেখাপড়া জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায় মাত্র, তথাপি জ্ঞানোপার্জ্জনের পক্ষে তাহা এতই প্রয়োজনীয় যে অমুক লেখাপড়া জানে বলিলে সে লোক জ্ঞানী ও বিদ্বান ইহাই বুঝায় এবং লিখিতে পড়িতে জানে না বলিলে মূর্খ বলা হয়। এই কারণে বিদ্যার্থী শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রথমে লিখিতে ও পড়িতে শিখানর রীতি সকল সভ্য দেশেই প্রচলিত আছে। এইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয় যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় সে বিষয়ে পিতামাতা ও শিক্ষকের বিশেষ চিন্তা ও মনোযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনেকে বলিবেন লেখা পড়া ত বাড়ীতে এবং পাঠশালায় শিখান হইয়া থাকে এবং বিদ্যার্থীরা বুদ্ধি ও পরিশ্রম অনুসারে শিখিয়া থাকে ইহার জন্য আবার বিশেষ চিন্তা ও মনোযোগের প্রয়োজন কি? শিশুদিগকে লেখা পড়া শিখানর রীতি যেরূপ সহজ বলিয়া আমাদের ধারণা আছে বাস্তবিক তত সহজ নহে। এই সম্বন্ধে দুই একটি প্রশ্নের অবতারণা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

য়ুরোপ ও আমেরিকাখণ্ডের পাঠশালা সমূহে পড়িতে ও লিখিতে শিখাইবার নানাপ্রকার রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সম্বন্ধে মতভেদও যথেষ্ট। কোনও রীতি একেবারে দোষশূন্য নহে। তবে যে প্রণালীতে শিশুগণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে সুচারুরূপে লেখাপড়া শিখিতে পারে সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ। যাহাতে যত অধিক পরিশ্রম ও অধিক সময় লাগে সে প্রণালী ততই নিকৃষ্ট। এবং যে প্রণালীতে পরিশ্রম করিয়া কখনই উৎকৃষ্ট রূপে লেখা পড়া শিখা যায় না সে প্রণালী সকলের নিকৃষ্ট। কোনও শিক্ষা প্রণালীর সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে শিক্ষাশাস্ত্রের দুইটি প্রধান বিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিধি দুইটি এই যে, পরিচিত বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অপরিচিত বিষয়ের এবং সরল হইতে ক্রমে

ক্রমে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দিতে হইবে। আজ কাল সকল শিক্ষাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এই দুইটি বিধি মানেন। যে প্রণালীতে যত অধিক পরিমাণে এই বিধিগুলি রক্ষিত হয় সেই প্রণালী তত উৎকৃষ্ট। আমরাও এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অস্মদ্দেশের প্রচলিত লেখাপড়া শিখানর প্রণালীর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

ইদানীং আমাদের পাঠশালা সমূহে বালকদিগকে প্রথমে বর্ণমালা চিনিতে ও উচ্চারণ করিতে শিখান হয়, তৎপরে বানান করিয়া এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখান হয়। বানান মুখস্থ করাইবার উপর অধিক আগ্রহ দেখা যায়। দুরূহ শব্দের বানান অভ্যস্ত করাইবার অভিপ্রায়ে ঐক্য, মাণিক্য, জাড্য, প্রভৃতি অনেক জটিল, দুর্ব্বোধ, বা শিশুদিগের একেবারেই অবোধ্য শব্দের বানান বার বার আবৃত্তি করান হয়। মুদ্রিত পুস্তক কতকদূর পাঠ করাইবার পর লিখিতে দেওয়া হয়। এইরূপ রীতির কতকগুলি দোষ আছে। নিম্নে তাহাদের উল্লেখ ও বিচার করা যাইতেছে।

পাঠারম্ভেই বর্ণমালা পরিচিত ও কণ্ঠস্থ করান যে অস্বাভাবিক ও দুরূহ তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কোমলমতি শিশুদিগের পক্ষে অক্ষরগুলি হিজিবিজি চিহ্ন, বর্ণমালার উচ্চারণ বাগ্‌যন্ত্রের ব্যায়াম মাত্র। উভয়ই অবোধ্য বা অর্থশূন্য, উদ্দেশ্যহীন ও প্রয়োজনহীন, সুতরাং নীরস। তাড়নায় অক্ষর পরিচয় ও আবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করিতে যে অধিক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয় তাহার আর আশ্চর্য্য কি? প্রথম হইতেই পাঠে শিশুদিগের বিতৃষ্ণা জন্মে। তাহারা যে লেখাপড়াকে তাহাদের শাসন করিবার ও কষ্ট দিবার ব্যবস্থা বলিয়া মনে করে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক বা অন্যায় নহে। ইংরাজী ভাষায় এক বর্ণের বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের এক প্রকার উচ্চারণ থাকাতে শিশুদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান অতি দুরূহ ব্যাপার। ইংরাজী বর্ণমালায় লিখন ও পঠনের বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও অনেক বিলাতী পাঠশালায় স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়—অর্থাৎ পরিচিত শব্দের লিখন ও পঠন আরম্ভ করা হয় এবং ক্রমশঃ বিশ্লেষণ দ্বারা শব্দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অক্ষর পরিচয় করান হয়। কেহ কেহ ইহাকে চীন দেশীয় প্রণালী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তথাপি অনেক পণ্ডিত ও শিক্ষক ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া স্বীকার করেন। বাঙ্গালায় বর্ণমালা সুবিন্যস্ত থাকায় শব্দ শিক্ষা আরম্ভ করিতে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কেহ হয়ত বলিবেন বাঙ্গালায় বর্ণমালা সুবিন্যস্ত থাকাতেই বর্ণমালার শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু বালকগণ লেখা পড়ায় কিছুদূর অগ্রসর না হইলে তাহাদিগকে বর্ণমালার শৃঙ্খলা ও প্রয়োজন শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত নহে। যখন শিশু কথা কহিতে শিখে, তখন যদি মা, বাবা, হাত, পা, গরু, প্রভৃতি পরিচিত পদার্থের নাম না শিখাইয়া অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ করিতে শিখান হয় ও পরে বানান করিয়া বএ আকার বা, বএ আকার বা, বাবা, বলিতে শিখান হয় তাহা হইলে কতদিনে শিশু কথা কহিতে শিখে বিবেচনা বা চেষ্টা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান পাঠনার রীতি কিরূপ অস্বাভাবিক এবং অযুক্তিসঙ্গত তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। যে প্রণালীতে শিশুরা কথা কহিতে শিখে সেই প্রণালী অনুসারে লিখন ও পঠন শিক্ষা করাই স্বাভাবিক। লিখন ও পঠন কথারই রূপান্তর মাত্র। শিক্ষাশাস্ত্রের যে দুইটি বিধি উপরে উল্লিখিত হইয়াছে—অর্থাৎ পরিচিত বিষয় হইতে ক্রমে অপরিচিত বিষয়ের এবং সরল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য—প্রচলিত পাঠনার রীতিতে সেই দুইটি বিধিরই অন্যথা হইয়া থাকে। পরিচিত শব্দের শিক্ষা না দিয়া অপরিচিত বর্ণমালার শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। দ্বিতীয় বিধির অন্যথা হয় কি না সে সম্বন্ধে কিছু মতান্তর হইতে পারে। অনেকেরই ধারণা এই যে প্রথমে অক্ষর পরিচয় করাইয়া এবং অক্ষর যোজনার দ্বারা শব্দ শিখাইয়া পরে সম্পূর্ণ বাক্য পাঠ করাইলেই সরল হইতে জটিল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধারণাটি ভ্রমাত্মক। বাগ্‌যন্ত্রের অপরিণতি হেতু শিশুরা সর্ব্বপ্রথমে সম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না বটে, তথাপি তাহারা সম্পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিবারই চেষ্টা করে। দা বলিতে দাদা আসিতেছে কি দাদা খেলিতেছে, মা বলিতে মা আসিতেছে বা মা দাঁড়াইয়া আছে, প্রভৃতি এক একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করিবারই চেষ্টা করে। কিন্তু যখন বাক্‌যন্ত্র এরূপ পরিণত হয় যে ছোট ছোট কথা

আপনা আপনি কহিতে পারে, তখন আর দা, মা, উচ্চারণ করাইবার আবশ্যক নাই। যখন শিশুদিগকে লিখন ও পঠন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তখন সম্পূর্ণ শব্দ ও বাক্য তাহাদিগের পরিচিত ও অভ্যস্ত, সুতরাং অপেক্ষাকৃত বোধগম্য ও সহজ। বর্ণ বা অক্ষর অপরিচিত ও অর্থহীন, সুতরাং তাহা আয়ত্ত করা অধিক ক্লেশকর। মা বা বাবা কিরূপ লেখা থাকে বা লিখিতে হয় তাহা জানিতে শিশুদিগের যেরূপ কৌতূহল হইবে, এবং বুঝিতে পারার জন্যও মন আকৃষ্ট হওয়ার জন্য শব্দটির রূপ স্মরণ রাখিতে তাহাদের পক্ষে যেরূপ সহজ হইবে, কেবল ম, বা ব, বা আ অক্ষরের পরিচয় করিতে ও স্মরণ রাখিতে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যর্থ পরিশ্রম করিতে হইবে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মানব সমাজে প্রথমে সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশের উপযুক্ত পদ বা শব্দ আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং ভাষার উন্নতি হইলে অনেক পরে মনীষী ব্যক্তির দ্বারা বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে মানববুদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ বাক্য বা পদ অপেক্ষা বর্ণমালা স্বভাবতঃ অধিক জটিল। আরও বিবেচনা করুন যে, কোন দ্রব্যের সমগ্র রূপ বা আকার চেনা ও স্মরণ রাখা যেরূপ সহজ সেই দ্রব্যের প্রত্যেক অঙ্গের আকার চেনা ও স্মরণ রাখা সেরূপ সহজ নহে।

সকলেই নিজে নিজে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কলিকাতার অনেকে চেহারা দেখিয়া কোন লোক ইংরাজ কি য়ুরোপের অপর জাতীয় তাহা সহজেই বলিয়া দিবেন, কিন্তু সেই লোকটির কোন্ কোন্ অংশে একজন ইংরাজের সহিত সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য আছে তাহা বলিতে পারিবেন না। এরূপ বলিতে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখা আবশ্যক। শব্দের আকার সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। অধিক বয়সে যদি কেহ দেবনাগরী, অথবা উর্দ্দু, পার্শী বা অপর কোন অপরিচিত অক্ষরে লিখিত পুস্তক আগ্রহসহকারে পড়িতে আরম্ভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে প্রথমে কেবল অক্ষর পরিচয় করা অপেক্ষা ছোট ছোট গল্প পড়িলে অপেক্ষাকৃত সহজে অক্ষর পরিচয় হয় এবং তাহা অধিক দিন স্মরণ থাকে। অতএব প্রারম্ভে ছোট ছোট সমগ্র শব্দ ও বাক্য পাঠ করান উচিত; শব্দ ও বাক্যগুলি শিশুদিগের সচরাচর ব্যবহারের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। কিছুদূর অগ্রসর হইলে কতকটা আপনা আপনি কতকটা শিক্ষকের সাহায্যে শিশুরা বিশ্লেষণ দ্বারা শব্দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অক্ষরাদি চিনিতে শিখিবে। এবং পরে বর্ণসমুদয়ের বৈয়াকরণিক শৃঙ্খলা ও বিভাগ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ভাষা শিক্ষার আরম্ভেই ব্যাকরণ শিক্ষা হইতে পারে না। শিশুদিগকে প্রথমেই যে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ব্যাকরণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করা উচিত।

প্রচলিত রীতির দ্বিতীয় দোষ এই যে প্রথমে কেবল পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়। লেখাপড়া এক সময়েই শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। বরং লিখিয়া পড়াই ভাল। "লেখাপড়া" অর্থাৎ লেখার পর পড়া এইরূপ ব্যবহার থাকাতে ইহা বুঝা যায় যে আমাদের দেশে এই বিধি স্বীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব' হইতে নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"বাঙ্গলায় পড়া এবং লেখা একবারেই শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। এতদ্দেশীয় প্রাচীন পাঠশালা সমস্তে এই রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথারই একান্ত বশবর্ত্তী তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই রীতি পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী রীতি যে, প্রথমতঃ কেবল পড়িতে শিক্ষা দেওয়া, তাহাই অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা বিবেচনা করুন ইংরাজীতে দুই* প্রকার অক্ষর প্রচলিত আছে। ইংরাজদিগের পুস্তক সমস্ত একপ্রকার অক্ষরে মুদ্রিত হয়, আর তাঁহাদিগের হাতের লেখা অন্য প্রকার। সুতরাং ইংরাজীতে লেখায় এবং পড়ায় যেমন স্বাভাবিক প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালায় সেইরূপ হইবার আবশ্যকতা নাই। অপরন্তু, ইংরাজী লেখায় এবং পড়ায় এইরূপ স্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলেও কোন কোন ইংলণ্ডীয় শিক্ষক স্বজাতীয় বর্ণমালায় শিক্ষা অধিক সহজ হইবে বলিয়া বালকদিগকে ছাপার অক্ষরগুলিও প্রথম হইতে লিখাইয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য! ইংরাজেরা আমাদিগের মধ্যে কোন সুরীতি দেখিলে তাহা অবলম্বন করিতে কালবিলম্ব করে না; কিন্তু আমাদিগের অনুচিকীর্ষা বৃত্তি কেমন বলবতী হইয়াছে, আমরা আপনারদিগের প্রচলিত কোন রীতির গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়াই, যাহাতে ইংরাজদিগের কোন গন্ধ আছে, তাহা একেবারে গ্রহণ করিয়া থাকি! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে কোমলমতি শিশুদিগকে একেবারে লেখা পড়া দুই ধরাইলে তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত ভারবোধ হইবে। ইহাঁরা এখন বলিলেও বলিতে পারেন যে একেবারে দুই পায়ে চলা বড় কঠিন ব্যাপার অতএব প্রথমতঃ একপায়ে চলিতে শিখাই ভাল। বস্তুতঃ যাঁহারা একেবারে লিখিতে এবং পড়িতে শিখা এত বিষম ব্যাপার বোধ করেন, তাঁহারা কখনই বালকদিগকে শিক্ষা

* চারিপ্রকার অক্ষর ইংরাজীতে প্রচলিত আছে বলা যাইতে পারে। পুস্তকসকল দুই প্রকার অক্ষরে (capital ও small) মুদ্রিত হয়, এবং হাতের লেখাও দুইপ্রকার অক্ষরের হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় এক বর্ণ একই প্রকারে মুদ্রিত ও লিখিত হয়।

প্রদান করেন নাই। নচেৎ, জানিতেন যে, অতি শৈশবাবস্থাতেও কার্য্যানুরক্তি এখন প্রবল হয় যে, শিশুরা লিখিবার আদেশ পাইলে যেমত সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তৎকর্ম্মে যেমন মনঃসংযোগ করে, শুদ্ধ বহি খুলিয়া ক, খ, গ, প্রভৃতি অক্ষরগুলির প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে কদাপি তেমন সন্তুষ্ট বা মনোযোগী হয় না। লিখিবার সময় যতগুলি ইন্দ্রিয়ের এবং মনোবৃত্তির পরিচালনা হয় কেবল অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতে গেলে কখনই তত হয় না। এই জন্য শিশুরা লিখিতে যত ভালবাসে প্রথমতঃ পাড়তে তেমন ভালবাসে না। অপরন্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লোকে আগে কথা কয় পরে লেখে, অতএব লেখা শিক্ষা শেষেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম। তাঁহারা বিবেচনা করুন যে, লেখার অগ্রে কথা কহা হয় বলিয়া লেখার পূর্ব্বে পাঠ করা হইতে পারে না। ফলতঃ এই বিষয় উপলক্ষ্যে অধিক বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। একেবারে লিখন ও পঠন শিক্ষা দেওয়াতে যে বিশেষ ফল দর্শে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে।”

বিশেষতঃ বাঙ্গালায় পুস্তকের ও হাতের লেখা একই প্রকার, যে অক্ষরটি হাতে করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিবে সেই অক্ষরটি মুদ্রিত পুস্তকে পড়িলে তাহার আকার সহজেই হৃদ্গত হয় এবং উত্তমরূপ মনে থাকে।

মুখে বানান অভ্যাস করা প্রচলিত রীতির তৃতীয় দোষ। ইহার কতকটা আভাস প্রথমাংশে দেওয়া হইয়াছে। লিখিত শব্দের রূপ বা আকার স্মরণ রাখাই বানান শিক্ষার উদ্দেশ্য। রূপ বা আকার দর্শনেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য, শ্রবণেন্দ্রিয়ের নহে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বানান শিক্ষা উত্তম হয় না। বানান মুখস্থ করিতে ধ্বনিগুলি কিছু মনে থাকে বটে কিন্তু এইরূপে শিক্ষা করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। বিশেষতঃ, কেবল কথা কহিবার জন্য বানান পরিচয় হইবার আবশ্যকতা নাই। তবে কাহারও কাহারও দৃষ্ট বিষয়ের স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুত বিষয়ের স্মৃতি অধিক প্রবল হয়। সেই স্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য অধিক পরিমাণে লওয়া যাইতে পারে। প্রধানতঃ দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্থাৎ লিখিয়া এবং পড়িয়া বানান শিক্ষা করাই প্রকৃতিসিদ্ধ। পড়া অপেক্ষা লেখাতে দর্শনক্রিয়া উৎকৃষ্ট রূপে হয়। কেবল দৃষ্টিপাত করিলে কোন পদার্থের আকারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গের প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয় না। হস্ত দ্বারা সেই আকারের প্রতিরূপ করিতে চেষ্টা করিলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অঙ্গের প্রতি মনোযোগ পড়ে ও আকারটি স্মৃতিপটে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়। যিনি একটু আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি ইহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিবেন। অতএব লিখিয়া এবং পড়িয়াই বানান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। লেখা পড়ায় একটু অগ্রসর হইলে শিশুদিগের নির্দ্দিষ্ট পাঠের পর শ্রুতিলিপির ব্যবহার মন্দ নয়। অনেক পাঠশালায় শিশুদিগকে “বানান করিয়া” পড়ান হয়। ইহাতে তাহারা কখনও সুচারুরূপে পাঠ করিতে শিখে না। আটকাইয়া আটকাইয়া পড়া অভ্যাস হয়। কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পল্লীগ্রামের অল্পশিক্ষিত লোক কাশীদাসের মহাভারত বা কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িবার সময় প্রতি ছত্রে দুই একটি শব্দ মুখে বানান না করিয়া পড়িতে পারে না। শব্দগুলি অপরিচিত বলিয়া যে তাহারা এরূপ করে তাহা নহে। কুড়িবার রামায়ণ মহাভারত শেষ করিয়া এবং অনেকাংশ কণ্ঠস্থ হইয়া গেলেও আবার পড়িতে হইলে অভ্যাস বশতঃ তাহারা সেইরূপ বানান করিয়া পড়িবে।

বাঙ্গালার বর্ণমালা সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ইহার এক বর্ণের একই ধ্বনি এবং এক একটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ; এবং সভ্য সমাজের প্রায় সকল প্রকার স্বাভাবিক ধ্বনি ইহার সাহায্যে লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে পারা যায়। এরূপ সুচারুরূপে বিন্যস্ত বর্ণমালা হিন্দুস্থানের বাহিরে আর কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। ইহা আমাদিগের শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুবিন্যাস যে আমরা সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করিতেছি না তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং দোষের নিবারণ করিতে তৎপর হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। জ, য; ণ, ন; শ, ষ, স; ব, ব; অ, ও (যথা ‘অক্ষর’কে ‘ওক্ষরের’ ন্যায় উচ্চারণ করা হইয়া থাকে); এবং ই, ঈ; উ, ঊর প্রভেদ উচ্চারণে বড় রক্ষা হয় না। অক্ষর পরিচয় হইবার সময় এবং বানান করিবার সময় মুখে হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ; বর্গীয় জ, অন্তস্থ য; তালব্য শ, দন্ত্য স, প্রভৃতি বলা হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক প্রভেদ অনুসারে আমরা উচ্চারণের প্রভেদ করি না। পড়িবার ও কথা কহিবার সময় উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ্য না করার জন্য বানান মুখস্থ করিবার আয়াস স্বীকার করিয়াও অনেক লোক শুদ্ধ করিয়া সকল কথা লিখিতে পারে না। অথচ উচ্চারণের প্রতি শিক্ষক মহাশয়েরা ও শিক্ষিত লোকেরা লক্ষ্য করিলে শুদ্ধ লিখিতে একটুও ক্লেশ হইবার কথা নহে। যেহেতু এক বর্ণের একই উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি প্রথম হইতে শিশুদিগকে যথাযথ উচ্চারণ করিতে শিখান হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ লিখিবার জন্য তাহাদিগকে যে এত পরিশ্রম ও এত সময়ক্ষেপ করিয়া

বানান মুখস্থ করিতে হয়, সে সকলের কিছু প্রয়োজন হয় না। কেবল বহি পড়িবার সময় শুদ্ধ উচ্চারণ অভ্যাস করিলে যথেষ্ট হইবে না। কথোপকথনের সময়ও শুদ্ধ উচ্চারণ অভ্যাস থাকা আবশ্যক। সুতরাং কেবল শিক্ষকদিগের চেষ্টায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কঠিন। এ বিষয়ে সকল শিক্ষিত লোকের মনোযোগ বাঞ্ছনীয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মহারাষ্ট্র দেশে উচ্চারণের শুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালীগণ শুদ্ধ ভাবে সংস্কৃত পড়িতে ও বলিতে পারেন না বলিয়া অপরদেশের লোক তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহাদের অসম্পূর্ণ বর্ণমালার সংস্কার করিবার কত যত্ন করিতেছেন, আর আমরা হেলায় আমাদের বর্ণমালাকে বিকারগ্রস্ত করিতেছি।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে লিখন ও পঠন একেবারেই আরম্ভ করা বিধেয়, বরং লিখন ড্রয়িংএর রীতি অনুসারে প্রথমেই ধরাইতে পারা যায়। স্বাভাবিক কথা বার্ত্তার সময় শিশুরা যে সকল শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করে, প্রথমে সেই সকল লিখিতে ও পড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং লিখন ও পঠনের বিষয় ও ভাষা তাহাদের কথাবার্ত্তার ধরণে হইলেই ভাল হয়। এই প্রবন্ধে অব্যক্ত ভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, কোন ভাষায় লেখা ও পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেই ভাষায় শিশুরা তাহাদের ভাব প্রকাশ করিতে ও তাহাদের মধ্যে আপনাআপনি কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিয়াছে। মাতৃভাষা সম্বন্ধে এই প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষিত হয় বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সময় বিপরীত দিক হইতে আরম্ভ করা হয়। যেরূপে কথোপকথনের দ্বারা শিশু মাতৃভাষা শিখে, সেই প্রণালী অনুসারে অন্যান্য ভাষার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া প্রকৃতি-সিদ্ধ। কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিবার পর, লিখন ও পঠন আরম্ভ কালে, বর্ণমালা হইতে আরম্ভ না করিয়া শিশুদিগের কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী সম্পূর্ণ শব্দ ও বাক্য লিখিতে পড়িতে শিখান শ্রেয়ঃ। পরে বিশ্লেষণ দ্বারা এক একটি বর্ণের পরিচয় করা যাইতে পারে। বানান মুখস্থ করা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র—লিখিয়া ও পড়িয়া বানান শিক্ষা করাই প্রকৃতি-সিদ্ধ। বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রতি বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বানান শিক্ষা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে না; এবং হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান হারা হইতে হয় না। উপরি উক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইলে প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকের সংস্কার করিতে ও শিক্ষক মহাশয়দিগকে পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রণালী যদি শিক্ষিত সমাজে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই প্রণালীতে কার্য্য করিবার তাঁহাদের বাসনা হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত পুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পুরণ হইতে অনতিক্রমণীয় বাধা থাকিবে না।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিজয়া দশমী।

শরতের সন্ধ্যাবধূ কুয়াসার জালে
আবরি' ধূসর দেহ মুদিত মৃণালে
বরষিল ধীরে ধীরে হিমানীর জল;
তরঙ্গের লেখাহীন নীল নিরমল
অগাধ সলিলরাশি কাঁপাইয়া ধীরে
চঞ্চল মরালদল উত্তরিল তীরে।

বিজয়া দশমী আজি; বিজন সন্ধ্যায়
ভাবি আমি অতীতের সুন্দর সীমায়
আর এক বিজয়া দশমী। সেই দিন,
হেথা হ'তে কতদূরে—বিষাদ-বিহীন
বালুময় ভাগীরথী পুণ্য তটদেশে
দেখেছিনু কোন্ দৃশ্য পুলক-আবেশে
বিস্ময়ে আবেগে! সেই দুরু দুরু বুক—
কত শত প্রেমোজ্জ্বল পরিচিত মুখ
করুণায় উচ্ছ্বসিত কৌতূহলময়—
দেখেছিনু শুভলগ্নে গোধূলি সময়।
জনহীন জাহ্নবীর সেই তটদেশে
নরনারী শত শত অজ্ঞাত আদেশে

মিলেছিল করিবারে প্রেম-বিনিময়;
যে ভূমি রহিত ঘুমে—বিজনতাময়
করিতে সার্থক তারে ক্ষণেকের তরে
এনেছিল জনস্রোত; আর অকাতরে

এনেছিল বহি' তার মহা কোলাহল
করুণ বিজয়া গীতি-শতেক চঞ্চল
চরণ-রাজীব হ'তে মধুর নিক্কণ
আপনি উঠিয়াছিল বিশ্ববিমোহন।

সেই দিন, সেই স্নিগ্ধ নৈশাকাশ তলে
যাহারা বাঁধিয়াছিল তপ্ত বক্ষস্থলে
এ মোর পঙ্কিল হৃদি আলিঙ্গন ডোরে,
কোথা তারা আজি ? কোন্ দুরদৃষ্ট মোরে
আনিয়াছে এ প্রবাসে ? দূরে যাই যত
ব্যবধান বাড়ে—আরো মৃণালের মত
দীর্ঘ হয় যোগসূত্র মম হৃদয়ের।

সেই বিজয়ার রাতে সমগ্র বিশ্বের
একখানি অকম্পিত ছবি অতুলন
পূর্ণ করেছিল মোর কুটীর প্রাঙ্গন।
রসাল তমাল তাল মৌন সভাতলে
নিতেছিল শির পাতি আশীর্ব্বাদছলে
শরদিন্দু করজাল নীরব-গৌরবে।
রুদ্ধদ্বার উটজের অধিবাসী সবে
মুক্ত বাতায়ন পাশে করিয়া শয়ন
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ছিল অচেতন।

শেফালি চরণমূলে অভিমান করি
সন্ধ্যা হ'তে অবিরাম পড়েছিল ঝরি
শেফালিকা রাশি রাশি হিমগন্ধময় :
নৈশবায়ু সনে তার প্রেম-পরিচয়
হতেছিল ক্ষণে ক্ষণে, মান অভিমান—
বিরহ মিলন, হাসি অশ্রুর নিদান।

মাধবীবিতান কোথা, রজনীগন্ধার
শ্বেতকান্তি সমুজ্জ্বল, সৌরভসম্ভার—
বিনিদ্র বাদককণ্ঠে সানায়ের স্বর
নাহি আসে দূর হ'তে, এ নির্জ্জন পুর
পূর্ণ করিবারে আধ' স্বপ্ন-জাগরণে ?
হেথাও প্রতি আজি শ্যাম আস্তরণে
ঢাকিয়াছে দেহখানি—কিন্তু কোথা তার
করুণ উৎসব গীতি, প্রীতি অর্ঘ্যভার

অযাচিত ? আজো হেথা দীপ্ত দীপশিখা
কাঁপিছে সমীর সনে ; বিশাল দীর্ঘিকা
রহিয়াছে স্থির হ'য়ে বিজন সন্ধ্যায়।
পূর্ণ জগতের শুধু আধখানা হায়
পড়ে আছে হেথা ; আছে শুধু প্রকৃতির
শ্যাম স্নিগ্ধ ছবিখানি স্থির সুগম্ভীর
অম্লান উজ্জ্বল ! কোথা চঞ্চল মুখর
জনস্রোত, জগতের মনোহরতর
আর আধখানি ? হৃদয় দুয়ার খুলি'
অতীতে বসিয়াছিনু বর্ত্তমান ভুলি ;
চাহিলাম যবে পুনঃ আপনার পানে
বিষম বেদনা আসি বাজিল পরাণে ;
দেখিনু নীরব নিশি সুখ দুঃখ হীন
হাসি গল্প গীত গান অতীতে বিলীন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবাসী বাঙালীর কথা।

দুরধিগম্য হিমাচল উত্তরণ পূর্ব্বক যে বাঙালী ইংরাজ শাসন-কালে প্রথম অজ্ঞাতপূর্ব্ব নেপাল রাজ্যে কর্ম্মব্যপদেশে গমন করেন তাঁহার নাম কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী কলিকাতা তালতলায়। তিনি ১৮৪৭ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ১৮৭১ সালে বি, এ, এবং ১৮৭২ সালে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নেপাল রাজদরবারে মহামন্ত্রী মহারাজা সার জঙ্গ বাহাদুরের এবং তাঁহার ভ্রাতা জেনারেল ধীর সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর সেনাপতির পুত্রদিগের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া নেপাল যাত্রা করেন। তিনি নেপালে গিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত করেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে নেপালে দরবার স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক প্রায় সকল পদস্থ রাজকর্ম্মচারীই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষিত। নেপালের বর্ত্তমান মহামন্ত্রী ও মার্শাল শ্রীযুক্ত মহারাজ সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ রাণা বাহাদুর বাল্যাবধি তাঁহার নিকটেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অন্ধবিদ্যালয়ের গায়ক ও বাদকদল

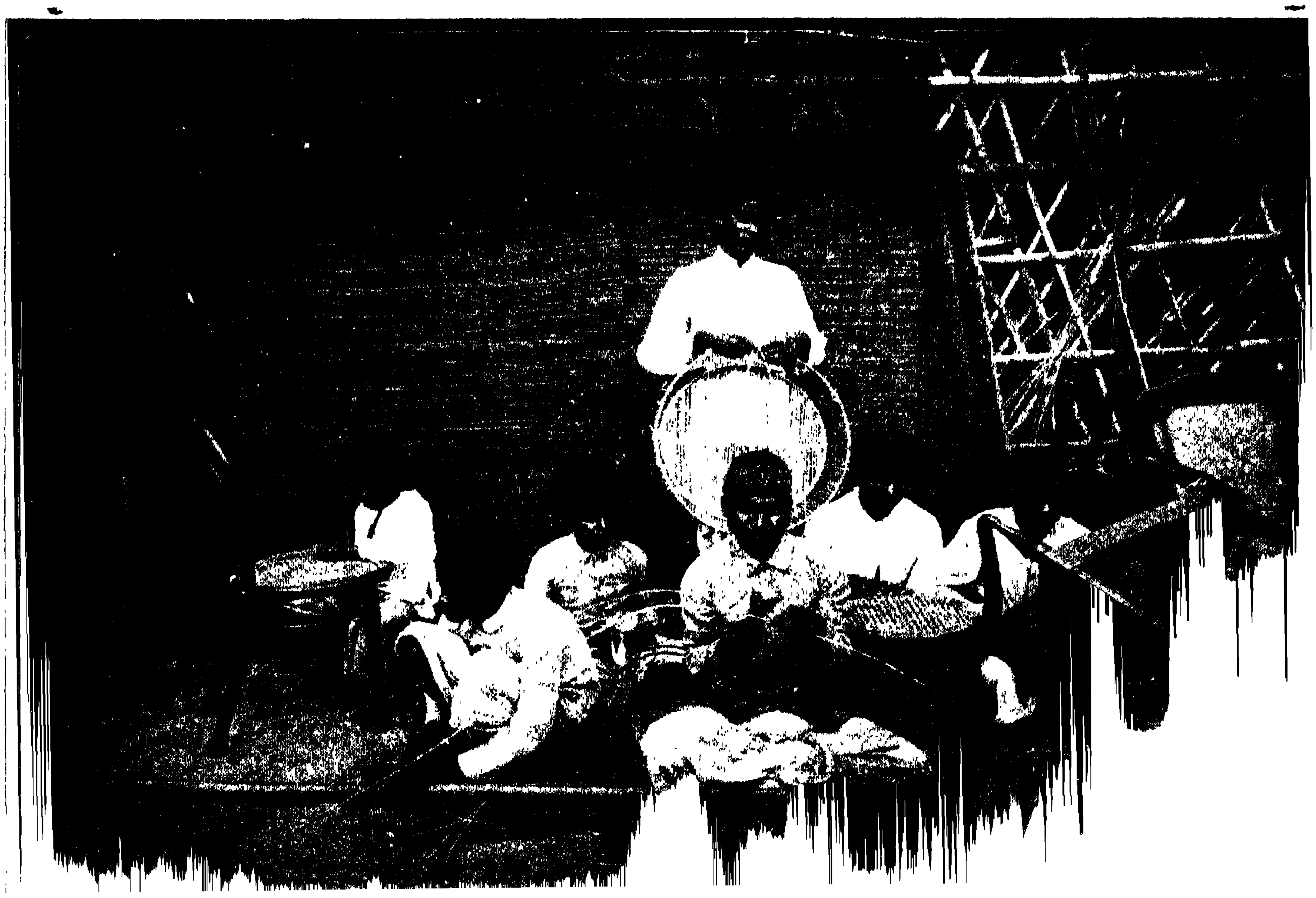

অন্ধবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ।

অন্ধবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ একটি ছাত্রকে অঙ্ক শিখাইতেছেন।
ঘরকাটা তক্তাটি স্লেট এবং ছাপার হরফ দ্বারা অঙ্ক রাখা হইতেছে

শুধু তিনি শিক্ষকতা করিয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। ভারতের একমাত্র স্বাধীন রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও উন্নতির জন্য তিনি যত্নবান ছিলেন। মন্ত্রীগণও বহু গুরু বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার বিজ্ঞতার জন্য যথেষ্ট সম্মানও করিতেন। ১৮৭৭০ সালের দিল্লী দরবারে তিনি নেপালী রাজদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন।

নেপাল দরবার তাঁহাকে কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন তাহার পরিচয় দরবার কর্ত্তৃক তাঁহাকে 'সর্দ্দার' উপাধি দানে পাওয়া যায়। গুর্খাগণ এই উপাধি খুব সম্মানজনক মনে করেন, এবং ইহা সহজলভ্য রায়বাহাদুরী খেতাব গোছের নহে। নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। নেপালে এই উপাধি নেপালী ভিন্ন আর কোন জাতির কোন লোক কখন পান নাই।

১৯০১ সালে তিনি পেন্সন লইয়া নেপালের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি যে প্রতীচ্য আদর্শ নেপালীদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার চেষ্টায় নেপালীরা যে উন্নতির স্বাদ পাইয়াছে এবং জাপানের অভ্যুদয়ে তাহাদের আরো যে উত্তেজনা আসিয়াছে তাহা নেপালীদের ক্রমোন্নতি ও অত্যুন্নতির আকাঙ্ক্ষায় পরিস্ফুট দেখা যায়। আশা করা যায় অতি নিকট ভবিষ্যতে নেপালীরা জগতের জাতীয়ত্ব গোষ্ঠীতে পরিগণিত হইবে। জাপানী আদর্শে নেপালীরাও বহু শিক্ষিত যুবককে দেশ বিদেশে কলা, বিদ্যা, শিল্প শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেছেন।

নেপালে বহু বাঙালী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বহু কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বভাব চরিত্রের প্রভাবে নেপালীরা সকল বাঙালীকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নেপাল রাজ্যের দপ্তর খুঁজিয়া ও বহু অনুসন্ধানের দ্বারা জঙ্গ বাহাদুরের এক জীবনী ও নেপাল রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নেপাল গভর্ণমেণ্টের সম্মতি না পাইয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

১৯০৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহার বহু পরিশ্রমের ফল স্বরূপ নেপালের ইতিহাস তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটি কৃতবিদ্য উন্নতচিত্ত পুত্র আছেন, তাঁহারা একটু সাহস করিয়া ঐ পুস্তক খানি প্রকাশ করিলে ইংরাজের ইতিহাস-পরিত্যক্ত বা যত্ন-সংগুপ্ত বহু বিষয় লোক সমাজে প্রকাশিত হইতে পারে। এখন তাহা প্রকাশিত করার পক্ষে কোনও বাধা নাই। বরং প্রকাশিত না করিলে তাঁহার শ্রম নিষ্ফল হইয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া ভারতের বহু সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙালীর শত্রু ইংলিশম্যানও তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি ধীর, নম্র ও বিনয়ী লোক ছিলেন। তিনি আত্মবিলোপ করিয়া কর্ম্ম করিতেন, অনাড়ম্বর ও অল্পভাষী ছিলেন। তিনি বহু পরিবারকে অপক্ষপাতে পোষণ করিতেন এবং গোপনে দানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

সর্দ্দার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনীর স্থূল ঘটনা সংগ্রহের জন্য আমি ইটালী পদ্মপুকুরের শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঋণী।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্ধ আশ্রম ও বিদ্যালয়।

প্রকৃতির নিগৃহীত সন্তান মূক বধির ও অন্ধ এতকাল সমাজের, পরিবারের ভারস্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু অভাবই উদ্ভাবনের জনক; ক্রমে এখন তাহারাও স্বাবলম্বনের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধদিগের জন্য প্রাচীনতম আশ্রম ১২৬০ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট লুই কর্ত্তৃক ফ্রান্সের পারি নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৭ সালে জে, বারনুইলি বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম একটি অন্ধ বালিকাকে লিখিতে শিখান। ১৭৮৪ সালে পারি নগরে ভ্যালেন্সিয়া হয়ুই প্রথম অন্ধকে রীতিমত শিক্ষাদিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই শুভচেষ্টার ফলস্বরূপ এখন দেশে দেশে অন্ধদিগের শিক্ষাশালা ও কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল অন্ধপ্রতিষ্ঠান ছয় রকম—(১) ছাত্রাবাসসমন্বিত শিক্ষালয়, (২) যুক্ত শিক্ষা ও কর্ম্মশালা, (৩) কর্ম্মশালা, (৪) আশ্রম, (৫) যুক্ত আশ্রম ও স্কুল, (৬) যুক্ত আশ্রম ও কর্ম্মশালা।

বহু রাজ্যে রাজকোষ হইতে অন্ধপ্রতিষ্ঠান সকল সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের ভারত উল্টা রাজার দেশ, এখানকার বিদেশী রাজা লইতে জানেন, দিতে বড় কুণ্ঠিত। কলিকাতায় একটি অন্ধআশ্রম ও বিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেণ্ট ও ম্যুনিসিপালিটি যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য স্বরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রাণ ও পোষক ইহারই প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত লালবিহারী সাহা। ইহার নাম স্বদেশী সভার সংবাদপাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহে। ইনি একজন বাঙ্গালী খৃষ্টান। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপত এই—

১৮৯৪ সালে লালবিহারী বাবু গার্থওয়েট সাহেবের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার নিকট অন্ধ শিক্ষাপ্রণালী কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন। সেই সাহেব একটি অন্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্থির করেন যে লালবিহারী বাবু সেই স্কুলের শিক্ষক হইবেন। কিন্তু চারি বৎসরেও তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না।

১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে লালবিহারী বাবু রেভারেণ্ড জিউসনের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি লালবিহারী বাবুকে এক অন্ধস্কুল খুলিতে বলেন। লালবিহারী বাবু অর্থের অসদ্ভাব জ্ঞাপন করেন—কারণ অন্ধগণ প্রায়ই অনাথ এবং তিনি নিজেও ধনবান নহেন। পাদরী সাহেব বাইবেলের উক্তি উদ্ধার করিয়া বলেন "The Lord is my shepherd, I shall not want;" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার রক্ষক, আমার কখন অভাব হইবে না। তখন তাঁহারা একটি গাছের তলে গিয়া উপাসনা করিয়া এই ভাবী প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। এই ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা যখন লালবিহারী বাবুর লেখায় প্রথম পাঠ করি, তখন আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারি নাই। মঙ্গলময়ের শুভনামে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভব।

তিনি এই স্কুলের বিষয়ে একটি ঘোষণা প্রচার করেন। সপ্তাহকাল পরে একজন অন্ধ তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হন। তখন লালবিহারী বাবু বিলাতে পত্র লিখিয়া উন্নত শিক্ষা প্রণালী ও যন্ত্রাদি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন।

ক্রমে এক বৎসরে স্কুলে আরো তিনটি বালক প্রবিষ্ট হয়। এক বৎসরে এই সব বালক লিখিতে পড়িতে পটু হয়। ১৮৯৯ সালের মার্চ মাসে জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজের হলে এক সভা হয় এবং পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সভার নায়ক ছিলেন। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম—এবং একজন জন্মান্ধ লিখিতে পড়িতে অঙ্ক কশিতে পারে ইহা সকলের নিকট অতি কৌতুককর আনন্দব্যাপার বোধ হইয়াছিল। সেই সভায় কালী বাবু বালকদিগকে যে শ্রুতিলিখন দেন তাহারই এক খণ্ড অন্ধলিপি আমি লালবিহারী বাবুর নিকট চাহিয়া লইয়া আজো সযত্নে রক্ষা করিতেছি।

বর্ত্তমানে এই স্কুলে ১৩ জন অধিবাসী ছাত্র ও ২ জন দিবসিক ছাত্র আছে। প্রায় সকলেই অনাথ। দুইটি বালিকাও আছে। স্কুলের প্রথম ছাত্র এখন সেই স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। আর একজন ছাত্র অম্বিকাকালনায় শিক্ষকতা করেন, দুই জন সঙ্গীত সম্প্রদায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং অপর একজন বেতের কারুকরী শিখিয়া মাসে ১৫।১৬৲ টাকা অর্জ্জন করিতেছেন।

বর্ত্তমানে ৪ জন শিক্ষক আছেন। লালবিহারী বাবুর পুত্রও শিক্ষকতা করেন। একজন সঙ্গীতশিক্ষক ও এক জন বেতের কারুকরও আছেন।

অগ্রগামী বালকেরা ইংরাজী তৃতীয় পুস্তক ও বোধোদয় পড়ে। ভগ্নাংশিক ভাগ অঙ্ক কশে। অন্ধ বালকেরা সাধারণ মুদ্রিত পুস্তক পড়িতে পারে না; তাহারা হাতের অঙ্গুলি স্পর্শে উঁচু উঁচু অক্ষর অনুভব করিয়া পড়িতে শিখে। সেই সকল অক্ষরও প্রচলিত অক্ষরের মত নহে; কতকগুলি সজ্জিত বিন্দুসমষ্টি মাত্র—যেমন খেলিবার তাসের ছক্কা পঞ্জা চৌকা প্রভৃতি। কাগজের উপর সূচ ফুটাইয়া অন্ধ বিন্দু সঙ্কেতে অক্ষর রচনা করে, পরে সেই কাগজখানা উল্টাইয়া ধরিয়া সূচিবিদ্ধ কাগজের পৃষ্ঠে উঁচু উঁচু বিন্দুর উপর আঙুল বুলাইয়া দ্রুত ও অনর্গল পড়িয়া যাইতে পারে। মুদ্রিত পুস্তকের অভাবে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। লালবিহারী বাবু টাইপ দিয়া এম্‌বস করার মত করিয়া পুস্তক মুদ্রণের প্রথা উদ্ভাবন করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। অন্ধদের এই লিখন প্রণালীকে উদ্ভাবয়িতার নামানুসারে Braille system বলে।

এই বিদ্যালয়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে সকল অন্ধকে গ্রহণ

করা হয়। বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হয় না, অধিকন্তু বাসস্থান আহার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়। লালবিহারী বাবু প্রকৃত প্রাচ্য আদর্শে যে মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাহাকে জয়যুক্ত করিবেনই।

ছাত্রগণকে মাদুর, চিক, চেয়ার প্রভৃতি বুনিতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। অর্থ স্বচ্ছলতা ঘটিলে ছুতার ও তাঁতির কাজ প্রভৃতিও শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে।

লালবিহারী বাবু সঞ্চিত সর্ব্বস্ব ও গৃহিণীর অলঙ্কার বন্ধক দিয়া যে বিদ্যালয়টিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা এক্ষণে সাধারণের স্বেচ্ছাকৃত দানে এবং গবর্ণমেণ্ট ও ম্যুনিসিপালিটির প্রদত্ত ৫০০৲ টাকা সাহায্যে একরূপ চলিতেছে। কিন্তু ইহার নিজস্ব গৃহ নাই—ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বিদ্যালয় অবস্থিত, মাসে ৬২৲ টাকা বাড়ীভাড়া দিতে হয়। এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায় হইতে সকলকে অনুরোধ করি। আজকাল এই বিদ্যালয়ের পরিচয় বোধহয় অনেকেই পাইয়াছেন, কারণ কলিকাতার দুইবারের কংগ্রেস প্রদর্শনীতেই লালবিহারী বাবুর ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিল।

এই বিদ্যালয়ের দু একটি ছাত্রের ইতিহাস বড় করুণ।

একজন ধূর্ত্ত একটি পাঞ্জাবী বালককে চুরি করিয়া লইয়া কলিকাতায় ভিক্ষা করাইয়া উপার্জ্জন করিবার জন্য আনিয়াছিল। সেই আত্মীয় স্বজনের সঙ্গবিরহিত বালককে স্বল্পাহারে রাখিত এবং ভিক্ষালব্ধ উপার্জ্জন অল্প হইলে তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। এই অবস্থায় সেই বালকটি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তাহাকে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে পাঠান হয়; সেখানকার কর্ত্তারা তাহাকে অন্ধাশ্রমে পাঠাইয়া দেন। যখন সে অন্ধাশ্রমে আসিল তখন অতি রুগ্ন ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল। সে ছবিতে স্কুলের ঐকতান সম্প্রদায়ের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাঁশি বাজাইতেছে দেখা যাইবে।

সম্প্রতি একজন সাঁওতালবালিকা আশ্রমে ভর্ত্তি হইয়াছে। জঙ্গল বিভাগের একজন কর্ম্মচারী তাহাকে বনের মধ্যে পাইয়াছিলেন। তাহার লম্বা চুল ও নখ ও উলঙ্গ নোংরা চেহারা দেখিয়া তাহাকে মানুষ মনে হইত না। সে কথা কহিতেও জানিত না। পনর দিন পরে সে সাঁওতালি দু একটা কথা বলিতে আরম্ভ করে। লালবিহারী বাবু সাঁওতালি জানেন। এখন সে অল্প অল্প কথা বলিতে পারে, এবং সাঁওতালি কথা বুঝিতে পারে। সে হাসিতে ও দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতে ও উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে—তাহার বয়স ১১।১২ বৎসর। সে সাঁওতালি বুঝিতে পারে বলিয়া মনে হয় যে সে অল্প বড় হইলে জঙ্গলে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এই স্কুলের মত আরো স্কুল ভারতের প্রধান প্রধান নগরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র পরিচয়।

মহারাজ শিবাজী সাতারার দুর্গচূড় হইতে একদিন দেখিলেন তাঁহার গুরু রামদাস স্বামী ভিক্ষায় চলিয়াছেন। শিবাজী ভাবিলেন যে—

"সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ।"

তখন তিনি একখানি পত্রে আপনার সমগ্র রাজ্য দান করিয়া গুরুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গুরু শিষ্যকে কহিলেন—

"রাজ্য যদি মোরে দেবে কিকাজে লাগিবে এবে,
কোন গুণ আছে তব, গুণী?"

শিবাজী বলিলেন যে তিনি গুরুর সেবায় জীবন অতিবাহিত করিবেন। তখন গুরু কহিলেন—

"তবে শোন, করিলি কঠিন পণ
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্ব্বার!

* * *

পালিবে যে রাজধর্ম্ম জেনো তাহা মোর কর্ম্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন!
বৎস, তবে এই লহ মোর আশীর্ব্বাদ সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস;
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো।"

তদবধি মহারাষ্ট্রদিগের গৈরিক পতাকা প্রচলিত হইয়াছে ইহার মধ্যে রাজধর্ম্মের একটি গূঢ় উপদেশ আছে। রাজা যিনি, তিনি রাজ্যের দীনতম ভিক্ষুকেরও প্রতিনিধি; তাঁহাকে উদাসীন বৈরাগীর মত রাজৈশ্বর্য্যে নিস্পৃহ থাকিয়া রাজ্যে

মঙ্গল চিন্তা করিতে হইবে। যিনি এমন তিনিই প্রকৃত রাজা, অন্য সবে অত্যাচারী। প্রাচ্যের আদর্শ ইহাই, ইংরাজ এখন যাহাই বলুন না কেন। যে রাজা প্রাচ্যআদর্শ মানিয়া না চলিবেন,—তিনি কখন আমাদের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন না।

বর্ত্তমান সংখ্যায় শিবাজীর যে দুইখানি চিত্র প্রকাশিত হইল তাহা এই উপাখ্যানটি আশ্রয় করিয়া অঙ্কিত। জিজ্ঞাসু পাঠক রবিবাবুর কথাগ্রন্থে ইহার সুন্দর বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত যে চিত্রখানি আমরা এবার প্রকাশ করিলাম, তাহার বিষয় কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণন হইতে গৃহীত। ছবিখানি মুখাবয়ব, অঙ্গভঙ্গি, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, সর্ব্ববিষয়েই ভারতবর্ষীয়।

ইন্দ্রজিৎ স্বর্গ হইতে ইন্দ্র ও দেবসভার এক অপ্সরাকে বন্দী করিয়া রাবণের সভায় আনিয়াছেন, ইহাই রবিবর্ম্মার অঙ্কিত বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত ছবিখানির বিষয়। পরাজিত শত্রুর সন্মান যে করিতে জানে না, সে বীর নহে। তাহার পতন অনিবার্য্য। যে নারীর অবমাননা করে, সে পশু অপেক্ষাও হেয়, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। রামায়ণের এই উপদেশ, বর্ত্তমান চিত্র হইতেও পাওয়া যায়।

আমেরিকা-প্রবাসীর পত্র।

১

978, ILLINOIS STREET,
URBANA, ILLINOIS,
U. S. A.

শ্রীচরণকমলেষু,

এবারে ডাকের কি গোলমাল হয়েছিল, সমস্ত সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইলুম্ কোন চিঠিই এলো না; ভাবলুম্ তোমরা হয় ত খুব ব্যস্ত ছিলে তাই চিঠি দিতে পারনি। তার পরে সব চিঠি পত্র এসেছে।

তোমাদের চিঠি সকালবেলায় এসেছিল কিন্তু আমি সন্ধেবেলায় সেগুলো পেলুম্। এই কয়েক ঘণ্টা তোমাদের চিঠি বর্জ্জিত হওয়ার কারণ কি জান? এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। তোমরা জান ত আমি পোকা সম্বন্ধে (Entomology) একটা কোর্স নিয়েছি। এই কোর্সে পোকার অনুসন্ধানে ও তাদের জীবনবৃত্তান্ত জান্‌তে প্রায়ই এদিক্ ওদিক্ যেতে হয়। এখান থেকে চৌদ্দ পনেরো মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মত আছে, সেখানে এখন একদল পঙ্গপাল দেখা দিয়েছে, তাই দেখতে অধ্যাপক আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। পোকার নাম শুনে তোমাদের নানা রকম মনে হ'তে পারে। সেই জন্যে বলে রাখি, কেবল যে পোকা খুঁজতেই গিয়েছিলাম তা' নয়, চড়িভাতি করাও উদ্দেশ্য ছিল।

জায়গাটার নাম হচ্ছে Homer Park. পার্ক শুনে গড়ের মাঠের মত জায়গা আদবেই ভেব না। এই পার্কের ভিতর মানুষের হাত একেবারেই নেই, একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জঙ্গল। Public Park এই অর্থে যে, লোকেরা এর উপর ঘর বাড়ি না তোলে। ছুটির দিন সকলে যা'তে এখানে এসে picnic করতে পারে, তার জন্যে এই জায়গাটুকুতে যে রকম স্বাভাবিক জঙ্গল ছিল সেই রকমই রেখে দিয়েছে।

আমরা বাসা থেকে সকালবেলায় বেরুলুম, সঙ্গে কিছু পয়সা, পোকা সংগ্রহের জন্যে জাল ও chloroform দেওয়া গোটা কতক শিশি ও একটা ছবি তোলাব জন্যে ছোট ক্যামেরা। সেখানে রেলগাড়ি যায় না, বৈদ্যুতিক রেলে যেতে হয়। সে'টা আর কিছু নয়, সাধারণ বৈদ্যুতিক ট্রামেরই কিছু বড় সংস্করণ,—রেলগাড়িরই মত জোরে যায়। আমাদের বাড়ির কাছ দিয়েই সেটা চলে গেছে, কিন্তু—students' rate জোগাড় করবার জন্যে ট্রামগাড়িতে প্রথমে আমাদের নিকটের সহর স্যাম্‌পেনে (Champaign) গেলুম। যাতায়াতের ভাড়া ৭০ সেণ্ট অর্থাৎ দু'টাকা তিন আনা, কিন্তু আমরা ৪০ সেণ্টে পেলুম। অধ্যাপকদের সঙ্গে এইরকম করে গেলে, এখানে সর্ব্বত্রই এইরকম অর্দ্ধেক ভাড়ায় যেতে দেয়। স্যাম্‌পেন্ থেকে সেই গাড়িতে প্রথমে ত আরবানায় (Urbana) গেলুম। তার পর সহর ছাড়িয়ে গাড়ি বরাবর মাঠ ও ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চল্লো। এই জায়গাটা সত্যিই আমাদের দেশের মত। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন বর্দ্ধমানের কাছাকাছি রেলে ক'রে যাচ্ছি। দু'ধারে ধানের বদলে কেবল ভুট্টা

ও যবের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক একটা গাছের ঝোপ্। তার ভিতর থেকে যদি দু'একটা বাঁশের ঝাড় ও খোড়ো ঘরের চাল উঁকি মারতো ত দেশের সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকত না। কিন্তু এখানে জান ত গ্রাম বলে কোনও জিনিস নেই, ঐসব গাছের ভিতর একটিমাত্র করে চাষার ঘর, ঘর বলা চলে না, বেশ একটি সুন্দর বাড়ি। এখানে জমির ত কোনও অভাব নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে, এইরকম ঘর বেঁধে চাষারা দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে,—কেবল সহরের লোকেরাই ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে একত্রে থাকে।

এক একজন চাষার কত বড় বড় ক্ষেত তা আমাদের কোনো ধারণা নেই। ঐ বোলপুরের মাঠটা বোধ হয় দু'তিন জন মাত্র অধিকার করে থাকবে। যন্ত্রপাতির এত উন্নতি করেছে যে, অত বড় ক্ষেত চাষ করতে বেশী লোকেরও দরকার হয় না। প্রায় সমস্ত কাজই দু'তিন জনে কর্‌তে পারে। এই সব মাঠের ভিতর দিয়ে গিয়ে একটা ছোট ষ্টেষণে আমাদের নামিয়ে দিলে। ষ্টেষণের কাছেই একটা ছোট restaurant, সেখানে সব রকম খাবার পাওয়া যায়। কাছেই একটা ছোট নদী, গিরিধির উশ্রী নদীর চেয়ে চওড়া নয়, কিন্তু সব সময়েই অনেক জল থাকে, আর বনের ভিতর দিয়ে বেশ এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

আমরা গাড়ি থেকে নেবেই পোকা দেখতে বেরুলুম,-নদীর ধার দিয়ে বনের ভিতর দিয়ে চল্লুম। খুব পরিষ্কার বন যে তা নয়। ঘাস ও লতাপাতায় প্রায় কোমর পর্য্যন্ত ডুবে যায়। এরকম জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে আমাদের দেশে ভয় করে কখন সাপের গায়ে পা পড়্‌বে, এখানে সে সব কোন ভয় নেই।

অনেক পোকামাকড় সংগ্রহ করা গেল। পঙ্গপাল জাতীয় যে পোকা বিশেষ ভাবে দেখতে গিয়েছিলুম, তা খুব দেখলুম,—সমস্ত বন ছেয়ে ফেলেছে। এ ভারি মজার পোকা। পঙ্গপাল ঠিক্ নয়,—কোথাও থেকে উড়ে আসে না। এক জায়গাতেই বরাবর থাকে, কিন্তু ১৭ বৎসর অন্তর দেখা দেয়। এই পোকাগুলো এখন ডিম্ পাড়্‌বে, তা থেকে যে পোকা হ'বে সেগুলি মাটির ভিতর ১৭ বৎসর চুপ্‌চাপ্ থাক্‌বে। তা'র পর হঠাৎ বেরিয়ে এসে, এতদিনকার খোলস বদ্‌লে চারিদিক্ ছেয়ে ফেল্‌বে,—কিন্তু বিশেষ কিছু অনিষ্ট করে না।

আমাদের অধ্যাপকের আদবেই প্রফেসরী ভাব নেই। ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বদাই গল্প ঠাট্টা চল্‌ছে। এদিকে লোকটি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর লেখা কীটতত্ত্বের (Entomology) পাঠ্য পুস্তক প্রায় সকল কলেজেই আজকাল পড়ানো হচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে তিনজন ছাত্রী ও বাকি সবই ছাত্র ছিল। মেয়েরা ঘণ্টা দু'য়ের পরই বাড়ি ফিরে গেল। আমরা সেই Restaurantএ ফিরে এলুম্। অর্থাৎ কি বুঝ্‌তে পাচ্ছো, জঙ্গলের ভিতর বেড়িয়ে বেড়িয়ে—উদরাগ্নি বেশ্ জ্বল্‌তে আরম্ভ করেছিল। খেয়ে দেয়ে আমরা একটা নৌকা ভাড়া কর্‌লুম। আমার সঙ্গে দু'জন ফিলিপিনো ছেলে এসে যোগ দিলো। এখানে অনেকগুলো নৌকা ভাড়া দিবার জন্যে রাখে। এক একটা বোটে কেবল তিনজন মাত্র বস্‌তে পারে। অনেক দিন পরে দাঁড় টান্‌তে খুব ভাল লাগ্‌ছিল। প্রায় মাইল দুই দাঁড় টান্‌লুম্।

নদীটি এমন সুন্দর যে কি বল্‌ব, বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে। দু ধারের বড় বড় গাছ তার উপর ঝুঁকে পড়েছে। সেই পুল্‌টার কাছে গিরিধির উশ্রী যেমন দেখতে অনেকটা সেই রকম। তবে অত উঁচু পাড় নয়, আর অনেক জল অথচ বেশী স্রোত নেই। বনের ভিতর কেও কোথাও নেই মাঝে মাঝে নদীর ধারে দু' একটা log-cabin। এ গুলো ভাড়া পাওয়া যায়। অনেকে এখানে এসে সপ্তাহ খানেক্ বা পনেরো দিন গরমের সময় এসে বাস করে।

ফিরে এসে দেখি নদীর ধারে, একটা খোলা আট্‌চালার মত ঘরে, আমাদের অধ্যাপক পিয়ানো বাজাচ্ছেন্ আর অনেকগুলি মেয়ে নাচ্ছেন্, আমাদের সঙ্গীরাও এই নাচে যোগ দিয়েছেন। এই ঘরটা নাচের জন্যেই রাখা। শুনলুম একদল মেয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এসেছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পরে কি কর্‌বেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের অধ্যাপককে চিন্‌তেন্। তাঁকে দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে এসে পিয়ানো বাজাতে বসিয়ে দেন্ ও তাঁরা নিজেরা নাচ্ সুরু ক'রে দেন্। নাচেতে এ দেশের লোক পরিশ্রান্ত হয় না। আমার সাম্‌নেই দু'

এক জন মেয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা নাচ্ চালালেন। আমাদের দু'জনের কাছে ছবি তোল্‌বার ক্যামেরা ছিল। মেয়েরা ছবি তোল্‌বার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ কর্‌লেন্। তাঁহাদের একটা group তুল্লুম্। আরো ক'টা ছবি তুলেছি, কি রকম হ'য়েছে দেখো।

এই সব ব্যাপারের পর বাসায় ফিরে এলুম্। ফিরে এসে ব্যায়ামাগারের (Gymnasium) ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলে সাঁতার কেটে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিলুম্। সেদিন বেশ্ গরম পড়েছিল। বাসায় এসে দেখি, এক গাদা চিঠি ও কাগজ এসে রয়েছে। সন্তোষ আমার সঙ্গে যায় নি। সে বেশ্ চিঠিপত্র পড়া শেষ করে পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ পড়্‌ছে। যায় নি বলে সে এক বেলা আগে চিঠি পেয়েছে। এ জন্যে সে মনে করছে খুব ভালই করেছে। তোমার কি মনে হয়? এ রকম একটা চড়িভাতির জন্যে এক বেলা চিঠি না দেখার ক্ষতিটা স্বীকার করা যেতে পারে না কি? ইতি ৮ই শ্রাবণ রবিবার।

সেবক,
শ্রীরথী।

২

শ্রীচরণকমলেষু,

রথী পোকা সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছে। তবু তোমার চিঠিটা কত ছোট দেখেছো ত? এবারে ভেবেছিলুম রাস্তায় নিশ্চয় জাহাজডুবি হয়েছে। তাই এই তিনদিন ধরে শোক কর্‌ছিলুম,—চিঠিগুলো নেহাৎ সমুদ্রে মারা গেল। তারপর শনিবারের দিন অতগুলো হারানিধি একসঙ্গে পেলে কার না আনন্দ হয়?

জানই ত ভায়া আজকাল কীটতত্ত্বের চর্চ্চা কর্‌ছেন। পোকার সঙ্গে তাঁর কি রকম সদ্ভাব সে ত দেখেইচ, ঘরের মধ্যে কাঁচপোকা কি আরসোলা দেখলে সে কি রকম অস্থির হয়ে পড়তো। তার অধ্যাপক আজকাল আদেশ দিয়েছেন পোকা দেখলেই বোতলে পুরবে। এখন পোকা তো আপনি আপনি বোতলে আসে না। রথীর কি রকম অগ্নি-পরীক্ষা চল্‌ছে বুঝতেই পার্‌ছো! বেচারি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে দেড়গজ লংক্লথ নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কোথাও একটা পোকার সন্ধান পেলেই তার উপর সেই দেড়গজ কাপড় নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তারপর ঘরে এসে, দরজা জানালা লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে কার্পেটের উপর কাপড় ঝাড়্‌তে থাকে। কার্পেটের উপর ইট পাট্‌কেল্ প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস পড়্‌তে থাকে। কিন্তু হায়,—ফড়িং জাতটা এমনি দুর্বৃত্ত যে, বিজ্ঞানের খাতিরেও একটা পা দান করতে চায় না! দিনান্তে বেচারি পরিশ্রান্ত হ'য়ে ঘরে ফিরে এসে আলো জেলে ব'সে থাকে, যদি একটা ফড়িং দৈবাৎ লাফিয়ে আলোর উপর পড়ে! কিন্তু যে দিন থেকে ভায়া কীটতত্ত্বের সেই বড় বইটা ঘরে এনেছেন, সে দিন থেকে আলো দেখেও পোকারা আর ঘরে আস্‌ছে না।

এই ত অবস্থা! কাল তাই যখন ভায়া বল্লেন্ "চল গোটাকতক পোকা ধরে আনা যাক্,—জায়গা শুন্‌চি বড় চমৎকার"—আমি তা'তে রাজি হলুম্ না। তারপর ফিরে এসে অবধি ক্রমাগত আমার কাছে গল্প কচ্ছে,—"কি চমৎকার! কি চমৎকার!"

ভায়ার চিঠিতে ঐ যে সব বর্ণনা কতটা খাঁটি একবার দেখ্‌তে যাবো। তবে ফড়িং ধরা ব্যাপারটা যে সত্য তা'তে আর সন্দেহ নেই। এক বোতল ফড়িং আমাদের পড়বার ঘরের জানালায় সাজানো রয়েছে। ইতি ৮ই শ্রাবণ।

সেবক,
শ্রীসন্তোষ।

শ্রীচরণকমলেষু,

গত ডাকের চিঠি কতকগুলো বাজে কথায় ভরাণো গিয়েছিল। এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যা'ক্।

বিশ্লেষ করে দেখ্‌বার জন্যে যে মাটি পাঠাবার কথা আছে, তা যেন বেশী পরিমাণে পাঠানো না হয়। আমাদের অধ্যাপক Dr. Hopkins বল্‌ছিলেন্ পদ্মা বা বড় নদীর ধারের মাটি পরীক্ষা করে বিশেষ ফল হবে না। ওরকম পলিপড়া জমির পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়—ভিন্ন ভিন্ন রকম ফল পাবার সম্ভাবনা। এ সকল জমি সাধারণতঃ খুব ভাল, সুতরাং উর্ব্বরতা (Soil fertility) নিয়ে কোন হাঙ্গামা নেই, drainage প্রভৃতি নিয়েই যা কিছু গোলযোগ।

অধ্যাপক বল্‌ছিলেন যে জমিতে বহুকাল ধরে চাষ হয়ে

এসেছে, ও চাষ ক'রে ক'রে যেখানে আর কোন ফসলই হয় না, এমন কি সুটিওয়ালা কোন ফসলও (Legume) জন্মাচ্ছে না, এ রকম পতিত জমি থেকে যদি খানিকটা মাটি পাওয়া যায়, তবে ভাল অনুসন্ধান চলে। অনেক জায়গায় ফসল হয় না, অর্থাৎ যা'কে উসর জমি (Alkaline) বলে, তা'র মাটির দরকার নেই। যে জমি অনুর্ব্বর নয়, কিন্তু ফসল দিয়ে দিয়ে একবারে অবসন্ন (exhausted) হয়ে পড়েছে, এই রকম জমির মাটির দরকার। এরকম জমিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, হয় ত কেবল একটা কোনও ধাতু ফুরিয়ে গেছে। সেইটা দিলেই আবার বেশ আবাদ করা যায়। বাঙ্গলাদেশের উত্তর দেশে ও বিহার অঞ্চলে এরকম জমি বোধ হয় অনেক আছে। তুমি চাতের গোড়ার যেসব মাটিকে exhausted বলে মনে করবে, তা পাঠিয়ো। আর আমাদের পরিচিত অপরিচিত যে কোন লোক যদি ঐ রকম মাটি সংগ্রহ আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তা' হ'লে আমাদের অধ্যাপক দ্বারা তা' বিশ্লেষ করিয়ে নিতে পারি। জমির গলদ কোথায় এবং তাতে কোন্ জিনিসটার অভাব আছে জান্‌লে, অতি অল্প খরচে জমিকে খুব ভাল করা যেতে পারবে। এখানকার চাষ আবাদে লোকে ঐ রকম মাটি বিশ্লেষ করে সার দেয়,—আর রাশি রাশি ফসল পায়।

আমি আজকাল কেবলি যে মাটিই বিশ্লেষ কর্‌ছি তা নয়, নানা রকমের grain ও গরু ঘোড়ার খাদ্যবস্তু (fodder) বিশ্লেষ কর্‌ছি। আমাদের দেশে অনেক সুটিওয়ালা ফসল (legumes) আছে, যা এদেশে কেও জানে না। সেগুলির অল্প অল্প নমুনা যদি কেও আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তবে খুব ভাল হয়। এখানে যেসব সুটিওয়ালা ফসল আছে, তার চেয়ে পুষ্টিকর যদি দু' একটা পাওয়া যায়, তবে এখানে সেগুলোর আবাদ সুরু করানো যেতে পারে। বজরা ও মাড়ুয়া প্রভৃতি ফসল এদেশে মোটেই নেই। সব চেয়ে যা' ভাল বীজ তাই পাঠালে ভাল হয়। এখানে সুটিওয়ালা ফসল মানুষে অতি অল্পই ব্যবহার করে। লতাপাতা ফল সবসুদ্ধ তুলে ও শুকিয়ে, এরা গরু ও ঘোড়ার খাবার রূপে ব্যবহার করে।

আমাদের অধ্যাপক ডাক্তার হপ্‌কিন্‌স সাহেব সে দিন বল্‌ছিলেন, যদি পরীক্ষার জন্যে আমার কাছে কেউ মাটি পাঠান, তবে জমিটার সবরকম খবর যেন তা'র সঙ্গে লিখে পাঠান। অর্থাৎ জায়গাটা কোথায় এমনি ভাবে দেওয়া দরকার যেন, যে কেউ গিয়ে ঠিক্ সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে পারে। আমাদের অধ্যাপক বল্‌ছিলেন, উনি এক-সময়ে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই যাবেন। যদি বিশেষ বিশেষ জায়গার মাটির বিশ্লেষে কোন বিশেষত্ব ধরা পড়ে, তবে উনি হয় ত ঐ জায়গা গুলোতে নিজে গিয়েই উপস্থিত হবেন।

কি রকমে মাটি সংগ্রহ করতে হয় তার খবর একটু লিখে দিচ্ছি। যদি কেউ আমার কাছে মাটি পাঠাতে চান্, তবে তিনি যেন এই উপায়ে নমুনা সংগ্রহ করেন—

যে সকল স্থান বানের জলে ভেসে যায় না, (অর্থাৎ নদী থেকে দূরে), বা উপর থেকে যা'র উপরে ধোয়া জল জমে না, এ রকম বহুদূর বিস্তৃত সমতল জমির মাটি সংগ্রহ করা উচিত। মাটি তোল্‌বার আগর (Auger) ব্যবহার করা ভাল। যেখানকার মাটি নিতে হবে, সেখানকার ঘাস সরিয়ে আগর ঘুরিয়ে ৬।৭ ইঞ্চি বসাতে হবে। তার পর সেটাকে টেনে উঠালেই খানিকটা মাটি উঠে আস্‌বে। এই রকমে ১০।১৫ ফুট অন্তর ৬।৭ টা গর্ত্তের মাটি সংগ্রহ করে মিশাতে হবে। এর আন্দাজ তিন ছটাক মাটি নিলে সেটা Surface Soil এর নমুনা হবে।

এখন আবার সেই গর্ত্তগুলোর কাছে গিয়ে আগর দিয়ে চেঁচে চেঁচে গর্ত্ত একটু বড় করতে হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, নীচেকার মাটি তোলবার সময় যেন উপরকার মাটি তার সঙ্গে চলে না আসে। এখন আগর ঘুরিয়ে ২৭ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মাটি তুল্‌তে হবে। নীচের মাটি শক্ত থাক্‌লে একেবারে তোলা যায় না। তিন চারিবারে তুল্‌তে হয়। সব গর্ত্ত থেকে এই রকম করে মাটি নিয়ে, আগেকার মত মিশিয়ে তবে তিন ছটাক আন্দাজ সংগ্রহ করে রাখলে, Sub-Surface Soil এর নমুনা পাওয়া যাবে।

মাটি পাঠাবার সম্বন্ধে মোটামুটি সব খবরই দিলুম। যদি কেউ চেষ্টা করে পাঠান তবে, জমির উন্নতি সম্বন্ধে যা কর্ত্তব্য আমি তাঁকে জানাতে পারবো। চিঠির হিসাবে মাটি প্যাক্ করে পাঠালে আধসেরে বোধ হয় ৪।৫ টাকা খরচ লাগে, কিন্তু Parcel পোষ্টে পাঠালে বোধ হয় প্রত্যেক

সেরে বারো আনার বেশী—খরচ হবে না। সকল পোষ্ট আফিসেই এর সন্ধান পাওয়া যাবে।

কাল এখানে একজন ভারতবর্ষীয় ছেলে এসেছেন। তাঁর নাম, বি, ডি, পাঁড়ে—বাড়ি আল্‌মোড়া। তিনি আমার সঙ্গেই জাপানে এসেছিলেন। তার পর আমরা যখন আমেরিকার জন্যে জাপান ছাড়্‌লুম তার সপ্তাহখানেক পরে তিনি এখানে আস্‌বার জন্যে বার হয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে, তাঁকে আমেরিকায় নামতে দেয়নি। কাজেই তাঁকে আবার জাপানে ফিরে যেতে হয়েছিল। এক বৎসর সেখানে অনিচ্ছায় বাস করে, এবারে ভালয় ভালয় এসে নেমেছেন। বোধ হয় আমাদের কৃষিকলেজেই পড়্‌বেন। ইতি—১৬ই শ্রাবণ।

সেবক,
শ্রীরথী।

উদ্ভিদের নিদ্রা।

অনেক গাছের পাতা সন্ধ্যার সময় বুজিয়া আসে এবং প্রাতঃকালে দেখা যায় সেগুলি আবার আপনা হইতেই খুলিয়া গেছে। ঝড় বৃষ্টি শীত রৌদ্র কিছুই না মানিয়া, ইহারা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর এক একবার নিশ্চয়ই বুজিবে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ব্যাপারটিকে উদ্ভিদের নিদ্রা (Nyctitropic movements) বলিয়াছেন।

উদ্ভিদজীবনের এই সুপরিচিত বিষয়টির বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলে, আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, আলোকপাত করিলে আমরা পাতার যে সকল নড়াচড়া দেখিতে পাই, এটা সে রকমের ব্যাপার নয়। যে দিক হইতে আলোক ফেলা যায়, সাধারণতঃ সেই দিক্ অনুসারে পাতার নড়-চড় হয়। কিন্তু উদ্ভিদের নিদ্রার জন্য পাতার যে সঞ্চলন, তাহা আলোকপাতের দিকের (Direction) উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ আজ সন্ধ্যার সময় যে পাতাটিকে নীচে নামিয়া বা উপরে উঠিয়া বুজিতে দেখিলে, আলোক যে দিক্ হইতেই পড়ুক না কেন, প্রতিদিনই তাহাকে অন্যকার মতই বুজিতে দেখিবে। সুতরাং পাতার সাধারণ সঞ্চলন হইতে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পৃথক।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ উভয়ের মধ্যে এই প্রকার এক স্বাতন্ত্র্য আনিয়া, নিদ্রাকে উদ্ভিদদেহের এক বিশেষ কার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আমাদের স্বদেশবাসী জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া—বহু প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের নানা ভ্রম দেখাইয়াছেন।

যে সকল পাঠক আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, গাছের ডালপালার আঁকাবাঁকার তিনি একটিমাত্র কারণ দেখাইয়াছেন। গাছের ডগা বা পাতার মূলের (pulvinus) উপর ও নীচের পিঠ যখন বিভিন্ন মাত্রায় উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল আলোক বা তাপ ইত্যাদির উত্তেজনায় আমরা ডালপাতার নড়াচড়া দেখি। কারণ এ অবস্থায় অধিক উত্তেজনশীল পিঠ, কোন প্রকার উত্তেজনা পাইলেই অপর পৃষ্ঠের তুলনায় অধিক সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কাজেই তখন ডাল বা পাতাগুলি না বাঁকিয়া থাকিতে পারে না। আচার্য্য বসু মহাশয় এই ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়াই গাছের নানা অংশের নানা প্রকার সঞ্চলনের ব্যাখ্যান দিয়াছেন, এবং এখন ইহাকেই অবলম্বন করিয়া গাছের নিদ্রারও ব্যাখ্যান দিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোকপাতে গাছের পাতার নড়াচড়া এবং নিদ্রাকালে সেগুলির বুজিয়া যাওয়াকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আচার্য্য বসু মহাশয় ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন, প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি সত্যই নিদ্রা ব্যাপারটা উদ্ভিদদেহের এক বিশেষ কার্য্য হইত, এবং আলোকের প্রাখর্য্যের পরিবর্ত্তন যদি তাহার কারণ হইত, তবে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবা মাত্র আমরা খোলা পাতাগুলিকে চোখের সাম্‌নে সদ্য সদ্য বুজিতে দেখিতাম। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃক্ষপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় দেখিয়াছেন, যতই বেলা বাড়িতে আরম্ভ করে, পাতাগুলিও ততই এক একটু করিয়া বুজিয়া আসে; এবং শেষে সন্ধ্যার সময় তাহারা একবারে বুজিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বোঁজার কাজটা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদেই চলে, এবং দিনের শেষে

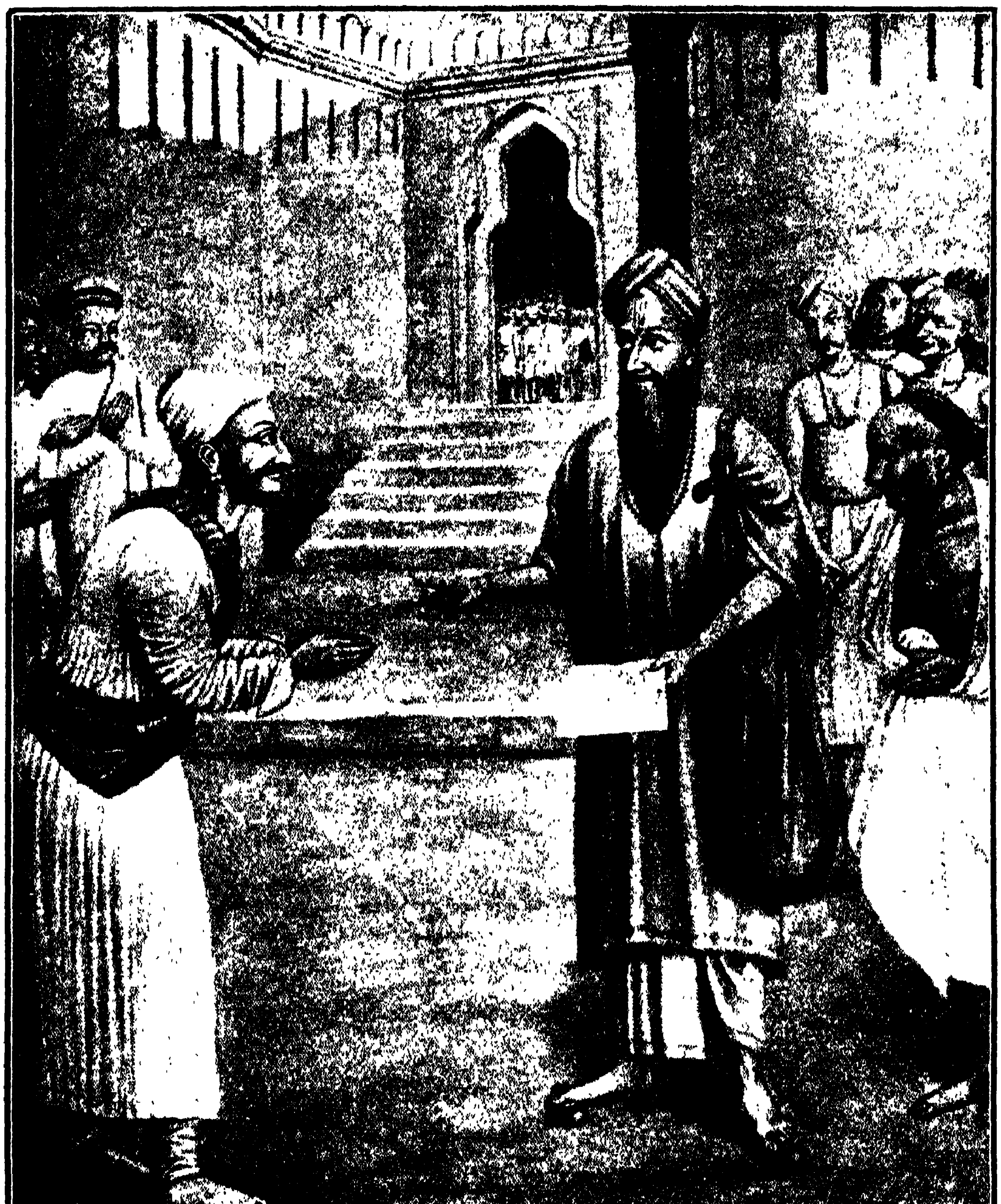

রামদাস স্বামীকে শিবাজীর রাজ্যভিক্ষা দান

সেই কাজটা চরমে পৌঁছিয়া পাতাগুলিকে একবারে মুদিত করিলে, তখন তাহা আমাদের নজরে পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, আলোকের প্রাখর্য্যের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সহিত বৈজ্ঞানিকগণ পাতার নিমীলনের যে সম্বন্ধ অনুমাণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সত্যই ভুল।

প্রচলিত সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, সূর্য্যাস্তকাল হইতে পরদিনের উদয়কাল পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ সময় চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, সে সময় পাতাগুলিও জোট্ বাঁধিয়া সুষুপ্ত থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাহা দেখা যায় না। রাত্রি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, পাতাগুলিও ততই খুলিতে আরম্ভ করে, এবং শেষে প্রভাত হইলে তাহারা সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ উন্মীলনের জন্য অনেক গাছের পাতা প্রভাত পর্য্যন্তও অপেক্ষা করে না। দু'একটি গাছের পাতাকে মধ্যরাত্রিতেই বিকশিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং রাত্রির অন্ধকারকে কখনই উদ্ভিদের নিদ্রা অর্থাৎ পাতা বোঁজার কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য বসু মহাশয় এই প্রকারে পদে পদে প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়াছেন, এবং এখানে অন্ধকারকেই পাতার উন্মীলনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে "স্বতঃ সঞ্চলন" ও "পৌনঃপুনিক সাড়া" (Autonomous movements and multiple response) প্রভৃতি প্রবন্ধে বন-চাঁড়াল (Desmodium Gyran) ইত্যাদি কতকগুলি গাছের পাতা কি প্রকারে আপনা হইতেই উঠা নামা করে তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি এবং ঐ প্রসঙ্গে পাতার উঠা নামার কারণও দেখানো গিয়াছে। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণকে ঐ "স্বতঃ সঞ্চলনেরই" একটা উদাহরণ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, বন চাঁড়ালের পাতা যেমন খুব ঘন ঘন উঠানামা করে, অপর বৃক্ষের পাতাগুলি সে প্রকার না করিয়া চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর উঠিয়া নামিয়া জাগরণ ও নিদ্রার ভাণ করে। বাহিরের উষ্ণতাদির মাত্রা অনুসারে বন চাঁড়াল গাছের পাতার উঠানামা ইত্যাদি নানা পরিবর্ত্তন সুরু হয়, কিন্তু ঐ সকল কারণে উদ্ভিদের নিদ্রাকালের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। ঝড় বৃষ্টি ও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি নানা উপদ্রবের ভিতরও গাছের পাতা অতি ধীরে নামিতে নামিতে সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ নামিয়া ও জোড় বাঁধিয়া সুষুপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, আলোকের উত্তেজনা দ্বারাই যদি উদ্ভিদের নিদ্রা উৎপন্ন হয়, তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে অর্থাৎ যখন আলোকের উত্তেজনা থাকে না, তখনো পাতাগুলি কেন যথা সময়ে বুজিয়া আসে? আচার্য্য বসু মহাশয় এই প্রশ্নটির অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আলোকের উত্তেজনায় গাছের পাতা চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর কি প্রকারে উঠা নামা করে—তাহা জানা আবশ্যক। লাউ বা কুম্‌ড়া গাছের লতানো ডগার উপরের পিঠ ক্রমাগত রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদিতে উন্মুক্ত থাকে বলিয়া, নীচের পৃষ্ঠের তুলনায় এদিক্‌টা অল্প উত্তেজনশীল হইয়া পড়ে। এই লাউডগা লইয়া আলোচনা সুরু করা যাউক।

মনে করা যাউক ঐ লতাটির উপর যেন সোজাসুজি ভাবে সূর্য্যের আলোক আসিয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য সূর্য্যের আলোকের উত্তেজিত করিবার ক্ষমতা আছে। কাজেই বহুক্ষণ ধরিয়া উপরের পিঠে সূর্য্যের আলোক পড়িতে থাকিলে, আলোকের উত্তেজনাটা ডগার ভিতর দিয়া নীচের পিঠে পৌঁছিবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কুম্‌ড়ার ডগার উপরের পিঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক উত্তেজনশীল। এজন্য প্রত্যক্ষ সূর্য্যালোক পাইয়া উপরকার পিঠ যতটা উত্তেজিত হয়, নীচেকার পিঠ পরিবাহিক উত্তেজনায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে। বৃক্ষের কোন অঙ্গ উত্তেজিত হইলে, উহার সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার অস্তিত্ব বুঝা যায়। কাজেই সূর্য্যালোকে যখন ডগার উপরের পৃষ্ঠ অপেক্ষা নীচের পিঠ অধিক উত্তেজিত হইয়া পড়ে, তখন নীচের পিঠের সঙ্কোচের মাত্রাও উপরের তুলনায় খুব বাড়িয়া যায়।

কোন লম্বা জিনিসের নীচেকার পিঠ উপরের পিঠ অপেক্ষা সঙ্কুচিত হইলে, তাহার আকারটা যে কি প্রকার হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এ অবস্থায় তাহার ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়া ব্যতীত আর উপায় নাই। আমাদের উদাহৃত কুম্‌ড়ার ডগাতেও অবিকল তাহাই

ততই ধনুকাকারে বাঁকিয়া মাটিতে মাথা গুঁজিতে আরম্ভ করে।

বৃক্ষপত্রের নামিয়া পড়া ব্যাপারটাও ঐপ্রকারে হইয়া থাকে। যে সকল গাছের পাতা সন্ধ্যাকালে বুঁজিয়া আসে, তাহাদের প্রত্যেক ক্ষুদ্র পাতার মূলের উপরকার ও নীচেকার পিঠ্ উদাহৃত লাউ গাছের ডগার ন্যায় অসম উত্তেজনশীল থাকে। এজন্য যখন সূর্য্যালোক পত্রমূলের উপরকার পিঠে পড়ে, তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না, কিন্তু সেই আলোকের উত্তেজনাই যখন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া নীচের পিঠে পৌঁছায়, তখন তাহাতেই নীচের পিঠ্ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোন জিনিসের কেবল এক পিঠ্ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলে, সেটির ধনুকাকারে বাঁকিয়া যাওয়ারই সম্ভাবনা। এখানেও অবিকল তাহাই হয়। পত্রমূল ধনুকাকারে বাঁকিয়া পাতা সমেত নীচে নামিয়া পড়ে।

আমরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় দেখিয়াছি, বেলাবৃদ্ধির সহিত পাতার নিমীলনও বৃদ্ধি পায়। আচার্য্য বসু মহাশয় ইহারো প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—অলোক প্রথমে পত্রমূলের উপরকার পিঠেই পড়ে। কিন্তু এপিঠ্টা তত উত্তেজনাশীল নয়, কাজেই আলোক পড়িবা মাত্র উত্তেজনার কার্য্য দেখা যায় না। কাল ক্রমে আলোকের উত্তেজনা উপর হইতে নীচের পিঠে পরিবাহিত হইয়া আসিলে পর তাহারি সঙ্কোচ দ্বারা উত্তেজনার কার্য্য প্রকাশ পায়। আলোক পড়িবা মাত্র পরিবাহিত হইয়া, নীচে আসে না। বৃক্ষ বিশেষে এবং বৃক্ষের অঙ্গের অবস্থা বিশেষে পরিবাহনকালের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সুতরাং আমরা যে গাছের পাতাগুলিকে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতে দেখিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আচার্য্য বসু মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান হইতে বেশ বুঝা যায়, সন্ধ্যায় আলোকের তেজ কমিয়া আসায় বৃক্ষপত্র সুষুপ্ত হয় না। সমস্তদিনের আলোকের উত্তেজনা পত্রমূলের (pulvinus) উপরপিঠ্ হইতে নীচের পিঠে আসিয়া, সন্ধ্যাকালেই ঐ পিঠের সঙ্কোচের মাত্রা খুব বাড়াইয়া তুলে বলিয়া, আমরা ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাতাগুলিকে সুপ্ত হইতে দেখি। রাত্রিতে আর আলোকের উত্তেজনা থাকে না। সঙ্কুচিত পত্রমূলের বিকৃত অণুসকল প্রকৃতিস্থ হইবার বেশ সুযোগ পাইয়া যায়। আণবিক বিকার কাটিয়া গেলেই পত্রমূলও সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পায়। এজন্য সূর্য্যালোক বিরহিত রাত্রিই বৃক্ষপত্রের জাগরণ আনিয়া দেয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রভাত-সূর্য্যের আলোকেই বৃক্ষের পাতা খুলিয়া দেয় বলিয়া যে একটা কথা আছে তাহা ভুল। পরীক্ষা করিলে কতক গাছের পাতাকে মধ্যরাত্রেই উন্মীলিত হইতে দেখা যায়, আবার কতকগুলিকে রাত্রিশেষে বা প্রভাতেও খুলিতে দেখা গিয়া থাকে। আচার্য্য বসু মহাশয় এই উন্মীলন কাল লইয়াও গবেষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে জানা গেছে, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অলোকের যে উত্তেজনাটা বৃক্ষদেহে পতিত হয়, তাহার সকলি পাতাগুলিকে নামাইতে ব্যয়িত হয় না। উহার কতক অংশ উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং ইহাই শেষে নীচু ও বিকৃত পাতাগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ করিয়া উঁচু করাইবার জন্য ব্যয়িত হয়। সুতরাং বাহিরের আলোকের উত্তেজনাকে অন্তর্নিহিত করিবার শক্তি যে সকল গাছের প্রবল, তাহারাই যে সেই সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে নিম্নমুখী পাতাগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র সোজা করিয়া তুলিবে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। শক্তি সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা সকল গাছের সমান নয়, কাজেই সুষুপ্তির কালও সকল গাছে সমান দেখা যায় না। যে গাছ যত অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে, আলোকের উত্তেজনাকে সে তত শীঘ্র পরাভব করিয়া জাগরিত হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে, পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, আচার্য্য বসু মহাশয় লজ্জাবতীর পাতার উঠানামা, বনচাঁড়াল গাছের পাতার নৃত্য এবং উদ্ভিদের নিদ্রা প্রভৃতি যে, একই ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিবা মাত্র, তাহার পত্রমূলের উত্তেজনায় পাতাগুলি যেমন বুজিয়া যায়, এবং উত্তেজনার ধাক্কা সাম্‌লাইয়া লইলে সেগুলি যেমন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়, উদ্ভিদের নিদ্রা ব্যাপারটাও অবিকল তাই। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল প্রভৃতি গাছের পাতার উঠানামা

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়, কিন্তু নিদ্রাজাগরণ শেষ হইতে চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মেঘাচ্ছন্ন দিনে যখন আলোকের উত্তেজনার লেশমাত্র নাই, তখনো গাছের পাতা ঠিক্ সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণ মুদিত হইয়া পড়ে। ইঁহার কারণ সম্বন্ধে আচার্য্য বসু মহাশয় কি বলেন, এখন আলোচনা করা যাউক। বসু মহাশয় সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে লজ্জাবতী লতা আবদ্ধ রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ঘরে অণুমাত্র আলোকের অস্তিত্ব ছিল না। তথাপি লতাটি যেন অভ্যাসের বসে ঠিক সন্ধ্যার সময় পাতা গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এবং তারপর যথাসময়ে পাতা খুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল।

আচার্য্য বসু মহাশয় সত্যই অভ্যাসের বসে ঐ ব্যাপারটি সংঘটিত হয় বলিয়া ব্যাখ্যান দিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা।

মনে করা যাউক একখণ্ড তারের দুই প্রান্ত খুব দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তাহাকে বামে ও দক্ষিণে কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘন ঘন মোচড় দেওয়া গেল। প্রথমকার দু'চার মোচড়ে একটু বলপ্রয়োগের আবশ্যক হইবে। কারণ প্রথম অবস্থাতেই তারের অসাড় অণুগুলি এপ্রকার মোচড়ে অভ্যস্ত হইতে পারে না, কাজেই ঐ নাড়াচাড়া সড়গড় করিয়া লইতে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া যাইবে। অণুগুলি বেশ সচল হইয়া দাঁড়াইলে, যদি মোচড় দেওয়া বন্ধ করিয়া তারটিকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে সেটি তখনো আপনা আপনিই বামে দক্ষিণে মোচড় খাইতেছে।

এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, বলপ্রয়োগে জোর করিয়া অণুগুলিতে আন্দোলন সুরু করিলে, তাহার কিয়দংশ সমবেত অণুতে মুদ্রিত হইয়া গুপ্তাবস্থায় থাকে; এবং তার পর বলের প্রয়োগ রহিত করিবা মাত্র, সেই গুপ্ত শক্তিই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, অণুগুলিকে অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় নাড়া দিতে আরম্ভ করে।

আলোকের উত্তেজনা সম্পূর্ণ রহিত হইলেও যে, গাছের পাতার নিদ্রা ও জাগরণ দেখা যায়, জড়ের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মটি অবলম্বন করিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় তাহার ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, গাছের পাতাগুলি প্রায় প্রতিদিনই উঠানামা করিয়া, পত্রমূলের অণুগুলির অবস্থা ঠিক্ উদাহৃত তারের অণুর মত করিয়া তুলে। কাজেই মেঘাচ্ছন্ন দিনে বা অন্ধকার ঘরে যখন আলোকের উত্তেজনা মোটেই থাকে না, তখনো পূর্ব্বের সেই অভ্যাস বশতঃ অণুগুলি আন্দোলিত হইয়া গাছের পাতাগুলিকে ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায় উঠাইতে ও নামাইতে আরম্ভ করে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

লুথার বরব্যাঙ্ক।

১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"তে "বৈজ্ঞানিক যাদুকর" শীর্ষক প্রবন্ধে যে অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষশ্রেষ্ঠের বিস্ময়জনক কার্য্যকলাপের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাঁহার জীবন কাহিনী বিবৃত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যে মতিমান মানব সার্দ্ধদ্বিসহস্রের অধিক উদ্ভিদের সংস্কার সাধন করিয়াছেন এবং বহুবিধ নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, যিনি অনেক অখাদ্য ও অনিষ্টকর ফলাদিকে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া জগতের খাদ্যভাণ্ডারের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যিনি নানা প্রকার নূতন পুষ্পের সৃষ্টি করিয়া ও অনেক পুরাতন পুষ্পের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া জগতের সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন, তাঁহার জীবনী হইতে আমাদের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। এই মহাপুরুষের নাম লুথার বরব্যাঙ্ক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বরব্যাঙ্কের ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি সামান্য স্কুলের শিক্ষা মাত্র লাভ করিয়া বহু অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিয়া জগতে সন্মানার্হ হইয়াছেন। দারিদ্র্যজনিত শারীরিক কষ্ট এবং লোকের অযথা বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও অধ্যবসায়বলে তিনি আজ কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন। তিনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বরাবর সংযতচিত্ত থাকিয়া পৃথিবীর উপকার সাধনার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন।

লুথার বরব্যাঙ্ক খৃষ্টীয় ১৮৪৯ সালের ৭ই মার্চ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের মাসাচুসেট্‌স্ বিভাগের ল্যাংকাষ্টার নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতা জাতিতে ইংরাজ এবং মাতা স্কচ ছিলেন। তিনি পিতা হইতে সাতিশয় অধ্যয়নস্পৃহা এবং

মাতা হইতে সচেতন পদার্থের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর তৎপ্রতি অনুরাগ লাভ করিয়াছেন। বাল্যাবধি বরব্যাঙ্ক পুষ্প ও সকল জাতীয় উদ্ভিদ ভাল বাসেন। শিশুকে কোন দ্রব্য দিলেই সে তাহা ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করে; কিন্তু বরব্যাঙ্ক এ বিষয়ে অতি শৈশব হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন তিনি দোলায় শুইয়া থাকিতেন তখন যদি কেহ তাঁহার হাতে একটি ফুল দিত তাহা হইলে তিনি বাল্যস্বভাবসুলভ আনন্দের সহিত সেটীকে ধারিয়া থাকিতেন এবং যতক্ষণ না উহা শুষ্ক বা গন্ধহীন হইয়া যাইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি উহাকে ছিঁড়িতেন না বা ফেলিয়া দিতেন না। সাধারণতঃ শিশুগণ কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়; কিন্তু বরব্যাঙ্ক বৃক্ষলতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত পৃথিবীর সুন্দর বস্তুর প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ বাড়িয়া আসিয়াছে।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া বরব্যাঙ্ক স্বীয় অধ্যয়নস্পৃহা দ্বারা শিক্ষকগণকে চমৎকৃত করিলেন। পুস্তক পাঠেচ্ছা তাঁহার এত প্রবল ছিল যে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রকৃতির বাহ্যবস্তু বিষয়ে তিনি এত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে এত অল্প বয়সে অন্য বালকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন সে সমস্তই তিনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। এ অভ্যাস তাঁহাতে চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছে। কোন নব প্রকাশিত উপন্যাসের নায়কনায়িকার বিষয় তিনি কিছু না জানিতে পারেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান জগতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সমস্তই তাঁহার জানা আছে এবং প্রত্যেক আবিষ্কৃত তথ্যকে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যবচ্ছেদ করিয়া বুঝাইতে পারেন। বাল্যাবস্থায় বরব্যাঙ্ক যে খেলাধূলা ভাল বাসিতেন না তাহা নহে, অনেক সময় তিনি অন্তরের সহিত খেলায় যোগ দিতেন; তবে খেলা অপেক্ষা পুস্তকপাঠ তাঁহার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আবার কবিহৃদয় যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ও প্রাকৃতিক জগতের মাধুর্য্য দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইত।

স্কুলের পাঠ শেষ হইলে বরব্যাঙ্ক কিছুদিন ল্যাঙ্কাষ্টারের একাডেমিতে পড়িয়াছিলেন। শীতকালে তথায় পড়িতেন এবং বৎসরের বাকী অংশে কোন কারখানায় কাজ করিতেন। ল্যাঙ্কাষ্টারে একটী ভাল বড় পুস্তকালয় ছিল; অবসর পাইলেই বরব্যাঙ্ক পুস্তকালয়টীতে যাইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার পিতার সযত্ন মনোনীত পুস্তকগুলিও পাঠ করিতেন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য আমেরিকার দার্শনিক কবি ইমারসনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এখনও বরব্যাঙ্ক ইমারসনের গ্রন্থ পড়িতে ভালবাসেন; বস্তুতঃ তিনি ইমারসনের গ্রন্থ যত পড়িয়াছেন অন্য কাহারও গ্রন্থ তত পড়েন নাই। তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্ এগাসিজের বন্ধু ছিলেন; পরে নিজেও একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হইয়াছিলেন। এইরূপ সংসর্গ লুথার বরব্যাঙ্কের ভবিষ্য জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

বালক বরব্যাঙ্ক যখন কারখানায় কাজ করিতেন, সেই সময় এক দিন তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। তাঁহার বয়োবৃদ্ধেরা একটী তৃণচ্ছেদনকারী যন্ত্রের অংশগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছিলেন, কিন্তু কোন মতেই একটী অংশকে ঠিক স্থানে বসাইতে পারিতেছিলেন না; বরব্যাঙ্ক নিকটে ছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া উক্ত অংশটীকে যথাস্থানে বসাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া সকলে সাশ্চর্য্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে এ লৌহখণ্ডটী এই স্থানের?" বরব্যাঙ্ক উত্তরে বলিলেন, "কেন, আমি দেখিলাম আপনারা ইহাকে অন্য স্থানে বসাইতে পারিলেন না।"

কারখানায় কাজ করিয়া বরব্যাঙ্ক অল্প যাহা পাইতেন তাহাতে তাঁহার চলিত না। এইজন্য তিনি এমন উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রয়াসী হইলেন যদ্দ্বারা বার জন লোকের কাজ একজন দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। অবশেষে তাঁহার উদ্যম ফলবান হইল; তিনি এমন একটী কল প্রস্তুত করিলেন যাহা দ্বারা তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইল। ইহাতে তাঁহার পদোন্নতি অর্থোন্নতি উভয়ই হইল। সকলে তাঁহাকে এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কল নির্ম্মাণ করা ছিল না। তিনি বন্ধুগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। কল কারখানার কাজ আর বরব্যাঙ্কের ভাল লাগিল

না। তিনি এ কাজ ছাড়িলেন, এবং শস্য ও বীজোৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। একাজটী তাঁহার স্বভাবানুযায়িক এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল ছিল। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই বৃক্ষলতাদির প্রকৃতিগত লক্ষণ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোলআলুর বীজ উৎপাদন করিবার সময় তিনি দেখিলেন কতকগুলি আলুর হরিদ্বর্ণ উপরিভাগে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে কেবল একটীতেই বীজগোলক রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে যদি এই বীজগোলককে রোপণ করা যায় ত ইহা হইতে উদ্ভূত আলুগুলির মধ্যে আরও অধিক বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইবে। এই পরীক্ষা হইতেই বরব্যাঙ্ক নামক উৎকৃষ্ট আলুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই আলুর বীজগোলক বরব্যাঙ্ক দেড়শত ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪৭০ টাকায় বিক্রয় করিলেন। এই আলুর চাষ করিয়া অন্যান্য অনেক শস্য ব্যবসায়ীরা বিশেষ লাভবান হইল। মার্কিনজাতি এই বরব্যাঙ্ক-আলু হইতে ২ কোটী ডলারের অধিক অর্থাৎ ৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার অধিক লাভ করিয়াছে। আলুর চাষের যেরূপ অবনতি হইতেছিল, আলু যেরূপ ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইতে অপকৃষ্টতর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে শীঘ্রই আলুর বিশেষ অভাব হইবে। বরব্যাঙ্ক-আলুর সৃষ্টি হওয়ায় লোকের ধারণা একেবারে দূর হইয়াছে; এখন অভাব হওয়া দূরে থাকুক, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট আলু উৎপন্ন হইতেছে।

বীজোৎপাদন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার অল্পদিন পরেই বরব্যাঙ্ক সূর্য্যের উত্তাপে কাজ করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই জন্য তিনি স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিলেন। কালিফর্ণিয়ায় এই সময়ে নূতন বসবাস আরম্ভ হইয়াছিল এবং তথাকার জলবায়ুও গৃহের বাহিরে কাজ করার পক্ষে অনুকূল। অতএব বরব্যাঙ্ক কালিফর্ণিয়ায় যাইয়া বাস করা স্থির করিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কালিফর্ণিয়ায় উপনীত হইলেন। এখানে চাষবাসের উপযোগী অনেক জমি ছিল; কিন্তু জমি ক্রয় করিয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার মত সংস্থান বরব্যাঙ্কের তখন ছিল না। তিনি অন্য কাহারও বাগানের সাহায্য করিয়া কিছু সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন কালিফর্ণিয়ার উর্ব্বরতা উৎপাদকতা বিষয়ে লোকে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল না; এই জন্য যাহারা অল্পস্বল্প চাষবাস করিতেছিল তাহারা বরব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া কার্য্য বিস্তার করিতে ভরসা করিল না। বরব্যাঙ্কের অল্প পুঁজি ক্রমে নিঃশেষ প্রায় হইয়া আসিল। কাজেই তাঁহাকে ছোট কাজ করিয়া অতিকষ্টে জীবন রক্ষা করিতে হইল। এই সময় তাঁহাকে এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে যে মাথা রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত পান নাই। একবার তিনি একজনের মুরগীর বাসা পরিষ্কার করিবার কাজ পাইলেন; ইহাতে তিনি যাহা কিছু পাইতেন তদ্দারা কেবল আহারেরই সংস্থান হইত, ঘর ভাড়া করিয়া থাকিবার পয়সা কুলাইয়া উঠিত না; কাজেই তাঁহাকে সেই মুরগীর বাসাতেই রাত্রিযাপন করিতে হইত। এইরূপ নানা কষ্টে পড়িয়া তিনি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। এ অবস্থায় একটী প্রতিবেশিনী করুণহৃদয়া রমণীর সাহায্য না পাইলে বরব্যাঙ্ক রোগমুক্ত হইতে পারিতেন না। রমণীটীর অবস্থাও ভাল ছিল না; কিন্তু তিনি আপনার পুত্র কন্যাগণকে বঞ্চিত করিয়াও বরব্যাঙ্ককে প্রত্যহ এক পাইণ্ট দুগ্ধ খাওয়াইতেন। রোগমুক্ত হইবার পর বরব্যাঙ্কের ভাগ্য কিছু প্রসন্ন হইল। তিনি ক্রমে যে দুএকটা কাজ পাইলেন তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন। এই সঞ্চিত অর্থদ্বারা তিনি একটু জমি ক্রয় করিয়া স্বাধীনভাবে বৃক্ষ ফল ও বীজ উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

একদিন তাঁহার নিকট বিশ সহস্র কুল (Prune) গাছের চারা যোগাইবার কাজ আসিল। চারাগুলি নয় মাসের মধ্যে দিতে হইবে। সাধারণতঃ কুলের চারা প্রস্তুত করিতে আড়াই হইতে তিন বৎসর লাগে; কিন্তু বরব্যাঙ্ক নয় মাসের মধ্যই দিবার ভার লইলেন। যে সময়ে তিনি এ ভার লইলেন সে সময়ে এক বাদাম গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ রোপণ করিলে তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কারণ বাদাম গাছ খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। তিনি অনেকগুলি বাদামগাছ রোপণ করাইলেন। যখন বাদাম গাছগুলি বড় হইয়া উঠিল তখন তিনি বিশ সহস্র কুলের অঙ্কুর বাদাম গাছের শাখায় লাগাইয়া দিলেন; বাদাম গাছের সঙ্গে সঙ্গে কুলের অঙ্কুর শীঘ্র গাছে পরিণত হইয়া বাড়িয়া চলিল। নয় মাস পূর্ণ হইতে না হইতে

বিশ সহস্র কুলের চারা তৈয়ার হইয়া গেল। বরব্যাঙ্কের পকেট ডলার পূর্ণ হইল। আজ বিশ বৎসর হইল এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এখনও সেই কুলের বাগান উৎকৃষ্ট কুল উৎপাদন করিতেছে।

এপর্য্যন্ত গাছ, ফল ও বীজ উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করাই তাঁহার কাজ ছিল। কিন্তু ইহা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না; এজন্য একাজ তাঁহার অধিকদিন ভাল লাগিল না। তাঁহার অন্তরের মহৎ উদ্দেশ্য পুরাতনের সংস্কার করিয়া এবং নানা প্রকার নূতন ধরণের বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিয়া জগতের কল্যাণসাধন করা। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। এতদিন বরব্যাঙ্ক যে কাজ করিতেছিলেন তাহা চালাইলে তিনি প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতে পারিতেন। ইতিমধ্যে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার বার্ষিক আয় দশ সহস্র ডলার অর্থাৎ প্রায় ৩১ হাজার ২ শত ৫০ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু একাজে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। অনেকে কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। সেই দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত নব ফলপুষ্পাদির সৃজন এবং পুরাতনের সংস্কার করাই তাঁহার একমাত্র কাজ হইয়া আসিতেছে। একাজ বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। এ কার্য্যে কিরূপ একাগ্রতা, পর্য্যবেক্ষণ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তাহা নিম্নলিখিত বৃক্ষের তালিকা ও তাহাদের রোপণাদি ব্যাপারের প্রণালী হইতে বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাঁহার পরীক্ষাধীনে তিনলক্ষ নানাপ্রকার কুল, ষাট হাজার নানাবিধ পীচ, পাঁচ ছয় হাজার নানা রকম বাদাম, হাজার লাল আলু, দুহাজার নাশপাতী, এক হাজার আঙ্গুর, তিন হাজার সেব, এক হাজার বিহিদানা, পাঁচ হাজার আখ্‌রোট, এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক ফলের গাছ রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় ফলের চারা গাছগুলির মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির হইল, সেইগুলিকেই রাখা হইল, এবং বাকীগুলিকে একেবারে বিনষ্ট করা হইল। যে সকল গাছ এইরূপে বাছিয়া রাখা হইল, তাহাদের শাখাগুলিকে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তাহাদের সমশ্রেণীর কোন বড় গাছের শাখার স্থানে স্থানে বসান হইল। ক্রমে এই টুকরাগুলি এক একটী বৃক্ষে পরিণত হইল; ইহাতে প্রায় দুই তিন বৎসর সময় লাগে। এই সকল নূতন বৃক্ষের মধ্যে আবার যেগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল সেই গুলিকেই রক্ষা করা হইল। যতক্ষণ না এই রক্ষিত বৃক্ষগুলির ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় ততক্ষণ এইরূপ পরীক্ষা চলিতে থাকে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও মনোমত না হইলে বৃক্ষের চারা বা ফলের বীজ বিক্রয় করা হয় না। এইরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থের প্রায় সমস্তই উক্তরূপ পরীক্ষাকার্য্যে ব্যয় হইয়া যায়। ইহা হইতে বরব্যাঙ্কের কিছুই সঞ্চয় হয় না। এরূপ আত্মত্যাগ কয়জন করিতে পারেন? বরব্যাঙ্কের আত্মত্যাগের, তাঁহার অমানুষিক পরিশ্রমের ফল অন্য পাঁচজনে ভোগ করিতেছে; তাঁহার আত্মোৎসর্গ দ্বারা তাঁহার দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইতেছে। তাঁহার সৃষ্ট নূতন ও উৎকৃষ্ট ফলাদির বীজ বপন করিয়া কত শত লোক লক্ষপতি হইয়াছেন এবং হইতেছেন। তাঁহার নিজ দেশ আমেরিকারই বহুলক্ষ ডলার আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে বরব্যাঙ্কের দৈনিক কার্য্যের একটা আভাস দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার এবং আহারাদির বিষয়ে বরব্যাঙ্ক কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন নন। কার্য্যের গুরুত্ব এবং শারীরিক অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে। বৎসরের সকল সময়ই বৃক্ষাদি রোপণ প্রভৃতি কার্য্য সমানভাবে চলে না। কোন কোন সময় বৃক্ষাদির উৎকর্ষবিধান বিষয়ে বিশেষ প্রশস্ত। সে সময়ে বরব্যাঙ্কের হাতে অনেক কাজ থাকে। তখন তিনি সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই শয্যাত্যাগ করেন এবং কয়েক ঘণ্টা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন। সাধারণতঃ তিনি সাতটার সময় উঠেন এবং আটটার সময় প্রাতরাশ ভোজন করেন; কিন্তু যদি পূর্ব্বদিন অধিক পরিশ্রম করায় বিশেষ ক্লান্ত হইয়া থাকেন ত নয়টা বা দশটা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে অধিকক্ষণ ক্রমাগত পরিশ্রম করিলে শরীর ও মনের অধিকক্ষণ সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। কখন কখন প্রাতরাশ ভোজনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাগানের দূর প্রান্ত দেশের দিকে যাইতে দেখা যায়। এ সময় বাগানের স্থানে স্থানে অনেক লোক বিশেষ বিশেষ

কার্য্যে ব্যাপৃত। কেহ তৃণাদি জঙ্গলী আগাছা নিড়াইয়া ফেলিতেছে; কেহ জমিতে কোন বিশেষ প্রকারের মাটী দিতেছে; কেহ বা চারাগাছ একস্থান হইতে তুলিয়া অন্য-স্থানে পুতিতেছে। এ সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান বরব্যাঙ্ককে করিতে হয়। প্রাতে হয় ত একবার সব কাজকর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া খাইয়া প্রাতরাশ ভোজন করেন। প্রাতরাশ ভোজন শেষ হইলে দু'এক ঘণ্টা পত্রাদি লেখায় ক্ষেপণ করেন। এক সময় ছিল যখন তিনি সব পত্রের উত্তর স্বহস্তে লিখি-তেন; কিন্তু এখন এত পত্রাদি আইসে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের উত্তর দানের ভার অন্যহস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই বরব্যাঙ্কের নিকট পত্র আসে। বৎসরে ৪০ সহস্রের অধিক পত্রের উত্তর তাঁহাকে দিতে হয়। একবার দুই মাসের মধ্যে ১৫ হাজার পত্র আসিয়াছিল। কখন মধ্যাহ্নভোজন বেলা একটার সময় সমাধা হয়, কখন বা তিন চারিটার সময় হয়। অনেক সময় অপরাহ্নেও কিছুক্ষণ পত্র লেখায় ব্যয়িত হয়। তাহার পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণাদি কার্য্য চলিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে একটী শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ধীরে ধীরে যাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। বরব্যাঙ্ক প্রায়ই রাত্রি নয়টার মধ্যে শয়ন করেন।

দিনের পর দিন বরব্যাঙ্ক লোকহিতের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছেন। ৩৫ বৎসরের মধ্যে তিনি কখনও এককালে একমাস কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। তিনি ইউরোপের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ফল পুষ্পের উৎকর্ষসাধন অনেকেই করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু বরব্যাঙ্ক যেরূপ প্রকৃতির অভিব্যক্তি-ক্রম ও নিয়মপরম্পরা অসীম অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের সহিত আনুপূর্ব্বরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি যত নূতন রূপের বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, অথাদ্য অনিষ্টকর ফলকে তৃপ্তিকর মধুর ভোজ্যপদার্থে রূপান্তরিত করিয়াছেন, সেরূপ অন্য কেহ করে নাই। অতএব বিজ্ঞান জগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ; তিনি একজন অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ।

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।

ঐ মুখখানি।

"ওগো, রাণি, শুনেছ ?"

"না, কি ?"

"সেই যে একজন কে ঘোমটার উদ্দেশে লিখেছিল,—

রাহু যে চাঁদেরে ছাড়ে
শুধু চাঁদ বলে,
সেও না ছাড়িত বুঝি
চাঁদমুখ হলে;

তা তোমাদের ঘোমটাও এবার স্বকার্য্যে শিথিল হয়ে পড়েছিল, চাঁদমুখখানি চুরি হয়ে গেছে।"

"সে কি রকম ?"

"আজ Englishmanএ লিখেছে যে সে দিন যে তোমরা সব স্ব স্ব গৃহ আঁধার করে প্রদর্শনীতে ফুটে উঠে-ছিলে, তা একজন সাহেব টের পেয়ে এক হাতক্যামেরার সাহায্যে সকলকে তুলে ফেলেছে; হেম বাবুর যত চাঁপা, শতদল, অপরাজিতা, চামেলি, মল্লিকা, একধার হতে সব filmএ ফুটিয়ে নিয়েছে, কাউকে বাকী রাখেনি,—

Blest be the art that can immortalise !"

আমার স্ত্রী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "নাও, রঙ্গ রাখ, সত্যি বল কি হয়েছে ?"

আমি বলিলাম, "আর হবে কি,—তোমাদের সব ছবি তুলেছে,—কেউ অবগুণ্ঠনবতী, কেউ অবগুণ্ঠনহীনা, কেউ মুগ্ধ নয়নে সাবানের তাজ দেখিতেছেন, কেউ পুরান সখীর সহিত অনেক কাল পরে দেখা হয়েছে গল্প জুড়ে দেছেন, কেউ স্ত্রীস্বভাবসুলভ কলহামোদে প্রবৃত্ত হয়েছেন, নানা রঙ্গে ভঙ্গে তোমাদের immortalise করেছে।"

"তারপর ?"

"তারপর, ভয় নাই, আর কিছু বড় করতে পায় নাই, চৌধুরী আপত্তি করায় filmগুলা তাঁকে দিয়াছে; সে সব negative আর develop ও print হবে না।"

আমার স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন, "বাঁচলুম।" তাহার পর একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এ রকম করে যে সে কি আমাদের 'বে-আব্রু' কর্ত্তে পারে ?"

আমি বলিলাম, "রাণি, 'আব্রু' ত তোমাদের হাতে,

তোমরা 'বে-আব্রু' না হলে জোর করে আর তোমাদের কে 'বে-আব্রু' করবে ?"

"না, তা নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই মনে কর যে, যদি আমার অজান্ত কেউ আমার ছবি তোলে, তা সে ছেপে সকলকে দেখাতে পারে কি ?"

উকীলের স্ত্রী বটে। আমি এবার হাসিয়া বলিলাম, "প্রশ্ন আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর উপযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নাই, তবে প্রশ্ন কিছু কঠিন। তা কথাটা সোজাই হোক আর শক্তই হোক, 'ফী' না দিলে ত আমি মত দিনা, তুমি জান।"

'ফী' তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইল।

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি ত সকল সময়ই তত্ত্ব আর স্বত্ব নিয়ে থাক, তা আজ আমিও দুটা আইনের কথা শুনব, ঘোমটা-স্বত্বটা কিরূপ ব্যাখ্যান কর।"

আমি বলিলাম, "তবে অবধান কর। তুমি আইনের কথা শুনতে চা'চ্ছ, তাই বলি। এই পর্দ্দা system, যাকে ভাল বাঙ্গলায় বলে, 'অবরোধপ্রথা,' সেটা কবে হল, কি করে হল, কেন হল, সে প্রথাটা ভাল কি মন্দ, দেশে থাকবে কি না থাকবে, এ সব কথা আজকের প্রশ্নের উত্তরে irrelevant; অন্য দিন জিজ্ঞাসা করো, কিম্বা—experts দের জিজ্ঞেস করাই ভাল—কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ বা সমাজসংস্কারক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো। আমি একটা fact ধরে আরম্ভ করি। পর্দ্দা আমাদের দেশে অনেক স্থানেই আছে, মেয়েরা সকলের সামনে বেরোয় না, যে সে লোকের যার তার বাড়ীর মেয়েদের দেখবার অধিকার নাই। কিন্তু তা বলেই সর্ব্বত্র আদালতে এই পর্দ্দাপ্রথা সম্মানিত হয় না। গুজরাটে পর্দ্দাস্বত্ব মানা হয় কিন্তু বাঙ্গলাদেশে হয় না। অথচ গুজরাটে মেয়েরা বাঙ্গালীর মেয়েদের মত 'পর্দ্দানিশীন' নহে। আর বোম্বাইয়ে ত কথাই নেই, সেখানে পর্দ্দা বলিয়া কোন জিনিস নাই। বিকালে নানা রকমের রেশমী সাড়ী পরে সমুদ্রের কুলে যখন সুন্দর ফুটফুটে মেয়েগুলি বেড়ায়, তাদের কি সুন্দরই দেখায়, এমন মনোহর দৃশ্য আমি আর কোথাও দেখি নাই! বোম্বাইয়ের রমণী is an artiste in colours, আর তোমরা সব পিঞ্জরাবদ্ধ শুক, artএর চর্চ্চার মধ্যে আলপনা দেওয়া আর 'র‍্যাফেলবধা' ছবিগুলা দেওয়ালেতে আঁটা;—না একটু রুচি শুধরেছে, এখন রবিবর্ম্মা হয়েছে।"

"কেন, পিঞ্জরাবদ্ধ কি রকম কিছু বুঝতে ত পারি না। তুমি ত আমাকে কোথাও যেতে বারণ কর না। আমি যে সে জায়গায় যেতে ভালবাসি না, তবে যেখানে যেতে ইচ্ছা হয় সেখানে ত যাই।"

"আমি তোমার কথা বিশেষ করে বলছি না, সাধারণতঃ বাঙ্গালী মেয়েদের কথা বলছি। আমি বুঝতে পারি না যে, যদি সুন্দর একটি জিনিস হয় ত তাকে আলমারিতে চাবিবন্ধ করে কেন রেখে দেব। আর যদি সুন্দর নাও হয় তবু পরমেশ্বরের সৃষ্টি ত বটে।

মালঞ্চে ফুল আপনি ফোটে, বাস বিলাতে চায়,
উষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাখা গায়।

ধর, একটি সুন্দর গোলাপফুল ফুটেছে, আমি তাহাকে এনে আমার বক্ষে ধারণ করলুম, কিন্তু তা বলে অন্য পাঁচ জনে তার সৌন্দর্য্য কেন দেখবে না ?"

"ছি! তুমি কি কথা বলছ! বাহিরে বেরুনো এক জিনিস, আর লাজ সরম ধর্ম্ম চরিত্র এ সব অন্য জিনিস। স্বাধীনতার সঙ্গে যথেচ্ছাচারিতাকে ভুল করো না। এমন করে পর্দ্দা তুলোনা যে—"

"অন্যের touch defile করে? তা তুমি ঠিক বলেছ। তোমাদের ফুলের সঙ্গে আর তুলনা করব না।—কথার প্রসঙ্গে কোথায় এসে পড়লুম দেখ। আমি বলছিলাম যে বাঙ্গালাদেশে পর্দ্দাস্বত্ব স্বীকৃত হয় নাই। একজন মুসলমান জজ এ বিচার করে গেছেন। পশ্চিমের অপেক্ষা বাঙ্গলা-দেশে পর্দ্দাটা যে কিছু কম তা ত দেখতে পাই না, সহরে ত কম নয়, পল্লিগ্রামে, যেখানে সকলেই সকলের মাসী পিসী বোন বউদিদি, সে রকম আঁটাআঁটি নাই বটে। তা পশ্চিমেও গ্রামে সহরের মতন হাঁফলাগা মত পর্দ্দার সৃষ্টি নাই। তবে সম্ভ্রান্ত ঘরে, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে, মেয়েরা একটু বড় হলে আর নিজেদের চাঁদমুখ কোন কালামুখকে দেখতে দেন না। কিন্তু এদেশে পর্দ্দাস্বত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বিশ বৎসর হতে চলল স্যর জন্ এজ্ মহমুদ সাহেবের সঙ্গে বসে বিচার করে গেছেন যে পুরাতন প্রথা ও আচার অনুযায়িক উত্তরপশ্চিম প্রদেশে right of

privacy আছে। এই মনে কর আমাদের পাশের বাড়ীওয়ালা এমন করে দোতলায় ঘর তুলিতে পারে না যে তোমাদের সব দেখতে পায়। তোমরা ঐ পিছনের বাগানে বেড়াও, বস; এখন যদি ঐ লোক ওর দেয়ালে একটা জানালা ফোটায়,—এমন একটা জানালা যে তোমরা যদি বাগানে যাও ত তোমাদের দেখতে পাওয়া যেতে পারে,—তাহলে তোমাদের এরূপ পর্দ্দাস্বত্ব আছে যে আমি নালিস করে সে জানালাটা বন্ধ করিয়ে দিতে পারি। এ প্রদেশের ইংরাজ জজেরা এ দেশের লোকেদের স্থানে নিজেদের স্থাপিত করে তাহাদের চোখ দিয়া এ সব জিনিস দেখবার চেষ্টা করেছেন। মধ্যে একটা মোকদ্দমা হয়েছিল তাতে এই প্রমাণ হয় যে দুটা বাড়ী কাছাকাছি অনেক দিন হতে ছিল, আর এক বাড়ীর ছাতে উঠিলে অন্য বাড়ীর ভিতর বার উপর নীচে সব দেখা যেত। এই ছাত ঘিরে একটা দেয়াল দেওয়া হতেছিল আর সেই দেয়ালে কতকগুলি ফোকর রাখা হয়। অন্য বাড়ীটি 'বেপর্দ্দা' হয়ে যা'চ্ছে বলে নালিশ হল। জেলার জজ বলিল যে পূর্ব্বে যতটা 'বেপর্দ্দা' ছিল তার বেশী কিছু হয় নাই। হাইকোর্টে কিন্তু একজন বৃদ্ধ সাহেব জজ একথা মানিলেন না। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে যখন শুধু ছাত ছিল তখন সে ছাতে কেউ উঠ্‌লে সকলে দেখতে পেত, অন্য বাড়ীর মেয়েরা সরে যেতে পারত; কিন্তু এখন ছাতে আড়াল হওয়াতে দুষ্টলোকে অবলীলাক্রমে ওসব মেয়েদের দেখতে পারবে, তাদের পর্দ্দা আর থাকবে কোথায়? ঐ মোকদ্দমায় এই বিচার ঠিক হয়েছিল কি ভুল হয়েছিল আমি বলতে চাই না, তবে আমি উদাহণ স্বরূপ এটা উল্লেখ করলুম। সাহেব জজেরাও তোমাদের পর্দ্দা রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত আর এসব জিনিস দেশী লোকের চোখে দেখতে চান।

"এই গেল একরকম পর্দ্দাস্বত্বের বা ঘোমটাস্বত্বের কথা। কিন্তু এখনও তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়নি। ভারতবর্ষে ও প্রশ্ন এখনও উঠেনি, বিলাতে উঠিলেও পাকারকমে বিচার হয়নি, আমেরিকায় উঠেছে, বিচার হয়েছে, নূতন আইন প্রস্তুত হয়েছে। প্রশ্নটা পূর্ব্বে উঠতে পারত না, কারণ পঞ্চাশী পুরাকালের কথা যদি বল তখন 'ফটোগ্রাফি' ছিল না, আর তার পরের যদি কথা বল তখন instantaneous photography হয় ত উঠে নাই, কিম্বা যদি উঠে থাকে তার বহুল প্রচার হয় নাই। Stand cameraয় তোমার বিনা অনুমতিতে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমার ছবি তুলিতে পারে না। আর তুমি যদি পয়সা দিয়া ছবি তোলাও ত সে ছবি তোমার, তুমি বারণ করিলে সে ছবি ছাপিয়া যাকে তাকে 'ফটোগ্রাফর' বেচতে পারে না। কিন্তু যেখানে তুমি জানলে না, অনুরোধ করলে না, অনুমতি দিলে না, পয়সাও খরচ করলে না, আমি একটা হাতক্যামেরা পকেটে নিয়ে যেতে যেতে পথে তোমাকে দেখলাম, মুখখানি পসন্দ হল, ঝাঁ করে একটা focal plane shutterএর exposure দিয়ে ফেল্লুম, কাকপক্ষীও হয় ত টের পেলে না—সে স্থলে তোমার কি স্বত্ব আছে? আমি সেই ছবি মনে কর ছাপ্‌লাম, পাঁচজন বন্ধুকে দিলাম, কাগজপত্রে বেরিয়ে গেল, সাধারণ 'হলে' হোটেলে উঠিল, শেষটা হয় ত সিগারেট বাক্সে কিম্বা কোন দোকানের বিজ্ঞাপনে ঐ মুখখানি শোভা পেতে লাগল,—তুমি কি করতে পার? এই প্রশ্ন। বিখ্যাত উপন্যাসলেখিকা মারি কোরেলির সম্প্রতি এইরূপ দুর্দ্দশা হয়েছিল। আজকাল নানারকম ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড উঠেছে দেখেছ। একজন ঐরূপ পোষ্টকার্ডে নানারূপ বিসদৃশ অবস্থায় মারি কোরেলির মূর্ত্তি ছাপিয়া বেচতে আরম্ভ করেছিল। গ্রন্থকর্ত্রী নালিশ করেছেন, এখনও শেষ ফল কি হ'ল শুনি নাই, তবে ইংলণ্ডে আইনজ্ঞেরা কেহ কেহ বলেছেন যে মানুষের চেহারায় আবার মুদ্রণস্বত্ব কি রকম হতে পারে? তুমি যদি একখানা বই লেখ, তোমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ তাকে (অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত) ছাপতে পারে না। সে বই তোমার জিনিস, তাতে তোমার স্বত্ব আছে, সেই স্বত্বের বিরোধে সেই জিনিসের ব্যবহার আর কেউ কর্ত্তে পারে না। কিন্তু যা তুমি নিজে সৃষ্টি কর নাই, যা পরমেশ্বরদত্ত, তাতে আবার কি রকম স্বত্ব, কি প্রকারের একাধিকার, হতে পারে? এইরূপ বোধ হয় অনেকে ভাবেন।

"আমেরিকায় Miss Roberson একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক ছিলেন—হয়ত এখনও আছেন। কেউ তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর একখানা ছবি তুলে এক ময়দার কলওয়ালাকে বেচে দেয়।

সেই কলওয়ালা ২৫০০০ বিজ্ঞাপন ছাপায়, সবগুলিতে সেই স্ত্রীলোকটির ছবি, তার নীচে লেখা "The Flour of the Family." এই ময়দার বিজ্ঞাপন দেশময় বিতরিত হয়, স্ত্রীলোকটিকে লয়ে লোকে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাহার মনে বড় কষ্ট হয়, শেষটা তার অসুখ পর্য্যন্ত হয়ে পড়ে। সে নালিশ করে যেন সে কলওয়ালা ও ছবি আর ছাপতে না পারে। দুই আদালতে Miss Roberson মোকদ্দমা জেতেন, কিন্তু শেষ আদালতে হারেন। চার জন জজ তাঁর বিপক্ষে মত দেন, তিন জন তাঁর সপক্ষে। তিন আদালতের জজের সংখ্যা গুনিলে তাঁর পক্ষেই অধিক হয়। কিন্তু চীফ্ জষ্টিস্ 'পার্কর' (ইনি একবার বৎসর তিনেক হল আমেরিকার President হবার চেষ্টা করেছিলেন, তোমার মনে থাকতে পারে—লোকটা ভারি পণ্ডিত) বলেন যে এরকম মোকদ্দমা কখন হয় নি, মান ও দ্রব্য (reputation আর property) র জন্যই নালিস হতে পারে, নূতন রকমের একটা স্বত্ব জজেরা সৃষ্টি কর্ত্তে পারেন না, তবে সরকার যদি একটা নূতন আইন জারি করেন সেটা আলাদা কথা। শুধু মনে কষ্ট হলেই ত নালিশ চলে না, যদি একটা right of privacy মানতে হয় ত কেবল ছবি ছাপা আটকালেই ত হবে না, কাহারও আকৃতি প্রকৃতি মানসিক ভাব, পারিবারিক ব্যবহার, কিছুরি বিষয় কেউ লিখতে বা বলতে পাবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর্ত্তে হয়। অনেক লোক আছে যাদের বিষয় নিয়ে পাঁচজন ঘোঁট করলে তারা বড় সন্তুষ্ট হয়; অনেক লোক আছেন যাঁরা public men, জন সাধারণ তাঁহাদের সব কথা জানতে চায়। কি রকম করে একটা নির্দ্দিষ্ট দৃঢ় নিয়ম কর্ত্তে পার? কোথায় line টানবে আর বলবে যে এতটা পর্দ্দা তুলতে পার আর বেশী পারবে না। জজ্ 'গ্রে' বাদীর পক্ষ সমর্থন করে রায় লেখেন। তিনি বলেন যে শুধু বিষয় সম্পত্তি নিয়ে গোল হলেই আদালতের সাহায্য পাওয়া যাবে আর অন্যরূপ কষ্ট হলে পাবে না এ কথা ঠিক নয়। সামাজিক পরিবর্ত্তনে বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে নানারূপ নূতন ধরণের কষ্ট সৃষ্ট হতে পারে, এবং যদি স্বত্ব প্রমাণ হয়, তার প্রতিকার কর্ত্তে হবে। চিরকাল হতে মানুষের একটা কায়িক স্বত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে—কেউ কারু গায়ে হাত তুলতে পারে না, এমন কি অপমানসূচক কিম্বা বিরক্তিজনক ইসারা ইঙ্গিতও কর্ত্তে পারে না,—তবে তার ছবি তুলে চতুর্দ্দিকে বিলুবে কেমন করে? কেউ অন্যের রচনা ছাপাতে পারে না, তবে নিজের লাভের জন্য, বিজ্ঞাপনের জন্য, তার চেহারা ছাপবে কেমন করে? New York-এর আপীল আদালত বড় Strong Court, কিন্তু সাতজন জজের মধ্যে চারজন এ কথা মানলেন না। প্রতিবাদীর জয় হ'ল। কিন্তু এ বিচারে ভবিষ্যতের জন্য সুফল ফলিল। New York Legislature নূতন আইন জারি করিলেন; ওরূপ মোকদ্দমা এবার হলে বাদীর নিশ্চয়ই জয় হবে।

"আর একটি মোকদ্দমা আমেরিকায় হয়েছে তারও উল্লেখ করি। এ মোকদ্দমাটিতে একজন চিত্রকর Pavesich বাদী হন। একটি জীবনবীমা কোম্পানি এক বিজ্ঞাপন বার করেছিল—দুইটি মানুষের ছবি, একটি ঐ চিত্রকরের, তাহার মাথার উপর লেখা "Do it now. The man who did," আর একটি রোগা বিশ্রী দীনহীন চেহারা, তাহার উপর লেখা, "Do it while you can. The man who didn't." আরও লেখা ছিল যে প্রথম মানুষটি ঐ কোম্পানিতে নিজের জীবনবীমা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। Pavesich কখনও ঐ কোম্পানিতে জীবনবীমা করাননি এবং এই বিজ্ঞাপনে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করিলেন। তিনি নালিশ করলেন খেসারা পাবার জন্য। Georgiaর Supreme Court সব-জজ একমত হয়ে—চিত্রকরবাদীর পক্ষে রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বল্লেন প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে সে খানিকটা নিজের জীবনের নিজের নিজস্বের সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ কর্ত্তে পারে, খানিকটা ঢাকা রাখতে পারে। একটা স্বত্ব আছে to be let alone, to have quiet. নিজের মত, নিজের চিন্তা নিজের কল্পনা সকলে ছাপিতে পারে, প্রকাশ কর্ত্তে পারে কিন্তু পরের চেহারা পরের, তাহা নিজের লাভের জন্য প্রকাশ কর্ত্তে পারে না। তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ, সমাজভুক্ত হয়েছ বলেই যে তোমার চেহারা চরিত্র ও আভ্যন্তরীন জীবন সাধারণকে দান করে ফেলেছ এ কোন শাস্ত্রে বলেনা। জজ 'কব়' লিখিলেন, "the right of privacy has its foundation in the instincts of nature," এবং বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে অন্য জজে অন্যরূপ রায় দিয়াছেন।

"সেকালে আমাদের দেশে মুনিদের মত এক হ'ত না, একালে বিচারাসনে অধিষ্ঠিত জজেদের মত এক হয় না। গ্রন্থকারদেরও মত বিভিন্ন প্রকারের। 'কুলি' বলিতেছেন—"

"আমি নজীর চাইনি, আর তোমার 'কুলি' আর 'ষ্ট্রীট্' আর 'পমেরয়' কি বলেছে' তাও জানতে চাহিনি। জানি পাঁচ গণ্ডা বইয়েতে যদি পঞ্চাশ রকম না লেখে ত বইগুলা অত মোটাই বা হয় কি করে। আমি তোমার মত চাই—তুমি কি মনে কর?"

ভাবিলাম স্বামীর মহত্ত্ব স্ত্রী ব্যতীত আর কে বুঝিবে? মনে একটু অহঙ্কারও হইল। বলিলাম, "আমার মত জষ্টিস্ গ্রের' সহিত এক,—তোমার ঐ মুখখানি কখনও হোটেলের দেয়ালে পানের দোকানে টাঙ্গাবার জন্য সৃষ্ট হয়নি। যে মুখের snapshot নেয় সে চোর।

আবার 'ফী' পাইলাম, এটা সুকরানা।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

উকীলের বুদ্ধি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুবোধচন্দ্র হালদার আজ চারি বৎসর যাবৎ ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—লোকটা ভারি চালাক চতুর,—উহার পশার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু হায়, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে! বাস্তবিক, বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুবোধ বাবুর পশার হয় নাই—এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক,—তাহার ছাপও তাঁহার নামের পশ্চাতেই মুদ্রাঙ্কিত। বুদ্ধিও তাঁহার অনন্যসাধারণ ছিল। পাস করিয়া তিনি দিনাজসাহী জেলায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। শুনিয়াছিলেন, সেখানে কাযকর্ম্মও যথেষ্ট—এবং 'বারও' তেমন 'ষ্ট্রং' নহে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ভবানীপুরে তাঁহার এক স্বগ্রামের উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার হাতে একটি ব্যাগ ছিল। উকীল বাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের পর বলিলেন—"আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

উকীল বাবু বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্যে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।"

উকীল বাবু কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উপহার এনেছ হে?"

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল—একটি চক্‌চকে নূতন আলপাকার চাপকান এবং একটি ঝক্‌ঝকে নূতন শামলা। জিনিষ দুইটি বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন—"এই গুলি অনুগ্রহ করে আপনাকে নিতে হবে।"

উকীল বাবু সুবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি?"

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন—"মানে আছে।"

"কি বল দিকিন?"

"এ দুটি আপনি নিয়ে—আপনার পুরাণো চাপকান আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ করে দিন।"

এতক্ষণে উকীল বাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বেশ বেশ—বুদ্ধি করেছ ভাল।"

সুবোধ বলিলেন—"আজ্ঞে, যাচ্চি নতুন জায়গায় ওকালতী করতে। একে আনকোরা নতুন উকীল,—তার উপর যদি নতুন শামলা আর চাপকান দেখে, তা হলে কি মক্কেল আর কাছে ঘেঁসবে?"

উকীল বাবু বলিলেন—"দেখ হে—আমি বলে দিচ্চি—তুমি শীগ্‌গিরই পশার করে তুলতে পারবে। তুমিই বারের উপযুক্ত লোক।"

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্দ্র কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাকতৈল কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল মাথায় মাখিয়া সম্মুখের চুলের কিয়দংশ শুভ্র করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে স্ত্রীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন শুনিলেন বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর হইতে

কেমন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেলটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিন কাল কি ভয়ানকই পড়িল। যে এত বুদ্ধি ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিয়া মক্কেল জুটাইতে পারিল না!

সুবোধচন্দ্রের বাসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানি—রাস্তার উপর একটি ফাটক আছে—তাহার পর সামান্য একটু কম্পাউণ্ড—তাহার পর গৃহের বারান্দা। বাড়ীটির ভাড়া মাসে ২০৲ করিয়া—কিন্তু তিন চারি মাস ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে! যে মুদীর দোকান হইতে চাউল প্রভৃতি আসে—তাহারও শ' খানেক টাকা ধার। বাড়ীওয়ালা ও মুদী সুবোধ বাবুকে বিষম বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাঁহার ধনরত্ন উপার্জ্জন না হউক, তিনি দুইটি কন্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আর উপার্জ্জন করিয়াছেন একটি বন্ধুরত্ন—জগৎপ্রসন্ন বাবু। জগৎ বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা। জগৎ বাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহার অবস্থা সুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মক্কেলের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শীতের প্রভাত। আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধ বাবু চা পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্ব্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন—"দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায়। দেশী চিনি বলে যা দেয় তা জাভার চিনি। লোকে মনে করে হল্‌দে চিনি হ'লেই দেশী হয়, শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী। কিন্তু তা মহা ভুল। জাভা, মরিশ্‌স্ প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি হচ্চে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।"

সুবোধ বাবুর চা পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাকি করিলেন কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীর নিকট শুনিলেন—আজ ঝি বাকী বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে নালিস্ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ হস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া, সুবোধচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। কলেজে পাঠকালে, অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গলের' ন্যায়, তিনিও ধূমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ উকীলগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; অল্প বিস্তর 'ইত্যাদি'ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব্বপ্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া, অবিলম্বে সুবোধ বাবু দুই টাকা মূল্যের এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট আনার একসের তামাকে তাঁহার পনেরো দিন চলিতে লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, 'ইত্যাদি'র দাম অনেক—তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতরাং ইত্যাদি করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক পোড়াইয়াও যখন পশার হইল না, তখন সুবোধ বাবু একদিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল—"কম্‌লি" তাঁহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহার করেন তাহা আট আনা সের নহে—চারি আনা সের মাত্র।

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণ প্রায়। আজ রবিবার—কাছারি যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত মনে সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিলেন—আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামান্য যাহা পৈত্রিক পুঁজি ছিল তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন আর চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক স্থানে কর্ম্মের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দিন দিন খরচ বৃদ্ধিই হইতেছে—আয়ের অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু পান—কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে লাগিলেন—আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাহিরে মোহনভোগওয়ালা, "ঘি—গাওয়া-ঘি"ওয়ালা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মক্কেলহীন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, চারি আনা সেরের একছিলিম তামাক সুবোধ বাবু নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরের হাতায় পদশব্দ শ্রুত হইল। কে আসে? মক্কেল নহে ত? নিকটস্থ আলমারির মস্তক হইতে সুবোধ বাবু একখানি পুরাতন ব্রীফ চট্ করিয়া পাড়িয়া লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পদশব্দ কম্পাউণ্ড হইতে বারান্দায় উঠিল। পর মুহূর্ত্তে জগৎপ্রসন্ন বাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র।

ব্রীফ্ সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধ বাবু বন্ধুকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন।—"আরে এস এস—এত সকালে কি মনে করে?"

"আর ভাই, বসে বসে কি করি—আসা গেল একটু গল্প গুজব করতে।"

"বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছট্‌ফট্ করে মরছিলাম। আজকের বেঙ্গলী নাকি? দেখি।"

কাগজ লইয়া সুবোধ বাবু চাকরি খালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জগৎ বাবু বলিলেন—"শুনেছ? পরশু বেলা ৭টার সময় ফুলার সাহেব এসে পৌঁছবেন।"

সুবোধ বলিল—"৭টার সময়? শুনে খুসী হলাম। আমার বাড়ী আসবেন না ত?"

জগৎ হাসিয়া বলিল—"বলা যায় কি? আসেনই যদি—এত ভয় কেন?"

"না ভাই—আমার স্বদেশী ঘরকরণা—তাতে ঝিটিও পালিয়েছে। তাঁকে খাতির করব কি করে?"

"খাতির যদি করতে পার, তা হলে সুবিধে করে নিতে পার—তা জান সুবোধ? বেচারি যেখানে যাচ্চে,—কেউ খাতির করছে না। কোনও মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনা করছে না—অনেক জায়গার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পর্য্যন্ত অভিনন্দন পত্র দেবার প্রস্তাব করে বেসরকারী সভ্যদের কাছে হার মেনে যাচ্চে।"

সুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিল—"খাতির করলে একটা চাকরি বাকরি পাওয়া যায় ত বল আমি নিজেই একটা অভিনন্দন পত্র দিয়ে ফেলি।"

"শোননি—পূর্ব্ববঙ্গের একজন উকীল ফুলার সাহেবের নামে একটা কবিতা রচনা করে, গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের পদ পেয়ে গেছে।"

সুবোধচন্দ্রের জীবনে এই একটা পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। পরিহাস করিয়া যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হঠাৎ গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন—"যা বলেছ। একটা গভর্ণমেণ্ট প্লীডারি পেলে যে গো-জন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি?"

জগৎ বাবু কিন্তু কথাটা পরিহাসের ভাবেই গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"ইংরিজি কবিতা লিখতে পারবে?"

"না। কখনও দুটো কথা মেলাইনি।"

"চেষ্টা করে দেখনা। একটা কবিতা লিখে সোণার জলে ছাপিয়ে ফেল। ফুলার সাহেব আসবার দিন সেইটে বিতরণ কর,—আর ফুলার সাহেবকেও এক কাপি পাঠিয়ে দাও। এই ফরিদসিংহের সরকারী উকীল মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি—তাঁকে নিয়ে গোলযোগ চলছে। চাই কি তাঁর পদটা পেয়ে যেতে পার।"

সুবোধ উত্তর না করিয়া, কপালে হাত দিয়া, বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

জগৎপ্রসন্ন পূর্ব্বমত পরিহাসের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"নাও, কাগজ কলম বের কর। আমি না হয় তোমার সাহায্য করছি। ছেলেবেলায় আমার কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল। কি বলে আরম্ভ করা যায়? Hail Fuller—Lord of East Bengal—তার পর, কি মিল করা যায় বল দেখি?"

সুবোধ উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন। জগৎ বলিলেন—"তার চেয়ে বরং Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal—শুনতে বেশ গম্ভীর। মিল করা যায় কি? 'Bengal' এর সঙ্গে 'all,' 'call', 'fall' অনেক মিলই ত আছে। হাঁ হাঁ—হয়েছে।

Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal,
How glad are Dinajshahi people all
To—to—

তার পর কি হে? বলনা। সব কবিতাটাই আমি রচনা করব—আর তুমি ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হবে?"

সুবোধ বলিলেন—"না হে—কবিতার কায নয়। আমি আর একটা কথা ভাবছি।"

"মনে হয়েছে।

To welcome thee to their most ancient town,
The worthy representative of the Crown.

না। 'Worthy' কেটে কর 'glorious'—সবটা শোন-দিকিন—লিখেনাও…

Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal,
How glad are Dinajshahi people all
To welcome thee to their most ancient town
The glorious representative of the Crown—

লিখে ফেল—লিখে ফেল। এমন ভাবরত্ন হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না!"

সুবোধ বলিলেন—"দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পার?"

জগৎ কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বেল্লিক বেরসিক তুমি ত হে! হচ্চে কবিতার চর্চ্চা। এমন সময় বল্লে কিনা 'টাকা ধার দিতে পার'? যাও আমি তোমায় কবিতা রচনায় সাহায্য করব না।"

সুবোধের মুখে হাসি নাই। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত। বলিলেন—"না, ঠাট্টা নয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।"

"কি মৎলবটা শুনি?"

"বড় দাঁও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভর্ণমেণ্টকে ঠকিয়ে আমি একটা সুবিধে করে নেবই নেব। দেখি এসপার কি ওস্‌পার।"

জগৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি করতে চাও?"

"ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করব।"

"কি পাগল! কে তুমি? রাজা নও, জমিদার নও, বড় চাকরিও কর না,—তোমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেই বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ষ্টেশনে যেতে নেমন্তন্ন করবেন? দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইণ্টার-ভিউ করবার সুযোগ পাবে?"

"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব—যাতে ফুলার সাহেবের নজরে পড়ে যাবই যাব। তা হলেই কার্য্যোদ্ধার।"

জগৎ বাবুর মুখ হইতে হাস্য পরিহাসের ভাব এখন তিরোহিত। বলিলেন—"কি পাগলামি করছ? দেশসুদ্ধ লোক কেউ ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করবে না—তুমি একা করবে! তুমি দেশদ্রোহীর মত নিজের স্বার্থের জন্যে দেশনায়কদের মতের বিরুদ্ধে কায করবে?"

সুবোধ বলিলেন—"জগৎ, তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছ। আমি যে চার বছর ধরে এখানে পড়ে পচে মরছি, স্ত্রীর গহনা বিক্রী করে বাসা খরচ চালাচ্ছি, দেশনায়কেরা কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—'ওহে, তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত?'—ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে আমি দুধ কিনতে পারিনে—শুধু কোলের মেয়েটির জন্যে একসের করে দুধ নিই—অন্য ছেলে মেয়েদের আমার স্ত্রী সুজি সিদ্ধ করে চিনি দিয়ে খাওয়ায়—তা তুমি খবর রাখ? নিয়মিত মাইনে পায় না বলে কোন ঝিই বেশীদিন টেকে না,—কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে, নিজের উন্নতি করে নিতে পারি ত কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে এই নতুন আসাম গভর্ণ-মেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছলে উঠছে তা ত নয়। গভর্ণমেণ্ট আমাদের ফাঁকি দিয়ে দেশথেকে সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে—আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি? কতকাল আর এ রকম করে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব,—ছেঁড়া জুতো' ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়াব?"

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলি-লেন—"কি করবে স্থির করেছ?"

"বাড়ীটে বেশ করে সাজাব।"

'তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে?"

"না তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র। বীজবপন মাত্র। তারপর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে ফুলার সাহেবের সুনজরে পড়ে যাব—কাজ বাগিয়ে নেব।"

"যোগাড়টি হবে ত? না শুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে?"

"ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে হবে না।"

"আমায় কি করতে হবে?"

"যখন যেমন যেমন বলব, তখন তেমন তেমন করবে।

আপাততঃ, আমি বাড়ী সাজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার খুব নিন্দে করে বেড়াও।"

"সে কায শক্ত নয়,—তা পারব।"

"আর, খুব সাবধান, তোমার আমার মধ্যে যে এই ষড়যন্ত্রটি চলচে—বাইরের লোক কেঁউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।"

"তার জন্যে ভয় নেই।"

"তা হলেই হল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই।"

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্রোত্থান করিলেন।

সুবোধও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। যাইবার সময় জগৎ বলিলেন "দেখ, ষড়যন্ত্র জিনিষটের ভিতর একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে রেছে। এ খেলা মন্দনয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে—সেইটিই সংশয়।"

সুবোধ বলিলেন—"ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই উন্মাদ ব্যাধিটুকু কিছুদিন টিকে যাক—আমাদের ষড়যন্ত্রটি ফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট।"

"আর আমার হাতযশ।" বলিয়া সহাস্যে জগৎ সুবোধের করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অদ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাট সাহেব আসিবেন। অথচ নগরবাসী কেহ কোনও উৎসবের আয়োজন করিতেছে না। বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে। নূতন লাট সাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে। মিউনিসিপালিটির বে-সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজুলিউসন করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন—তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য নানা স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি অনেক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব্ রেজিষ্ট্রার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায়, জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি "আঞ্জুমানি ইস্লামিয়া" সভা গঠিত হইয়াছে—সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাট সাহেবকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, আঞ্জুমানের বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজি ভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দন পত্র পাঠ করে কে? এই বিষম সমস্যার বিষয় তারযোগে অবগত হইয়া, ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজি জানা পারিষদকে দিনাজ-সাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসিগণ এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধ বাবু উকীলের বাটী সজ্জিত করিবার জন্য দশ বারো জন লোক লাগিয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদারু পত্র আসিয়াছে। কয়েকটা সদ্যছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধ বাবুর ফটকের উপর বাখারীর আর্চ্চ তৈয়ারি হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে আর্চ্চ দেবদারুপত্রে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুইটি কদলী বৃক্ষ রোপিত হইল। প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণ ঘট। গৃহের জানালাগুলির চারি পার্শ্বে গেঁদাফুলের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া, তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধ-বর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল। পত্র ও পুষ্পকে সজীব রাখিবার জন্য এক ব্যক্তি ক্রমাগত সেগুলিতে জল-সেচন করিতে লাগিল।

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সুবোধ বাবু পুলিস আফিসে ছুটিলেন। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে, আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় নিজগৃহের কম্পাউণ্ডে কিছু বাজি পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিস সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার গৃহদ্বার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানা লম্বা তক্তা আনাইয়া, তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার

উপরে লাল কাগজের কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণসূচক শব্দসমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় যুবক ও বালক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাঁহাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল—"আপনি এ কি করছেন ?"

সুবোধচন্দ্র অত্যন্ত ভাল মানুষের মত বলিলেন—"কাল লাট সাহেব আসছেন কিনা,—তাই বাড়ীটে একটু সাজাচ্ছি।"

"কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না—আপনি সাজাচ্ছেন কেন ?"

"কেন, তাতে দোষটা কি ?"

"বঙ্গচ্ছেদের জন্যে সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে—এই কি উৎসবের সময় ?"

"শোকে মগ্ন রয়েছে নাকি ?—কেন শোক কিসের ? সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখছি।"

"আপনি কি তবে বঙ্গচ্ছেদ আনন্দের বিষয় বলে মনে করেন ?"

সুবোধচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০শে আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল—তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভাই বাঙ্গালী—মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত—এ রুধিরপাত—যতদিন এর প্রতিশোধ আমরা না নিতে পারব—ততদিন যেন কোন রকম বিলাস বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই"—ইত্যাদি।

সুবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকেরা অনেক কাকুতি মিনতি করিল। একজন বলিল—"আপনার পায়ে ধরি—এসব ভেঙ্গে ফেলুন।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন—"এত খরচ করে করলাম সব নষ্ট হবে ?"

বালকেরা বলিল—"আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন,—আমরা ইস্কুল থেকে চাঁদা তুলে—নিজেদের জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে—আপনার ক্ষতিপূরণ করে দেব। অনুমতি করুন—আমরা নিজে এসব ভেঙ্গে ফেলি।"

সুবোধ চন্দ্রের বুকের মধ্যে ঝনাৎ করিয়া একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা একমুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন—"যাও যাও বিরক্ত কোরোনা। সকল কাযেই তোমরা খোঁচা দিতে শিখেছ। যাও লেখা পড়া করগে।"

বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সুবোধ ভাবিলেন—এ সকল বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত, কি জানি রাত্রে যদি আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া দেয় ? তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া পুলিস সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলেন সাহেব বাড়ী নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে গিয়াছেন। সুবোধ বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়া, পুলিস সাহেবের নিকট নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন।

অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। সুবোধ বাবু গিয়া উভয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস সাহেব বলিলেন—"কি বাবু ? কি চাই ?"

"হুজুর, কাল লাট সাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, ইস্কুলের ছেলেরা রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে।"

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আপনি কি আজ বাজি পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন ?"

"হাঁ হুজুর—আমিই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পুলিস সাহেব বলিলেন—"ইহাঁরই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।" সুবোধকে বলিলেন—"আচ্ছা সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনার বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য আমি এখনি চারিজন কনেষ্টবল হুকুম করিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি উকীল ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"বেশ। আপনার রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন ?"

সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন—"হুজুর, সেত আমার বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।"

"অলরাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। আপনার নামটি কি ?"

সুবোধ নাম বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একখানি কার্ড লইয়া, স্বহস্তে সুবোধের নাম পূরণ করিয়া, তাঁহাকে দিলেন।

রামদাস স্বামী ও তাঁহার শিষ্য শিবাজী।

আউন্ধের পন্ত প্রতিনিধি পরিবারের শ্রীমন্তবালা সাহেব কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে

সুবোধ বাবু ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

*　*　*

পরদিন যথা সময়ে লাট সাহেবের আগমন হইল। পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। লাট সাহেবের ফীটন গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। কমিসনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। ফুলার সাহেবকে দেখিবা মাত্র সুবোধ নত মস্তকে সেলাম করিল। লাট সাহেব স্মিত মুখে, হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলী বৃক্ষ পত্রপুষ্পের সজ্জা নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষ দেশে শাদা জমির উপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল—

Long Live Fuller.

Welcome to Dinajshahi.

দেখিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ক্রমে ফীটন অদৃশ্য হইয়া গেল।

*　*　*

ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দরবার সজ্জিত হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দরবার। ৯টা বাজিলে পর, একখানি গাড়ী আনাইয়া সুবোধ বাবু দরবারে উপস্থিত হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া দিলেন। পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন।

দরবারে লোকসংখ্যা অত্যন্তই অল্প। রাজা ও জমিদারের মধ্যে দুই তিন জন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী—ডেপুটি, মুনসেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ করিবার জন্য কাছারির আমলাগণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন কাটাইয়া দেয়। কাছারি যাইবার জন্য একসুট মাত্র পোষাক আছে তাহা দরবারের উপযুক্তই নহে। অনেকে চোগা ও চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই তাহারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাপকান মলিন শামলা এবং তালি দেওয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে—না আসিলে চাকরি যায়। ডেপুটি মুনসেফ আমলা প্রভৃতি সরকারি চাকর ছাড়া, হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল বেসরকারী লোক অত্যন্তই অল্প সংখ্যক। আঞ্জুমানি ইস্লামিয়ার জন পনেরো মুসলমান উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নবদন ফুলার সাহেব দরবারে প্রবেশ করিলেন। হিন্দুগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইল। মুসলমানগণ "মরহাবা" বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিল। আঞ্জুমানি ইস্লামিয়ার অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। ফুলার সাহেব ইংরাজি ও উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর "ইন্‌ট্রোডক্সনের" পালা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে লাটসাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুবোধ বাবুও সাহস পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাকেও লাটসাহেবের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে সেলাম করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল। আমি তোমার সুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উকীলেরা ভারি রাজদ্রোহী—আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র বাবুর ইঙ্গিতে বাঁদরনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই।"

"আমি লোকের কথায় নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না।"

"বেশ। তুমি বৈকালে সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করিতে আসিও।" বলিয়া ফুলার সাহেব সুবোধকে বিদায় দিলেন। অন্যলোক "ইন্‌ট্রোডিউস" হইল।

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া আসিতেছিলেন। এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়া, পকেট হইতে একখানি প্রাইবেট ইণ্টারভিউর নামহীন কার্ড বাহির করিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন—"তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। His Honor স্বয়ং তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যথা সময় উপস্থিত হইও।"

সুবোধচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ এ কি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎ প্রসন্ন ঠাট্টা

করিয়া বলিয়াছিল—"দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করতে নিমন্ত্রণ হবে?"—সবইত হইল। এখন গভর্ণমেণ্ট প্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য! যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, সেই সমস্ত ঘটিয়া যাইতেছে। তবে কি সুদিন উপস্থিত হইল? এতদিনের পর কি গ্রহদশা খণ্ডিত হইল?

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধচন্দ্র গৃহাভিমুখে পদচালনা করিলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া পত্রপুষ্পসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লাটসাহেব সজ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা করিয়াছেন। অনিমেষ নেত্রে সুবোধ বাবু নিজ কীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল।

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে নিজ গৃহশোভা দেখিতেছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের উপর হইতে, এক গামলা গোবর ও কাদা গোলা জল, সুবোধ বাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল।

সুবোধচন্দ্র চকিত নেত্রে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কে বিদ্রূপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "Long live Subodh Babu—Welcome to Pandemonium."

গোবর ও কাদা গোলা জল, তাঁহার শামলা বহিয়া চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয়া প্যাণ্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধ বাবু জুতা চব্ চব্ করিতে করিতে যথা সাধ্য ত্বরিত পদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই একটি মাত্র পোষাক—তাহা গেল নষ্ট হইয়া। এখন কি পরিয়া সুবোধ বাবু প্রাইবেট ইণ্টারবিউ করিতে যান?

স্নানাহার করিয়া, তিনি অনাথ বাবু ডেপুটির বাসায় ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া, একসুট পোষাক ধার চাহিলেন।—

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"মহাশয় আচ্ছা, তা পোষাক না হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্ম্মভোগ কেন? আমরা গোলামী করছি—আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার বাড়ী সাজানই বা কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? প্রাইবেট্ ইণ্টারবিউ করবার এত আগ্রহই বা কেন?"

সুবোধ বাবুর মুখ খানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেন—"সাহেব নিজে বলেছেন—না গেলে সেটা কি ঠিক হয়?"

ডেপুটি বাবুর হঠাৎ মনে হইল—এসব কথা এ লোকটাকে বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়া দেয়—তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"না-তা যাবেন বৈকি! সাহেব নিজে বলেছেন—অবিশ্যি আপনার যাওয়াই উচিত। বসুন পোষাকটা নিয়ে আসি।"

প্রাইবেট ইণ্টারবিউ হইয়া গেল—বাজিও পুড়িল। রাত্রি ৯টার সময়, শাল মুড়ি দিয়া, সুবোধচন্দ্র জগৎ বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগৎবাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"সাবাস্—সাবাস্। তুমি যা বল্লে তাই হল যে। তার পর লাটসাহেবের কাছে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারির কথা তুলেছিলে?"

সুবোধ বলিলেন—"পাগল! তা হলে যে সন্দেহ করবে। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। সে সব এখনও দেরী আছে। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।"

"এবার কি করবে?"

"টেলিগ্রাফের ফরম আছে?"

"আছে।"

"বের কর দিকিন খান কতক।"

জগৎ বাবু টেলিগ্রাফের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ বলিলেন—"বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দেমাতরম্ কাগজে তার পাঠাতে হবে।"

"কিসের তার?"

"আমার কীর্ত্তি।"

"সে হয়ে গেছে। বেঙ্গলীর সংবাদ দাতা সুকুমার বাবু তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে বারের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর দরবারে উপস্থিত ছিলে।"

"আর সে গোবরজলের কথাটা!"

"সেটা বোধহয় লেখেন নি।"

"আরে সেইটেই আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম

মুসাবিদা করে এনেছি। সুকুমার বাবুর টেলিগ্রামে আমার প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার। আর গোবরজলের কথাটা আর Welcome to Pandemoniumটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় dramatic হয়েছে। সাধারণের কল্পনাকে ভারি উত্তেজিত করবে।"

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবোধ বাবু সেই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখিলেন কোতোয়ালি হইতে দুইজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিল —"মশায়—শুনলাম না কি কাল আপনি যখন দরবার থেকে ফিরছিলেন, তখন কে ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবর-গোলা জল ফেলেছে?"

"ফেলেছিল বটে।"

"এ কথা সাহেবদের কাণে গেছে। পুলিস সাহেব আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকর্দ্দমা চালাতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা সাক্ষী প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপনাকে সাহায্য করব। দুঃখের বিষয় এটা পুলিস গ্রহণীয় মোকর্দ্দমা নয়। হলে আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ একটা নালিস করে দিন।"

সুবোধ বাবু বলিলেন—"কাউকে ত দেখতে পাইনি, কার নামে নালিস করব?"

"ও বাড়ীতে ছেলে পিলে যারা আছে তাদের নাম আমরা এখনি সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আর তাদের বাপ, উকীল বাবুটি, তিনি নিশ্চয়ই ওদের abet করেছেন। তাঁরও নাম লাগিয়ে দিন।"

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন—আমি ত কাউকে দেখ্‌তে পাই নি—কাউকে সেনাক্ত করতে পারব না। এ অবস্থায় নালিস করলে কোনও ফল হবে না।"

দারোগা বাবুরা তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

সুবোধ বাবু ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন "যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবর জল ঢেলেছিল—তারা আমার আশাতীত উপকার করেছে।" খবরটা এতক্ষণ বোধ হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তটা জড়িয়ে এমন একটা হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে আমার কার্য্য সিদ্ধি হতে বেশী বিলম্ব হবে না।"

বাস্তবিক তাহাই হইল। তিন দিনের মধ্যে দেশময় টী টী পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ নকল করিয়া বাঙ্গলা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গালিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন—"এমন স্বদেশদ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত।" একজন রসিক লেখক "সুবোধ বাবুর পাপমুক্তি" নামক একটি কবিতায় লিখিলেন, গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ। লাট-দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুবোধ বাবুর যে পাপসঞ্চয় হইয়াছিল,—গোবরজলে তাহা ধৌত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজেও সুবোধ বাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ লিখিলেন পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু বহু রাজভক্ত শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম হন না। সুবোধ বাবুর সৎসাহসের প্রশংসাও বাহির হইল। এ দিকে, দিনাজসাহীতে সুবোধ বাবুর গঞ্জনার সীমা রহিল না। বারলাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্য উকীলগণ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সুবোধ বাবুর অনুপস্থিতি কালে একজন উকীল একদিন জগৎবাবুকে বলিলেন—"কিহে তোমার বন্ধুর মৎলবটা কি? দারোগা হতে চায়, না ডেপুটি হতে চায়, না কি হতে চায়?"

জগৎ বাবু রাগিয়া বলিলেন—"আরে মশায়, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও লোকটার উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুতা—"

"বন্ধুতা! অমন লোককে বন্ধু বলে স্বীকার করতে অপমান বোধ হয়।"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে? এমনটাই করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

জগৎ বাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন—"আমি ওর সঙ্গে সেইদিন থেকে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লাটসাহেবের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান উকীল কিশোরীমোহন বাবুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। কিশোরী বাবু বৃদ্ধ অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। সুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায় তিনিই কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন—"সুবোধ কাজটা যা করেছে তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই। ছেলে মানুষ, না বুঝে করে ফেলেছে। তাই বলে কি ওর উপর অমন করে জুলুম করতে আছে! আহা বেচারি কাগজে যা গাল'টা খেয়েছে অন্যলোক হলে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর তোমরা ও কথা উত্থাপন কোরো না।" ফলতঃ দুই চারিজনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সুবোধ বাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল। আফিসকক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎ বাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

"এস এস—আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো মনের কথা বলবার ফুরসৎ পাইনে।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম জমিয়ে তুলেছ—আসতে ভয় করে পাছে ধরা পড়ে যাই। কিন্তু আসল কাজের ত কোনও চিহ্ন দেখছি নে। কেবল কি গাল' খেয়েই মরলে?"

"আসল কাজই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। সবুরে মেওয়া ফলবে হে—মেওয়া ফলবে।"

"কাগজে দেখলাম ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের চাকরি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না।"

"না ভাই—এ খণ্ডপ্রলয়ের পর বারে আর সুবিধে হবে না। হলাম যেন সরকারী উকীল—কিন্তু বার লাইব্রেরীতে কেউ আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে কি সুখ হবে?"

"তবে কি করবে?"

"একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে মাস গেলেই। হাকিম পদটাও লোভনীয়।"

"তবে তাই দরখাস্ত কর না।"

"না, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাঁধি দাঁড়াও।"

"আর কি গোড়া বাঁধবে?"

"একঘরে হতে হবে। তোমরা আমায় একঘরে করে দাও; বস আর কিছু চাইনে। তা'হলেই ডেপুটিগিরি আমার বাঁধা।"

"আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।"

"কিশোরী বাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"যাচ্চ নাকি?"

"অবিশ্যি।"

"তোমায় নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু গোলযোগ করেছিল। তারপর কিশোরী বাবু বলে কয়ে তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।"

"ঐ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কাজ কর। যখন খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাধাও।"

"তার পর।"

"তার পর আমি উঠে আসব। তার পর লম্বা টেলিগ্রাম কাগজে কাগজে।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"না হে—অত বাড়াবাড়িতে কায নেই। কাযটাও শক্ত। পারব না।"

"পারতেই হবে। এইটিই আসল—এরি উপর সব নির্ভর করছে। এইটে হলেই তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার দাবীর জোর হবে।"

অনেক বলা কহার পর জগৎ বাবু রাজি হইলেন। এক পেয়ালা চা পান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন নিমন্ত্রণ সভায় যথাপরামর্শ কার্য্য হইল। জগৎ বাবু উচিত মুহূর্ত্তে বলিলেন—"মহাশয়গণ, আমায় ক্ষমা করবেন—আমি এ নিমন্ত্রণ সভায় ভোজন করতে অক্ষম। সুবোধ বাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার করলে আমার জাতিপাত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল—"আমরাও খাব না।" বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল।

সুবোধ বাবু উঠিয়া বলিলেন—"মশায়—একজনের জন্যে আপনারা এতজন কেন অভুক্ত ফিরে যাবেন? তার চেয়ে আমিই উঠে যাচ্ছি।" বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরী বাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত দুইখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ভাই, চলে যেও না। এস তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই।"

সুবোধ বাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—"এত অপমান সহ্য হয় না।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া, অন্যের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ মহলে আবার হুলস্থূল বাধিয়া গেল। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণ লিখিলেন—এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া দিনাজসাহী যে সদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা সমস্ত দেশবাসীর অনুকরণযোগ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আরও একসপ্তাহ কাটিয়াছে। আপিস কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র জগৎ বাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্যকার ইংলিশম্যান কাগজ খোলা রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম —দিনাজসাহীর উকীল বাবু সুবোধচন্দ্র হালদারকে আসাম গবর্ণমেণ্ট ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিসের কর্ম্ম দিতে সংকল্প করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।"

সুবোধ বলিলেন—"তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুল্লে। এত কাণ্ড করে—এত গাল খেয়ে—শেষে পুলিসের চাকরি!"

জগৎ বাবু বলিলেন—"গবর্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। এ আড়াইশো টাকায় আরম্ভ হবে—ডেপুটিগিরি দুশো টাকা বৈ ত নয়?"

"মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিন সময় পড়েছে—আমার ত মোটেই কাজটা লোভনীয় মনে হচ্চেনা। দেখ, এই একমাস জাল স্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। পুলিসে চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী হতে হবে। কোথায় কে বিলিতি নুন ফেলে দিয়েছে—যাও তাকে ধর। কোথায় কোন ছেলে বন্দেমাতরম্ বলেছে—মার তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই আমি পার্ব্ব না। তার চেয়ে বাবে আমার এ উপবাসই ভাল।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"দেখ আমার বোধ হয়, ডেপুটিগিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পারলে গবর্ণমেণ্ট তোমায় তাই দিতে চাইত। সেটা গবর্ণমেণ্টকে জানানো ভাল। যাও শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।"

"এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না—শুধু ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই ছুটব?"

"ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেণ্টের চিঠিরই সমান।"

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন রাত্রেই সুবোধচন্দ্র শিলং যাত্রা করিলেন।

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল, সুবোধ বাবু অষ্টম গ্রেড্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবোধ বাবু এখন ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তাঁহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় নাই। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা পান করেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ সমালোচনা।

১। তাম্বুল বণিকের উপবীত—শ্রীহরিপ্রিয় কোঁচ প্রণীত। কোঁচ মহাশয় বলিতেছেন,—"আমাদের পৈতা ছিল"; ইহাও লিখিয়াছেন যে, উঁহাদের জাতির ছজন লোক ইতিমধ্যেই পৈতা পরিয়াছেন। কথা এই ইঁহারা সকলেই পৈতা লইতে চান। বঙ্গের বাহিরে শবর, গণ্ড প্রভৃতি অনার্য্যরাও যখন পৈতা পরে; এবং কেহ নিষেধ করে না, তখন তাঁহারা পৈতা পরিলে যে কেহ বাধা দিবে, অথবা অধিক সম্মান পাইবেন, ইহার কোনটাই মনে হয় না।

ইতিহাস বা সাহিত্যের হিসাবে পুস্তিকাখানির কিছু মূল্য নাই; তবে অনেক জাতির লোকই পৈতা পরার ধুয়া তুলিয়া এক একটা অদ্ভুত ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছেন। যে দেশে ইতিহাস সংগ্রহে বিষম ভ্রম, সে দেশে এ সকল খেয়াল উপেক্ষা করা চলে না। বেদে তাম্বুল বা পানের কথা আছে, অতএব কোঁচ মহাশয়েরা তৎকালের এক জাতিবিশেষের বংশধর, এ সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই ভাল বটে। বৈদিক ওঁকারের যে নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা অতি চমৎকার। বঙ্গাক্ষর যে খুব আধুনিক কালের সৃষ্টি, তাহা অবশ্য গ্রন্থকার জানেন না। তাই তিনি গম্ভীরভাবে লিখিয়াছেন, যে পেটের ভিতরে জ্রূণটি ওঁকারের মত আকার ধরিয়া বসিয়া থাকে, ইত্যাদি। বঙ্গাক্ষরের রূপে বৈদিক ওঁকারের উৎপত্তি নির্ণয় করার মত ইতিহাসই এদেশে বেশী আদরের। একখানি তন্ত্রে ক অক্ষরের মহিমা বর্ণনায় তন্ত্রকার ধরা দিয়াছেন, যে তিনি দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী সময়ের বাঙ্গালী; অথচ সেই তন্ত্র নাকি

সত্যযুগের রচনা! একা কোঁচ্ মহাশয়কে নিন্দা করিলে কি হইবে? গ্রন্থকার বলেন, যে গানের সুর ভাঁজিবার আগেও "ওঁ ওঁ" করিতে হয়। "তা—না—" হইতেও পারে।

২। Glimpses of Famine and Flood in East Bengal—সহৃদয়া ভগ্নী নিবেদিতা, দুর্ভিক্ষ এবং জলপ্লাবনপীড়িত পূর্ববঙ্গবাসীদিগের দুঃখে অশ্রুপাত করিয়াছেন। করুণায় অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তা অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর এবং মূল্যবান। তথ্যের সত্যতায়, ভাবের মূল্যে, কবিত্বের চমকে এবং ভাষার স্বচ্ছতায় এই মুক্তাহারগাছি সকলেরই আদরের সামগ্রী। পাটের চাষ সম্বন্ধে লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পত্রিকায় তাহার অনুশীলন এবং সমালোচনা চলিতেছে। গ্রন্থখানির ছাপা এবং কাগজ অতি পরিপাটি; অথচ মূল্য মোটে চারি আনা।

৩। এপিক্‌টেটসের উপদেশ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইউরোপের অনেক সুবুদ্ধি এবং পণ্ডিতব্যক্তি মনে করেন যে, এপিক্‌টেটস্ ও মার্কাস্ অরিলিয়াস্ এন্টোনিনসের উপদেশাবলী, খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা অপেক্ষাও চরিত্র গঠনে বেশী সহায়। সে কথা যাহাই হউক, কিন্তু উপদেশ গুলি যে অমূল্য, তাহাতে ভুল নাই। বঙ্গভাষায় এ জিনিস এই প্রথম প্রচারিত। গ্রন্থকার আমাদিগকে নিত্য নিত্য নূতন নূতন জিনিস প্রাচীন আকর হইতে তুলিয়া দিতেছেন।

৪। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বদেশহিতৈষণা ভাল, কিন্তু যাহা বিদেশের তাহাই অপবিত্র, এ ভাব বড় অনিষ্টকর। আজকালও উহার বিপরীত ভাবের লোক অনেক আছেন, যাঁহাদের কাছে বিদেশের কুকুর স্বদেশের ঠাকুর অপেক্ষা পূজ্য। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রায় কথা কহিবার মত ভাষায় এই উভয়পক্ষেরই দোষগুণ সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সমালোচনা, এখন মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হওয়ায় ভাল হইয়াছে।

৫। অঞ্জলি—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। শুভক্ষণে দেশময় স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে। এই প্রীতির উচ্ছ্বাসে গ্রন্থকার যে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা সুপাঠ্য এবং সুরচিত।

৬। নবউদ্দীপনা—শ্রীসৈয়দ সিরাজী প্রণীত। এখানিও অঞ্জলির শ্রেণীর কবিতা গ্রন্থ। উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় হিন্দুমুসলমানের মিলন কামনায় অনেক কবিতা লিখিত হইয়াছে।

৭ ও ৮। মানস সরোবর ও গার্হস্থ্য সন্ন্যাস শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত। উভয়গ্রন্থেই গদ্য ও পদ্যে কবিতা আছে। গদ্যে কবিতা হয় না, তাহা নয়; তবে যাহা পদ্যে ফোটে নাই গদ্যে তাহার প্রত্যাশা করা বৃথা। শেষ গ্রন্থের যুক্তি বলে কোন নাস্তিক নাকি আস্তিক হইয়াছেন। সে খুব ভাল কথা। এরূপ ফললাভের পর যদি সাহিত্যের হাটে যশ উপার্জ্জন না হয়, তবে ক্ষতি কি?

৯। অশ্বত্থামা বিজয় (কাব্য)—শ্রীরাজনাথ গুহ নিয়োগী প্রণীত। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং এগার সর্গবিশিষ্ট; কাজেই এখানি মহাকাব্য। রচনা বড়ই প্রাণশূন্য; অনেক কষ্টেও পড়িয়া উঠিতে পারা যায় না।

শ্রীসমালোচক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গসংসার—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৩৯৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৷৹ টাকা। এই বই খানি নভেল; পড়িয়া দেখিলাম ইহাতে যথারীতি মান, সাধ্যসাধনা, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা, খুন, আত্মহত্যা, সন্ন্যাসী হওয়া, দীর্ঘ বক্তৃতা প্রভৃতি নভেলি অঙ্গের কিছুরই ত্রুটি নাই। অর্থাৎ নবীন লেখকের চাপল্য ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইহাতে কতকগুলি পুরুষ ও নারীচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের একদল ধর্ম্মপ্রাণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও অপরদল অসৎ ও কলুষিত। গ্রন্থকার সৎ যুবকের পশ্চাতে কলুষিত চরিত্র রমণীকে ও প্রত্যেক সতীসাধ্বীর পশ্চাতে ঘৃণ্যচরিত্র পুরুষকে লেলাইয়া দিয়া ব্যাধের মত নিষ্ঠুর ক্রীড়া করিয়াছেন। শোণিতসম্পর্কান্বিত ভ্রাতাকে ভগ্নীর প্রতি কলুষ পোষণ করাইতেও গ্রন্থকার সঙ্কুচিত হন নাই। রক্তমাংসের জন্য ছুটাছুটি ছাড়া বঙ্গসংসারের যুবক যুবতীর কি আর কোন কর্ত্তব্য গ্রন্থকার খুঁজিয়া পান নাই? ইহা বাস্তবিক বঙ্গসংসারের চিত্র না সয়তানের সংসারের ইতিহাস? "বঙ্গসংসার" প্রত্যেক বঙ্গসংসার কর্ত্তৃক সযত্নে পরিহর্ত্তব্য, এমন বই না ছাপিলেই ভালো হইত। গ্রন্থকারের ভাষার মধ্যে 'সশঙ্কিত' প্রভৃতি ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদ দুই একটা ও 'নববর্ষ সমাগমে যেমন বৃক্ষদেহ নব "বিল্বপত্রে" সমাচ্ছন্ন হয়, প্রভৃতি রচনা-শৈথিল্য থাকিলেও তাঁহার বাংলা লিখিবার শক্তি আছে। ভবিষ্যতে আদর্শ উচ্চ করিয়া সংযত ভাবে লেখনী চালনা করিলে সফলতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

রেণুকণা শ্রীনিস্তারিণী দেবী প্রণীত; মূল্য আট আনা, ৭৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এখানির পূর্ব্বার্দ্ধে গদ্যকাহিনী, উত্তরার্দ্ধে কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। একটি বালিকার মৃত্যুকাহিনী ও তাহারই শোকোচ্ছ্বাসে পুস্তিকাখানির উদ্ভব। কবিতাগুলি আমাদের ভালো লাগে নাই, ছন্দের শিথিলতা ও ভাবের অপ্রগাঢ়তা তাহার কারণ। কিন্তু কাহিনীটি বেশ হইয়াছে। একটি বালিকা মাতার সন্তান সম্ভব হইতে শিশুর মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যথাযথ ভাবে অতি নিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। নিত্য অশুভাশঙ্কা মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল বেদনা পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া যে করুণচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা মাতৃস্থানীয়ারই উপযুক্ত—পুরুষ এমনটি প্রকাশ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুস্তকের ভাষা সুন্দর, লিখনভঙ্গী পরিপাটী, রুচি সুমার্জ্জিত। কলেবর অনুপাতে মূল্য অধিক বোধ হইল।

শিবাচার্য্য-ঠাকুর—শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ৩৮৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। এখানির শিরোনামায় বন্ধনীর মধ্যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যে, এখানি কাব্য। আমরাও দেখিলাম মিলের পর মিল গাঁথিয়া গ্রন্থ বিপুল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাব্যের লক্ষণের সহিত ইহার বৈলক্ষণ্যই লক্ষিত হইল। ইহা তান্ত্রিক শিবাচার্য্য ঠাকুরের পদ্যময় জীবনী, কিন্তু কাব্য নহে। লম্বা লম্বা সাত সর্গের মধ্যে কবিত্বের পরিচয় কোথাও জুটিল না। গ্রন্থখানিতে আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের সহিত গ্রাম্যকথার অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। 'ছিল মধ্যবিত্ত পুরী অতি সুশোভন সমাকীর্ণ মঠাদি হর্ম্ম্য দেবালয়ে'—পুরী মধ্যবিত্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু 'স্বয়ং মধ্যবিত' যে কি রকম ঠিক বুঝা গেল না। ইহাতে বহু অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। যথাঃ—'অকস্মাৎ দিন-দৈন্য পেয়ে ধনরাশি,' 'সাভিজন, আঁটকুড়া, ক্ষুব্ধ, ভাগ্যবান্'; 'জপ সাঙ্গ হ'লে শিব ত্রিতীয় প্রহরে,' 'আছিল সমাংসমীনা গাভী সুলক্ষণা,' প্রশান্ত মূরতি চারু অঙ্গের সৌষ্ঠব,' 'অবনি,' 'গৃহাঙ্গিনা,' 'দিগব্যাপী মসী,' 'রুদ্রবল্লী বাম স্কন্ধে,' 'অন্তপুর নাছদ্বারে,' 'গৃহস্থ জাগৎ গণি,' 'আগুড়ি দেখি না কেন আসে কিনা সেই,' 'বদিস্থাৎ বাঁচে শিশু,' 'নীরব যতেক জন, নিস্তব্ধ কিয়ৎক্ষণ,'

'পালে পালে ভীমকায়, সারমেয়, ভুরিমায়
* * * তাহাদের অবিরল
বিকট আরাবে ধৃত অশুভ শ্মশান'।

'সদ্যঃ আবেশিত শব,' 'আতজ,' 'ক্লিশিত,' 'স্বামী সহ সতী বাঞ্ছা,' 'কন্যা চিবু ধরি চুম্বিলা কত,' 'নতুবা কৈবল্য কদাপি ন'বে'। 'ত্রিতীয় নয়ন

বিশাল ভালে,'. 'সদেশে,' 'আচার্য্যের ন'যে বৈকল্য মনের,' 'সশঙ্কিত,' 'কিবোদ্দেশে তথা শুভাগমন,' 'উষ্মার বৈকালে,' 'তাড়িয়াছে বুঝি আলয়ে তোমারে,' ইত্যাদি।

তালিকার বিস্তৃতি ভয়ে নিরস্ত হইতে হইল। অভিধানদুর্লভ শব্দ-প্রয়োগ, সন্ধি শব্দসঙ্কোচ ও বর্ণযোজনা সম্বন্ধে কবি একেবারে নিরঙ্কুশ! ইহাতে কবিত্বের পরিচয়-'কম্বুর রবে,' 'বিভোরিত মনে,' কিন্তু 'এত যে লাঞ্ছনা স্ত্রী তবু নাই'। কবি পারস্তভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 'কিন্তু তাহে গ্রন্থ নাহিক এমন জ্ঞানের বর্দ্ধন সম্যক যায়'। এরূপ ভ্রান্ত মত ব্যক্ত করিবার তাঁহার কতদূর অধিকার আছে জানি না। গ্রন্থের পঞ্চম সর্গে শিষ্যাচার্য্যের স্খলনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আরো একটু সংযত হইলে ভালো হইত। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে আমাদের ভালো লাগিয়াছে হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে একটি শ্লোক তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। কবি হিন্দুদিগকে বলিতেছেন—

"কেড়ে নিল ওরে ভুজবলে যারা
সর্ব্বস্ব তোদের, হ'ল কিনা তারা
ঘৃণ্য হেয় জাতি; তয়ে আত্মহারা
প্রাধান্য গরবে ফাটিয়া মর।
জাতীয়ত্ব গুণে যারা একপ্রাণ,
ত্রিসন্ধ্যা যে পূজে সর্ব্বশক্তিমান,
উপাস্য তোদের, তারে হেয় জ্ঞান
জানি না দুর্ম্মতি কি ব'লে কর।"

এই গ্রন্থখানি কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। পুস্তক শেষে দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী সংশুদ্ধিপত্র দিয়াও ভুল নির্ম্মূল হয় নাই, এত ছাপার ভুল প্রেসের অখ্যাতিকর। প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগী না হইলে প্রেসের লব্ধ প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইবে।

এপিক্‌টেটসের উপদেশ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য আট আনা, গ্রন্থকার ক্রমান্বয়ে বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবিধান করিতেছেন; তাঁহার সেই শুভ চেষ্টার অন্যতম অমৃতময় ফল এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'আমাদের এই দৈন্যদশার দিনে, রাজভয়ের দিনে, যদি আমরা এপিক্‌টেটসের উপদেশ অনুসারে চলি, তাহা হইলে শোক তাপে সান্ত্বনা পাইব, বিপদে বল পাইব, মৃত্যুভয়কে জয় করিয়া নির্ভয় হইব'। অতএব প্রত্যেক আত্মহিতেচ্ছু, দেশহিতেচ্ছু ব্যক্তি এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিবেন আশা করি। পাঠে অর্থব্যয় সার্থক হইবে এটুকু আশ্বাস আমরা দিতে পারি। 'রাজশক্তি ও আত্মবল' 'ভয় ও অভয়,' 'কথা নয় কাজ,' 'রাষ্ট্র পরিচালন,' 'আত্মশক্তির জ্ঞান ও সাধনা' প্রভৃতি সম্বন্ধে এপিক্‌টেটসের উপদেশের সার সঙ্কলন পড়িয়াও আমাদের শিখিবার যথেষ্ট বিষয় আছে। সান্যাল কোম্পানীর ছাপা—মুদ্রণ ও কাগজ দুই ভালো।

নবরত্নমালা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ইহাতে বেদ, উপনিষদ ও গীতার শ্রেষ্ঠ অংশ সকলের মূল ও বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। বহু উদ্ভট শ্লোক ও সংস্কৃত কাব্যের রত্নসদৃশ শ্লোকের মূল ও পদ্যানুবাদ, সমগ্র মেঘদূত, অজবিলাপ, রতিবিলাপ, মদনদহন, প্রভৃতির মূল ও পদ্যানুবাদ আছে। কয়েকটি ইংরাজি কবিতার পদ্যানুবাদ, তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গের পদ্যানুবাদ, পারসীদিগের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি অসংখ্য রত্ন একত্র করিয়া গ্রন্থখানি রত্নমালা হইয়াছে। অনুবাদ অধিকাংশই গ্রন্থকারের নিজের, দ্বিজেন্দ্র বাবু, জ্যোতিরিন্দ্র বাবু ও রবীন্দ্র বাবুরও কিছু কিছু আছে। এই সদগ্রন্থখানি অবসর সহচর হইবার একান্ত উপযুক্ত. অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু অনুবাদে মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের শ্লোকের ঝঙ্কার ও গতি যেরূপ সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে, উপনিষদের অনুবাদে প্রায়ই মূলের গাম্ভীর্য্য সেরূপ রক্ষিত হয় নাই। অনুবাদ প্রায়ই কেমন লঘু ও তরল হইয়া গিয়াছে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽ মৃতস্য পুত্রা' 'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্,' 'নমস্তে সতে তে' ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকের অনুবাদ প্রায় মূলের মতই গম্ভীর ও সুন্দর হইয়াছে।

পুস্তকে তিন খানি চিত্রও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থকারের চিত্র, দ্বিতীয় বিরহী যক্ষ ও তৃতীয় অজবিলাপ।

হিন্দুস্থান—রচয়িতা শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী, মূল্য দুই আনা মাত্র, ২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই পুস্তকের শেষে বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে যে, "উপরোক্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠে পাঠক, নবীন যুবকের নবীন উদ্যম, অদ্ভুত চিন্তা, এবং প্রগাঢ় ভাবুকতা দেখিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত, ক্রোধিত, রোমাঞ্চিত, উত্তেজিত, চমৎকৃত হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই"। অভাগ্য আমরা ভারতের দুঃখে নবীন যুবকের কয়েকটি পদ্যময় হা হুতাশের মধ্যে উল্লিখিত কোন গুণই দেখিতে পাইলাম না; যাহা দেখিয়াছি তাহাতে "ক্ষোভিত" হইয়াছি।

"হত কি ভারতবাসী বিলাসে মগন,
বিদেশীয় বিদ্যা আদি করিতে অর্জ্জন,—
যাইত বিদেশে ধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন?"
করিত কি হিন্দু হ'য়ে অখাদ্য ভোজন?"

এই কি "নবীন যুবকের নবীন উদ্যম?"

খোকার দপ্তর—শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত। এই শিশুপাঠ্য পুস্তকখানির ছাপা বেশ ভাল হইয়াছে। দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু ইহার লেখার প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

আলেখ্য—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত কতকগুলি কাব্য চিত্র। ১১২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, মূল্য আট আনা মাত্র। এই কাব্য চিত্রগুলির ভাষা প্রচলিত শিথিল কথিত, ও ছন্দ মাত্রিক, ইহাতে কাব্যের সরসতা ও মর্ম্ম-স্পর্শিতা বৃদ্ধি হইয়াছে; ইহা প্রতিগৃহের নিত্য আলোচনার 'আটপৌরে' জিনিষ, 'সৌখিন' দু এক জনের গণ্ডির মধ্যে আটক পড়িয়া থাকিবে না। এই কথিত শিথিল ভাষাতে কবি সরস স্বভাব বর্ণনায়ও অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। হাস্য ও অশ্রু যেন সহোদরের মত কবিতাগুলির মধ্যে গলাগলি হইয়া আছে। কিন্তু 'নেতা' চিত্রটির মধ্যে নকল নেতা অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ছবি অধিক পরিস্ফুট দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। 'নেতা' বলিয়া যাঁহার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এ বিদ্রূপ তাঁহার যশোহানি করিতে পারিবে না, শুধু বিদ্রূপকর্ত্তার প্রতিই জনসাধারণের শ্রদ্ধা ক্ষুণ্ণ হইবে।

আর্য্য-নীতি-বিজ্ঞান—(উচ্চ পাঠ)। শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ১৪২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য বারো আনা মাত্র। এই পুস্তকখানিতে নীতি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, গুরু, তুল্য ও কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার ও পাপপুণ্যের পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি সুলিখিত সন্দর্ভ লিখিত হইয়াছে। উপনিষদ, গীতা, মনু, মহাভারত, হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য সমর্থিত হইয়াছে। প্রাচ্য দার্শনিক ভাবের সহিত প্রতীচ্য ভাবেরও সামঞ্জস্য অলক্ষিতভাবে রক্ষিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইলে বালকদিগের নীতি ও কর্ত্তব্য শিক্ষার সদুপায় হয়। এরূপ সুলিখিত সুমুদ্রিত পুস্তকের প্রুফ সংশোধনে আরও একটু মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল।

সূত্রধর তত্ত্ব—অর্থাৎ সূত্রধর জাতির নিদান ও সামাজিক অধিকার। শ্রীবিহারীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লিখিত নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বেদ, সংহিতা, ইতিহাস, সেন্সস্ রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে

বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে সূত্রধর জাতি বৈশ্য ও উপবীতী। এই মীমাংসা মানিয়া লইতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এইরূপ পুস্তক দেখিয়া আমাদের মনে হয় আমাদের দেশে উন্নত হইবার, হীনতাপঙ্ক ঝাড়িয়া ফেলিয়া মাথা তুলিবার, একটা বাসনা সকলের মনেই জাগ্রত হইয়াছে। প্রথমে আত্ম-অনুভূতি (Self-consciousness) তাহা হইতে, স্বত্ব-দাবি (Self-assertion) এবং তাহা হইতে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা (Self-realization) লাভ হয়। আমাদের আত্ম-অনুভূতি লাভ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে স্বত্ব-দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহার ফলে আত্ম প্রতিষ্ঠা অচিরে লাভ করিব। আমাদের গৃহমধ্যে নারীগণ হেয় হইয়াছিলেন, সমাজে বহু জাতি হেয় হইয়াছিলেন সুতরাং সমাজও আবহমানকাল পরপদদলিত লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছে। চারিদিকে দাসত্ব করিয়া করিয়া আমরা এমন হেয় হইয়া গিয়াছি যে, আমরা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করিতে কুণ্ঠিত হই, জোর করিয়া আদায় করা ত দূরের কথা। যদি এক্ষণে প্রথমে আমাদের অন্তঃপুরিকারা আপনাদের অধিকার সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া লন, এবং সকল জাতি যদি আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া মাথা তুলিয়া সমাজে দাঁড়াইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ নিতান্তই নিশার স্বপনসম হইবে না। আমরা এই পুস্তকখানি প্রত্যেক সূত্রধরজাতীয় ব্যক্তিকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া আত্মমর্য্যাদা লাভ করিবেন।

মাতৃপ্রেম—শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত, ৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি আনা। এখানি গ্রন্থকারের স্বীয় জননীর প্রতি ভক্তির এবং উপকারকের প্রতি শ্রদ্ধার ছন্দোময় উচ্ছ্বাস। ইহা নিতান্তই নিজস্ব জিনিষ, সাধারণের নহে। অতএব ইহার দোষ গুণ আমরা বিচার করিব না, এবং গ্রন্থকারেরও উচিত ইহা আপনার আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখা।

রাখী-কঙ্কণ স্বদেশী উপন্যাস, প্রথম খণ্ড—শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ প্রণীত, ১৫৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য দশ আনা। বরিশালে প্রথম স্বদেশীব্রত গ্রহণ উপলক্ষে দৃঢ়ব্রত যুবকযুবতীদিগকে স্বদেশদ্রোহী আত্মীয় স্বজন দ্বারাও যে কিরূপ নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল, তাহারই চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। এবং কি রকম লোক স্বদেশদ্রোহী হয় তাহারো একটা সুন্দর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখকের ভাষার উপর অধিকার আছে, ঘটনার কোন বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকিলেও, পুস্তক খানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য সমুৎসুক রহিলাম।

শ্রীমুদ্রাযান্ত্রিক।

দলিত কুসুম।

৫

চতুর্থ দিবস গত, জ্যোতির্ম্ময় রবি
হইল উদয়, পুনঃ গেল অস্তাচলে।
পঞ্চম দিবসে অতি মধুর প্রভাতে
গাইয়া বিহঙ্গকুল জাগাইছে ধীরে
গ্রামবাসী জনে। হরিৎ শস্যের ক্ষেত্র,
সেথা হতে আসিতেছে গ্রাম্য নারী যত
আপনার বহুমূল্য দ্রব্যভার লয়ে
সমুদ্রের কূলে। আসে আর ফিরে চায়
অশ্রু পূর্ণ আঁখি। দেখে চেয়ে যতনের
চির প্রিয় সুখ শান্তি পূর্ণ নিকেতন।
ক্রমে বৃক্ষ অন্তরালে যায়নাক দেখা,
আবরিল গৃহদ্বার কাননের ছায়।
ক্ষুদ্র শিশুগণ ধীরে খেদাইছে পশু
যতনে বক্ষের মাঝে খেলিবার দ্রব্য
ধরিয়া চলেছে তারা, সভয়ে কাতরে।

এই রূপে সিন্ধুকূলে রমণীরা সব
আপনার দ্রব্যভার রাখিল আনিয়া।
সারা দিনে করে দিল তরণী বোঝাই।
অপরাহ্নে সূর্য্য যবে যায় অস্তাচলে
সহসা অদূরে শ্রুত হল বাদ্যরব।
রমণীরা এক সাথে উঠিল সহসা
লইয়া শিশুরে সবে। সহসা খুলিয়া
গেল মন্দিরের দ্বার, সৈনিক সকল
বেষ্টিয়া আনিল সেই গ্রামবাসী যত
সরল মানবগণে। যেন তীর্থ যাত্রী
করিতেছে তীর্থ যাত্রা সকলে মিলিয়া।
এক সাথে গীত গাহি যাইতেছে তারা
দেখিবারে আপনার প্রিয় পরিজন।
গাহিতেছে যুবক সবে "দয়াময় পিতা
দাও ধৈর্য্য দাও শক্তি ক্ষমা সহিষ্ণুতা।"
বৃদ্ধ নরনারী গায় কণ্ঠ মিলাইয়া
দয়াময় নামে লভে শান্তি ধৈর্য্য বল।
উপরে আকুলকণ্ঠে বিহঙ্গের দল
সহসা গাহিয়া গেল দেবাত্মার প্রায়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। | ৮ম সংখ্যা।

স্বর্গ।

স্বর্গ ? কোথা স্বর্গ ? তাহা আকাশে কি মৃত্যুর পরে নয়,
স্বর্গ ভক্তের স্বপ্ন নয়ক, স্বর্গ নয়ক মস্তিষ্কে কবির,
স্বর্গ—সে পদার্থ নয়ক, ধারণা নয়। মহা সমাধির
সাধনা সে ; নয় সে সুখের স্থান।—বড় দুঃখময় !
চলেছে যে মহাছন্দে চূর্ণজ্যোতি অশ্রান্ত, অধীর,
কোটি কোটি মহাশূন্যে, তাহাদেরও একটা স্বর্গ আছে।
ক্ষুদ্রতম কীট যা মাটির মধ্যে থাকে—পাছে
কা'রও পায়ে দলে' যায়, তা'রও স্বর্গ আছে জেনো স্থির।
স্বর্গ—সে সাধনা যাহার অন্ত নাইক ; স্বর্গ—মহা যোগ ;
স্বর্গ—পরের জন্য সহা ; স্বর্গ—পরের জন্য দুঃখভোগ।

এই যে সৃষ্টি—চলেছে সে একই মহা লক্ষ্য লক্ষ্য করে'—
কেন্দ্র হ'তে ক্ষেপে, শূন্য হ'তে বিশ্বে, আত্ম হ'তে পরে।
সভ্যতাও চলেছে সে একই দিকে—সেই স্বার্থ হ'তে
পরার্থে, স্ব-বৃত্তি হ'তে প্রেমে, নেওয়া হ'তে দেওয়ায়।
পরের জন্য স্বইচ্ছায় তীব্র জ্বালা মাথা পেতে' নেওয়ায়
যেই দুঃখ—সে-ই স্বর্গ ! সেই মহা দুঃখ-মহাব্রতে
বুদ্ধ খ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য পরেছিলেন ছিন্ন চীর-বেশ,
সেই দুঃখের মহাছন্দে গেয়েছিলেন মহাকবিচয়।
কেন প্রশ্নের নাইক সীমা ? কেন বিশ্বের দুঃখের নাইক শেষ ?
—পাছে এ ব্রহ্মাণ্ড হ'তে সেই স্বর্গ কভু লুপ্ত হয় !
কি কাজ তবে কর্ব্বে মানুষ ? সে দিন কাহার দুঃখ করে' দূর
ধন্য হ'বে ? কি দুঃখে গাহিবে কবি—তাহার বীণায়
বাজাবে কি সুর ?

সেই-ই পরম সুখ—পরের দুঃখে কেঁদে যে সুখ সুমধুর।
সেই-ই গরীয়সী চিন্তা—পরের সুখের জন্য চিন্তা করা।
সেই-ই পুণ্যকর্ম্ম—পরের জন্য সহা, দুঃখ করা দূর।
সেই-ই শ্রেয় ধর্ম্ম—পরের প্রতি প্রীতি অনুকম্পাভরা।
সেই মহা দুঃখই স্বর্গ ! সেই মহা দুঃখ—মহা সুখ !
সেই মহা সুখের কাছে স্বার্থের যা সম্ভোগ—সে কতটুক !
সেই মহা প্রীতির কাছে সূর্য্যোদয়ে শশধরের মত
স্বার্থ পাণ্ডু হ'য়ে যায় ;—সে আলোকে বিশ্বে সমুদয়
হেয়, কুৎসিৎ, অপবিত্র যা'—সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয় !
ক্রন্দন নির্ব্বাক হ'য়ে যায়, ও স্বয়ং মৃত্যু হয় সে পদানত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিতে হইলে, পুরাতন ইতিহাসের সন্ধান লইতে হয়। সে ইতিহাস এখনও

সুচারুরূপে সংকলিত হয় নাই। কোন্ পুরাকালে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়,—স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভারতবিখ্যাত রাজনগর বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। তথায় এক সময়ে ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যাইত; তাহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে সকল স্থানই "ধর্ম্ম—সংঘ—বুদ্ধ" মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রদেশ এক সময়ে জ্ঞানালোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সুধীসমাজেও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধমতানুরক্ত পাল নরপালগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নানা স্থানে রাজনগর ও রাজদুর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাহাদের রাজ্য কালক্রমে সেনরাজগণের করতলগত হইবার পর, তাহা আবার মুসলমানের অধীন হইয়া পড়ে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান,—সকলেই এখন ক্রীড়াপটে বিরাজ করিতেছেন। এখন তাঁহাদের বীরবিক্রমের লীলাভূমি অরণ্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বক্তিয়ার খিলিজি এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী মুসলমান ভূপতিবর্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা রাজ্যজয়েই ব্যাপৃত ছিলেন, সুতরাং পুনর্ভবাতীরে দেবকোটের সেনানিবাসেই তাঁহাদের প্রকৃত রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর গৌড়,—তাহার পর পাণ্ডুয়া,- তাহার পর আবার গৌড় রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বরেন্দ্রমণ্ডলের অত্যল্প স্থানেই বক্তিয়ার খিলিজি অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাধিকৃত রাজ্য মধ্যে শাসন-সংস্থাপনের সুব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই বক্তিয়ার খিলিজি তিব্বত-বহির্গত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধনকোট হইতে দশ দিবস উত্তরাস্যে করতোয়াতীর অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইবার পর বক্তিয়ার একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু দেখিতে পাইয়া করতোয়া উত্তীর্ণ হইয়া পর্ব্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অধিকদূর আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে পরাভূত হইয়া সেতুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। সেখানে আসিয়া দেখিলেন,—সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, দেশের লোকে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অবরুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছে। তিনি একশত মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সন্তরণে নদী পার হইয়া ভগ্নমনোরথে দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মহম্মদ শেরাণ তখন রাজ্যজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি দেবকোটে আসিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হত্যাকারী দিল্লীতে উপনীত হইয়া বাদশাহী সনন্দ লইয়া দেবকোট আক্রমণ করায়, পুনরায় গৃহকলহের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহাতে শেরাণ নিহত হইলে, আলি মাইন খিলিজি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সুলতান আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহার অত্যাচার অবিচারে লোকসমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন হাসামুদ্দীন তাঁহাকে পদচ্যুত ও নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ঘিয়াসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া দেবকোট হইতে গৌড় নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। গৌড়ের সুবৃহৎ মৃৎপ্রাচীর তাঁহারই কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

১২২৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলতমাস তদীয় পুত্র শাহজাদা নসিরুদ্দীনকে গৌড় আক্রমণে নিযুক্ত করেন। তিনি ঘিয়াসুদ্দীনকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, গৌড়ীয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে আবার খিলিজি সামন্তগণ গৃহকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীন দৌলত শাহ সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতে, দিল্লীর ফৌজ আসিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিল; এবং আলাউদ্দীন জানি নামক এক ব্যক্তিকে রাজপ্রতিনিধি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। জানি বর্ষ চতুষ্টয় রাজ্যভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলে, সইফউদ্দীন আইবক ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

সইফউদ্দীনের পর তুঘান খাঁ। সম্রাট আল্তামস তাঁহাকেই সিংহাসন দান করেন। আল্তামস-দুহিতা সুলতানা রিজিয়া তাহাই স্থির রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে (১২৪৪ খৃষ্টাব্দে) উড়িষ্যাধিপতি গৌড়দুর্গ আক্রমণ করায়, দুর্গতির একশেষ উপস্থিত হইয়াছিল। গৌড়াধিপতি দুর্গ রক্ষার সম্ভাবনা দেখিতে না পাইয়া, দিল্লীশ্বরের শরণাগত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বরের সেনাপতি তৈমুর খাঁ আসিবার

পূর্ব্বেই, উড়িষ্যাধিপতি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তুঘানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, স্বয়ং বাদশাহী করিবার আশায়, তৈমুর খাঁ দুর্গাবরোধ করেন। তুঘান পরাভূত হইয়া পলায়ন করায়, তৈমুর খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই তৈমুর খাঁর মৃত্যু সংঘটিত হয়। তাহার পর দ্বাদশবর্ষব্যাপী গৃহকলহে গৌড়রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। মঘিসুদ্দীন সুলতান হইয়াছিলেন। তিনি আসাম জয় করিতে গিয়া, কামরূপে পঞ্চত্বলাভ করিলেন। ইজুদ্দীন বলবন্ সিংহাসনে আরোহণ করিলে, আবার নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইল। তখন পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন। বলবন্ পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আরসালান খাঁ গৌড়নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

১২৬৫ হইতে ১২৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপে গৌড়-নগর নানা বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হয়। অবশেষে দিল্লীশ্বরের পুত্র নসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রুকনুদ্দীন বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সুলতান বলিয়া পরিচিত। তিনি কাই কায়ুস নামে ইতিহাসে উল্লিখিত। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহার পর তাঁহার পুত্র বোঘরা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে আবার গৃহকলহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বোঘরা খাঁকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর শাহ সিংহাসন গ্রহণ করিলে, দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগ্‌লক শাহ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। এইরূপে বাহাদুর শাহ পদচ্যুত হইলে, নসিরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

১৩২৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। তখন দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি কাদির খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুবর্ণগ্রামে বহরাম খাঁ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, ফকর উদ্দীন সুবর্ণগ্রামের সিংহাসন অধিকার করিয়া, গৌড়দুর্গ আক্রমণ করেন, এবং কাদির খাঁকে নিহত করেন। কাদির খাঁর সেনাপতি আলি মোবারক বাহুবলে ফকর উদ্দীনকে পরাভূত করিয়া, আলিশাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে হাজি ইলিয়াস আসিয়া আলি মোবারককে নিহত করিয়া, স্বয়ং সামসুদ্দীন ইলিয়াস নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। উপর্য্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে গৌড় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য সামসুদ্দীন ইলিয়াস, গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ইঁহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, ইঁহাকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্রের নাম শেকন্দর শাহ। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর "আদিনা" নামক ভুবনবিখ্যাত বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, নিহত হইয়াছিলেন। সে কাহিনী—কলঙ্ককাহিনী। পিতাকে নিহত করিয়া পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। পুত্রের নাম ঘিয়াসুদ্দীন। তিনি নুরকুতব আলমের সহাধ্যায়ী ছিলেন। পিতৃহন্তার নিধনকাহিনী ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ এই সময়ে বাইজিদ শাহ নামক একজনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন; পরে নিজেই ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। গণেশের শাসন সময়ে পাণ্ডুয়া আবার দেবমন্দিরে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাভেনশ' লিখিয়া গিয়াছেন—"গণেশ দশ বৎসর হিন্দুমুসলমানের প্রিয়পাত্র হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।"*

গণেশের পুত্রের নাম জাঠমল বা যদু। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, জালালুদ্দীন নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন; এবং ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। ইঁহার শাসন-সময় পাণ্ডুয়ার অভ্যুদয়যুগ। রাজধানী গৌড়নগরে স্থানান্তরিত হইলেও, পাণ্ডুয়া একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। জালালুদ্দীনের পুত্র আহমদশাহ সিংহাসনে আরোহণ

* He reigned for 10 years, making Pandua his capital, and his popularity with his Mahomedan subjects shows him to have been a sensible and tolerant ruler.—Ravenshaw's Gour, p. 99.

করিয়া, নৃশংস নরপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে নিহত করিলে, ইলিয়াস শাহের বংশধর নসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে গৌড়-নগর আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

১৪৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের পুত্র বার্ব্বাক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার শাসন সময়েই ধ্বংসবীজ সংগৃহীত হয়। ইনি সেনাদলে ৮০০০ হাব্‌সী ক্রীতদাসকে স্থানদান করিয়াছিলেন। বার্ব্বাক শাহের পুত্র ইউসফ শাহ সাত বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া, ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হইলে, তাঁহার খুল্লতাত ফতে শাহ হাব্‌সী ক্রীতদাসদিগের প্রভুত্বে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তাহারা পাইক সেনাদলের সহিত যোগদান করিয়া, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রভুহত্যা করিয়া, বারিক নামক খোজাকে সুলতান শাহজাদা নামে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল;—বাঙ্গালার সিংহাসনে এইরূপে এক নপুংসক সমাসীন হইল! তাহাকে অধিকদিন রাজাভিনয় করিতে হইল না। হাব্‌সী সেনাপতি মালিক ইন্দিল ইহাকে নিহত করিয়া, সইফ উদ্দীন ফিরোজ শাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহার মিনার অদ্যাপি "ফিরোজ মিনার" নামে বর্ত্তমান আছে।

ফিরোজ শাহের পর নসিরুদ্দীন মহম্মদ শাহ। তিনি ভাল করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতেই, সেনা কর্ত্তৃক নিহত হন। আবার একজন হাব্‌সী মজফ্‌ফর শাহ নামে সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড়ের সিংহাসন যখন এইরূপে হাব্‌সী ক্রীতদাসদিগের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত হইয়াছিল, সেই সময়ে হোসেন শাহ উজিরি করিতেন। তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, মজফ্‌ফর শাহকে পরাভূত ও নিহত করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গৌড় আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। হোসেন শাহ হাব্‌সী সেনাদলকে ও পাইকগণকে নির্ব্বাসিত করিয়া, শান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

হোসেন শাহের শাসনযুগ গৌড়ীয় ইতিহাসের কল্যাণ-যুগ। এই যুগে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সূত্রে হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী রূপসনাতন সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের বিদ্যানুরাগ প্রবল ছিল। বঙ্গসাহিত্যও তাঁহার নিকট সমুচিত উৎসাহ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পুত্র নসরৎ শাহ পিতার ন্যায় লোকরঞ্জন করিতেন। কিন্তু তিনি পাণিপথের মোগলপাঠানের তুমুল কলহে লোদীপক্ষ অবলম্বন করায়, বাবর তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য কৃত-সংকল্প হন। নসরৎ শাহ অনন্যোপায় হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খোজাগণ তাঁহাকে নিহত করিয়া, তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহকে সিংহাসন দান করিয়াছিল। ফিরোজের খুল্লতাত মামুদ শাহ তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে হইল না। বিহারাধিপতি সের আফগান ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগর অবরোধ করিয়া, তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন।* সন্ধি হইলেও, রাজশ্রী বিনষ্ট হইয়া গেল;—মামুদ ভগ্নমনোরথে প্রাণত্যাগ করিলেন! সদুল্লাপুরে ইঁহার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই শেষ।† তাহার পর গৌড় একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইয়া, দিল্লীশ্বরের অধীন হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ আকবর শাহের প্রতিনিধি মনায়েম খাঁর শাসন সময়ে গৌড়নগর মহামারীতে জনশূন্য হইয়া, ক্রমে বিজন বনে পরিণত হইয়াছে।‡

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* The Portuguese, as we are told by Faria Y Souza, sent on this occasion nine ships to Mahmud's assistance, but they did not reach Gour till after the City's surrender.—Ravenshaw's Gour, p. 101 note.

† From its sack by Sher Khan's officers, in 1537, and from its depopulation by the plague in 1575, it never subsequently recovered.—*Ibid*, p. 102.

‡ ক্রমে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে গৌড়ের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিবার সময়ে বিশেষ তর্ক-বিতর্কের প্রতি কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা করিবার সময়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রচলিত কাহিনী বিবৃত হইল। বিশেষ কাহিনী "গৌড়কাহিনী" নামে স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইতেছে।

আম্রবিক্রেত্রী ব্রহ্ম নারী

বর্ম্মা।

(১)

১৮৮৬ খ্রীঃ সর্ জর্জ্জ স্কট তৎপ্রণীত বর্ম্মার ইতিহাসের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন,—

"It is related of a member of Parliament that some years ago he met at dinner a Civilian from British Burma, home on leave. The conversation turned on that country, and the legislator remarked, 'Burma—oh, yes, Burma. I had a cousin who was out there for sometime, but he always called it Bermuda.'"

কালক্রমে বর্ম্মা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর নিকট বর্ম্মা ও হনলুলুতে এখনও বিশেষ পার্থক্য নাই।

উপস্থিত, পেটের দায়ে বর্ম্মায় অনেক ভারতবাসী আসিয়া পড়িয়াছেন, এবং এখনও প্রতি মেলে অনেকে আসিতেছেন। সুতরাং বর্ম্মা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

'বর্ম্মা' শব্দের উৎপত্তি লইয়া শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন সংস্কৃত 'ব্রহ্মা' শব্দের অপভ্রংশ 'বর্ম্মা'। অপর পক্ষ বলেন, 'বর্ম্মা' চীন ভাষার বর্ম্মানিবাসী জাতিজ্ঞাপক শব্দ মাত্র। উভয় পক্ষই স্বমত সমর্থন করিবার নিমিত্ত প্রমাণপ্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হন নাই এবং উভয় পক্ষেই বিচক্ষণ ব্যক্তির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বর্ম্মাদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয়, ভারতবর্ষের সহিত এক সময় বর্ম্মার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম বর্ম্মার সর্ব্বত্র প্রচারিত না হইলেও স্থানে স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 'মিন্ধান' জেলায় 'পাগান' নামক একটী স্থান আছে। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এই স্থান বর্ম্মার রাজধানী ছিল এবং এক প্রতাপশালী নরপতি এই স্থানে বাস করিতেন। পাগানের পূর্ব্বসমৃদ্ধি অনেক দিন অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এক্ষণে সেখানে রাশি রাশি ভগ্নস্তূপ তাহার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে মাত্র। কথিত আছে এক সময়ে পাগানে ৯,৯৯৯ বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার ছিল। এরূপ জনশ্রুতি, যে ঐ সমস্ত বিহারের মধ্যে কোন কোনটী ভারতবাসী শ্রমণদিগের আবাস স্থান ছিল। যে সমস্ত মন্দির এখনও সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন হয় নাই তাহাদিগের নির্ম্মাণপ্রণালী অনুধাবন করিলে বোধ হয় কতকগুলি নিশ্চয়ই ভারতবাসীর কীর্ত্তি। ধ্বংসাবশেষ মূর্ত্তি দেখিয়াও বোধ হয় তাহাদের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু দেব দেবীর। হিন্দুদিগের পক্ষে কাশী যেমন পবিত্র তীর্থক্ষেত্র, মুসলমানদিগের পক্ষে মক্কা যেমন তীর্থক্ষেত্র, এই পাগানও বর্ম্মাবাসীদিগের পক্ষে সেইরূপ তীর্থক্ষেত্র; এখনও প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রিদলসমাকুলিত হইয়া পুণ্যক্ষেত্র পাগান অল্প সময়ের জন্য পূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। পাগান ব্যতীত বর্ম্মার অন্যান্য স্থানেও হিন্দুকীর্ত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে।

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ১৫৮৬ খ্রীঃ রাল্ফ্ ফিচ্ নামক একজন ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে বর্ম্মায় আগমন করেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানেও বাণিজ্যব্যপদেশেই ইংরাজের প্রথম আগমন হয়। রাল্ফ্ ফিচের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের (বিশেষতঃ বঙ্গদেশের) সহিত বর্ম্মা বাণিজ্যসূত্রে বদ্ধ ছিল। ইঁহার আগমনের পর হইতে ইংরাজের সহিত বর্ম্মার সাক্ষাৎ সূত্রে বাণিজ্য আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরে হলাণ্ডনিবাসীদিগের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ইংরাজেরাও তাহাদের সহিত বর্ম্মা হইতে তাড়িত হয়েন। ইহার পর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পুনরায় ইংরাজদিগের বর্ম্মায় আগমন আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা এই সময়ে সিরিয়াম বন্দরে একটী কুঠী স্থাপন করেন। এই কুঠী স্থাপনার অর্দ্ধশতাব্দী পরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তাৎকালিক প্রতিনিধি স্মার্ট সাহেব বর্ম্মার রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে সিরিয়ামের কুঠী ভস্মীভূত হয়।

এই সময় বর্ম্মায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। এই বিবাদ শেষ হইলে আলোং-ফারা বা আলোম্প্রা শান্তির নিদর্শন স্বরূপ ১৭৫৭ খ্রীঃ রেঙ্গুন নগর স্থাপন করেন। এই রেঙ্গুনই বর্ত্তমানকালে বর্ম্মার রাজধানী। আলোম্প্রা সমগ্র বর্ম্মা প্রদেশের একছত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার সময়েই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ফরাশিশ জাতি বর্ম্মায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠেন। ইনি ইংরাজদিগকে আরাকানের তীর হইতে অদূরবর্ত্তী নিগ্রেইস

দ্বীপ দান করেন। ইহার অল্প দিন পরে ১৭৫৯ খ্রীঃ সিরিয়াম বন্দরস্থ ফরাশির্শ বণিকসম্প্রদায় পেগুয়ানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। ইংরাজদিগের সহিত ঐ ষড়যন্ত্রের কোনও সংশ্রব ছিল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু, ঐ বৎসর নিগ্রেইস দ্বীপস্থ প্রায় সমুদায় ইংরাজদিগকে হত্যা করার কথা হওয়াতে বোধ হয় ইংরাজেরা ষড়যন্ত্রের সহিত একবারে অসংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইংরাজেরা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া কাপ্তেন আভ্স্‌কে বর্ম্মায় প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজা আলোম্প্রার মৃত্যু ঘটে।

আলোম্প্রার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সিন-বিউ-শিন্ সিংহাসন অধিরোহণ করেন। এই সময়ে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে নানারূপে ব্যস্ত থাকায় নিগ্রেইস দ্বীপের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার অবসর পান নাই। সিন্-বিউ-শিন্ অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি মণিপুর হইতে মিকং নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড স্বরাজ্যভুক্ত করেন, চীনদিগের সহিত কয়েকবার যুদ্ধে জয়লাভ করেন, শ্যাম রাজধানী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন এবং শান রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইহার রাজত্বকালের পর হইতে চীনের সহিত বর্ম্মার আর বিশেষ কোনও মনোমালিন্য হয় নাই। চীনেরা কিন্তু সিন-বিউ-শিন্ কর্ত্তৃক পরাভব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বহু পূর্ব্ব হইতে বর্ম্মার উপর তাঁহাদের আধিপত্য চলিয়া আসিতেছিল, এবং সিন্-বিউ-শিনের সময়েও সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

সিন্-বিউ-শিনের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় এবং অবশেষে ১৭৮২ খ্রীঃ বো-ড-কায়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার সময় হইতেই বর্ম্মার সহিত ইংরাজের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল সর জন্ শোর বর্ম্মার সহিত ইংরাজের বাণিজ্যসম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার নিমিত্ত এবং বর্ম্মায় ফরাশি ক্ষমতা বিস্তার বন্ধ করিবার নিমিত্ত দূতস্বরূপ কাপ্তেন সাইমসকে বর্ম্মারাজের নিকট প্রেরণ করেন। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন, যে ইতিমধ্যে বর্ম্মারা চট্টগ্রাম সীমান্তে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কাপ্তেন সাইমসের দৌত্যের ফলে রেঙ্গুনে ইংরাজ রেসিডেন্সি স্থাপিত হয় এবং কাপ্তেন হিরাম্ ককৃস্ গভর্ণর-জেনারেলের প্রতিনিধি হইয়া ১৭৯৬ অব্দে রেঙ্গুনে উপস্থিত হন; কিন্তু অল্পদিন পরেই বর্ম্মাদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ইংরাজ বণিকদিগের সহিত স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। ইহার ফলে লর্ড ওয়েলেস্‌লি পুনরায় কাপ্তেন সাইমস্‌কে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ম্মায় প্রেরণ করেন। কথিত আছে কাপ্তেন সাইমস্ এই যাত্রায় বিশেষরূপে নিগৃহীত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া যান। ইহার পরেও ভারত গভর্ণমেণ্ট বর্ম্মার সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য কয়েকবার বিফল প্রয়াস করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে ফরাশির ভরসায় সাহসী হইয়াই বর্ম্মারাজ এই সময় তাঁহাদিগের সহিত অসদ্ব্যবহার করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা বর্ম্মার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে ঐ সময়ে বর্ম্মা অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন এবং বর্ম্মারাজ্য সুবিস্তীর্ণ ছিল। মণিপুর, আসাম ও কাছাড় ঐ সময় বর্ম্মা রাজ্যভুক্ত ছিল। বর্ম্মা সৈনিকেরা অত্যন্ত সাহসী ও সুনিপুণ ছিল। প্রথমে সিলেট ও আসামে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং বর্ম্মারা ইংরাজ সৈন্যকে পরাভূত করে। বর্ম্মা সেনাপতি মহাবাণ্ডুলা কয়েকবার ইংরাজদিগের দ্বাদশ সহস্র সৈন্যকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যুদ্ধের পর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ান্দেবুতে বর্ম্মার সহিত ইংরাজের সন্ধি হয়। সন্ধির ফলে আরাকান, টেনাসেরিম, মার্টাবানের কতক অংশ, কাছাড় ও আসাম ইংরাজেরা লাভ করেন, এবং মণিপুর "স্বাধীন অথচ ইংরাজের অধীন" এইরূপ সাব্যস্ত হয়।

যুদ্ধের পরেও বর্ম্মারাজ ইংরাজের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অবশ্য ইহা তাঁহার নিতান্ত দুরদৃষ্টেরই পরিচায়ক। লর্ড ডালহৌসি লিখিয়াছেন, "of all the Eastern natives with which the Government of India has had to do, the Burmese are the most arrogant and overbearing. * * *" ডালহৌসির উক্তি দ্বারা ইংরাজেরা বুঝাইতে চাহেন যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ম্মার বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয় তাহা অকারণ অথবা ইংরাজের রাজ্য-

লিপ্সামূলক নহে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ম্মাবাসীদিগের অতীত ঔদ্ধত্যের জন্য সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে ইংরাজরাজ পিগু প্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এই অভিযানের সময় বর্ম্মারাজ্যের সহিত কোনওরূপ সন্ধিস্থাপনও ইংরাজেরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

যে সময় বর্ম্মার সহিত ইংরাজের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় সে সময় রাজা মিণ্ডন মিন্ বর্ম্মার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ হইতে ১৮৩২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ম্মা রাজসভায় রীতিমত কোনও ইংরাজ দূত ছিলেন না। ১৮৬২ খ্রীঃ সার্ আর্থার ফেয়ার বর্ম্মার তদানীন্তন রাজধানী মন্দালয় নগরে তাঁহার একজন প্রতিনিধি রাখিয়া যান এবং এই সন্ধি করেন যে ইরাবতী নদীর উপর ইংরাজবণিক অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবেন, এবং বর্ম্মাবণিকও অবাধে ইংরাজ রাজ্যান্তর্গত ইরাবতী নদীর অপরাংশে বাণিজ্যার্থে অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবেন। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে বর্ম্মারাজ এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য করিতে কোনই চেষ্টা করেন নাই। ১৮৬৭ খ্রীঃ জেনারেল ফিচ্ বর্ম্মার সহিত আর একটী সন্ধি সংস্থাপন করেন। এই সন্ধি অনুসারে দশ বৎসরের জন্য ইংরাজ বণিককে বর্ম্মারাজ কতকগুলি সুবিধাদান করিতে স্বীকৃত হয়েন এবং ইহা দ্বারা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি পুনরায় দৃঢ়ীকৃত হয়। কিন্তু এত সন্ধি সত্ত্বেও ইংরাজরাজের সহিত বর্ম্মারাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয় নাই। মন্দালয়ে যে ইংরাজ রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহাকে ইংরাজ প্রজার দেওয়ানী মোকর্দ্দমা বিচার করিবার ক্ষমত দেওয়া হয়। এবং চীন ও বর্ম্মার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত ভামো নগরে ইংরাজদিগের পলিটিক্যাল এজেন্সী স্থাপিত হয়। কথিত আছে এই সময়ে ইংরাজ-দূতকে রাজদরবারে উপস্থিত হইতে হইলে পাদুকা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইত এবং রাজসভায় নতজানু হইয়া উপবিষ্ট হইতে হইত। ইংরাজেরা এই অপমানকর নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য বর্ম্মাগভর্ণমেণ্টের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই এই দেশাচার দূর করিতে পারেন নাই।

১৮৭৮ খ্রীঃ থিব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন রাজসভাসদদিগের চক্রান্ত দ্বারা তাঁহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করান হয়, নতুবা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। রাজসভায় চিরদিনই বিজ্ঞ বিচক্ষণ, ও মান্যগণ্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়। যদি তাঁহারা সকলে একমত হইয়া রাজবংশের ব্যক্তিবিশেষকে যোগ্যতম পাত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং যদি তাঁহাদের এই নির্ব্বাচন প্রজাসাধারণের অনভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনের উপর যথেষ্ট দাবী না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি দেখা যায় না। থিব দূরদর্শী রাজা ছিলেন বলিয়া বোধহয়। সিংহাসন অধিরোহণের পর তিনি নিজরাজ্যে রাজকার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে প্রজাদিগকে ক্ষমতা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন থিব তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ মিত্রতা করিবেন, ফলে কিন্তু তাহা হয় নাই। সিরাজ উদ্দৌলার ন্যায় থিবও ইংরাজদিগকে কখনও বিশ্বাস করেন নাই পরন্তু ঘৃণা করিতেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইংরাজপ্রজা অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাদের যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইংরাজের জাহাজ সকল আটক করিতেন, এবং তাহার উপর অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিতেন। এ সমস্ত "অত্যাচার" ইংরাজের অসহ্য হইয়া পড়ে। তাহার উপর রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই থিব রাজপ্রাসাদে কতকগুলি রাজবংশধর হত্যা করেন। এ সকল বিবরণ অবশ্য ইংরাজের তরফ হইতে পাওয়া যায়। আজ যদি রত্নাগিরি হইতে মুক্ত হইয়া থিব স্বরাজ্যে স্বাধীন ভাবে দিন যাপন করিতে পারিতেন তাহা হইলে ইংরাজের বিবরণ সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ করিবার সুবিধা হইত। ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন যে এই সময়ে তাঁহাদের রেসিডেণ্টের সহিত এরূপ অভদ্র ব্যবহার আরম্ভ করা হয়, যে ১৮৭৯ খ্রীঃ তাঁহাদের রেসিডেণ্ট মন্দালয় পরিত্যাগ করিয়া যান। শুনা যায় এই সময় থিব একজন নিজকর্ম্মচারীকে একটী নূতন সন্ধির খসড়ার সহিত ইংরাজ-রাজের নিকট প্রেরণ করেন। তাহার এই সন্ধির খসড়ার সর্ত্তগুলি জানি না, কিন্তু ইংরাজেরা বলেন যে এই সন্ধি অনুসারে তিনি অসথা ক্ষমতা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা আরও বলেন, যে এখন হইতে থিব স্বরাজ্য মধ্যে যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার অত্যাচারে দেশ অরাজক হইয়া উঠে। দলে দলে দস্যুগণ ভীষণ অরণ্যে আশ্রয় লইতে থাকে এবং রাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ

হয়। ইংরাজদিগের রাজ্যের পার্শ্বে অপর কোনও রাজ্যের এরূপ দুর্দ্দশা দেখা ক্রমে তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িল এবং থিবার রাজ্যের অরাজকতা ক্রমশঃ ইংরাজ অধিকৃত উচ্চ বর্ম্মাতেও অনুভূত হইতে লাগিল। ১৮৮২ খৃঃ থিব পুনরায় সন্ধি প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন, এবং লর্ড রিপন তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বেই তিনি দূতকে প্রত্যাগমন করিবার আদেশ দেন। ইংরাজেরা মনে করেন এই দূত প্রেরণ কেবল মাত্র ভাণ; প্রকৃত পক্ষে ইংরাজের যুদ্ধোদ্যোগ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করাই থিবর উদ্দেশ্য ছিল।

এতদিনে বোধ হয় থিব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে একাকী ইংরাজের সম্মুখীন হওয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ, এই সময় হইতে তিনি ফরাশি, ইতালী প্রভৃতি রাজ্যের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার বিশেষ প্রয়াস পাইতেছিলেন। শুনা যায় ফরাশি কারিগর দ্বারা স্বরাজ্য মধ্যে গুলি, গোলা, বন্দুক, কামান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবারও বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। থিবর এই সমস্ত আয়োজন ইংরাজ যে মনোমত বিবেচনা করেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই সময়ে হাস নামক একজন ফরাশিশের প্ররোচনায় থিব বম্বে বর্ম্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন নামক একদল বণিকসম্প্রদায়ের উপর অর্থদণ্ড করেন। এই বণিক সম্প্রদায়ের তরফ হইয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ করেন, কিন্তু থিব সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় আদেশই বাহাল রাখেন। সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেন এবং ইহাও বলেন যে তাঁহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে। ইংরাজদিগের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া থিব বর্ম্মাবাসীদিগকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ১৮৮৫ খ্রীঃ এক রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। এই যুদ্ধের পরিণাম কি হইল তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐ বৎসর নভেম্বর মাসের শেষ তারিখে বর্ম্মার শেষ স্বাধীন নরপতি ইংরাজের নিকট বন্দী হইলেন।

এতক্ষণ আমরা অতি সংক্ষেপে বর্ম্মার অতীত কাহিনী বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলাম। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ-সংগৃহীত উপাদান হইতেই এই কাহিনী গ্রথিত। স্বাধীন ভাবে বিদেশী ভাষায় স্বদেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, অথবা ইংরাজরচিত ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচার করিতে পারেন, বর্ম্মায় এখনও সেরূপ কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মার থিব যে বাঙ্গলার সিরাজের ন্যায় চরপনেয় কলঙ্ককালিমা মুক্ত হইয়া হতভাগ্য রাজকুমার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না এ কথা কে বলিতে পারে?

(২)

১৯০১ খ্রীঃ আদমসুমারীর গণনানুসারে বর্ম্মার লোকসংখ্যা ১০,৪৯০,৬২৪। বর্ম্মার মফস্বলে প্রত্যেক বর্গমাইলে গড়ে ৪৯ জন লোক বাস করে। ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে ১৯০১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ম্মায় শতকরা ৩৫·৮ জন হিসাবে লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ২০ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ হইতে বর্ম্মায় অনেক লোক আসিয়াছে, কিন্তু এখান হইতে অন্যদেশে বড় বেশী লোক যায় নাই। এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ইহাই প্রধান কারণ। ১৯০১ সালে অন্যায় প্রদেশে জাত ৬০২,৫০০ জন লোক বর্ম্মার লোকসংখ্যার মধ্যে গণিত হইয়াছিল কিন্তু বর্ম্মায় জাত কেবল মাত্র ৯,৪৬০ জন লোক অন্য প্রদেশে গণিত হইয়াছিল।

বর্ম্মায় প্রধানতঃ জর, উদরাময়, বিসূচিকা ও বসন্ত এই কয় রোগেই মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাস হইতে স্থানে স্থানে প্লেগও দেখা দিয়াছে। ঋতু বিশেষে কোনও কোনও জেলায় হৃদ্‌রোগ, যক্ষ্মা ও উদরাময়ের বিশেষ প্রকোপ লক্ষ্য হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বর্ম্মার স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। শীত কয়েকটী জেলা ব্যতীত অন্য স্থানে একরূপ নাই বলিলেও চলে। রেঙ্গুনে শীতকালেও কেবলমাত্র লংক্লথের শার্ট ব্যবহার করিলেও কোন অসুবিধা হয় না। বর্ষাকালে ক্রমাগত সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। সে সময়ে মধ্যে মধ্যে শীতবস্ত্র ব্যবহার করিলে আরাম বোধ হয়। এখানকার বৃষ্টিতে স্থানীয় লোকদের কোনও ক্ষতি হয় না। তাহারা এত বর্ষাতেও রীতিমত কাজকর্ম্ম করিতেছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেখানে একটু জল আবদ্ধ হইয়াছে, সেই-

যুবক অভিনেতা।

যুবক বাদক।

শোয়ে ডেগুন প্যাগোডার তোরণ।

ব্রহ্মদেশীয়া নর্ত্তকী।

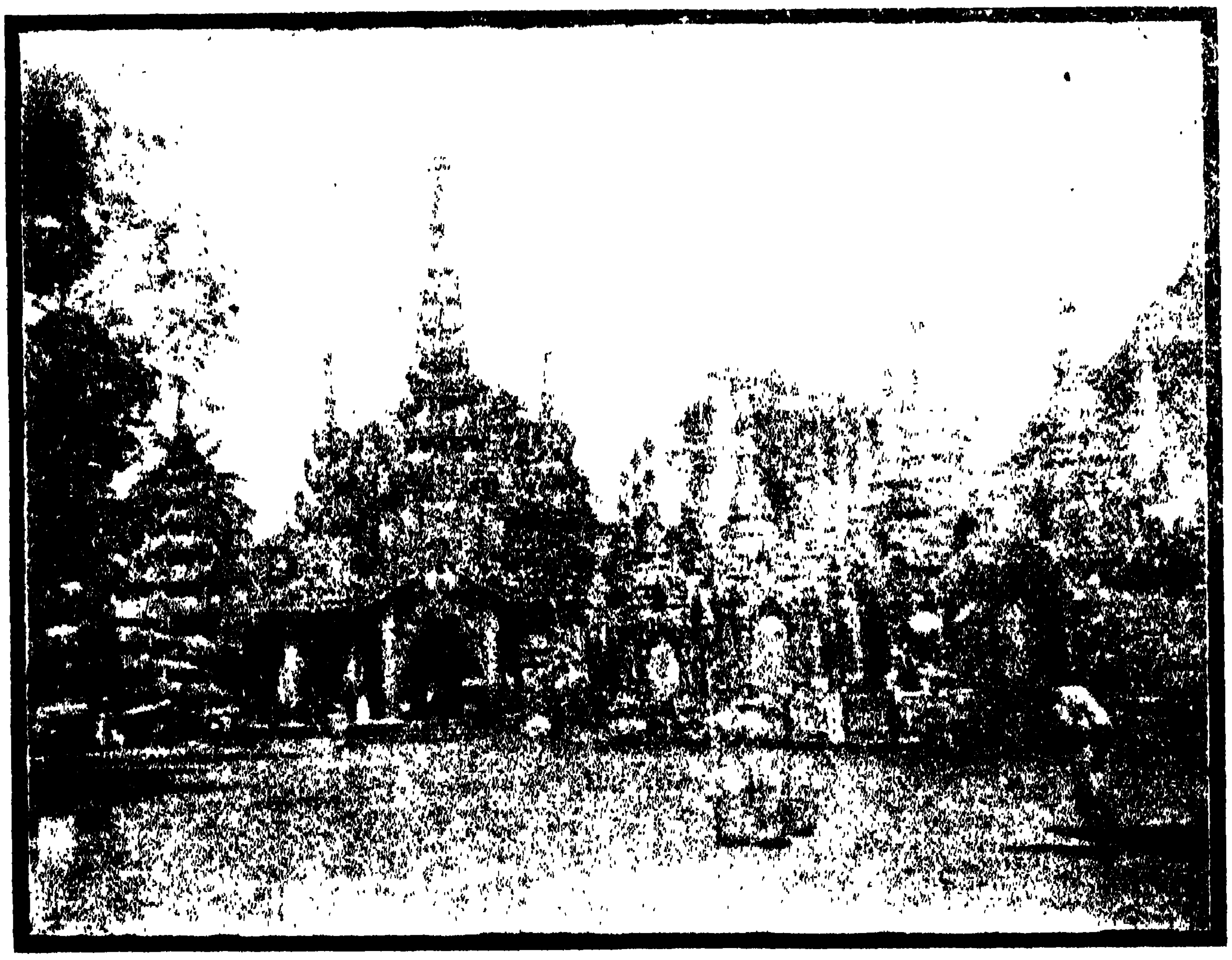

কতকগুলি প্যাগোডা

খানেই খেলা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ম্মার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আদৌ নাই। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধ। ভারতবর্ষে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও সিংহলে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম এতদুভয়ের সংমিশ্রণে বর্ম্মার বৌদ্ধ ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। বর্ম্মাবাসী বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত:— ১। মুলাগণ্ডী। ২। মহাগণ্ডী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধেরা বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপে বিশেষ অনুরক্ত, শেষোক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধেরা অদৃষ্টবাদী, তাহারা ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা দেবতার প্রীতিসাধন বিষয়ে বিশেষ আস্থাবান নহে। উপরে যে উভয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ দলাদলি নাই। উর্দ্ধ বর্ম্মার (Upper Burma) বৌদ্ধেরা তাহাদের একজন দলপতি নির্ব্বাচন করে। এই দলপতির নাম "থাথা না বাইং" (thathanabaing)। অবশ্য, ইংরাজ আমলে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হইলে নির্ব্বাচন সিদ্ধ হয় না। বর্ম্মার সকল স্থানেই ধর্ম্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির গুলিকে ইংরাজেরা pagodas (প্যাগোডা) বলিয়া থাকেন। মন্দিরগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত, আমাদের দেশের ঘণ্টার আকারের। কোনও কোনও মন্দিরের উপরাংশ সোণার পাত দিয়া মোড়া। এই সমস্ত ধর্ম্মমন্দির ব্যতীত বর্ম্মায় অসংখ্য "ফুঙ্গী-চঙ্গ" আছে। "ফুঙ্গী-চঙ্গ" পুরোহিত দিগের আশ্রম, বৌদ্ধ শ্রমণদিগের বিহার। অধিকাংশ আশ্রমই কাষ্ঠনির্ম্মিত, তবে কতকগুলি ইষ্টক নির্ম্মিতও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত আশ্রমগুলিই ইহাদের জাতীয় পাঠশালা। ধর্ম্মোপদেষ্টাই ইহাদের শিক্ষক। পল্লী-গ্রামে বালক বালিকারা এই সমস্ত আশ্রমেই লেখাপড়া শিক্ষা করে। বিদ্যাশিক্ষার পরেও ইহারা কিছু দিন এই সমস্ত আশ্রমে বাস করে। ইহাদের ধর্ম্মের নিয়ম এই যে প্রত্যেক পুরুষকেই কিছু দিনের জন্য পুরোহিতদিগের সহিত আশ্রমে বাস করিতে হইবে।

এখানকার পার্ব্বত্য জাতিগুলি বৌদ্ধ নহে। তাহারা মৃতব্যক্তির আত্মার উপাসনা করে। ভূত প্রেত বিশ্বাস করে। এমন কি নরহত্যা করিয়াও ইষ্টদেবতার প্রীতিসাধন করিতে ক্ষান্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত বর্ম্মায় হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। ১৯০১ খ্রীঃ আদমসুমারী অনুসারে বর্ম্মার হিন্দুর সংখ্যা ২৮৫,৪৮৪; মুসলমানের সংখ্যা ৩৩৯,৪৪৬; খ্রীষ্টানের সংখ্যা ১৪৭,৫২৫। খ্রীষ্টানদিগের যে সংখ্যা দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে বর্ম্মাবাসী খ্রীষ্টান সংখ্যা ১২১,১৯১।

বর্ম্মার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কিন্তু রেশম ও সূতার বস্ত্রবয়ন, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যেও অনেক লোক জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। সমগ্র অধিবাসী সংখ্যার শতকরা ৪·৩৪ বাণিজ্যে ও ২·৫৪ অন্যান্য ব্যবসায় ব্যাপৃত। সরকারী চাকুরীতে ১৯১,৭৯৬ অর্থাৎ শতকরা ১·৮৫ জন লোক ১৯০১ খ্রীঃ নিযুক্ত ছিল। বর্ম্মায় ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা কম। ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে বর্ম্মাবাসীরা বিশেষ পটু বলিয়া বোধ হয় না। রেঙ্গুনে যে সমস্ত চীনদেশীয় সওদাগর আছেন, তাঁহাদেরই ব্যবসায় বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়।

খাদ্য সম্বন্ধে বর্ম্মাবাসীদিগের বিশেষ কিছুতে আপত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের ন্যায় ইহারাও ভাত খায়। তবে ইহাদের চাউল, সবই আতপ। আমাদের দেশের ন্যায় সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে ইহারা জানে না। সকল রকম মৎস্য মাংসই ইহারা খায়। পিঁয়াজ ও রসুনে ইহারা বিশেষ অনুরক্ত। লবণাক্ত মৎস্য ইহারা বড় ভাল-বাসে। এই পচা শুষ্ক মৎস্যের এরূপ দুর্গন্ধ যে অনভ্যস্ত ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারে না। যদি কেহ আমাদের দেশ হইতে লোণা মাছের আমদানি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ সে ব্যবসা করিয়া কিছু কিছু লাভবান হইয়াছেন। কিন্তু বিপুল আয়োজনে এ ব্যবসা করিবার চেষ্টা কেহই করেন নাই।

বস্ত্রাদি সম্বন্ধে ইহারা বেশ পরিষ্কার পরিছন্ন। অবস্থানু-সারে অধিকাংশ লোকই রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের বস্ত্রের বিশেষ পার্থক্য নাই। আমাদের ন্যায় কাছা, কোঁচা ইহাদের নাই। তবে কোনও কোনও পুরুষ কোঁচার পরিবর্ত্তে খানিকটা কাপড় নাভির নিকট গুঁজিয়া রাখে। সকলেই সর্ব্বদা জামা গায়ে দেয়। পুরুষেরা মাথায় খানিকটা রেশমী বস্ত্র জড়াইয়া রাখে।

স্ত্রীলোকেরা ঐ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা গলদেশ ও বক্ষদেশ আবৃত রাখে। তাহারা মস্তকে কোনও রূপ আবরণ ব্যবহার করে না। শানদেশের রমণীরা সূতার বস্ত্র দ্বারা সময় সময় মস্তক আবৃত রাখে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ম্মাবাসীদিগের পোষাক পরিচ্ছদ যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ইহাদের আবাসগৃহগুলি কিন্তু সেরূপ নহে। সকলের গৃহেই বিলাতী দ্রব্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। বসিবার জন্য দুই চারিখানা বড় বড় কার্পেট সকলের গৃহেই আছে। কিন্তু জিনিসগুলি গুছাইয়া পরিষ্কারভাবে সজ্জিত রাখিতে সকলে জানে না। সহরবাসীরা সাহেবদের ন্যায় চেয়ার টেবিল ব্যবহার করে, এবং বাসগৃহের চতুর্দ্দিকে ফুলগাছের টব সাজাইয়া রাখে।

ইহারা আমাদের ন্যায় মৃতব্যক্তির দাহ করে না। মৃতের সমাধিই এখানকার সাধারণ নিয়ম। কোনও কোনও বিশিষ্ট পুরোহিত বা "ফুঙ্গী"র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বিশেষ সমারোহ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ তৈলের মধ্যে রাখিয়া ইহারা সকলে ভিক্ষা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করে। এইরূপে কখনও কখনও মৃত্যুর বৎসরান্তে মৃতব্যক্তির সৎকার হইয়া থাকে। কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া বড় বড় মন্দির বা প্যাগোডা প্রস্তুত করা হয়। সেই স্থানে সকলের সমক্ষে মৃতব্যক্তির দাহ করা হয়। ইহাকে "ফুঙ্গী বিয়ান" বলে। এই উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অনেক লোক সমবেত হয়, এবং সেখানে দেশীয় যাত্রা ও অন্যান্য আমোদপ্রমোদও হইতে দেখা যায়।

মৃতের জন্য আমাদের দেশের ন্যায় এখানে স্ত্রীলোকদের বিলাপ করিতে দেখা যায় না। মৃতের নিকট আত্মীয়গণ (পুত্র, কন্যা ইত্যাদি) কখনও কখনও বাষ্পমোচন করিয়া থাকে; কখনও কখনও বিলাপ করিবার জন্য অপর লোক নিযুক্ত করিবার কথাও শুনা যায়।

এখানকার লোকেরা আমোদপ্রমোদ খুবই পছন্দ করে। সকল প্রকার আমোদপ্রমোদকেই ইহারা 'পোএ' (pwe) বলে। এই সমস্ত আমোদপ্রমোদের মধ্যে ইহাদের দেশী থিয়েটারও আছে। তাহাতে পটাদির কোনও ঘটা নাই, এবং প্রায় সকল অভিনয়ের উপাখ্যানভাগই ধর্ম্মমূলক এবং বুদ্ধের জীবনী হইতে গৃহীত। কোনও কোনও অভিনয়ে স্ত্রীলোকেরাও যোগদান করে। নৌকার বাচ, ঘোড়দৌড়, গাড়ীদৌড়, ফুটবল, ঘুড়ী, দাবা, মার্ব্বেল খেলা ও অন্যান্য আমাদের দেশে প্রচলিত প্রায় সকল প্রকার ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুকে বর্ম্মাবাসীরা যোগদান করে।

আমরা যেমন নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করি, ইহারা তেমনি নামের পূর্ব্বে "মং" (Maung) শব্দ ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকদিগের নামের পূর্ব্বে "মা" (Ma) শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ইহারা খুব সদালাপী। সকলের সহিত মিশিতে খুব ইচ্ছুক। টুপীওয়ালাদিগকে বড় ভয় করে। কিন্তু আজি কালি সহরে বর্ম্মাবাসীরা টুপীওয়ালা দেখিয়া মস্তক অবনত করে না বলিয়া কোনও কোনও ইংরাজ লেখক আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাহেবদের ইচ্ছা নয় যে, ইহাদের চক্ষু ফুটিয়া উঠে। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প, এবং এখনও সাহেব-প্রীতি ইহাদের খুব বেশী। ইহারা এখনও মনে করে স্বদেশী রাজার রাজ্য অপেক্ষা ইহারা অধিক সুখে আছে। বিলাতীপণ্যে ইহাদের আপণ সকল পূর্ণ; বিলাতী বস্ত্রে ইহাদের দেহ এখনও সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত না হইলেও, অতি অল্প সময়েই হইবে বলিয়া বোধ হয়; বিলাতী বুটে পদদ্বয় শোভিত; বিলাতী ছত্রে ইহাদের মস্তক শীতল রাখে।

বর্ম্মাবাসীদিগের বিবাহপ্রথা অনেকটা নূতনতর। প্রায় সকল সভ্যজাতির মধ্যেই বিবাহ প্রথার সহিত ধর্ম্মের নিকট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বর্ম্মায় ঠিক তাহার বিপরীত। বিবাহের সহিত ধর্ম্মের এখানে কোনও সম্বন্ধ নাই। আমাদের দেশের ন্যায়, এখানেও বর ও কন্যার পিতামাতা নিজে অথবা ঘটক নিযুক্ত করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। কখনও কখনও পাত্রপাত্রী পিতামাতার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গান্ধর্ব্ব মতে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বিবাহোৎসবে এখানেও উভয় পক্ষের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ মিষ্টান্নের দাবী রাখেন। বালিকাবিবাহ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। পুরুষ অথবা স্ত্রীর বিবাহের কোনও নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। বিধবা বিবাহ এখানে প্রচলিত আছে, সুতরাং বিধবার সংখ্যা এখানে খুব কম। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ এখানে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং তাহাতে সামাজিক

কোনও কলঙ্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে পূর্ব্বে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন প্রায়ই তাহা কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু একেবারে যায় নাই।

(৩)

বর্ম্মারাজের সহিত প্রথম যুদ্ধের পর, ১৮২৬ খ্রীঃ ইংরাজেরা আরাকান্ ও টেনাসেরিম্ প্রদেশদ্বয় অধিকার করেন। সেই সময় আরাকান্ প্রদেশ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার অধীনে বঙ্গপ্রদেশের অংশরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং টেনাসেরিম্ প্রদেশের জন্য গভর্ণর-জেনারেলের অধীনে একজন কমিশনর নিযুক্ত হয়। পরে ১৮৫২ খ্রীঃ পিগু প্রদেশ ইংরাজশাসনাধীনে আসিলে পর, মার্টাবান্ টেনাসেরিমের কমিশনরের অংশে নির্দ্দিষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশের জন্য একজন স্বতন্ত্র কমিশনর নিযুক্ত হয়। এই নূতন কমিশনরের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে স্থাপিত হয় এবং টেনাসেরিম্ প্রদেশের কমিশনরের ন্যায় ইনিও গভর্ণর জেনারেলের অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ১৮৬২ খ্রীঃ ইংরাজ শাসনাধীন সমগ্র বর্ম্মা প্রদেশের জন্য চীফ্ কমিশনর নিযুক্ত হয়। বর্ম্মার প্রথম চীফ্ কমিশনর সার আর্থার ফেয়ার্। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে জেনারেল্ এ, ফীচে, সর্ এশ্লি ইডেন্, সর্ রিভার্স টমসন্, সর্ চার্লস্ এচিসন্, সর্ চার্লস্ বার্ণার্ড, সর্ চার্লস্ এষ্টওয়েট, সর্ এলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ও সর্ ফ্রেডারিক্ ফ্রায়ার্ এই আট জন বর্ম্মার চীফ্ কমিশনর নিযুক্ত হন। শেষ চীফ্ কমিশনর, সর্ ফ্রেডারিক্ ফ্রায়ারের সময় ১৮৯৭ খ্রীঃ বর্ম্মাপ্রদেশের জন্য একজন ছোটলাটের সৃষ্টি হয় এবং ইনিই প্রথম ছোটলাট নির্ব্বাচিত হন। তাহার পর ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সর্ হিউ বার্ণস্ (এক্ষণে ভারত-সভার সদস্য) বর্ম্মার ছোটলাট ছিলেন। বর্ম্মার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা সর্ হার্ব্বার্ট থার্কেল হোয়াইট্।

শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য ছোটলাটের পাঁচ জন সেক্রেটারী আছেন। সেক্রেটারীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ৪ জন আণ্ডার সেক্রেটারী ও দুই জন সহকারী-সেক্রেটারী আছেন। তদ্ব্যতীত রাজ্য-শাসনসংক্রান্ত প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক এক জন বিভাগীয় কর্ত্তা আছেন।

সমগ্র বর্ম্মাপ্রদেশ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত :—(১) উচ্চ (Upper) ও (২) নিম্ন (Lower) বর্ম্মা। প্রত্যেক বিভাগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। এই এক একটি বিভাগের জন্য এক একজন কমিশনর নিযুক্ত আছেন। সুতরাং সমগ্র বর্ম্মায় ৮টী বিভাগীয় কমিশনর আছেন। এই ৮জন কমিশনরের অধীনস্থ ৮টী প্রদেশের নাম :—

(১) আরাকান;
(২) পিগু;
(৩) ইরাবতী;
(৪) টেনাসেরিম্; } নিম্ন (Lower) বর্ম্মা।

(৫) মাগোয়ে;
(৬) মন্দালয়;
(৭) সাগাইন্;
(৮) মিক্‌টিলা। } উচ্চ (Upper) বর্ম্মা।

কমিশনরদিগের বেতন ২,৭৫০্। সিভিল্ সার্ভিসের কর্ম্মচারী (অথবা সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী যাঁহারা সিভিল্ সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন) ব্যতীত অন্য কেহ কমিশনর হইতে পারেন না। সমগ্র বর্ম্মাপ্রদেশ ৩৭টী জেলায় বিভক্ত। প্রতি জেলায় গড়ে ২৫০,০০০ জন লোক বাস করে। জেলার কর্ত্তাদিগের নাম ডেপুটী কমিশনর। জেলার কর্ত্তাদিগের পদগুলিও সাধারণতঃ সিভিল সার্ব্বিসের অন্তর্ভুক্ত। এই ৩৭টী জেলা, ৮২টী মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমার শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যেও অনেকগুলির পদ সিবিল সার্ব্বিসের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। অবশিষ্টগুলি এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার (আমাদের দেশীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) অথবা মিউক (আমাদের দেশীয় সব্‌ডেপুটী) দ্বারা চালিত। মহকুমাগুলি আবার ১৯৪ টাউনশিপে বিভক্ত। টাউনশিপগুলি মিউক্ দিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। ডেপুটী কমিশনর ব্যতীত প্রতি জেলায় একজন করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলিস ও সিভিল সার্জ্জনও আছে।

পূর্ব্বোক্ত আটটী বিভাগ ব্যতীত বর্ম্মায় আর তিনটী বিভাগ আছে যথা :—

(১) উত্তরশান্ রাজ্য
(২) দক্ষিণশান্ রাজ্য
(৩) চীন পার্ব্বত্যপ্রদেশ।

এই তিনটী বিভাগের কর্ত্তাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়া থাকে। এইগুলি এখনও দেশীয় রাজ্য বলিয়া

পরিগণিত হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ জমিদারী লইয়া এক একটী শান্ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিনানুমতিতে ইঁহাদের একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। শান্ জমিদারদিগকে 'সওবোয়া' বলে। একজন 'সওবোয়ার' মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীকেই সাধারণতঃ 'সওবোয়া' নিযুক্ত করা হয় এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহাকে একখানি 'সনন্দ' অথবা নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। তিনি সেই নিয়োগপত্রে লিখিত নিয়মে প্রজাপালন করিতে বাধ্য থাকেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই সমুচিত শাস্তি পাইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'সওবোয়া'দিগের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪ জন 'সওবোয়া' অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্য ৯টী করিয়া তোপ ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট আছে :—

(১) কেংটাং 'সওবোয়া'
(২) মংনেই „
(৩) সিপ „
(৪) ইয়ংহোয়ে „

১৮৯৭ খ্রীঃ যখন বর্ম্মার জন্য ছোটলাটের সৃষ্টি হয়, সেই সময় একটী ব্যবস্থাপক সভারও সৃষ্টি হয়। এই সভায় ছোটলাট ব্যতীত ৯ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ৯ জন সভ্যের মধ্যে ৫ জন সরকারী ও ৪ জন বেসরকারী। অন্যান্য ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় এখানে সভ্যেরা যথেচ্ছা প্রশ্ন করিবার অথবা বাৎসরিক আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত।

১৯০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ম্মায় বিচার ও শাসনবিভাগের বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। ঐ সময় দক্ষিণ বর্ম্মার জন্য ৫ জন বিভাগীয় বিচারকর্ত্তা, ও ৭ জন ডিষ্ট্রীক্ট জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশের সবজজ ও মুন্সেফ শ্রেণীর কর্ম্মচারীও ঐ সময় দক্ষিণ বর্ম্মায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন প্রায় প্রধান প্রধান সকল স্থানেই বিচার ও শাসন বিভিন্ন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত আছে। উচ্চ বর্ম্মায় কিন্তু এখনও সেরূপ ঘটে নাই। সেখানে বিভাগীয় কমিশনরগুলিই বিভাগীয় বিচার ও শাসন কর্ত্তা। কেবল মন্দালয়ে একজন ডিষ্ট্রিক্ট ও অতিরিক্ত সেসন জজ আছেন। উচ্চ বর্ম্মার কোনও কোনও জেলায় Headquarter's Assistant নামক কর্ম্মচারী আছেন বটে কিন্তু তাঁহারা জেলার ডেপুটী কমিশনরদিগের সহকারী ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। উত্তর বর্ম্মার সর্ব্বপ্রধান বিচারকের নাম জুডিশ্যাল কমিশনর। ইঁহার কাছারী মন্দালয়ে। বিভাগীয় কমিশনরদিগের নিকট হইতে যে কোনও আপীল ইঁহারই নিকট নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। দক্ষিণ বর্ম্মায় একটী চীফকোর্ট আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের যে ক্ষমতা দক্ষিণ বর্ম্মায় চীফকোর্টেরও সেই ক্ষমতা। ১৯০০ খ্রীঃ এই চীফ্ কোর্ট স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়ে এখানে ৪ জন বিচারক নিযুক্ত আছেন। তন্মধ্যে দুইজন সিভিল সার্ব্বিসের কর্ম্মচারী ও অপর দুইজন ব্যারিষ্টার জজ। এই বিচারালয়ের বর্ত্তমান বিচারপতি সর্ এডওয়ার্ড ফক্স্ পূর্ব্বে ব্যারিষ্টারী করিতেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ইংরাজ আমলের পূর্ব্ব হইতে এখন পর্য্যন্ত এদেশবাসীদিগের প্রাথমিক শিক্ষা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-যাজকদিগের হস্তেই ন্যস্ত আছে। ইংরাজেরাও এই প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করেন নাই। এই সমস্ত বিদ্যামন্দিরে দুরূহ বিষয় শিক্ষিত হয় না—সামান্য হস্তলিখন, পাটীগণিত, আবৃত্তি ইত্যাদি ইহাদের শিক্ষিতব্য বিষয়। বর্ম্মায় অনেকগুলি মিশনরি স্কুল হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এখনও দেশীয় বিদ্যামন্দিরগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ফলতঃ এখানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সরকারের বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ম্মার জন্য এখনও স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয় নাই এবং শীঘ্র হইবে এরূপ আশাও নাই। ১৮৮২ খ্রীঃ এখানে একটী এডুকেশনাল সিণ্ডিকেটের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সিণ্ডিকেট স্থানীয় পরীক্ষা পরিচালন করেন ও নিম্নশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ হইতে এই সিণ্ডিকেটে একজন বাঙ্গালী সদস্য কার্য্য করিতেছেন ; ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার এট্-ল। রেঙ্গুনে একটী প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজ আছে। এই কলেজেও একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক আছেন ; ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দে, এম, এ, (রায় চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত)। রেঙ্গুনে একটী বেসরকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। দুইটী কলেজই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। বর্ম্মায় স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃই বিস্তৃত

পূর্ণ পরিচ্ছদধারিণী শান রমণী।

ব্রহ্ম-মহিলা।

হইতেছে এইরূপ সকলের ধারণা। রেঙ্গুন কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায়ই স্ত্রীলোকেরা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৯০৪ খ্রীঃ বর্ম্মার ৪৭,৪৬৬ জন বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। এদেশে অবরোধ প্রথা নাই; স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তৃতির ইহাই প্রধান কারণ। ১৯০১ খ্রীঃ শতকরা ৫·৬ জন বালিকা স্কুলে শিক্ষিত হইতেছিল। এখানকার কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। সুতরাং যে সমস্ত বাঙ্গালী এখানে সপরিবারে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে।

১৮৭৪ খ্রীঃ বর্ম্মায় প্রথম মিউনিসিপাল আইন পাস হয় এবং ঐ বৎসর রেঙ্গুন, মৌলমীন, প্রোম, বেসিন, আকিয়াব, টংলু এবং হেনজেদা এই ৭টী নগরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। ঐ সমস্ত মিউনিসিপালিটীর সভ্য সেসময়ে চীফ কমিশনর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত। ১৮৮২।৩ খ্রীঃ নির্ব্বাচনপ্রথা বর্ম্মায় প্রথম প্রচলিত হয়; কিন্তু এই সভ্য-নির্ব্বাচন প্রথা বর্ম্মায় এ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট আদৃত হয় নাই। ১৯০৫ খ্রীঃ বর্ম্মায় সর্ব্বসমেত ৪২টী মিউনিসিপালিটী ছিল, তন্মধ্যে দুইটীতে (রেঙ্গুন ও মন্দালয়) ১ লক্ষের অধিক, ১৭টীতে ১০ হাজারের অধিক কিন্তু ১ লক্ষের কম, এবং ২৩টীতে ১০ হাজারের কম জনসংখ্যা ছিল। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটীতে গড়ে প্রত্যেককে ৬৷৷৪ পাই হিসাবে, এবং অন্যান্য মিউনিসিপালিটীতে প্রত্যেককে গড়ে ১৷৷৶৩ পাই হিসাবে কর দিতে হইত। ১৯০৪-৫ খ্রীঃ সমগ্র বর্ম্মায় মিউনিসিপালিটীর সভ্য ছিলেন ৫৪৩ জন, তন্মধ্যে ১৬১ জন সরকারী কর্ম্মচারী, ২৬৮ জন সরকারের তরফ হইতে নিয়োগ প্রাপ্ত ও অবশিষ্ট ১১৪ জন নির্ব্বাচিত সভ্য। রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটীর সভাপতি একজন সিভিল সার্ব্বিসের কর্ম্মচারী, এবং অন্যান্য মিউনিসিপালিটীগুলির সভাপতি জেলার ডেপুটী কমিশনর, অথবা স্থানীয় প্রধান সরকারী কর্ম্মচারী।

রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটীর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। রেঙ্গুন হইতে ১৮ মাইল দূরে 'হ্লগা' নামে একটী স্থান আছে। সেখানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গভর্ণমেণ্ট একটী প্রকাণ্ড হ্রদ প্রস্তুত করাইয়াছেন। এই হ্রদ হইতে রেঙ্গুনের অধিবাসীর জন্য জল আসিয়া থাকে। রেঙ্গুনের ড্রেনগুলিরও অবস্থা বেশ ভাল। ১৯০৩।৪ খ্রীঃ রেঙ্গুন মিউনিসিপালিটীর আয় হইয়া ছিল ২৪ লক্ষ ও ব্যয় হইয়াছিল ২১ লক্ষ টাকা।

বর্ম্মায় ডিষ্ট্রিক্ট অথবা লোকাল্ বোর্ড নাই কিন্তু প্রত্যেক ডেপুটী কমিশনরের অধীনে নিম্ন বর্ম্মায় একটী করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট ফণ্ড ও উত্তর বর্ম্মায় একটী করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট সেস্ ফণ্ড আছে। দক্ষিণ বর্ম্মায় এই ফণ্ডের আয় জমীর উপর নির্দ্দিষ্ট কর হইতে সঞ্চিত হয় এবং সমগ্র বর্ম্মায় পশ্বাদির গোয়াড়, পারঘাটা, বাজার ইত্যাদির আয় এই ফণ্ডে সঞ্চিত হয়। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ এই সকল ফণ্ডে ২৭ লক্ষেরও অধিক অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। এই সকল ফণ্ডে সঞ্চিত অর্থ হইতে জেলার রাস্তাগুলি মেরামত করান হয়, এবং অন্যান্য লোক-হিতকর কার্য্যে এই অর্থ ব্যয়িত হয়। ১৯০৩-৪ খ্রীঃ এই সকল ফণ্ড হইতে সর্ব্ব সমেত ব্যয় হইয়াছিল ২৬ লক্ষ টাকা।

বর্ম্মার প্রধান রেলওয়ে লাইন রেঙ্গুন হইতে বাহির হইয়া মিচিনা পর্য্যন্ত (৭২৪ মাইল) গিয়াছে। এই প্রধান লাইন হইতে কতকগুলি শাখাও বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত শাখা লাইনের একটী মিওহং হইতে বাহির হইয়া উত্তর শান্ রাজ্যের অন্তর্গত লাশিও পর্য্যন্ত (১৮০ মাইল) গিয়াছে। এই শাখা লাইনে ১,৬২০ ফুট লম্বা একটী লৌহ বর্ত্ম আছে। এই লৌহ বর্ত্ম সমতল ভূমি হইতে ৩২৫ ফুট উচ্চে দুইটী গিরিশৃঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যে প্রধান লাইনের কথা বলা হইয়াছে সেটি কিন্তু এখানকার প্রথম লাইন নহে। ১৮৭৭ খ্রীঃ রেঙ্গুন হইতে প্রোম পর্য্যন্ত (১৬১ মাইল) সর্ব্বপ্রথম লাইন খোলা হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বর্ম্মার রেল লাইনগুলি সরকারের অধীনে ছিল। ১৮৯৭ খ্রীঃ বর্ম্মা রেলওয়েজ্ কোম্পানী সরকারের সহিত লাইনগুলির বন্দোবস্ত করিয়া লয়। ঐ বন্দোবস্তে এরূপ ধার্য্য হয় যে কোম্পানীর মূলধন ৩০,০০০,০০০্ টাকায় শতকরা ২½ টাকা সুদ বাদ দিয়া যে লাভ থাকিবে তাহা সরকার ও কোম্পানীর মধ্যে ⅘ ও ⅕ হিসাবে বিভক্ত হইবে। ১৯০১ খ্রীঃ বর্ম্মায় সর্ব্বসমেত ১,১৭৮ মাইল রেল লাইন ছিল, এবং গড়ে প্রত্যেক মাইলের জন্য খরচ হইয়াছিল ৯৪,৩৯২্। বর্ম্মার লাইনগুলি মিটার গেজ্ (metre gauge)।

এক্ষণে রেঙ্গুন ও মন্দালয়ে বৈদ্যুতিক ট্রামও চলিতেছে।

১৮৬১ খ্রীঃ যখন ভারতীয় পুলিস আইন বিধিবদ্ধ হয়, সেই সময় বর্ম্মায় যথাযথ ভাবে পুলিসবিভাগের স্পষ্টি হয়। ১৯৯১ খ্রীঃ পুলিস বিভাগে ১২,৮৭৯ জন কর্ম্মচারী ছিল। পুলিস বিভাগের নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীর জন্য স্থানীয় লোক গৃহীত হয়, কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে এ দেশীয় লোকে পুলিস বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। টিকটিকি পুলিসের কার্য্য এ দেশীয় লোক দ্বারা আদৌ চলে না। স্থানে স্থানে এখনও নিগ্রহ পুলিস নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের ব্যয়ভার স্থানীয় লোকদিগকেই বহন করিতে হয়। বর্ম্মার সকল স্থানেই পুলিস বিভাগে পাঞ্জাবদেশীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খ্রীঃ বর্ম্মায় প্রথম মিলিটারি পুলিসের স্পষ্টি হয়। এই মিলিটারি পুলিসের ১২টী ব্যাটালিয়ন বা দল আছে; তন্মধ্যে ১০টী উচ্চ বর্ম্মার জন্য ও ২টী নিম্ন বর্ম্মার জন্য নিযুক্ত আছে। মিলিটারি পুলিসেও অধিকাংশ কর্ম্মচারী ভারতবাসী। প্রত্যেক দলের কর্ত্তাস্বরূপ এক একজন খাস গোরা কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাহাদের অধীনে ভারতীয় কর্ম্মচারী দ্বারাই এ বিভাগের কার্য্য চলিতেছে। ১৯০৩ খ্রীঃ বর্ম্মায় মিলিটারি পুলিসের সংখ্যা ছিল ১৫,০৬২। সিবিল পুলিসের কর্ম্মচারীদিগকে দা ও বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, এবং মিলিটারি পুলিসের কর্ম্মচারী সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীর ন্যায় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকে।

১৯০১ খ্রীঃ বর্ম্মায় ৩২টী জেল ছিল, এবং ঐ বৎসর কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১১,৭৩১। রেঙ্গুন, ইনসিন্ ও মন্দালয়ে ৩টী বড় জেল আছে; এ গুলি এক একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। অন্যান্য জেলগুলি জেলার সিবিল সার্জ্জন অথবা অন্য কোনও প্রধান সরকারী ডাক্তারের দ্বারা পরিচালিত হয়। চিকিৎসা বিভাগে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালী ডাক্তারগণ কর্ম্ম করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইনি সুখ্যাতির সহিত বহুদিন কর্ম্ম করিয়া অল্পদিন হইল কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মুন্সী, এল্, এম্, এস্।

বর্ম্মা হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে:—চাউল, কাঠ, খদির, চামড়া, পেট্রোলিয়ম তৈল, রবার, তুলা ও মূল্যবান প্রস্তরাদি। বিদেশ হইতে বর্ম্মায় আমদানি হয়:—রেশম, লোণা মৎস্য, পশম, সূতা, চটের থলি, সুপারি, মদ, তামাক লৌহ, কলকারখানার আবশ্যক দ্রব্যাদি, এবং চিনি। নিম্নলিখিত স্থান গুলি এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান:—রেঙ্গুন, মৌলমীন, আকিয়াব, বেসিন, ট্যাভয়, মাগুই, চ্যকফিউ, স্যাণ্ডোয়ে, মন্দালয়, ভামো, পাকোকু, প্রোম, হেন্‌জেদা ও মিঙ্খ্যান।

শ্রীঃ——

গোরা।

১০

উপরে গাড়িবারান্দায় একটা টেবিলে শুভ্র কাপড় পাতা;—টেবিল ঘেরিয়া চৌকি সাজানো। রেলিঙের বাহিরে কার্ণিশের উপরে ছোট ছোট টবে পাতাবাহার এবং ফুলের গাছ। বারান্দার উপর হইতে রাস্তার ধারের শিরীষ ও কৃষ্ণচূড়া গাছের বর্ষাজলধৌত পল্লবিত চিক্কণতা দেখা যাইতেছে।

সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই;—পশ্চিম আকাশ হইতে ম্লান রৌদ্র সোজা হইয়া বারান্দার এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

ছাতে তখন কেহ ছিল না। একটু পরেই সতীশ শাদা কালো রোঁয়া-ওয়ালা এক ছোট কুকুর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নাম খুদে। এই কুকুরের যত রকম বিদ্যা ছিল সতীশ তাহা বিনয়কে দেখাইয়া দিল। সে এক পা তুলিয়া সেলাম করিল, মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, একখণ্ড বিস্কুট দেখাইতেই ল্যাজের উপর বসিয়া দুই পা জড় করিয়া ভিক্ষা চাহিল;—এইরূপে খুদে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিল সতীশই তাহা আত্মসাৎ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিল—খুদের এই যশোলাভে লেশমাত্র উৎসাহ ছিল না;—বস্তুত যশের চেয়ে বিস্কুটটাকে সে ঢের বেশি সত্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিল।

কোন্ একটা ঘর হইতে মাঝে মাঝে মেয়েদের গলার খিল্‌খিল হাসি ও কৌতুকের কণ্ঠস্বর এবং তাহার সঙ্গে একজন পুরুষের গলাও শুনা যাইতেছিল। এই অপর্য্যাপ্ত হাস্য কৌতুকের শব্দে বিনয়ের মনের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে একটা যেন ঈর্ষার বেদনা বহন করিয়া

আনিল। ঘরের ভিতরে মেয়েদের গলার এই আনন্দের কলধ্বনি সে বয়স হওয়া অবধি এমন করিয়া কখনো শুনে নাই। এই আনন্দের মাধুর্য্য তাহার এত কাছে উচ্ছ্বসিত হইতেছে অথচ সে ইহা হইতে এত দূরে! সতীশ তাহার কানের কাছে কি বকিতেছিল বিনয় তাহা মন দিয়া শুনিতেই পারিল না।

পরেশ বাবুর স্ত্রী তাঁহার তিন মেয়েকে সঙ্গে করিয়া ছাতে আসিলেন—সঙ্গে একজন যুবক আসিল সে তাঁহাদের দূর আত্মীয়।

পরেশ বাবুর স্ত্রীর নাম বরদাসুন্দরী। তাঁহার বয়স অল্প নহে কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায় যে বিশেষ যত্ন করিয়া সাজ করিয়া আসিয়াছেন। বড় বয়স পর্য্যন্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত কাটাইয়া হঠাৎ এক সময় হইতে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান বেগে চলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার সিল্কের শাড়ি বেশি খস্‌খস্‌ এবং উঁচু গোড়ালির জুতা বেশি খট্‌খট্‌ শব্দ করে। পৃথিবীতে কোন্‌ জিনিষটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেই জন্যই রাধারাণীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি সুচরিতা রাখিয়াছেন। কোনো এক সম্পর্কে তাঁহার এক শ্বশুর বহুদিন পরে বিদেশের কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে জামাইষষ্ঠী পাঠাইয়াছিলেন—পরেশ বাবু তখন কর্ম্ম উপলক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন। বরদাসুন্দরী এই জামাইষষ্ঠীর উপহার সমস্ত ফিরৎ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এ সকল ব্যাপারকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন। মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমন ভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমতের একটা অঙ্গ। কোন ব্রাহ্ম পরিবারে মাটিতে আসন পাতিয়া খাইতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আজকাল ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার অভিমুখে পিছাইয়া পড়িতেছে।

তাঁহার বড় মেয়ের নাম লাবণ্য। সে মোটাসোটা, হাসিখুসি, লোকের সঙ্গ এবং গল্পগুজব ভালবাসে। মুখটি গোলগাল, চোখ দুটি বড়, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। বেশভূষার ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু ঢিলা কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মাতার শাসনে তাহাকে চলিতে হয়। উঁচু গোড়ালির জুতা সে পরিতে সুবিধা বোধ করে না, তবু না পরিয়া উপায় নাই। বিকালে সাজ করিবার সময় মা স্বহস্তে তাহার মুখে পাউডার ও দুই গালে রং লাগাইয়া দেন। একটু মোটা বলিয়া বরদাসুন্দরী তাহার জামা এমনি আঁট করিয়া তৈরি করাইয়াছেন যে লাবণ্য যখন সাজিয়া বাহির হইয়া আসে তখন মনে হয় যেন তাহাকে পাটের বস্তার মত কলে চাপ দিয়া আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে।

মেজ মেয়ের নাম ললিতা। সে বড় মেয়ের বিপরীত বলিলেই হয়। তাহার দিদির চেয়ে সে মাথায় লম্বা, রোগা, রং আর একটু কালো, কথাবার্ত্তা বেশি কয় না, সে আপনার নিয়মে চলে, ইচ্ছা করিলে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে পারে। বরদাসুন্দরী তাহাকে মনে মনে ভয় করেন, সহজে তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে সাহস করেন না।

ছোট লীলা, তাহার বয়স বছর দশেক হইবে। সে দৌড়ধাপ উপদ্রব করিতে মজবুৎ—সতীশের সঙ্গে তাহার ঠেলাঠেলি মারামারি সর্ব্বদাই চলে। বিশেষত ক্ষুদে নামধারী কুকুরটার স্বত্বাধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কোনো মীমাংসা হয় নাই। কুকুরের নিজের মত লইলে সে বোধ হয় উভয়ের মধ্যে কাহাকেও প্রভুরূপে নির্ব্বাচন করিত না;—তবু দুজনের মধ্যে সে বোধ করি সতীশকেই কিঞ্চিৎ পছন্দ করে। কারণ, লীলার আদরের বেগ সম্বরণ করা এই ছোট জন্তুটার পক্ষে সহজ ছিল না। বালিকার আদরের চেয়ে বালকের শাসন তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত সুসহ ছিল।

বরদাসুন্দরী আসিতেই বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরেশ বাবু কহিলেন—"এঁরই বাড়িতে সেদিন আমরা—"

বরদা কহিলেন—"ওঃ! বড় উপকার করেছেন—আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানবেন।"

শুনিয়া বিনয় এত সঙ্কুচিত হইয়া গেল যে, ঠিকমত উত্তর দিতে পারিল না।

মেয়েদের সঙ্গে যে যুবকটি আসিয়াছিল তাহার সঙ্গেও বিনয়ের আলাপ হইয়া গেল। তাহার নাম সুধীর। সে কলেজে বি এ পড়ে। চেহারাটি প্রিয়দর্শন, রং গৌর, চোখে চশমা, অল্প গোঁফের রেখা উঠিয়াছে। ভাবখানা

অত্যন্ত চঞ্চল—এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে চায় না, একটা কিছু করিবার জন্য ব্যস্ত। সর্ব্বদাই মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করিয়া বিরক্ত করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিয়াছে। মেয়েরাও তাহার প্রতি কেবলি তর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু সুধীরকে নহিলে তাহাঁদের কোনোমতেই চলে না। সার্কাস্ দেখাইতে, জুয়লজিকাল গার্ডনে লইয়া যাইতে, কোনো সখের জিনিষ কিনিয়া আনিতে সুধীর সর্ব্বদাই প্রস্তুত। মেয়েদের সঙ্গে সুধীরের অসঙ্কোচ হৃদ্যতার ভাব বিনয়ের কাছে অত্যন্ত নূতন এবং বিস্ময়কর ঠেকিল। প্রথমটা সে এইরূপ ব্যবহারকে মনে মনে নিন্দাই করিল কিন্তু সেই নিন্দার সঙ্গে একটু যেন ঈর্ষার ভাব মিশিতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"মনে হচ্চে আপনাকে যেন দুই একবার সমাজে দেখেচি।"

বিনয়ের মনে হইল যেন তাহার কি একটা অপরাধ ধরা পড়িল। সে অনাবশ্যক লজ্জা প্রকাশ করিয়া কহিল—"হাঁ, আমি কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বুঝি কলেজে পড়চেন ?"

বিনয় কহিল—"না, এখন আর কলেজে পড়িনে।"

বরদা কহিলেন—"আপনি কলেজে কতদূর পর্য্যন্ত পড়েচেন ?"

বিনয় কহিল—"এম এ পাস করেচি।"

শুনিয়া এই বালকের মত চেহারা যুবকের প্রতি বরদাসুন্দরীর শ্রদ্ধা হইল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পরেশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আমার মনু যদি থাক্‌ত তবে সেও এতদিনে এম এ পাস করে বের হত।"

বরদার প্রথম সন্তান মনোরঞ্জন নয় বছর বয়সে মারা গেছে। যে কোনো যুবক কোনো বড় পাস করিয়াছে, বা বড় পদ পাইয়াছে, ভাল বই লিখিয়াছে বা কোনো ভাল কাজ করিয়াছে শুনেন, বরদার তখনি মনে হয় মনু বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দ্বারাও ঠিক এইগুলি ঘটিত। যাহা হউক সে যখন নাই তখন বর্ত্তমানে জনসমাজে তাঁহার মেয়ে তিনটির গুণ প্রচারই বরদাসুন্দরীর একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তাঁহার মেয়েরা যে খুব পড়াশুনা করিতেছে একথা বরদা বিশেষ করিয়া বিনয়কে জানাইলেন;—মেম তাঁহার মেয়েদের বুদ্ধি ও গুণপনা সম্বন্ধে কবে কি বলিয়াছিল তাহাও বিনয়ের অগোচর রহিল না। যখন মেয়ে-ইস্কুলে প্রাইজ দিবার সময় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে তোড়া দিবার জন্য ইস্কুলের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লাবণ্যকেই বিশেষ করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং গবর্ণরের স্ত্রী লাবণ্যকে উৎসাহজনক কি একটা মিষ্টবাক্য বলিয়াছিলেন তাহাও বিনয় শুনিল।

অবশেষে বরদা লাবণ্যকে বলিলেন, "যে সেলাইটার জন্যে তুমি প্রাইজ্ পেয়েছিলে সেইটে নিয়ে এস ত মা!"

একটা পশমের সেলাই করা টিয়াপাখীর মূর্ত্তি এই বাড়ির আত্মীয় বন্ধুদের নিকটে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মেমের সহযোগিতায় এই জিনিষটা লাবণ্য অনেকদিন হইল রচনা করিয়াছিল—এই রচনায় লাবণ্যের নিজের কৃতিত্ব যে খুব বেশী ছিল তাহাও নহে—কিন্তু নূতন আলাপী মাত্রকেই এটা দেখাইতে হইবে সে ধরা কথা। পরেশ প্রথম প্রথম আপত্তি করিতেন কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ফল জানিয়া এখন আর আপত্তিও করেন না। এই পশমের টিয়াপাখীর রচনানৈপুণ্য লইয়া যখন বিনয় দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়াছে তখন বেহারা আসিয়া একখানি চিঠি পরেশের হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া পরেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন "বাবুকে উপরে নিয়ে আয়!"

বরদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ?"

পরেশ কহিলেন—"আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কৃষ্ণদয়াল তাঁর ছেলেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে পাঠিয়েচেন।"

হঠাৎ বিনয়ের হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল এবং তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার পরক্ষণেই সে হাত মুঠা করিয়া বেশ একটু শক্ত হইয়া বসিল—যেন কোনো প্রতিকূল পক্ষের বিরুদ্ধে সে নিজেকে দৃঢ় রাখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল। গোরা যে এই পরিবারের লোকদিগকে অশ্রদ্ধার সহিত দেখিবে ও বিচার করিবে ইহা আগে হইতেই বিনয়কে যেন কিছু উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

১১

খুঞ্চের উপর জলখাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা ছাতে আসিয়া বসিল এবং

সেই মুহূর্ত্তে বেহারার সঙ্গে গোরাও আসিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ শুভ্রকায় গোরার আকৃতি আয়তন ও সাজ দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিল।

গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা এক জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কট্‌কি জুতা। সে যেন বর্ত্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এরূপ সাজ সজ্জা বিনয়ও পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই।

আজ গোরার মনে একটা বিরোধের আগুন বিশেষ করিয়াই জ্বলিতেছিল। তাহার কারণও ঘটিয়াছিল।

গ্রহণের স্নান উপলক্ষ্যে কোনো ষ্টীমার কোম্পানি কাল প্রত্যুষে যাত্রী লইয়া ত্রিবেণী রওনা হইয়াছিল। পথের মধ্যে মধ্যে এক এক ষ্টেশন হইতে বহুতর স্ত্রীলোক যাত্রী দুই একজন পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে লইয়া জাহাজে উঠিতেছিল। পাছে জায়গা না পায় এজন্য ভারি ঠেলাঠেলি পড়িয়াছিল। পায়ে কাদা লইয়া জাহাজে চড়িবার তক্তাখানার উপরে টানাটানির চোটে পিছলে কেহবা অসম্বৃত অবস্থায় নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে; কাহাকেও বা খালাসী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে; কেহ বা নিজে উঠিয়াছে কিন্তু সঙ্গী উঠিতে পারে নাই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে;—মাঝে মাঝে দুই এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া তাহাদিগকে ভিজাইয়া দিতেছে;—জাহাজে তাহাদের বসিবার স্থান কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মুখে চোখে একটা ত্রস্তব্যস্ত উৎসুক সকরুণ ভাব, তাহারা শক্তিহীন অথচ তাহারা এত ক্ষুদ্র যে জাহাজের মাল্লা হইতে কর্ত্তা পর্য্যন্ত কেহই তাহাদের অনুনয়ে এতটুকু সাহায্য করিবে না ইহা নিশ্চয় জানে বলিয়া তাহাদের চেষ্টার মধ্যে ভারি একটা কাতর আশঙ্কা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গোরা যথাসাধ্য যাত্রীদিগকে সাহায্য করিতেছিল। উপরের ফার্ষ্ট ক্লাসের ডেকে একজন ইংরেজ এবং একটি আধুনিক ধরণের বাঙালীবাবু জাহাজের রেলিং ধরিয়া পরস্পর হাস্যালাপ করিতে করিতে চুরুট মুখে তামাসা দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে কোনো যাত্রীর বিশেষ কোনো আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া ইংরেজ হাসিয়া উঠিতেছিল এবং বাঙ্গালীটিও তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছিল।

দুই তিনটা ষ্টেশন এইরূপে পার হইলে গোরার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে উপরে উঠিয়া তার বজ্রগর্জ্জনে কহিল, "ধিক্ তোমাদের! লজ্জা নাই!" ইংরেজটা কঠোর দৃষ্টিতে গোরার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। বাঙালী উত্তর দিল,—"লজ্জা! দেশের এই সমস্ত পশুবৎ মূঢ়দের জন্যই লজ্জা!"

গোরা মুখ লাল করিয়া কহিল—"মূঢ়ের চেয়ে বড় পশু আছে—যার হৃদয় নেই!"

বাঙালী রাগ করিয়া কহিল—"এ তোমার জায়গা নয়—এ ফার্ষ্ট ক্লাস!"

গোরা কহিল—"না, তোমার সঙ্গে একত্রে আমার জায়গা নয়—আমার জায়গা ঐ যাত্রীদের সঙ্গে! কিন্তু আমি বলে যাচ্চি আর আমাকে তোমাদের এই ক্লাসে আসতে বাধ্য কোরো না!"

বলিয়া গোরা হন্ হন্ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। ইংরেজ তাহার পর হইতে আরাম কেদারার দুই হাতায় দুই পা তুলিয়া নভেল পড়ায় মনোনিবেশ করিল। তাহার সহযাত্রী বাঙালী তাহার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করিবার চেষ্টা দুই একবার করিল কিন্তু আর তাহা তেমন জমিল না। দেশের সাধারণ লোকের দলে সে নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য খানসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল মুরগির কোনো ডিশ আহারের জন্য পাওয়া যাইবে কি না। খান্‌সামা কহিল না, কেবল রুটি মাখন চা আছে। শুনিয়া ইংরেজকে শুনাইয়া বাঙালীটি ইংরেজি ভাষায় কহিল—"Creature Comforts সম্বন্ধে জাহাজের সমস্ত বন্দোবস্ত অত্যন্ত যাচ্ছেতাই।"

ইংরেজ কোনো উত্তর করিল না। টেবিলের উপর হইতে তাহার খবরের কাগজ উড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল। বাবু চৌকি হইতে উঠিয়া কাগজখানা তুলিয়া দিল কিন্তু থ্যাঙ্কস্ পাইল না।

চন্দননগরে পৌছিয়া নামিবার সময় সাহেব সহসা গোরার কাছে গিয়া টুপি একটু তুলিয়া কহিল—"নিজের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত—আশা করি আমাকে ক্ষমা করিবে।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী যে সাধারণ লোকদের দুর্গতি দেখিয়া বিদেশীকে ডাকিয়া লইয়া নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমানে

হাসিতে পারে ইহার আক্রোশ গোরাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশের জনসাধারণ এমন করিয়া নিজেকে সকল প্রকার অপমান ও দুর্ব্যবহারের অধীনে আনিয়াছে—তাহাদিগকে পশুর মত লাঞ্ছিত করিলে তাহারাও তাহা স্বীকার করে এবং সকলের কাছেই তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় ইহার মূলে যে একটা দেশব্যাপী সুগভীর অজ্ঞান আছে তাহার জন্য গোরার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; কিন্তু সকলের চেয়ে তাহার এই বাজিল যে, দেশের এই চিরন্তন অপমান ও দুর্গতিকে শিক্ষিত লোক আপনার গায়ে লয় না নিজেকে নির্ম্মম ভাবে পৃথক করিয়া লইয়া অকাতরে গৌরব বোধ করিতে পারে। আজ তাই শিক্ষিত লোকদের সমস্ত বই-পড়া ও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করিবার জন্যই গোরা কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ লাগাইয়া ও একটা নূতন অদ্ভুত কট্‌কি চটি কিনিয়া পরিয়া বুক ফুলাইয়া ব্রাহ্মব বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিনয় মনে মনে ইহা বুঝিতে পারিল, গোরার আজিকার এই যে সাজ ইহা যুদ্ধ সাজ। গোরা কি জানি কি করিয়া বসে এই ভাবিয়া বিনয়ের মনে একটা ভয়, একটা সঙ্কোচ এবং একটা বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিল।

বরদাসুন্দরী যখন বিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন তখন সতীশ অগত্যা ছাতের এক কোণে একটা টিনের লাঠিম ঘুরাইয়া নিজের চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত ছিল। গোরাকে দেখিয়া তাহার লাঠিম ঘোরানো বন্ধ হইয়া গেল ; সে ধীরে ধীরে বিনয়ের পাশে দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে গোরাকে দেখিতে লাগিল এবং কানে কানে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল "ইনিই কি আপনার বন্ধু ?"

বিনয় কহিল —"হাঁ।"

গোরা ছাতে আসিয়া মুহূর্ত্তের এক অংশ কাল বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আর যেন তাহাকে দেখিতেই পাইল না। পরেশকে নমস্কার করিয়া সে অসঙ্কোচে একটা চৌকি টেবিল হইতে কিছু দূরে সরাইয়া লইয়া বসিল। মেয়েরা যে এখানে কোনো এক জায়গায় আছে তাহা লক্ষ্য করা সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল।

বরদাসুন্দরী এই অসভ্যের নিকট হইতে মেয়েদিগকে লইয়া চলিয়া যাইবেন স্থির করিতেছিলেন এমন সময় পরেশ তাঁহাকে কহিলেন—"এঁর নাম গৌরমোহন, আমার বন্ধু কৃষ্ণদয়ালের ছেলে।"

তখন গোরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিল। যদিও বিনয়ের সঙ্গে আলোচনায় সুচরিতা গোরার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল তবু এই অভ্যাগতটিই যে বিনয়ের বন্ধু তাহা সে বুঝে নাই। প্রথম দৃষ্টিতেই গোরার প্রতি তাহার একটা আক্রোশ জন্মিল। ইংরাজি শেখা কোনো লোকের মধ্যে গোঁড়া হিন্দুয়ানি দেখিলে সহ্য করিতে পারে সুচরিতার সেরূপ সংস্কার ও সহিষ্ণুতা ছিল না।

পরেশ গোরার কাছে তাঁহার বাল্যবন্ধু কৃষ্ণদয়ালের খবর লইলেন। তাহার পরে নিজেদের ছাত্র অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন—"তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনেই এক জুড়ি ছিলুম—দুজনেই মস্ত কালাপাহাড় —কিছুই মানতুম না—হোটেলে খাওয়াটাই একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে মনে করতুম। দুজনে কতদিন সন্ধ্যার সময় গোলদিঘিতে বসে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে তার পরে কি রকম করে আমরা হিন্দু সমাজের সংস্কার করব রাত দুপুর পর্য্যন্ত তারই আলোচনা করতুম।"

বরদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন তিনি কি করেন ?"

গোরা কহিল—"এখন তিনি হিন্দু আচার পালন করেন।"

বরদা কহিলেন—"লজ্জা করে না ?"—রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল।

গোরা একটু হাসিয়া কহিল—"লজ্জা করাটা দুর্ব্বল স্বভাবের লক্ষণ। কেউ কেউ বাপের পরিচয় দিতে লজ্জা করে।"

বরদা। আগে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না ?

গোরা। আমিও ত এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলুম।

বরদা। এখন আপনি সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন ?

গোরা। আকার জিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন কুসংস্কার নেই। আকারকে গাল দিলেই কি সে ছোট হয়ে যায় ? আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেচে ?

পরেশ বাবু মৃদু স্বরে কহিলেন—"আকার যে অন্তবিশিষ্ট।"

গোরা কহিল—"অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেচেন—নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।

বরদা মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"নিরাকারের চেয়ে আকার সম্পূর্ণ আপনি এমন কথা বলেন?"

গোরা। আমি যদি নাও বলতুম তাতে কিছুই আস্‌ত যেত না। জগতে আকার আমার বলার উপর নির্ভর করচে না। নিরাকারই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হত তবে আকার কোথাও স্থান পেত না।

সুচরিতার অত্যন্ত ইচ্ছা করিতে লাগিল কেহ এই উদ্ধত যুবককে তর্কে একেবারে পরাস্ত লাঞ্ছিত করিয়া দেয়। বিনয় চুপ করিয়া বসিয়া গোরার কথা শুনিতেছে দেখিয়া তাহার মনে মনে রাগ হইল। গোরা এতই জোরের সঙ্গে কথা বলিতেছিল যে, এই জোরকে নত করিয়া দিবার জন্য সুচরিতার মনের মধ্যেও যেন জোর করিতে লাগিল।

এমন সময়ে বেহারা চায়ের জন্য কাৎলিতে গরম জল আনিল। সুচরিতা উঠিয়া চা তৈরি করিতে নিযুক্ত হইল। বিনয় মাঝে মাঝে চকিতের মত সুচরিতার মুখের দিকে চাহিয়া লইল। যদিচ উপাসনা সম্বন্ধে গোরার সঙ্গে বিনয়ের মতের বিশেষ পার্থক্য ছিল না তবু গোরা যে এই ব্রাহ্ম পরিবারের মাঝখানে অনাহূত আসিয়া বিরুদ্ধ মত এমন অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া যাইতেছে ইহাতে বিনয়কে পীড়া দিতে লাগিল। গোরার এই প্রকার যুদ্ধোদ্যত আচরণের সহিত তুলনা করিয়া বৃদ্ধ পরেশের একটি আত্মসমাহিত প্রশান্ত ভাব, সকল প্রকার তর্কবিতর্কের অতীত একটি গভীর প্রসন্নতা বিনয়ের হৃদয়কে ভক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—"মতামত কিছুই নয়, অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণতা, স্তব্ধতা ও আত্মপ্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে দুর্লভ। কথার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা তাহা লইয়া যতই তর্ক কর না কেন প্রাপ্তির মধ্যে যেটা সত্য সেইটাই আসল।" পরেশ সকল কথাবার্ত্তার মধ্যে মধ্যে এক একবার চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া লইতেছিলেন—ইহা তাঁহার অভ্যাস—তাঁহার সেই সময়কার আত্মনিবিষ্ট শান্ত মুখশ্রী বিনয় একদৃষ্টে দেখিতেছিল। গোরা যে এই বৃদ্ধের প্রতি ভক্তি অনুভব করিয়া নিজের বাক্য সংযত করিতেছিল না ইহাতে বিনয় বড়ই আঘাত পাইতেছিল।

সুচরিতা কয়েক পেয়ালা চা তৈরি করিয়া পরেশের মুখের দিকে চাহিল। কাহাকে চা খাইতে অনুরোধ করিবে না করিবে তাহা লইয়া তাহার মনে দ্বিধা হইতেছিল। বরদাসুন্দরী গোরার দিকে চাহিয়াই একেবারে বলিয়া বসিলেন—"আপনি এ সমস্ত কিছু খাবেন না বুঝি!"

গোরা কহিল—"না।"

বরদা। কেন? জাত যাবে?

গোরা কহিল—"হাঁ।"

বরদা। আপনি জাত মানেন?

গোরা। জাত কি আমার নিজের তৈরি যে মান্‌ব না? সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি।

বরদা। সমাজকে কি সব কথায় মান্‌তেই হবে?

গোরা। না মানলে সমাজকে ভাঙা হয়।

বরদা। ভাঙ্‌লে দোষ কি?

গোরা। যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি সে ডাল কাট্‌লেই বা দোষ কি?

সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—"মা, মিছে তর্ক করে লাভ কি? উনি আমাদের ছোঁওয়া খাবেন না।"

গোরা সুচরিতার মুখের দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি একবার স্থাপিত করিল। সুচরিতা বিনয়ের দিকে চাহিয়া ঈষৎ সংশয়ের সহিত কহিল—"আপনি কি—"

বিনয় কোনো কালে চা খায় না। মুসলমানের তৈরি পাঁউরুটি বিস্কুট খাওয়াও অনেক দিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছে কিন্তু আজ তাহার না খাইলে নয়। সে জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—"হাঁ খাইব বই কি!" বলিয়া গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোরার ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ একটু কঠোর হাসি দেখা দিল। বিনয়ের মুখে চা তিতো ও বিস্বাদ লাগিল কিন্তু সে খাইতে ছাড়িল না। বরদাসুন্দরী মনে মনে বলিলেন—"আহা, এই বিনয় ছেলেটি বড় ভাল।"

তখন তিনি গোরার দিক হইতে একেবারেই মুখ

ফিরাইয়া বিনয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। তাই দেখিয়া পরেশ আস্তে আস্তে গোরার কাছে তাঁর চৌকি টানিয়া লইয়া তার সঙ্গে মৃদুস্বরে আলাপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় রাস্তা দিয়া চীনের বাদামওয়ালা গরম চীনাবাদাম হাঁকিয়া যাইতেই লীলা হাততালি দিয়া উঠিল --কহিল—"সুধীর দা, চীনেবাদাম ডাক।"

বলিতেই ছাদের বারান্দা ধরিয়া সতীশ চীনাবাদামওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে সকলেই পানু বাবু বলিয়া সম্ভাষণ করিল কিন্তু তাঁহার আসল নাম হারানচন্দ্র নাগ। দলের মধ্যে ইঁহার বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। যদিও স্পষ্ট করিয়া কোনো পক্ষই কোনো কথাই বলে নাই তথাপি ইঁহার সঙ্গেই সুচরিতার বিবাহ হইবে এই প্রকারের একটা সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল। পানু বাবুর হৃদয় যে সুচরিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে কাহারো সন্দেহ ছিল না এবং ইহাই লইয়া মেয়েরা সুচরিতাকে সর্ব্বদা ঠাট্টা করিতে ছাড়িত না।

পানু বাবু ইস্কুলে মাষ্টারি করেন। বরদাসুন্দরী তাহাকে ইস্কুলমাষ্টার মাত্র জানিয়া বড় শ্রদ্ধা করেন না। তিনি ভাবে দেখান যে পানু বাবু যে তাঁহার কোনো মেয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই সে ভালই হইয়াছে। তাঁহার ভাবী জামাতারা ডেপুটিগিরির লক্ষ্যবেধরূপ অতি দুঃসাধ্য পণে আবদ্ধ।

সুচরিতা হারানকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া দিতেই লাবণ্য দূর হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। সেই হাসিটুকু বিনয়ের অগোচর রহিল না। অতি অল্প কালের মধ্যেই দুই একটা বিষয়ে বিনয়ের নজর বেশ একটু তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে ;--দর্শন নৈপুণ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে সে প্রসিদ্ধ ছিল না।

এই যে হারান ও সুধীর এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে অনেক দিন হইতে পরিচিত—এবং এই পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে তাহারা মেয়েদের মধ্যে পরস্পর ইঙ্গিতের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বিনয়ের বুকের মধ্যে ইহা বিধাতার অবিচার বলিয়া বাজিতে লাগিল।

এদিকে হারানের অভ্যাগমে সুচরিতার মন যেন একটু আশান্বিত হইয়া উঠিল। গোরার স্পর্দ্ধা যেমন করিয়া হোক্ কেহ দমন করিয়া দিলে তবে তাহার গায়ের জ্বালা মেটে। অন্য সময়ে হারানের তার্কিকতায় সে অনেকবার বিরক্ত হইয়াছে কিন্তু আজি এই তর্কবীরকে দেখিয়া সে আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে চা ও পাঁউরুটির রসদ জোগাইয়া দিল।

পরেশ কহিলেন—"পানু বাবু, ইনি আমাদের"—

হারান কহিলেন—"ওঁকে বিলক্ষণ জানি। উনি এক সময়ে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন।"

এই বলিয়া গোরার সঙ্গে কোনো প্রকার আলাপের চেষ্টা না করিয়া হারান চায়ের পেয়ালার প্রতি মন দিলেন।

সেই সময়ে দুই একজন মাত্র বাঙালী সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিয়াছেন। সুধীর তাঁহাদেরই একজনের অভ্যর্থনার গল্প তুলিল। হারান কহিলেন, "পরীক্ষায় বাঙালী যতই পাস করুন বাঙালীর দ্বারা কোন কাজ হবে না।"

কোনো বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ্ ডিষ্ট্রিক্টের ভার লইয়া যে কখনো কাজ চালাইতে পারিবে না ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য হারান বাঙালীর চরিত্রের নানা দোষ ও দুর্ব্বলতার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে তাহার সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করিয়া কহিল—"এই যদি সত্যই আপনার মত হয় তবে আপনি আরামে এই টেবিলে বসে বসে পাউরুটি চিবচ্চেন কোন্ লজ্জায়!"

হারান বিস্মিত হইয়া ভুরু তুলিয়া কহিলেন, "কি করতে বলেন ?"

গোরা। হয় বাঙালী চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন নয় গলায় দড়ি দিয়ে মরুনগে। আমাদের জাতের দ্বারা কখনো কিছুই হবে না একথা কি এতই সহজে বল্‌বার ? আপনার গলায় রুটি বেধে গেল না ?

হারান। সত্য কথা বলব না ?

গোরা। রাগ করবেন না, কিন্তু এ কথা যদি আপনি যথার্থই সত্য বলে জান্‌তেন তাহলে অমন আরামে অত আস্ফালন করে বল্‌তে পারতেন না। কথাটা মিথ্যে জানেন বলেই আপনার মুখ দিয়ে বেরল—হারান বাবু মিথ্যা পাপ,

মিথ্যা নিন্দা আরো পাপ, এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মত পাপ অল্পই আছে।

হারান ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। গোরা কহিল "আপনি একলাই কি আপনার সমস্ত স্বজাতির চেয়ে বড়? রাগ আপনি করবেন—আর আমাদের পিতৃপিতামহের হয়ে আমরা সমস্ত সহ্য করব!"

ইহার পর হারানের পক্ষে হার মানা আরো শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি আরো সুর চড়াইয়া বাঙালীর নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙালী সমাজের নানাপ্রকার প্রথার উল্লেখে কহিলেন—"এ সমস্ত থাকতে বাঙালীর কোনও আশা নাই।"

গোরা কহিল—"আপনি যাকে কুপ্রথা বলচেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ করে বলচেন—নিজে ও সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ইংরেজের সমস্ত কুপ্রথাকেও যখন আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা করতে পারবেন তখন এ সম্বন্ধে কথা কবেন।"

পরেশ এই প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ক্রুদ্ধ হারান নিবৃত্ত হইলেন না। সূর্য্য অস্ত গেল; মেঘের ভিতর হইতে একটা অপরূপ আরক্ত আভায় সমস্ত আকাশ লাবণ্যময় হইয়া উঠিল;—সমস্ত তর্কের কোলাহল ছাপাইয়া বিনয়ের প্রাণের ভিতরে একটা সুর বাজিতে লাগিল। পরেশ তাঁহার সায়ংকালীন উপাসনায় মন দিবার জন্য ছাত হইতে উঠিয়া গিয়া বাগানের প্রান্তে একটা বড় চাঁপা গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে গিয়া বসিলেন।

গোরার প্রতি বরদাসুন্দরীর মন যেমন বিমুখ হইয়াছিল হারানও তেমনি তাঁহার প্রিয় ছিল না। এই উভয়ের তর্ক যখন তাঁহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তিনি বিনয়কে ডাকিয়া কহিলেন,—"আসুন বিনয় বাবু আমরা ঘরে যাই।"

বরদাসুন্দরীর এই সস্নেহ পক্ষপাত স্বীকার করিয়া বিনয়কে ছাত ছাড়িয়া অগত্যা ঘরের মধ্যে যাইতে হইল। বরদা তাঁহার মেয়েদেরও ডাকিয়া লইলেন। সতীশ তর্কের গতিক দেখিয়া পূর্ব্বেই চীনাবাদামের কিঞ্চিৎ অংশ সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষুদে কুকুরকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধান করিয়াছিল।

বরদাসুন্দরী বিনয়ের কাছে তাঁহার মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাবণ্যকে বলিলেন,—"তোমার সেই খাতাটা এনে বিনয়বাবুকে দেখাও না।"

বাড়ীর নূতন আলাপীদের এই খাতা দেখানো লাবণ্যর অভ্যাস হইয়াছিল। এমন কি সে ইহার জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিয়া থাকিত। আজ তর্ক উঠিয়া পড়াতে সে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

বিনয় খাতা খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কবি মুর এবং লংফেলোর ইংরেজি কবিতা লেখা। হাতের অক্ষরে যত্ন এবং পারিপাট্য প্রকাশ পাইতেছে। কবিতাগুলির শিরোনামা এবং আরম্ভের অক্ষর রোমান ছাঁদে লিখিত।

এই লেখাগুলি দেখিয়া বিনয়ের মনে অকৃত্রিম বিস্ময় উৎপন্ন হইল। তখনকার দিনে মুরের কবিতা খাতায় কপি করিতে পারা মেয়েদের পক্ষে কম বাহাদুরী ছিল না। বিনয়ের মন যথোচিত অভিভূত হইয়াছে দেখিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহার মেঝোমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ললিতা, লক্ষ্মী মেয়ে আমার, তোমার সেই কবিতাটা—"

ললিতা শক্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—"না, মা, আমি পারব না। সে আমার ভাল মনে নেই।" বলিয়া সে দূরে জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল।

বরদাসুন্দরী বিনয়কে বুঝাইয়া দিলেন, মনে সমস্তই আছে কিন্তু ললিতা বড় চাপা, বিদ্যা বাহির করিতে চায় না। এই বলিয়া ললিতার আশ্চর্য্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় স্বরূপ দুই একটা ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, ললিতা শিশুকাল হইতেই এইরূপ; কান্না পাইলেও মেয়ে চোখের জল ফেলিতে চাহিত না। এ সম্বন্ধে বাপের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আলোচনা করিলেন।

এইবার লীলার পালা। তাহাকে অনুরোধ করিতেই সে প্রথমে খুব খানিকটে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহার পরে কলটেপা আর্গিনের মত অর্থ না বুঝিয়া "Twinkle twinkle little stars" কবিতাটা গড় গড় করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

এইবার সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে জানিয়া ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ছাতে তর্ক তখন উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। হারান তখন রাগের মাথায় তর্ক ছাড়িয়া গালি দিবার উপক্রম করিতেছেন। হারানের অসহিষ্ণুতায় লজ্জিত ও বিরক্ত হইয়া সুচরিতা গোরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।

হারানের পক্ষে সেটা কিছুমাত্র সান্ত্বনাজনক বা শান্তিকর হয় নাই।

আকাশে অন্ধকার এবং শ্রাবণের মেঘ ঘনাইয়া আসিল; বেলফুলের মালা হাঁকিয়া রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা চলিয়া গেল। সম্মুখের রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া গাছের পল্লবপুঞ্জের মধ্যে জোনাকি জ্বলিতে লাগিল। পাশের বাড়ীর পুকুরের জলের উপর একটা নিবিড় কালিমা পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করিয়া পরেশ ছাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোরা ও হারান উভয়েই লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইল। গোরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "রাত হয়ে গেছে আজ তবে আসি।"

বিনয়ও ঘর হইতে বিদায় লইয়া ছাতে আসিয়া দেখা দিল। পরেশ গোরাকে কহিলেন, "দেখ, তোমার যখন ইচ্ছা এখানে এসো। কৃষ্ণগোপাল আমার ভাইয়ের মত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এখন আমার মতের মিল নেই—দেখাও হয় না—চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ আছে কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুত্ব রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে। কৃষ্ণগোপালের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অতি নিকটের। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

পরেশের সস্নেহ শান্ত কণ্ঠস্বরে গোরার এতক্ষণকার তর্কতাপ যেন জুড়াইয়া গেল। প্রথমে আসিয়া গোরা পরেশকে বড় একটা খাতির করে নাই। যাইবার সময় যথার্থ ভক্তির সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গেল। সুচরিতাকে গোরা কোনো প্রকার বিদায় সম্ভাষণ করিল না। সুচরিতা যে সম্মুখে আছে ইহা কোনো আচরণের দ্বারা স্বীকার করাকেই সে অশিষ্টতা বলিয়া গণ্য করিল।
মুখ ... নতভাবে প্রণাম করিয়া সুচরিতার দিকে
না। অতি অল্প ক নমস্কার করিল এবং লজ্জিত হইয়া তাড়া-
নজর বেশ একটু তী তরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।
নৈপুণ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে ে য় সম্ভাষণ ব্যাপার এড়াইয়া ঘরের মধ্যে
এই যে হারান ও গার একটি ব্রহ্মসঙ্গীত বই লইয়া তাহার
অনেক দিন হইতে পরিচি ।
হাসের সঙ্গে এমন ভাবে ই া যাইবা মাত্র হারান দ্রুতপদে ছাতে
পরস্পর ইঙ্গিতের বিষয় হইয় —"দেখুন সকলের সঙ্গেই মেয়ে-
ইহা বিধাতার অবিচার বলিয়া আমি ভাল মনে করিনে।"

সুচরিতা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তা সে ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিল না; কহিল, "বাবা যদি ে নিয়ম মান্‌তেন তাহ'লে ত আপনার সঙ্গেও আমাদের আলা হতে পারত না।"

হারান কহিলেন—"আলাপ পরিচয় নিজেদের সমাজে মধ্যেই বদ্ধ হলে ভাল হয়।"

পরেশ হাসিয়া কহিলেন—"আপনি পারিবারিক অন্তঃপুরকে আর একটুখানি বড় করে একটা সামাজিক অন্তঃপুর বানাতে চান। কিন্তু আমি মনে করি নানা মতের ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেয়েদের মেশা উচিত; নইলে তাদের বুদ্ধিকে জোর করে খর্ব্ব করে রাখা হয়। এতে ভয় কিম্বা লজ্জার কারণ ত কিছু দেখিনে।"

হারান। ভিন্ন মতের লোকের সঙ্গে মেয়েরা মিশবে না এমন কথা বলিনে কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় সে ভদ্রতা যে এঁরা জানেন না।

পরেশ। না, না, বলেন কি! ভদ্রতার অভাব আপনি যাকে বলচেন সে একটা সঙ্কোচ মাত্র—মেয়েদের সঙ্গে না মিশ্‌লে সেটা কেটে যায় না।

সুচরিতা উদ্ধত ভাবে কহিল—"দেখুন, পানু বাবু, আজকের তর্কে আমাদের সমাজের লোকের ব্যবহারেই আমি লজ্জিত হচ্ছিলুম।"

ইতি মধ্যে লীলা দৌড়িয়া আসিয়া "দিদি" "দিদি" করিয়া সুচরিতার হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী।

স্বর্গীয় রাসবেহারী ঘোষের পিতা বাবু গুরুনারায়ণ ঘোষ ১৮০৭ সালে কলেক্টর আমুটী সাহেবের সহিত এলাহাবাদে আইসেন (কলিকাতায় আমুটী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দোকান অদ্যাবধি আমুটী কোম্পানী নামে বিখ্যাত)। এ দেশে তখন ২।৪ জন মাত্র বাঙ্গালী আসিয়াছিলেন। দেশ ছাড়িয়া এ দেশে আসাকে তখনকার লোকে বিপজ্জনক মনে করিত। গুরুনারায়ণ বাবু কলেক্টরি

আফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বাটী যেখানে সেই মুটীগঞ্জ নামক স্থান পূর্ব্বে ধুমন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান জমীদারের এলাকাধীন ছিল। আমুটী সাহেব গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাঁহাকে বারশত টাকা বার্ষিক পেনসন্ দিয়া উক্ত স্থান ক্রয় করিয়া নিজ নামে ইহার নামকরণ করেন ও (এখনও ধুমন খাঁর বংশধরগণ উক্ত পেন্সন ভোগ করিয়া থাকেন) গুরুনারায়ণ বাবুকে দান করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু গুরুনারায়ণ বাবু সমস্ত পল্লীটা না লইয়া প্রয়োজন মত অল্প স্থান লইয়া তাহাতে বাটী নির্ম্মাণ করান।

এই বাসভবনে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে রাসবেহারী বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা পাঁচ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিলেন। ইনি আপন পিতামাতার চতুর্থ পুত্র ছিলেন। দয়া, মায়া, পরোপকারিতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে লোকে মনুষ্যপদবাচ্য হয় রাসবেহারী বাবুর তৎসমুদয় যথেষ্ট ছিল। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি স্বগ্রামে (চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আনোরপুরে) গিয়াছিলেন। বাল্যশিক্ষা তাঁহার বারাসতের স্কুলে হয় ; দেশে যাইবার কিছুদিন পরে ইহাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। ১২ বৎসর বয়সে পুনরায় এলাহাবাদে আইসেন এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। তৎকালে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকদ্বয় বিখ্যাত ট্রেমস্ ও লিবিস্ সাহেব তাঁহার বুদ্ধিমত্তা দর্শনে তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

বাল্যাবধি রাসবেহারী বাবুর ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু হইয়া জনেক সন্ন্যাসীর সহিত বাটী হইতে চলিয়া যান। তাঁহার ভ্রাতারা অনেক অনুসন্ধানে ত্রিবেণীতীর হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইসেন ; "অবিবাহিতের সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই, ফিরিয়া যাইয়া বিবাহ কর, পরে সন্তানাদি হইলে এ পথের পথিক হইতে পারিবে" বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ও ভ্রাতৃগণের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছায় তিনি বাটী আসিলেন। তাঁহার সহোদরেরা অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সংসারাবদ্ধ করিলেন।

তিনি যেরূপ নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন, দেখিতেও সেইরূপ সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি ছিলেন, মিষ্টভাষী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া লোকে প্রীত হইত। ঘোড়ায় চড়িবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। যেমনই দুষ্ট ঘোড়া হউক না কেন তাঁহার শাসন মানিত। তিনি এরূপ বলশালী ছিলেন ও এরূপ ব্যায়ামকৌশল শিখিয়াছিলেন যে তৎকালে কুস্তীতে তাঁহার সমকক্ষ প্রায় কেহ ছিল না। মৃজাপুরের বিখ্যাত পালোয়ান ওস্তাদ সরনাম সিংএর নিকট তিনি কুস্তী শিখিয়াছিলেন। সরনাম সিংও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার শক্তির জন্য দুষ্ট বদমায়েস লোকেরাও তাঁহাকে ভয় এবং ভক্তি করিত। একবার তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাটী ডাকাত পড়িয়াছিল। তিনি শুনিয়া কয়েকজন অনুচর সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আমি থাকিতে তোরা এইরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিস ?" তাঁহাকে দেখিয়া ডাকাতের দলপতি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল "ক্ষমা করুন আমি জানিতাম না ইহা আপনার আত্মীয়ের বাটী"। এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সদলে তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি সেতার ও তবলা বাজাইতে সুনিপুণ ছিলেন এবং সুগায়কও ছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইত।

স্কুল ছাড়িয়া এত দিন তিনি কলেক্টরি আফিষে কর্ম্ম করিতেন। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাটী বুন্দেলখণ্ডে যান। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইহার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল ও তিনি কয়েকবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতে বাঁচিয়াছেন। সে সমস্ত বিস্তারিত লিখিতে গেলে একখানি সুন্দর সুবৃহৎ পুস্তক হয়। বাঁদার ৬০নং পূর্ব্বিয়া পল্টনে দেড়-শত টাকা বেতনে তাঁহার কেরাণীগিরি কর্ম্ম হয়। সেই পল্টন আম্বালায় যায়। তিনিও সপরিবারে আম্বালায় গেলেন। সেই পল্টনের অধ্যক্ষ কমাণ্ডিং কর্ণেল র‍্যাণ্ডেল ও আডজুটেণ্ট কাপ্তেন সেবিয়ার সাহেব ছিলেন। এই সাহেবদ্বয় বিশেষতঃ সেবিয়ার সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অম্বালা হইতে সে পল্টন যখন দিল্লী যায় রাসবেহারী বাবু তখন নিজ শ্যালক বাবু কামতানাথ কীর্ত্তির (তিনি ৬নং পল্টনে কর্ম্ম করিতেন) নিকট স্ত্রী পুত্র রাখিয়া পল্টনের সঙ্গে দিল্লি গেলেন। কর্ণালে পৌছিলে সংবাদ আসিল "রোতকে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে খাজনা লুট করিয়াছে ইংরাজদের মারিতেছে অতএব তোমরা এই পল্টন লইয়া রোতকে গিয়া তাহাদের শাসিত কর।" সে পল্টন দিল্লী

না গিয়া রোতকেন্টে যাইল। সেখানে পৌঁছিয়া প্রথম দিনেই কোর্ট মার্শেলের আইনানুযায়ী তদারক করিয়া ২৫।৩০ জনকে বিদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া আনিয়া ফাঁসী দেওয়া হয় (এই বিদ্রোহীদলের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও বড় জমীদারও ছিলেন)। ২য় দিনেও দোষী নির্দ্দোষী প্রায় ৫০ জনকে ধরিয়া আনিল ও তাহাদের ফাঁসীর হুকুম হইল! রাসবেহারী বাবু দেখিলেন দোষীর সঙ্গে নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড হয়। তিনি ভালরূপ তদন্ত করিয়া তাহাদের নির্দ্দোষিতার অনেক প্রমাণ পাইলেন এবং সাহেবদের বলিয়া প্রায় ৩০ জনের প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন! তাহারা মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ ও জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেল। তদবধি প্রত্যহ যে সমস্ত লোক ধরিয়া আনা হইত তাঁহার দয়াতে নির্দ্দোষী মাত্রেই মুক্তিলাভ করিত অর্থাৎ কোনরূপ অন্যায় বিচার হইত না।

এদিকে বিদ্রোহিগণ প্রত্যহ আপনাদের দলপুষ্ট করিতে লাগিল এবং বেরিলী মিরাট প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। সে ভয়ানক সময়ের কথা সকলেই অবগত আছেন।

৬০নং পল্টনের কর্ত্তারা পাছে তাঁহাদের সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে এই ভয়ে সদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। প্রজারা ও সিপাহীরা সকলেই রাসবেহারী বাবুকে ভালবাসিত ও মান্য করিত। তিনিও রাজার বিদ্রোহাচরণ করা কিরূপ অন্যায় ও বিপদকালে প্রভুর সাহায্য না করা কতদূর কৃতঘ্নের কাজ তাহা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু সিপাহীরা এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে রাজা বা প্রভু কিছুই মানিল না।

অন্য সকল পল্টনই প্রায় বিদ্রোহী হইয়াছিল। ৬০ নম্বর পল্টন তখন পর্য্যন্ত যদিও কার্য্যত কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ করে নাই কিন্তু আর থাকে না; ইহাদের ভাবভঙ্গীতে সর্ব্বদা অসন্তোষ ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল, যেন কাহারও আজ্ঞার প্রত্যাশী হইয়া রহিয়াছে হুকুম পাইলেই যেন পালন করিতে ব্যস্ত। এইভাবে দিন কয়েক গেল। একদিন কয়েক জন সিপাহী ২৫।৩০ জন ক্ষত্রিয়ানী স্ত্রীলোক ধরিয়া রাসবিহারী বাবুর নিকট লইয়া আসিল। তাহারা সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোক সকলেই সুন্দরী এবং অনেকেই যুবতী। তাহাদের সঙ্গে ২টি মাত্র পুরুষ। তাহারা এই ভীষণ বিপ্লবের সময়ে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া 'পাটিয়ালাভিমুখে যাইতেছিল। যে ভয়ে তাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া পলাইতেছিল তাহাদের তাহাই ঘটিল, পথিমধ্যে কৃতান্তকিঙ্করসদৃশ উন্মত্ত সিপাহীদের হাতেই পড়িল! পুরুষ ২টি ভয়ে ও অপমানে নির্ব্বাক; স্ত্রীলোকেরা মান ও প্রাণভয়ে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া কাঁদিয়াই আকুল হইল। সিপাহিরা তাহাদের বাবুকে বলিল, "বাবু সাহেব আপনি এখন ইহাদের বসাইয়া রাখুন; আপনি ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া আমাদের দিবেন, আমরা রাত্রে আসিয়া লইয়া যাইব।" সিপাহীরা চলিয়া গেলে স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিল, "বাবু আপনি গরীবের মা বাপ, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। সিপাহীদের নিকট পাঠাইবেন না।" তিনি তাহাদের আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, "মা সকল তোমরা কেঁদ না, স্থির হও; আমি তোমাদের সকলকেই বাঁচাইব। তোমরা ইচ্ছামত আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর।" তাহারা তাঁহার কথায় আশ্বস্ত হইল, লজ্জা ভয়ে ও পথশ্রমে তাহারা নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল, জল পান করিয়া সুস্থ হইল। সে সময়ে তাহাদের মনের যে কি ভয়ানক অবস্থা তাহা অননুমেয়। সন্ধ্যা হইলে রাসবেহারী বাবু স্বীয় প্রভু সেবিয়ার সাহেবের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন ও কয়েক জন বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে দিয়া সেই সব স্ত্রীলোক ও পুরুষ দুটিকে তাহাদের অভিলষিত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যাইবার কালীন তাহাদের যাহার নিকট যাহা ছিল স্বর্ণমুদ্রা হীরা জড়োয়া গহনা প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিষ দিয়া গেল ও প্রাণ ভরিয়া জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া গেল। তিনি ঐ সকল ধন রত্ন লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা কোন মতে শুনিল না। বলিল, "আমাদের ধন মান ও প্রাণ সমস্তই যাইতে বসিয়াছিল, আপনার কৃপায় আমরা এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম, এ ছার ধনের জন্য শেষে আবার অনর্থ ঘটিবে। আর আপনার এ উপকারের প্রতিশোধ দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। যৎকিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন।" সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট কাঁচলি ছিল। তাহাতে ছোট বড় অনেক হীরা বসান ছিল তন্মধ্যে ২ খানি হীরা এত বড় ও

এত উৎকৃষ্ট ছিল যে সেরূপ হীরা অনেক ধনশালী মহাজনের গৃহে থাকে না।

রাত্রি হইলে সিপাহীরা আসিয়া দেখিল শীকার তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। দেখিয়া উন্মত্ত সিপাহীরা বাবুর উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্ট বচনে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনার সহিত তাহাদের এরূপ বুঝাইলেন যে তাহারা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নত মস্তকে চলিয়া গেল। পরদিন তিনি ঐ সমস্ত দ্রব্য কাপ্তেন সেবিয়ার সাহেবকে দিলেন। উদারচেতা সেবিয়ার কিছুই লইলেন না, বলিলেন "এ সকল দ্রব্য জগদীশ্বর তোমায় সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বরূপ দিয়াছেন, তুমিই ইহা গ্রহণের উপযুক্ত।" রাসবেহারী বাবু বলিলেন "আপনি এসকল লইয়া চলুন, সমস্তই আপনার, আমাকে যাহা ইচ্ছা করিয়া দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব।" সেবিয়ার সাহেব বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই; আর এক দিন পরে অর্থাৎ ৮ই জুনে ট্রেজরি খুলিবে। খাজনায় জমা করিয়া দিলে আর কোন ভয় থাকিবে না। এখন তুমি নিজের কাছে রাখ।" ৭ই জুনের দিন কোন মতে কাটিল। গভীর রাত্রে যুদ্ধের সঙ্কেত-সূচক ভেরী ধ্বনি হইল। আর সমস্ত সিপাহীগণ আপন আপন স্থান হইতে আসিয়া একস্থানে সমবেত হইল। ঐ দিবস এক ব্যক্তি একখানা চিঠি লইয়া একজন সিপাহীকে দিয়া গিয়াছিল। পরে জানা গিয়াছিল দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীগণ এখানকার সিপাহীদের নিজদলে যোগ দিতে লিখিয়াছিল। সেই পত্রানুযায়ী তাহারা ভিতরে ভিতরে আপনাদের ইচ্ছামত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া গভীর নিশীথে "চলরে দিল্লী চলরে দিল্লী" বলিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তুমুল কোলাহলে সাহেবেরা জাগরিত হইয়া চমকিত হইলেন। অধ্যক্ষ র‍্যাণ্ডেল বলিলেন, "কাহার আজ্ঞায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ইহারা দিল্লী চলিল ইহাদের ভেরী বাজাইতেই বা কে বলিল ?" রাসবেহারী বাবুও সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখিতেছেন না, ইঁহারা ক্ষেপিয়াছে। এখন আর ইহাদের কিছু বলিবেন না। আপনারা শীঘ্র এখান হইতে দিল্লী প্রস্থান করুন। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" কর্ণেল বলিলেন, "যদি একশত সৈন্য আমার পক্ষে হয় আমি উহাদের নয়শতকে পরাস্ত করিতে পারি।" রাসবেহারী বাবু তাঁহাকে সে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। কারণ তখন আর সে চেষ্টা বৃথা। রাসবেহারী বাবু পুনঃ পুনঃ বলাতে কর্ণেল র‍্যানডেল কাপ্তেন সেবিয়ার ও আরও ৫।৭ জন ইংরাজ কর্ম্মচারী সেই রাত্রে দিল্লী প্রস্থান করিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীর দল সকলে একত্র হইলে প্রথমে সাহেবদের অনুসন্ধান করিল। তাহাদের না পাইয়া বাবুর খোঁজ করিল। বাবু তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া উহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন। সাহেবেরা কিয়দ্দূর গেলে তিনি যাইবেন। কারণ সকলে একসঙ্গে গেলে যদি উহারা দেখিতে পায় সকলকেই মারিবে। বরং তাহাদের সহিত কথোপকথনে খানিক সময় কাটাইলে ততক্ষণে সাহেবেরা দৃষ্টিপথাতীত হইয়া যাইতে পারিবেন, এই ভাবিয়া দাঁড়াইয়া তিনি নিজ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "তুমি আমাদের দলের নেতা হইয়া দিল্লী চল। আমরা দিল্লী জয় করিয়া তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব ও চিরদিন তোমার ভৃত্য হইয়া রহিব।" তিনি ইহাদের অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু নিরস্ত করা অসম্ভব দেখিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কৌশল করিয়া কহিলেন, "আমি দ্রব্যাদি লইয়া আসি।" এই বলিয়া তাহাদের নিষেধ না মানিয়া চলিয়া গেলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। শেষে রাগিয়া ৪।৫ জনে একেবারে তাহার উপর গুলি বর্ষণ করিল। তিনি গুলি আসিতেছে দেখিয়া উপস্থিত বুদ্ধিপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে শয়ন করিলেন। গুলি কয়টা চলিয়া গেলে উঠিয়া তিরস্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোরা হিন্দু হইয়া হিন্দুকে মারিস, প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিস; তোরা কি মনে করিয়াছিস্ ইংরাজকে মারিয়া রাজ্য লইবি ? তোদের কখন ভাল হইবে না।" তখন তাহারা বলিল, "আপনাকে মারা আমাদের অন্যায় হইয়াছে এবং আমাদের সে উদ্দেশ্যও ছিল না। এখন আমাদের সহিত চলুন, আমরা আপনার জিনিষপত্র আনাইতেছি।" এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা তাঁহার দ্রব্যাদি আনাইয়া ঘোর রোলে সকলে দিল্লী যাত্রা করিল। অগত্যা রাসবেহারী বাবুও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। তিন দিনে তাহারা দিল্লী পৌঁছিল। দিল্লীর বাহিরে হিন্দু রায়ের কুঠী নামক স্থানে তাম্বু স্থাপন করিয়া গোরা ও শিখ সৈন্য লইয়া ইংরাজ

প্রতিনিধিগণ অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন; বিদ্রোহী সিপাহীগণ প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া সহরে ঘোর অত্যাচার করিতেছিল। এই সময়ে রোতকের সৈন্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দ্বার খুলিতে বলায় ভিতর হইতে উত্তর আসিল, তোমরা আমাদের স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কিরূপে বুঝিব? প্রথমে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরীক্ষা দাও পরে ভিতরে আসিতে পাইবে। তাহারা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, রাসবেহারী বাবু তখন পলায়নের প্রকৃত অবসর বুঝিয়া যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পথসম্বল স্বরূপ ২০০৲ মাত্র টাকা লইয়া একদিন সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি অনবরত চলিয়া সকালে রোতকে আসিয়া পৌছিলেন। দৈবশক্তিবলে তিনি এক রাত্রে দিল্লী হইতে রোতকে আসিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় এত ফুলিয়াছিল যে জুতা কাটাইয়া খুলিতে হইয়াছিল!

তিনি রোতকে ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু সেখানে তখন মহা বিশৃঙ্খলা, বড়ই গোলমাল। সময় পাইয়া সহরের যত বদমায়েস ডাকাইতি লুট খুন করিতে লাগিল। সাধু সন্ন্যাসী ফকিরগণও তাহাদের হাতে নিষ্কৃতি পাইল না। তাহারা পথিক সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতি দেখিলেই ছদ্মবেশী গৃহস্থ ভাবিয়া নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। আবার সিপাহীরাও ইংরাজের গুপ্তচর ভাবিয়া তাহাদের হত্যা করিতে লাগিল! সে ভয়ানক বিপ্লবের কথা বর্ণনাতীত! চারিদিকে সেই ঘোর বিপদের সময় রাসবেহারী বাবু রোতকে ফিরিয়া আসিলেন। লুট, মার, হত্যা ক্রন্দনে সহর তোলপাড় হইতেছে। কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় না। একস্থানে একটা বড় মাটির স্তূপ ছিল। তাহার উপর একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি সেখানে আশ্রয় লইলেন। পূর্ব্বে রোতকে বাস কালীন সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিনিতেন। আশ্রয় দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া রীতিমত সন্ন্যাসী সাজাইলেন। বলিলেন, "ও বেশে মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরা পড়িবে এবং দুজনেরই প্রাণ যাইবে।" তিনি বলিলেন, "সন্ন্যাসীরাই নিরাপদ কোথায়? তবে যতক্ষণ যায় ততক্ষণ ভাল।"

একদিন সেখানে জন কয়েক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ইহাঁদের নিকট বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। নানা কথার পর একজন সন্ন্যাসী রাসবেহারী বাবুকে তামাকু সাজিতে বলায় তিনি উঠিলেন। নূতন সন্ন্যাসীরা স্তূপবাসী সন্ন্যাসীকে বলিল "তোর কাছে কি আছে দে নচেৎ তোকে হত্যা করিব।" তাহাদের কথার প্রণালী ও পরস্পর ইঙ্গিত প্রভৃতি দেখিয়া রাসবেহারী বাবুর মনে প্রথমাবধি সন্দেহ হইয়াছিল। পরে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া ইহারা যে সন্ন্যাসী বেশে দস্যু বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি কলিকার ছিদ্রে দিবার ঢিল খুঁজিতে খুঁজিতে স্তূপ হইতে নীচে অবতরণ করিয়া ভাবিলেন ইহাদের অভিপ্রায় দেখিতেছি ভাল নয়; ইহারা ৫।৭ জনে আক্রমণ করিলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না; বিশেষত ইহারা সশস্ত্র। এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের অলক্ষিতে যাইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ডাকাইতেরা গুপ্ত ধনের জন্য সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত যাতনা দিতে লাগিল। তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া চিমটা গরম করিয়া স্থানে স্থানে পোড়াইয়া দিল। সন্ন্যাসী যাতনায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। যে স্থানে সন্ন্যাসী বসিত ডাকাতেরা সে স্থান খুঁড়িয়াও যখন কিছু পাইল না তখন তাহারা তাঁহাকে সেই অবস্থায় সেখানে ফেলিয়া রাসবেহারী বাবুকে এদিক ওদিক খুঁজিল। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া নানাবিধ অকথ্য ভাষায় গালি দিতে দিতে প্রস্থান করিল। তাহারা চলিয়া গেলে রাসবেহারী বাবু বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সন্ন্যাসীর বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সাধু তুমি কোথায় ছিলে? ঈশ্বরকৃপায় তুমি যে দুরাত্মাদের হাতে পড় নাই এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। দেখ আমার কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। চল আমরা দুজনে এখান হইতে প্রস্থান করি।" এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন, ডাকাতেরা তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। তাঁহারা অতি দ্রুত বেগে চলিয়া সম্মুখে এক বৃহৎ জলাশয় দেখিয়া তাহাতেই ঝম্প প্রদান করিয়া সন্তরণে পার হইতে লাগিলেন। সেই জলাশয়ের ভিতরে খানিকটা পাথরের ঢিবি ছিল; তাহা জানা ছিল না বলিয়া অসাবধানতা বশতঃ সন্ন্যাসীর মাথায় তাহাতে দারুণ আঘাত লাগিল। রক্তপাত হইয়া চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইল

দেখিয়া রাসবেহারী বাবু একহাতে তাঁহাকে দৃঢ় রূপে ধরিয়া অপর হাতে সন্তরণ কাটিয়া সেই বৃহৎ জলাশয় পার হইলেন। পরপারে আসিয়া অনেক চেষ্টা ও যত্নে সন্ন্যাসীকে সুস্থ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ উভয়ে বিভিন্ন পথে প্রস্থান করিলেন।

দিল্লী হইতে আসিবার সময় পাথেয় স্বরূপ যে ২০০৲ শত টাকা লইয়া আসিয়াছিলেন এ পর্য্যন্ত তাহা তাঁহার নিকটেই ছিল। পথিপার্শ্বে একটি কূপের ধারে অতি সামান্য একটু খুঁড়িয়া সেই টাকা পুতিয়া রাখিয়া গেলেন। ভাবিলেন সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি শেষে এই সামান্য টাকার জন্য আবার বিপদে পড়িব।

কিন্তু জগদীশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন কেহই তাহাকে মারিতে পারে না; রোতকের সকল লোকই তাঁহাকে চিনিত এবং তিনি পল্টনে চাকুরী করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন এইরূপ মনে করিত তাই তাহারা তাঁহাকে খুজিতে লাগিল। রোতকে জন্মেজয় ঘোষ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন রাসবেহারী বাবু তাঁহাকে পিতৃব্য সম্বোধন করিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিলেন সেখানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা ধন রত্ন হইতে সামান্য আহারীয় দ্রব্য পর্য্যন্ত লুটিয়া লইয়া গিয়াছে; একখানি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত রাখিয়া যায় নাই।

তিনি কয়েক দিন সেখানে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর বাটী ফিরিতেছেন দেখিলেন চারিজন লোক একখানি খাটিয়ায় একটি মৃত দেহ লইয়া তাহার আগে আগে যাইতেছে ক্রমে তাহারাও জন্মেজয় বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল দেখিয়া তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। বাহকেরা গৃহস্বামীকে বলিল, "আমরা পল্টনের বাবু মনে করিয়া আপনার পুত্রকে মারিয়াছি। বোধ হয় এ এখনও বাঁচিয়া আছে, চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে।" তাহারা চলিয়া গেলে রাসবেহারী বাবু নিকটে আসিয়া দেখিলেন, কালী বাবুর সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত; তিনি অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছেন। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া জন্মেজয় ও তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুকষ্টে তিন দিন পরে তাঁহার চৈতন্য হয়। ঈশ্বরকৃপায় কালী বাবু সেই ভীষণ মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার পাইলেন।

আর একদিন রাসবেহারী বাবু পথে যাইতেছেন তাঁহার কানের নিকট দিয়া ছুটি গুলি শন্ শন্ করিয়া চলিয়া গেল। নিক্ষেপকারী অবশ্য তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়াই গুলি ছুড়িয়াছিল কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপার-মহিমা বলে তিনি সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন!

আর সহরে থাকা বিপদ জনক ভাবিয়া তিনি রোতক ছাড়িয়া একটি গ্রামে গিয়া রহিলেন। শান্তস্বভাব গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে "সাধু" দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক দুগ্ধ ফল মূল ইত্যাদি দিয়া যাইত। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাঁহাকে পুত্র সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে মা বলিতেন। ব্রাহ্মণী বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাকে ভালরূপ আহার করাইতেন। বৃদ্ধা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, তাঁহার বাটীর পার্শ্বে তাঁহার একটি শিবমন্দির ছিল। তিনি তাঁহাকে সেই মন্দিরে থাকিতে দিলেন।

তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তিতে সন্ন্যাসীর বেশ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। পূর্ব্ব হইতে তিনি কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানিতেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে করিয়া স্ব স্ব অভিপ্রায়ে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ তাঁহার কাছে আসিত। স্ত্রীলোকেরা ঔষধ লইতে, ছেলে ঝাড়াইতে, প্রশ্ন গণনা করাইতে আসিত। কেহ বা সাধু দর্শনে পুণ্য ভাবিয়া দর্শন করিতে বা আহার সামগ্রী দিতে আসিত। পুরুষেরা কেহ সেতার শিখিতে, কেহ গীত শিখিতে, কেহ ভজন শুনিতে কেহ বা শাস্ত্রালাপ করিতে আসিত। এই ভাবে তিনি সেখানে থাকিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন এবং দিন দিন গ্রামবাসিগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে দিল্লী প্রভৃতি স্থানও ক্রমে শাসিত হইল। এক দিন সেবিয়ার সাহেবের এক ভৃত্য কোন কার্য্যোপলক্ষে সেই গ্রামে আইসে। ঘটনা ক্রমে তিনি তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হইলেন। পরে তাহার নিকট নিজ প্রভু সেবিয়ার সাহেবকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া দিলেন যে "আমি এখানে এই ভাবে আছি, আমাকে লইয়া যান। সেবিয়ার সেই পত্র পাইয়া একশত দুর্রাণী সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাপ্তেন হড্সন্‌কে পাঠান। কাপ্তেন হড্সন্ এক সহস্র দুর্রাণী সৈন্য লইয়া একটি পল্টন গঠিত করেন। তাঁহার গঠিত পল্টনের নাম হড্সন্স্ হর্স্। তাহারই একশত সৈন্য লইয়া তিনি রোতকের নিকট সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ও গ্রামের প্রান্ত ভাগে তাঁবু খাটাইয়া সসৈন্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দুইজন সৈনিক প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া বলিল "পল্টনের বাবুকে তোমরা কে লুকাইয়া রাখিয়াছ শীঘ্র বাহির করিয়া দাও নচেৎ তোমাদের গ্রাম শুদ্ধ তোপে উড়াইয়া দিব।" গ্রামবাসিগণ তাহাদের "সাধু" কে "পল্টনের বাবু" বলিয়া কেহই জানিত না। সুতরাং সৈনিকদের কথায় তাহারা মহাভীত হইয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে গিয়া তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তিনি সৈন্যদের ডাকাইয়া বলিলেন, "আমাকে তোমাদের প্রভুর নিকট লইয়া চল, পল্টনের বাবুর সন্ধান আমি বলিয়া দিব।" পরে তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বাসিত করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইতে বলিয়া সৈন্যদের সঙ্গে হড্‌সন্ সাহেবের নিকট আসিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন, হড্‌সন্ সাহেব তাঁহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পূর্ব্ব লেখার সহিত হাতের লেখা মিলাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া সৈন্য সহিত দিল্লীতে পৌঁছিলেন। দিল্লীতে পৌঁছিয়া সেবিয়ার সাহেবের আজ্ঞার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। সাহেবের হুকুম ও সে দিনের "প্যারোলের" সঙ্কেত জানিয়া দূত ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেবিয়ার সাহেব তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তাঁহার বেশ দেখিয়া বীর সেবিয়ারের চক্ষে জল আসিল। সেই দিনই সাহেব তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলেন।

দিল্লীতে শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা অম্বালায় আসিলেন এবং তথা হইতে সপরিবারে এলাহাবাদে আইসেন। এই ভয়ানক বিপ্লবের সময় তাঁহার পরিবারবর্গ অত্যন্ত উদ্বেগে কালযাপন করিতেছিলেন। তিনি জীবিত আছেন এই সংবাদের জন্য কতই অর্থ ব্যয় করিয়াছেন; কিন্তু এ সংবাদ কেহই নিশ্চয়রূপে দিতে পারে নাই। অধিকন্তু অর্থলোভে অনেকে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি বলিয়া অর্থ আদায় করিত। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই মনে করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি ৪৩ বৎসর জীবিত ছিলেন।

এলাহাবাদে আসিয়া তিনি পুনরায় কলেক্টরি আফিষে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; এবং কিছুদিন কর্ম্ম করণান্তর যথাকালে পেন্সন লইলেন; পেন্সন লইয়া সমস্ত সাংসারিক ভার পুত্রদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরোপাসনা ও অবকাশ মত চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ অনেক লোক তাঁহার নিকট আসিত (বাটী হইতে তিনি বড় একটা কোথাও যাইতেন না)। কেহই বিফলমনোরথ হইত না. তাঁহার হাতে রোগী প্রায় মরিত না। অনেক ইংরাজও তাঁহার নিকট প্লীহা ঝাড়াইয়া আরোগ্য হইয়াছেন। ছোট ছোট ইংরাজের ছেলে মেয়ে তাঁহার নিকট অনেকেই ঝাড় ফুঁকের জন্য আসিত। একবার একটি স্ত্রীলোককে সাপে কামড়াইয়াছিল। বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার তার চিকিৎসা করেন; কিছুতেই তাহাকে আরোগ্য করিতে না পারিয়া মৃতজ্ঞানে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তাহার অভিভাবকেরা একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য সেই মৃত দেহ পালকী করিয়া রাসবেহারী বাবুর নিকট লইয়া আসিল। তাহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে কোন বিচক্ষণ ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া মৃত দেহ ভিন্ন আর কিছু মনে করিতে পারিতেন না। কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া তিনি তাহাকে আরোগ্য করিলেন।

রাসবেহারী বাবু জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন কিন্তু শেষ দশায় পৌত্রের শোক আর তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পৌত্রটী মারা যায়। তাঁহার জীবদ্দশায়ই জ্যেষ্ঠ পুত্র বেহারী বাবু মারা যান, দুটি জামাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যার শোকও তাঁহাকে পাইতে হইয়াছিল।

উপর্য্যুপরি অনেক শোক পাইয়া তাঁহার পত্নী ভয়ানক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রায় চারিবৎসরকাল কষ্ট পাইয়া অবশেষে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু রাসবেহারী বাবু এই সকল ভয়ানক শোক সমস্ত জগদীশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তাঁহার নিকট সতত সাধু সন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। তাঁহাদের সহিত আলাপে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইতেন।

অনেকেরই ধারণা অধিক বয়সে লেখাপড়া হয় না; কিন্তু এত বয়সেও তিনি শিবসংহিতা ঘেরণ্ডসংহিতা প্রভৃতি

গ্রন্থের শ্লোক সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র মারা যাওয়ার পর হইতে তিনি চোখে ঝাপ্‌সা দেখিতেন তথাপি তিনি লেখাপড়ায় বিরত ছিলেন না। চসমা চোখে দিয়া আবশ্যকীয় কাজ নির্ব্বাহ করিতেন।

রাসবেহারী বাবু অনেক সৎকাজ করিয়াছেন। এলাহাবাদে ৺কালীবাড়ী করিয়া কালিকাদেবী প্রতিষ্ঠিত করেন (তাঁহাদেরই জমীতে কালীবাড়ী তৈয়ার হইয়াছে); ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীকে তিনিই আনয়ন করেন (এই ব্রহ্মচারী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে ৺কালী স্থাপনা করেন, তন্মধ্যে দিল্লীতে কালীবাড়ী করিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন)। ধর্ম্মে ঐকান্তিক ভক্তি ছাড়া আরও একটি সদুদ্দেশ্যে কালীবাড়ী স্থাপিত হয়; বিদেশী আশ্রয়হীন ব্যক্তিরা দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া ও আহার পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বে এই সহরের সমস্ত ময়লা ও আবর্জ্জনা গঙ্গার জলে ফেলা হইত। হিন্দুমাত্রেই ইহাতেই বিরক্ত হইতেন কিন্তু অপ্রিয় হইবে ভাবিয়া কেহ কখন কর্ত্তৃপক্ষকে নিষেধ করিতেন না। রাসবেহারী বাবু তদানীন্তন কলেক্টর রবার্টসন্ সাহেবকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে উগ্রপ্রকৃতি রবার্টসন্ প্রথমতঃ রাগিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহার ন্যায়যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া অন্যায় স্বীকার করিলেন। তদবধি গঙ্গার জলে ময়লা ও জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হইয়া এলাহাবাদের প্রান্তভাগে রাজাপুর নামক স্থানে ফেলা হইতে লাগিল। সেই সকল ইট প্রস্তুতের বড় বড় গর্ত্ত ভরাট হইয়া সার প্রস্তুত হইয়া গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট লাভও হইতে লাগিল। এই কার্য্য করাতে তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন।

তিনি এমনই কার্য্যক্ষম ও সুস্থদেহ ছিলেন যে, দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়াছিলেন কখন কামাই হয় নাই কখন ছুটী লয়েন নাই!

তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও সুস্বাস্থ্যের গুণে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বল অটুট ছিল। ৮৫ বৎসর বয়সেও অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজের সমুদায় কাজ নিজে নির্ব্বাহ করিতেন! ২৮ বৎসরকাল পেন্‌সন্ ভোগ করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ১৯০০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্ত পুণ্যময় স্থানে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

জনৈক প্রবাসী।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেন কি না ?

শঙ্করাচার্য্যের উপরে যত প্রকার অবিচার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এইটাই সর্ব্বপ্রধান। বিদেশীয় পণ্ডিতবর্গের ত কথাই নাই, ভারতেরও অনেক পণ্ডিত পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, "শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করেন নাই"; "শঙ্করদর্শনে জগতের স্থান নাই," এবং "শঙ্কর কেবলমাত্র বিবর্ত্তবাদী ও তিনি পরিণামবাদ স্বীকার করিতেন না"। আমরা এই প্রবন্ধে, শঙ্করোক্তি দ্বারাই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এ সকল মত অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। শঙ্কর-ভাষ্য অত্যন্ত বিপ্রকীর্ণ। নানা স্থানে নানা প্রকারের তত্ত্ব ভাষ্যে বিকীর্ণভাবে উক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষমাত্র দেখিয়াই, অল্পধী ব্যক্তিগণ একটা একটা ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া থাকেন। শঙ্করকে বুঝিতে হইলে, ভাষ্যের অংশগুলির একবাক্যতা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু একবাক্যতা করিয়া লইতে যতটা পরিশ্রম স্বীকার করা আবশ্যক, অনেকেই সে কষ্ট স্বীকার করেন না; কিন্তু সিদ্ধান্ত করিতে অত্যন্ত মজ্‌বুৎ। আমরা বড় দুঃখেই এই সকল অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা এ প্রবন্ধে শঙ্করোক্তি উদ্ধৃত করিব; কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে, এই জন্য আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়া দিব। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল ভাষ্যাংশ দেখিয়া লইবেন।

এ কথা সকলেই জানেন যে, শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ও সগুণ ভেদে—ব্রহ্মের দুই প্রকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মই* যখন সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তখন তাঁহাকেই সগুণ বা কারণ ব্রহ্ম বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

* নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের অর্থ পূর্ণগুণ ও পূর্ণ শক্তিস্বরূপ। মৎ-প্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের ১১৯ হইতে ১৩৩ পৃষ্ঠায় নির্গুণাদি শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

নিগুর্ণ ব্রহ্মই শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কার্য্য দ্বারাই কারণের অনুমান করা যায়। জগতে যে বিবিধ বিকার দেখা যাইতেছে, এই বিকারগুলির একটী নিশ্চয়ই উপাদান-কারণ আছে। এই উপাদান কারণই "শক্তি"*। এই শক্তিরূপ উপাদান-কারণ-যোগে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন। শঙ্করাচার্য্য এই শক্তিকে "অব্যাকৃত," "অব্যক্ত," "অক্ষর," "মায়াশক্তি," "প্রাণশক্তি," "নামরূপের বীজ"—এই সকল নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে ভাষ্যের কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া, সেই অংশগুলিতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

(১) কঠোপনিষদের (৩।১১) ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন —"অব্যক্তই জগতের মূল বীজ। জগতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও কারণশক্তির এই অব্যক্তই মূলবীজ। বটকণিকায় যেমন বটবৃক্ষের বীজ নিহিত থাকে, তদ্রূপ এই অব্যক্তশক্তি ব্রহ্মে নিহিত আছে"। টীকাকার আনন্দগিরি এই ভাষ্য এইরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন—"প্রলয়কালে সমুদয় জগৎ শক্তিরূপে অবস্থান করে।† শক্তি নিত্য, শক্তির ধ্বংস নাই। সুতরাং শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। এই শক্তিদ্বারাই, ব্রহ্ম জগতের কারণ। সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে এই অব্যক্তের সত্তা নাই। এই অব্যক্তশক্তি ব্রহ্মের নিতান্ত অনুগত। এই জন্যই শক্তিসত্ত্বেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ক্ষতি হয় না।"

(২) ঐতরেয় উপনিষদের (১।১) ভাষ্যে শঙ্কর যে সকল কথা বলিয়াছেন, টীকাকার জ্ঞানামৃতযতি তাহা এই ভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—"সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক ব্রহ্মই ছিলেন। 'কেবল' এবং 'এক' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মে স্বজাতীয়ভেদ, বিজাতীয়ভেদ, এবং স্বগতভেদ নিষিদ্ধ হইল। ব্রহ্মে জড়জগতের কারণীভূত জড় মায়াশক্তি ত বর্ত্তমান আছে;—তবে আর বিজাতীয়ভেদ নিষিদ্ধ হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, মায়াশক্তি থাকিলেও, সে অবস্থায় মায়ার কোন ক্রিয়া ছিল না, সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। যদি বলা যায় যে, মায়ার ক্রিয়া না থাকিলেও, মায়া ত তখন বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং বিজাতীয়ভেদ ত রহিয়াই যাইতেছে; এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে মায়ার সত্তা স্বীকার করা যায় না। মায়া তখন ব্রহ্মই,—ব্রহ্মেরই আত্মভূত। যাহা ব্যতিরেকে যাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহা তাহাতে কল্পিত। সুতরাং এই কল্পিত মায়া দ্বারা ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হয় না। এই মায়াশক্তি ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে স্থিত। অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত সত্তা ইহার নাই। এই জন্যই, ব্রহ্মকে 'অভিন্নাধিষ্ঠানোপাদান' বলা যায়। সে সময়ে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া না থাকায়, একরূপ মৃতবৎ অবস্থান করে। সুতরাং এই মায়াশক্তিরূপ উপাদান এবং ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে অভিন্ন বলা যায়"।

(৩) বেদান্তদর্শনের (১।৪।৩) ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন,—"এই জগৎ অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল। এই শক্তিকে আমরা সাংখ্যদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র বলি না। এই শক্তি ব্রহ্মের নিতান্ত অধীন। এই শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কেন না, এই শক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টি করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তিরহিত পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতে হয়।"

(৪) মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকার প্রথম শ্লোকের ভাষ্য করিতে গিয়া, শঙ্করাচার্য্য প্রাণশক্তিকে জগতের বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই প্রাণশক্তিকে, সৃষ্টির পূর্ব্বে, 'অব্যাকৃত' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন যে, এই অব্যাকৃত প্রাণশক্তিই জগতের বীজ এবং এই বীজ দ্বারাই ব্রহ্মকে 'জগৎ-কারণ' বলা যায়। এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। টীকাকার আনন্দগিরি এই স্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন—"কার্য্যরূপ লিঙ্গ (চিহ্ন) দ্বারাই কারণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। কার্য্যের সত্তা আছে বলিয়াই, কারণেরও সত্তা আছে বলিতে হয়। সুতরাং প্রাণকেই জগতের কারণ বলিতে হইবে। ব্রহ্মব্যতিরেকে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সুতরাং এই প্রাণ দ্বারাই জগৎকারণ ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধ

* "পরতন্ত্রত্বাদুপাদানমপি শক্তিঃ"—
রত্নপ্রভা টীকা (বেদান্তদর্শন, ১।১।২২)।

† শঙ্করও নিজে এই কথা বলিয়াছেন—"প্রলীয়মানমপি চেদংজগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি"—বেদান্তভাষ্য, ১।৩.৩০

হইতেছে। নতুবা,—এই শক্তি স্বীকার না করিলে—'কারণ-ব্রহ্ম'ও অসৎ হইয়া যান।"

এই উদ্ধৃত অংশগুলিই যথেষ্ট। ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেন এবং এই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে যে যদি শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মের কি গতি হইবে? এই তত্ত্বটী লোক বুঝে না। বুঝে না বলিয়াই শঙ্করের উপরে অবিচার করিয়া বসে। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই যে শক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, এ কথা শঙ্কর সুস্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। পাঠক ঐতরেয় উপনিষদের (৫।৩) ভাষ্যটী দেখুন। শঙ্কর বলিতেছেন—

"প্রত্যস্তমিতসর্ব্বোপাধিশেষং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং……… অত্যন্তবিশুদ্ধপ্রজ্ঞোপাধিসম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং সর্ব্বসাধারণা-ব্যাকৃতজগদ্বীজপ্রবর্ত্তকং নিয়ন্তৃত্বাদন্তর্যামিসংজ্ঞংভবতি।"

অব্যাকৃতশক্তিই এই জগতের বীজ। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মই,—এই অব্যাকৃত শক্তির প্রবর্ত্তক। নির্গুণ ব্রহ্মদ্বারাই, এই শক্তি জগৎরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। পাঠক, ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা সম্ভবে কি?

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে থাকিয়াই যে প্রাণশক্তি জগদাকারে অভিব্যক্ত হয়, তদ্বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের আর একটী উক্তি পাঠক দেখুন—

ঈশ উপনিষদের ৪ মন্ত্রের "তিষ্ঠত্তস্মিন্ মাতরিশ্বা দধাতি"—ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—"ব্রহ্ম স্বয়ং অবিক্রিয়। এই অবিক্রিয় ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে "মাতরিশ্বা" অর্থাৎ প্রাণশক্তি অবস্থিত আছে। এইপ্রাণশক্তি,—অবিক্রিয়ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়া জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে;—এই শক্তি হইতেই অগ্নি ও সূর্য্যাদির জ্বলনদহনবর্ষণাদি ক্রিয়া এবং প্রাণীদিগের চেষ্টালক্ষণক্রিয়া হইতেছে।" ইহা অপেক্ষা আর সুস্পষ্ট উক্তি হইতে পারে? নির্গুণ ব্রহ্মই যখন সৃষ্টিকার্য্যে যুক্ত, তখনই তাঁহাকেই সগুণব্রহ্ম বলাযায়। বস্তুতঃ নির্গুণে সগুণে কোন ভেদ নাই।

তবে কেন নির্গুণ ব্রহ্মকে,—কার্য্যও কারণের অতীত হইয়াছে? ইহার তাৎপর্য্য কিরূপ? ভাষ্যের অনেকস্থানে বলা হইয়াছে যে, নির্গুণ ব্রহ্ম—অব্যাকৃত, শক্তি হইতেও পৃথক। ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারাতেই নির্গুণব্রহ্মকে সগুণব্রহ্ম হইতে নিতান্ত ভিন্ন বলিয়া লোক ধরিয়া লইয়াছে। ব্রহ্মপদার্থ প্রকৃতপক্ষে অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তিস্বরূপ। যে কয়েকটী শক্তি মিলিয়া মিশিয়া জগৎরূপে দেখা দিয়াছে,—যে জ্ঞান জগতে প্রকাশিত হইয়াছে;—সেই কয়েকটী শক্তি ও জ্ঞান কি ব্রহ্মের অনন্তশক্তি ও অনন্তজ্ঞানের ইয়ত্তা করিতে পারে? কখনই না। ইহাই বুঝাইবার জন্য, শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম ছাড়াও নির্গুণব্রহ্মের স্থান রাখিয়াছেন। অনন্তশক্তি স্বরূপ ব্রহ্ম, কয়েকটীমাত্র শক্তিকে যেন আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া, তদ্দ্বারা জগৎসৃষ্টি ও জগৎপালন করিতেছেন। এই তত্ত্বই, পুরুষসূক্তের "যজ্ঞে"—ব্রহ্মের আত্মত্যাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম জীবের কল্যাণার্থে আত্মত্যাগ করিয়াছেন,—নিজেরই কতকগুলি শক্তিকে যেন কিছু পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জগৎসৃষ্টি ও পালন করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যেই নির্গুণ ব্রহ্মকে,—অব্যাকৃত শক্তি হইতে পৃথক্ বলা হইয়াছে। কিন্তু শক্তি,—ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, উহা ব্রহ্মই। শঙ্কর-ভাষ্যের রত্নপ্রভাটীকাকার বেদান্ত দর্শনে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। "নিত্যস্যাপি জ্ঞানস্য ব্রহ্মস্বরূপাদভেদং কল্পয়িত্বা কার্য্যত্বোপচারাৎ ব্রহ্মণস্তৎকর্ত্তৃত্বব্যপদেশঃ" (১।১।৫)। এই টীকাটুকু বুঝা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের কারণ। শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা। শক্তি সংসর্গে জগতের যে নানাবিজ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে, ব্রহ্ম সেই বিজ্ঞানেরও কর্ত্তা; সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। এখন কথা হইতেছে যে, যাঁহার নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তি,—তাঁহাকে সেই শক্তি ও জ্ঞানের 'কর্ত্তা'ও 'জ্ঞাতা' কিরূপে বলা যায়? বিকার বা কার্য্য না থাকিলে, কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব হইতে পারে না। কোন ক্রিয়া-বিশেষের আমরা কর্ত্তা, এবং কোন জ্ঞানবিশেষের আমরা জ্ঞাতা। ব্রহ্ম, নিত্যশক্তি ও নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং তিনি কর্ত্তা ও জ্ঞাতা হইবেন কিরূপে? ভাষ্যকার ও টীকাকার এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বুঝিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। লোকে এই সকল মীমাংসা তলাইয়া বুঝেনা বলিয়াই, শঙ্করের নামে যা' তা' বলিয়া বেড়ায়। ফলতঃ, ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞান ও নিত্য-

শক্তিস্বরূপ হইলেও, তাঁহাকে মুখ্য-ভাবে 'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'সর্ব্বশক্তিমান্' (কর্ত্তা) বলা যাইতে পারে। কেন বলা যাইতে পারে? "ঈশ্বরস্যাপি বিবিধসৃষ্টিসংস্কারায়াঃ অবিদ্যায়াঃ সর্গোন্মুখঃ কশ্চিৎ পরিণামঃ, তস্যাং সূক্ষ্মরূপেণ নিলীন সর্ব্ব কার্য্যবিষয়কং ঈক্ষণং তস্য কার্য্যত্বাৎ কর্ম্মসম্ভাবাচ্চ তৎকর্ত্তৃত্বং মুখ্যম্।" সৃষ্টির প্রাক্কালে, অনন্তশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য, আপনা হইতে কতকগুলি শক্তিকে পৃথক্ করিয়া দিয়া, সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই শক্তিগুলি তাঁহারই শক্তি; কিন্তু তথাপি ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্কৃত। এই শক্তিগুলিকেই সমষ্টিভাবে "মায়াশক্তি" বা "অব্যাকৃত শক্তি" বলে। এই আগন্তুক পরিণাম ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই, ব্রহ্মকে কর্ত্তা বলা যায়।* এই ভাবেই ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও জ্ঞাতা ও কর্ত্তা হইয়া থাকেন। এই জন্যই ব্রহ্মকে নির্গুণ জ্ঞাতা ও কর্ত্তা বলায় দোষ হয় না। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত। এই জন্যই পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর নির্গুণ-ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রকার বিশেষণ বর্জ্জিত বলিয়াও, তাঁহাতে 'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'সর্ব্বশক্তিমান্' এই দুইটী বিশেষণ রাখিয়াছেন। ব্রহ্ম,—এই শক্তি হইতে পৃথক্ বলিয়াই, তিনি বিকার দ্বারা দূষিত বা সংস্পৃষ্ট হন না। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই; সুতরাং শক্তির বিকার দ্বারা শক্তিমানেরও বিকার হইতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মে শক্তির আরোপ করা যায় না।" কেহ কেহ এইরূপ তর্ক করেন। কিন্তু তাঁহারা শঙ্করের সিদ্ধান্ত বুঝেন নাই। শক্তি কদাপি শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে;—শক্তি ব্রহ্মেরই আত্মভূত, উহা ব্রহ্মই। একথা অত্যন্ত সত্য। এই অর্থেই শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলা যায়। কিন্তু এ কথার অপর একটী অংশ আছে। লোকে সে অংশটীর কোন খবর রাখে না বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি করিতে সাহস করে। শঙ্কর,—শক্তিকে যেমন ব্রহ্মেরই অধীন এবং উহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে,—এ কথা বলিয়াছেন; তেম্নি আবার শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সেই শক্তি হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। ইহা না বলিলে, ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপকে জগদাকারে বিকাশিত বলিতে হয়।—ইহা না বলিলে, নির্গুণ ব্রহ্মের স্থান থাকে না। শক্তিকে ব্রহ্মের অধীন বলিয়া দিয়া, এবং ব্রহ্ম হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই, সুতরাং শক্তি ব্রহ্মে 'কল্পিত' এই কথা বলিয়া দিয়া,—টীকাকার স্পষ্ট বলিতেছেন—"কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাদ্ভেদেপি অধিষ্ঠানস্য ততো ভেদঃ" (বেদান্ত দর্শন, ১।১।১৭)। শ্রুতি এই জন্যই—"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" বলিয়াছেন। এই জন্যই শক্তির বিকার হইলেও, শক্তিমানের কোন বিকার হয় না। * এ তত্ত্বটা না বুঝিয়াই লোকে বলে যে নির্গুণ ব্রহ্মে শঙ্কর শক্তির আরোপ করেন নাই! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্?"

এখন আমরা দেখাইব যে, শঙ্কর কেবল যে "বিবর্ত্তবাদ" স্বীকার করিতেন, তাহা নহে; তিনি "পরিণামবাদ"ও স্বীকার করিতেন। এ তত্ত্বটাও না বুঝিয়া লোকে শঙ্করের উপর যারপর নাই অবিচার করিয়া থাকে! উপরে আমরা শক্তি সম্বন্ধে যে সকল ভাষ্য অনুবাদ করিয়া দিয়াছি, তদ্দ্বারাই কথাটা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে; তথাপি এস্থলে শঙ্করের আরো সুস্পষ্ট উক্তি আমরা দেখাইব।

বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের, প্রথম পাদে, ১৪ সূত্রের ভাষ্যের শেষাংশে শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, ব্যবহারতঃ সূত্রকার 'পরিণাম বাদ'ই স্বীকার করিয়াছেন—"অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণাম-প্রক্রিয়াঞ্চ আশ্রয়তি (সূত্রকারঃ)।" টীকাকার বলিতেছেন—"ন কেবলং লৌকিক-ব্যবহারার্থং পরিণামপ্রক্রিয়াপ্রণয়ং কিন্তু উপাসনার্থঞ্চ।" কিন্তু পরমার্থতঃ বিবর্ত্তবাদই এই সূত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে। শঙ্করও বলিতেছেন—"পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ"। পাঠক জানেন যে, শঙ্করের মতে পরমার্থতঃ এ জগৎ ব্রহ্মই। কিন্তু তথাপি ব্যবহারতঃ এ জগৎ জড় ও পরিণামী। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, শঙ্কর পরিণামবাদও স্বীকার করিতেন। শঙ্করের টীকাকারগণেরও এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি তাহা দেখাও নিতান্ত আবশ্যক। কেননা, এই অংশটী অনেকেই বুঝেন না। না বুঝিয়াই শঙ্করকে 'মায়াবাদী' ও 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয়।

---

*"ন চ নিত্যজ্ঞানেনৈব কর্ত্তৃত্বনির্ব্বাহাৎ কিমীক্ষণেনেতিবাচ্যং; ...... ঐক্ষতেতি আগন্তুকত্বেন শ্রুতমীক্ষণং অঙ্গীকার্য্যং"—রত্নপ্রভাটীকা। সৃষ্টির প্রাক্কালে শক্তির এই পৃথক্ করণকে লক্ষ্য করিয়াই, কোন কোন স্থলে মায়াশক্তির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। নতুবা নিত্য শক্তির আবার উৎপত্তি কি? "ততোঽহমভিজায়তে"—ইহার ভাষ্য ও টীকা দেখ।

* আনন্দগিরিও মাণ্ডুক্য ভাষ্যে এতত্ত্ব বলিয়া দিয়াছেন—মায়া দ্বারা ব্রহ্মণস্তৎ সম্বন্ধেপি, স্বরূপ দ্বারা ন তৎসম্বন্ধোঽস্তীতি।"

ঐতরেয় উপনিষদের (১।১) ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ এই আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, আত্মা-ভিন্ন ত অন্য কোন 'উপাদান' নাই, তবে আত্ম-চৈতন্য হইতে এই বিকারি-জগৎ উৎপন্ন হইল কিরূপে? এই আপত্তির উত্তর শঙ্কর এইরূপে নিজেই দিতেছেন—অব্যাকৃত নাম-রূপই জগতের উপাদান ; এই উপাদান আত্মারই স্বরূপভূত ; এই উপাদান হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং উপাদান-রহিত হইলেও আত্মা হইতে জগৎ সৃষ্টি সিদ্ধ হইতেছে। "নৈষ দোষঃ, আত্মভূতে নামরূপে অব্যাকৃতে আত্মৈকশব্দ-বাচ্যে জগৎ উপাদানভূতে সংভবতঃ; তস্মাদাত্মভূতনামরূপো-পাদানঃ সন্ জগন্নির্ম্মিমীতে।" এস্থলে টীকাকার এই ভাষ্য এইরূপে বুঝাইয়া দিতেছেনঃ—"প্রশ্ন হইতে পারে যে অদ্বিতীয় আত্মা নিজেই নিজের উপাদান, সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির অন্য উপাদানের আবশ্যক কি ? ইহার উত্তর এই যে, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কেন না, সৃষ্টপদার্থগুলি পরিণামী ও বিকারী বলিয়া, অবশ্যই ইহাদের একটী পরি-ণামি-উপাদান আছে। আত্মা নিরবয়ব, চেতন। সুতরাং বিকারী জড় জগতের আত্মা উপাদান হইতে পারে না। অব্যাকৃত নামরূপই, সেই পরিণামি-উপাদান ; আত্মা বিবর্ত্ত-উপাদান মাত্র। "বিয়দাদেঃ পরিণামিত্বমঙ্গীকৃত্য তত্র অনভিব্যক্তনামরূপাবস্থং বীজভূতমব্যাকৃতং পরিণাম্যুপাদানম-স্তীতি আহ নৈষ দোষ ইতি। পরিণমমানাবিদ্যাধিষ্ঠানেন আত্মনো বিবর্ত্তোপাদানত্বং।" শঙ্কর-দর্শনে এই উভয়বিধ উপাদানই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বেদান্তভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে টীকাকার রত্নপ্রভা বলিয়া দিতেছেন যে,—"সাংখ্যেরা অচেতন জড় প্রকৃতিকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া থাকেন। আমরাও ত্রিগুণাত্মক জড়মায়াকে উপাদানকারণ বলি। কিন্তু সাংখ্যমতে এই উপাদান স্বাধীন ; আমরা এই উপাদানকে ব্রহ্মের নিতান্ত অধীন বলিয়া গ্রহণ করি ; ব্যতিরিক্ত সত্তা ইহার নাই।" "বেদান্তপরিভাষা" এক-খানি অতি প্রামাণিক বেদান্তগ্রন্থ। ইহা শঙ্করাচার্য্যের নিতান্ত অনুগত গ্রন্থ। শঙ্করমত বুঝাইয়া দেওয়াই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থেও বুঝান হইয়াছে যে, বেদান্তে বিবর্ত্ত ও পরিণাম উভয় বাদই গৃহীত হইয়াছে। "প্রকৃতিস্তু সাম্যা-বস্থাপন্নসত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী অব্যাকৃতনামরূপা পারমেশ্বরী শক্তিঃ।" প্রকৃতি বা মায়াশক্তি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া দিয়া বেদান্তপরিভাষা বলিতেছেন—"অবিদ্যাপেক্ষয়া পরিণামঃ, চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ত্তঃ।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ইহার টীকায় বলিয়া দিয়াছেন—"কার্য্যং যদাত্মকং তদ্রূপকারণমুপাদানং। তথাচ উপাদানস্য স্বসত্তাককার্য্য-ভাবেন আবির্ভাবঃ পরিণমতে ইত্যর্থঃ।" কার্য্য যে প্রকার, উহাদের উপাদানও তদ্রূপ। কার্য্যগুলি জড় ও পরিণামী ; সুতরাং উহাদের উপাদানশক্তিও জড় ও পরিণামী। সুতরাং মায়াশক্তি বা অব্যক্তই জগতের পরিণামি-উপাদান। আর, বিবর্ত্ত-উপাদান ? "চৈতন্যোপাদানত্বেতু বিবর্ত্তত্বং।" অর্থাৎ বেদান্তমতে, যাবতীয় বস্তুর দুই প্রকার উপাদান। এক উপাদান—মায়া বা অবিদ্যা। আর এক উপাদান—ব্রহ্ম-চৈতন্য। অবিদ্যাই পরিণত হয় ; এবং ইহারই সংসর্গবশতঃ চেতনের যে অবস্থান্তর প্রতীত হয়, তাহাই বিবর্ত্ত। এই দুই উপাদানের কথা লক্ষ্য করিয়াই 'বেদান্তপরিভাষা' লক্ষণ করিলেন যে,—"উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং, জগদা-কারেণ পরিণমমানমায়াধিষ্ঠনত্বং বা।" অর্থাৎ, ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান-উপাদান এবং মায়া জগতের পরিণামি-উপাদান। "পঞ্চদশী" আর একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ। ইহার গ্রন্থকার বিদ্যারণ্য,—শঙ্করের মতের নিতান্ত অনুগত শিষ্য। তিনিও এই দুই প্রকার উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। "অচিন্ত্য-শক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা। অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠাবিকারং যাত্যনেকধা" (১৩।৬৫—৬৬)। পঞ্চদশী বলিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও, তাঁহাতে অবস্থিত শক্তি জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত এই শক্তিরই পরিণাম হয় ; কিন্তু অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের কোন পরিণাম হয় না। তবে ব্রহ্মচৈতন্য জড়ের অনুগত বলিয়া, চেতনেরও অবস্থান্তর প্রতীত হয়। ইহাই বিবর্ত্তবাদ।

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্য, দুই প্রকার উপাদানই স্বীকার করিয়াছেন এবং মায়া বা অব্যাকৃতশক্তিরও ব্রহ্মে অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার ভাষ্যে এই শক্তির প্রাধান্য মোটেই দেওয়া হয় নাই। তিনি ব্রহ্মেরই প্রাধান্য দিয়া, শক্তিকে নিতান্ত অপ্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। একথাটা মনে রাখিতে হইবে। এই শক্তি,—ব্রহ্মেরই শক্তি,

ব্রহ্মেরই আত্মভূত;—ইহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র-সত্তা বা স্বাধীনতা নাই। এইজন্য অনেক স্থলে ইহাকে 'কল্পিত' শব্দেও উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা, এ শক্তি যে কিছুই নহে,—এপ্রকার অর্থ নহে। "মায়ায়াঃ আত্ম-তাদাত্ম্যেন স্বতন্ত্রত্বনিরাসঃ।" স্বতন্ত্রতা নাই বলিয়াই এই শক্তি সত্বেও, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই মায়াশক্তির যেখানেই উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্থানেই ইহাকে "তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে"—বলিয়াছেন। এ কথাটার অর্থ কি ? এই বিশেষণটী বিশেষরূপে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝা যাইবে। আনন্দগিরি এই বিশেষণটীর অর্থ করিয়া দিয়াছেন। পাঠক সেই অর্থ টী দেখুন :—"চিদাত্মনি লীনে নামরূপে এব বীজং......নামরূপয়োরীশ্বরত্বং বক্তুমশক্যং জড়ত্বাৎ, নাপি ঈশ্বরাদন্যত্বং কল্পিতস্য পৃথক্-সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবাৎ।" এই মায়াশক্তি জড়। সুতরাং ব্রহ্ম ও এই শক্তি এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। আবার, এই শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না ; কেন না, ব্রহ্ম হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ক্রিয়া নাই। ব্রহ্মসত্তাতেই ইহার সত্তা। এইজন্যই, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই শক্তিকে 'আত্মা' বলিয়াই ঐতরেয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই আবার অনেক স্থলে ইহাকে 'মিথ্যা' বলিয়াও কথিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এরূপ নহে যে, শক্তি একেবারেই অসৎ বা শক্তির অস্তিত্বই নাই। সে কথার অর্থ এই যে, ব্রহ্মব্যতিরেকে ইহার স্বতন্ত্রতা নাই। অথচ অনেক অল্পধী ব্যক্তি, একেবারে মিথ্যা বলিয়াই শক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের ভাষ্য না বুঝিয়া,—টীকাকারগণের ব্যাখ্যা না পড়িয়া, শঙ্করকে অসদ্বাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিয়াছেন *।

যাহাহউক, আমরা এ প্রবন্ধে শক্তি সম্বন্ধে যে সকল ভাষ্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, তদ্দ্বারা শঙ্করের উপরে যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ও অসঙ্গত, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। শঙ্করের উপরে অন্য যে সকল অবিচার করা হইয়াছে, তাহা অন্য প্রবন্ধে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য,
বিদ্যারত্ন, এম্ এ।

* মৎপ্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে, আমরা শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় ও ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি।

চাক্‌মাজাতির সংস্কার কর্ম্ম।

[চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চাক্‌মা নামক জাতিবিশেষের বাস। ইহাদের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধলক্ষ হইবে। শারীরিক গঠনপ্রণালী অনেকটা মঘত্রিপুরাদি অপরাপর পাৰ্ব্বত্যজাতির অনুরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহারাও "লোহিত" অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র (যারকিও সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে ইহাদিগের দুইটী মাত্র প্রাচীন নিদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য। বস্তুত "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ ছড়া" আখ্যায়িকার সাক্ষ্য স্বীকার করিলেও প্রাগুক্ত মত অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং ইহারাও "লৌহিতিক" অর্থাৎ "তিব্বতীব্রহ্মী" শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে।* তবে অনেক দিন তাহারা হিন্দুধর্ম্মে ছিল, সম্প্রতি বৌদ্ধদলভুক্ত হইয়াছে। †]

যদিও চাক্‌মারা এক সময়ে হিন্দুধর্ম্মের অধিকারে ছিল, কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষণে দশাচারের অনেকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার বিভিন্নধর্ম্মের সাহচর্য্যে দু'একটি অভিনব অনুষ্ঠানও এই সমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। কর্ম্মসংখ্যা নিতান্ত বহুল না হইলেও অতিশয় বিশৃঙ্খল। এমন কি, সাধারণ এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পার্থক্যের প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিলে স্থুলতঃ বলা যায়, সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ উন্নত সম্প্রদায় আপনাদের ক্রিয়াকর্ম্মে যথাসাধ্যরূপে হিন্দুদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, সাধারণ দল এ যাবত ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফলে তাহাদিগের মধ্যে নানা উচ্ছৃঙ্খলাচার প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি যে প্রধান ভিত্তির উপর অনুষ্ঠিত হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন এক মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া না যায়, তত দিন ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন-আচার চলিবার আশা নাই। বর্ত্তমানে উন্নত সম্প্রদায় সমাজের মধ্যে একটা 'সংস্কার' আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন, আর সাধারণ সকলের তাহা

* ইহাদের জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীন কাহিনী লইয়া 'আষাঢ়' এবং 'মাঘ' (১৩১৩) সংখ্যার "ভারতী"তে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

† এতৎসম্বন্ধেও "বৌদ্ধবন্ধু"র 'বৈশাখ' হইতে 'কার্ত্তিক' সংখ্যায় (১৩১৩) বিবৃত বিবরণী বাহির হইয়াছে।

গ্রহণ করিয়া উঠিতে অনেক দিন চলিয়া যায়, ইহাই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যভাবের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এ স্থলে সাধারণ ভাবে উভয় সম্প্রদায়েরই কথা বিবৃত করিতে চেষ্টা করা হইল।

প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজনকে ভোজন প্রদান এবং অবস্থাবিশেষে বাজী পোড়ান প্রভৃতি আনুসঙ্গিক উৎসবও চলিয়া থাকে। কিন্তু দুহিতা লাভে এবম্বিধ অনুষ্ঠান অতি অল্পই ঘটে। নামকরণ বলিয়া ইহাদের কোনও ক্রিয়াবিশেষ নাই। অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন দৈবীশক্তির উপর ভারার্পণ করিবার ব্যবস্থাও দেখা যায় না। পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধগণ স্নেহগর্ভ সংক্ষিপ্ত নাম নির্ব্বাচিত করে; তাহাই শেষে 'ডাক নাম' হইয়া দাঁড়ায়, নিতান্ত বিকৃত শুনাইলেও তাদৃশ নামে সন্তানের প্রকৃতি উপলব্ধি হয়। যথা, "কুর্য্যা" (কুড়ে) নামে বুঝা যায় ছেলেটী বড়ই অলস, এবং "পিড়াভাঙা" নামধেয় ব্যক্তির ভারে যে কোনদিন "পিড়া" (পিড়ি) ভাঙ্গিয়াছিল অর্থাৎ সে যে স্থূলকায় সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। জন্মস্থান বিশেষেও নামকরণ হইয়া থাকে। যেমন, "বড়কলে"* জন্ম হইলে পুত্র "বড়কল্যা" এবং কন্যা "বড়কলী নামে আখ্যাত হয়। কালের কবলে অনেক পুত্র কন্যা হারাইয়া যদি পরিশেষে কোন সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলে সেই সন্তানের জন্য অতি জঘন্য নাম নির্দ্দেশ করা গিয়া থাকে। বিশ্বাস তাদৃশ নামে যমেরও ঘৃণা হইবে! শেষে সন্তান বয়স্ক হইলে স্বীয় পছন্দানুরূপ বা গুরুগণ কর্ত্তৃক একটা সভ্যভব্য নামে আখ্যাত হয়। অনেক স্থলে স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময়ে শিক্ষকগণই শিশুদিগের বিকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া থাকেন। আবার পিতা মাতা কর্ত্তৃক এমন নাম সকলও নির্ব্বাচিত হইতে দেখা যায়, যেন তাহাতে সন্তানের জীবন দীর্ঘ ও গৌরবসূচক হয়। এই আশায় প্রায় রামায়ণ এবং মহাভারতোক্ত নামই রাখা গিয়া থাকে, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর নামেও অনেকে সন্তানের নামকরণ করে। তাহা অজামিলের ন্যায় ফাঁকতালে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির কামনায় নহে। ইহারা আশা রাখে সন্তানকে তন্নামধেয় দেবতা অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপে চাক্‌মা সমাজের প্রায় সমস্ত নামই হিন্দুসমাজানুমোদিত। অন্নপ্রাশনেরও কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নাই; সুতরাং তজ্জন্য অনুষ্ঠানবিশেষেরও প্রয়োজন হয় না। সন্তানেরা অনেক দিন ধরিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে থাকে। তিন বৎসরের শিশু তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীর সহিত স্তন্যপান করিতেছে এ হেন দৃশ্য বিরল নহে।

কর্ণবেধ।

কর্ণবেধের প্রথা থাকিলেও ইহাদের সমাজে 'কর্ণবেধ' বলিয়া কোনও ক্রিয়া বিশেষ নাই। উচ্চ পরিবারে এই উপলক্ষে মাত্র আমোদ আহ্লাদাদি করা হয়; তা' ছাড়া ধর্ম্মার্থে কিছুই অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ সন্তান ছয় সাত বৎসরের হইলে সিজ বা অন্যবিধ বন্যবৃক্ষের কণ্টক দ্বারাই কাণ দুখানি ছিদ্র করিয়া লয়। পুরুষেরা দুই কাণে দুইটীমাত্র ছিদ্র করে, কেহ কেহ তাহাতে রূপার আঙ্‌টী ধারণ করে। নতুবা ছিদ্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের দুই কাণে অন্যূন বার এবং বাম নাসিকায় একটী ছিদ্র করাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবিক অবলাগণ গহনা পরিধানের নিমিত্ত কিদৃশ নিষ্ঠুররূপে ক্ষতবেদনা সহ্য করে। ইহা যে কেমন সখ, সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

দীক্ষা।

আট নয় বৎসরের সময় শুভদিনে সচরাচর বিষু ও বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং মাঘের পূর্ণিমায় বালকগণের "চামনি" অর্থাৎ দীক্ষা হয়। "ঠাকুর" (ভিক্ষু) তদভাবে "রড়ীগণ" (শ্রমণেরা) এই দীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা গ্রহণার্থী পূর্ব্বাহ্নে মস্তক মুণ্ডিত করিয়া যথাবিধি পবিত্রতা সাধন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সপল্লব ঘট-দীপ-তণ্ডুল ইত্যাদি সম্মুখে পশ্চিমাস্য হইয়া উপবেশন করে। অনন্তর সপ্তগুণ সূত্র দ্বারা এ সমুদায় বেষ্টন করতঃ তৎপ্রান্তদ্বয় হস্তে লইয়া "দশশীল" আচরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। অবশেষে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত ও গুরুদক্ষিণা দান করিয়া শ্রমণ-ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু এই কৃচ্ছ্রসাধ্যব্রত পালনে অনেকেই পরাঙ্মুখ হয়; অধিকাংশ সকলে সাত দিন মাত্র আচরণেই

* "বড়কল"—কর্ণফুলী নদীর জলপ্রপাত বিশেষ, ইহা মোহানা হইতে প্রায় শতেক মাইল উপরে অবস্থিত। বিস্তারিত বিষরণ ১৩১১ সালের "জ্যোতিতে" "কর্ণফুলী এবং বড়কল" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

মনে করে,—আর যাহারা যাবজ্জীবন এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে তাহারা প্রথমে "রড়ী" এবং সিদ্ধ হইলে "ঠাকুর" আখ্যা পায়। চাকমা সমাজের প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, স্ত্রীলোকদিগের কোন দীক্ষার ব্যবস্থা নাই।

যৌবনোন্মেষ।

বালিকাগণ ত্রয়োদশ বৎসরে এবং বালকেরা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে যৌবনের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ রোগ-জীর্ণতায় সকলের সহিত অগ্রসর হইতে পারে না। আবার অনেকে 'ইচড়েই পাকিয়া' যায়। সাধারণ-শ্রেণীতে—কোন বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে অনন্যনির্ভরতায় "জুম"* কর্ত্তন করে। ইহাই তাহার যৌবনপ্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন। পুত্রের যৌবনপ্রাপ্তিতে পিতামাতা প্রতিবেশী এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনাদি লইয়া আমোদ-উৎসব করিতে বাধ্য হয়।

বিবাহ।

ইহাদের মধ্যে এমন কি যাবতীয় পার্ব্বত্যজাতির ভিতর বাল্যবিবাহ বিরল প্রচলিত। পরন্তু কত বয়সে যে বিবাহ হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট নাই। কোন কোন ব্যক্তি আবার চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায়। বিবাহ হইলে ইহাদের "বুড়াবুড়ী" আখ্যা হয়। নতুবা বয়স যত অধিক হউক না কেন, "গাভূর" (কুমার) ও "মিলা" (কুমারী) অভিধা থাকে। বিগত আদমসুমারীর বিবরণীতে দেখা যায়, চাকমাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৬ বৎসরের	৬ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে ঊর্দ্ধে বৎসরের	মোট
পুরুষ	৪২৩৯	৫৫৭১	১৬১১	১৮৪৬	১২২৬	৬০	১৪৫৫৩
স্ত্রী	৪০৩৩	৪৯২৪	১৩১৫	৭৬৬	১২৯	৩৫	১১২০২

অবিবাহিত চল্লিশোর্দ্ধ বয়সের এই ৬০ জন পুরুষ এবং ৩৫ জন স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হইবার আশা কোথায়? অপর ২০—৪০ বৎসরের যে সকল স্ত্রীলোক অদ্যাপি অবিবাহিতা তাহাদেরও অনেকে চিরকুমারী থাকিবে, তবে অধিকাংশ পুরুষের দার পরিগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে, পক্ষান্তরে "বিবাহিতের" তালিকায় দেখা যায়, চাকমাদিগের—

শ্রেণী	০ হইতে ৬ বৎসরের	৬ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে ঊর্দ্ধে বৎসরের	মোট
পুরুষ	০	১১	১১	২৭৪	৬০১০	৪১২২	১০৪২৮
স্ত্রী	৫	১২	১৫২	১৪৪৩	৬৪৬৩	২২৩১	১০৩০৭

পত্নী পতি লইয়া আছে। সুতরাং এই এই উভয় তালিকা তুলনা করিলে সহজেই পরিলক্ষিত হইবে যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সে পুরুষের এবং ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের অধিক পরিমাণে বিবাহ ঘটিয়া থাকে, পরন্তু পরবর্ত্তী তালিকায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০৪২৮ হইলে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কিরূপে ১০৩০৭ জন মাত্র হইল, দেখিয়া সন্দেহ হয়। এই ১২১ জনকে মৃত-দারও বলিতে পারা যায় না; কেন না তাহা স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর মহাভারতীয় দ্রৌপদী বা আধুনিক তিব্বতীয় সম্প্রদায়ের মত ইহাদের সমাজে একত্রে বহু-স্বামী-গ্রহণ-প্রথা (Polyandry)ও প্রচলিত নাই, অধিকন্তু বহু-স্ত্রী-গ্রহণ প্রথা (polygamy) আছে।* তবে এই মাত্র অনুমান করা যায়, বর্জ্জিত-পত্নীক পুরুষগণকেও বিবাহিত সংখ্যায় গণনা করা হইয়াছে। অপর তালিকায় আছে, চাক্‌মাদিগের মধ্যে—

শ্রেণী	০ হইতে ৬ বৎসরের	৬ হইতে ১২ বৎসরের	১২ হইতে ১৫ বৎসরের	১৫ হইতে ২০ বৎসরের	২০ হইতে ৪০ বৎসরের	৪০ হইতে ঊর্দ্ধে বৎসরের	মোট
বিপত্নীক	০	২	০	৭	২১৫	৭২৫	৯৪৯
বিধবা	৩	১	১	১৩	১৬৫	১১৭২	১৩৫৫

অতএব মোট ২২৮৬৪ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৩৫৫ জন মাত্র অর্থাৎ এক ষোড়শাংশের ন্যূনসংখ্যক স্ত্রীলোককে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাতে আবার প্রৌঢ়া অর্থাৎ যাহাদের পুনর্বিবাহের সময় সম্পূর্ণরূপে অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমন বিধবার সংখ্যা ১১৭২ জন, আর ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক মৃতদার অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা

* কৃষিবিশেষ মাত্র। এখানে জুম জঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

* কিন্তু একসময়ে দুই পত্নীর অধিক কাহারও পরিদৃষ্ট হয় না, এমন কি তৎপ্রতি সাধারণের ঘৃণার আভাস পাওয়া যায়। ইহাদের কথাই আছে—

"ছিলে বিলে তিন জোগ্,
মুসলমানের তিন মোগ।"

অর্থাৎ বিলাদিতে যেমন জোঁক্ যথেষ্ট, তেমনি মুসলমানের স্ত্রী অনেক। (মুসলমানবন্ধুগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন)।

অনেক কম। ইহাতে সহজে অনুভূত হয় যে, যুবতী বিধবাগণের প্রায়ই পুনর্বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বয়সের বিপত্নীকগণের কথা দূরে থাকুক, চল্লিশোর্দ্ধ যে যে ৭২৫ জন মৃতদার পুরুষের সংবাদ পাওয়া গেল, জরাপীড়া বা সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি বিশেষ অসুবিধায় না পড়িলে তাহাদিগেরও অনেকে পত্নীবিরহিত হইয়া অধিক দিন থাকিবে না।

ইহাদিগের মধ্যে, পিতৃকুল লইয়া "গোষ্ঠী"* এবং বাসস্থান ভেদে "গোছা"† আখ্যাত হয়। সেই হেতু "গোছা" এক হইলে বিবাহে কোন বাধা থাকে না। অথচ "সগোষ্ঠীতে" বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলিয়াই সমাজের ব্যবস্থা ছিল। এত দিন এই বিধি নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিয়াছে। একমাত্র সেই দিন কুমার রমণীমোহনের বিবাহে ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি সগোষ্ঠী হইতে পত্নীগ্রহণ করিয়াছেন। সমাজবন্ধন এই যে শিথিল হইল, এখন হইতে বোধ হয় ইহা অবাধে চলিবে। মামাত ভগ্নী, পিস্‌তুত ভগ্নী প্রভৃতির পাণিগ্রহণও যথেষ্টই প্রচলিত, বরং সেইগুলি যেন প্রকৃষ্ট সম্বন্ধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ভাগিনেয়ী, বড়শালী প্রভৃতির সহিত বিবাহ কদাচ পরিদৃষ্ট হয় না। পরিত্যক্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেবরেরাও বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য তাহারা বাধ্য নহে।

চাক্‌মাজাতির বিবাহ।

সচরাচর বিবাহ পঞ্চবিধ যথা—

অভিভাবকগণের প্রস্তাবানুসারে (১) পাত্রী তুলিয়া আনিয়া ও (২) পাত্র তুলিয়া আনিয়া বিবাহ, এবং (৩) বড় বিবাহ (৪) গৃহজামাতা আনয়ন ও (৫) মনোমিলনে পরিণয়।

এতন্মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত শ্রেণীর বিবাহই সমধিক প্রচলিত। বিশেষতঃ ধনবান্-সম্ভ্রান্ত পরিবারে ভিন্ন "বড় বিবাহ" হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকারের বিবাহকেও সমাজ ঘৃণার চক্ষে দেখে, এজন্য অবস্থা ভাল হইলে কেহই ইহাতে স্বীকৃত হয় না। এতদ্ভিন্ন বিধবা এবং পরিত্যক্তা মহিলাদিগের বিবাহও আছে। পুনর্ব্বার বলিয়া রাখি, যে কোন বিবাহেই "চুঙুলাং"* পূজা প্রয়োজন, নতুবা স্ত্রী পুরুষের কাহারও বিবাহ ভাঙিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

অভিভাবকগণের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ।

পুত্র বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে দেখিলে পিতা মাতা অপরাপর নিকট আত্মীয়দিগের সহিত "তাইনমাং" (পরামর্শ) করিয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহাদের মনোমত কন্যার সমাচার পাইলে কোন কোন সময় পুত্রকেও প্রকারান্তরে তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হয়।

অনন্তর প্রস্তাবনার নিমিত্ত অভিপ্রেত কন্যার পিত্রালয়ে বরের পিতার যাওয়া একান্ত অপরিহার্য্য। তদভাবে মূল অভিভাবককেই যাইতে হয়। প্রথম বারে—মদ, পান সুপারী এবং কয়েকবিধ মিষ্টান্ন লইয়া যাওয়াই বিধি। বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উঠাইতে অতিশয় সতর্কতা গ্রহণ করা গিয়া থাকে। পাত্রের পিতা বলে—"তোমার ঘরের নিকট একটি মাহাহর বৃক্ষ জন্মিয়াছে, আমি তাহার ছায়াতে একটি চারা রোপণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতে চাহি।" ইহা হইতেই কন্যার পিতা মূল কথা বুঝিয়া লয়। যাতায়াতের সময় উভয় পক্ষই অতি সাবধানে শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। কেন না, সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত এমন অনেক বিবাহ কুলক্ষণ দ্বারা ভাঙিয়া গিয়াছে। যদি স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, মোরগ, জল বা দুগ্ধ লইয়া দক্ষিণপার্শ্বে যাইতে দেখা যায়, তবে লক্ষণ—শুভ। কিন্তু চিল কি শকুনি দেখা গেলে অথবা কোন কাক যদি বাম পার্শ্বে বসিয়া ডাকিতে থাকে, তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়াই কথিত হয়। যদি তাহারা পথে আসিতে কোনও জীবজন্তুর মৃতদেহ দেখিতে পায়, তবে আর পদৈকমাত্র অগ্রসর হয় না, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় আয়োজনও বন্ধ করিয়া দেয়। বৃদ্ধদিগের মুখে এমন বহু উদাহরণ শুনা যায় যে, এই সমস্ত শুভাশুভ লক্ষণের প্রতি অবহেলা পক্ষান্তরে প্রভূত অসুখের কারণ হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত, "ছাদং"এর সময় অর্থাৎ আষাঢ়পূর্ণিমা হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা

* "গোষ্ঠী"—গোত্র।

† "গোছা"—সংস্কৃত গুচ্ছ শব্দ হইতে উৎপন্ন। সমগ্র চাকমা-সমাজ একত্রিংশ "গোছা" অর্থাৎ দলে বিভাজিত।

* ইহা দেবী পরমেশ্বরীর পূজা। চাকমা-সমাজে ইহা একটি অতি পবিত্র অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। আশ্বিন কার্ত্তিক (১৩১৩) সংখ্যার "বৌদ্ধবন্ধু"তে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

মধ্যে বিবাহের কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় বারে পিষ্টক মোরগ এবং প্রথমোক্ত উপঢৌকনগুলি লইয়া বরের পিতা পুনরায় উপস্থিত হয়। এ যাত্রায় উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধা বিবেচিত হইয়া থাকে। এবং উপস্থিত পাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিতে পাত্রীর পিতামাতার অভিমতও অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় না। অনন্তর তৃতীয়বারেও দ্বিতীয়বারানুরূপ "তত্ত্ব" সামগ্রী লইয়া যায়, সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও থাকে। এবার পণ ধার্য্য করা হয়। সাধারণতঃ ৫০।৬০ তোলা রূপার গহনা এবং ১০০।১২০ টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই সময়ে বর কন্যা তুলিয়া আনিবে কি বরকে তুলিয়া আনিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, প্রস্তাব উপস্থিত হয়। বর তুলিয়া আনিয়া বিবাহে বরপক্ষীয়ের খরচ অবশ্য অল্প, কিন্তু ইহা খুব বিরল প্রচলিত। হিন্দু সমাজের কলঙ্ক কুলীন সম্প্রদায়ের মত যৌতুকের সামগ্রীতে গৃহপূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের সমাজে এযাবৎ হয় নাই। বর পাত্রীর পিত্রালয়ে গিয়া বিবাহ করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান মনে করে। পরন্তু ভাবী বৈবাহিকের রুধিরলোলুপ এমন কোন বরের পিতা চাক্‌মাজাতিতে দেখা যায় না, এবং তাদৃশ বরবিক্রয়ের প্রথাও ইহাদের সমাজে প্রচলিত নাই। সে যাহা হউক উপরোক্ত প্রস্তাবে উভয় পক্ষের সন্তোষজনক মীমাংসা সম্পাদিত হইলে শুভদিন ধার্য্য করে। ফসলের কার্য্য হইতে অবসর কালেই বিবাহের প্রশস্ত সময়; এই নিমিত্ত সচরাচর মাঘ ফাল্গুন মাসেই দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে হাতে টাকা পয়সারও অভাব হয় না এবং সকলে কাজকর্ম্ম হইতেও কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এইরূপে কথাবার্ত্তা সাব্যস্ত হইয়া গেলে কোন কোন বরের পিতা ভাবী পুত্রবধূকে উদ্বাহস্থিরতা জ্ঞাপক একটী অঙ্গুরীয় উপহার দিয়া আইসে। অবশেষে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে বরপক্ষ কন্যার পিতার নিকট হইতে অচিরে উপস্থিত বিবাহের নিমিত্ত মদপ্রস্তুত করিবে কি না অনুমতি লইয়া যায়।

বিবাহের পূর্ব্বদিন যে সকল বাদ্যকরেরা আসে, তাহাদের প্রথম বাদ্য হইতে বয়োবৃদ্ধগণ ভাবী পরিবারের শুভাশুভ গণনা করে। এই প্রথম বাদ্যকে "খোলামাননি" * বলা হয়। এতদ্ভিন্ন বরপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোক কদলী পত্রে পান এবং সুপারীর দুইটী 'পুটুলী' করিয়া একত্রে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াও ইষ্টানিষ্ট পরীক্ষা দেখে। যদি 'পুটুলী' দুইটী মিলিত হইয়া ভাসিতে থাকে, তাহা হইলে ভাবী দম্পতির প্রগাঢ় সদ্ভাব সূচিত হয়। অন্যথা 'পুটুলী' দুইটী বিপ্রকৃষ্ট হইয়া ভাসিলে পরস্পরের মধ্যে চিরজীবনই মতভেদ ঘটিয়া থাকে। বিবাহ বরের বাড়ীতে হইবার কথা হইলে তদনন্তর সেই মহিলা নদী হইতে এক কলসী জল লইয়া আইসে; নতুবা কন্যাপক্ষ হইতে জল তোলান হয়। তদ্দ্বারা বিবাহের দিন বরকন্যাকে স্নান করাইয়া থাকে। অধিবাস দিবসে বরকন্যা উভয়পক্ষেরই গৃহসম্মুখীন দুইধারে সপল্লব মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়া থাকে।

পাত্রী তুলিয়া—

পাত্রী তুলিয়া আনিতে হইলে বিবাহের পূর্ব্ব দিন, পথ যদি দূরবর্ত্তী হয়, তবে তাহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ যাহাতে বিবাহদিন প্রাতে পাত্রীকে লইয়া বরের বাড়ীতে উপনীত হইতে পারা যায়, সেই হিসাবে বরের পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা নানাবিধ বাদ্যাদি সমভিব্যাহারে কন্যা আনয়নের জন্য যাত্রা করে। তাহাদের সঙ্গে সগোত্রজা এক অনূঢ়া কিশোরী সুরঞ্জিত "ফুলবারেং"†এর মধ্যে করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সমস্ত গহনা, দুই দুইখানি "পিঁধন", "খাদী"‡ চাদর, "খবং"§ ও কুর্ত্তা (তন্মধ্যে একটি ফুলবিহীন ও অন্যটি "ফুলদার", এই "ফুলদার" কুর্ত্তা বিশেষতঃ বিবাহেই ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা এসময়ে গহনাগুলি বাঁধিয়া নিয়া থাকে) এবং এক বোতল নারিকেল তৈল, ও একখানি চিরুণী লইয়া যায়।

এদিকে কন্যাকর্ত্তা বিবিধ ভোজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া থাকে; এবং বরযাত্রিগণের নিমিত্ত প্রাঙ্গণে স্ত্রী ও পুরুষের

* ইহাতে প্রাঙ্গণে একটি জায়গা করিয়া তাহাতে পান সুপারী, প্রদীপ ইত্যাদি দিয়া ঘট স্থাপিত করে; এই নিমিত্ত টাকাও একটি দিতে হয়।

† "ফুলবারেং"—'চ্যাচারি' নির্ম্মিত ঝুড়ি বিশেষ।

‡ "পিঁধন" ও 'খাদী" স্ত্রীলোকদিগের যথাক্রমে পরিধেয় ও বক্ষবন্ধন বস্ত্র। বিস্তৃত পরিচয় অগ্রহায়ণ (১৩১৩) সংখ্যার কল্পতরুতে প্রকাশিত হইয়াছে।

§ খবং—পাগড়ী।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৈঠক স্থান গঠিত হয়। তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ স্বাগতসম্ভাষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে বসায়; এবং তখন মদ, তামাক ইত্যাদি শিষ্টাচারোপহার অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে পাত্রীপক্ষীয় সকলে নানা মঙ্গলা-য়োজনের সহিত প্রথমে উপরোক্ত কিশোরীকে গৃহে তুলিয়া, পরে অন্যান্য বরযাত্রিগণকেও ঘরে লইয়া যায়। এই সঙ্গে দ্বারদেশে স্থাপিত মঙ্গল ঘট এবং প্রদীপাদিও উঠাইয়া আনা হয়। পরে গহনাদি যাবতীয় দ্রব্য কন্যার পিতামাতা বুঝিয়া লয়, এবং সকলে আহার করিয়া উঠিলে বরপক্ষীয়া মহিলাগণ সেই গহনা এবং পরিচ্ছদের এক প্রস্থ পাত্রীকে পরাইয়া দেয়।

অনন্তর সকলে নিদ্রা যায়, এবং পরদিন প্রত্যুষে ঘট প্রদীপাদি যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক অপরাপর শুভানুষ্ঠানের সহিত পিতামাতা দুহিতারত্নকে বিদায় দান করে। এই সময়ে "সাঁকো" (সিঁড়ি)র পথ বন্ধ করিয়া সপ্তগুণ সূত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। বরপক্ষীয়েরা পাত্রী বাহির করিয়া আনিতে কন্যার মাতা সূতাখানি ছিঁড়িয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের সহিত কন্যার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়*। যাহা হউক, কন্যার সমভিব্যাহারে তাহার পিতা কি পিতামাতা উভয়েই গিয়া থাকে। বরের বাড়ীতেও নানা মঙ্গলায়োজনের সহিত পাত্রী তুলিয়া লইবার প্রথা আছে। বিবাহদিন প্রাতেই "চুঙলাং" পূজা হইয়া থাকে।

রাত্রে (কোন কোন পরিবারে গণৎকার নির্দ্ধারিত লগ্নে) বরকন্যাকে উপযুক্ত বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া শয়নকক্ষে বিবাহবেদী উপরি উপবেশন করায়। স্ত্রী স্বামীর বামপার্শ্বে স্থান পাইয়া থাকে। অতঃপর বরের কোনও আত্মীয় এবং আত্মীয়া বরকন্যার প্রতিনিধিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে তাহাদের পশ্চাতে বসে। ইহাদিগকে "ছাঁয়লা" এবং "ছাঁয়লী" বলা হয়। ইহারা একখানি নূতন কাপড় লইয়া উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করে, "যোড়গাঁট বাঁধিবার হুকুম আছে ত?" সকলে বলিয়া উঠে—"আছে" "আছে" "আছে"। সম্মতি পাইবা মাত্রই "ছাঁয়লা-ছাঁয়লী" উক্ত বস্ত্রের দ্বারা দম্পতীকে বদ্ধ করে। তখন তাহারা পরস্পরকে "বদাগুল্যা ভাত" অর্থাৎ সিদ্ধ ডিম্ব মিশ্রিত অন্ন এবং কলা, গুড় ও পান ইত্যাদি খাওয়ায়, ফলে মুখস্পর্শ করাইয়া থাকে। স্ত্রী দক্ষিণ হস্তে স্বামীর মুখে এবং স্বামী বাম হস্ত দ্বারা প্রণয়িনীর গলদেশ বেষ্টন করতঃ মুখে উল্লি-খিত ভক্ষ্য প্রদান করে। অবশ্য এই কার্য্যেও "ছাঁয়লা-ছাঁয়লী"র বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেন না উপস্থিত সাধারণের * সম্মুখে নবদম্পতি ব্রীড়ানিপীড়িতপ্রায় অসাড়ই থাকে। তখন তাহারা স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না। প্রতি কার্য্যেই অন্যদীয় সহায়তা অপেক্ষা করে! খাওয়ানর বিনিময়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সমাগত বয়োবৃদ্ধগণ নবীন দম্পতীর মস্তকে শুভাশীষবাক্যের সহিত নদীজল বর্ষণ করে। ইহাই স্বস্তি বাচন—পক্ষান্তরে কর্ম্মের সাফল্য ঘোষণা! অনন্তর স্বামী স্ত্রী দুই পৃথক স্থানে নিদ্রায় রাত্রি কাটাইয়া থাকে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে দম্পতী গাত্রোত্থান করিয়া জনৈক "ওঝার"† সহিত নদীকূলে যায়; এবং তথায় দুইটী মোরগের রুধির, 'ঘিলা' ও 'কুঁচ' বাঁটা, কিঞ্চিৎ মদ্য ও সোণারূপার জলে মাথা ধুইয়া শুদ্ধ হয়। ইহাকেই বিবাহের "বুরপারণ" বলে। অতঃপর চারিদিকের লোক ঘুম হইতে না উঠিতেই বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পরিশেষে আহারাদির পর আত্মীয়স্বজনাদি সমাগত স্ত্রী পুরুষ সকলে (অবশ্য দুই ভিন্ন দলে) সভা করিয়া বসে। তখন নবদম্পতী তাঁহাদিগের নিকট হইতে শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে উপনীত হয়, এবং যথোচিত অভিবাদন পুরঃসর পূজনীয়বর্গের নিকট হইতে নিষ্ঠীবনপৃক্ত-সতণ্ডুল-তুলা শুভনির্ম্মাল্য স্বরূপ লাভ করে। এই সঙ্গে দম্পতীর কিছু আর্থিক লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ এ সময়ে কন্যার

* ত্রিপুরাদিগের মধ্যেও ঈদৃশী প্রথা আছে, কিন্তু তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ। পাত্রীকে বাহির করিয়া আনিবার সময় তাহার ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূ (বাহই) দ্বারে একটি মুলী বাঁশ আড় করিয়া ধরে। বর-পক্ষীয়েরা তাহা ভাঙ্গিয়া কন্যা লইয়া আসে।

* এস্থলে 'সাধারণ' বলিতে স্বজাতীয় বুঝিতে হইবে। প্রত্যুত ইহা-দিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার কঠোরতা না থাকিলেও ইহারা এই বিবাহ স্বজাতি ভিন্ন অপর কাহাকেও কোনরূপেই দেখিতে দেয় না, এমন কি বিজাতীয় বন্ধুও বন্ধুর বিবাহ দেখিতে সমর্থ নহে।

† জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের যাজক। ভূতপ্রেতাদির উৎপাত নিবারণ, রোগপ্রতিকার, গ্রাম্যদেবতা পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়াকর্ম্মে "ওঝার" প্রয়োজন। এই পদ বংশগত নহে, বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলে ইহার ভার পায় না। চাকমাসমাজে ধাত্রীগণকেও "ওঝা" বলিয়া থাকে।

পিতা নবজামাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া দেন, "ইহাকে (স্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তার্পিত করিয়া) গ্রহণ কর। আমি বড় সাধ করিয়া ইহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এ নিতান্ত বালিকা, গৃহকর্ম্ম কিছুই জানে না। যদি কোন সময়ে তুমি কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া দেখ যে, ভাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, অথবা তদ্রূপ আর কোন দোষ করিয়াছে, তবে তাহাকে শিক্ষা দিও, প্রহার করিও না। এরূপে তিন বৎসর চলিয়া গেলেও যদি অনিষ্ট করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রহার করিতে পার, তজ্জন্য আমি অসন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু একবারে প্রাণে মারিয়া ফেলিলে, আমি তোমা হইতে প্রাণের মূল্য দাবী করিব।" অনন্তর কন্যাপক্ষীয় সকলে এবং অপরাপর আত্মীয়স্বজনদিগেরও প্রায় অনেকে বিবাহ বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

বিবাহের দুই তিন দিন পরে বর নানাবিধ মদ্য এবং পিষ্টকাদির সহিত নবোঢ়াসমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে গমন করে এবং তথায় দুই চারি দিন অবস্থানের পর সস্ত্রীক চলিয়া আইসে। ইহারই নাম "বিবাহের "ছুঁইদ্ ভাঙান" অর্থাৎ ইহাতেই বিবাহজনিত অপবিত্রতা (?) নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, ইহা না হইলে নবদম্পতীর একত্র বাসও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে এবং তাহারা অপর কাহারও মঞ্চেও * উঠিতে পারে না। চাক্‌মাসমাজের ইহা অতিশয় উল্লেখযোগ্য সংস্কার।

বর তুলিয়া

আনিয়া বিবাহ এবং উপরিবর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই; কেবল বর-আলয়ের কার্য্যগুলিও কন্যার পিত্রালয়ে হইয়া থাকে মাত্র। ইহাতে বরযাত্রীদিগের সহিত বরও গিয়া থাকে। তাহারা যাহাতে বিবাহ দিন প্রাতে পাত্রীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইতে পারে, সেই হিসাবে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য, 'বর তুলিয়া বিবাহে' "বিবাহের ছুঁইদ্ ভাঙাইবার" প্রয়োজন হয় না।

* ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ অবস্থাপন্ন প্রায় সকলেই মঞ্চোপরি বসবাস চালাইয়া থাকে, উচ্চশ্রেণী হইতেও ইহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সম্ভ্রান্ত কয়েক পরিবারে মাত্র বাঙ্গালী অনুকরণে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যুত কেবল চাক্‌মাগণ বলিয়া নহে, পার্ব্বত্য জাতি মাত্রেরই ঈদৃশী ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

বড় বিবাহ

রাজপরিবার এবং সম্ভ্রান্ত দেওয়ান পরিবার ভিন্ন অপর সাধারণে এ বিবাহের অধিকারী নহে*। ইহা একপক্ষে যেমন ব্যয়সাধ্য পক্ষান্তরে তেমনি বংশমর্য্যাদা সাপেক্ষ। বিবাহের আনুষঙ্গিক অপরাপর কার্য্য—পাত্রী তুলিয়া বিবাহেরই অনুরূপ। তবে সেই সঙ্গে আড়ম্বরাদির ত কথাই নাই। অধিকন্তু তিন খানি গৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহার এক ঘরে বরপক্ষ, আর এক ঘরে কন্যাপক্ষ থাকেন। অপর গৃহ খানি "ফুল ঘর" নামেই আখ্যাত। তাহাতে নবদম্পতিকে যথাবিধি বসাইয়া 'ঠাকুর' (ভিক্ষু) 'জয়মঙ্গলসূত্র' রূপান্তরে "সিগলমোগলতারা" পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে সাধারণ বিবাহেও এই "তারা" (শাস্ত্রগ্রন্থ) পঠিত হইত; এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত। এই "বড় বিবাহে"ও নবদম্পতীকে "ছুঁইদ্‌ভাঙাইয়া" আসিতে হয়।

গৃহ জামাতা।

যাহারা নিতান্ত সম্বলহীন এবং যাহাদের পরিবারে অপর কেহ নাই, তাহারা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া শ্বশুরেরই ব্যয়ে বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্র তুলিয়া লইয়া বিবাহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। গৃহ জামাতা হইলেও আজীবন শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান অধুনা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। অনেকেই আপনাকে পরিবারচালনক্ষম বুঝিলে স্ত্রীকে লইয়া সরিয়া পড়ে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর বিবাহ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুসমাজ হইতেও ইহা বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নতুবা কুলীন পরিবার যেরূপ ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল, এতদিন উহা সেই ভাবে প্রবল থাকিলে সম্ভবত এতদিনে হিন্দুসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইত!

মনোমিলনে বিবাহ।

ত্রিপুরাসমাজে এই বিবাহ "হিকনানানী" আখ্যায় প্রথিত। প্রাচীনকালে হিন্দুসম্প্রদায়ে যে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশের "কোর্টসিপ" (Courtship) এবং ব্রাহ্মসমাজের মনোমিলন পদ্ধতিতে তাহার কিঞ্চিৎ গন্ধ

* এমন কি, ইহাদের সমাজে জাতীয় রাজাদেশ ব্যতিরেকে সাধারণ চাক্‌মা পরিবারে কেহ কোন স্বর্ণাভরণ, অধিক কি "বাজু", "চন্দ্রহার" এবং পায়ের "মল" প্রভৃতি রৌপ্যালঙ্কারও ধারণ করিতে কিংবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের ন্যায় অবরোধপ্রথা প্রবর্ত্তনে সমর্থ নহে।

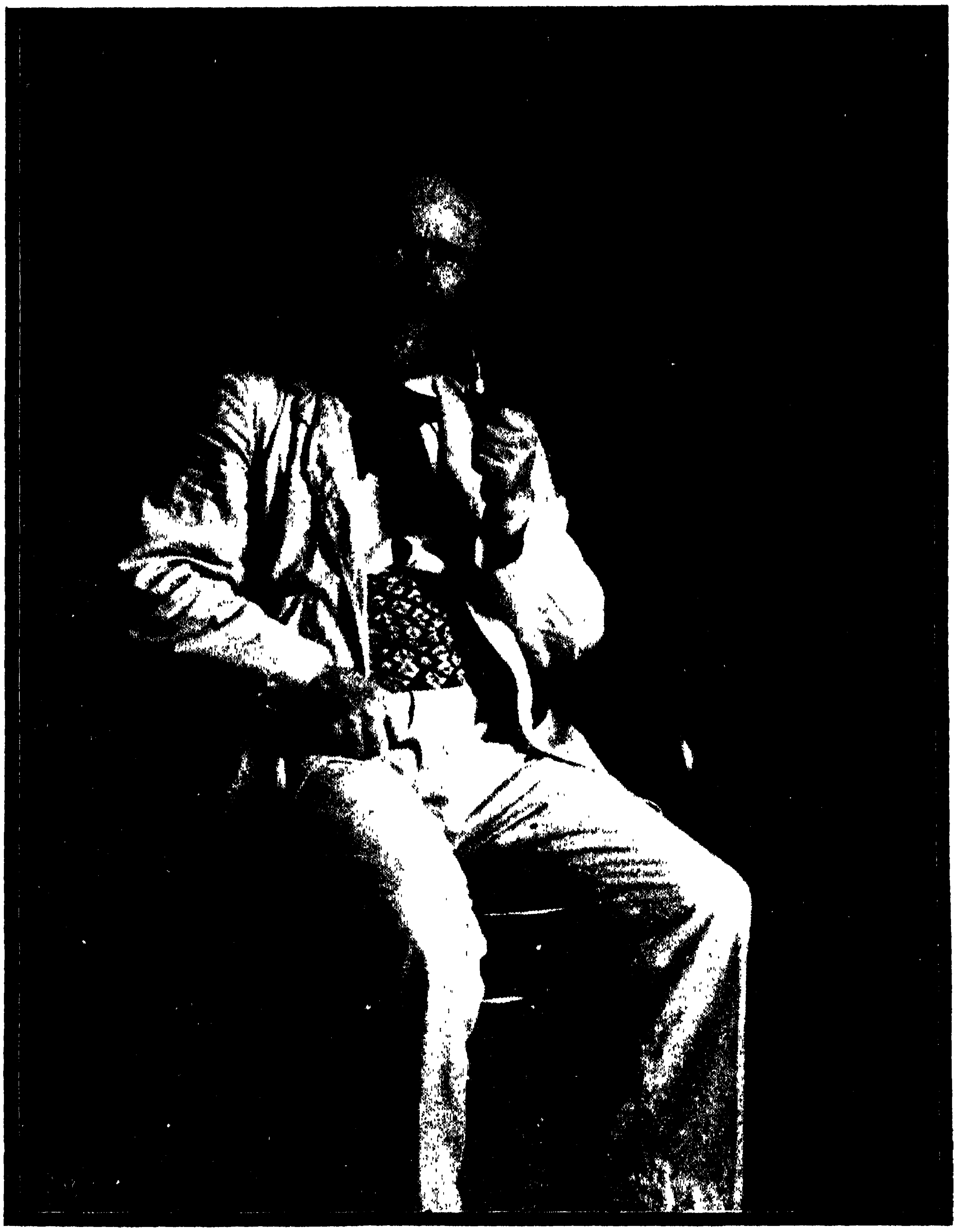

মিষ্টার কিয়ার হার্ডি, এম, পি,

প্রবাসীর জন্য গৃহীত বিশেষ ফটোগ্রাফ।

পাওয়া যায়। 'ইহাতে দম্পতী পরস্পরকে "ত্বং মে পতি— ত্বং মে ভার্য্যা" ইত্যাকার জ্ঞানে গ্রহণ করিলে 'গান্ধর্ব্ব বিবাহ' সম্পাদিত হইয়া যায়। ফলতঃ এইরূপ পরিণয় অতি আদিম প্রথা। অনেকদিন হইতে ইহা লইয়া নীতিশাস্ত্রবিদ্ সমাজে গভীর গবেষণা চলিতেছে; এ যাবৎ তাহার কোন প্রকৃষ্ট মীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই। চাকমাগণ ইহা ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে ইহা একরূপ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু সাধারণ সমাজে মনোমিলনে সম্বন্ধ যত অধিক, অভিভাবকদিগের প্রস্তাবসিদ্ধ বিবাহ তাহার অর্দ্ধেকও নহে। তবে তাহাদের এই বিবাহের সহিত পাশ্চাত্য সমাজের স্পেনীয় ও ফরাসীয় বিবাহব্যবস্থার গাঢ়তর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পরন্তু ইহাদের সমাজে অনূঢ় এবং অনূঢ়াদলের সম্মিলন প্রায় অব্যাহত। যুবক যুবতীর মধ্যে সেই সুযোগে প্রণয়াসক্তি জন্মিলে, কিম্বা "মহামুনি মেলার"* সম্মিলনে সূচিত পূর্ব্বরাগে মনোমিলন হইয়া গেলে, তাহারা উভয়ে একযোগে পলাইয়া যায়। এদিকে পিতামাতা যখন জানিতে পারে যে, তাহাদের পুত্র বা কন্যা অমুকের কন্যা বা পুত্রের সঙ্গে পলাইয়াছে, তখন কন্যার পিতা আসিয়া হেডম্যান † সমীপে যুবকের নামে অভিযোগ করে। উপায়ান্তরাভাবে যুবকের পিতামাতাও যুবতীর পিতামাতার নিকট ইহাদিগের পরিণয়ে সম্মতি প্রার্থনা করে। অবশেষে যুবক যুবতী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হেডম্যানের কাছে বিচার উপস্থিত হয়। যদি যুবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ দ্বারা লইয়া গিয়াছে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সেই দুর্ম্মতি যুবকের ৬০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারে। অন্যথা পরস্পরের স্বীকৃতি পাইলে (হেডম্যানের) বিচারে কিছু অর্থের দ্বারা কন্যার পিতামাতাকে সম্মত করিয়া তাহাদের যথাবিধি বিবাহ হইয়া যায়। আর কোন কারণে অভিভাবকদিগের সম্মতি পাওয়া না গেলে, তথাচ যদি যুবক যুবতীর সঙ্কল্প প্রবল থাকে, তাহারা পুনরায় পলায়ন করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার পলায়নের পর আর কেহই তাহাদের বিবাহে বাধা দেয় না। এই বিবাহে "চুঙুলাং" পূজা এবং নূতন কুটুম্বগণকে লইয়া এক পরিপাটি ভোজ ভিন্ন অপরাপর আনুষঙ্গিক কার্য্য না করিলেও চলে, হয়ও না।

কোন কোন সময় এবংবিধ সম্মিলনে ভগ্নমনোরথ হইয়া করুণরসাত্মক অভিনয় ঘটে! তখন ইহা চিরজীবনের তরে অসুখের কারণ হইয়া থাকে। কাপ্তেন লুইন স্বীয় পুস্তকে* এরূপ একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহারই মর্ম্মানুবাদ তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলাম ঃ—

"ভুপিয়া নামে জনৈক যুবক সন্যামুলা নাম্নী বালিকার সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই সন্যামুলা মাতৃহারা হয়। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জুরাধন সস্ত্রীক ভিন্নগ্রামে বসতি করিত। সন্যামুলা অপর ভ্রাতা হিরাধন ও বৃদ্ধ পিতার সহিত জুমের সময় "মইনঘরে"† বাস করিতেছিল। ভুপিয়া তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিত; কোনরূপেই তাহার পাশ ছাড়া হইতে চাহিত না। জুমকার্য্যের সহায়তা প্রভৃতি ব্যপদেশে সে সর্ব্বদাই তাহাদের পরিবারের ভিতর থাকিতে প্রয়াস পাইত এবং প্রায় প্রতিদিনই তাহাদের বাড়ীতে আহার ও "গুদী ‡ তে শয়ন করিত। কিন্তু সে এত দরিদ্র ছিল যে, সন্যামুলার অভিভাবকদের সহিত প্রস্তাবক্রমে বিবাহ করিবার সাহস পায় নাই। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া তাহাদিগের প্রণয়ের আদান প্রদান চলিতে থাকে। অবশেষে উভয়ে একযোগে পলায়ন করিল। ঘটনার অবশিষ্ট কথাগুলি হিরাধনের মুখেই প্রকাশ করা যাইতেছে।—"গত শুক্রবার আমি যখন কার্য্যস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হই, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোর ভগ্নী কোথায়? অনেকক্ষণ হইল সে জল আনিতে গেল, কিন্তু অদ্যাপি ফিরে নাই। অকর্ম্মণ্য ভুপিয়া আমাদের এখানে নিরন্তর ঘুরিত। আমার সন্দেহ হইতেছে, বুঝিবা সন্যামুলা তাহারই সঙ্গে পলাইয়া গেল!' এই কথায় আমি আরও দুই তিন জন যুবককে সঙ্গে লইয়া ভগিনার উদ্দেশে বাহির হইলাম। এক ক্ষুদ্র সরিত্তীরে তাহাদের সহিত দেখা হইল। ভুপিয়া অগ্রে; সন্যামুলা তাহার হস্তধারণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। এই দৃশ্যে আমি ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত দা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতেই সে একপার্শ্বে লাফাইয়া পড়িল; এবং সেই আঘাত আমার ভগ্নীর উপর পড়িয়া তাহার পার্শ্বদেশ কাটিয়া ফেলিল। হায়! তৎক্ষণাৎ সে 'ও ভাই' বলিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি ভয়ে পলাইয়া গেলাম। যদিও আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানিতাম না যে, তাহাদের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে। কেন না প্রেম-সমস্যা অনুসন্ধান—আমাদের জাতীয় প্রথা নহে। যদি ভুপিয়া আমাদের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত করিত এবং নিয়মিত পণ দিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা বন্ধুবান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকেই বিবাহ দিতাম। কিন্তু সে বিবাহের উপযোগী ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে

* এই মেলার বিস্তৃত বিবরণী ফাল্গুন চৈত্র (১৩১২) সংখ্যার "কোহিনুরে", 'মহামুনি' শীর্ষক প্রবন্ধে বাহির হইয়াছে এবং বক্ষ্যমান্ চিত্রও "বৌদ্ধবন্ধু"র ভাদ্র (১৩১৩) সংখ্যায় সুস্পষ্ট দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

† হেড্‌ম্যান (Head man)—গ্রামের মোড়ল। বলা বাহুল্য ইংরাজ শাসনাধীনে আসিয়া বর্ত্তমান পদবী লাভ হইয়াছে। ইহাঁরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজাবাহাদুরের অনুরোধক্রমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

* The Chittagong Hill Tracts and the dwellers there in.—P. 72-73.

† জুমক্ষেত্রের ফসল পাকিলে বন্যজন্তুর উপদ্রব হইতে তৎসমুদয় রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় মইন্ অর্থাৎ শৃঙ্গোপরি যে অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হয়।

‡ শয়নকক্ষ।

পারিবে না বলিয়া তাহা করে নাই। অগত্যা সন্ধ্যামুলাকে লইয়া পলাইয়াছিল।" ইত্যাদি।"

ইহা ছাড়া এইরূপই প্রায়শঃ ঘটে যে, কোন রমণী এক জনকে পূর্ব্বে বিশেষরূপ আশ্বাস দিয়াছিল, শেষে ঘটনাচক্রে অপরের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায়। ইহাতে সেই হতাশপ্রণয়ী স্বীয় জীবনের মমতা তুচ্ছ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে ইহলোক হইতে সরাইতে সচেষ্ট হয়। বৎসরে দুই চারিটি হত্যা এই নিমিত্তই ঘটিয়া থাকে।

বিধবা এবং পরিত্যক্তা রমণীদের বিবাহে বিশেষ কোনও আমোদ-উৎসবাদি হয় না। কেবল স্বগ্রামবাসী সকলকে একটি ভোজ দেওয়া গিয়া থাকে মাত্র। পূর্ব্বপতির ঔরসজাত সন্তানাদি অধিকাংশস্থলে তাহাদের পিত্রালয়েই থাকে। আর নিতান্ত অপোগণ্ড হইলে যদি মাকে ছাড়া থাকিতে না চাহে, তাহা হইলে পরবর্ত্তীস্বামীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে দান করিয়া না গেলে কেহই পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না।

গর্ভাধানাদি ইহাদের সমাজে নাই। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ প্রভৃতি গর্ভিণীসংস্কারগুলিও এই সমাজে কোন কালে ছিল কি না, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরন্তু এই সকলের পরিবর্ত্তে প্রসূতিদিগের মঙ্গলার্থ প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে "গাংশালা"* ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। গর্ভের সপ্তম মাসে অথবা প্রসবের পর শুভদিন নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বদিন যথানিয়মে অর্থাৎ মদ, পান, সুপারী প্রভৃতি দিয়া "ওঝা" নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী নদীজলে—জলপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ ভাগে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। অনন্তর বাড়ীতে আসিয়া একটি হাঁড়িতে একটা আস্ত সুপারী স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখ "থাদী" দ্বারা আবৃত করিয়া লয়। পরে একখানি সুদীর্ঘ সূতার একপ্রান্ত সেই "হাঁড়ির" গলায় সাতপাক জড়ায় এবং হাঁড়িটী সাতবার গর্ভিণীর বা প্রসূতির মস্তক 'নিছিয়া' যথাসম্ভব সোজাসুজি পথে সেই ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া আসে। কিন্তু সূতাখানি এত লম্বা থাকে যে, তাহার এক প্রান্ত সেই "গাংশালার" "হাঁড়ি"তে আবদ্ধ রহিলেও অপর প্রান্ত 'পোয়াতি'র আবাস গৃহে থাকে। ব্রতকার্য্যে প্রথমে "আগ্ চাওয়া"* হইয়া গেলে পূজা ও বলিদান প্রভৃতি, ক্রমে সম্পাদিত হয়। অনন্তর ওঝা সূতা ধরিয়া অগ্রসর হয়; এবং প্রসূতির স্বামী সেই "হাঁড়ি" ও বলিপ্রদত্ত মোরগ লইয়া অনুসরণ করিতে থাকে। "হাঁড়ি"টী গৃহে আনিয়া তুলিয়া রাখিবার পর প্রাঙ্গণে একটি শূকর বলি দেওয়া হয়। ইহার নাম "আগিদা"। পরিশেষে সাধ্যমতে আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশিগণকে ভোজদানের ব্যবস্থা আছে।

(২)

অন্ত্যেষ্টি।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে স্নানাদি করাইয়া শবকে নববস্ত্র পরিধান করায় এবং "সিঙাপা"য় তিনটী বংশবোঝা সংস্থাপন করিয়া তদুপরি শয্যা রচনা পূর্ব্বক উহাকে তাহাতে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া রাখে। অনন্তর শবের শিরোদেশে ও পদপ্রান্তে দুইটি অন্নপিণ্ড এবং বক্ষোপরি কতক খই ও একটি টাকা রাখার পর বড়া (শ্রমণ) "মালেম তারা" পাঠ আরম্ভ করেন। রাজা বা গণ্যমান্য লোকের মৃত্যুতে "আবেওয়ামা তারা"ও পঠিত হইয়া থাকে। এই সময়ে "ঢুল" (ঢোল) বাদ্যও চলে, এবং শবরক্ষক যুবকগণ এই "ঢুল" বাজাইয়াই রাত্রি যাপন করে। অন্ত্যেষ্টির আয়োজন এবং আত্মীয় স্বজনের আগমন পর্য্যন্ত শব এইরূপে থাকে। পরে সুবিধানুরূপ দিনে চরম সংস্কারের নিমিত্ত সকলে প্রস্তুত হয়। বুধবার লক্ষীবার; সুতরাং সেইদিন মৃতসংকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাহা ছাড়া অনেক পরিবারে শুক্রবারেও স্থগিত থাকে। কিন্তু শব যত দিন গৃহে থাকে, তত দিন বাড়ীতে আর উনুন জলে না। তাহারা সকলে নিকটবর্ত্তী আত্মীয় বা পাড়ার অপর কাহারও গৃহে একে একে আহার করিয়া আসে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সৎকারের যথাবিধি আয়োজন হইলে পূর্ব্বস্থাপিত অন্নপিণ্ডদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের

* "গাং"—নদী, "শালা"—গৃহ; নদীতে গৃহ প্রস্তুত করিয়া যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে "গাংশালা ব্রত" কহে।

* "আগ"—পরীক্ষা, "চাওয়া"—দেখা। ওঝা দুইটি কাটাল পাতা উদভাবে বাঁশ পাতা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যস্থলে রাখিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করে। যদি পাতা দুইটিই চিৎ হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে—'হাসিতেছে!' অন্যথা দুইটিই উল্টিয়া পড়িলে বিরাগভাব সূচিত করে। কিন্তু ইহার কোনটাই সফলতাদায়ক নহে। দ্বিতীয় কি তৃতীয়বারের পরীক্ষাতেও যদি পাতা একটী চিৎ ও একটি উপুড় করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহা হইলে সেই পাতা দুইটী পরিবর্ত্তন করিয়া লয়।

মুখস্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দেয়; এবং তৎস্থলে পুনরায় দুইটী সদ্যপক্ক অন্যপিণ্ড স্থাপন করে। অনন্তর শবের পাদকনিষ্ঠা-ঙ্গুলিতে সপ্তলহর সূত্রের এক প্রান্ত বদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত একটি মোরগশাবকের অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া দেয়; মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে সেই মোরগশাবক ধরিয়া থাকে। তখন "আদমের" (পাড়ার) জনৈক বয়োবৃদ্ধ সূত্রের ঠিক মধ্যস্থলে —নিম্নে একখণ্ড কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া "তাগল" (দা) হস্তে সমাগত আর সকলকে জিজ্ঞাসা করে, 'মরা হইতে জীবিতদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হুকুম আছে কি না?" তাহারা যুগপৎ "আছে" "আছে" বলিয়া উঠিলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির একই ঘা'য়ে মৃত জীবিতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে "আনিজা তারা" পাঠ আরম্ভ হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেই সকলে শবকে শ্মশানভূমিতে লইয়া চলে। সচরাচর স্রোতস্বতী তীরেই শ্মশান নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। তথায় আনয়নের পর শেষোক্ত অন্নপিণ্ড দুইটী হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাতবার শবের মুখস্পর্শ করাইয়া পরিত্যাগ করে।

পূর্ণবয়স্কের মৃত্যুতে ও সমর্থ হইলে শ্মশানে রথ টানিবার আয়োজন করা হয়। এই রথ নির্ম্মাণেও আবার ইতর-বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রাজপরিবারে বা তদ্‌ঘনিষ্ঠ কেহ মরিলে "পঞ্চরত্ন" রথ প্রস্তুত হয়, অপর সাধারণের মৃত্যুতে একটিমাত্র শৃঙ্গ থাকে। একটি কাষ্ঠমঞ্জুষায় নানা সৌগন্ধি দ্রব্যাদির সহিত শব রাখিয়া, সেই শবাধার রথোপরি স্থাপন করে। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমান দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিপরীতাভিমুখে টানিতে থাকে। তাহাদের এক-পক্ষকে "স্বর্গের দূত" অপর পক্ষকে "নরকের দূত" নামে কল্পনা করা হয়। তাহাদিগের হারজিতের দ্বারা মৃতব্যক্তির পরলোকের স্থান পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু লোক-নির্ব্বাচনে এমনি চাতুরী থাকে, প্রায়শই "স্বর্গীয় দূতের" জয় হয়। পূর্ব্বে এই রথ টানিবার নিমিত্ত বিবাহিত এবং অবিবাহিতদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। বর্ত্তমানে বিবাহিতের সংখ্যা অধিক হইয়া যাওয়াতে "গোছা" ভেদে অথবা নদীর বিপরীতকূলবাসীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। বলিয়া রাখা ভাল, এই সময়ে বাদ্য, বাজী-পোড়ান প্রভৃতিও একান্ত প্রয়োজন।

শব সচরাচর দাহ করিয়া বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু অনুদ্গতদন্ত শিশু কিংবা বসন্ত বা ওলাউঠাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ভূপ্রোথিত করাই সাধারণ বিধি। যদি কেহ তাদৃশ শবকেও পোড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে শবের মুখে কড়ি স্পর্শ করাইয়া অথবা সমাধিদানের কয়েক দিন পরে 'কবর' হইতে উহা তুলিয়া—তৎপর জ্বালায়। ইহা-দের শবদগ্ধ করিবার নিমিত্ত চুল্লীর প্রয়োজন হয় না। দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা গুঁড়ি স্থাপন করিয়া তদুপরি পুরুষের নিমিত্ত পাঁচ তবক এবং স্ত্রীলোকের সাত তবক সরু কাষ্ঠ সাজাইয়া লয়। * মধ্যে মধ্যে আম্র প্রশাখাও নিয়ম আছে। ধনশালী মহাশয়েরা তৎপরিবর্ত্তে চন্দনকাষ্ঠ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই চিতার উপরিভাগে একখানি চন্দ্রাতপ টাঙাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর পুরুষের শব পূর্ব্বাভিমুখ এবং স্ত্রীলোকের শব পশ্চিমাভিমুখ মস্তকে চিতার উপর সংস্থাপিত করা হয়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র তদভাবে অপর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মুখাগ্নি দান করিলে আরও অনেকে চতুর্দ্দিক হইতে অগ্নিসংযোগ করিয়া থাকে।

এই সঙ্গে মৃত ব্যক্তির গৃহের একটি থাম কি একটি বাঁশ বা যে কোন একটি অংশ পরজন্মের আশ্রয়ার্থ দগ্ধ করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের মৃত্যুতে প্রক্ষালনকালেও বাদ্যোৎসবের প্রচলন আছে। অবস্থাপন্ন হইলে, বাজী পোড়াইবারও ব্যবস্থা করা হয়। পরিশেষে দাহকার্য্য সমাধা হইয়া আসিলে রড়ীগণ "ছাদিংগিরি তারা" পাঠ করেন। যদি কেহ ভূতগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা হইলে সেই শব অর্দ্ধদগ্ধ হইবার পর বক্ষের নিম্নে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলা হয়। সংস্কার আছে, নতুবা সেই পুনর্জ্জীবিত হইয়া নানা অহিত সংঘটন করে। প্রাচীনকালে আত্মহত্যাকারীদিগের প্রতিও ঈদৃশী ব্যবস্থা প্রদত্ত হইত। বিসূচিকাদি সংক্রামক রোগে মৃতদেহ ভূগর্ভে পুতিয়া রাখে; অনন্তর দুই তিন মাস পর সেই শব তুলিয়া যথা নিয়মে জ্বালাইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল

* মঘদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের নিমিত্ত অধিকতর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। চাক্‌মাগণ তাহাদিগ হইতে ইহা অনুকরণ করিতে পারে। কিন্তু জানি না, ঈদৃশী ব্যবস্থায় কোন্ বিশেষ রহস্য নিহিত রহিয়াছে কাপ্তেন লুইনও এতৎপ্রসঙ্গালোচনায় লিখিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের অধিকতর বুদ্ধি এবং তৈলাক্ত পদার্থের আধিক্যনিবন্ধন দাহোপকরণের কম প্রয়োজন হইবার কথা, কিন্তু ইহারা তৎস্থলে আরও অধিকই ব্যবহার করে।

ছোঁয়াচে রোগের শব সদ্য জ্বালাইলে হুতাশনের প্রায় ঐ রোগ গ্রাম উৎসন্ন করে।

হাড়ভাসান।

অন্ত্যেষ্টির পরদিন প্রত্যূষে চিতা হইতে কতকগুলি অস্থিমাত্র সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্মরাশি স্রোতোজলে নিক্ষেপ করে। অনন্তর সংগৃহীত হাড়গুলি একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করত মৃতব্যক্তির জনৈক সগোত্র লইয়া সেই স্রোতস্বতীর জলে নামে। এই ব্যক্তির হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয়; অপর প্রান্ত তাহার সম্পর্কে সম্মানিত সেই গোত্রেরই কেহ তীরভূমি হইতে টানিয়া ধরে। এদিকে চাপদ্বারা "হাঁড়ি"টা জলপূর্ণ হইলে ডুব দিয়া তাহা ঠেলিয়া দিতেই তীরস্থিত ব্যক্তি জলগত ব্যক্তিকে টানিয়া তুলিয়া আনে। অতঃপর রড়ী ও ঠাকুরদিগকে দান-দক্ষিণা উৎসর্গ করা এবং পরিপাটিরূপে খাওয়ান হয়। এই সময়ে শ্মশান ভূমিতে ঘেরা দিবারও ব্যবস্থা আছে।

শ্রাদ্ধ।

কোন কোন গোষ্ঠীতে অন্ত্যেষ্টির দিন হইতে সাতদিন পরে আবার কেহ কেহ বা মৃত্যু দিবসের সাতদিন পরে সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই আদ্যশ্রাদ্ধকার্য্য শ্মশান ভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাধ্যায়ত্তরূপে ভিক্ষু ও শ্রমণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধ্বজা, খট্টা, শয্যা, নানাবিধ বাসন ও ভোজ্যোপকরণ ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ করে; এবং সপরিবারে কলসী ধরিয়া জল ঢালিয়া থাকে। যদি পরিবারের কাহারও অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে একখানি সুদীর্ঘ সূত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া রহে, অপরপ্রান্ত দানভূমিতে আনিয়া উক্ত কলসীগলে জড়ায়। পিতামাতার শ্রাদ্ধে মাথার চুল ফেলিয়া দিতে হয়। এই সময়ে সমাগত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরাও প্রেতাত্মার উদ্দেশে ধ্বজা প্রতিষ্ঠা এবং 'দান খয়রাত' ইত্যাদি যথা ইচ্ছা করিয়া থাকে। কথিত আছে, 'ধ্বজাদানের এতই ফল যে, তৎসঞ্চালনে শ্মশানের যতগুলি রেণু চালিত হয়, মৃতব্যক্তি তত বৎসর নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গবাসের অধিকার লাভ করে।' সুতরাং ধ্বজা সংখ্যায় বেশী হইলে স্বর্গবাসের সুবিধাও অধিক হয়। এতদুপলক্ষে ভোজনাদিও যথাসাধ্য পরিপাটি হইয়া থাকে। ইহাদের সমাজে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবারও রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকেই করে। মৃত্যুদিবসের বাঙ্গলা তারিখ ধরিয়াই বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন গণনা করা হয়। ইহাতেও ভিক্ষু এবং শ্রমণদিগকে নানাবিধ দান ও দক্ষিণাদি উৎসর্গ ভিন্ন পূর্ব্বোক্তরূপে জল ঢালাও হয়, তা'ছাড়া অপর কোন বিশেষ বিধি নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

সংগ্রহ।

ম্যালেরিয়ার ইতিহাস।

ডাক্তার মেজর রস, এফ, আর, এস, ম্যালেরিয়ার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। তাহার সারসংগ্রহ ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত বঙ্গীয় পাঠকের মনোরঞ্জক হইবে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে হিপোক্রেটিস লিখিয়া গিয়াছেন যে গ্রীক ও রোমকেরা ম্যালেরিয়ার নিদান অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে (১) ম্যালেরিয়া লাগ্নিক ব্যাধি নহে; তাহার আক্রমণ ছাড়িয়া ছাড়িয়া সময়ে সময়ে ঘটে। ইহা প্রাত্যহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যহিক বা চতুরহিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ জ্বর রোজ ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, এক দিনে দুই বার, প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ এক দিন অন্তর, প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে। (২) এই ব্যাধির সহিত স্যাঁতা স্থান ও জলা প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাঁহারা ইহাও স্থির করেন যে ম্যালেরিয়ার বিষ কোন প্রকার জীবাণু দ্বারা মনুষ্য শরীরে নিষিক্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মশক-উপপত্তির সহিত ইহার একত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। *

গ্রীক ও রোমকের পরে দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ম্যালেরিয়ার সংশ্রব। ইকোয়েডরের অন্তর্গত ম্যালাকোটস্ নামক গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কুইনিনের আবিষ্কার হয়। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা য়ুরোপে বিজ্ঞাত হয়, এবং ফরাসী রাজা চতুর্দ্দশ লুই ইহা ব্যবহার করিয়া জ্বরমুক্ত হইলে

* সিংহলের এক ইংরাজ ডাক্তার প্রাচীন সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে হিন্দুদিগের মশকবিষে জ্বরোৎপত্তির প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় প্রচার করিয়াছেন।

কুইনাইনের খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। ১৮২০ সালে পেরুভিয়ন-ত্বক হইতে প্রকৃত কুইনিয়ন বহিষ্কৃত করা হয়।

অধুনাতন কালে জীবাণুবিদ্যা ও অণুবীক্ষণের উন্নতি-দ্বারা ইহা নিশ্চিত প্রমাণ হইয়াছে যে ম্যালেরিয়া বিষ মশক-সংক্রামিত জীবাণু ভিন্ন আর কিছু নহে। উহারা মনুষ্যরক্তে মিশ্রিত হইয়া দাহ উপস্থিত করে। তাহাই ম্যালেরিয়া জ্বর। অন্যান্য বহু রোগ, যেমন যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি, জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রাণীজ এবং অন্যান্য রোগের উদ্ভিজ্জ।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের মধ্যে গিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। যখন জীবাণুকোষ পূর্ণ-পরিণত হইয়া ফাটিয়া অসংখ্য বংশে ছড়াইয়া পড়ে, তখনই জ্বর আসে, আবার সকল জীবাণু পরিণত হইয়া উঠিলে জ্বর বন্ধ হয়; পরিণতির শেষাবস্থায় যখন আবার বংশবিস্তার হয়, তখন আবার জ্বর হয়, এইরূপে কোন কোন জীবাণু ২৪ ঘণ্টায় একবার, কোন কোন বা ৪৮ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টায় একবার বংশ বিস্তার করে। একই শরীরে ত্রিবিধ জীবাণুই থাকিতে পারে, কিন্তু সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না।

যে সময় ম্যালেরিয়া জীবাণু রক্তের মধ্যে বংশ বিস্তার করে সেই সময় রোগীর শীত বা কম্প, গা বমি বমি, এবং দাহ হয়। অল্পক্ষণ পরে শরীর প্রাকৃতিক চেষ্টায় বহির্বিষকে আয়ত্ত করিয়া লয়, এবং কতক বিষ ঘামের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়, তখন জ্বর ছাড়ে। কিন্তু রক্তের মধ্যে যাহারা থাকে তাহারা আবার বংশ বিস্তার করে, আবার জ্বর হয়। যে পর্য্যন্ত না নিঃশেষে জীবাণু ধ্বংস হয়, সে পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া জ্বর আসে। সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হইয়া গেলেও সামান্য অনিয়ম, যেমন রৌদ্র বা অগ্নিতাপ, পরিশ্রম, ঠাণ্ডা প্রভৃতি মৃত জীবাণুকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলে, এবং পালটিয়া জ্বর হয়। এই জন্য খুব সাবধানে থাকিয়া বহুদিন ধরিয়া জীবাণুর সঙ্গে প্রতিষেধক ঔষধ সাহায্যে যুদ্ধ চালান দরকার, শত্রু মরিয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি'!

ম্যালেরিয়ার দেশে ছেলেরা অধিক আক্রান্ত হইয়া মারা পড়ে। যদি কোন মতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ এড়াইয়া বড় হয়, তবে আর তাহাদের বড় একটা জ্বর জ্বালা হয় না। ইহার কারণ, ম্যালেরিয়ার দেশে এমন বালক নাই যাহার রক্তে ম্যালেরিয়াবিষ নাই; যদি বিষ অল্পে অল্পে রক্তে মিশে তবে টীকা দেওয়ার মত তাহা শরীরে সহিয়া যায়, অথচ বাহিরের বিষকে আর রক্তের মধ্যে আমল দেয় না। ম্যালেরিয়ার অল্পবিষাক্ত বালক বড় হইলেও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে।

প্রথমে অনুমিত হইত যে এই ম্যালেরিয়া বিষ বদ্ধ পচা জলাশয়ে জন্মে এবং বাতাসের সঙ্গে শ্বাস গ্রহণের সময় শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া অনর্থ ঘটায় বা সেই জল পান করিলে শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। তৎপরে মশক-উপপত্তি প্রচারিত হয়। এবং ইহা সত্য কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মশক ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে আছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র হয় না কেন? ডাক্তার সার্ প্যাট্রিক ম্যান্সন্ প্রমাণ করিয়াছেন যে ম্যালেরিয়া বিষ এক জাতীয় বিশেষ মশকের দ্বারা মনুষ্য শরীরে নিষিক্ত হয়, সকল মশকই অপরাধী নহে।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার কল্পে ডাক্তার রস ম্যালেরিয়া-মশক উৎপাদক জলা বিল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমরা দল বাঁধিয়া নির্জীবভাবে মরিতে জানি, প্রতিকার করিতে জানি না। পরাধীন জাতির উদ্যমও থাকে না, এবং এ সব কাজ ব্যক্তিগত নহে; পূর্ব্বে সমাজ-সাপেক্ষ ছিল, এখন রাষ্ট্রসাপেক্ষ হইয়াছে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র না হইলে অকর্ম্মণ্য জীবের চুপিচুপি মরণের প্রতি পরকীয় রাষ্ট্র কখনই লক্ষ্য করিবে না।

পুরাতত্ত্ব-আবিষ্কার।

আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যত্নে মিশর দেশের নাগা-এড্-ডার নামক স্থান খনন করিয়া মিশরের আদিম নিবাসীদিগের সম্বন্ধে বহুতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদিম অসভ্য অধিবাসী হইতে সুসভ্য মিশরবাসীদিগের ৯।১০ হাজার বৎসরের ক্রমোন্নতি ও পুনরবনতির ইতিহাস নির্ণীত হইয়াছে। গোরস্থান হইতে মসলারক্ষিত নরশরীর আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে স্থানে নরকঙ্কাল বাহির হইয়াছে তাহা কায়রো সহরের ৩০০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব মরুময় স্থান;

সেখানে নরকঙ্কাল বাহির হইয়া প্রমাণ করিতেছে যে এক-কালে সেই ভূমি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মনুষ্যবাসোপযোগী ছিল, কালে আবহ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মরুতে পরিণত হইয়াছে।

নরকঙ্কাল দেখিয়া মিশরের আদিমবাসীদিগকে আসীয় বংশ বলিয়া জানা যাইতেছে। সেই সকল নরশরীর এমন অবিকৃত আছে যে অন্ত্র পাকস্থলীতে খাদ্য, এমন কি ঔষধ পর্য্যন্ত আজো অবিকৃত আছে। তাহা দেখিয়া তদানীন্তন কালের খাদ্যপেয় ঔষধ প্রভৃতির স্বরূপ অবগত হওয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল শরীর দেখিয়া তাহাদের মৃত্যুকারণও স্থির করিয়াছেন; কেহ মূত্রস্থালীর পীড়ায়, কেহ পাথুরী রোগে, কেহ বিকৃত অস্থির জন্য মারিয়াছে বুঝা যায়।

এই সকল মনুষ্যের সহিত অধুনাতন অধিবাসীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে। এই বিপুল কালের মধ্যেও সেই আদিম মনুষ্যের বংশপরম্পরায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্তি স্থগিত হইয়া আছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

কবরের মধ্যে তদানীন্তন কালের আচার ব্যবহার, জীবন যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তরনির্ম্মিত। তখনই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল; অস্ত্রের বাঁট সাপ বা অন্যান্য জন্তুর মস্তকের অনুকরণে অঙ্কিত। মৃৎ পাত্রে বহুবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত। ধাতুর চিহ্ন মাত্র নাই। বোধ হয় ধাতুর ব্যবহার তখনো জ্ঞাত হয় নাই। কবরের মধ্যেও মনুষ্য শরীর অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা সেই ইতিহাসাতীত কালেও মিশরবাসীর আয়ত্ত হইয়াছিল দেখা যায়। তৎকালে ঘাসের বুনোট চ্যাটাইয়ের মধ্যে লবণ মাখান মৃতদেহ জড়াইয়া রাখা হইত। সেই মৃতদেহের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র খাদ্যপেয় কবরে রাখা হইত, ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কবরগুলি বৃত্তাভাসের আকারে বা চৌকা করিয়া তৈয়ার হইত। ঘাসের মাদুর চাপা দিয়া তাহার উপর মাটি ঢাকা দেওয়া হইত।

সকল দেহগুলি একই রকমে রক্ষিত দেখা গিয়াছে। হাঁটু মুড়িয়া তাহার উপর দাড়ি রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়ান। বোধ হয় এইরূপ করিয়া গোর দেওয়াই তাৎকালিক প্রথা ছিল।

স্ত্রীলোকের কবরের মধ্যে চুড়ি, বালা, চিরুণী, কাঁকই, মালা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

নাগা-এড্ ডার্ বোধ হয় সমগ্রদেশের গোরস্থানরূপেই ব্যবহৃত হইত। কারণ সেখানে বহুকালের ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রোমসম্রাট জষ্টিনিয়নের নামাঙ্কিত মুদ্রা কোন কোন কবরে পাওয়া গিয়াছে। তাৎকালিক কবরের মধ্যে মালা, কণ্ঠহার, বালা চুড়ি, কাণের মাকড়ি, আংটি, মাথার মুকুট, ক্রুশযুক্ত গহনা, প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত, এবং কোন কোনটা গিল্টী করা।

পরবর্ত্তী কালের "মমী" অর্থাৎ মস্‌লাদ্বারা রক্ষিত শরীরের আবরণ খুলিয়া অতি চমৎকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, রত্নাভরণ, শিল্প-কলার নিদর্শন, জ্যামিতিক চিত্র, নরনারীর মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। তৎকালে যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

সিংহল দ্বীপেও সংপ্রতি একটি সহরের ধ্বংসাবশেষ ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সহরে খৃষ্টজন্মেরও বহু পূর্ব্বে চরম সভ্যতা প্রসৃত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।

এই দুই পুরাতত্ত্ব সায়েন্টিফিক আমেরিকান হইতে সংগৃহীত হইল।

ইটের ইতিহাস।

ইট আমাদের এত পরিচিত যে তাহা যে কোন কালে ছিল না, এবং মানুষ তাহা বুদ্ধি খরচ করিয়া উদ্ভাবন করিয়াছিল ইহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না। অতি পুরাতন ভূগর্ভ উত্থিত জনপদের ধ্বংসাবশেষেও ইটের চিহ্ন দেখা যায়। সে, তবে মনুষ্যের ইতিহাসের কোন অতীত কাল যবে মানুষ ইট গড়িতে জানিত না। সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান্ পত্রিকায় ইটের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই সার সঙ্কলন এখানে লিখিত হইতেছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত অধ্যাপক ই, জে, ব্যাঙ্ক্‌স্ ব্যাবিলোনীয়ার মধ্যে একটি সহর খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছেন। অধ্যাপকের মতে ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম সহর।

একটি মন্দিরের আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে একটি প্রস্তর পাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার গায়ে হাতির দাঁত বসাইয়া নানা-বিধ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি ইটও পাওয়া গিয়াছে।

SKETCH OF THE DESIGN ON THE VASE

প্রস্তর পাত্রের গায়ে আঁকা ছবির নক্সা।

প্রস্তরপাত্রের গায়ে তেরটি নরমূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। বোধ হয় ইহা কোন বিজয়ী রাজার শোভাযাত্রা। মধ্যে দু'জন সপ্ততন্ত্রী ও পঞ্চতন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে মুকুটধারী রাজা, তাঁহার পশ্চাতে একজন বালক ও একজন স্তাবক। নগরবাসী সকলে পল্লবনির্ম্মাল্য হস্তে ছুটিয়া আসিতেছে। কাহারো হাতে নির্ম্মাল্য আছে, কেহ বা রাজার উদ্দেশে বর্ষণ করিয়াছে কোনটা শূন্যে আছে, কোন কোনটা নীচে মাটিতে পড়িয়াছে।

এই সকল নরমূর্ত্তির নাসিকা খগরাজকে বিষম লজ্জা দিয়া লম্বা করিয়া অঙ্কিত। সকলে দিব্য ক্ষৌর পরিস্কৃত, মস্তকের কেশ দীর্ঘ বেণীবদ্ধ। সকলের মাথায় টুপি, দশ ব্যক্তির টুপিতে একটা করিয়া ফিতার মত জড়ান, রাজার টুপিতে তিনটি ছটা লাগান।

এই পাত্র প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস বহন করিতেছে। ইহার বয়স অধ্যাপকের আন্দাজে ৪৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ যে সকল ইট পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রথম মেসোপোটেমিয়াতে ১০০০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। মেসোপোটেমিয়া সমতল জমি, সেখানে পাথর নাই। সেখানে প্রথমে গৃহ নলখাস প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্বারা নির্ম্মিত হইত। পরে গৃহ একটু মজবুত করিবার ইচ্ছায় কাঁচা মাটির দেয়ালের প্রচলন হইয়া থাকিবে। পরে অভিজ্ঞতায় ইহা দেখা গিয়াছিল যে, মাটি কোন আকারে গড়িয়া রৌদ্রে শুখাইলে অধিক শক্ত হয়। এইরূপে প্রথম ইটের সূত্রপাত।

বিস্মিয়া নামক স্থানে গভীর ভূ-প্রোথিত ঐরূপ ইটের দেয়াল বহু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ রৌদ্রপক্ক ইটে শুধু যে সাধারণ লোকের গৃহ নির্ম্মিত তাহা নহে, মন্দির ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতিও নির্ম্মিত হইত।

৪৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বে হয় ত' কোন অর্দ্ধনগ্ন ব্যাবিলনীয় উনানের মধ্যে নরম কাদা পুড়িয়া শক্ত হইতে দেখিয়া ইটের উদ্ভাবন করিয়াছিল। প্রথম নির্ম্মিত ইট সুগঠিত হয় নাই, তাহার তলা চ্যাপ্টা, উপর গোল ঢালু। এই সকল ইট ছোট ছোট ও পাতলা। কালক্রমে উহার আকার বড় এবং আয়তক্ষেত্রবৎ হইয়াছিল।

এখন যেমন ইটের উপর ব্যবসায়ীর নাম মুদ্রিত করা হয়, ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ব্যাবিলনীয় আপনার অঙ্গুষ্ঠের বা লাঠির ছাপ নরম কাদায় অঙ্কিত করিয়া ইট চিহ্নিত করিত। যখন ইটের আকার বর্দ্ধিত হইল, তখন লম্বালম্বি একটা রেখা কাটিয়া দেওয়া হইত; পরবর্ত্তী বংশীয়েরা সেই রেখা কর্ণ করিয়া টানিত, তৎপরবর্ত্তীকালে উহা দুইটি কর্ণ করিয়া চিহ্নিত হইত। চতুর্থ বংশশাখা দুইটি লম্বালম্বি সমান্তরাল রেখা চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার আরম্ভ করে। পঞ্চমসম্প্রদায় সমান্তরাল রেখা কর্ণক্রমে টানিতে থাকে; এবং এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে ৩, ৪, ৫ লাইন পর্য্যন্ত চিহ্ন দেখা যায়। তখন হয়ত সেই বংশের লোপ হওয়ায় আর রেখার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে নাই।

৩৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সেমাইটগণ ব্যাবিলনীয়া ও সারগন আক্রমণ করে। তাৎকালিক রাজা ইট চৌকা করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তদাকৃতি ইট আজো ঐ প্রদেশে প্রচলিত দেখা যায়। তিনি ইটের উপর রেখাচিহ্নের পরিবর্ত্তে আপনার নাম ও উপাধি খোদিত করাইয়া ইট প্রস্তুত করাইতেন। তাহার পুত্র নরম সিং সারগনের ইট অত্যন্ত বড় মনে করিয়া কিঞ্চিৎ ছোট করিবার আদেশ করেন। সেই ইটেই ব্যাবিলনে নেবুক্যাডনেজারের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত সেই ইট প্রচলিত ছিল।

ইটের উপর লেখা ৩৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে আরম্ভ দেখা যায়। সব ইটেই নাম লেখা হইত না। কাহাতেও লেখা খোদা হইত, কাহাতেও ছাপ মারা হইত। নরম সিঙের ইটে লিখিত দেখা যায়—'নরম সিং, ইস্তারের মন্দির-নির্ম্মাতা'। পরবর্ত্তী নৃপতিগণের ইষ্টকলিপি দীর্ঘ এবং প্রায় সবই ইটের লিখিত হইত। ২৭৫০ খৃষ্টপূর্ব্বের ইটের ২০টার মধ্যে ১টাতে ৯ লাইন করিয়া লিপি পাওয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ রাজা নেবুক্যাডনেজারের সময়ের ইটের লিপি 'নেবুক্যাডনেজার, ব্যাবিলনের রাজা, ইসাগিল ও ও এজিদা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাবিলনের রাজা ন্যাবো-পোলাসারের প্রথমজাত পুত্র'।

২৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মিস্ত্রীরা বুঝিয়াছিল যে ঠিক ঠাস করিয়া দেয়াল গাঁথিতে অনেক সময় ইট ভাঙিয়া বসাইতে হয়। তখন আধলা ইটও তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। সেই আধলা ইটের আকার আমাদের দেশের অধুনা প্রচলিত ইটের মত। সভ্যতার পূর্ণতার সঙ্গে ব্যাবিলনীয়গণ দেয়ালের কোণ, গোল থাম ও ইঁদারা এবং কারুকার্য্যের জন্য গোল, গোলার্দ্ধ, তেকোনা, তেরছা প্রভৃতি নানা আকারের ইট গড়িতে আরম্ভ করে। কোন ইট বা চৌকা, তার এক পিঠ কুব্জ, অপর পিঠ মুব্জ, এবং কোনটার বা একটা কোণ হইতে একটা চৌকা অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া।

৪৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সম-মুব্জ (planoconvex) ইট ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। সেই ইট বসাইতে আলকাতরা জাতীয় বিটুমেন মসলারূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা য়ুফ্রেতিস নদীর উষ্ণ প্রস্রবণে কাদার সঙ্গে মিশ্রিত পাওয়া যাইত। নেবুক্যাড্‌নেজারের পূর্ব্বে চূণের ব্যবহার আরম্ভ হয়। চূণ আরব-অধিত্যকা হইতে সংগৃহীত হইত। তৎপরে চূণই প্রধান মসলা হইয়া দাঁড়ায়।

এই সকল ইটের গঠন পারিপাট্য, কাঠিন্য, স্থায়িত্ব, সুদৃশ্যতা কখন কোন কালে পরাজিত হয় নাই। বিসমীয়াতে ৪৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বের যে সব ইট পাওয়া গিয়াছে, তাহা যেন আজিকার টাটকা গড়া ইট বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী কালে যখন ইট পালিশ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বহু জীবজন্তুর মূর্ত্তি রং-বেরঙে রঞ্জিত করিয়া ইটের গায়ে উঁচু করিয়া (in relief) গড়িয়া তোলা হইত। সেই সকল চিত্র এত সুন্দর ও সুগঠিত যেন নিপুণ ভাস্কর বহু প্রযত্নে এক একটিকে খুদিয়া বাহির করিয়াছে।

এই আবিষ্কার স্থাপত্যপুরাবিদের যেমন আদরণীয়, সাধারণেরও তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই। এবং ইহা প্রতীচ্যের উপর প্রাচ্যের আর একটি নূতন বিজয় ঘোষণা।

দ্রাক্ষাসব।

দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে 'রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে' গুচ্ছে গুচ্ছে পুঞ্জে পুঞ্জে থরে থরে যবে ফল ধরে, তখন অঞ্চল ভরিয়া সেই বসন্তের নিটোল সুন্দর ফলগুলি উপভোগ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। যে 'makes glad the heart of man,' সেই দ্রাক্ষা কাহার না প্রিয়, কে না তাহার সেই নিটোল সুন্দর রসভরা টুলটুলে রূপটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া উপভোগ করিতে চায়? চায় সকলেই, কিন্তু নিন্দনীয় হইয়াছে শুধু মাতাল বেচারা।

এমন কোমল অভিমানী ফলগুলি, যাহারা ওষ্ঠের কোমল চাপে ফাটিয়া টুটিয়া যায়, তাহাদের প্রাণের মধ্যে এমন সর্ব্বনাশী নেশা আসে কোথা হইতে! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে নেশা বুঝি অনিবার্য্য! সত্য শিব সুন্দরের যে চরম মঙ্গলময় সৌন্দর্য্য তাই কি নেশা-ছাড়া?

দ্রাক্ষার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাসে যে কবিত্ব সঞ্চিত আছে তাহা চিন্তা করিলেই নেশা হয়, উপভোগ করিলে যে মাতাল হইব, পাগল হইব তার আর আশ্চর্য্য কি! ভাবিয়া দেখ 'দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল'; সুন্দরী রমণীগণ দলে দলে বসন্তবাহার রাগিণীতে গাহিয়া হাসিয়া দুলিয়া নাচিয়া 'লুটে নিল ভরিয়া অঞ্চল' বসন্তের 'জীবনের সকল সম্বল'; তার পর শোণিতরাগ-অরুণিত চরণাঘাতে অভিমানী ফলগুলি টুটিয়া ফাটিয়া মধুর রসধারা বহিয়া যায়; তার পর সেই রস গাঁজিয়া ফাঁপিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া মাদক হইয়া উঠে। যেখানে রস সেখানে উচ্ছ্বাস, যেখানে রসোচ্ছ্বাস সেখানে মাদকতা!

দ্রাক্ষা রস গাঁজিয়া পচিয়া মাদক সুরা হইয়া উঠে। এক প্রকার জীবাণুর সংস্রবে রস পচিয়া গাঁজিয়া উঠে। এই জীবাণু প্রবেশ রোধ করিলে মধুর দ্রাক্ষারসে মাদকতা জন্মিতে পারে না; মধুর দ্রাক্ষারস সকলের স্বাস্থ্যপ্রদ স্বাদু

দীপান্বিতা।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্র হইতে।

পেয় হইতে পারে। স্বনামধন্য মনস্বী পাস্তর বলেন দ্রাক্ষারসে জীবকণার প্রবেশ রোধ করা যাইতে পারে। সম্যশোধিত দ্রাক্ষারসে তাপ ও শৈত্য প্রয়োগ করিলে জীবকণা আর প্রবেশ করিয়া পচাইয়া গাঁজাইয়া দ্রাক্ষারসে মাদকতা উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। এই উপায়ে জীবকণাশোধিত করাকে 'পাস্তরিত' করা বলে।

ফরাশী দেশের মা-ডি-লা-ভিল নামক স্থানে এই উপায়ে এক ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে চারি হাজার মণ মাদকতাহীন দ্রাক্ষাসব তৈয়ারি হইতেছে। তাপ শৈত্যে জীবকণা মরিয়া পাত্রের তলায় জমে, তার পর ছাঁকিয়া লইলে দ্রাক্ষাসব জীবকণাবিরহিত বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রাক্ষাসবও জীবকণার আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না। এজন্য আসবরক্ষার পাত্রমুখ উদ্ভিজ্জ মোম দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়; বায়ুপ্রবেশপথে জীবকণাবিরহিত বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপে কিছু দিন রাখিয়া, এই আসব পুনরায় পাস্তরিত করিয়া লইতে হয়। তাপ প্রদান করার পরেও যদি দুই একটা জীবাণু প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে তাহা ঠাণ্ডা লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শৈত্য দেওয়ার পর শোধিত বোতলে দ্রাক্ষাসব ভরিতে হয়।

দ্রাক্ষারস গাঁজিয়া উঠিলে রসের মিষ্টতা ও স্বাস্থ্যপ্রদ নিরাময়তা গুণ নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তরিত দ্রাক্ষাসবে এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকায় মদ্য অপেক্ষা সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দ্রাক্ষাসব ঔজ্জ্বল্যে গরীয়ান্, স্বাদে বরীয়ান্, স্বাস্থ্যপ্রদ নিরাময়তা গুণে মহীয়ান্!

যে বিষম বিষের মহাপ্রলোভনে পড়িয়া নরকুল ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহাকে দূর করিয়া এই নির্দ্দোষ পানীয় আপনার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। লোকে যে দ্রাক্ষারসের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য কবিত্ব স্বাস্থ্যের জন্য তাহার আদর করে এমন ত' মনে হয় না; তাহার নেশাটুকুর জন্যেই বুঝি তার আদর। কিন্তু যে নেশা রসাতলের দিকে টানিতে থাকে তাহা যতই মনোমদ হউক, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সুন্দরকে তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য উপাসনা করায় দোষ নাই, ইন্দ্রিয়ের লালসা বাড়াইয়া তুলিলে নরকের পথই শুধু সহজ সোজা করিয়া ফেলা হয়। জগতের একটি শ্রেষ্ঠ স্বাদু রস পচিয়া ফাঁপিয়া গাঁজিয়া উঠিয়া মিষ্টতা হারাইত, লোককে কদর্য্য পশুতুল্য বোধশূন্য সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিত। পাস্তর পণ্ডিতের কল্যাণে নরসমাজে পরম কল্যাণ আবির্ভূত হইয়াছে—দ্রাক্ষারসের মিষ্টত্ব (grape sugar) স্বাস্থ্যদান করিবে, আর তাহা কীটাণুর খাদ্য হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে না। দ্রাক্ষাসবের অঙ্গার ও উদ্‌জান মানবশরীরের তাপ ও শক্তি উপচিত করিয়া অতুল্য স্বাস্থ্য, অনিন্দ্য কান্তি দান করিবে। কবির ভাষায় দ্রাক্ষাসবের স্তুতিগান করা যাইতে পারে "The cup that cheers but doth not inebriate."

শ্রীমঞ্জুপ্রিয় মালাকর।

একটী প্রশ্ন।

আমাদের প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকেরা কি Solar Spectrumএর কথা অবগত ছিলেন?

প্রাচীন শাব্দিকদের গ্রন্থাবলীতে সূর্য্যপর্য্যায়ে 'সপ্তাশ্ব' সূর্য্যের এই নামান্তর পাওয়া যায়। ('ভাস্ব বিবস্বৎ সপ্তাশ্ব' হরিদশ্বোষ্ণরশ্ময়ঃ ইত্যমরঃ)। পৌরাণিক কল্পনার অলঙ্কার দূর করিয়া ইহার সরল অর্থ ধরিলে বোধ হয় যে 'সপ্তাশ্ব' অর্থে 'সপ্তরশ্মি' নচেৎ সূর্য্যের আবার অশ্ব কি? সূর্য্যের একচক্র রথ ও 'সপ্তাশ্ব' সূর্য্যমণ্ডল ও সূর্য্যকিরণ বোধক বলিয়া সহজে বোধ হয়। বায়ুর 'পৃশদশ্ব' নামও আমাদের এ কথা সমর্থন করিবে। এরূপ অনুমান করিবার আরও সঙ্গত কারণ আছে। উক্ত সূর্য্যপর্য্যায়ে সূর্য্যের আর একটী নাম 'হরিদশ্ব'। 'হরিৎ' শব্দের তিনটী অর্থ ধরিয়া তিনটী ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; প্রথম অর্থ,—হরিৎ অর্থাৎ সবুজবর্ণ (পলাশো হরিতোহরিৎ' ইত্যমরঃ; দ্বিতীয় অর্থ,—দিক্। ('দিশশ্চ হরিতশ্চতাঃ' ইত্যমরঃ।) তৃতীয় অর্থ,—অশ্ব। এ অর্থ যদি অমরে নাই কিন্তু অন্যান্য বিখ্যাত অভিধানে আছে। ('হরিৎ ককুভি বনে চ তৃণবাজি বিশেষয়োঃ' ইতি বিশ্বঃ)। অপিচ, হরি ও হরিৎ তুল্যার্থবোধক। সকল অর্থে নয় কতকগুলি অর্থের সাদৃশ্য আছে। 'হরি' শব্দের অর্থ সবুজবর্ণ ও অশ্ব। ('হরি র্না কপিলে ত্রিষু' ইত্যমরঃ) ও হরি শব্দের অর্থ 'কিরণ' ('যমোপেন্দ্র মরীচিষু' ইতি বিশ্বঃ) ('বিষ্ণুসিংহাংশু বাজিষু' ইত্যমরঃ)। সুতরাং হরিৎ শব্দের অর্থ কিরণ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় হয় না। 'হরিৎ' অর্থাৎ কিরণ যাহার অশ্ব সুতরাং 'সপ্তাশ্ব' অর্থাৎ 'সপ্তরশ্মি' কিম্বা হরিৎবর্ণ অশ্ব বা রশ্মি বলিলেও Spectrumএর বর্ণান্তরব্যঞ্জক হয়। অমরকোষের নানার্থবর্গে 'হরিৎ' পর্য্যায়ের বিভিন্নার্থের অনুবাদে ডাঃ কোলব্রুক তৎসম্পাদিত অমরের উৎকৃষ্ট সংস্করণে 'হরিৎ' শব্দের অনুবাদে 'Green, Yellow, Tawny' করিয়াছেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত দুটী বর্ণই Spectrumএর বর্ণদ্বয়। অপিচ, 'হরিৎ' শব্দের 'দিক্' এ অর্থে উক্ত পণ্ডিতবর উক্ত গ্রন্থে 'space, region or quarter' এই অনুবাদ করিয়াছেন। সূর্য্যরশ্মি যে একই সময়ে এই বিশাল নভোমণ্ডলে প্রসারিত হইয়া পড়ে (যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা Diffusion of light বলেন) ও তাহার কারণই যে Space, সূর্য্যরশ্মি নভোমণ্ডলের বিভিন্ন বায়ুস্তরের মধ্যে আসিয়া আকাশকে নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত করে ইত্যাদি অনেক প্রকার suggestion এ শব্দ হইতে পাওয়া

যায়। এখন আমাদের বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিক আচার্য্য মহাশয়েরা এ:সম্বন্ধে "প্রবাসী" পত্রে সন্দেহ নিরসন করিলে বাধিত হইব।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা শব্দ শাস্ত্র ও পুরাণাদির সাহায্য লইয়া এই 'সপ্তাশ্ব' শব্দের অর্থ করিয়াছি। অজ্ঞতা বশতঃ এর আর এক প্রধান অংশের আলোচনা বাকী রহিল। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার অর্থ কি করে? হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন স্পষ্ট কি অস্পষ্ট বর্ণনা আছে যাহাতে হিন্দুদের Solar spectrum এর ধারণা এরূপ যুক্তিযুক্ত অনুমান করা যায়। সে সম্বন্ধেও যদি আমাদের বঙ্গীয় জ্যোতির্বিদ মহাশয়গণ আলোচনা করেন তাহা হইলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

প্রাচীন শব্দ শাস্ত্রাদি ও পুরাণেতিহাসে অনেক সংজ্ঞা ও অনেক কাহিনী আছে যাহার কল্পনার আবরণ দূরে রাখিয়া ধীর ভাবে সবিশেষ আলোচনা করিলে অনেক রকম বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপিত হইতে পারে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সূচনা দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে এরূপ কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে যাইতেছি। সে ক্ষমতা আমার আদৌ নাই। তবে এ বিষয়ে আমি সুপণ্ডিত অভিজ্ঞ মহাশয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে যে প্রথা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—তাঁহার সে বিষয়ে সাফল্য বা নিষ্ফলতার বিচার ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হস্তে কিন্তু সেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথা আর কোনও বঙ্গীয় লেখকের গ্রন্থ অলঙ্কৃত করিল না ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। এরূপ আলোচনার বিষয় ভূরি ভূরি আছে। এ প্রবন্ধে কতকগুলি বিষয়ের নামকরণ করিতেছি। বঙ্কিম উক্ত কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থেই দেখাইয়াছেন যে বেদের অগ্নি ও অরণি কাষ্ঠ পুরাণেতিহাসে কিরূপ পুরূরবা উর্ব্বশীর সুন্দর কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। গত চৈত্র মাসের প্রবন্ধে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই বিষয়ে লেখনীচালনা করিয়াছেন। আশা করিয়াছিলাম তিনি এ উপাখ্যানের ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই।

এইরূপ আলোচনায় তাঁহাদের মত কৃতী লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বলরামের 'অনন্ত' 'সঙ্কর্ষণ' প্রভৃতি নাম ও উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "নবজীবন" পত্রিকায় একজন সুলেখক "সঙ্কর্ষণাগ্নি - অনন্ত—বলরাম" ইতি শীর্ষক একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখেন। মধ্যে সাহিত্য পরিষদের সভ্য কোনো কবিরাজ মহাশয় অভিধান ও বৈদ্যকাদি শাস্ত্র হইতে হিন্দু উদ্ভিদবিদ্যার সম্বন্ধে একটী মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে আর কোনো কথা বঙ্গীয় পাঠক সাধারণে অবগত হন নাই। কিন্তু এরূপ আলোচনার সময় আসিয়াছে একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। এ অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ সেরূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণের সাহায্যার্থ কতকগুলি আলোচ্য বিষয়ের নামোল্লেখ করা গেল। একজনেরও দৃষ্টি যদি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

মেঘ পর্য্যায়ে—'মেঘের' নামান্তর, যথা, বলাহক, তড়িত্বান, ধূমযোনি, জীমূত। বলাহক—বারীণাং বাহক এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে মেঘের উৎপত্তি অনুসন্ধেয়।

বিদ্যুৎ পর্য্যায়ে—'বিদ্যুৎ' শব্দের নামান্তর যথা, শংপা, শতহ্রদা, হ্রাদিনী, ঐরাবতী—এ সকল শব্দগুলিই বৈজ্ঞানিক সত্য মূলক। ঐরাবত অর্থাৎ ইরাবান বা সমুদ্র হইতে উদ্ভূত—এ অর্থে evaporationএর কথা সূচিত হয়। ইন্দ্রের দিকহস্তী যে ঐরাবত ও ঐরাবতাদি চতুর্দ্দিগ্‌গজ যে পৃথিবীতে বর্ষণ করে, এ পৌরাণিক কল্পনার মূল কি সে সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

চন্দ্র পর্য্যায়ে—চন্দ্রের নামান্তর যথা, ওষধীশ, অব্জ, জৈবাতৃক, নক্ষত্রেশ, দ্বিজরাজ, সোম শশধর। "ওষধীশ" সম্বন্ধে যতদূর স্মরণ হয়, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্যপত্রে আলোচনা করিয়াছিলেন। 'অব্জ'—অর্থাৎ জল হইতে উদ্ভূত, ইহা চন্দ্রের সৃষ্টির আকার বোধক। 'সোম' ও ওষধীশের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ আছে কি না? চন্দ্রকে নক্ষত্রেশ বা তারাপতি কেন বলা হয়?

সূর্য্য পর্য্যায়ে—সূর্য্যের নামান্তর যথা, চিত্রভানু, বিরোচন, মিহির, দ্বাদশাত্মা, বিকর্ত্তন, সবিতা, অর্ক। দ্বাদশাত্মা—প্রলয়কালীন দ্বাদশ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে এই শব্দের যোগ আছে কি না? সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকদের নাম ('মাঠরঃপিঙ্গলো দণ্ডশ্চণ্ডাংশো পারিপার্শ্বিকাঃ' ইত্যমরঃ।) গুলিও আলোচ্য। অরুণ সূর্য্যের সারথি ঘটিত পৌরাণিক কাহিনী উৎপত্তির কারণ ও সূর্য্যের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন বৈদিক নামের (যথা, পুষা, মিত্র, ভগ ইত্যাদি) কারণ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধেয়।

বায়ু পর্য্যায়ে—শ্বসন, স্পর্শন, মাতরিশ্বা, পৃশদশ্ব, গন্ধবহ, আশুগ, সদাগতি। অমর যতগুলি পর্য্যায় দিয়াছেন সকল গুলিই বাতাসের একটী না একটী গুণবোধক। 'মাতরিশ্বা' অর্থাৎ নভোমণ্ডলে যাহা বৃদ্ধি পায় এই ব্যুৎপত্তিতে 'Expansion of Gases' সূচিত হয় কি না বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা এ কথার মীমাংসা করিবেন। 'পৃশদশ্ব' অর্থাৎ জলকণা অশ্ব অর্থাৎ বাহক যাহার; ইহাতে বাহ্য প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যে জল-শোষণ (evaporation) কার্য্য হইতেছে এ শব্দ তাহারই বোধক। বৈজ্ঞানিকেরাও এ কথা বলেন—যেখানে উক্ত শোষণক্রিয়া দ্রুত হইতে থাকে সেখানে বায়ুস্রোতও প্রবল হয় এ অর্থে 'পৃশদশ্ব' শব্দের বিশেষ সার্থকতা আছে।

অগ্নি পর্য্যায়ে—কৃষ্ণবর্ত্মা, দহন ও জ্বলন, বৃহদ্ভানু, কৃশানু বা কৃষাণুঃ, রোহিতাশ্ব, উষর্বুধ, তনূনপাৎ, শুষ্ম, আশ্রয়াশো, সপ্তার্চ্চি, হিরণ্যরেতা, কৃপীটযোনি, বোহিতাশ্ব, অপাম্পিত্তং, চিত্রভানু। এ সকল গুলিই অগ্নির বিভিন্ন গুণবোধক। বৈজ্ঞানিক মহাশয়েরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করিলে ইহা হইতে অনেক তথ্য বাহির করিতে পারেন। অগ্নি ও সূর্য্য উভয়েরই নাম চিত্রভানু। শাব্দিকেরা বলেন (অমরকোষের প্রধান টীকাকার ক্ষীর স্বামী তাহার মধ্যে অন্যতম) যে সপ্ত জিহ্বা রূপ অর্চ্চিঃ হওয়াতে যাহার কিরণ বিচিত্র; এ জন্য অগ্নির নাম চিত্রভানুঃ। কিন্তু 'অগ্নি' সম্বন্ধে 'সপ্তার্চ্চিঃ' বা 'চিত্রভানু' কোন বিশেষ অর্থ নাই তবে সূর্য্য সম্বন্ধে 'সপ্তার্চ্চিঃ' বা 'সপ্তাশ্ব' বা 'চিত্রভানু' পর্য্যায় সার্থক। এ কথায় আমাদের Spectrumএর কথাই সমর্থিত হয়। কৃষ্ণবর্ত্মা (অঙ্গারের উৎপত্তিসূচক।) বৃহদ্ভানু সূর্য্যমণ্ডলের উত্তাপের কারণ বোধক। কৃশানু—অগ্নিতে জড়ের পরমাণুগুলি কতকাংশে রূপান্তর পায় মাত্র, উহা রাসায়নিকের আলোচ্য। রোহিতাশ্ব—'রোহিত' অর্থাৎ রক্তবর্ণ রশ্মি যাহার; এ অর্থে আমাদের 'সপ্তাশ্বে'র ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে। 'অপ্ পিত্তং' আশ্রয়াশো, অর্থাৎ যিনি নিজের আশ্রয় নষ্ট করেন, 'কৃপীটযোনি' অর্থাৎ কাষ্ঠাদি উৎপত্তির কারণ যাহার, 'তনূনপাৎ' অর্থাৎ শরীর নাশক 'শুষ্ম' অর্থাৎ শোষক এ সকলগুলিই অগ্নির বিভিন্ন গুণবোধক। 'তনূনপাৎ' এই অর্থে অগ্নির অর্থাৎ অগ্নির উৎপত্তির কারণ যে অম্লজান বাষ্প তাহার দাহিকাশক্তির নির্দ্দেশ আছে।

এরূপ ইন্দ্র, বরুণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বহু শব্দ বিশেষভাবে আলোচিত হইলে অনেক তথ্য বাহির হইতে পারে।

শব্দের অর্থ হইতে পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা মনে পড়িয়া যায়। বিদ্বন্মণ্ডলীর আলোচনার্থ নিম্নে কতকগুলির উল্লেখ করা গেল।

(১) তারা ও চন্দ্রের কাহিনী।

(২) সঙ্কর্ষণাগ্নি।

(৩) ইন্দ্র ও অহল্যা।

(৪) পুরুরবা ও উর্ব্বশী।

(৫) মন্বন্তর। বিভিন্ন মনু (স্বারোচিষ, স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি)র নামের তাৎপর্য্য। দৈব, পৈত্র ও ব্রাহ্মযুগের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা অর্থাৎ ভূতত্ত্ব (Geology) এ কথা সমর্থন করে কিনা।

(৬) চারিযুগ। প্রবন্ধান্তরে ইহা আলোচ্য। বলা বাহুল্য উপরি উক্ত এক একটী বিষয়ে স্বতন্ত্র একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শৈলসঙ্গীত—শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, বি এল প্রণীত। ১২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক। সমালোচন ব্রত গ্রহণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের বহু আবর্জ্জনা ঘাঁটিতে ঘাটিতে যখন একটি রত্ন মিলিয়া যায়, তখন সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ হয়। শশাঙ্কমোহনের শৈলসঙ্গীত এতকাল পড়ি নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ইহার প্রতিটি কবিতা নিজস্ব ভাবের প্রবাহবেগ, ছন্দের তরলতা ও শব্দবিন্যাসের সরস মাধুর্যে পূর্ণ। কবি চট্টগ্রামনিবাসী; তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হইয়াছিল O Caledonia, meet nurse for a poetic child!" আমরা সকল সুন্দর কবিতার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি 'মধু' ও 'স্বাধীনতা' শীর্ষক কবিতা দুইটি। কবি স্বাধীনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"অসুর নাচিছে আজ ধরামাঝে তাণ্ডবে অধীর,
পায়ে দলি তোর মূর্ত্তি, ভাঙ্গি তোর পবিত্র মন্দির।
কাতর এ ধরাভূমি, দিগঙ্গনা করে হাহাকার!
ভাঙ্গেনি কি দেব নিদ্রা? আঁখি খুলি দেখ একবার!

* * *

স্বার্থে অন্ধ সকলেই কে তুলিবে সহায় নিশান?
ঘুমাইছে কোষবদ্ধ কোটী কোটী শাণিত কৃপাণ!
এই ত' সময় মাগো! পূর্ব্ব উক্তি কর না স্মরণ
যখন যখন হবে সভ্যতার স্খলিত চরণ,
তখনি নামিবে তুমি—এইরূপে কত কত বার
পতিত এ জগতেরে হে জননি, করেছ উদ্ধার!
নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তি, দক্ষ করে স্নেহ শান্তি বর;
লোহিত রসনা লোভী, বাম করে কৃপাণ খর্পর।

* * *

মানবের হৃদয়ের গূঢ়তম, শ্রেষ্ঠতম গীতা!
অয়ি বরাভয়করে? অয়ি কালি? অয়ি স্বাধীনতা"?

ভাব বা সৃষ্টির প্রথম সূর্য্যোদয় কবিতাটি পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি। কবিতাটি বিষয়ের উপযুক্ত হয় নাই। সর্ব্বশেষে বক্তব্য, এরূপ একখানি পুস্তকের মুদ্রণও মনোহর ও নির্ভুল হওয়া আবশ্যক। পুস্তকের শেষে দীর্ঘ শুদ্ধিপত্র বিশেষ লজ্জার বিষয়।

রেণু—শ্রীহিরণ্ময়ী সেনগুপ্তা প্রণীত। ১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য বারো আনা। পুস্তক খানির ছাপা কাগজ বেশ পরিষ্কার ও সুদৃশ্য, কিন্তু বাংলা পুস্তকের রীতি সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র ছাপাখানার কলঙ্কধ্বজা তুলিয়া পুস্তকের মোহড়া আগলিয়া রহিয়াছে। এখানি কবিতা পুস্তক। বিধবার করুণ ব্যাকুল বিলাপেই পুস্তক খানির উদ্ভব। কবিতাগুলি সরল সরস ভাষায় সোজা-সুজি ভাবে লিখিত। তবে ইহার মধ্যে কোন কাব্যের বা ভাবের বিশেষত্ব নাই। একই ছন্দে বহু কবিতা পর পর পড়িতেও শ্রবণ মন বৈচিত্র্যের অভাবে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

একাদশ বৎসরের কুন্তলীন পুরস্কার—কুন্তলীন পুরস্কারের প্রতিযোগী রচনায় বঙ্গভাষা পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বহু নূতন লেখক লেখিকার সৃষ্টি হইতেছে। এজন্য বঙ্গসাহিত্য কুন্তলীনের নিকট ঋণী। সমালোচ্য পুস্তক খানিতে পনরটি গল্প আছে। ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তক খানির ছাপা, কাগজ, মলাট, আকার প্রভৃতি বাহ্যদৃশ্য চমৎকার, সুন্দর। কিন্তু এত ছাপার ভুল কুন্তলীন প্রেসের লজ্জার বিষয়। গল্পসংগ্রহকার শ্রীযুক্ত এইচ, বসু ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আশানুরূপ উৎকৃষ্ট গল্প এখনও আমরা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" আমাদের ধারণা ঠিক তাহাই নহে। বসু মহাশয়ের আদর্শ যে খুব উচ্চ তাহা এই পুস্তকখানি পাঠে উপলব্ধ হয়। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, 'যে সকল গল্পলেখক পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া থাকেন, তাহারা একটু চেষ্টা করিলেই কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য ভাল গল্প লিখিয়া পাঠাইতে পারেন।" কিন্তু আমাদের মনে হয় ফরমাসী লেখা, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচনা, কখনো ভালো হইতে পারে না। তথাপিও এই পুস্তকের প্রায় প্রত্যেক গল্পই সুলিখিত। ভাষা ও ভাব-মাধুর্য্যে পরিপাটি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম বসু মহাশয় বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "গল্প খুব সুন্দর, স্বাভাবিক ও মৌলিক হইলে কুন্তলীন ও দেলখোসের অবতারণা ভিন্নও তাহা পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হইবে।" পুস্তক খানির কুত্রাপি ইহার মূল্যের পরিচয় পাইলাম না। ইহা বিনামূল্যে দেয় হইলেও তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—শ্রীবরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল প্রণীত। ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ আনা। এই পুস্তকখানি প্রবাসীরই একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ। এই পুস্তক খানিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা অবনত অবস্থা—যাহাকে বিবেকানন্দ 'ছুতমার্গ' বলিয়াছেন, তাহাই, অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণকে উচ্চ করিবার জন্য ব্রাহ্মণেতর জাতিকে নীচু করিবার অনেক পরামর্শ দিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই এরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু অন্য জাতি যাঁহারা এখন আত্মসম্মান বুঝিয়া সমাজে আপনাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট, তাঁহারা ইহা মানিয়া চলিবেন কি না সন্দেহ। হিন্দুশাস্ত্র কামধেনু—তাহার দোহাই দিয়া জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, চিরবৈধব্য, প্রভৃতির সমর্থন এবং সমুদ্রযাত্রা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার অপকারিতা সপ্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন না হইলেও এই স্বাধীন চিন্তার দিনে তাহা নির্বিচারে মানিয়া লইতে কয়জন প্রস্তুত হইবে বলিতে পারি না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে শিক্ষাভিমানী তাহা পুস্তকের মলাটে একস্থানে বি এ ও অপর স্থানে বি এল লিখিত দেখিয়া বুঝিয়াছি। কিন্তু তাঁহার মত লোক যে নজির দেখাইয়া সকলকে আপন পথে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন ইহা ঠিক হয় নাই। সকল মানুষই গতানু-গতিক নহে, চিন্তা করিয়া নিজের শুভাশুভ বুঝিবার নিজস্ব ক্ষমতা অনেকের আছে। এই গতানুগতিক স্রোতে পড়িয়া আমাদের এত দূর অধঃপতন হইয়াছে, যে আমরা আবহমান কাল পরাধীনতার চাপে নিষ্পিষ্ট হইতেছি। এখন যদি একটুখানি সজীবতা আসিয়াছে, তখন যাহারা বন্ধনের ও বাধার উপকারিতা ও স্বাধীনতার অপকারিতা ঘোষণা করে তাহারা কৃপাপাত্র, তাহারা দেশবৈরী—ভগবান দেশকে আমাদিগকে তাহাদের শুভকামনা হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীমুদ্রাযান্ত্রিক শর্ম্মা।

দলিত কুসুম।

সিন্ধুকূল হতে দূরে নলিনী নীরবে
চাহিয়া পথের পানে। ম্লান মুখ-কান্তি
দুঃখে অশ্রুহারা তবু হয়নি বালিকা।
হেরিল যখন দূরে আসে জন-স্রোত
মন্দির হইতে, দেখিল সে বিমলের
দুঃখে ভরা ম্লান মুখ, অশ্রুরাশি আর
মানেনাক বাধা চোখে। ছুটিয়া তখন
ধরিয়া দুইটি কর, লুকাইল মুখ
বিমলের হৃদি পরে। ভুলি লজ্জা ভয়
কহিল সে মৃদু কণ্ঠে "বিমল, বিমল,
হোয়োনাক আশাহারা। যদি প্রিয়তম
ভালবাসি চিরদিন মোরা পরস্পরে
কিছুতেই কোন ক্ষতি হবে না মোদের।
যত না দুঃখের ছায়া ঘিরে দিক এই
আমাদের সুখ রাশি, আমরা দুজনে
যদি দুজনার থাকি, কি ক্ষতি তা'হলে
সহস্র দুঃখের ঘায়?" সহসা যখন
দেখিল পিতারে তার, কি মলিন মূর্ত্তি
নাহি সে আশার আলো বৃদ্ধের আননে,
নয়নের দীপ্তি যেন নিভে গেছে হায়।
আপনার পদশব্দ যেন হৃদয়েতে
প্রতিধ্বনি হইতেছে। নলিনী আসিয়া
নীরবে নিঃশ্বাস ফেলি ধরিল গলায়,
বলিল হইতে স্থির। হায় সে হৃদয়ে
জগতের কোন কথা করে না প্রবেশ।
এইরূপে আয়োজন হইল সবার
নির্ব্বাসনে যাইবার।
সহসা তরণী—
খুলিতে হইল আজ্ঞা। জোয়ারের জল
এসেছে সিন্ধুর কূলে, তরণী চঞ্চল।
সেনাপতি আজ্ঞা দিল, সৈনিকের দল
লইয়া চলিল যত নরনারীগণে।
রমণীরে লয়ে যায় পতি রহে তীরে,
কোলশূন্য নারী যায়, কোলের সন্তান
রহিল কূলেতে পড়ি। লয়ে গেল হায়
বিমল ও সুমন্তেরে। নলিনী অভাগী
রহিল কূলেতে চেয়ে পাষাণপ্রতিমা।
নলিনীর পিতা যেন জড়ের সমান।
রবি অস্ত চলে গেল, ম্লান অন্ধকারে
গোধূলি নামিয়া এল। জোয়ারের জল
যেতেছে সরিয়া ধীরে। ফেনোর্ম্মি সকল
পড়িছে সমুদ্র তটে। বালুর উপর
অদূরে পড়িয়া আছে, গ্রামবাসীদের
দ্রব্যজাত, স্তূপাকার, শিবির সমান।
সহসা প্রবল এক তরঙ্গ আঘাতে
ভাসিয়া যেতেছে তাহা। অন্য বাকি যত
গ্রামবাসী সেই স্থানে রহিল পড়িয়া।
সারাক্ষণ শুনে সব তরঙ্গগর্জ্জন।
প্রস্তরে পাইয়া বাধা দুরন্ত তরঙ্গ
বেলা ভূমি লয়ে সাথে যেতেছে ভাসিয়া।
আসিল রজনী পরি তিমির বসন,
গ্রাম্য পশুপাল গৃহে যেতেছে ফিরিয়া।
মধুর বহিতেছিল রজনী সমীর।
গাভীগণ চেয়ে আছে পাইবে কখন
আপনার খাদ্য দ্রব্য। কোথায় এখন
দুগ্ধ পাত্র লয়ে হায় রমণীর দল?
নীরবতা আসি যেন ছেয়ে দিল সেই
জনশূন্য পথ ঘাট। মন্দিরেতে আজি
নাহি ঘণ্টারব। বাতায়নে আলোশিখা
জ্বলে না কাঁপিয়া। গৃহচালে আজি আর
ধূমশিখা উঠে নাই, নীরব সকল।
সমুদ্রের কূলে সবে জ্বালাইল আলো
ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড লয়ে। চারিদিকে তার
শুষ্ক ম্লান মুখে বসি আঁধার হৃদয়ে
অভাগা সে গ্রামবাসী। শুনা যায় শুধু
নরনারী-কণ্ঠধ্বনি, শিশুর ক্রন্দন
মাঝে মাঝে সে স্তব্ধতা দেয় ভাঙ্গাইয়া।
গ্রাম্য পুরোহিত যেন পিতা সবাকার,

প্রত্যেকের কাছে গিয়া সান্ত্বনার কথা
কহিছেন, করিছেন আশীর্ব্বাদ সবে।
এইরূপে অগ্রসরি উপনীত তিনি
মলিনা নলিনী যেথা পিতার সহিত।
বীরবল বাক্যশূন্য, নির্জীবের প্রায়
চাহিয়া রয়েছে সেই অগ্নিশিখা পানে।
নলিনী কাতরে কহে সান্ত্বনার কথা,
কখনো আহার দ্রব্য হাতে তুলে লয়ে
আহার করিতে কহে, সকলি বিফল
বাকশূন্য বৃদ্ধ শুধু নীরব নিশ্চল।
কহিলেন পুরোহিত "উঠ বীরবল।"
আর সরিল না কথা সে কম্পিত কণ্ঠে,
হেরি সে বিষাদপূর্ণ বিষণ্ণ আনন,
আদর্শ শোকের যেন চিত্রপট খানি।
স্থাপিয়া আপন হস্ত নলিনীর শিরে
চাহি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিমল তারকা-
ময় গগনমণ্ডলে, ফুল্ল পুষ্প সম
বালিকার তরে, যাচিলেন আশীর্ব্বাদ।
তার পর ধীরে বসি নিকটে তাহার
নীরবে বর্ষিলা অশ্রু দয়ার আধার।
সহসা দক্ষিণ হতে উঠিল জ্বলিয়া
আলো শিখা, শরতের পূর্ণশশী সম,
যেন স্বচ্ছ আকাশের প্রাচীরের গায়
সহস্র কিরণ রাশি পড়িছে ছড়ায়ে।
উচ্চ শৈলে প্রান্তরেতে নদ নদী বুকে।
সেই মত অগ্নি শিখা, ধীরে ধীরে জ্বলি
ক্রমশঃ পড়িল, গ্রাম বাসী গৃহ হতে
বাহিরায় ধূম শিখা। সেই আলো রাশি
আকাশে ফুটেছে যেন, সমুদ্রের বুকে .
ভাসিতেছে। ক্রমে বাড়িতে লাগিল শিখা
ধূ ধূ করি জ্বলে যায় গৃহ গুলি সব।
দুরন্ত পবনে শিখা, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে
ছড়ায়ে পড়েছে যেন শত শত গৃহ
এইরূপে জ্বলিতেছে অনল শিখায়।
এই দৃশ্য দেখে বসি সমুদ্রের কূলে
অভাগা সে গ্রামবাসী বাক্যহারা হয়ে,
সহসা সকলে কহে আকুলিত কণ্ঠে
সমস্বরে "হায় হায় এই গ্রামে আর
দেখিব না আমাদের যতনের গৃহ।"
হেরি আলো শিখা ভাবি হয়েছে প্রভাত
নীরব বিহঙ্গকুল করিছে কূজন।
ভীত পশু পাল সব আকুল কণ্ঠেতে
জানায় প্রাণের ভয়। মুক্ত অশ্বপাল
ত্রস্ত ভাবে ছুটিতেছে দুর্গম কাননে,
ভাঙ্গিয়া প্রাচীর দ্বার, পদতলে দলি
শ্যাম শস্যক্ষেত্র গুলি। কত না যতন
করিয়াছে গ্রামবাসী যাহার কারণ।
সেই দৃশ্যে বিচলিত হয়ে পুরোহিত
চাহিলা তাহার পানে। ব্যাকুলা নলিনী
দেখিছে আতঙ্কে সেই দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সহসা ফিরিয়া চায়, যেথা পিতা তার
বসিয়াছিলেন; সমুদ্রের কূলে হায়
প্রাণ হীন দেহ তাঁর রয়েছে পড়িয়া।
পুরোহিত ধরিলেন উঠাইয়া শির,
দেখিলেন প্রাণহীন। নলিনী বিবশা
কাঁদিছে আকুল দুঃখে, সহসা বালিকা
জ্ঞানশূন্যা মৃত প্রায় পড়িল ধূলায়।
সেই ভাবে অচেতনে মৃত পিতৃবক্ষে
রাখি শির সারানিশি রহিল পড়িয়া।
প্রভাতে মেলিয়া আঁখি দেখে চারিদিক,
শোকপূর্ণ মুখে সবে চারিদিক ঘিরে
রেখেছে সে মৃত দেহ। সকলের আঁখি
অশ্রুপূর্ণ। এখনও দেখা যায় দূরে
অনলের রাঙা শিখা প্রান্তরের পরে,
আকাশ হয়েছে রাঙা সেই আলো দিয়া,
সেই ছায়া মানবের মুখে প্রভাসিত।
শুনিল নলিনী কহে পরিচিত স্বরে
গ্রামবাসী সবে "হেতা এই সিন্ধু কূলে
হউক সমাধি তার। কখনো আমরা
যদি ফিরে আসি হেতা, শেষ ধূলি তার

যতনে রাখিব লয়ে সমাধির স্থানে।”
পুরোহিত করিলেন মন্ত্র উচ্চারণ
সকলে মিলিয়া সেই ক্ষুব্ধ সিন্ধু কূলে
করিল সমাধি শেষ। সিন্ধু যেন শোকে
কাঁদিতেছে। তরঙ্গের মৃদ্ কলরব
যেন তার শোক গীতি। সহসা আবার
আসিল জোয়ার জল। রাজার তরণী
বাকি গ্রামবাসী জনে লইবে এবার।
উঠিল সকলে দুঃখে। সুবাতাস পেয়ে
ধীরে ধীরে চলে তারা, আরোহী তরীর
চাহিয়া রয়েছে সেই গ্রাম পানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

গিয়াছে কত না শ্রান্ত বরষ কাটিয়া,
গ্রামবাসী জন সবে গেছে নির্ব্বাসন।
সে সুন্দর গ্রাম কোথা ? শুধু ধূলি সার,
ধরণীধূলায় শুধু গিয়াছে মিশিয়া।
সেই রাজ আজ্ঞা পেয়ে রাজার তরণী
অনুকূল স্রোত ভরে গিয়াছে চলিয়া,
সেই পল্লী বক্ষ হতে লয়েছে ছিনিয়া
যত গ্রামবাসী জন, রত্ন রাজি তার।
বহু দূরে নদী প্রান্তে কোন(ও) গ্রামে এক
নামিতে হইল আজ্ঞা। হায় অভাগারা
গৃহ হারা, শান্তি হারা সব এক গ্রামে
নামিল না। শীতের জমাট বাঁধা সেই
তুষার কণিকা সম, দেশে দেশে তারা
পড়িল ছড়ায়ে। বন্ধুহীন গৃহহীন,
আশাহীন হয়ে তারা, ফিরে গ্রামে গ্রামে।
তুষার শীতল সেই সাগরের তীরে,
অনাহারে অনশনে। অভাগা সকল
আপনার প্রাণপণে অন্বেষণ করি
চাহিছে আশ্রয়, কেহ চায় গৃহ দ্বার।
কেহবা যেতেছে চলি শৈলারণ্য তলে
নব আশা আলো বুকে, হায়রে সহসা
আশা বাসা ভাঙ্গি তার ধূলি মাত্র সার।
ধরণীর বুকে শুধু লভিছে আশ্রয়
প্রাণহীন দেহগুলি। কেহ বা কেবল
ভগন নিরাশ প্রাণে কাতর হৃদয়ে
চাহিতেছে একমাত্র মরণের কোল,
লভিতে অতুল শান্তি।
সেই সব ইতিহাস
সমাধি প্রস্তর পরে অক্ষয় লেখনে
লেখা আছে চিরদিন অজয় অমর।
সেই সব দীনহীন গৃহছায়া তলে
একটি মলিন মূর্ত্তি কাতর রমণী
ফিরিত কাহার আশে ? সেই মুখে তার
প্রভাসিত হয়ে আছে লেখা যাতনার।
সুন্দরী নবীনা বালা, হায় তবু তার,
বিষাদের অন্ধকারে মলিন আনন।
শক্তিহীন তনুলতা, প্রাণ যেন তার
কোন দিব্যধামে সদা করে বিচরণ।
মনোবাসা হতে তার আশার কলিকা
ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। শ্রান্ত প্রাণ লয়ে
কাহার উদ্দেশে বালা বেড়ায় ভ্রমিয়া।
বৈশাখের রৌদ্র-দীপ্ত প্রভাত গগনে
সহসা ঢাকিয়া দেছে মেঘ অন্ধকার।
তেমনি যৌবনে তার প্রেম রবি হায়
কোথা গেছে, অসম্পূর্ণ করিয়া জীবন।
কখনো সে কোন গ্রামে আশাপথ চেয়ে
রয়েছে দুদিন, অন্তরের ভস্মাবৃত আশা
সহসা জ্বলিয়া উঠে কাহার আশায়।
সহসা সে শ্রান্ত প্রাণে উঠে গো জাগিয়া
সহস্র আবেগ রাশি। কার অন্বেষণে
কার পথচিহ্ন ধরি বেড়ায় ভ্রমিয়া ?
বিমল সে নলিনীর হৃদয়ের আলো,
প্রেমের আকাশে তার একমাত্র রবি।
তবু হয়নাক দেখা মেলে না সন্ধান।
কখনো সে যেতে যেতে পথ প্রান্তে যদি
দেখে কোন নামহীন সমাধি অজানা

বসে থাকে পাশে তার। ভাবে মনে মনে
হয় ত তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার
লভিছে বিশ্রাম সেই সমাধি মাঝার।
হায় সেই দুঃখক্লিষ্ট বিষাদ অন্তরে
চাহিছে বিশ্রাম শান্তি বালা চির তরে।
কখনো বা লোকমুখে কত ভাসা কথা
শুনিতেছে, আশার পুলকে বীণা পুনঃ
বাজিয়া উঠিছে বক্ষে। কখনো সে শুনে
কোনো যাত্রীমুখে তার প্রণয়ীর কথা,
দেখেছে বিমলে সবে সুমন্তের সাথে
অদূরে গ্রামের প্রান্তে। কেহ বলে কভু
বিমল যাত্রীর বেশে গ্রামে গ্রামে ফিরে
দিনেকের তরে তার গতি নহে স্থির।
কেহ বা আশ্বাসি তারে সুমধুর স্বরে
কহিছে আশার বাণী, "কেন বালা তুমি
স্বপনে রয়েছ মগ্ন? আশা ছায়া ধরে
ফিরিছ বিমল আশে, সে কোথা এখন?
এভাবে বিফলে কেন কাটাবে জীবন?
এখানেত কত যুবা তোমার লাগিয়া
হতাশে কাটায় দিন। তাদের প্রণয়ে
কেন না হইবে সুখী তোমার হৃদয়?
এরূপে একেলা তুমি এমন বয়সে
ফিরিতেছ পথে পথে, সে কভু কি হয়?
অকালে দলিতে চাও আপন হৃদয়!"
নলিনী একই কথা করিছে উত্তর
"কখনো না এ হৃদয় (ভালবাসি যারে
তারি শুধু) আর আমি দিব না কাহারে।
যাহার উদ্দেশে পূজা করিছে হৃদয়
সে দেবতা বিনা আমি দিব কার পায়?
প্রেমের আলোক মোর দুর্দ্দিনে বিপদে
দেখাইবে পথ ঘাট ধ্রুবতারা সম।
আমার এ প্রেম কভু হবে না নিষ্ফল।"
বৃদ্ধ পুরোহিত যিনি পিতার সমান
নলিনীর, যাঁর স্নেহে এ ঘোর বিপদে
লভেছে আশ্রয় শান্তি। স্নেহ মুগ্ধ স্বরে
বলিলেন, "যিনি বৎসে দিয়াছেন তোমা
এ অক্ষয় প্রেমসুধা, তাঁহার করুণা
করিবে তোমার শূন্য হৃদয় পূরণ।
প্রেম কভু বৃথা নয় যায় না বৃথায়,
যদি নাই পূর্ণ হয় সংসারের সাধ
যদি প্রেম নাহি লভে প্রেমের আশ্রয়,
ইহার প্রবাহ বহি যাইবে যেথায়
প্রণয়ের উৎস বৎসে আছে বিরাজিত।
সেই উৎস হতে পুনঃ আসিবেক ধারা
তোমার হৃদয় উৎসে, অতি নিরমল
শান্তিবারি, আর সহিষ্ণুতা। তব হৃদি
পূর্ণ হবে, সেই স্নিগ্ধ মধুর পরশে,
ধরার প্রণয়ে যাহে শত আশা জাগে
সহস্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ। লভি সে প্রণয়
হবে শুদ্ধ শান্ত বৎসে তোমার হৃদয়।
ঈশ্বরের প্রেমরাশি পবিত্র নির্ম্মল
তোমার জীবন-পথ করুক উজ্জ্বল।"
সেই আশা বাক্যে শান্ত হইল হৃদয়
নব বলে বলীয়ান হইল আবার।
প্রণয়ীর পথ আশে রহিল চাহিয়া
নলিনী প্রণয় ভরে। আকাশ ধরণী
কহিছে শ্রবণে তার আশ্বাসের বাণী।
সুনীল সমুদ্র হতে আসিছে ভাসিয়া
যেন শত শোকগীতি, কিন্তু সুরে তার
বাজিছে মধুরে সেই আশার ঝঙ্কার
"হয়ো না নিরাশ বালা।"

এইরূপে হায়
নলিনী ও পুরোহিত গ্রাম হতে গ্রামে,
ফিরিছেন প্রতিদিন। হায় সে নলিনী
পিতার সুখের গৃহে, স্নেহ শান্তি মাঝে
কি ভাবে কাটাত দিন। আজ কোন্ ভাবে
পথে পথে ফিরিতেছে, দুখানি চরণ
শত ছিন্ন পথে পথে, কণ্টক আঘাতে।
আলেয়ার আলো সম তাদের নয়নে
শতবার জেগে উঠে মিলনের ছবি।

'তৃষিত' কাতর পান্থ যবে সে শ্রবণে
শুনিছে ঝরণা বারি ঝরে ঝর ঝর
হেরিছে নয়নে শুধু নির্ম্মল সলিল।
অতি শ্রান্ত অবশেষে হয় অগ্রসর
পায় না প্রবেশ পথ। কণ্টকে পল্লবে
পূর্ণ পথ, শুধু তার বাজিছে শ্রবণে
ঝরণার ঝর ঝর ধ্বনি সুমধুর।
হায়রে অভাগা যদি সহসা কখনো
পায় হাতে স্নিগ্ধ বারি। তা'হলে তখন
অসীম পুলকে পূর্ণ হবে না নয়ন?

[ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

চিত্রপরিচয়।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'দীপান্বিতা' চিত্র অতি সুন্দর ও নানা ভাবোদ্দীপক হইয়াছে। অয়ি ভারতের মাতৃদেবীগণ, কবে তোমরা অমাবস্যার অন্ধকারের মত অজ্ঞানতা, ভীরুতা ও স্বার্থান্ধতার অন্ধকারও দূর করিবে?

স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিত, তাঁহার লিখনভঙ্গী ও কার্য্য-প্রণালী অনেকের অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু এখন সে সকলের বিচার করিবার সময় নয়। তাঁহার অকপট দেশপ্রীতি, নিঃস্বার্থ দেশসেবা, গভীর পাণ্ডিত্য, অদম্য সাহস, কথায় ও কার্য্যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সঙ্গতি রক্ষা, দেশের জন্য সন্ন্যাসব্রত ধারণ ও পালন,—এই সকল যথাশক্তি সকলেরই অনুকরণীয়।

পার্লেমেণ্টের সভ্য মিঃ কেয়ার হার্ডি বিলাতে এক মজুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজেও শৈশবে কয়লার খাদে কুলিগিরি করিতেন। তাহার পরেও মজুরী করিয়াছেন। তিনি পার্লেমেণ্টে মজুরদেরই প্রতিনিধি। এখানে আমাদের দেশের রাজা মহারাজারা ত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন, বড়লাটও তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোক এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝুন যে, বিলাতের লোকেরা যে এত শক্তিশালী তাহার কারণ এই যে, সেখানকার নিম্নতম শ্রেণীর প্রজাদের কাছে জ্ঞানের ও শক্তির দ্বার ক্রমশঃ বিস্তৃততর ভাবে উন্মুক্ত হইতেছে। আমাদের দেশেরও চাষা ও মজুরদিগকে আমরা উন্নত করিয়া না তুলিলে আমাদের জাতি শক্তিশালী হইবে না। কোনও বিদেশী সত্যসত্যই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিলে আমরা সাদরে তাঁহার সাহায্য লইতে পারি; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও বিদেশী বা বিদেশীর দল আমাদিগকে বড় করিতে পারিবে না। উন্নতির পথ ঊর্দ্ধাভিমুখ ও কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে আমাদিগকেই ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া স্বশক্তিতে চলিতে হইবে।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাননীয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

৭ম ভাগ। | পৌষ, ১৩১৪। | ৯ম সংখ্যা।

দেব-দূত।

(নাট্য-কাব্য।)

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অরবিন্দের গৃহ। কাল—অপরাহ্ণ।

(অরবিন্দ ও অজয়।)

অজয়। ভালো কি লাগে না বন্ধু, সেই রূপরাশি ?

অরবিন্দ। সুন্দরী সে ;—তবু, তা'রে নাহি ভালবাসি
প্রিয়বর। প্রেম যবে জাগে চিত্ত-মাঝে,
রূপের সে না করে বিচার, কুরূপা যে—
সে-ও সে মহেন্দ্র-ক্ষণে অপূর্ব্ব প্রভায়
অতুল সৌন্দর্য্য ল'য়ে বিরাজে ধরায়
মহীয়সী দেবীসম।

অজয়। —মানি তাহা। তবু,
অটল সংকল্প ল'য়ে চাহো যদি, কভু
ব্যর্থ নাহি হ'বে ইচ্ছা তব। জ্ঞানী জন
প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে যাপে না জীবন।
প্রবৃত্তি সংযত করি' ইচ্ছা-শক্তি-বলে,
আপন কর্ত্তব্য স্মরি,' এই ধরাতলে
আপনারে জয় করি' লহ।

অরবিন্দ। সখা মোর,
মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণায় র'য়েছ বিভোর।
সুস্নিগ্ধ, প্রদীপ্ত প্রেম বিকচ-নবীন,
অদম্য সে,—বিশ্ব-জয়ী! প্রেম ইচ্ছাধীন ?
—নহে কভু। ইচ্ছা সে-ই নিত্য ভক্তিভরে
দাসীসম প্রাণপণে তা'র সেবা করে।
সকল প্রবৃত্তি আসি,' বিনম্র উচ্ছ্বাসে,
অর্ঘ্যে অর্ঘ্যে সদ্যোস্ফুট অশোক-পলাশে
প্রণয়ের সেই রক্ত-পদ্মাম্বুজে যবে
পূজার সম্ভার ঢালে,—তখনি এ ভবে
ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে গগনে-পবনে
অশ্রান্ত বিহঙ্গ-কণ্ঠ সঙ্গীত-সুধায় ;
তখনি এ মর্ত্ত্য-ভূমি দীপ্ত গরিমায়
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশে হয় কম্পমান ;
হর্ষ-রোমাঞ্চিত-তনু প্রেমিকের প্রাণ
নিখিল-বিশ্বের সেই মথিত নির্য্যাস—
সৌন্দর্য্য-মদিরা পানে, মিটায়ে তিয়াস,
তখনি বিহ্বল হ'য়ে আনন্দ-পাথারে
ডুবে' যায়।
হেন প্রেমে কেহ কিগো পারে
আনিতে আপন বশে ?

অজয়। —সম্বর' কল্পনা।
অলীক স্বপ্নের মোহে কভু করিয়ো না—
সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ। হও আত্ম-জয়ী ;—
'আপন কর্ত্তব্য জানি,' সর্ব্ব দুঃখ সহি,'
পরিণীতা, গৃহলক্ষ্মী ভার্য্যারে হৃদয়ে
বরি' লহ সমাদরে। সুখে, দুঃখে, ভয়ে—
এ সংসারে তোমারেই অসীম নির্ভরে
একমাত্র আপনার ভেবে,' ভক্তি ভরে
যে তোমার মুখপানে সদা আছে চাহি,'
দিওনা—দিওনা তা'রে ব্যথা।

অরবিন্দ। পাপ নাহি
অকপট ব্যবহারে। কন্তু, সঙ্গোপন
করি' সত্যে, যদি আমি প্রীতি আচরণ
করি তা'র সনে,—হ'বে ঘোর অপরাধ ;
তা' হ'লে, বিধাতৃরোষে ভীষণ প্রমাদ
ঘটিবে অচিরে। যা'রে নাহি ভালবাসি,
কেমনে প্রফুল্লাননে তাহারে সম্ভাষি'
ছলনা করিব নিত্য ? নিত্য মনে মনে
আত্ম-প্রতারণা করি,' স্বচ্ছন্দে কেমনে
বিষাক্ত এ জীবন যাপিব ? অবলা সে—
সে ছলনা না বুঝিয়া, সরল বিশ্বাসে
যদি আমারেই করে চিত্ত সমর্পণ,—
ধর্ম্মে কি সহিবে তাহা ?

অজয়। হায়—মূঢ় জন,
এখনো কি বোঝ নাই সে নারীর মন ?
এখনো কি জানো নাই—জীবন-মরণ
তোমারি চরণোপান্তে দিয়াছে সঁপিয়া
সেই মূক, ক্ষুদ্র নারী-হিয়া ? যুক্তি দিয়া
যাহারে রাখিয়া দূরে—অন্তঃপুরকোণে,
আজি তুমি স্বার্থ-মগ্ন, সে যে কায়-মনে
তোমারি চরণে ওগো বিকা'য়ে দিয়াছে
আপনারে বিনামূলে !

অরবিন্দ। মোর মনোমাঝে
কেন বৃথা বাড়াও বিষাদ ? মিথ্যা মোরে
বন্দী করিবারে চাহো ! এখনো যদিও
হয়নি সম্যক পরিচয় তথাপি জানিও—
তোমা হ'তে চিনি আমি তা'রে ; সে আমায়
বাসেনি এখনো ভালো। বৃথা আশঙ্কায়
উদ্বিগ্ন হোয়োনা !

অজয়। হায়—সুহৃৎ আমার,
এত অন্ধ তুমি ! হায়—কেমনে বুঝাই
আর এ সংসারে তা'র তোমা বিনে নাই
অন্য চিন্তা কোন। ওরে হিন্দু-নারী সে যে !
সেই সে গোধূলি-লগ্নে উঠেছিল বেজে'
যখন মঙ্গল-বাদ্য—শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি,
মিলিল দু'হাত যবে, অজ্ঞাতে তখনি
ওই ক্ষুদ্র বক্ষ-পুটে সমগ্র হৃদয়
উচ্ছ্বসি' উঠিয়াছিল ; কোলাহলময়
সেই শুভ সন্ধ্যালোকে, ধূপ-গন্ধ সনে,
তখনি মঙ্গল, দিব্য মন্ত্র-উচ্চারণে
ওই ক্ষুদ্র জীবনের উদ্যান-মাঝার
ফুটিয়া উঠিল ধীরে পূজা-উপচার—
থরে থরে, মধু-গন্ধি প্রসূনের রাশি।
সেই শুভক্ষণে ধীরে উঠিল বিকাশি'
রমণীর মহাধর্ম্ম—আত্ম-বলি দান !
তখনি হারা'ল বালা আপনার প্রাণ,—
পূজিল সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমারে গোপনে
হৃদি-মাঝে। আজি তা'র জীবনে, মরণে
একমাত্র গতি—তুমি। নারী-ধর্ম্ম কিযে,
বোঝনি এখনো তুমি। তাই, শুধু নিজে
কল্পনারে ল'য়ে কর—আজো হাহাকার
উপেক্ষার বিষ-বাণে হৃদয় তাহার
জীর্ণ করি'। ভ্রান্তিবশে, তাই, অকারণে
সাধ করে' তুচ্ছ করি' মহার্হ রতনে
আজি তুমি সাধিতেছ স্বীয় সর্ব্বনাশ
সযতনে।

অরবিন্দ। করেছিলে মোরে উপহাস—
কল্পনা-প্রবণ বলি' হে বন্ধু, এখন
কল্পনা-শিখরে তুমি করি আরোহণ
স্বপ্নাবিষ্ট হ'য়ে আছ। শোনো নিবেদন—

এ নহে পুতুল-খেলা ; ল'য়ে প্রাণ-মন
আপন খেয়ালে কেহ—ইচ্ছা হ'ল বলে'—
পারে না সঁপিতে অন্যে খেলিবার ছলে
এতই সহজে। প্রাণ দিতে নাহি হয়,—
প্রেমের উদ্ভবে তাহা আপন আলয়
আপনিই লহে খুঁজি'।

অজয়। কি বলিব আর!
অভিন্ন-হৃদয় তুমি, হেরিয়া তোমার
হেন দশা—প্রাণে বড় ব্যথা বাজে মম।
আরো বাজে এ হৃদয়ে—স্ফুট, পদ্ম সম,
হেরি' ওই অসহায়া সতী-রমণীর
হেন অপমান। হায়—এই কি বিধির
ছিল মনে। ভাবি নাই—এই পরিণাম
হ'বে শেষে!

অরবিন্দ। কেন আর বৃথা অবিরাম
লজ্জা দেহ মোরে! ওগো কি করেছি পাপ—
যা'র লাগি' অদৃষ্টের হেন অভিশাপ
সহি নিত্য! হৃদে জ্বলে যেই চিন্তানল—
আবাল্য-সুহৃৎ তুমি,—তুমিও কেবল
সে বহ্নি আহুতি দানে তুলিছ জ্বালায়ে ;
তুমিও দিলেনা হায়—আজিও নিবায়ে
সমবেদনার অশ্রু বরষি' আমার
অসহ্য এ তীব্র জ্বালা।

অজয়। হেন অবিচার
কোরো না আমার প্রতি। কি জানিবে—কত
অশান্তি পুষিয়া এই অন্তরে সতত
যাপি আমি নিশি-দিন। তব হিত-তরে
কহি যত রূঢ় বাক্য, তাহে কভু মোরে
ভাবিও না—প্রাণহীন পাষাণ-মূরতি!
আমি চির-বন্ধু তব।

অরবিন্দ। তবে, মোর প্রতি
কেন এত কর রোষ?

অজয়। রুষ্ট নহি আমি।
তোমারি কল্যাণ লাগি'—জানে অন্তর্য্যামী
কহি এ অপ্রিয় কথা।

অরবিন্দ। কিবা ফল তা'রে—
ব্যথিতেরে দিয়ে ব্যথা?

অজয়। রোগী নাহি চাহে—
ঔষধ সেবিতে সুখে ; তবু, সেই তা'রে
ঔষধ সেবিতে হয়,—নিখিল-সংসারে
এই চিরন্তন প্রথা। হে আমার প্রিয়,
কহি পুনরায়—হও স্থির ; না করিও—
আত্মহত্যা স্বেচ্ছায়, প্রমাদে। এ সুধারে
পায়ে ঠেলি' বিষ-কুম্ভ ভ্রমে, আপনারে
অনন্ত নরক-স্রোতে দিওনা ভাসায়ে।

অরবিন্দ। কভু চাহিনা দলিতে তা'রে পায়ে ;—
এতদূর হীন নহি আমি। তা'রে যবে
বিবাহ করেছি, মোরি গৃহে তা'র হবে
বাস-ভূমি। অনিচ্ছায়—পিতার আদেশে
কাল-পরিণয়-পাশে বদ্ধ হ'য়ে, শেষে—
তা'র সনে অকারণে কোথা চলিলাম,
নাহি জানি! শুধু, আজি শুনি অবিরাম—
প্রলয়-গর্জ্জন-ধ্বনি নিত্য চরাচরে—
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে।

অজয়। রাখো যদি ঘরে,
কি ভাবে র'বেন তিনি তোমার সহিত—
জানিবারে কৌতূহল মম।

অরবিন্দ। —হিতাহিত
না করি বিচার আর। করেছি বিবাহ ;
গৃহে রাখি' সমাদরে, সংসার-নির্ব্বাহ
করে যা'ব। তা'রপর যা' হ'বার হ'বে,
ভাবিতে পারি না আর।

অজয়। অতুল বৈভবে
বর্দ্ধিত হ'বেন তিনি তব অন্তঃপুরে,
মানিলাম তাহা ; কিন্তু, কল্যাণী বধূরে
বসা'বে কি হৃদাসনে?

অরবিন্দ। —দেখোনা স্বপন!
কোথায় হৃদয়? হের,—সেই পদ্মাসন
নৈরাশ্যের পদাঘাতে বিচূর্ণ হইয়া
পড়ে' আছে চারি ধারে।

অমিয়া, অমিয়া,
হৃদয়-ঈশ্বরী মোর, কোথা—কোথা তুমি?
হের দেবি! তোমাবিনে শূন্য বিশ্ব-ভূমি—
শ্মশানের সম শুধু ঘোর অন্ধকারে,
আর্ত্ত ব্যাকুলতা ল'য়ে, শুধু হাহাকারে
শ্বাসি'ছে বেদনা ভরে!

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্নপূর্ণা। রাত্রি দ্বিপ্রহর!

অরবিন্দ। ঘুমাক্ অনন্তকাল বিশ্ব-চরাচর
এই মত স্তব্ধতায়!

অজয়। কল্যাণি, প্রণমি
শ্রীচরণে তব।
(জনান্তিকে) বন্ধু, মোরে তবে ক্ষমি'
দেহ হে বিদায় এবে। মনে রেখো, হায়—
প্রেম নাহি হয় লুপ্ত বিচ্ছেদের ঘায়ে;
কিন্তু, উপেক্ষার বিষে হ'লে 'জর-জর'—
সে-ও নাহি রহে আর।

অরবিন্দ। (কর-ধারণ করিয়া) এসো বন্ধুবর,
দেখা দিতে ভুলিও না।

[অজয় প্রস্থান।

অন্নপূর্ণা। রাত্রি বেড়ে' যায়।
অভুক্ত গৃহের সবে তোর প্রতীক্ষায়;—
আয় অন্তঃপুরাবাসে।

অরবিন্দ। দিদি, চল যাই।
(স্বগত) কোথা যাব? কোথা যাব? শান্তি কোথা পাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

সীতা।

(রামায়ণের ও মেঘনাদবধের।)

বোধ হয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে সীতাদেবীর চরিত্রে এমন একটী অলৌকিক মাধুর্য্য আছে, যে তাঁহার প্রসঙ্গ মাত্রই সকলের মনোহরণে সমর্থ হয়। এই কারণেই মহর্ষি বাল্মীকির সীতাচরিত্র ভারতবর্ষের রমণীগণের চিরদিনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই অপূর্ব্ব চরিত্রটীকে যদি ঐতিহাসিকতা বর্জ্জিত করিয়া কেবল মহর্ষি বাল্মীকির প্রতিভা প্রসূত বলিয়াই লওয়া যায় তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এমন সুসঙ্গত ও সুচিত্রিত রমণীচরিত্র জগতের সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের ধারণা ছিল যে বাল্মীকির সীতাচরিত্র দোষে গুণে এতদূর সম্পূর্ণ যে তাহাকে আবার উন্নত করিবার প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। আদিকবি বাল্মীকির পদাঙ্কানুসরণে অনেক সুকবি সীতাচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সে চরিত্রকে উন্নত করিতে পারেন নাই ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মত।

বঙ্গের আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তদীয় "মেঘনাদবধে" সীতাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া মাইকেলের জীবনী প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু সেই গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"কিন্তু কেবল বর্ণনার মাধুর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের জন্য সীতা ও সরমার কথোপকথনের প্রশংসা নয়, সেই সঙ্গে সীতাচরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই মধুসূদনের অধিকতর প্রশংসা।" পুনশ্চ "শাণনির্ম্মুক্ত মণির ন্যায় সীতাচরিত্র তাঁহার হস্তে যেন একটু উজ্জ্বল হইয়াছে।" ইত্যাদি। কথাটা যখন প্রথম পাঠ করি তখন অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলাম। কারণ মেঘনাদবধে রামায়ণের চরিত্রগুলির অবনতি ঘটিয়াছে ইহাই আমাদিগের ধারণা ছিল। তাহার পর বহুদিন যাবৎ এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছি, বহুবার মূল রামায়ণের সীতাচরিত্র ও মেঘনাদবধের সীতাচরিত্র মিলাইয়া দেখিয়াছি, বহুবার যোগীন্দ্র বাবুর মত বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি; করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এতৎ প্রবন্ধে প্রকটিত করিব। নিজ মতামত যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব, কিন্তু উদ্ধৃতাংশ অনেক স্থলেই অনতিবিস্তর দীর্ঘ হইবে তজ্জন্য পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

প্রধানতঃ দুইটী বিষয় লইয়া শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু উপরি কথিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম সীতা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের প্রতি তীব্র তিরস্কার ও দ্বিতীয় আততায়ী রাক্ষস্ কুলের প্রতি দয়ার অভাব। আমরাও প্রথমে এই

দুই বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। ১ম সীতা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ-তিরস্কার। এতৎ সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বাবু কহিয়াছেন—

মহর্ষি সীতাদেবীকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহর্ষিকল্পিত সীতা-চরিত্রেও যে একটু অপূর্ণতা থাকিবার সম্ভাবনা, মেঘনাদবধে মধুসূদন তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াবী মারীচের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীর লক্ষ্মণের প্রতি অনুযোগ, আর্ষ রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগকে যথার্থ ই ব্যথিত হইতে হয়। তাহাতে এইরূপ আছে।—

"অনার্য্য-করুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন॥
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে॥
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।
তদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রাম মেক মেকো নুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥

এই ভর্ৎসনার অন্য কোনও কথা সম্বন্ধে আমাদিগের আপত্তি নাই, কিন্তু যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে রাজভোগ, স্নেহময়ী জননী এবং পতিপ্রাণা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যাঁহার নয়নযুগল কখনও ভ্রাতৃ-জায়ার পদলগ্ন নূপুরের ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় নাই—সেই চিরপবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি পাপকামনাবশতঃই তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সীতাদেবীর মনে এরূপ চিন্তা উদিত হওয়া কি কর্ত্তব্য? লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর কি ভ্রাতৃবধুর নিকট এরূপ সন্দেহের যোগ্য, না মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মুখ হইতে এইরূপ হলাহল উদ্গীর্ণ হইবার উপযুক্ত? সেরূপ অবস্থায় সীতাদেবী কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে কঠোর তিরস্কার করা অস্বা-ভাবিক নহে, কিন্তু বহুদিনের বিশ্বাস অকস্মাৎ এরূপ সন্দেহে পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক নহে। যাঁহারা বলেন যে দেবকার্য্য সম্পাদনের জন্য দুষ্টা সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কোনও বক্তব্য নাই। আমরা মেঘনাদবধের রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে মানবমানবী ভাবেই দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা স্বাভাবিক তাহাই বলিতেছি। মধুসূদন সীতাদেবীর অনুযোগ এইরূপ লিখিয়াছেন।—

সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;—
কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে
নিষ্ঠুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি;
রে ভীরু রে বীরকুলগ্লানি যাব আমি
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমাকে।

এই তিরস্কার সীতাদেবীর প্রকৃতির অযোগ্য হয় নাই।"

আমরা সবিস্তারে যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিলাম, কারণ কেহ না মনে করেন যে তাঁহার মতামত আমরা নিজ প্রয়োজন মত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লইয়াছি। ইহাও এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে সীতা দেবীকে আমরাও রমণী বলিয়াই ধরিয়া লইব, কারণ রামায়ণে সীতাদেবী রমণী রূপেই চিত্রিত। এখন দেখা যাউক যোগীন্দ্র বাবুর কথা কতদূর সত্য।

এই বিষয়ের বিচারের পূর্ব্বে সীতাচরিত্রের মূলতত্ত্ব আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সীতাচরিত্রের মূলতত্ত্ব এই তাঁহার গভীর পাতিব্রত্য, অনন্যচিন্তা-পরাহত-পতিপ্রেম। তিনি রামময়জীবিতা, পতিচিন্তাসর্ব্বস্বা, পতির বাহিরে তাঁহার জগৎ নাই, বিশ্ব নাই, বিশ্বচরাচর সকলি তাঁহার পতিমধ্যগতা। এই অপার সাগরবৎ পতিপ্রেম, যাহা সুখে, দুঃখে, বিপদে সম্পদে, প্রলোভনে, আদরে, অনাদরে, নিকটে, দূরে, সর্ব্বাবস্থাতেই, সকল সময়েই তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট,—সীতাচরিত্রের মূল উপাদান। অতএব সীতাচরিত্রের বিচারকালে আশা করি কেহ তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

এখন আমরা যদি সীতা দেবীর উক্তিনিচয় ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু রামায়ণের যথেষ্ট ঐতিহাসিকতা আছে একথা স্বীকার করিলেও সীতার কথাগুলি যে যথাযথ রামায়ণে উদ্ধৃত হইয়াছে একথা কেহই স্বীকার করিবেন না, আমরাও করিনা। রামায়ণের ঘটনাবলীর সত্যতা অস্বীকার না করিলেও আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে একটা মূল ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া মহর্ষি সীতার বচনগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সেক্ষেত্রেও আমা-দিগকে সীতাদেবীর উক্তিগুলি বিচার করিতে হইবে। আর যদি রামায়ণকে কেবল কাব্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে তো সবিশেষ বিচার আবশ্যক। কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও সীতাদেবীর উক্তি সমগ্র রামায়ণের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন।

লক্ষ্মণের প্রতি সীতার তিরস্কার বাক্য হইতে সীতা হরণ ও অপূর্ব্ব যুদ্ধকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে; অতএব এই বাক্যের গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সীতার বাক্যগুলির বিচার করিতে হইলে, শুধু সীতাচরিত্রের উপর দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে না, চারিদিকের আনুসঙ্গিক ঘটনাবলী ও বিশেষতঃ রামায়ণচিত্রিত লক্ষ্মণ চরিত্রের উপরও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সীতাবাক্যের প্রতি যোগীন্দ্র বাবুর দ্বিবিধ আপত্তি আছে প্রথমতঃ—ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ সীতার কর্ত্তব্য ছিল না; এবং

দ্বিতীয়তঃ—লক্ষ্মণের প্রতি সহসা বিশ্বাস হারান অস্বাভাবিক। এই দ্বিবিধ আপত্তি খণ্ডন করা এখন আমাদিগের উদ্দেশ্য।

সর্ব্বজনবিদিত হইলেও রামায়ণবর্ণিত সীতা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের প্রতি কটূক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী আর একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। সীতা দেবীর ঐকান্তিক অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণমৃগবধার্থ কাননে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি লক্ষ্মণের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন যে তুমি কুটীরে থাকিয়া বিশেষ সাবধান হইয়া সীতাকে রক্ষা করিবে। রামভক্ত লক্ষ্মণ সেই কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া কুটীরে অবস্থান করিয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে কাননাভ্যন্তর হইতে রামস্বরবৎকণ্ঠে কে কাতরস্বরে ডাকিয়া উঠিল—হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! এই স্বর শুনিয়া লক্ষ্মণ বিচলিত হইলেন না, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এ কোনও মায়াবীর প্রবঞ্চনা মাত্র। কিন্তু রামের আর্ত্তস্বর শুনিয়া ও তাহা শ্রীরামচন্দ্রই উচ্চারণ করিয়াছেন ভাবিয়া—সীতাদেবী অতিশয় বিচলিত হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন—

........গচ্ছ জানীহি রাঘবম্ ॥
নহি মে জীবিতং স্থানে হৃদয়ঞ্চাবতিষ্ঠতে।
ক্রোশতঃ পরমার্ত্তস্য শ্রুতঃ শব্দো ময়াভৃশম্ ॥
আক্রন্দমানন্তু বনে ভ্রাতরং ত্রাতুমর্হসি।
তং ক্ষিপ্র মভিধাব ত্বং ভ্রাতরং শরণৈষিণম্ ॥

* * * *

এই সময়ে সীতাদেবীর অবস্থা কেমন তাহা যাঁহারা সীতাদেবীর পতিপ্রেম—তাঁহার চরিত্রের মূলতত্ত্ব—সম্যক্ ধারণা করিতে পারিবেন তাঁহারাই কেবল বুঝিতে সুক্ষম হইবেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে জানিতেন তাই মারীচের হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! শব্দ শুনিয়াই তিনি আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে স্বতঃ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল—

রামো রুধির সিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে।
জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্য বচঃস্মরন্ ॥

* * * *

হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেব মাক্রুশ্য তু মহাস্বনম্।
মমার রাক্ষসঃ সোঽয়ং শ্রুত্বা সীতা কথং ভবেৎ ॥

লক্ষ্মণও তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই রামচন্দ্রকে তিনি কহিয়াছিলেন :—

সা ত্বমার্ত্ত স্বরং শ্রুত্বা তব স্নেহেন মৈথিলী।
গচ্ছ গচ্ছেতি মামাহ রুদন্তী ভয়বিক্লবা ॥

* * * *

এবমুক্তাহি বৈদেহী পরিমোহিতচেতনা।
উবাচাশ্রূণি মুঞ্চন্তী দারুণং মামিদংবচঃ ॥

ফলতঃ রামের সমূহ বিপদ ভাবিয়া রামময়জীবিতা সীতার হৃদয় কতদূর দুঃস্থ হইয়াছিল তাহা যতক্ষণ বুঝিতে না পারা যাইবে ততক্ষণ সীতার তখনকার আচরণ ও কথা বুঝা যাইবে না। সীতা তখন আত্মহারা, তাঁহার পতিদেবতার তাঁহার জীবনের জীবন, তাঁহার প্রিয়তমের অমঙ্গল নিশ্চয় হইয়াছে, এই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় অভিভূত হইয়াছে, সমগ্র বিশ্ব তাঁহার হৃদয় হইতে দূরে অপসৃত হইয়া তাঁহার পতির চিন্তা সেখানে পূর্ণমাত্রায় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। এমন অবস্থায় লক্ষ্মণ তো তাঁহার কথা শুনিয়া রামকে উদ্ধার করিতে গেলেন না। কেন গেলেন না তাহা আমরা জানি—বাল্মীকি তাহা বলিয়া দিয়াছেন :—

"ন জগাম তথোক্তস্তু ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্।"

কিন্তু সীতার তখন তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। রামের বিপদে রামকে উদ্ধার করিতে না যাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মণ তাঁহার কাছে সর্ব্বগুণহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সীতার হৃদয়ে তখন অন্যচিন্তার বা হিতাহিত বিবেচনার অবসর ছিল না। তিনি তখন চৈতন্য-হীনা, লক্ষ্মণের নিজের কথায় "পরিমোহিতচেতনা"। তাই তিনি ভাবিলেন যে লক্ষ্মণ যখন রামের এমন বিপদে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন না, তখন বুঝি লক্ষ্মণ রামের যথার্থ ভক্ত নহেন, তিনি রামের শত্রু, বুঝি লক্ষ্মণের কাছে রামের বিপদই প্রার্থনীয়। যদি লক্ষ্মণের বীরত্বে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ থাকিত তবে হয় তো সীতাদেবী ভাবিলেও ভাবিতে পারিতেন যে ভয়ে লক্ষ্মণ রামের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন না, কিন্তু সে সন্দেহ তো তাঁহার নাই। তখন স্বভাবতঃই তাঁহার মনে হইল যে লক্ষ্মণ রামের শত্রু, লক্ষ্মণের মনে কুবাসনা আছে, নচেৎ কেন এমন হয়? সামর্থ্য সত্ত্বেও কেন লক্ষ্মণ রামকে সহায়তা করিতে যাইতেছেন না? তাই তিনি অতিশয় ব্যাকুলভাবে লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন :—

"সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ।
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে ॥
ইচ্ছসিত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণমৎকৃতে।
লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্ ॥
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তিতে।
তেন তিষ্ঠসি বিস্রব্ধং তমপশ্যন্ মহাদ্যুতিম্ ॥

কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়াভবেৎ।
কর্ত্তব্যমিহ তিষ্ঠত্যাঃ যৎপ্রধানস্ত্বমাগতঃ॥

এই তিরস্কারের সহিত মেঘনাদবধের তিরস্কারোক্তিটী তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে শেষোক্ত তিরস্কারটী তীক্ষ্ণতায় প্রথমোক্ত তিরস্কারের অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু সেই তিরস্কার শুনিয়াই মেঘনাদবধের লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন আর রামায়ণের লক্ষ্মণ উপরে উদ্ধৃত কঠিন তিরস্কার শুনিয়া কি করিয়াছিলেন? তিনি সীতা-দেবীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যান নাই।

এই স্থলে আমাদিগকে রামায়ণোক্ত লক্ষ্মণের চরিত্র একবার মানসপটে প্রতিফলিত করিতে হইবে। মহর্ষি বাল্মীকি লক্ষ্মণের চরিত্রে অশেষগুণের সমাবেশ করিয়াছেন। বীরত্বে লক্ষ্মণ অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জিতেন্দ্রিয়ত্ব তাঁহার চরিত্রে জাজ্জ্বল্যমান্। তিনি জ্ঞানী, বিনয়ী, ধর্ম্মরত মহাপুরুষ। কিন্তু যে গুণে তিনি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর চিত্ত বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তাঁহার অপরূপ ও অমেয় ভ্রাতৃবৎসলতা ও সেই ভ্রাতৃ-প্রেম-জনিত আত্মত্যাগ। রামচন্দ্র তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা। এই দেবতার টানে তিনি পিতামাতা পত্নী অনায়াসে ত্যাগ করিয়া, সুখসম্পৎ অবহেলা করিয়া কেবল তৎসঙ্গলোভে বন-চারী হইয়াছেন। রামের আজ্ঞা তাঁহার পক্ষে বেদবাক্যস্বরূপ, সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাল্য। রাম-পত্নী সীতাদেবী তাঁহার কতদূর মাননীয়া তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ফলতঃ সীতাদেবীকে তিনি দেবতার আসনেই বসাইয়াছিলেনঃ—

"উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতীমম।"

চির-ব্রহ্মচারী চিরজিতেন্দ্রিয় চিরবিনয়ী চিররিপুজয়ী লক্ষ্মণের দেবতাস্থানীয়া-ভ্রাতৃজায়ার ভর্ৎসনায় ধৈর্য্যচ্যুতি সম্ভবে না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে আর্ষরামায়ণের লক্ষ্মণ সীতার প্রথমকটূক্তি শ্রবণ করিয়াও অবিচলিত রহিয়া, রামাজ্ঞা-পালনে তৎপর রহিয়াছেন; অমন সন্দেহ-বিষ উদ্গীর্ণ হইলেও তিনি সীতাকে কহিতেছেনঃ—

ন্যাস-ভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তাময়ি মহাত্মনা।
রামেণ ত্বং বরারোহে নত্বাংত্যক্তুমিহোৎসহে॥

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সীতার তখন বিচারবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহার রামচন্দ্র যে বিপদ্গ্রস্ত হয় তো শত্রুকরে নিহতপ্রায়, তিনি যে কাতরস্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ডাকিয়াছেন, তিনি যে কাননে একাকী, অসহায় অবস্থায় রহিয়াছেন; আর তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ কি না এখন তাঁহাকে বুঝাইতে আসিয়াছেন! এ কি তখন পাগলিনী সীতার সহ্য হয়? এমন অবস্থায় আর কি বিশ্বাস থাকিতে পারে? বিশ্বাস কেমন করিয়া থাকিবে? যদি লক্ষ্মণ রামের বিপদ বুঝিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে যাইতেছেন না, তবে আর রামময়প্রাণা সীতার তাঁহার প্রতি বিশ্বাস থাকা কি সম্ভব না স্বাভাবিক? আজীবনের বিশ্বাস একটী দিনের সামান্য ঘটনায় চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায় এমন সংসারে অনেক ঘটিয়া থাকে তাহা কে না জানেন? সাহিত্যে ওথেলো তাহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। সীতার হৃদয়ে তখন শত সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছে; এক রামের উদ্ধার-চিন্তা ব্যতীত জগৎ সংসার তাঁহার কাছে লুপ্ত হইয়াছে। এই ভয়বিক্লবা শোক-বশীভূতা বিমোহিত-চেতনা জানকী ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি অবিচার হইতেছে কি না ভাবিয়া চিন্তিয়া তিরস্কার করিতে বসিবেন, তাহাই কি স্বাভাবিক?

যদি সীতাদেবী লক্ষ্মণকে কাপুরুষ বলিয়া জানিতেন তাহা হইলেও বা ভয়ের জন্য তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন না এমন সন্দেহ তাঁহার মনে উদিত হইতে পারিত। কিন্তু সক্ষম হইয়াও যখন লক্ষ্মণ রামোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন না দেখিলেন তখন তাঁহার মনে সকল প্রকার অনিষ্ট ও অমঙ্গলের চিন্তা উদিত হইয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলিল, সকল পাপ লক্ষ্মণের দেহকে আশ্রয় করিয়াছে ইহাই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। শুধু লক্ষ্মণের প্রতি নহে, বিশ্বজগতের প্রতিই তখন তিনি সন্দিগ্ধচিত্তা। ভরতের প্রতি সন্দেহ, লক্ষ্মণের প্রতি সন্দেহ, সবারই প্রতি সন্দেহ। কে জিতেন্দ্রিয়? কে সর্ব্বগুণশালী? কে কখনও তাঁহার চরণ ভিন্ন মুখের দিকে চাহেন নাই? যিনি তাঁহার ইন্দীবরনয়ন রামচন্দ্রকে এমন বিপন্ন জানিয়াও তাঁহার উদ্ধারার্থ গেলেন না সে লক্ষ্মণের সহস্রগুণ থাকিলেও এখন তিনি সর্ব্বপাপক্ষম। বুঝি সেই কপটাচারীর তাঁহাকে রাম-বিরহিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, বুঝি সে তাঁহারই লোভে রামের অনুগমন

করিয়াছে, এতদিন নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া আজি লব্ধকাম হইয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য মহর্ষি বাল্মীকি সীতার দেবীত্ব ঘুচাইয়া তাঁহার রমণীত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন—এই মুহূর্ত্তে সীতাদেবী নিজের অদৃষ্টবজ্র নিজ হস্তে সংগঠিত করিয়া নিজের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সে বজ্র লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় তিরস্কার বাক্য।

অনার্য্য করুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন।
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ॥
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে।
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তঃ ভরতেনবা॥
তন্নসিধ্যতি সৌমিত্রেরথাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥
উপসংসৃত্য ভর্ত্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্ জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যশংসয়ম্॥
রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূমি তলে॥

নিপুণ চিত্রকর বাল্মীকি সীতাদেবীর এই বচনের উপযুক্ত উন্মাদমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই তিরস্কারকে লোমহর্ষণ বলিয়াছেন। আমরাও বলি এই তিরস্কার লোমহর্ষণ কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। আমাদিগকে একবার সীতাদেবীর তাৎকালীন অবস্থা স্মরণ করিতে হইতেছে। বিজন কাননাভ্যন্তরে একাকিনী সীতাদেবী, পার্শ্বে লক্ষ্মণ; সম্মুখে কাননাভ্যন্তর হইতে রামের কাতর আর্ত্তনাদ সীতাদেবীর কর্ণগোচর হইয়াছে; তাঁহার অত্যন্ত বিশ্বাস হইয়াছে যে রামের আর্ত্তস্বরই বটে। তাঁহার সমস্ত হৃদয় সেই স্বরাভিমুখে ছুটিয়াছে—রামের বিষম বিপদ হইয়াছে ভাবিয়া তিনি দুশ্চিন্তায়, শোকে ও ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। সেই অবস্থায় তিনি লক্ষ্মণকে রামের উদ্ধারার্থ যাইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু লক্ষ্মণ গেলেন না। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়াও লক্ষ্মণ গেলেন না। তখন সীতার মনে শত পাপচিন্তার উদয় হওয়া সম্ভব নহে কি? তখন লক্ষ্মণের প্রতি শত সন্দেহ তাঁহার মনে জন্মান অস্বাভাবিক কি? কখনই নহে। মহর্ষি ইচ্ছা করিলে দুটো অপেক্ষাকৃত সভ্য কথা সীতার মুখে বসাইতে যে না পারিতেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাহার কারণ তখন যদি সীতা ওজন করিয়া, পরে তাঁহার কথার কিরূপ সমালোচনা হইবে ভাবিয়া, লক্ষ্মণের প্রতি অবিচার হইতেছে কি না তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া গালি দিতে বসিতেন তাহা হইলে হয় তো শুনিতে বেশ হইত কিন্তু তাহা অবস্থানুরূপ বা স্বাভাবিক হইত না। বিশেষতঃ মহর্ষির কাছে আর একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। স্বাভাবিক হয় অথচ এমন তীক্ষ্ণ হয় যে যাহাতে চিরাত্মজয়ী লক্ষ্মণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি চাই, তাহার বিষ এত প্রবল হয় যে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে রামাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে এমনই তিরস্কার সীতার মুখে তাঁহাকে বসাইতে হইয়াছে। যাহা রামায়ণে আছে সেই তিরস্কারেই শুধু এই উভয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেখানে কঠিন বজ্রের প্রয়োজন সেখানে মাইকেল সামান্য প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছেন। যেখানে হৃদয়বেধকারী আয়ুধের প্রয়োজন সেখানে পুষ্পশর সৃষ্টি করিলে স্বাভাবিক হইবে কেন? তাহা করিলে লক্ষ্মণের চরিত্রের গুরুত্ব নষ্ট হইয়া যায় যে। মাইকেল যে তিরস্কার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, একটী পাও নড়িতেন না—রামায়ণকাব্যেরও সৃষ্টি হইত না। সমগ্র রামায়ণকাব্যে বা ইতিহাসে সীতার এই "দুষ্টা সরস্বতী" মেরুদণ্ড স্বরূপ। দুষ্টা হইলেও এই বাণীর ভিতর দিয়াই আমরা তাঁহার পতিপ্রেমের অসীম প্রখরতা ও তীব্রতা অনুভব করিতে পারি। চিরবিশ্বাসী, চিরজিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণের প্রতি অবিচারেই সেই তীব্রতা বিশেষরূপে প্রকাশিত। অতএব ইহাকে উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর রুচিরূপ ক্ষুদ্র মানদণ্ড দ্বারা পরিমাণ করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির মুকুট খর্ব্ব করিবার প্রয়াস করা কতদূর সঙ্গত তাহা বলিতে পারি না।

সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই বলিতে হয় যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সীতার চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেও এবিষয়ে তিনি কোনও রূপেই মহর্ষিচিত্রিত সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষবিধান করিতে পারেন নাই।

অতঃপর আমরা যোগীন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় হেতুর বিচারে প্রবৃত্ত হইব। তিনি বলিতেছেন যে "অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি অনুকম্পা আর্ষ রামায়ণে সীতাপ্রকৃতিতে অর্পিত হয় নাই; ইহা মধুসূদনেরই সৃষ্টি।" একথার বিচার করিবার পূর্ব্বে আর একটা ক্ষুদ্র বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন হইতেছে। সীতা ও সরমার কথোপকথনে যখন সরমা

জটায়ু বধ।

সীতাদেবীর অঙ্গ অলঙ্কারবিহীন দেখিয়া রাবণকে দোষ দিতেছিলেন তাহাতে সীতাদেবী কহিয়াছিলেন :—

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।

এই কথা অবতারণা করিবার পূর্ব্বে যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি এই :—

"শাণযন্ত্রনির্ম্মুক্ত মণির ন্যায় সীতাচরিত্র তাঁহার হস্তে আরও যেন একটু উজ্জ্বল হইয়াছে।" মূল রামায়ণে এইরূপ কথোপকথন নাই, সেখানে সীতা ও সরমার কথোপকথন অন্যরূপ, অতএব বাল্মীকির এই সব কথা লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই; তাহার অপর এক কারণ যে সীতাদেবী অঙ্গের সমস্ত আভরণ ফেলিয়া দেন নাই, তাহাই মূল রামায়ণে কথিত হইয়াছে। মাইকেল সীতা দেবীকে সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করাইয়া এই কথোপকথনের অবতারণা করিয়াছেন। সীতাদেবীকে মিথ্যাবাদিনী না করিলে সরমার কথার ওরূপ ভিন্ন আর কোনও প্রত্যুত্তর সম্ভব হয় না, অতএব এ বিষয়ে রামায়ণের অপেক্ষা মেঘনাদবধের উৎকর্ষ আমি দেখিতেছি না। রামায়ণের সীতা অপক্ষপাতে গুণগ্রাহিণী। শত্রুপক্ষের যাহারা গুণশালী তাহাদের গুণ তিনি শত মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি অবিন্ধ্য রাক্ষস সম্বন্ধে হনুমান্‌কে কহিয়াছেন—

"অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ধৃতিমা শীলবান্ বৃদ্ধো রাবণস্য সুসম্মতঃ॥"

রাবণও যে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিল তাহাও তিনি হনুমান্‌কে বলিতে ভুলেন নাই।

"দ্বৌ মাসৌ তেন মে কালো জীবিতানুগ্রহঃ কৃতঃ॥"

আর্য রামায়ণের সীতা শত্রু-মিত্রের প্রতি সমভাবে সুবিচারয়ী।

এখন যোগীন্দ্র বাবুর আসল কথাটার অবতারণা করা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন—

দ্বিতীয়বার সরমা আসিয়া—সীতাদেবীকে মেঘনাদের মৃত্যু এবং প্রমীলার চিতারোহণ সংবাদ প্রদান করিলেন। বিধাতার অনুগ্রহে তাঁহার কারাগারের দ্বার যে উন্মুক্ত হইবার উপক্রম হইল তজ্জন্য তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, কিন্তু রাক্ষসবংশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি নিরপরাধিনী; কিন্তু হায়! বিধাতা তাঁহাকে রাক্ষসবংশের কালস্বরূপিণী করিলেন কেন? তাঁহারই জন্য নিরপরাধ মেঘনাদ এবং নিরপরাধিনী সাধ্বী প্রমীলা যে চিতানলে ভস্মীকৃত হইতেছিলেন তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইল; তিনি সজল নয়নে সরমাকে বলিলেন,—

"কুক্ষণে জনম মম সরমা রাক্ষসি,
সুখের প্রদীপ সখি নিবাই লো সদা—
প্রবেশি যে গৃহে হায় অমঙ্গলারূপী
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
* * * হৃদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী কত কে পারে গণিতে!
মরিল দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। বসন্তারম্ভে হায় লো শুকাল
হেন ফুল।"

সীতাচরিত্রের এই অনুপম দেবভাব মূল রামায়ণে নাই। অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি অনুকম্পা আর্ষ রামায়ণের সীতাপ্রকৃতিতে অর্পিত হয় নাই; ইহা মধুসূদনেরই সৃষ্টি।"

আমি অস্বীকার করি না যে মধুসূদন সীতা-চরিত্র খুব উন্নত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, সে চেষ্টা সীতাদেবীর উপরে উদ্ধৃত বচনে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তাঁহার এ প্রয়াস সফল হয় নাই। আর্ষ রামায়ণের সীতা-চরিত্রে দেবভাব আছে কি না তাহা পরে দেখা যাইবে। তবে ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন যে সে চরিত্রে অস্বাভাবিকতা নাই, এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে মহিমময় রমণীত্ব বিরাজিত আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহর্ষি সীতাদেবীকে রমণীরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। সেই জগৎমনোহর চিত্রের মূল তত্ত্ব আমাদিগকে আর একবার স্মরণ করিতে হইবে। যে অত্যন্ত প্রখর পতিপ্রেম সীতাদেবীকে লক্ষ্মণের প্রতি অবিচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল সেই পতিপ্রেমই সীতার মুখে মধুসূদনসৃষ্ট বচনাবলীর অস্বাভাবিকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। যাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তের আত্যন্তিক কামনা যে পতি-সমাগম-পথরোধী রাক্ষসকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, তাঁহার কখনও কি রাক্ষসরথীর নাশে দুঃখিত হওয়া সম্ভব না স্বাভাবিক? রাক্ষসবিনাশ তাঁহার আনন্দজনকই হইয়াছিল। সীতাদেবী জানিতেন যে ইন্দ্রজিৎ তাঁহার পতি-সম্মিলনের প্রধান অন্তরায়। সেই অন্তরায় অপসৃত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে যে নিরতিশয় আনন্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে কোনও আততায়ী ভাবের সম্মিলন সম্ভবে না। ইন্দ্রজিৎ নিরপরাধ কেমন করিয়া হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অপরের চক্ষে নিরপরাধ হইলেও সীতার চক্ষে তিনি তো নিরপরাধ নহেন। তাঁহাকে রামচন্দ্র হইতে বিযুক্ত রাখিবার চেষ্টায় যে যে রাক্ষস নিযুক্ত ছিল সকলেই তাঁহার চক্ষে বিষম অপরাধী; বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে ইন্দ্রজিৎ দুইবার অন্যায় যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছিল। সেই ইন্দ্রজিতের পতনে তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার কিরূপে হইতে পারে? তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে তাঁহার পতির সহিত

মিলিত হইবার পথ প্রশস্ততর হইল, তাই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। যাহার জন্য বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন তাহার জন্যই আবার কাঁদাকাটা করা কতদূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

ফলতঃ সীতাদেবীর সে সময় একমাত্র কামনা—যে রাক্ষসকুলের ধ্বংস হউক—তিনি পতির সহিত মিলনসুখ লাভ করিতে পারুন। পতিমাত্র-গত-প্রাণা সতীর সে সময় কি অন্য কোনও বাসনা হৃদয়ে আসিতে পারে? ভগবানের নিকট তাঁহার আকুল প্রার্থনা—

লঙ্কা মুন্মথিতাং কৃত্বা কদা মাং দ্রক্ষ্যতি পতিঃ।

তখন তাঁহার অনন্য-চিন্তাপরাহতা কামনা ও আশা—

সান্ধকারা হতদ্যোতা হতরাক্ষস পুঙ্গবাঃ।
ভবিষ্যতি পুরী লঙ্কা নির্দগ্ধা রামসায়কৈঃ॥

এই কামনায় যাঁহার প্রতি মুহূর্ত্ত কাটিতেছিল তাঁহার পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসবীর মেঘনাদের পতনে হৃদয়ে ব্যথা পাইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অস্বাভাবিক, তাহা কে না স্বীকার করিবেন?

শুধু তাহাই নহে, আবার মাইকেল সীতাকে বলাইতেছেন—

… … … আদে দেখ হেথা—
মরিল বাসব-জিৎ অভাগীর দোষে।

এ কথাই বা সীতার মুখে কেমন করিয়া বাহির হইতে পারে? তাঁহার দোষ কোথায়? রাবণ তাঁহাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল; তাঁহাকে রামের নিকট প্রত্যর্পণ না করিয়া তুমুল কলহ বাধাইয়া দিয়াছিল ও সেই অন্যায় অধর্ম্ম যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ তাহার সাহায্য করিতে গিয়া নিজকর্ম্মকৃত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে সীতার অপরাধ কোথায়? তাঁহার একমাত্র অপরাধ তিনি পিশাচের সংসর্গে পিশাচিনী হইতে অসম্মত হইয়াছিলেন; বহু প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, বহু উৎপীড়ন সহ্য করিয়া এমন কি প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন। এই কি তাঁহার দোষ? নিরপরাধিনী সীতার মুখে সাপরাধ ইন্দ্রজিতের পতনে, এমন বিপরীত কথা কেমন করিয়া উচ্চারিত হইতে পারে? ফলতঃ সীতার মুখে মধুসূদন যে কথাগুলি বসাইয়াছেন সে সমগ্র উক্তিটীই অসম্ভব, অস্বাভাবিক ও অর্থহীন। সেরূপ ভাব বা উক্তির স্থান রামায়ণে থাকা সম্ভবে না। এই উক্তিটী পাঠ করিলেই হেলেনকে মনে পড়িয়া যায় এবং বড়ই অনুতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে অনন্তমহিমময়ী সীতাদেবীর চরিত্র চিত্রণকালেও মধুসূদন প্রতীচ্য কাব্যের অনুকরণলালসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সীতার কথাগুলি হেলেনের কথার ছায়ামাত্র। হেলেন হেক্টরকে কহিয়াছিল—

Oh generous brother! if the guilty dame
That caused these woes deserve a Sister's name!
Would heaven ere all these dreadful deeds were done,
The day had showed me to the golden sun
Had seen my death! … .. … …
* * * * * *
Heaven filled up all my ills, and I accursed
Bore all and Paris of those ills the worst.

Pope's Homer's Iliad. Book VI.

হেক্টরের মৃত্যুতে হেলেন কাঁদিয়াছিল—

"For thee I mourn and mourn myself in thee,
The wretched source of all this misery."

Popis Homer's Iliad Book XXIV.

তাই মাইকেলও সীতাকে ইন্দ্রজিতের জন্য কাঁদাইয়াছেন—নিজেকে দোষী বলাইয়াছেন—"অমঙ্গলারূপী" বলাইয়াছেন, "কুক্ষণে জনম মম" বলাইয়াছেন। কিন্তু অপহর্ত্তৃ-প্রণয়-বশগা হেলেনের মুখে অপহর্ত্তার বংশের লোকের মৃত্যুতে দুঃখ করা সাজে, সীতার মুখে সাজে না, তাহা মাইকেল ভুলিয়া গিয়াছিলেন ও দুঃখের বিষয় যে, সুসমালোচক যোগীন্দ্র বাবুও তাহা ভুলিয়া গিয়া এই উক্তি প্রসবের জন্য মাইকেলের প্রতিভাকে বাল্মীকিপ্রতিভাবিজয়িনী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি এমন অস্বাভাবিক উপায়ে সীতা-চরিত্রের "দেবভাব" বিকশিত করিতে চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু সে চরিত্র তিনি দেবভাব-বিরহিত করিয়া আঁকেন নাই। রাক্ষসকুলের ক্ষয় তাঁহার আদৌ বাসনা ছিল না; তিনি নিজে পরমশত্রু রাবণকে কত সদুপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা শুনিলে রাবণের সর্ব্বনাশ হইত না।

"নাহ মৌ পরিকী ভার্য্যা পর ভার্য্যা সতী তব।
সাধুধর্ম্মমবেক্ষস্ব, সাধু সাধু ব্রতং চর॥
ইত্যাদি—সুন্দর কাণ্ড, ২১শ সর্গ।

কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধ ভিন্ন মুক্তির

উপায় নাই তখনই তিনি হনুমানকে সসৈন্য রামকে আনিতে অনুরোধ করিলেন।* অকারণ প্রাণিনাশে তাঁহার রুচি ছিল না।† যতদিন পতিসম্মিলন-পথ রোধ করিয়াছিল, ততদিনই রাক্ষসকুলকে তিনি পরমশত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যখন রাবণের মৃত্যুতে তাঁহার অনন্ত যন্ত্রণার শেষ হইল, তখন আর তাঁহার কাহারও প্রতি বিদ্বেষ রহিল না, তাই যখন রাবণবধ-সংবাদ দিতে আসিয়া হনুমান তাঁহার প্রতি অসহনীয়োৎপীড়ন-কারিণী চেড়ীগণকে শাস্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেই অনর্থক অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাদের বিষম অপরাধ তখনি তিনি ক্ষমা করিলেন।‡ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি অত্যাচার রাবণ বা অন্য রাক্ষসে করে নাই, ইহারাই করিয়াছিল, এক বৎসর ধরিয়া দিনে দিনে ইহারাই তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছিল, ইহারাও রাক্ষসবংশের, ইহারাও অত্যাচারী। ইহাদের প্রতি অনুকম্পাও অত্যাচারী রাক্ষসবংশেরই প্রতি অনুকম্পা। মানবসুলভ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দমন করিয়া এই সকল চেড়ীগণকে ক্ষমা করায় যে দেবভাব প্রকাশ পাইয়াছে, মহর্ষি সীতাদেবীর এই সময়কার আচরণে ও কথায় যে মহত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় ইন্দ্রজিতের বা রাবণের মৃত্যুতে তাঁহাকে কাঁদাইলে প্রকাশিত হইত না। আর ইহাই সীতাচরিত্রের মূলতত্ত্ব স্মরণ করিলে স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সে সময়ে তাঁহার হৃদয়ে যে অমেয় আনন্দ উদিত হইয়াছিল, তাহার সহিত কোনও ইতর ভাবের সমাবেশ অসম্ভব; তখন তিনি মূর্ত্তিমতী দয়া, পতিদর্শনসম্ভাবনায় তাঁহার সকল জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচিয়া গিয়াছে, তখন কি আর তিনি কাহারও অমঙ্গল বাঞ্ছা করিতে পারেন? এমনি করিয়া, এমনি স্বাভাবিক উপায়ে মহর্ষি বাল্মীকি সীতাদেবীর দেবীত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। মাইকেলাবলম্বিত পন্থা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যোগীন্দ্র বাবুর সমালোচনাধীন মতের কোনও যথার্থ ভিত্তি নাই। মধুসূদন সীতাচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক মধুসূদনের হস্তে সীতাচরিত্রের বিশেষ অবনতি হইয়াছে তাহা সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমাত্রেই অবগত হইবেন। বাল্মীকিচিত্রিত চরিত্রের উন্নতিসাধন আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি; তাহা করিতে পারেন নাই বলিয়া 'আমি মধুসূদনকে দোষ দিতেছি' না। কিন্তু তিনি সীতাচরিত্রের অবনতি ঘটাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আমি দোষভাক্ করিতেছি। কিসে মধুসূদন সীতাচরিত্রের খর্ব্বতাসাধন করিয়াছেন, তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি।

সীতাদেবী রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ, রাজভার্য্যা, ক্ষত্রিয়রমণী। তিনি পরন্তপ রাজা দশরথের পুত্রবধূ, মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী, অপূর্ব্ব সতীতেজঃসম্পন্না আর্য্যনারী। ক্ষত্রিয়রমণীর নির্ভীকতা, শুধু পুরাণেতিহাসে নহে, সৌভাগ্যের বিষয় ইতিহাসেও উজ্জ্বল অক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে। রামায়ণের সীতা সেই আর্য্যরমণী। শ্রীরামচন্দ্র বনগমনকালে সীতাকে অযোধ্যায় রাখিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, তদুত্তরে সীতাদেবীর নির্ভীক উত্তর সকল পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।(১) রাবণ তাঁহাকে হরণোদ্যম করিলে তিনি তাহাকে যে তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রীতিপ্রদ ও তেজোব্যঞ্জক।(২) রাবণ যখন তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে তখনও তিনি সতীত্ববলে বলবতী থাকিয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিতেছেন।(৩) পরে যখন রাবণ সীতাকে নিজপুরী মধ্যে আনয়ন করিয়া নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া নিজাঙ্কশায়িনী হইতে আহ্বান করিল তখনও সীতাদেবীর প্রত্যুত্তর বীরাঙ্গনার উপযুক্ত; (৪) তখনও তিনি নির্ভয়া, শোকাভিভূতা হইলেও ভয়হীনা—

"সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্ষিতা।"

সীতাদেবীর এই অমানুষী সতীত্ব প্রভাবও তদ্রূপ ভীতিহীনতার পরিচয় যাঁহারা সম্যক্‌রূপে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা স্মরণ করুন।(৫) মহাবীর হনুমান্ সীতাদেবীকে বলিলেন চলুন আমি আপনাকে

* রামায়ণ—সুন্দরকাণ্ড, ২৭শ সর্গ দেখ।
† রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড ৯ম সর্গ দেখ।
‡ রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

(১) অযোধ্যাকাণ্ড ২৭শ সর্গ ও ২৯শ সর্গ ও ৩০শ সর্গ দেখ।
(২) অরণ্যকাণ্ড ৪৭শ সর্গ দেখ।
(৩) অরণ্যকাণ্ড—৫৩শ সর্গ দেখ।
(৪) অরণ্যকাণ্ড—৫৬শ সর্গ দেখ।
(৫) সুন্দরকাণ্ড—৩৭শ সর্গ দেখ।

এখান হইতে লইয়া যাই। তাহার প্রত্যুত্তরে সীতাদেবী কহিয়াছিলেন—

ভর্ত্তৃভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।
নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম॥
* * * * *
যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা স রাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তৎতস্য সদৃশং ভবেৎ॥

বহু বিপৎসমাকুল শত্রুপুরীতে যদি হঠাৎ উদ্ধারের এমন সুযোগ উপস্থিত হইল, তথাপি কেবল সতীত্ব-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে তাহা ত্যাগ করিতে কতটা হৃদয়-বলের ও সাহসিকতার প্রয়োজন তাহা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। আর্ষ রামায়ণের সম্পূর্ণ সীতাচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তিনি পরমজ্ঞানবতী পরম বীর্য্যবতী, দয়াদান দাক্ষিণ্যাদিগুণমাণ্ডতা সতীশিরোমণি আদর্শ আর্য্যরমণী। এত গুণের সমাবেশ আছে বলিয়াই চিরদিন তিনি ভারতললনার শীর্ষস্থান অধিকার পূর্ব্বক কত সহস্র বৎসর যাবৎ জগজ্জনের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বাল্মীকির এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি, আর্ষ রামায়ণের এই "সিংহিনী" ও "রাজহংসী" মধুসূদনের হস্তে "ভেকী" ও "কপোতীতে" পরিণত হইয়াছেন। অপূর্ব্ব তেজোময়ী ক্ষত্রিয়ললনা, মধুসূদনের হস্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভীরু বাঙ্গালীরমণী হইয়া দেখা দিয়াছেন। যুদ্ধের নামে ও যুদ্ধদর্শনে যাঁহার অপার উৎসাহ ও আনন্দ তিনি মধুসূদনের কাব্যে কোদণ্ডটঙ্কার শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইতেছেন, যুদ্ধ হইবে শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। উদাহরণ দেখুন;—

(১) "চালাইল রথ রথী। কালসর্প মুখে
কাঁদে যথা "ভেকী" আমি কাঁদিনু সুভগে
বৃথা! * * * *
* * * *
* * * প্রভঞ্জনবলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে পড়ে মড় মড়ে
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে "কপোতী"?

(২) "তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড টঙ্কারে সখি কত যে কাঁদিনু
কব কারে? মুদি আঁখি কৃতাঞ্জলি পুটে
ডাকিনু দেবতাকুলে রক্ষিতে রাঘবে।
আর্ত্তনাদ সিংহনাদ উঠিল গগনে!
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।"

আর্ষ রামায়ণের সীতা শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বের প্রতি সন্দেহশালিনী ছিলেন না, রামের জন্য তাঁহাকে ঠাকুর দেবতাকে মানত করিতে হইত না। তিনি পতির বীর্য্যে বিশ্বাসবতী ছিলেন বলিয়াই রাবণকে সদর্পে কহিয়াছিলেন—

য এতে রাক্ষসা—প্রোক্তা ঘোররূপা মহাবলাঃ।
রাঘবে নির্বিষাঃ সর্বে সুপর্ণে পন্নগা ইব॥
* * * * *
অসুরৈর্বা সুরৈর্বাস্তং যদ্যবধ্যোসি রাবণ।
উৎপাদ্য সুমহৎ বৈরং জীবংস্তস্য ন মোক্ষ্যসে॥

মাইকেলের সীতা বাঙ্গালীরমণীর ন্যায় সিন্নি দিতে বিশেষ পটু। যাক্, এখন আরও দু'একটা উদাহরণ দিতেছি—

(৩) এতেক কহিয়া সখি গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র!
অচেতন হ'য়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে।

(৪) বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে সুন্দরি,
কাঁপিল বসুধা, দেশ পূরিল আরাবে!
অচেতন হৈনু পুনঃ।

ইনিই কি সেই সীতাদেবী যাঁহার গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া জগদ্‌বাসী চিরদিন ধরিয়া তাঁহার পদানত হইয়া রহিয়াছে? ইনিই কি সেই মহিমময়ী আর্য্যরমণী যিনি চিরকালের জন্য ভারতললনার আদর্শীভূতা হইয়া রহিয়াছেন? যাঁহার অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক সতীত্বের কাছে স্বয়ং কাল পরাভূত হইয়াছে? মাইকেলের এই ক্রন্দনপটু কথায় কথায় নষ্টচেতনা সীতা আদৌ ক্ষত্রিয়রমণী নহেন, বাঙ্গালীর গৃহবধূ। মাইকেলের হস্তে সীতাচরিত্রের এইরূপে বিষম অবনতি ঘটিয়াছে।

যোগীন্দ্র বাবু আক্ষেপের সহিত কহিয়াছেন যে, মেঘনাদ-বধের চতুর্থসর্গ সাধারণ পাঠকের কাছে প্রায়ই অনাদৃত হয়। হয় সত্যই, তাহার কারণ এই যে সীতাদেবীতে যে গুণ দেখিতে ইচ্ছা হয় তাহা তাহারা পায় না। মধুসূদনের সীতাচরিত্রে আর্ষ রামায়ণের সীতাচরিত্রের মহত্ত্ব ও গৌরব নষ্ট হইয়াছে, তাই তাহার সে আকর্ষণীশক্তি নাই। কিরণোদ্ভাসিত বৈদূর্য্যমণি ছাড়িয়া লোকে কাচের প্রতি আকৃষ্ট হইবে কেন? অনন্তসুখদায়িনী চন্দ্রিকা ত্যাগ করিয়া তারকার ক্ষীণ-জ্যোতির প্রতি লোকে আকৃষ্ট হইবে কেন?

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু, এম্ এ, বি এল্।

বৌদ্ধ প্রসঙ্গ।

(মিলিন্দ প্রশ্ন হইতে)

বুদ্ধদেব পূজা গ্রহণ করেন কি না ?

অনন্তর অবকাশ প্রদত্ত হইলে মিলিন্দ রাজা গুরুর চরণে প্রণত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই বলিলেন 'পূজনীয় নাগসেন, তৈর্থিকগণ * বলেন "বুদ্ধ যদি পূজা গ্রহণ করেন, তবে তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন নাই ; এই লোকের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে, তিনি এই লোকেরই অন্তর্ভূত একজন সাধারণ ব্যক্তি। অতএব তাঁহার জন্য যাহা কিছু করা যায়, তাহা বন্ধ্য ও নিষ্ফল। আবার যদি তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, লোকের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই, এবং সমস্ত সত্তার তিনি অতীত, তাহা হইলে তাঁহার পূজা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ; কেন না পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে কিছুও গ্রহণ করিতে পারেন না, অগ্রহীতার জন্য কৃত কার্য্য বন্ধ্য ও নিষ্ফল।" অতএব ইহা উভয় দিকেই প্রশ্ন। এই বিষয়কে (অথবা সংশয়কে †) অমনস্বী ব্যক্তি ভেদ করিতে পারে না, মহান্ লোকেরাই পারেন। অপরাপর দর্শন—(মত, বিশ্বাস) জালকে এক দিকে স্থাপন করুন। আপনার নিকটে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। পরবাদের নিগ্রহ জন্য আপনি অনাগত জিনপুত্র (বৌদ্ধ) গণকে চক্ষু প্রদান করুন।'

স্থবির কহিলেন 'মহারাজ, ভগবান্ পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তিনি পূজা গ্রহণ করেন না। বোধিদ্রুম মূলেই তিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন ত তিনি সেইরূপে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না। ‡ মহারাজা, ধর্ম্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্র ইহা বলিয়াছেনও—

"অসমান শমযুক্ত তাঁহারা গ্রহণ
করেন না সৎকার, যদিও তাঁদের
করেন পূজন দেব মানব নিকর,
স্বভাব (কীর্ত্তিত) ইহা বুদ্ধসমূহের।"

রাজা বলিলেন- 'পূজনীয় নাগসেন, পুত্র পিতার কথা (বা যশঃ *) বলিতে পারে, বা পিতা পুত্রের কথা (বা যশঃ) বলিতে পারেন। ইহাতে পরকীয় মত নিগৃহীত হয় না। পরস্পরের প্রসন্নতা তাহাতে প্রকাশ পাইতে পারে। অতএব আপনি আমাকে ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে কারণ নির্দ্দেশ করুন, যাহাতে স্বমত, প্রতিষ্ঠিত ও পরকীয় দর্শন-(মত) জাল অনাবৃত হইতে পারে।'

স্থবির কহিলেন 'মহারাজ, ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি পূজা গ্রহণ করেন না। কিন্তু তথাগত পূজা গ্রহণ না করিলেও দেব ও মনুষ্যগণ তাঁহার (দন্তনখাদিরূপ) ধাতু রত্নের বাস্তু (স্তূপাদি, নিবাস স্থান) নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানরত্নকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্রূপে শীলাদি সেবন করিতে করিতে সম্পত্তিত্রয় † লাভ করিতে পারে। মহারাজ, অতিমহান্ ‡ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া নির্ব্বাপিত করিলে, তাহা কি আর তাহার উপাদানভূত তৃণ কাষ্ঠ গ্রহণ করে ?'

'অগ্নি যখন জ্বলিতেছে, তখনই ত আর তাহার উপাদানভূত তৃণকাষ্ঠ গ্রহণ করে না ; § ইহা যখন নির্ব্বাণ, উপসন্ন, অচেতন, তখন যে গ্রহণ করিবে না, তাহা আর কি বলা যাইবে।'

মহারাজ, সেই অগ্নি নষ্ট নির্ব্বাণ হইলে কি লোক অগ্নিশূন্য হয় ?

* বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী আচার্য্যেরা বৌদ্ধসাহিত্যে 'তিথির' অর্থ বা তৈর্থিক নামে কথিত হন।

† মূল "বিসয়ো ;" ইহার সংস্কৃত 'বিষয়' বা 'বিশয়' এই উভয়ই হইতে পারে।

‡ মূল 'অনুপাদিসেসয়া নিব্বাণধাতুয়া পারিনিব্বুতন্স,' নির্ব্বাণ দ্বিবিধ উপাদিশেষ' ও 'অনুপাদিশেষ'। উচীচ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইহা উপাধিশেষ ও অনুপাধিশেষ নামে কথিত হয়। যাঁহারা অহত্ত্বফলস্থ, তাঁহারা 'উপাধিশেষ' নির্ব্বাণলাভ করেন। তাঁহাদের এই অবস্থা একরূপ নির্ব্বাণই, ন্যূনত্ব এই যে তখনও স্কন্ধ (রূপবিজ্ঞানাদি) অবশিষ্ট থাকে। মৃত্যু হইলেই ইহাঁরা চরম নির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন আর স্কন্ধ পর্য্যন্তও, থাকে না। এই শেষ নির্ব্বাণের নাম 'অনুপাদিশেষ' নির্ব্বাণ।' ভবিষ্যতে 'নির্ব্বাণ' নামক প্রবন্ধে এবিষয় বিশেষরূপে বলিতে চেষ্টা করা যাইবে।'

* মূল 'বণ্ণং'।

† 'তিস্‌সো সম্পত্তিয়ো' ; মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোক সম্পত্তি ও নির্ব্বাণ সম্পত্তি।

‡ 'মহতি মহা অগ্গিক্খন্ধো,' এস্থানে 'মহতি' শব্দপরবর্ত্তী 'মহা' শব্দও বিশেষণরূপে প্রযুক্ত বোধ হয়। এতাদৃশ প্রয়োগ অসকৃৎ পাওয়া যায়, যথা ইহারই একটু পরে 'মহতি মহাবাতো' ইত্যাদি। মিলিন্দ প্রশ্ন ৬৭ পৃঃ সিংহল সংস্করণ।

§ জ্বলন্ত অগ্নি নিজের জন্য আর কাষ্ঠের অপেক্ষা করে না, তাহাতে কাষ্ঠ দিলে অপর অগ্নি জ্বলিতে পারে।

'নিশ্চয়ই না। কাষ্ঠ 'অগ্নির বাসস্থান (বাস্ত) বলিয়া তাহাকে তাহার উপাদান বলা হয়। অগ্নিকামী পুরুষ স্বকীয় শক্তি সামর্থ্য, চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক অগ্নিকার্য্য সমূহ সম্পন্ন করে।'

'অতএব মহারাজ, তৈর্থিকগণের কথা মিথ্যা যে,'যে গ্রহণ করে না, তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ্য ও নিষ্ফল। মহারাজ যেমন অতিমহান্ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, ভগবানও সেইরূপ দশ সহস্র লোকোপরি বুদ্ধ-লক্ষ্মীদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন। যেমন সেই অতিমহান্ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া নির্ব্বাণ হইয়াছিল, ভগবানও সেইরূপ মহারাজ, দশ সহস্র লোকোপরি বুদ্ধলক্ষ্মীতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই প্রকারে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না। মহারাজ, যেমন নির্ব্বাণ অগ্নি উপাদান তৃণ-কাষ্ঠকে গ্রহণ করে না, এইরূপ লোক হিতকারী ভগবানের পরিগ্রহ বিনষ্ট হইয়াছে। যেমন কাষ্ঠাদি উপাদানহীন অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে মনুষ্যগণ স্ব স্ব শক্তি সামর্থ্য চেষ্টায় কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা দ্বারা অগ্নি সম্পাদ্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করে, এইরূপই দেব ও মনুষ্যগণ পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগতের (দন্তনখাদিরূপ) ধাতুরত্নের বাস্ত (নির্ব্বাসস্থান, স্তূপাদি) নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানরত্নকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্ রূপে শীলাদি সেবন করিতে করিতে সম্পত্তিত্রয় লাভ করেন,—যদিও তথাগত কিছু গ্রহণ করেন না। এই কারণেও মহারাজ, পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে কৃত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল।

'মহারাজ, আরও পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, অতিমহান্ বায়ু বহিয়া উপরত হইলে, সেই উপরত বায়ু কি পুনর্ব্বার (অন্যকর্ত্তৃক) উৎপাদনা গ্রহণ করে?'

'না; উপরত বায়ুর পুনরুৎপাদনা বিষয়ে কোন চিন্তা থাকে না, কেন না বায়ু মহাভূত অচেতন।'

'মহারাজ, সেই উপরত বায়ুর 'বায়ু' সংজ্ঞা হইতে পারে কি?'

'না; তালবৃন্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ। যে কোন মনুষ্যগণ নিদাঘাভিতপ্ত, ও পরিদাহ (জ্বরাদিতাপ) পীড়িত হয়, তাহারা তালবৃন্ত বা ব্যজন দ্বারা বায়ু উৎপন্ন করিয়া, সেই বায়ুর দ্বারা নিদাঘকে নির্ব্বাসিত, ও পরিদাহকে উপশান্ত করে।'

'তাহা হইলে, মহারাজ, তৈর্থিকেরা যে বলেন "যিনি গ্রহণ করেন না, তাঁহার জন্য কৃতকার্য্য বন্ধ্য ও নিষ্ফল"—তাহা মিথ্যা। মহারাজ, যেমন অতিমহান্ বায়ু বহিয়াছিল, ভগবানও এইরূপ দশ সহস্র লোকে শীতল-মধুর, শান্ত-সূক্ষ্ম মৈত্রী বায়ুতে বহিয়াছিলেন। মহারাজ, যেমন অতিমহান্ বায়ু বহিয়া উপরত হয়, ভগবানও এইরূপ শীতল-মধুর, শান্ত-সূক্ষ্ম মৈত্রী বায়ুতে বহিয়া সেই প্রকারে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না।* যেমন উপরত বায়ু (নিজের অন্য কর্ত্তৃক) পুনরুৎপাদনা গ্রহণ করে না, এইরূপ লোকহিতকারী ভগবানেরও মহারাজ, কোন বস্তুপরিগ্রহ নষ্ট, উপশান্ত। সেই মনুষ্যগণ মহারাজ, যেমন নিদাঘাভিতপ্ত ও পরিদাহ পীড়িত, দেব ও মনুষ্যগণও এইরূপ ত্রিবিধ অগ্নির † সন্তাপ ও পরিদাহে পরিপীড়িত। যেমন তালবৃন্ত ও ব্যজন বায়ুর উৎপত্তির কারণ, এইরূপ তথাগতের (দন্তনখাদি) ধাতুর জ্ঞানরত্ন সম্পত্তিত্রয় লাভের কারণ। যেমন উষ্ণাভিতপ্ত ও পরিদাহপীড়িত মনুষ্যগণ তালবৃন্ত ও ব্যজনের দ্বারা বায়ু উৎপন্ন করিয়া তাহা দ্বারা উষ্ণকে নির্ব্বাপিত, ও পরিদাহকে উপশান্ত করে, এইরূপই দেব ও মনুষ্যগণ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত তথাগতের, যদিও তিনি গ্রহণ করেন না, (দন্তনখাদি) ধাতু ও জ্ঞানরত্নকে পূজা করিয়া কুশল উৎপাদন করেন। এবং সেই কুশলের দ্বারা ত্রিবিধাগ্নির সন্তাপপরিদাহকে নির্ব্বাপিত ও উপশান্ত করেন। মহারাজ, এই কারণেও তথাগতের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবন্ধ্য ও সফল।

'মহারাজ, পরকীয় মত নিগ্রহের জন্য আপনি আরও পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন। মহারাজ কোন পুরুষ ভেরীকে স্থাপন করিয়া তাহাতে শব্দ উৎপাদন করে, পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত এই ভেরীশব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়। মহারাজ, সেই শব্দ কি (অন্য কর্ত্তৃক নিজের) পুনরুৎপাদনাকে গ্রহণ করে?'

* Rhys David কৃত অনুবাদে ইহার পর কয়েকটী কথা ছাড়া পড়িয়াছে।

† রাগ, দ্বেষ, ও মোহ।

'নিশ্চয়ই না, সে শব্দ অন্তর্হিত হইয়া যায়, পুনরুৎপত্তির জন্য তাহার কোন চিন্তা থাকে না। কেন না উৎপাদিত ভেরীশব্দ অন্তর্হিত হইলে তাহা সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ভেরী শব্দোৎপত্তির কারণ। কারণ উপস্থিত থাকিলে, লোকে স্বকীয় চেষ্টায় ভেরীকে স্থাপিত করিয়া শব্দ উৎপাদন করে।'

'এইরূপই মহারাজ, ভগবান শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তলভ্য দর্শনের নিমিত্ত পরিচিন্তিত ধাতুরত্ন, ধর্ম্ম, বিনয়, অনুশাসন ও শাস্তা (শাসনকর্ত্তা শিক্ষক) কে স্থাপন করিয়া নিজে সেইরূপে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, যাহাতে আর কিছু অবশেষ থাকে না। কিন্তু ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেও (লোকের) সম্পত্তিত্রয় লাভ উপচ্ছিন্ন হয় নাই। সংসারদুঃখপীড়িত জীবেরা সম্পত্তিকাম হইয়া ধর্ম্ম, বিনয় ও অনুশাসনকে কারণরূপে অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পত্তিলাভ করিয়া থাকে। মহারাজ, এজন্যও তথাগতের জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য, তিনি গ্রহণ না করিলেও, অবন্ধ্য ও সফল। মহারাজ, ভগবান্ পূর্ব্বেই এই অনাগত (ভবিষ্যৎ) কাল দেখিয়া বলিয়াছেন, ঘোষণা করিয়াছেন ও জানাইয়াছেন* আনন্দ, তোমাদের মনে এইরূপ হইতে পারে যে, 'প্রবচন সমূহের শাস্তা অতীত হইয়া গিয়াছেন, আমাদের শাস্তা নাই'। আনন্দ, ইহাকে সেরূপ মনে করিবে না। আনন্দ, আমি যে ধর্ম্ম ও বিনয়কে উপদেশ করিয়াছি ও জানাইয়াছি সেই তোমাদের আমার অভাবে (অত্যয়ে) শাস্তা।"† অতএব পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত, অগ্রহীতা, তথাগতের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কার্য্য বন্ধ্য ও বিফল—তৈর্থিক গণের এই উক্তি মিথ্যা, বিতথ, অলীক, বিরুদ্ধ, বিপরীত, দুঃখহেতু, দুঃখপরিণাম ও অপারপ্রাপক।

'মহারাজ আরও পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যাহাতে পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত অগ্রহীতা হইলেও, তাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল। মহারাজ এই মহাপৃথিবী কি ইহা গ্রহণ করে* যে বীজ সকল আমাতে সংবিরূঢ় হউক ?'

'না।'

'মহারাজ' যদি মহাপৃথিবী বীজসকলকে গ্রহণ না করে, তবে কি প্রকারে সেই সমস্ত বীজ বিরূঢ় হইয়া, দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও স্কন্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প ফল ধারণ করে ?'

'গ্রহণ না করিলেও, মহাপৃথিবী ঐ সকল বীজের বাসস্থান (বাস্তু) এবং তাহাদিগকে প্ররোহণের জন্য নিমিত্ত প্রদান করে। অতএব ঐ সকল বীজ সেই বাসস্থান অবলম্বন করিয়া, ঐ প্রাপ্ত নিমিত্ত দ্বারা বিরূঢ় হইয়া, দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ও স্কন্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া পুষ্প ফল ধারণ করে।'

তবে মহারাজ, তৈর্থিকগণ যদি বলেন যে, 'অগ্রহীতার জন্য কৃত কার্য্যবন্ধ্য ও নিষ্ফল,' তবে তাঁহারা নিজের কথাতেই নষ্ট, হত ও বিরুদ্ধ হইয়া পড়েন। মহারাজ, যেমন মহাপৃথিবী, সম্যক্ সম্বুদ্ধ অর্হৎ তথাগতও তেমন। যেমন মহাপৃথিবী কিছু গ্রহণ করেন না, তথাগতও তেমনই কিছু গ্রহণ করেন না। মহারাজ ঐ সমস্ত বীজ যেমন পৃথিবীকে আশ্রয় পূর্ব্বক সংবিরূঢ় হইয়া, দৃঢ় মূল ও জটায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, স্কন্ধ, সার ও শাখা বিস্তারিত করিয়া ফলপুষ্প ধারণ করে, এইরূপ দেব ও মনুষ্যগণ পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত অগ্রহীতা তথাগতের দন্ত নখাদি ধাতু ও জ্ঞানরত্নকে অবলম্বন পূর্ব্বক দৃঢ় কুশলরূপ মূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমাধি রূপ স্কন্ধ, ধর্ম্মরূপ সার, ও শীলরূপ শাখা বিস্তার করিয়া বিমুক্তিরূপ পুষ্প ও শ্রামণ্য রূপ ফল ধারণ করে। এই কারণেও মহারাজ, পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্য কৃতকার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়।'

'মহারাজ, আরও পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্য কৃতকার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, এই উষ্ট্র বলীবর্দ্দ, গর্দ্দভ, অজ, পশু ও মানবগণের কুক্ষি মধ্যে যে কৃমিকুল উৎপন্ন হয়, তাহারা কি তাহা গ্রহণ করে।'†

---

* "কথিতঞ্চ ভণিতঞ্চ আচিকিথতঞ্চ"। এস্থানে একার্থক তিনটী পদ যুক্ত হইয়াছে। পালি ধাতুমঞ্জুষার দ্বারা ইহার পৃথক্ পৃথক্ অর্থ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ সাহিত্যে এতাদৃশ একার্থক শব্দের অসকৃৎ একত্র প্রয়োগ বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এখানে Rh. D. কে অনুসরণ করিয়াছি।

† মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্ত ৫, ১,।

* অর্থাৎ তাহাতে কি মহাপৃথিবীর সম্মতি থাকে। মূল 'সাদিয়তি'।

† অর্থাৎ তাহাতে কি তাহাদের সম্মতি থাকে।

'নিশ্চয়ই না।'

'মহারাজ, তবে কি প্রকারে ইহারা তাহাদের অমতেও কুক্ষি মধ্যে উৎপন্ন হইয়া বহু পুত্রনপ্তায় বিপুল হইয়া উঠে?'

'তাহাদের পাপ কর্ম্মের প্রভাব হেতু, অমত হইলেও, কুক্ষি মধ্যে ইহারা সম্ভূত হইয়া বহু পুত্রনপ্তায় বিপুল হইয়া উঠে।'

'এই প্রকারেই মহারাজ, পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্য কৃতকার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়।

'মহারাজ, আরও পরবর্ত্তী কারণ শ্রবণ করুন, যে কারণে পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও, তাঁহার জন্য কৃতকার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। মহারাজ, 'এই অষ্টনবতি প্রকার ব্যাধি শরীরে উৎপন্ন হউক'---এই বলিয়া মনুষ্যরা কি তাহাদিগকে গ্রহণ করে?

'নিশ্চয়ই না।"

'কি জন্য মহারাজ, তবে মনুষ্যেরা গ্রহণ না করিলেও, ঐ সমস্ত রোগ তাহাদের শরীরে উপস্থিত হয়?"

'পূর্ব্বকৃত দুশ্চরিতের জন্য।'

'যদি মহারাজ, পূর্ব্ব (জন্ম) কৃত অকুশলকর্ম্মের ফল এখানে অনুভব করিতে হয়, তবে পূর্ব্ব (জন্ম) কৃত, বা ইহ (জন্ম) কৃত, উভয় বিধই কুশল ও অকুশল কর্ম্ম অবন্ধ্য ও সফল।--মহারাজ এ কারণেও পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য কৃতকার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়।'

'মহারাজ, আপনি কি পূর্ব্বে শুনিয়াছেন নন্দক নামক যক্ষ স্থবির সারিপুত্রকে পীড়ন করিয়া ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল?'

'হাঁ, শুনা যায়; লোকে ইহা প্রকটিত আছে।'

'মহারাজ, নন্দক যক্ষ যে মহাপৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া গ্লানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্থবির সারিপুত্রের কি তাহা অভিপ্রেত ছিল?'

'যদি এই সদেব লোক বিপর্য্যস্ত হয়, যদি চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীতে পতিত হয়, ও যদি পর্ব্বতরাজ 'সিনেরু' (মেরু)কে বিকীর্ণ করা যায়, তথাপি স্থবির সারিপুত্র অন্যকে দুঃখ প্রদানে সম্মত হন না। কি হেতু? যেহেতু যে কারণে স্থবির সারিপুত্র কাহারও প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন, বা কাহাকেও নিন্দা করিতে পারেন না, তাঁহার শরীর হইতে সেই কারণ সমুচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই কারণ অপকৃত হওয়ায় স্থবির সারিপুত্র প্রাণহরণকারীরও প্রতি কোপ করিতে পারেন না।'

'যদি স্থবির সারিপুত্র, মহারাজ, নন্দক যক্ষের মহাপৃথিবীতে প্রবেশজনিত গ্লানিতে সম্মত না ছিলেন, তবে নন্দক যক্ষ মহাপৃথিবীতে প্রবেশ করিবে কেন?'

'তাহার অকুশল কর্ম্ম বলবৎ হওয়ায়।'

'মহারাজ, অকুশল কর্ম্ম বলবৎ হওয়ায় যদি নন্দক যক্ষ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে যিনি গ্রহণ করেন না---(যাঁহার সম্মতি থাকে না), তাঁহারও জন্য কৃতকার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। সেই জন্যই, কুশল কর্ম্ম বলবৎহেতু, অগ্রহীতারও জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়। এ কারণেও মহারাজ, পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়।

'মহারাজ, এখানে কতজন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে? আপনি কি সে বিষয়ে কিছু শ্রবণ করিয়াছেন?'

'হাঁ, পূজনীয়; তাহা শুনা যায়।'

'মহারাজ, তাহা আমাকে শ্রবণ করান ত।'

"মানবিকা 'চিঞ্চ,' শাক্য 'সুপ্পবুদ্ধ' (সুপ্রবুদ্ধ), স্থবির 'দেবদত্ত', যক্ষ 'নন্দক,' ও মানবক 'নন্দ,'--শুনা যায় এই পাঁচজন পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।'

'কোথায় তাঁহারা অপরাধী হইয়াছিলেন?'

'ভগবান্ ও শ্রাবকগণের নিকট।'

'মহারাজ, তাহারা পৃথিবীতে প্রবেশ করুক,--এই বলিয়া ভগবান্ বা শ্রাবকগণ কি সম্মত ছিলেন?'

'না, মাননীয়।'

'মহারাজ, পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত তথাগত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত কার্য্য অবন্ধ্য ও সফল হয়।'

'মাননীয় নাগসেন, আপনি আপনার নিকট উপস্থাপিত গম্ভীর প্রশ্নকে বিবৃত করিয়া সুন্দর বুঝাইয়া দিয়াছেন,--দেখাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন হইয়াছে। আপনি গহনকে অগহন করিয়াছেন। পরকীয়বাদ নষ্ট, কুদৃষ্টি (কুমত) ভগ্ন, ও কুতৈর্থিক সমূহ, হে গণীশ্রেষ্ঠ,* আপনার নিকট নিষ্প্রভ হইয়াছে!'

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

* এক একটী 'গণ' বা যৌদ্ধাদি সমূহের নায়ককে 'গণী' বলে।

শ্রীযুক্ত ত্রিভুবন দাস নরোত্তম দাস মালবী, এম, এ, এল, এল, বী,

সুরাট কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

Kuntaline Press, Calcutta.

না! কেবল নাচিয়ে দিতেই পারেন। কথায় বলে, 'জলমে রহ্‌কে মগর সো বৈর' (জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত শক্রতা)। আগে নিজেরাই সাহেব সাজ্‌লেন, হোটেলে খেলেন, চুরুট ফুঁকলেন, এখন 'নেজামুড় খেয়ে ধর্ম্মে দিয়েছেন মন,' কিনা স্বদেশী সেজেছি। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, এ আবার ছাই কি কথা? বন্দেপিতরম্ বল্লেও বা কিছু মানে হতো। চিরকাল বর্গীর ভয়ে পেটের পীলে চমকেছে, এখন শিবাজী হলেন আপনার লোক। এ দেশের লোক বেশ বাবা! কোন হুজ্জত হাঙ্গামে নেই, পোড়া বাঙ্গালীর সব বাড়াবাড়ি।" এই শ্রেণীর প্রবাসিনীরা বলেন, "কি বাবু! স্বদেশী কাপড় দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, মোটা খস্‌খসে পরলে পরে গায়ে যেন ছড় যায়। একখানা কাপড় এক মনের বোঝা। আবার গুণ কত! ধোপার বাড়ী গেলে, 'কিনারীর' (পাড়ের) রঙ্গ উঠে যায়। ওসব স্বদেশী ওদেশী কিচ্ছু থাকবে না। ইংরেজের সঙ্গে লাগা, ওরা হ'ল দেবতার জাত, ওদের সঙ্গে পারবে? কথায় বলে, 'যার খাই তার গাই'। তা বাঙ্গালী এমন জাত যে, নুনের গুণ মানে না গা! রাজার দেশ, তা সে দু'খানাই করুক আর চারখানাই করুক, তাতে আমার তোমার কি?" প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত প্রবাসীরা বঙ্গবিভাগে কোন ক্ষতি না মনে করিলেও, কেহ কেহ স্বদেশীর পক্ষপাতী হইয়াছেন।

প্রবাসিনী।

প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ।

(ইতিহাসের শিক্ষা।)

(১)

জীর্ণ চীরপরিহিত পর্ণকুটীরবাসী নিরন্ন ব্যক্তি হইতে রাজমুকুটধারী স্বর্ণসিংহাসনারূঢ় পৃথ্বীপতি পর্য্যন্ত কাহারও নিস্তার নাই—প্রকৃতির প্রতিশোধ, দেবতার দণ্ড সকলকেই স্পর্শ করে। জীবনে হউক, জীবনান্তে হউক, বিধাতার অভিসম্পাত অপরাধীর অদৃষ্টের মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টি সকল সময়ে তীব্র অনলশিখা দেখিতে পায় না, তাই কখন কখনও মনে হয় যে পরমেশ্বরের অপক্ষপাত বিচারেও অপরাধী নিষ্কৃতি লাভ করে—অপরাধীর চিতাভস্মের সহিত তৎকৃত অপরাধও চিরবিলুপ্ত হইয়া যায় —স্বর্গের বিচারমণ্ডপে পাপ-পুণ্যের হিসাব-নিকাশের খাতায় উহা বাদ পড়ে।

কিন্তু ইহা একটী নিদারুণ ভ্রম। ইতিহাস অতীতের জ্ঞান-বৃদ্ধ সাক্ষী—বর্ত্তমানের বিচক্ষণ শিক্ষক ও ভবিষ্যতের অতিস্থির অচঞ্চল পথপ্রদর্শক। সেই ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে—

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্ বুধাঃ।

মনু—৭।১৯।

ধর্ম্ম অক্ষয়—তাহার বিনাশ নাই। চির সুষুপ্তিমগ্ন ধরাতলে দণ্ডই জাগরণ। তাই ঋষিবাক্য দণ্ডকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছে। দণ্ড যে মহা জাগরণ তাহা আমরা এখন বেশ বুঝিতে শিখিয়াছি।

সুদূর আফগানিস্থানের দুর্ভেদ্য শৈলমালার অন্তরাল হইতে একদিন মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজি হজরৎ মহম্মদের পতাকা লইয়া স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। বিধিদত্ত কুরূপ দর্শনে মহম্মদ ঘোরী যাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই—দিল্লির রাজপথে ভ্রমণ করিয়া যিনি জীবনের দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তবুও কুতব-উদ্দীনের আশ্রয়লাভ করিতে পারেন নাই, অবশেষে ঔঘল্ বেগ নামক কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যাঁহার কর্ম্মকুশলতা, সাহস এবং শক্তি দর্শনে পুলকিত হইয়া বিধিপ্রদত্ত কুরূপ উপেক্ষা করিয়াছিলেন—সেই বক্তিয়ার খিলিজি প্রথমে বেহারে এবং পরে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার অংশবিশেষে বিজয়লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার রণোন্মত্ত সৈন্যগণ নদীয়ার ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া যখন পরিতৃপ্ত হইল, বক্তিয়ার তখন বীরদর্পে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যলাভেচ্ছা এতই প্রবল হইয়াছিল যে তিনি দুর্গম তিব্বতে পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। রাজ্যবিস্তারকামনায় বক্তিয়ার এতই অন্ধ হইয়াছিলেন যে নিজের সৈন্য-সামন্তদিগের

সুখ-সুবিধাও দেখিতেন না। তাঁহার স্বার্থের মন্দিরতলে যে কত হতভাগ্য অকালে আত্মবলি দিয়াছিল তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। কিন্তু সেই সকল হতভাগ্যদিগের দীর্ঘশ্বাস—তাহাদিগের অনাথ পুত্র, অনাথিনী পত্নী প্রভৃতির অশ্রুধারা বৃথা যায় নাই! প্রবল পরাক্রান্ত বক্তিয়ার যখন কুচবেহার হইতে দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন আলিমর্দ্দনের শাণিত ছুরিকা তাঁহার হৃদয়শোণিত পান করিয়াছিল।*

বক্তিয়ারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। হত্যাকারী আলিমর্দ্দন পলায়ন করিয়া দিল্লির সিংহদ্বারে যাইয়া উপনীত হইলেন। বাদশাহ কুতবউদ্দীন তখন দিল্লি হইতে গজনি অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন; আলিমর্দ্দন তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

বক্তিয়ারের মৃত্যুর পর তাঁহার সুবিখ্যাত সেনাপতি মহম্মদ শেরাণ লক্ষ্মণাবতীর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন টেঁকে নাই। আলিমর্দ্দনের প্ররোচনায় কুতবউদ্দীনের বিপুল বাহিনী বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হইল। তখন হোসেনউদ্দীন নামক একজন পাঠান গঙ্গোত্রীর শাসন কর্ত্তা ছিলেন। নিজ স্বার্থসিদ্ধি জন্য তিনি রাজসৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন, কিন্তু অন্যান্য পাঠান সেনাপতিগণ রুমীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুচবেহারে পলায়ন করিলেন। একদিন তাঁহাদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল—মহম্মদ শেরাণ সেই কলহকালে নিহত হইলেন! বক্তিয়ারের সুখ-দুঃখের, বিপদ-সম্পদের, পাপ-পুণ্যের সহচর কর্ম্মফল ভোগ করিলেন।

যখন পথ নিষ্কণ্টক হইল তখন আলিমর্দ্দন আসিয়া দেবকোটের মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু যে দিন তিনি শুনিলেন যে সুলতান কুতবউদ্দীন আর জীবিত নাই, তিনি সেই দিনই নিজেকে একান্ত স্বাধীন বিবেচনা করিয়া সুলতান আলাউদ্দীন নামে বঙ্গের বাদশাহ হইয়া বসিলেন। মসনদে বসিয়া তাঁহার ঔদ্ধত্য এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে নিরপরাধ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও খিলিজি ভদ্রগণ প্রতিদিন নিহত হইতে লাগিলেন! আলিমর্দ্দন তখন মনে করিতেছিলেন যে তিনিই দুনিয়ার মালেক—পারস্য বা খোরাসান বা দিল্লির বাদশাহগণ অতি নগণ্য সকলেই তাঁহার পদানত! কিন্তু নবীন সুলতানের ভরা তখন পূর্ণ হইয়াছিল; দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিতে না করিতেই গুপ্তহন্তার সুশাণিত ছুরি তাঁহার সকল সাধে বাদ সাধিল—বক্তিয়ারের তৃষিত আত্মা শান্তিলাভ করিল!

তারপর অনেকদিন গেল; নসীরুদ্দীন, তোঘল খাঁ, জালালউদ্দীন প্রভৃতি অনেকে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং জলবুদ্বুদের ন্যায় কালস্রোতে মিশিয়া গেলেন। শেষে খ্রীঃ ১৪৯১ সালে সুলতান ফিরোজ বাঙ্গালার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারূপে দানে ও দয়ায় লোকপূজ্য হইয়া মসজেদ এবং মিনারেটে গৌড়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র মহম্মদশাহ পিতার সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। রাজমন্ত্রী হাবিশ খাঁ রাজার জন্য শুধু শূন্য সিংহাসন ভিন্ন আর কিছু রাখেন নাই! অন্যান্য রাজ-অমাত্যগণ স্থির করিলেন যে হাবিশ খাঁকে অপসৃত করিবেন। সিদ্দি বদ্দর দেওয়ানা নামক একজন অমাত্য রাজমন্ত্রীকে নিহত করিলেন; তখনও তাঁহার হৃদয়ে লোভ আসে নাই। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে আর একপদ অগ্রসর হইলেই একেবারে সিংহাসনে যাইয়া বসিতে পারা যায় তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া হাবিশ খাঁর রুধির-রঞ্জিত খড়্গে নৃপতি মহম্মদ শাহের নিরপরাধ শির ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন! কিন্তু তাঁহার শাসনকৌশলে রাজ-অমাত্যগণ এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে একদিন নিশাযোগে হত্যাকারিগণ তাঁহাকে নিহত করিল! রাজমন্ত্রী সৈয়দ হোসেন এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিলেন।

সিংহাসন কখনই শূন্য থাকে না—মহম্মদ শাহের শোণিত-সিক্ত সিংহাসনে সৈয়দ হোসেন আসিয়া বসিলেন। তিনি ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মক্কার শরিফ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ গৌড় লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সৈয়দ হোসেন অবশেষে দেখিলেন যে লুণ্ঠন নিবৃত্ত না করিলে গৌড়ে আর কিছু থাকে না! তিনি নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিলেন। লুণ্ঠন-লুব্ধ উন্মত্ত সৈন্যগণ

* A few days after his arrival at Deocote in Bengal, he sank under the pressure of his calamities, amidst the execration and curses of the orphans and widows of the *soldiers who had fallen a sacrifice to his insatiable ambition*—History of Bengal, C. Stewart.

সে আদেশ মানিল না—রুধির স্রোতে গৌড় জনপদ ভাসিয়া গেল, দেশে হাহাকার উঠিল। ক্রুদ্ধ সুলতানের আদেশে তখন দ্বাদশ সহস্র (!) সৈনিকের শির ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল!*

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিধাতার বজ্র তাঁহাকে এ জগতে স্পর্শ করিল না বটে কিন্তু উহা নিষ্ফল হইল না। রাজার শোণিত—দ্বাদশ সহস্র সৈনিকের শোণিত প্রতিদিন প্রতিশোধের জন্য কাঁদিতে লাগিল। হোসেনের পুত্র নসরৎ শাহ নৃপতি হইয়া একদিন পিতার সমাধি-মন্দিরতলে প্রণাম করিতে যাইয়া একজন খোজা দাস কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। পুত্রের শোণিতে পিতার সমাধি-মন্দির সিক্ত হইয়া গেল! হোসেনের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ শাহ বঙ্গের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত হইলেন—রাজধানী শত্রুহস্তে নিপতিত হইল—তাঁহার পুত্র দুইটীও পাঠানের খড়্গে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল! রাজ্যচ্যুত পুত্রকলত্রহীন হোসেন ভগ্নহৃদয়ে অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতির ইতিহাস চিরবিলুপ্ত হইয়া গেল!

বাদশাহ হুমায়ুন তখন বঙ্গপ্রবেশের সিংহদ্বার গুলির সন্ধান পাইয়াছেন; বিপুল বাহিনী লইয়া তিনি গৌড়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। গৌড়বাসিগণ মহানন্দে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল—মস্‌জেদে মস্‌জেদে তাঁহার জয়গান ধ্বনিত হইতে লাগিল। বীর শের শাহ তাঁহার পথরোধ করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। তখনও মোগলের দিন আসে নাই; কনৌজে মোগল ও পাঠানে সাক্ষাৎ হইল—হুমায়ুন কোন প্রকারে পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিলেন—পাঠানরাজধানী আরও কিছুকাল বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শের শাহকে অমর করিয়া দিল।

পাঠান দুইশত ছত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় রাজত্ব করিয়াছিল। দুর্দ্ধর্ষ মোগল এই দীর্ঘকাল একেবারে নীরব ছিল না—সময় পাইলেই পাঠানদিগকে বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিত। প্রাতঃস্মরণীয় বাদশাহ আকবর যখন মোগল-সিংহাসনে বিজয়গৌরবে অধিষ্ঠিত, তখন পাঠানরাজ সলিমন গৌড় হইতে পাঠানরাজধানী উঠাইয়া আনিয়া তন্দায় উহা স্থাপিত করিলেন। সমগ্র বেহার ও বঙ্গভূমি তাঁহার চরণ-চুম্বন করিল, তিনি উড়িষ্যাবিজয়ে অগ্রসর হইলেন।

সুলতান ইব্রাহিম অতি অল্পকালের জন্যই মোগল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে সুলতানকে অবশেষে উড়িষ্যায় বাস করিতে হইয়াছিল। সলিমন উড়িষ্যায় যাইয়া একটী সভা আহ্বান করিলেন। সুলতান ইব্রাহিমও সেই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; স্বার্থান্ধ সলিমন ইব্রাহিমকে আত্মকবলে পাইয়া হীন দস্যুর ন্যায় হত্যা করিলেন!*

সলিমনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দাউদ খাঁ যখন বাঙ্গালার নৃপতি হইলেন তখন বাদশাহ আকবরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। মোগল সেনাপতি মৈনম খাঁ সসৈন্যে পাটনার নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। দাউদের প্রধান সচিব লোদি খাঁ মৈনমের সহিত কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধ করিয়া শেষে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ মোগল স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর কণ্টকমুক্ত দাউদ লোদি খাঁর যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং অবশেষে তাঁহারই শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উপকারের প্রত্যুপকার করিলেন!

আকবরের সহিত দাউদের গোলযোগ মিটিল না। নানারূপে পর্য্যুদস্ত হইয়া দাউদ একদিন স্বীয় মুক্ত তরবারি মোগল সেনাপতির করে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি শপথ করিলেন আমরণ মোগলের বন্ধু থাকিবেন।

দাউদ খাঁ অধিক দিন আত্মপ্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই; মোগল সেনাপতি মৈনম খাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

* The privilege of plundering the city having been carried further than the Syed intended, he ordered the soldiery, after some days, to desist; but finding his orders disobeyed, *he caused twelve thousand of them to be put to death*, and seized all fruits of rapine.—Stewart's History of Bengal.

* But the conquest was stained by an act of the grossest treachery; for having invited to a conference Sultan Ibrahim, who for a short period had been Emperor of Delhy,......*he basely assasinated him.*—Stewart's History of Bengal.

করিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ, দেবতার দণ্ড দাউদখাঁকে নিষ্কৃতি দিল না—তাঁহার ছিন্ন শির আগ্রার রাজসিংহাসন-তলে প্রেরিত হইল! দাউদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পাঠান-রবি অস্তমিত হইয়া গেল—দুই শতাব্দীর সুদৃঢ় সিংহাসন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল—সুলতান ইব্রাহিম ও লোদি খাঁর আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিল!

(২)

যাহা সত্য তাহাই সনাতন ও সর্ব্বকালব্যাপী। ইতিহাস অঙ্গুলী নির্দ্দেশে যাহা দেখাইয়া দিতেছে তাহা সেই সনাতন সত্য। দেশ বা জাতি বা সমাজ বিভিন্ন হইলেও ঐতিহাসিক সত্য বিভিন্ন নহে। সিজরের অপঘাত মৃত্যু বা ইংলণ্ডেশ্বর জনের ম্যাগ্‌নাকার্টা স্বাক্ষর, টমাস বেকেটের হত্যা বা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদন, নিহিলিষ্ট কর্ত্তৃক সমগ্র রুষিয়ার জারের পতন বা গই ফক্সের গন্ পাউডার প্লট কিম্বা মহাশক্তিধর নেপোলিয়নের সেন্ট-হেলেনা দ্বীপে মহাপ্রস্থান ও যোসে-ফাইন নিগ্রহ অথবা ফরাসী লুইয়ের রাজত্বকালে বিশ্ব-নাশকারী প্রজাশক্তির তীব্র উন্মত্ততা এ সমস্তই আমাদিগকে সেই একই সত্যের দিকে লইয়া যায়—আমাদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে প্রকৃতির প্রতিশোধ অবশ্যম্ভাবী. দেবতার দণ্ড চির-জাগ্রত—উহা কাহাকেও ক্ষমা করে নাই, কাহাকেও ক্ষমা করিবে না—রাজা, প্রজা, সমাজ কাহারও নিস্তার নাই!

দুৰ্দ্ধর্ষ তৈমুর যখন শুনিলেন যে ভারতীয় নৃপতিবর্গ পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠ কাটিবার জন্য উদ্‌গ্রীব—ভারতে একতার বন্ধন নাই, দেশের জন্য স্বার্থ-বলি নাই, পরের জন্য আত্মজয় নাই তখন বিধাতার বজ্র স্বরূপ তিনি সসৈন্যে সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সে দুর্দ্দমনীয় গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। তৈমুর যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন তাঁহার পশ্চাতে কেবল রুধির-স্রোত বহিতে লাগিল—চিতাধূমে ভারতের নীলাকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল! কিন্তু তৈমুর অবশেষে ভারতবর্ষকে আপনার করতলগত রাখিতে পারেন নাই—ভারতের ধনরত্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল।

যে নাদির শাহের কথা মনে হইলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যাঁহার লুণ্ঠনে ও হত্যাকাণ্ডে ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়াছিল, তিনিও আপন পাপের উপযুক্ত দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন; পারস্যের শুষ্ক ভূমি তাঁহার শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল—গুপ্তহন্তার সুশাণিত কৃপাণ যেন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল!

আপন স্বার্থের জন্য নরহত্যা ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। ইতিহাস ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর পাপকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। সেলিম যখন জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত হইয়া ভারতসম্রাট আকবরের পবিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন তাহার অল্পকাল পরই সম্রাটপুত্র খস্রু কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া পিতৃসিংহাসনের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। নিজের দলে লোক জুটাইবার জন্য তিনি অকম্পিত চিত্তে নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।*

মানুষ যখন প্রথমে ক্ষিপ্ত হয় তখন তাহার হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, উন্মত্ততার অনল প্রশমিত হইলে সে তখন নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখে। খস্রুও দেখিলেন। তিনি একান্ত বিষন্ন চিত্তে দেখিলেন—

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায়! হায়! কেহ কার নয়।"

সুসময়ের বন্ধুগণ তখন অনেকেই খস্রুকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। অবশেষে পিতৃদ্রোহী খস্রু সুবর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কয়েকজন বন্দী অনুচরসহ পিতার সমক্ষে আনীত হইলেন।

খস্রুর করুণ নিবেদন উপেক্ষা করিয়া জাহাঙ্গীর সেই সকল বিদ্রোহীদিগকে একে একে নিতান্ত নিগৃহীত করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। খস্রুর চক্ষের সম্মুখে সেই সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিতে লাগিল! তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। তিনি কারামধ্যে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনুচরদিগের দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য বাদশাহের আদেশে তাঁহাকে প্রতিদিন কারার বাহিরে রাজধানীর রাজপথে আসিতে হইত! তিনি রোদন করিতে করিতে রাজপথ বহিয়া চলিতেন আর পথিপার্শ্বস্থ শতাধিক সুতীক্ষ্ণ

* Those who refused, were, without mercy, put to the sword, after being plundered of all their effects.—Dow's Hindustan.

শূলোপরি তাঁহার জীবন-মরণের বন্ধুগণ প্রাণ বিসর্জ্জন করিত! নিরুপায় শৃঙ্খলাবদ্ধ খস্রু বাষ্পাকুললোচনে দেখিতেন যে তাঁহাকে প্রাণপণে ভালবাসিয়াই তাঁহার বন্ধুবর্গ, কেহ বা শূলে, কেহ কৃপাণাঘাতে, কেহ বা সদ্য আনীত গোচর্ম্ম মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রৌদ্রতপ্ত রাজপথে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে! পিতা যদি বিদ্রোহী পুত্রকে এরূপ দণ্ড না দিয়া বধ করিতেন তাহা হইলেও হয়ত খস্রু অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিতেন।

কিছুকাল পর জাহাঙ্গীর শুনিলেন যে বিদ্রোহিগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে। লোকে সেই কুমন্ত্রণার সহিত খস্রুর নামও সংযুক্ত করিয়া দিল। খস্রু প্রতিদিন পিতার চক্ষে তীক্ষ্ণ শল্যসদৃশ হইতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গীরের দেহ তখন শের আফগানের তরলশোণিতে রঞ্জিত— শের আফগানের অতৃপ্ত আত্মা তখন জাহাঙ্গীরকে ঘিরিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য ফিরিতেছে। এদিকে আবার খস্রুর পিতৃদ্রোহের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্তকালও সমাগত হইল। জাহাঙ্গীর প্রতিদিন পুত্রের জন্য নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইতে লাগিলেন। এমন সময় এক দিন সংবাদ আসিল যে খস্রু নিহত হইয়াছেন! পিতৃদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত হইল বটে কিন্তু বৃদ্ধ জাহাঙ্গীরের তখন আরও অনেক সহ্য করিবার ছিল! তিনি সম্রাট হইয়া আশ্রিতের পত্নী লাভেচ্ছায় পতিকে নিহত করাইয়াছিলেন, সুতরাং এক পুত্রশোকরূপ বজ্র জাহাঙ্গীরের জন্য যথেষ্ট হয় নাই।

খস্রুর মৃত্যু-সংবাদে জাহাঙ্গীর একান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি কবর হইতে পুত্রের মৃতদেহ তুলিয়া পরীক্ষা করিলেন; শেষে যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে শাজেহানই ভ্রাতৃহন্তা, তখন জাহাঙ্গীরের জীর্ণহৃদয়ে যে কি বিষম আঘাত লাগিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। জাহাঙ্গীর শাজেহানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহাধিক্যই তাঁহার মর্ম্মযাতনা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

পরস্ত্রীকামীর দণ্ড মহাগ্রন্থ রামায়ণ আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসও পুনরায় দেখাইতেছে। জাহাঙ্গীর শোকে মুহ্যমান কিন্তু চর আসিয়া সংবাদ দিল প্রাণাধিক প্রিয় শাজেহান তাঁহারই শির লক্ষ্য করিয়া খড়্গ তুলিয়াছেন! পাপিনী মেহের-উন্-নিসা—জাহাঙ্গীরের নয়নের মণি 'নূর মহাল' নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন, তিনি নূর মহালের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। শেষে পিতাপুত্রে ঘোরতর মনোমালিন্য ও সমর উপস্থিত হইল! জাহাঙ্গীরের অদৃষ্টে আরও ছিল। এক দিন সংবাদ আসিল যে প্রিয়তম পুত্র পার্বেজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন! তার পর এমন দিনও আসিয়াছিল যখন মোগল বাদশাহ আপন পটাবাসে আপনিই বন্দী হইয়াছিলেন।

মেহের-উন্-নিসার কি হইল? ইতিহাস সে কাহিনীও কহিতেছে। যে বালিকা একদিন বালুময় মরুভূমে প্রস্ফুটিত স্থলকমলবৎ শোভা পাইয়াছিল, যাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া হতভাগ্য শের আফগান জাহাঙ্গীরের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিল—সেই মেহের-উন্-নিসা যখন রাজধানীতে আনীতা হইলেন তখন জাহাঙ্গীরের রূপতৃষা যেন মিটিয়া গিয়াছিল। তিনি মেহেরের সহিত সাক্ষাতই করিলেন না! মেহেরের হৃদয়ে তখন দিল্লীশ্বরী হইবার বাসনা ভীমবেগে জ্বলিতেছিল। মেহের-উন্-নিসার বাসের জন্য বেগম মহলের একটী অতি নিকৃষ্ট কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল—বাদশাহের আদেশে সুন্দরী মেহের দৈনিক চৌদ্দ আনা করিয়া মুশাহারা পাইতে লাগিলেন! স্বয়ং দিল্লীশ্বর এক দিন যাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন তাহার দৈনিক মুশাহারা চৌদ্দ আনা!

মায়াবিনী তখন কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিল। জাহাঙ্গীরের জননী পুত্রকে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সম্রাট তত্রাচ মেহেরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কি ঘৃণা! কি লজ্জা! পদদলিতা নাগিনীর ন্যায় মেহের জ্বলিতে লাগিলেন।

মেহের-উন্-নিসা তখন শিল্পকলার সাহায্যে জীবনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কারুকার্য্যের প্রশংসায় সমগ্র দিল্লি ও আগ্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল। চারি বৎসরে তাঁহার প্রভূত আর্থিক স্বচ্ছলতা ঘটিল। তাঁহার দাস দাসীগণ সুন্দর পরিচ্ছদসমূহ পরিধান করিয়া পুরীমধ্যে বিচরণ করিত, কিন্তু তিনি নিজে সামান্যা রমণীর ভূষণে সজ্জিতা থাকিতেন।

কাল ক্রমে তাঁহার গুণপণার কথা জাহাঙ্গীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কৌতুহলী হইয়া মেহের-উন্-নিসাকে দর্শন দিতে গেলেন। দর্শন মাত্রেই জাহাঙ্গীরের চারি বৎসরের

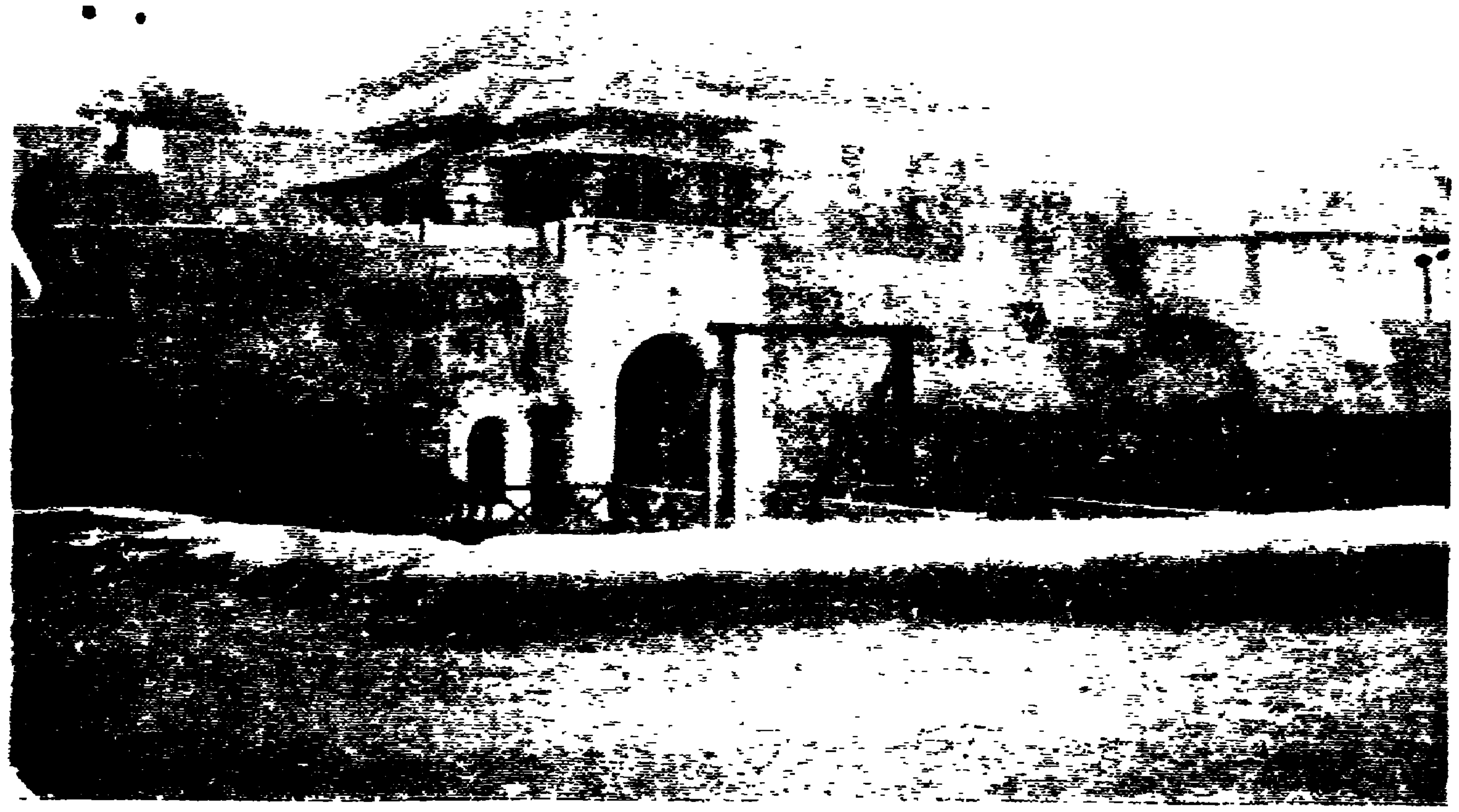

দুর্গ।

খাজে বিবন সাহেবের সমাধি ও মীনারস্তম্ভ।

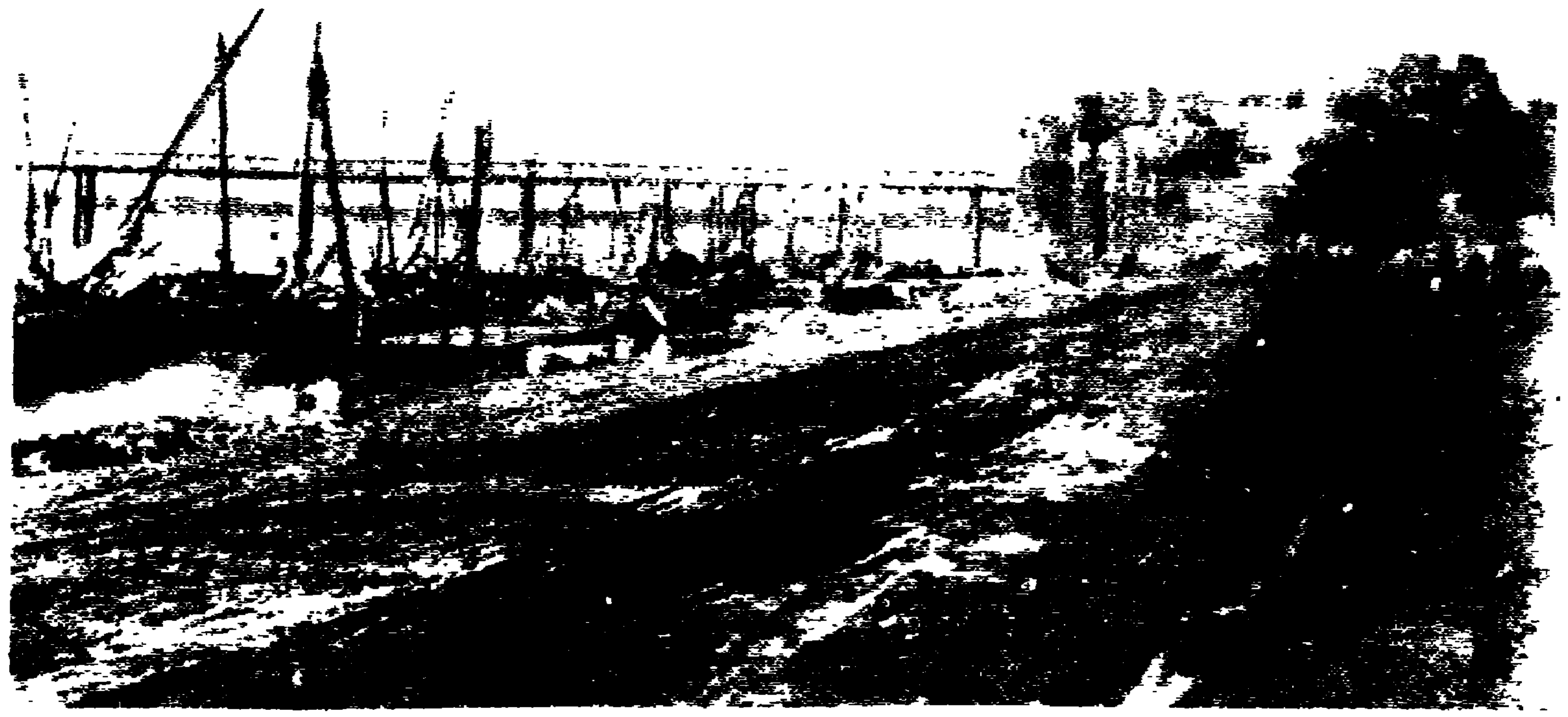

দুর্গ, "হোপ্" পুল ও ডেঙ্কা বন্দর।

গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল

প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল;—ভাগীরথীতরঙ্গে যেমন একদিন ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল সেইরূপ। সেই দিন হইতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া নূরজাহানের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিতেন।

হায় শের আফগান! তাঁহার প্রেতাত্মা কি মেহেরের দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে নাই? পাপ যখন পূর্ণ হইল—যখন কালসাপিনীর তীব্র নিশ্বাসস্পর্শে বাদসাহের কুসুমকুঞ্জ শুকাইতে লাগিল, তখন উন্নতহৃদয় মহব্বতের কৌশলে নূরজাহান বন্দিনী হইলেন! যে জাহাঙ্গীরের চরণ-তলে আত্মবিক্রয় করিয়া শের আফগানের মেহের-উন্-নিসা নূরজাহান রূপে ভারতেশ্বরী হইয়াছিলেন সেই জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন!

কুহকিনী আসিয়া সাশ্রুনয়নে জাহাঙ্গীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাদশাহের আর সহ্য হইল না। তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন "মহব্বত, ইহাকে কি তুমি মার্জ্জনা করিতে পার না? আহা, দেখ, দুই নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে!" নূরজাহান সেবারকার মত রক্ষা পাইলেন। পরে আবার তিনি স্বভ্রাতার হস্তেই বন্দিনী হইয়াছিলেন!

জাহাঙ্গীরের পর শাজেহান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পিতৃদ্রোহী স্বজনঘাতী শাজেহান আপনার কর্ম্মফল বিধিমত ভুগিয়াছিলেন। তাই একদিন তিনি বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—'পুত্র কর্ত্তৃক পিতা অনেকবার সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের দিনে পিতার অপমান শুধু ঔরঙ্গজেবের জন্যই সঞ্চিত ছিল!'

সুচতুর ঔরঙ্গজেব যখন কৌশলে সিংহাসনারোহণ করিলেন তখন বৃদ্ধ শাজেহান বন্দী। মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জনে আগ্রানগরী বিকম্পিত হইতে লাগিল; জনসঙ্ঘ যখন বিজয়নিনাদে নবীন সম্রাটের আবাহন গান গাহিতে-ছিল তখন শাজেহান অশ্রুসিক্তবদনে তাঁহার স্নেহময়ী দুহিতাকে কহিলেন—'জাহানারা, দেখ ত আজি অকস্মাৎ এত আনন্দধ্বনি কিসের? উহা জানিয়াই বা আমাদের কি ফল? যাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাদের হর্ষ কেবল আমাদের বিষাদকেই আরও বাড়াইয়া তুলিবে। বুঝি দারার কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। জাহানারা, অমন করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিও না, কি জানি, তোমার প্রাণোপম সহোদরের ছিন্ন শির হয় ত নয়নে পড়িতে পারে। * * * * জাহানারা, নবীন সম্রাট অসময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য পাপকর্ম্মের সহিত পিতৃহত্যা সংযুক্ত হইলেই ঠিক হইত!' হায় হতভাগ্য পতিত সম্রাট! ধর্ম্মের চক্ষু কখনও মুদ্রিত হয় না—বিধাতার বজ্র ব্যর্থ নহে—এইরূপেই প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ ঘটিয়া থাকে! তাই ঐতিহাসিক কহিতেছেন—"The means by which Shaw Jehan obtained the empire of the Moguls, were not more justifiable than those which he so much blamed in Aurungzeb."*

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস উপন্যাসময়। দারার পিতৃস্নেহ, জাহানারার ভালবাসা, ঔরঙ্গজেবের ক্রূর স্বার্থ-সন্ধান,—নাদিরা বানুর পতিপ্রেম, পিয়ারে বানুর নারীধর্ম্ম-রক্ষা, সুজার পতন প্রভৃতির সংমিশ্রণে ঔরঙ্গজেবের কাহিনী একান্ত কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন কোন বিখ্যাত কাল্পনিক কবি লোকশিক্ষার জন্য নানাবিধ চরিত্র লিখিয়া ঔরঙ্গজেবের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। এক সঙ্গে এত বৈচিত্র্যময় সত্যের সমাবেশ সহসা দৃষ্ট হয় না।

গৃহবিতাড়িত স্বজনপরিত্যক্ত সিংহাসনবঞ্চিত হতভাগ্য দারা প্রাণভয়ে পারস্যদেশে পলায়ন করিতেছেন; তখন প্রাণোপমা পত্নী—সেই ফুলভারাবনতা বল্লরী বিশুষ্কা করি-পদদলিতা মৃত্যুশয্যায় শায়িনী। তাঁহার আর চলিবারও শক্তি ছিল না; পথশ্রমে ক্লান্তা, বিপদে বিশীর্ণা, রোগে দুর্ব্বলা নাদিরা বানু তখন বেশ বুঝিতেছিলেন যে পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। তিনি স্বামীকে পলায়ন করিতে বলিলেন। কহিলেন—'যম আসিয়া শীঘ্রই পার্ব্বেজ-কন্যাকে রক্ষা করিবে; প্রিয়তম, আমি তোমার পথের কণ্টক হইব না।' দারা কোন্ প্রাণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেন? তিনি জিহন খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জিহন বাদসাহ পুত্রকে আশ্রয় দিবার জন্য নিজের প্রাসাদ ছাড়িয়া দিলেন।

সুলতানা তখন একান্ত শক্তিহীনা। দারা সমস্ত নিশা রোদন করিয়া, জাগিয়া কাটাইলেন। প্রভাতে যখন পূর্ব্ব

* History of Hindustan—Dow.

গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল—যখন বিহঙ্গমকুল লতাবিতানে ললিতমধুরে গাহিতে লাগিল—তখন অভাগিনী নাদিরা বান্নুর শেষ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সেই স্বরলহরী মধ্যে মিলাইয়া গেল! হতভাগা দারা বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 'একা আজ আমি একা!' তিনি রাজপরিচ্ছদ ছিন্ন করিলেন, রাজ মুকুট ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন!

সুলতানার শ্মশানে কয়েকদিন মাত্র অতিবাহিত করিতে না করিতেই দারা সংবাদ পাইলেন, যে ঔরঙ্গজেবের সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। ব্যাঘ্র যেমন মৃগের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তাহারাও সেইরূপে দারার অনুসরণ করিতেছিল। জিহন খাঁর নিকট বিদায় লইয়া দারা পলায়ন করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে জিহন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছে। সরলমতি দারা আপনার অশ্ব ফিরাইলেন; মনে করিলেন জিহনের অযাচিত অনুগ্রহের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিবেন।

কৃতঘ্ন জিহন খাঁ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া নিশ্চিন্ত দারাকে বাঁধিয়া ফেলিল! দারা ঘৃণাভরে কহিলেন—'দস্যু এই জন্যই কি আমি তোমাকে দুইবার পিতার ক্রোধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম; যখন মত্ত মাতঙ্গ তোমার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া পিতার আদেশ অপেক্ষা করিতেছিল, আমি কি এই জন্যই সে সময় তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম? ধর্ম্ম আছেন ইহার ফল তোমাকে ভুগিতেই হইবে!'

বন্দীকৃত দারা পুত্রসহ মলিনবেশে দরিদ্রের ন্যায় দিল্লির রাজপথে আনীত হইলেন। যে তাঁহাকে দেখিল সেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ঔরঙ্গজেবের শিরে অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল। কৃতঘ্ন নরকুলকলঙ্ক জিহন ঔরঙ্গজেবের নিকট বখশিস লাভের জন্য আগমন করিল! ঔরঙ্গজেব তাহাকে উচ্চ রাজসম্মানে ভূষিত করিলেন। কিন্তু বিধাতার দণ্ড জিহনকে ক্ষমা করিল না—বিশ্বাসহন্তাকে দেবতা কোন দিন মার্জ্জনা করেন না। ক্ষিপ্ত নাগরিকগণ জিহনের পশ্চাতে অভিসম্পাতের মত ফিরিতে লাগিল। জিহন প্রাণভয়ে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিল। কিন্তু পথিমধ্যেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল—শতছিন্ন পাপ দেহ ভূমিতলে পড়িয়া রহিল! কিছুকাল পর বন্দী শাজেহান দারার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন।

ঔরঙ্গজেব তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকেই সুস্থির থাকিতে দেন নাই। পুত্র মহম্মদ পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া শেষে মরণে শান্তিলাভ করিয়াছিল! সুজার সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সুজা পরাজিত হইলেন। তিনি তখন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পূর্ব্বপরিচিত বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। মোগল সেনাপতি মিরজুমলা সুজার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতেছিলেন। সুজা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করিয়া রাঙ্গামাটীর শৈলশ্রেণীর মধ্যে আশ্রয় লইলেন এবং কোন ক্রমে আরাকানে যাইয়া উপনীত হইলেন। আরাকানরাজ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

কিছুকাল গেল; আরাকানরাজ সুজার ধনরত্ন লাভেচ্ছায় তাঁহাকে নিহত করিবার বাসনা করিলেন। এইরূপ কুকর্ম্মের একটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন বিবেচনায় তিনি রটনা করিলেন যে সুজা আরাকানসিংহাসনের বিদ্রোহী। এদিকে আবার তিনি সুজার কন্যার পাণিপীড়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সুজার নিকট সে সংবাদও প্রেরণ করিলেন। গর্ব্বিত সুজা দূতকে কহিলেন 'তোমার রাজাকে বলিও, তৈমুরের বংশ অপমান সহ্য করে না।'

আরাকানপতি ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সুজাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। তাঁহার সহিত তখন ৪০ জন মাত্র শরীররক্ষীছিল। সুজা বন্দীকৃত হইলেন। রাজার আদেশে মগগণ তাঁহাকে নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিল। আরাকানকারাগারে পিয়ারে বান্নু আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন! সুজার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া হতভাগ্য শাজেহান বলিয়াছিলেন—"Alas! could not the Raja of Arracan leave one son to Suja to revenge his grand father!"*

শরণাগত নিগ্রহে আরাকানের যে মহাপাপ হইল তাহার প্রায়শ্চিত্তকাল আসিতেও অধিকদিন লাগে নাই। ঔরঙ্গজেবের আদেশে মোগলবাহিনী সুজার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় † এবং আরাকাননৃপতি ও ফিরিঙ্গিদিগের

* History of Hindustan—Dow.

† *A generous regret for Suja*, joined issue with an intention to the public benefit, in the mind of Aurungzeb. The cruelty exercised against the unfortunate Prince was not less an object of revenge, than the protection afforded to public robbers.—*Ibid.*

অত্যাচার হইতে পূর্ব্ববঙ্গকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভীমবেগে অগ্রসর হইল। জগদিয়া, আলমগীর নগর, শণদ্বীপ প্রভৃতি স্থান অল্পকাল মধ্যেই মোগলের পদদলিত হইল। যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োন্মত্ত মোগলগণ দুই সহস্র আরাকান সৈন্য ধৃত করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলিল! সমগ্র প্রদেশ মোগল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইয়া গেল! আরাকানের প্রায়শ্চিত্ত হইল!

ঔরঙ্গজেব আত্মীয় শোণিতে রঞ্জিত হইয়া, পিতা পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে একান্ত নিগৃহীত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। জীবনে তাঁহাকে যে কত যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা শত মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়াবহ। যখন আমরা শুনিতে পাই যে দিন-দুনিয়ার মালেক বাদশাহ ঔরঙ্গজেব কহিতেছেন—'আমি শুধু আমার পাপের বোঝা শিরে করিয়াই চলিলাম। একা আসিয়াছিলাম—একাই যাইতেছি'—যখন আমরা শুনিতে পাই যে বাদশাহ কাতর হৃদয়ে কহিতেছেন—'আমি এ রাজ্যের রক্ষক হইতে পারি নাই। আমার সময় বৃথাই কাটিয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়মধ্যে বিবেকদেবতা বাস করিতেন, কিন্তু অন্ধ আমি—তাঁহার পুণ্যকিরণ দেখিতে পাই নাই!'* তখনই আমরা ঔরঙ্গজেবের অন্তর্যাতনা বুঝিতে পারি। শুধু ইহাই নহে; এত করিয়া বাদশাহ যে মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই শক্তি আপন তেজঃ হারাইয়াছিল! বলিতে গেলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই মোগলশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। অধর্ম্মের উপর, শোণিতের উপর যে রাজসিংহাসন স্থাপিত হয় তাহা এইরূপেই চূর্ণ হইয়া যায়—ইহাই প্রায়শ্চিত্তে প্রতিশোধ! বাঙ্গালার ইতিহাস সেই প্রতিশোধ সম্বন্ধে কি প্রমাণ দিতে পারে তাহা আমরা কতক দেখিয়াছি, ভবিষ্যতে আরও দেখিব।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, বি এ।

---

* Tarikh-I-Iradat-Khan—Letters of Aurungzeb as quoted in Elliots' History of India.

পেকিন রাজপুরীর নানা কথা।

চীনদেশের উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকগণ যেমন আট নয় ঘটিকা বেলা না হইলে শয্যাত্যাগ করেন না, বৃদ্ধা মহারাণী বা সম্রাট্ তাদৃশ নহেন। সম্রাটের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজমাতাও অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন, এবং বেলা ৭টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করেন।

বৃদ্ধা মহারাণী যখন নিদ্রা যান তখন একটী পরিচারিকা তাঁহার কক্ষ মধ্যে পাহারা দিয়া থাকে। দুই জন খোজা শয়নকক্ষের দরজায় দ্বাররক্ষক ভাবে নিযুক্ত থাকে, এবং চারি জন খোজা তাঁহার শরীররক্ষক রূপে তাঁহার খাস-কামরায় অপেক্ষা করিতে থাকে। যে পরিচারিকা ও খোজা তাহার শয়নকালে প্রহরীর কার্য্য করে, তাহাদের প্রতিদিনই বদলি হইয়া থাকে। সম্রাজ্ঞীর শয়নকক্ষে ও সিংহাসন-কক্ষে উচ্চপদবিশিষ্ট খোজাগণ ভিন্ন অপর কাহারো যাইবার আদেশ নাই।

বৃদ্ধারাণীর নিদ্রার নিয়মিত সময় নাই এবং তিনি অতি অল্প সময় নিদ্রা গিয়া থাকেন। রজনীযোগে হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যদি আর নিদ্রা যাইতে না পারেন তাহা হইলে, ঘরের বাহির হইয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে তিনি ঘরের বাহির হইয়া স্বভাবের দৃশ্যে মোহিত হইয়া থাকেন, এবং বলেন যে প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য চব্বিশ ঘণ্টাকালই দেখিবার যোগ্য জিনিষ।

রাত্রিকালে অনিদ্রাই হউক বা সুনিদ্রাই হউক প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়াই এক বাটী দুগ্ধ বা এক বাটী পদ্মমূলের মণ্ড পান করিয়া থাকেন। এই পদ্মমূলের ব্যবহার চীনদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত। ইহাকে বলকারক পথ্য রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। তৎপর রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক দরবার গৃহে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইলে প্রথমতঃ তাঁহাকে নবীন সম্রাজ্ঞী ও অন্যান্য মহিলাগণ প্রণাম করিয়া থাকেন। তাহার পর সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে প্রণাম করিলে উভয়ে এক সঙ্গে রাজকার্য্যে মনোযোগ দিয়া থাকেন। সেই সঙ্গে নবীনা সম্রাজ্ঞীগণ ও অপর রাজকুমারীগণ দরবার-গৃহের অন্তরালে থাকিয়া রাজকার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

থাকেন। প্রকাশ্য দরবারের সময় এই তরুণীগণের যাইবার নিয়ম নাই। রাজকীয় কার্য্য শেষ হইলে রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধা মহারাণী রাজপুরীর অন্যান্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

তাঁহার রাজকার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজকীয় উদ্যান হইতে বা রাজপুরীর বাহির হইতে যত ফল পুষ্পাদি উপহার প্রেরিত হইয়াছে সে সমস্ত তিনি নিজে পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং যাহাকে যাহাকে দিতে হইবে স্বয়ং তাহার আদেশ করিয়া থাকেন। যাহা রন্ধন শালায় প্রেরিত হইবে, যাহা সম্রাটকে দিতে হইবে, বা অন্যান্য রাজকুমারীগণের নিকট পাঠাইতে হইবে সে সকলের ব্যবস্থা তিনি প্রত্যহ করিয়া থাকেন। ফল পুষ্পাদির ব্যবস্থা হইলে, পরে তিনি রাজকীয় তাঁত হইতে আনীত পট্টবস্ত্র, এবং রাজপুরীর অভ্যন্তরস্থ কারখানা সকল হইতে প্রস্তুত আসবাবাদি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে অবকাশমত তিনি এক প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত বর্গক্ষেত্রাকৃতি একখানি টেবলের উপর এই খেলা হইয়া থাকে। মেজের উপর পট্টবস্ত্রে ভূমণ্ডল ও পরীরাজ্যের দৃশ্য অঙ্কিত আছে। হস্তীদন্তনির্ম্মিত মনুষ্যাকৃতি একটী গুটিকাকে ভূমণ্ডল হইতে পরীরাজ্যে পৌঁছানই এই খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই মনুষ্যাকৃতি গুটিকা কি ভাবে কত দূর অগ্রসর হইবে তাহা পাশার দানের মত বা জুয়া খেলার গুটিকা নিক্ষেপের মত দান দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। ঐ অস্থিনির্ম্মিত চতুষ্কোণ গুটিকা তিনটী হাতের মধ্যে লইয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া একটা জেড প্রস্তরনির্ম্মিত বাটীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তাহাদের গাত্রের ছিদ্রের সংখ্যানুসারে মনুষ্যমূর্ত্তিটীকে অগ্রসর করান হইয়া থাকে। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী রাজপুরীর অন্যান্য মহিলাগণের সঙ্গে এই খেলা খেলিয়া থাকেন এবং ইহা বাজি রাখিয়া খেলা হয়। দুই জন উচ্চপদস্থ খোজা নিকটে থাকিয়া গুটি চালের হিসাব করিয়া দিয়া থাকে। বৃদ্ধার যদি জীত হয় তাহা হইলে তিনি অন্যের নিকট অর্থ পান না, কিন্তু তিনি নিজে হারিলে অপরকে অর্থ দিতে হয়, তাহা তিনি খুসী হইয়া দিয়া থাকেন। এই ক্রীড়ার আমাদিগের দেশের গোলকধাম বা গোলক ধাঁ ধাঁ খেলার সঙ্গে মিল দেখা যায়। বৃদ্ধা রাণী দিবসে মাত্র দুই বার আহার করেন। তাঁহার আহারের কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহার প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন আহার্য্য দ্রব্যের বিশেষ কোন তারতম্য ও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার প্রাতরাশ বেলা সাড়ে দশ ঘটিকা হইতে বার ঘটিকার মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তিনি আকরোট, বাদাম ইত্যাদি ফল ভাল বাসেন। মদ্য প্রায়ই পান করেন না। সচরাচর গরম দুগ্ধ, চা ও কোন কোন প্রকার ফলের রস পান করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধারাণীর আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই দেখিয়া নব-সম্রাজ্ঞী প্রভৃতি প্রত্যহ তাঁহার আহারের জন্য অপেক্ষা করেন না। কখনও বৃদ্ধা মহারাণী নিজে আহার করিয়া পরে নবীনা সম্রাজ্ঞীদিগকে তাঁহার টেবলস্থ ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ পাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। তাঁহারা অনিচ্ছাসত্বেও খাতিরে পুনরায় আহার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। তিনি প্রাচীন রীতি নীতি ও আদব কায়দার পক্ষপাতী। এই সকল প্রাচীন নিয়মানুসারে যাহাতে সর্ব্বত্র কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কোন মহিলার কোন আচার ব্যবহারের ক্রটি দেখিলে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করাইয়া লইয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে অন্যান্য মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া তিনি স্বয়ং আহার করিয়া আড়ালে গিয়া অবস্থান করেন, তখন অপর মহিলাগণ তাঁহার টেবলের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া আহার করিয়া থাকেন। আহারের পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্য তাঁহাকে দেখাইতে হয়। রৌপ্যাধার রৌপ্যাবরণ যুক্ত পীতবর্ণের মৃণ্ময়পাত্রে তাঁহার আহার্য্য দ্রব্য সকল সজ্জিত হইয়া থাকে। তাঁহার ব্যবহারের জন্য দুইটি রৌপ্য বা স্বর্ণময় শলাকা (chop sticks), দুই খানি চামচ, একটি বাটী, একখানি চীনামাটির রেকাবী ও একখানি পরিষ্কার রুমাল রক্ষিত হইয়া থাকে। তিনি যখন আহার করিতে যাইবেন তখন একজন খোজা চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকে "খাদ্য দ্রব্যের আবরণ উন্মোচিত হউক।" তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাত্রের আবরণ মুক্ত হইবে। আহার সমাপ্ত হইলে পরিচারিকা রৌপ্যাধারে জল ও সাবান লইয়া তাঁহার হাত ধুইবার সাহায্য করিয়া থাকে।

প্রাতরাশ সমাপ্ত হইলে তিনি শয়নকক্ষে গিয়া আরাম করেন। তাঁহার পাঠক তাঁহার আদেশানুসারে বাছা বাছা

গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়া থাকে। কখনও কখনও তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন। শয়নকক্ষে এক কি দেড় ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া অপরাপর মহিলাগণ সহ উদ্যানে ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। কোন কোন দিন এত বিলম্বে উদ্যান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন যে, সায়ংকালীন আহারের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম ও পঞ্চদশ দিবসে রাজপুরীতে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। সেই দিন দরবারগৃহ হইতেই সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য গমন করেন। নাট্যমঞ্চের সম্মুখস্থ প্রাসাদে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীগণ উপবেশন করিলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতাগণ জাঁকজমক-পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম (খ-টেউ) করে, এবং "রাজ্যের শান্তি, উন্নতি এবং সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ইঁহাদিগের দীর্ঘজীবন" কামনা করিয়া তাহারা সে দিনকার ধার্য্য অভিনয় আরম্ভ করিয়া থাকে। দরবার গৃহে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইলে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী নাট্যাভিনয় স্থলেই তাঁহাদের প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বৃদ্ধারাণী মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে মৎস মাংস ভক্ষণ করেন না। মাত্র শাকসবজী আহার করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা রমণীগণের চীনরাজ্যের সর্ব্বত্রই এই প্রকার রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন পর্ব্ব উপলক্ষে রাজবংশের অভিজাত-বর্গকে রাজপুরীতে নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে, এবং সেই সঙ্গে অপর মহিলাগণকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। অল্পবয়স্ক বা অধিকবয়স্ক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বৃদ্ধারাণীকে প্রণাম করিতে হয়। একদা এক নিমন্ত্রণের সময় তাঁহার কোন আত্মীয়ের পাঁচ বৎসর বয়সের একটি বালিকা কিছুতেই বৃদ্ধারাণীকে প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইল না। বালিকাকে তিনি ও তাহার মাতা কত প্রকার বুঝাইলেন কিন্তু সকলই বৃথা হইল। সে অভিবাদন করিল না। বৃদ্ধারাণী এই বালিকার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এমন বেয়াদবি আমি সহ্য করিতে পারি না, ইহাকে শীঘ্র এখান হইতে লইয়া যাও।" তাহাতে বালিকার মাতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন যে, "আপনি এই অবোধ বালিকার উপর রুষ্ট হইবেন না; ইহার অপরাধ ক্ষমা করুন।" বৃদ্ধারাণী উত্তর করিলেন, "তুমি মনে করিয়াছ যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বালক বালিকার অপরাধে বিরক্ত হয়। এত তাহার অপরাধ নহে, এ তোমার অপরাধ, কারণ তুমি ইহাকে আদব কায়দা শিক্ষা দিলে, এ এপ্রকার ব্যবহার করিত না। দুঃখের বিষয় তোমার অপরাধের জন্য এই অবোধ বালিকাকে শাস্তিভোগ করিতে হইল। তোমাকেও এই বালিকার সঙ্গে এখান হইতে যাইতে আদেশ করি।" এই কথার পর সেই পরিবারের সকলকেই রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল এবং ইহার পর বহুদিন যাবত রাজপুরীতে সেই পরিবারের নিমন্ত্রণ বন্ধ ছিল।

রাজপুরীর উদ্যানে একপ্রকার লেবু জন্মে, তাহাকে "বুদ্ধদেবের হস্ত" নাম দেওয়া হইয়াছে। এই লেবু দেখিতে হাতের আকৃতি। ইহা বড় সুগন্ধযুক্ত। সুগন্ধের জন্য স্তূপাকারে ইহা রক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামলাল সরকার।

গোরা।

১২

সে দিন তর্কে গোরাকে অপদস্থ করিয়া সুচরিতার সম্মুখে নিজের জয়পতাকা তুলিয়া ধরিবার জন্য হারানের বিশেষ ইচ্ছা ছিল, গোড়ায় সুচরিতাও তাহাই আশা করিয়াছিল। কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটিল। ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক মতে সুচরিতার সঙ্গে গোরার মিল ছিল না কিন্তু স্বদেশের প্রতি মমত্ব, স্বজাতির জন্য বেদনা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যদিচ দেশের ব্যাপার লইয়া সে সর্ব্বদা আলোচনা করে নাই কিন্তু সে দিন স্বজাতির নিন্দায় গোরা যখন অকস্মাৎ বজ্রনাদ করিয়া উঠিল তখন সুচরিতার সমস্ত মনের মধ্যে তাহার অনুকূল প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। এমন বলের সঙ্গে এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধে কেহ তাহার সম্মুখে কথা বলে নাই। স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় বাঙালী কিছু না কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে; তাহাকে গভীর ভাবে সত্য ভাবে বিশ্বাস করে না; এই জন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই বলুক দেশের প্রতি তাহার ভরসা নাই। কিন্তু গোরা

তাহার স্বদেশের সমস্ত দুঃখ দুর্গতি দুর্ব্বলতা ভেদ করিয়াও একটা মহৎ সত্য পদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইত,—সেই জন্য দেশের দারিদ্র্যকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়াও সে দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল, দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি এমন তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে, তাহার কাছে আসিলে, তাহার দ্বিধাবিহীন দেশভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়ীকে হার মানিতে হইত। গোরার এই অক্ষুণ্ণ ভক্তির সম্মুখে হারানের অবজ্ঞাপূর্ণ তর্ক সুচরিতাকে প্রতি মুহূর্ত্তে যেন অপমানের মত বাজিতেছিল। সে মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

তাহার পরে হারান যখন গোরা ও বিনয়ের অসাক্ষাতে ক্ষুদ্র ঈর্ষাবশত তাহাদের প্রতি অভদ্রতার অপবাদ আরোপ করিলেন তখনও এই অন্যায় ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সুচরিতাকে গোরাদের পক্ষে দাঁড়াইতে হইল।

অথচ গোরার বিরুদ্ধে সুচরিতার মনের বিদ্রোহ একেবারেই যে শান্ত হইয়াছে তাহাও নহে। গোরার একপ্রকার গায়ে-পড়া উদ্ধত হিন্দুয়ানি তাহাকে এখনো মনে মনে আঘাত করিতেছিল। সে একরকম করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল এই হিন্দুয়ানির মধ্যে একটা প্রতিকূলতার ভাব আছে—ইহা সহজ প্রশান্ত নহে—ইহা নিজের ভক্তি বিশ্বাসের মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে—ইহা অন্যকে আঘাত করিবার জন্য সর্ব্বদাই উগ্রভাবে উদ্যত।

সে দিন সন্ধ্যায় সকল কথায় সকল কাজে আহার করিবার কালে, লীলাকে গল্প বলিবার সময় ক্রমাগতই সুচরিতার মনের তলদেশে একটা কিসের বেদনা কেবলি পীড়া দিতে লাগিল—তাহা কোনোমতেই সে দূর করিতে পারিল না। কাঁটা কোথায় আছে তাহা জানিতে পারিলে তবে কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে পারা যায়। মনের কাঁটাটি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সেদিন রাত্রে সুচরিতা সেই গাড়িবারান্দার ছাতে একলা বসিয়া রহিল।

রাত্রের স্নিগ্ধ অন্ধকার দিয়া সে নিজের মনের অকারণ তাপ যেন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোনো ফল হইল না। তাহার বুকের অনির্দ্দেশ্য বোঝাটার জন্য তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু কান্না আসিল না।

একজন অপরিচিত যুবা কপালে তিলক কাটিয়া আসিয়াছে অথবা তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া তাহার অহঙ্কার নত করা গেল না এই জন্যই সুচরিতা এতক্ষণ ধরিয়া পীড়া বোধ করিতেছে ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত হাস্যকর কিছুই হইতে পারে না। এই কারণটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মন হইতে সে বিদায় করিয়া দিল। তখন আসল কারণটা মনে পড়িল এবং মনে পড়িয়া তাহার ভারি লজ্জা বোধ হইল। আজ তিন চার ঘণ্টা সুচরিতা সেই যুবকের সম্মুখেই বসিয়াছিল এবং মাঝে মাঝে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তর্কেও যোগ দিয়াছে অথচ সে তাহাকে একেবারে যেন লক্ষ্য মাত্রই করে নাই;—যাবার সময়েও তাহাকে সে যেন চোখে দেখিতেই পাইল না। এই পরিপূর্ণ উপেক্ষাই যে সুচরিতাকে গভীর ভাবে বিঁধিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাহিরের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় অনভ্যাস থাকিলে যে একটা সঙ্কোচ জন্মে, বিনয়ের ব্যবহারে যে একটি সঙ্কোচের পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সঙ্কোচের মধ্যে একটা সলজ্জ নম্রতা আছে। গোরার আচরণে তাহার চিহ্ন-মাত্রও ছিল না। তাহার সেই কঠোর এবং প্রবল ঔদাসীন্য সহ্য করা বা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সুচরিতার পক্ষে আজ কেন এমন অসম্ভব হইয়া উঠিল? এত বড় উপেক্ষার সম্মুখেও সে যে আত্মসম্বরণ না করিয়া তর্কে যোগ দিয়াছিল, নিজের এই প্রগল্‌ভতায় সে যেন মরিয়া যাইতেছিল। হারানের অন্যায় তর্কে একবার যখন সুচরিতা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন গোরা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে চাহনিতে সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না—কিন্তু সে চাহনির ভিতরে কি ছিল তাহাও বোঝা শক্ত। তখন কি সে মনে মনে বলিতেছিল—এ মেয়েটি কি নির্লজ্জ, অথবা, ইহার অহঙ্কার ত কম নয়, পুরুষমানুষের তর্কে এ অনাহূত যোগ দিতে আসে? তাহাই যদি সে মনে করিয়া থাকে তাহাতে কি আসে যায়? কিছুই আসে যায় না কিন্তু তবু সুচরিতা অত্যন্ত পীড়া বোধ করিতে লাগিল। এ সমস্তই ভুলিয়া যাইতে, মুছিয়া ফেলিতে সে একান্ত চেষ্টা করিল কিন্তু কোনোমতেই পারিল না। গোরার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল—গোরাকে সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন উদ্ধত যুবক বলিয়া সমস্ত মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে চাহিল কিন্তু তবু সেই বিপুলকায় বজ্রকণ্ঠ

পুরুষের সেই নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির স্মৃতির সম্মুখে সুচরিতা মনে মনে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল—কোনোমতেই সে নিজের গৌরব খাড়া করিয়া রাখিতে পারিল না।

সকলের বিশেষ লক্ষ্যগোচর হওয়া আদর পাওয়া সুচরিতার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে যে মনে মনে এই আদর চাহিত তাহা নহে কিন্তু আজ গোরার নিকট হইতে উপেক্ষা কেন তাহার কাছে এত অসহ্য হইল? অনেক ভাবিয়া সুচরিতা শেষকালে স্থির করিল যে, গোরাকে সে বিশেষ করিয়া হার মানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়াই তাহার অবিচলিত অনবধান এত করিয়া হৃদয়ে আঘাত করিতেছে।

এমনি করিয়া নিজের মনখানা লইয়া টানাছেঁড়া করিতে করিতে রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বাতি নিবাইয়া দিয়া বাড়ির সকলেই ঘুমাইতে গিয়াছে। সদর দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল—বোঝাগেল বেহারা রান্না খাওয়া সারিয়া এইবার শুইতে যাইবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় ললিতা তাহার রাত্রির কাপড় পরিয়া ছাদে আসিল। সুচরিতাকে কিছুই না বলিয়া তাহার পাশ দিয়া গিয়া ছাদের এক কোণে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। সুচরিতা মনে মনে একটু হাসিল, বুঝিল ললিতা তাহার প্রতি অভিমান করিয়াছে। আজ যে তাহার ললিতার সঙ্গে শুইবার কথা ছিল তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভুলিয়া গেছি বলিলে ললিতার কাছে অপরাধ ক্ষালন হয় না—কারণ, ভুলিতে পারাটাই সকলের চেয়ে গুরুতর অপরাধ। সে যে যথা সময়ে প্রতিশ্রুতি মনে করাইয়া দিবে তেমন মেয়ে নয়। এতক্ষণ সে শক্ত হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল—যতই সময় যাইতেছিল ততই তাহার অভিমান তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে যখন নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল তখন সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কেবল নীরবে জানাইতে আসিল যে আমি এখনো জাগিয়া আছি।

সুচরিতা চৌকি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে ললিতার কাছে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল—কহিল, "ললিতা, লক্ষ্মী ভাই, রাগ কোরো না ভাই!"

ললিতা সুচরিতার হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—"না, রাগ কেন করব? তুমি বোসো না।"

সুচরিতা তাহার হাত টানিয়া লইয়া কহিল—"চল ভাই, শুতে যাই।"

ললিতা কোনো উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে সুচরিতা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া শোবার ঘরে লইয়া গেল।

ললিতা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"কেন তুমি এত দেরি করলে? জান এগারটা বেজেছে। আমি সমস্ত ঘড়ি শুনেছি। এখনি ত তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।"

সুচরিতা ললিতাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "আজ আমার অন্যায় হয়ে গেছে ভাই।"

যেমনি অপরাধ স্বীকার করা ললিতার আর রাগ রহিল না। একেবারে নরম হইয়া কহিল—"এতক্ষণ একলা বসে কার কথা ভাবছিলে দিদি? পানু বাবুর কথা?"

তাহাকে তর্জ্জনি দিয়া আঘাত করিয়া সুচরিতা কহিল—"দূর!"

পানু বাবুকে ললিতা সহিতে পারিত না। এমন কি, তাহার অন্য বোনের মত তাহাকে লইয়া সুচরিতাকে ঠাট্টা করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। পানু বাবু সুচরিতাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এ কথা মনে করিলে তাহার রাগ হইত।

একটুখানি চুপ করিয়া ললিতা কথা তুলিল—"আচ্ছা দিদি বিনয় বাবু লোকটি কিন্তু বেশ। না?"

সুচরিতার মনের ভাবটা যাচাই করিবার উদ্দেশ্য যে এ প্রশ্নের মধ্যে ছিল না তাহা বলিতে পারি না।

সুচরিতা কহিল—"হাঁ, বিনয় বাবু লোকটি ভাল বইকি—বেশ ভাল মানুষ।"

ললিতা যে সুর আশা করিয়াছিল তাহা ত সম্পূর্ণ বাজিল না। তখন সে আবার কহিল—"কিন্তু যাই বল দিদি, আমার গৌরমোহন বাবুকে একেবারেই ভাল লাগে নি। কি রকম কটা কটা রং, কাটখোট্টা চেহারা, পৃথিবীর কাউকে যেন গ্রাহ্যই করে না। তোমার কি রকম লাগল?"

সুচরিতা কহিল—"বড় বেশি রকম হিঁদুয়ানি!"

ললিতা কহিল—"না, না, আমাদের মেসোমশায়ের ত খুবই হিঁদুয়ানি কিন্তু সে আর এক রকমের। এ যেন—ঠিক বলতে পারিনে কি রকম।"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—"কি রকমই বটে!" বলিয়া গোরার সেই উচ্চ শুভ্র ললাটে তিলক কাটা মূর্ত্তি মনে আনিয়া সুচরিতা রাগ করিল। রাগ করিবার কারণ এই যে ঐ তিলকের দ্বারা গোরা কপালে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে যে তোমাদের হইতে আমি পৃথক্। সেই পার্থক্যের প্রচণ্ড অভিমানকে সুচরিতা যদি ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারিত তবেই তাহার গায়ের জ্বালা মিটিত।

আলোচনা বন্ধ হইল, ক্রমে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি যখন দুইটা সুচরিতা জাগিয়া দেখিল, বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; মাঝে মাঝে তাহাদের মশারির আবরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলো চমকিয়া উঠিতেছে; ঘরের কোণে যে প্রদীপ ছিল সেটা নিবিয়া গেছে। সেই রাত্রির নিস্তব্ধতায়, অন্ধকারে, অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দে, সুচরিতার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইতে লাগিল। সে এপাশ ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল—পাশেই ললিতাকে গভীর সুপ্তিতে মগ্ন দেখিয়া তাহার ঈর্ষা জন্মিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বিরক্ত হইয়া সে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। খোলা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সম্মুখের ছাতের দিকে চাহিয়া রহিল—মাঝে মাঝে বাতাসের বেগে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ সন্ধ্যাবেলাকার সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া তাহার মনে উদয় হইল। সেই সূর্য্যাস্তরঞ্জিত গাড়িবারান্দার উপর গোরার উদ্দীপ্ত মুখ স্পষ্ট ছবির মত তাহার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল এবং তখন তর্কের যে সমস্ত কথা কানে শুনিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল সে সমস্তই গোরার গভীর প্রবল কণ্ঠস্বরে জড়িত হইয়া আগাগোড়া তাহার মনে পড়িল। কানে বাজিতে লাগিল—"আপনারা যাদের অশিক্ষিত বলেন, আমি তাহাদেরই দলে—আপনারা যাকে কুসংস্কার বলেন আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভালবাসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মুখ থেকে দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করতে পারব না।" এ কথার উত্তরে পানু বাবু কহিলেন—"এমন করলে দেশের সংশোধন হবে কি করে?" গোরা গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব তাহলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে। আপনারা যে পৃথক হয়ে দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে চান,—আপনারা বলেন দেশের কুসংস্কার আছে অতএব আমরা সুসংস্কারীর দল আলাদা হয়ে থাক্‌ব। আমি এই কথা বলি, আমি কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারো থেকে পৃথক হব না এই আমার সকলের চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা—তারপর এক হলে কোন্ সংস্কার থাক্‌বে কোন্ সংস্কার যাবে তা আমার দেশই জানে, এবং দেশের যিনি বিধাতা তিনিই জানেন!" পানু বাবু কহিলেন,—"এমন সকল প্রথা ও সংস্কার আছে যা দেশকে এক হতে দিচ্চে না।" গোরা কহিল—"যদি এই কথা মনে করেন যে আগে সেই সমস্ত প্রথা ও সংস্কারকে একে একে উৎপাটিত করে ফেলবেন তার পরে দেশ এক হবে তবে সমুদ্রকে ছেঁচে ফেলে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করা হবে। অবজ্ঞা ও অহঙ্কার দূর করে নম্র হয়ে ভালবেসে নিজেকে অন্তরের সঙ্গে সকলের করুন, সেই ভালবাসার কাছে সহস্র ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা সহজেই হার মানবে। সকল দেশের সকল সমাজেই ত্রুটি ও অপূর্ণতা আছে কিন্তু দেশের লোকে স্বজাতির প্রতি ভালবাসার টানে যতক্ষণ এক থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার বিষ কাটিয়ে চল্‌তে পারে। পচ্‌বার কারণ হাওয়ার মধ্যেই আছে। কিন্তু বেঁচে থাক্‌লেই সেটা কাটিয়ে চলি, মরে গেলেই পচে উঠি। আমি আপনাকে বলচি সংশোধন করতে যদি আসেন ত আমরা সহ্য করব না, তা আপনারাই হোন বা মিশনারিই হোন।" পানু বাবু কহিলেন—"কেন করবেন না?" গোরা কহিল—"কর্‌ব না তার কারণ আছে। বাপ মায়ের সংশোধন সহ্য করা যায় কিন্তু পাহারাওয়ালার সংশোধনে শোধনের চেয়ে অপমান অনেক বেশি; সেই সংশোধন সহ্য করতে হলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আগে আত্মীয় হবেন তারপরে সংশোধক হবেন—নইলে আপনার মুখের ভাল কথাতেও আমাদের অনিষ্ট হবে"।—এমনি করিয়া একটি একটি সমস্ত কথা আগাগোড়া সুচরিতার মনে উঠিতে লাগিল এবং এই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বেদনাও কেবলি পীড়া দিতে থাকিল। শ্রান্ত হইয়া সুচরিতা বিছানায় ফিরিয়া আসিল এবং চোখের উপর করতল চাপিয়া সমস্ত ভাবনাকে ঠেলিয়া ঘুমাইবার

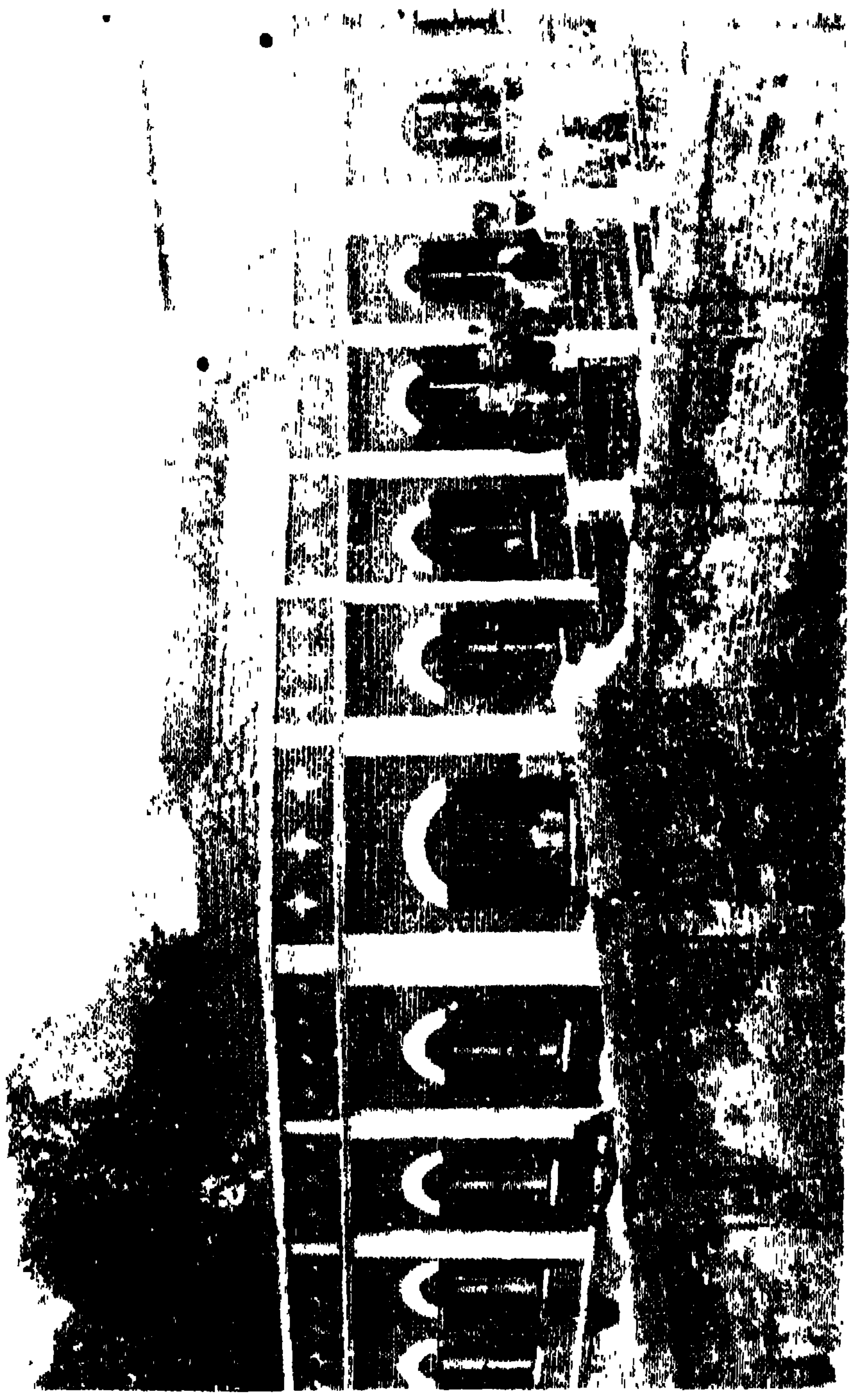

ইংরেজ কুঠির পুরাতন ফটক।

ডাচ্ সমাধিস্থান।

চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার মুখ ও কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল এবং এই সমস্ত আলোচনা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার মনের মধ্যে কেবলই আনাগোনা করিতে থাকিল।

১৩

বিনয় ও গোরা পরেশের বাড়ি হইতে রাস্তায় বাহির হইলে বিনয় কহিল—"গোরা একটু আস্তে আস্তে চল ভাই—তোমার পা দুটো আমাদের চেয়ে অনেক বড়—ওর চালটা একটু খাট না করলে তোমার সঙ্গে যেতে আমরা হাঁপিয়ে পড়ি।"

গোরা কহিল—"আমি একলাই যেতে চাই, আমার আজ অনেক কথা ভাববার আছে।"

বলিয়া তাহার স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সে বেগে চলিয়া গেল।

বিনয়ের মনে আঘাত লাগিল। সে আজ গোরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। সে সম্বন্ধে গোরার কাছে তিরস্কার ভোগ করিলে সে খুসি হইত। একটা ঝড় হইয়া গেলেই তাহাদের চিরদিনের বন্ধুত্বের আকাশ হইতে গুমট কাটিয়া যাইত এবং সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত।

তাহা ছাড়া আর একটা কথা তাহাকে পীড়া দিতেছিল। আজ হঠাৎ গোরা পরেশের বাড়িতে প্রথম আসিয়াই বিনয়কে সেখানে বন্ধুভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে করিয়াছে বিনয় এ বাড়িতে সর্ব্বদাই যাতায়াত করে। অবশ্য, যাতায়াত করিলে যে কোনো অপরাধ আছে তাহা নয়;—গোরা যাহাই বলুক পরেশ বাবুর সুশিক্ষিত পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া বিনয় একটা বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে; ইহাঁদের সঙ্গে মেশামেশি করাতে গোরা যদি কোনো দোষ দেখে তবে সেটা তাহার নিতান্ত গোঁড়ামি;—কিন্তু পূর্ব্বের কথাবার্ত্তায় গোরা না কি জানিয়াছে যে, বিনয় পরেশ বাবুর বাড়িতে যাওয়া আসা করে না আজ সহসা তাহার মনে হইতে পারে যে সে কথাটা সত্য নয়। বিশেষত বরদাসুন্দরী তাহাকে বিশেষ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, সেখানে তাঁহার মেয়েদের সঙ্গে তাহার আলাপ হইতে লাগিল—গোরার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য হইতে ইহা এড়াইয়া যায় নাই। মেয়েদের সঙ্গে এইরূপ মেলামেশায় ও বরদাসুন্দরীর আত্মীয়তায় মনে মনে বিনয় ভারি একটা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে এই পরিবারে গোরার সঙ্গে তাহার আদরের পার্থক্য তাহাকে ভিতরে ভিতরে বাজিতেছিল। আজ পর্য্যন্ত এই দুটি সহপাঠীর নিবিড় বন্ধুত্বের মাঝখানে কেহই বাধা স্বরূপ দাঁড়ায় নাই। একবার কেবল গোরার ব্রাহ্ম-সামাজিক উৎসাহে উভয়ের বন্ধুত্বে একটা ক্ষণিক আচ্ছাদন পড়িয়াছিল—কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিনয়ের কাছে মত জিনিষটা খুব একটা বড় ব্যাপার নহে—সে মত লইয়া যতই লড়ালড়ি করুক না কেন মানুষই তাহার কাছে বেশি সত্য। এবারে তাহাদের বন্ধুত্বের মাঝখানে মানুষের আড়াল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া সে ভয় পাইয়াছে। পরেশের পরিবারের সহিত সম্বন্ধকে বিনয় মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতেছে কারণ, তাহার জীবনে ঠিক এমন আনন্দের আস্বাদন সে আর কখনো পায় নাই—কিন্তু গোরার বন্ধুত্ব বিনয়ের জীবনের অঙ্গীভূত—সেই বন্ধুত্ব হইতে বিরহিত জীবনকেই সে কল্পনা করিতে পারে না।

এপর্য্যন্ত কোনো মানুষকেই বিনয় গোরার মত তাহার হৃদয়ের এত কাছে আসিতে দেয় নাই। আজ পর্য্যন্ত সে কেবল বই পড়িয়াছে এবং গোরার সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, ঝগড়া করিয়াছে, আর গোরাকেই ভালবাসিয়াছে; সংসারে আর কাহাকেও কিছুমাত্র আমল দিবার অবকাশই হয় নাই। গোরারও ভক্ত সম্প্রদায়ের অভাব নাই কিন্তু বন্ধু বিনয় ছাড়া আর কেহই ছিল না। গোরার প্রকৃতির মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতার ভাব আছে—এদিকে সে সামান্য লোকের সঙ্গে মিশিতে অবজ্ঞা করে না অথচ নানাবিধ লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অধিকাংশ লোকই তাহার সঙ্গে একটা দূরত্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ বিনয় বুঝিতে পারিল পরেশ বাবুর পরিজনদের প্রতি তাহার হৃদয় গভীরতররূপে আকৃষ্ট হইতেছে। অথচ আলাপ বেশিদিনের নহে। ইহাতে সে গোরার কাছে যেন একটা অপরাধের লজ্জা বোধ করিতে লাগিল।

ঐ যে বরদাসুন্দরী আজ বিনয়কে তাঁহার মেয়েদের ইংরেজি হস্তলিপি ও শিল্পকাজ দেখাইয়া ও আবৃত্তি শুনাইয়া মাতৃগর্ব্ব প্রকাশ করিতেছিলেন গোরার কাছে যে ইহা কিরূপ

অবজ্ঞাজনক তাহা বিনয় মনে মনে সুস্পষ্ট কল্পনা করিতেছিল। বস্তুতই ইহার মধ্যে যথেষ্ট হাস্যকর ব্যাপার ছিল;—এবং বরদাসুন্দরীর মেয়েরা যে অল্পস্বল্প ইংরেজি শিখিয়াছে, ইংরেজ মেমের কাছে প্রশংসা পাইয়াছে, এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের স্ত্রীর কাছে ক্ষণকালের জন্য প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে এই গর্ব্বের মধ্যে এক হিসাবে একটা দীনতাও ছিল কিন্তু এসমস্ত বুঝিয়া জানিয়াও বিনয় এই ব্যাপারটাকে গোরার আদর্শ অনুসারে ঘৃণা করিতে পারে নাই। তাহার এসমস্ত বেশ ভালই লাগিতেছিল। লাবণ্যর মত মেয়ে—মেয়েটি দিব্য সুন্দর দেখিতে তাহাতে সন্দেহ নাই—বিনয়কে নিজের হাতের লেখা মূরের কবিতা দেখাইয়া যে বেশ একটু অহঙ্কার বোধ করিতেছিল ইহাতে বিনয়েরও অহঙ্কারের তৃপ্তি হইয়াছিল। বরদাসুন্দরীর মধ্যে একালের ঠিক রংটি ধরে নাই অথচ তিনি অতিরিক্ত উদগ্রভাবে একালীয়তা ফলাইতে ব্যস্ত বিনয়ের কাছে এই অসামঞ্জস্যের অসঙ্গতিটা ধরা পড়ে নাই যে তাহা নহে তবুও বরদাসুন্দরীকে বিনয়ের বেশ ভাল লাগিয়াছিল;—তাঁহার অহঙ্কারও অসহিষ্ণুতার সারল্য-টুকুতে বিনয়ের প্রীতি বোধ হইয়াছিল। মেয়েরা যে তাহাদের হাসির শব্দে ঘর মধুর করিয়া রাখিয়াছে, চা তৈরি করিয়া পরিবেশণ করিতেছে, নিজেদের হাতের শিল্পে ঘরের দেয়াল সাজাইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে ইংরেজি কবিতা পড়িয়া উপভোগ করিতেছে ইহা যতই সামান্য হউক বিনয় ইহাতেই মুগ্ধ হইয়াছে। বিনয় এমন রস তাহার মানবসঙ্গবিরল জীবনে আর কখনো পায় নাই। এই মেয়েদের বেশভূষা হাসিকথা কাজকর্ম্ম লইয়া কত মধুর ছবিই যে সে মনে মনে আঁকিতে লাগিল তাহার আর সংখ্যা নাই। শুধু বই পড়িয়া এবং মত লইয়া তর্ক করিতে করিতে যে ছেলে কখন্ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে জানিতেও পারে নাই তাহার কাছে পরেশের ঐ সামান্য বাসাটির অভ্যন্তরে এক নূতন এবং আশ্চর্য্য জগৎ প্রকাশ পাইল।

গোরা যে বিনয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল সে রাগকে বিনয় অন্যায় মনে করিতে পারিল না। এই দুই বন্ধুর বহুদিনের সম্বন্ধে এতকাল পরে আজ একটা সত্যকার ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ষারাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারকে স্পন্দিত করিয়া মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিনয়ের মনে অত্যন্ত একটা ভার বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল তাহার জীবন চিরদিন যে পথ বাহিয়া আসিতেছিল আজ তাহা ছাড়িয়া দিয়া আর একটা নূতন পথ লইয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যে গোরা কোথায় গেল এবং সে কোথায় চলিল!

বিচ্ছেদের মুখে প্রেমের বেগ বাড়িয়া উঠে। গোরার প্রতি প্রেম বিনয়ের হৃদয়ে যে কত বৃহৎ এবং কত প্রবল, আজ সেই প্রেমে আঘাত লাগিবার দিনে তাহা বিনয় অনুভব করিল।

বাসায় আসিয়া রাত্রির অন্ধকার এবং ঘরের নির্জ্জনতাকে বিনয়ের অত্যন্ত নিবিড় এবং শূন্য বোধ হইতে লাগিল। গোরার বাড়ি যাইবার জন্য একবার সে বাহিরে আসিল; কিন্তু আজ রাত্রে গোরার সঙ্গে যে তাহার হৃদয়ের মিলন হইতে পারিবে এমন সে আশা করিতে পারিল না; তাই সে আবার ফিরিয়া গিয়া শ্রান্ত হইয়া বিছানার মধ্যে শুইয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া তাহার মন হাল্কা হইয়া গেল। রাত্রে কল্পনায় সে আপনার বেদনাকে অনাবশ্যক অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছিল—সকালে গোরার সহিত বন্ধুত্ব এবং পরেশের পরিবারের সহিত আলাপ তাহার কাছে একান্ত পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হইল না। ব্যাপারখানা এমনি কি গুরুতর, এই বলিয়া কাল রাত্রিকার মনঃপীড়ায় আজ বিনয়ের হাসি পাইল।

বিনয় কাঁধে একখানা চাদর লইয়া দ্রুতপদে গোরার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। গোরা তখন তাহার নীচের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। বিনয় যখন রাস্তায় তখনি গোরা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল—কিন্তু আজ বিনয়ের আগমনে খবরের কাগজ হইতে তাহার দৃষ্টি উঠিল না। বিনয় আসিয়াই কোনো কথা না বলিয়া ফস্ করিয়া গোরার হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইল।

গোরা কহিল—"বোধ করি তুমি ভুল করেছ—আমি গৌরমোহন—একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু।"

বিনয় কহিল—"ভুল তুমিই হয় ত করছ। আমি হচ্চি শ্রীযুক্ত বিনয়—উক্ত গৌরমোহনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বন্ধু।"

গোরা। কিন্তু গৌরমোহন এতই বেহায়া যে সে তার

কুসংস্কারের জন্য কারো কাছে কোনো দিন লজ্জা বোধ করে না।

বিনয়। বিনয়ও ঠিক তদ্রূপ। তবে কি না সে নিজের সংস্কার নিয়ে তেড়ে অন্যকে আক্রমণ করতে যায় না।

দেখিতে দেখিতে দুই বন্ধুতে তুমুল তর্ক বাধিয়া উঠিল। পাড়াসুদ্ধ লোক বুঝিতে পারিল আজ গোরার সঙ্গে বিনয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

গোরা কহিল—"তুমি যে পরেশ বাবুর বাড়িতে যাতায়াত করচ সে কথা সেদিন আমার কাছে অস্বীকার করার কি দরকার ছিল?"

বিনয়। কোনো দরকার বশত অস্বীকার করিনি—যাতায়াত করিনে বলেই অস্বীকার করেছিলুম। এতদিন পরে কাল প্রথম তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছি।

গোরা। আমার সন্দেহ হচ্চে অভিমন্যুর মত তুমি প্রবেশ করবার রাস্তাই জান—বেরবার রাস্তা জান না।

বিনয়। তা হতে পারে—ঐটে হয় ত আমার জন্মগত প্রকৃতি। আমি যাকে শ্রদ্ধা করি বা ভালবাসি তাকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে। আমার এই স্বভাবের পরিচয় তুমিও পেয়েছ।

গোরা। এখন থেকে তাহলে ওখানে যাতায়াত চল্‌তে থাক্‌বে।

বিনয়। একলা আমারি যে চল্‌তে থাক্‌বে এমন কি কথা আছে! তোমারও ত চলৎশক্তি আছে তুমি ত স্থাবর পদার্থ নও!

গোরা। আমি ত যাই এবং আসি কিন্তু তোমার যে লক্ষণ দেখলুম তুমি যে একেবারে যাবারই দাখিল! গরম চা কি রকম লাগ্‌ল?

বিনয়। কিছু কড়া লেগেছিল।

গোরা। তবে?

বিনয়। না খাওয়াটা তার চেয়ে বেশি কড়া লাগ্‌ত!

গোরা। সমাজ পালনটা তাহলে কি কেবলমাত্র ভদ্রতা পালন?

বিনয়। সব সময়ে নয়। কিন্তু দেখ গোরা সমাজের সঙ্গে যেখানে হৃদয়ের সংঘাত বাধে সেখানে আমার পক্ষে—

গোরা অধীর হইয়া উঠিয়া বিনয়কে কথাটা শেষ করিতেই দিল না। সে গর্জ্জিয়া কহিল—"হৃদয়! সমাজকে তুমি ছোট করে তুচ্ছ করে দেখ বলেই কথায় কথায় তোমার হৃদয়ের সংঘাত বাধে। কিন্তু সমাজকে আঘাত করলে তার বেদনা যে কতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় তা যদি অনুভব করতে তাহলে তোমার ঐ হৃদয়টার কথা তুল্‌তে তোমার লজ্জা বোধ হত। পরেশ বাবুর মেয়েদের মনে একটুখানি আঘাত দিতে তোমার ভারি কষ্ট লাগে—কিন্তু আমার কষ্ট লাগে এতটুকুর জন্যে সমস্ত দেশকে যখন অনায়াসে আঘাত করতে পার।"

বিনয় কহিল—"তবে সত্য কথা বলি ভাই গোরা। এক পেয়ালা চা খেলে সমস্ত দেশকে যদি আঘাত করা হয় তবে সে আঘাতে দেশের উপকার হবে। তার থেকে বাঁচিয়ে চল্‌লে দেশটাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল, বাবু করে তোলা হবে।"

গোরা। ওগো, মশায়, ও সমস্ত যুক্তি আমি জানি—আমি যে একেবারে অবুঝ তা মনে কোরো না। কিন্তু ও সমস্ত এখনকার কথা নয়। রুগী ছেলে যখন ওষুধ খেতে চায় না মা তখন সুস্থ শরীরেও নিজে ওষুধ খেয়ে তাকে জানাতে চায় যে তোমার সঙ্গে আমার একদশা—এটা ত যুক্তির কথা নয়, এটা ভালবাসার কথা। এই ভালবাসা না থাকলে যতই যুক্তি থাক না ছেলের সঙ্গে মায়ের যোগ নষ্ট হয়। তা হলে কাজও নষ্ট হয়। আমিও চায়ের পেয়ালা নিয়ে তর্ক করি না—কিন্তু দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারি না—চা না খাওয়া তার চেয়ে ঢের সহজ—পরেশবাবুর মেয়ের মনে কষ্ট দেওয়া তার চেয়ে ঢের ছোট। সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেলাই আমাদের এখনকার অবস্থায় সকলের চেয়ে প্রধান কাজ- যখন মিলন হয়ে যাবে তখন চা খাবে কি না খাবে দুকথায় সে তর্কের মীমাংসা হয়ে যাবে।

বিনয়। তা হলে আমার দ্বিতীয় পেয়ালা চা খাবার অনেক বিলম্ব আছে দেখ্‌চি।

গোরা। না, বেশি বিলম্ব কর্‌বার দরকার নেই। কিন্তু, বিনয়, আমাকে আর কেন? হিন্দুসমাজের অনেক অপ্রিয় জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ছাড়বার সময় এসেছে। নইলে পরেশবাবুর মেয়েদের মনে আঘাত লাগবে।

এমন সময় অবিনাশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে

গোরার শিষ্য। গোরার মুখ হইতে সে যাহা শোনে তাহাই সে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ছোট এবং নিজের ভাষার দ্বারা বিকৃত করিয়া চারিদিকে বলিয়া বেড়ায়। গোরার কথা যাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না, অবিনাশের কথা তাহারা বেশ বোঝে ও প্রশংসাও করে।

বিনয়ের প্রতি অবিনাশের অত্যন্ত একটা ঈর্ষার ভাব আছে। তাই সে জো পাইলেই বিনয়ের সঙ্গে নির্ব্বোধের মত তর্ক করিতে চেষ্টা করে। বিনয় তাহার মূঢ়তায় অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠে—তখন গোরা অবিনাশের তর্ক নিজে তুলিয়া লইয়া বিনয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অবিনাশ মনে করে তাহারই যুক্তি যেন গোরার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে।

অবিনাশ আসিয়া পড়াতে গোরার সঙ্গে মিলন ব্যাপারে বিনয় বাধা পাইল। সে তখন উঠিয়া উপরে গেল। আনন্দময়ী তাঁহার ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন।

আনন্দময়ী কহিলেন—"অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের গলা শুনতে পাচ্চি। এত সকালে যে? জল খাবার খেয়ে বেরিয়েছ ত?"

অন্য দিন হইলে বিনয় বলিত, না খাই নাই—এবং আনন্দময়ীর সম্মুখে বসিয়া তাহার আহার জমিয়া উঠিত। কিন্তু আজ বলিল—"না, মা, খাব না—খেয়েই বেরিয়েছি।"

আজ বিনয় গোরার কাছে অপরাধ বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। পরেশবাবুর সঙ্গে তাহার সংস্রবের জন্য গোরা যে এখনো তাহাকে ক্ষমা করে নাই—তাহাকে একটু যেন দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে ইহা অনুভব করিয়া তাহার মনের ভিতরে ভিতরে একটা ক্লেশ হইতেছিল। সে পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া আলুর খোসা ছাড়াইতে বসিয়া গেল।

মিনিট পনেরো পরে নীচে গিয়া দেখিল গোরা অবিনাশকে লইয়া বাহির হইয়া গেছে। গোরার ঘরে বিনয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে খবরের কাগজ হাতে লইয়া শূন্যমনে বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

১৪

মধ্যাহ্নে আহারের পর গোরার কাছে যাইবার জন্য বিনয়ের মন আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিনয় গোরার কাছে নিজেকে নত করিতে কোনো দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই। কিন্তু নিজের অভিমান না থাকিলেও বন্ধুত্বের অভিমানকে ঠেকানো শক্ত। পরেশ বাবুর কাছে ধরা দিয়া বিনয় গোরার প্রতি তাহার এতদিনকার নিষ্ঠায় একটু যেন খাটো হইয়াছে বলিয়া অপরাধ অনুভব করিতেছিল বটে কিন্তু সেজন্য গোরা তাহাকে পরিহাস ও ভর্ৎসনা করিবে এই পর্য্যন্তই সে আশা করিয়াছিল, তাহাকে যে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে মনেও করে নাই। বাসা হইতে খানিকটা দূর বাহির হইয়া বিনয় আবার ফিরিয়া আসিল;—বন্ধুত্ব পাছে অপমানিত হয় এই ভয়ে সে গোরার বাড়িতে যাইতে পারিল না।

মধ্যাহ্নে আহারের পর গোরাকে একখানা চিঠি লিখিবে বলিয়া কাগজ কলম লইয়া বিনয় বসিয়াছে; বসিয়া অকারণে কলমটাকে ভোঁতা অপবাদ দিয়া একটা ছুরি লইয়া অতিশয় যত্নে একটু একটু করিয়া তাহার সংস্কার করিতে লাগিয়াছে এমন সময় নীচে হইতে "বিনয়" বলিয়া ডাক আসিল। বিনয় কলম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া বলিল—"মহিম দাদা, আসুন উপরে আসুন।"

মহিম উপরের ঘরে আসিয়া বিনয়ের খাটের উপর বেশ চৌকা হইয়া বসিলেন এবং ঘরের আস্‌বাবপত্র বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"দেখ বিনয়, তোমার বাসা যে আমি চিনিনে তা নয়—মাঝে মাঝে তোমার খবর নিয়ে যাই এমন ইচ্ছাও করে কিন্তু আমি জানি তোমরা আজকালকার ভাল ছেলে, তোমাদের এখানে তামাকটি পাবার জো নেই তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে—"

বিনয়কে ব্যস্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া মহিম কহিলেন—"তুমি ভাবচ এখনি বাজার থেকে নতুন হুঁকো কিনে এনে আমাকে তামাক খাওয়াবে, সে চেষ্টা কোরো না। তামাক না দিলে ক্ষমা করতে পারব কিন্তু নতুন হুঁকোয় আনাড়ি হাতের সাজা তামাক আমার সহ্য হবে না।"

এই বলিয়া মহিম বিছানা হইতে একটা হাতপাখা তুলিয়া লইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে কহিলেন—"আজ রবিবারের দিবানিদ্রাটা সম্পূর্ণ মাটি করে তোমার এখানে এসেছি তার একটু কারণ আছে। আমার একটি উপকার তোমাকে করতেই হবে।"

বিনয় "কি উপকার" জিজ্ঞাসা করিল। মহিম কহিলেন "আগে কথা দাও, তবে বলব।"

বিনয়। আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় তবে ত?

মহিম। কেবলমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আর কিছু নয় তুমি একবার হাঁ বল্লেই হয়।

বিনয়। আমাকে এত করে কেন বলচেন? আপনি ত জানেন আমি আপনাদের ঘরেরই লোক—পারলে আপনার উপকার করব না এ হতেই পারে না।

মহিম পকেট হইতে একটা পানের দোনা বাহির করিয়া তাহা হইতে গোটা দুয়েক পান বিনয়কে দিয়া বাকি তিনটে নিজের মুখে পুরিলেন ও চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন—"আমার শশিমুখীকে ত তুমি জানই। দেখ্‌তে শুনতে নেহাৎ মন্দ নয় অর্থাৎ বাপের মত হয় নি। বয়স প্রায় দশের কাছাকাছি হল, এখন ওকে পাত্রস্থ করবার সময় হয়েছে। কোন্ লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়বে এই ভেবে আমার ত রাত্রে ঘুম হয় না।"

বিনয় কহিল—"ব্যস্ত হচ্চেন কেন—এখনো সময় আছে।"

মহিম। নিজের মেয়ে যদি থাকৃত ত বুঝ্‌তে কেন ব্যস্ত হচ্চি। বছর গেলেই বয়েস আপনি বাড়ে কিন্তু পাত্র ত আপনি আসে না! কাজেই দিন যত যায় মন ততই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখন, তুমি যদি একটু আশ্বাস দাও তাহলে না হয় দু'দিন সবুর করতেও পারি।

বিনয়। আমার ত বেশি লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় নেই—কলকাতার মধ্যে আপনাদের বাড়ি ছাড়া আর কোনো বাড়ি জানিনে বল্লেই হয়—তবু আমি খোঁজ করে দেখ্‌ব।

মহিম। শশিমুখীর স্বভাবচরিত্র ত জান।

বিনয়। জানি বই কি। ওকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসচি—লক্ষ্মী মেয়ে।

মহিম। তবে আর বেশি দূর খোজ করবার দরকার কি বাপু! ও মেয়ে তোমারি হাতে আমি সমর্পণ করব।

বিনয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল—বলেন কি?

মহিম। কেন, অন্যায় কি বলেছি! অবশ্য, কুলে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়—কিন্তু বিনয়, এত পড়াশুনো করে যদি তোমরা কুল মান্‌বে তবে হল কি!

বিনয়। না, না, কুলের কথা হচ্চে না, কিন্তু বয়েস যে—

মহিম। বল কি! শশীর বয়েস কম কি হল! হিঁদুর ঘরের মেয়ে ত মেম সাহেব নয়—সমাজকে ত উড়িয়ে দিলে চলে না।

মহিম সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—বিনয়কে তিনি অস্থির করিয়া তুলিলেন। অবশেষে বিনয় কহিল—"আমাকে একটু ভাববার সময় দিন।"

মহিম। আমি ত আজ রাত্রেই দিনস্থির করচিনে।

বিনয়। তবু বাড়ির লোকদের—

মহিম। হাঁ, সে ত বটেই। তাঁদের মত নিতে হবে বইকি। তোমার খুড়োমশায় যখন বর্ত্তমান আছেন তাঁর অমতে ত কিছু হতে পারে না।

এই বলিয়া পকেট হইতে দ্বিতীয় পানের দোনা নিঃশেষ করিয়া যেন কথাটা পাকাপাকি হইয়া আসিয়াছে এইরূপ ভাব করিয়া মহিম চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দময়ী একবার শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব আভাসে উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিনয় তাহা কানেও তোলে নাই। আজও প্রস্তাবটা যে বিশেষ সঙ্গত বোধ হইল তাহা নহে কিন্তু তবু কথাটা মনের মধ্যে একটুখানি যেন স্থান পাইল। বিনয়ের মনে হইল এই বিবাহ ঘটিলে আত্মীয়তা সম্বন্ধে গোরা তাহাকে কোনো দিন ঠেলিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটাকে হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত করাকে ইংরাজিয়ানা বলিয়াই সে এতদিন পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাই শশিমুখীকে বিবাহ করাটা তাহার কাছে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল না। মহিমের এই প্রস্তাব লইয়া গোরার সঙ্গে পরামর্শ করিবার যে একটা উপলক্ষ্য জুটিল আপাতত ইহাতেই সে খুসি হইল। বিনয়ের ইচ্ছা গোরা এই লইয়া তাহাকে একটু পীড়াপীড়ি করে। মহিমকে সহজে সম্মতি না দিলে মহিম গোরাকে দিয়া তাহাকে অনুরোধ করাইবার চেষ্টা করিবে ইহাতে বিনয়ের সন্দেহ ছিল না।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া বিনয়ের মনের অবসাদ কাটিয়া গেল। সে তখনি গোরার বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চাদর কাঁধে বাহির হইয়া পড়িল। অল্প একটু দূর যাইতেই পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইল—"বিনয় বাবু!" পিছন ফিরিয়া দেখিল সতীশ তাহাকে ডাকিতেছে।

সতীশকে সঙ্গে লইয়া আবার বিনয় বাসায় প্রবেশ করিল। সতীশ পকেট হইতে রুমালের পুঁটুলি বাহির করিয়া কহিল—"এর মধ্যে কি আছে বলুন দেখি!"

বিনয় "মড়ার মাথা" "কুকুরের বাচ্ছা" প্রভৃতি নানা অসম্ভব জিনিষের নাম করিয়া সতীশের নিকট তর্জ্জন লাভ করিল। তখন সতীশ তাহার রুমাল খুলিয়া গোটাপাঁচেক কালো কালো ফল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি বলুন দেখি?"

বিনয় যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। অবশেষে পরাভব স্বীকার করিলে সতীশ কহিল রেঙ্গুনে তাহার এক মামা আছেন তিনি সেখানকার এই ফল তাহার মার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন—মা তাহারই পাঁচটা বিনয় বাবুকে উপহার পাঠাইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশের ম্যাঙ্গোষ্টীন্ ফল তখনকার দিনে কলিকাতায় সুলভ ছিল না—তাই বিনয় ফলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া টিপিয়া টুপিয়া কহিল—"সতীশ বাবু, ফলগুলো খাব কি করে?"

সতীশ বিনয়ের এই অজ্ঞতায় হাসিয়া কহিল—"দেখবেন, কাম্‌ড়ে খাবেন না যেন—ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়।"

সতীশ নিজেই এই ফল কামড় দিয়া খাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া আজ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আত্মীয়স্বজনদের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়াছে—সেই জন্য বিনয়ের অনভিজ্ঞতায় বিজ্ঞজনোচিত হাস্য করিয়া তাহার মনের বেদনা দূর হইল।

তাহার পরে দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে কিছুক্ষণ কৌতুকালাপ হইলে পর সতীশ কহিল—"বিনয় বাবু, মা বলেছেন আপনার যদি সময় থাকে ত একবার আমাদের বাড়ী আসতে হবে—আজ লীলার জন্মদিন।"

বিনয় বলিল—"আজ, ভাই, আমার সময় হবে না, আজ আমি আর এক জায়গায় যাচ্চি।"

সতীশ। কোথায় যাচ্চেন?

বিনয়। আমার বন্ধুর বাড়িতে।

সতীশ। আপনার সেই বন্ধু?

বিনয়। হাঁ।

"বন্ধুর বাড়ি যেতে পারেন অথচ আমাদের বাড়ি যাবেন না" ইহার যৌক্তিকতা সতীশ বুঝিতে পারিল না—বিশেষত বিনয়ের এই বন্ধুকে সতীশের ভাল লাগে নাই;—সে যেন ইস্কুলের হেডমাষ্টারের চেয়ে কড়া লোক, তাহাকে আর্গিন শুনাইয়া কেহ যশ লাভ করিবে সে এমন ব্যক্তিই নয়;—এমন লোকের কাছে যাইবার জন্য বিনয় যে কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করিবে তাহা সতীশের কাছে ভালই লাগিল না। সে কহিল—"না, বিনয় বাবু, আপনি আমাদের বাড়ি আসুন।"

আহ্বান সত্বেও পরেশ বাবুর বাড়িতে না গিয়া গোরার কাছে যাইব বিনয় এটা মনে মনে খুব আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিল। আহত বন্ধুত্বের অভিমানকে আজ সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না, গোরার প্রতি বন্ধুত্বের গৌরবকেই সে সকলের ঊর্দ্ধে রাখিবে ইহাই সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু হার মানিতে তাহার বেশিক্ষণ লাগিল না। দ্বিধা করিতে করিতে মনের মধ্যে আপত্তি করিতে করিতে অবশেষে বালকের হাত ধরিয়া সেই আটাত্তর নম্বরেরই পথে সে চলিল। বর্ম্মা হইতে আগত দুর্লভ ফলের এক অংশ বিনয়কে মনে করিয়া পাঠানোতে যে আত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে খাতির না করা বিনয়ের পক্ষে অসম্ভব।

বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিল পানু বাবু এবং আর কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি পরেশবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। লীলার জন্মদিনের মধ্যাহ্নভোজনে তাহারা নিমন্ত্রিত ছিল। পানুবাবু যেন বিনয়কে দেখিতে পান নাই এমনি ভাবে চলিয়া গেলেন।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই বিনয় খুব একটা হাসির ধ্বনি এবং দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনিতে পাইল। সুধীর লাবণ্যর চাবি চুরি করিয়াছে; শুধু তাই নয়, দেরাজের মধ্যে লাবণ্যর খাতা আছে এবং সেই খাতার মধ্যে কবিযশঃপ্রার্থিনীর উপহাস্যতার উপকরণ আছে তাহাই এই দস্যু লোকসমাজে উদ্ঘাটন করিবে বলিয়া শাসাইতেছে ইহাই লইয়া উভয়পক্ষে যখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে বিনয় প্রবেশ করিল।

তাহাকে দেখিয়া লাবণ্যর দল মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিল। সতীশ তাহাদের কৌতুকের ভাগ লইবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল। কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা আপনাকে একটু বসতে বললেন, এখনি তিনি আসচেন। বাবা অনাথ বাবুদের বাড়ি গেছেন, তাঁরও আসতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্য্য! সুচরিতার ঘরে প্রবেশকে, সুচরিতার বর্ত্তমানতাকে বিনয় সহজ ঘটনার মত কোন মতেই দেখিতে পারে না। প্রথমেই তাহার মনের মধ্যে এমন একটা বিস্ময়ের ধাক্কা লাগে যে সে হতবুদ্ধির মত হইয়া যায়। তাহার মূর্ত্তি, তাহার বেশভূষা, তাহার চালচলন, তাহার কথাবার্ত্তা, তাহার আবির্ভাবটি বিনয়ের কাছে যেন একটি সুসম্পূর্ণ সঙ্গীতের মত ঠেকে—পরিপূর্ণতার এমন প্রকাশ সে কোথাও আর কখনো দেখে নাই। মুখের দিকে না চাহিলেও তাহার সুকুমার হাতের উপর যদি চোখ পড়ে, তাহার পরিপাটি আঁচলের একটি পাড়ের ভঙ্গীও যদি তাহার দৃষ্টিতে ঠেকে তবে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনয়ের সমস্ত মস্তিষ্ক যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া যায়। অথচ এই মাধুর্য্যের আবেশকে সে অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করে, এই জন্য তাহার নিজের মধ্যে নিজের দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায়—তাই সুচরিতার সঙ্গে সাক্ষাতের আরম্ভেই কথাবার্ত্তায় যোগ দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। এই বাধাটাকে ঠেলিতে না পারিয়া তাহার ভারি একটা কষ্ট হইতে থাকে।

বিনয়ের এই প্রকার জড়ীভূত অবস্থায় সুচরিতা মনে মনে একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে কিন্তু করুণা এবং আনন্দমিশ্রিত হাস্য। ভক্তির প্রাবল্যে ভক্তের জড়িমা উপস্থিত হইলে দেবতা এমনি করিয়া হাসেন, এই রুদ্ধবাক্ জড়িমাই যে পূজা।

দ্বারের কাছে ললিতাকে দেখিয়া সুচরিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে কানে কানে কি বলিল। ললিতা ঘরে আসিয়া সুচরিতার আড়ালে বসিয়া তাহার কাপড়ের পাড় লইয়া নাড়িতে লাগিল।

সুচরিতা বিনয়ের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গোরার কথা তুলিল। হাসিয়া কহিল, "তিনি বোধ হয় আমাদের এখানে আর কখনো আস্‌বেন না?"

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

সুচরিতা কহিল—"আমরা পুরুষদের সাম্‌নে বেরই দেখে তিনি নিশ্চয় অবাক্ হয়ে গেছেন। ঘরকরনার মধ্যে ছাড়া মেয়েদের আর কোথাও দেখলে তিনি বোধ হয় তাদের শ্রদ্ধা করতে পারেন না।"

বিনয় ইহার উত্তর দিতে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া গেল। কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিলেই সে খুসি হইত কিন্তু মিথ্যা বলিবে কি করিয়া? বিনয় কহিল—"গোরার মত এই যে, ঘরের কাজেই মেয়েরা সম্পূর্ণ মন না দিলে তাঁদের কর্ত্তব্যের একাগ্রতা নষ্ট হয়।"

সুচরিতা কহিল—"তাহলে মেয়ে পুরুষে মিলে ঘর-বাহিরকে একেবারে ভাগ করে নিলেই ত ভাল হত। পুরুষকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় বলে তাঁদের বাইরের কর্ত্তব্য হয় ত ভাল করে সম্পন্ন হয় না। আপনিও আপনার বন্ধুর মতে মত দেন না কি?"

নারীনীতি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত ত বিনয় গোরার মতেই মত দিয়া আসিয়াছিল। ইহা লইয়া সে কাগজে লেখালেখিও করিয়াছে। কিন্তু সেইটেই যে বিনয়ের মত এখন তাহা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। সে কহিল—"দেখুন, আসলে এ সকল বিষয়ে আমরা অভ্যাসের দাস। সেই জন্যেই মেয়েদের বাইরে বেরতে দেখলে মনে খট্‌কা লাগে—অন্যায় বা অকর্ত্তব্য বলে যে খারাপ লাগে সেটা কেবল আমরা জোর করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করি। যুক্তিটা এস্থলে উপলক্ষ্য মাত্র সংস্কারটাই আসল।"

সুচরিতা কহিল—"আপনার বন্ধুর মনে বোধ হয় সংস্কারগুলো খুব দৃঢ়।"

বিনয়। বাইরে থেকে দেখে হঠাৎ তাই মনে হয়। কিন্তু একটা কথা আপনি মনে রাখ্‌বেন আমাদের দেশের সংস্কারগুলিকে তিনি যে চেপে ধরে থাকেন তার কারণ এ নয় যে সেই সংস্কারগুলিকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন। আমরা দেশের প্রতি অন্ধ অশ্রদ্ধাবশত দেশের সমস্ত প্রথাকে অবজ্ঞা করতে বসেছিলুম বলেই তিনি এই প্রলয় কার্য্যে বাধা দিতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন আগে আমাদের দেশকে শ্রদ্ধার দ্বারা প্রীতির দ্বারা সমগ্র ভাবে পেতে হবে জান্‌তে হবে, তার পরে আপনিই ভিতর থেকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের নিয়মে সংশোধনের কাজ চলবে।"

সুচরিতা কহিল—"আপনিই যদি হ'ত তা হলে এতদিন হয়নি কেন?"

বিনয়। হয় নি তার কারণ, ইতিপূর্ব্বে দেশ বলে আমাদের সমস্ত দেশকে, জাতি বলে আমাদের সমস্ত জাতিকে এক করে দেখতে পারিনি। তখন যদি বা আমাদের স্বজা-

তিকে অশ্রদ্ধা করিনি তেমনি শ্রদ্ধাও করিনি—অর্থাৎ তাকে লক্ষ্যই করা যায় নি—সেই জন্যেই তার শক্তি জাগেনি। এক সময়ে রোগীর দিকে না তাকিয়ে তাকে বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল—এখন তাকে ডাক্তার খানায় আনা হয়েছে বটে কিন্তু ডাক্তার তাকে এতই অশ্রদ্ধা করে যে একে একে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনো দীর্ঘ শুশ্রূষাসাধ্য চিকিৎসা সম্বন্ধে সে ধৈর্য্য ধরে বিচার করে না। এই সময়ে আমার বন্ধু ডাক্তারটি বল্‌চেন আমার এই পরমাত্মীয়টিকে যে চিকিৎসার চোটে আগাগোড়া নিঃশেষ করে ফেল্‌বে এ আমি সহ্য করতে পারবো না। এখন আমি এর ছেদন কার্য্য একেবারেই বন্ধ করে দেব এবং অনুকূল পথ্য দ্বারা আগে এর নিজের ভিতরকার জীবনীশক্তিকে জাগিয়ে তুলব তার পরে ছেদন করলেও রোগী সইতে পারবে ছেদন না করলেও হয় ত রোগী সেরে উঠবে। গোরা বলেন, গভীর শ্রদ্ধাই আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সকলের চেয়ে বড় পথ্য—এই শ্রদ্ধার অভাবেই আমরা দেশকে সমগ্রভাবে জান্‌তে পারচিনে—জান্‌তে পারচিনে বলেই তার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করচি তা কুব্যবস্থা হয়ে উঠচে। দেশকে ভাল না বাসলে তাকে ভাল করে জানবার ধৈর্য্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভাল করতে চাইলেও তার ভাল করা যায় না।

সুচরিতা একটু একটু করিয়া খোঁচা দিয়া দিয়া গোরার সম্বন্ধে আলোচনাকে নিবিতে দিল না। বিনয়ও গোরার পক্ষে তাহার যাহা কিছু বলিবার তাহা খুব ভাল করিয়াই বলিতে লাগিল। এমন যুক্তি এমন দৃষ্টান্ত দিয়া এমন গুছাইয়া আর কখনো যেন সে বলে নাই; গোরাও তাহার নিজের মত এমন পরিষ্কার করিয়া এমন উজ্জ্বল করিয়া বলিতে পারিত কিনা সন্দেহ। বিনয়ের বুদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতার এই অপূর্ব্ব উত্তেজনায় তাহার মনে একটা আনন্দ জন্মিতে লাগিল এবং সেই আনন্দে তাহার মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিনয় কহিল—"দেখুন শাস্ত্রে বলে আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান। নইলে মুক্তি কিছুতেই নেই। আমি আপনাকে বলচি আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাকে আমি সামান্য লোক বলে মনে করতে পারিনে। আমাদের সকলের মন যখন তুচ্ছ আকর্ষণে নূতনের প্রলোভনে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তখন ঐ একটি মাত্র লোক এই সমস্ত বিক্ষিপ্ততার মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়িয়ে সিংহগর্জ্জনে সেই পুরাতন মন্ত্র বলচে—আত্মানং বিদ্ধি।"

এই আলোচনা আরো অনেকক্ষণ চলিতে পারিত—সুচরিতাও ব্যগ্র হইয়া শুনিতেছিল—কিন্তু হঠাৎ পাশের একটা ঘর হইতে সতীশ চীৎকার করিয়া আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

"বোলো না কাতর স্বরে না করি বিচার
জীবন স্বপনসম মায়ার সংসার।"

বেচারা সতীশ বাড়ির অতিথি অভ্যাগতদের সাম্‌নে বিদ্যা ফলাইবার কোনো অবকাশ পায় না। লীলা পর্য্যন্ত ইংরেজি কবিতা আওড়াইয়া সভা গরম করিয়া তোলে কিন্তু সতীশকে বরদাসুন্দরী ডাকেন না। অথচ লীলার সঙ্গে সকল বিষয়েই সতীশের খুব একটা প্রতিযোগিতা আছে। কোনো মতে লীলার দর্প চূর্ণ করা সতীশের জীবনের প্রধান সুখ। বিনয়ের সম্মুখে কাল লীলার পরীক্ষা হইয়া গেছে। তখন অনাহূত সতীশ তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার কোনো চেষ্টা করিতে পারে নাই। চেষ্টা করিলেও বরদাসুন্দরী তখনি তাহাকে দাবাইয়া দিতেন;—তাই আজ পাশের ঘরে যেন আপন মনে উচ্চস্বরে কাব্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল। শুনিয়া সুচরিতা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

এমন সময় লীলা তাহার মুক্ত বেণী দোলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া সুচরিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে কি একটা বলিল। অমনি সতীশ ছুটিয়া তাহার পিছনে আসিয়া কহিল—"আচ্ছা লীলা, বল দেখি 'মনোযোগ' মানে কি?"

লীলা কহিল—"বলব না।"

সতীশ। ঈস্! বলব না! জান না তাই বল না!

বিনয় সতীশকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল—"তুমি বল দেখি মনোযোগ মানে কি?"

সতীশ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া কহিল—"মনোযোগ মানে মনোনিবেশ।"

সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল, "মনোনিবেশ বল্‌তে কি বোঝায়?"

আত্মীয় না হইলে আত্মীয়কে এমন 'বিপদে কে ফেলিতে

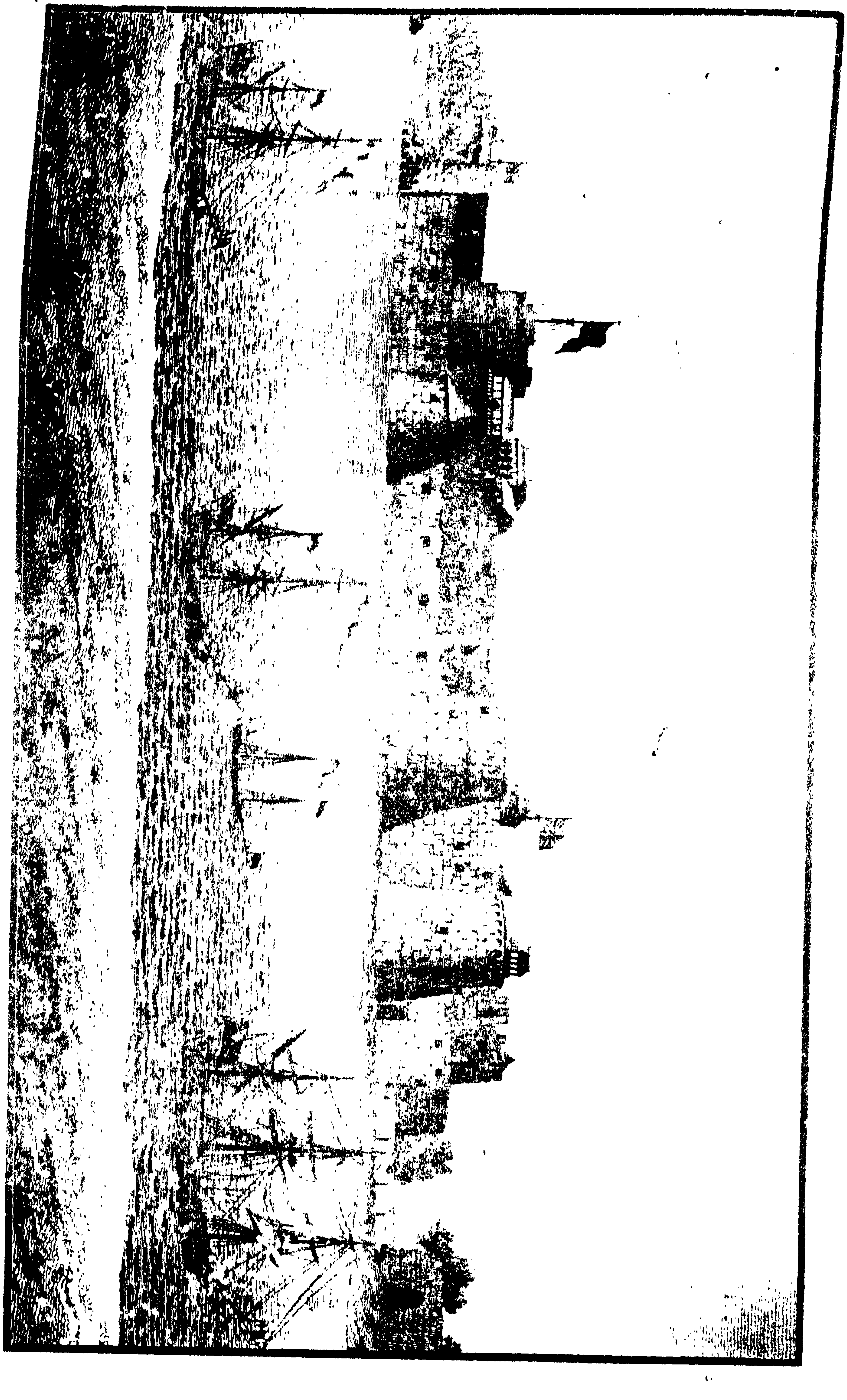

পারে ? সতীশ প্রশ্নটা যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে লাফাইতে লাফাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় আজ পরেশ বাবুর বাড়ি হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া গোরার কাছে যাইবে নিশ্চয় স্থির করিয়া আসিয়াছিল। বিশেষত গোরার কথা বলিতে বলিতে গোরার কাছে যাইবার উৎসাহও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। তাই সে ঘড়িতে চারটে বাজিতে শুনিয়া তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

সুচরিতা কহিল, "আপনি এখনি যাবেন ? মা আপনার জন্যে খাবার তৈরি করচেন। আর একটু পরে গেলে কি চলবে না ?"

বিনয়ের পক্ষে এ ত প্রশ্ন নয়, এ হুকুম। সে তখনি বসিয়া পড়িল। লাবণ্য রঙীন রেশমের কাপড়ে সাজিয়া গুজিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"দিদি, খাবার তৈরি হয়েছে। মা ছাতে আস্‌তে বল্লেন।"

ছাতে আসিয়া বিনয়কে আহারে প্রবৃত্ত হইতে হইল। বরদাসুন্দরী তাঁহার সব সন্তানদের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন। ললিতা সুচরিতাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। লাবণ্য একটা চৌকিতে বসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া দুই লোহার কাঠি লইয়া বুনানির কার্য্যে লাগিল—তাহাকে কবে একজন বলিয়াছিল বুনানির সময় তাহার কোমল আঙুল গুলির খেলা ভারি সুন্দর দেখায় সেই অবধি লোকের সাক্ষাতে বিনা প্রয়োজনে বুনানি করা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

পরেশ আসিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ রবিবারে উপাসনামন্দিরে যাইবার কথা। বরদাসুন্দরী কহিলেন—"যদি আপত্তি না থাকে আমাদের সঙ্গে সমাজে যাবেন ?"

ইহার পর কোনো ওজর আপত্তি করা চলে না। দুই গাড়িতে ভাগ করিয়া সকলে উপাসনালয়ে গেলেন। ফিরিবার সময় যখন গাড়িতে উঠিতেছেন তখন হঠাৎ সুচরিতা চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"ঐ যে গৌরমোহন বাবু যাচ্চেন।"

গোরা যে এই দলকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহাতে কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এইরূপ ভাব করিয়া সে বেগে চলিয়া গেল। গোরার এই উদ্ধত অশিষ্টতায় বিনয় পরেশবাবুদের কাছে লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিল। কিন্তু সে মনে মনে স্পষ্ট বুঝিল বিনয়কেই এই দলের মধ্যে দেখিয়া গোরা এমন প্রবল বেগে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণ তাহার মনের মধ্যে যে একটি আনন্দের আলো জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে নিবিয়া গেল। সুচরিতা, বিনয়ের মনের ভাব ও তাহার কারণটা তখনি বুঝিতে পারিল, এবং বিনয়ের মত বন্ধুর প্রতি গোরার এই অবিচারে ও ব্রাহ্মদের প্রতি তাহার এই অন্যায় অশ্রদ্ধায় গোরার উপরে আবার তাহার রাগ হইল;—কোনো মতে গোরার পরাভব ঘটে এই সে মনে মনে ইচ্ছা করিল।

সুরাট।

এবার শেষ মুহূর্ত্তে স্থির হইয়াছে যে কংগ্রেস নাগপুরে হইবে না, সুরাটে হইবে। অতএব সুরাটের বৃত্তান্ত জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে সুরাটের বৃত্তান্ত লিখিতেছি—

সুরাট তপতী নদীর দক্ষিণ তটে প্রায় নদীর মোহানায় অবস্থিত। সুরাট সমুদ্র হইতে জলপথে ১৪ মাইল এবং স্থলপথে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। তপতী যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ বাঁকিয়া দক্ষিণপশ্চিমে গিয়াছে ঠিক সেই বাঁকের উপর সুরাট অবস্থিত। তপতী নর্ম্মদার ন্যায় পূণ্যতোয়া বলিয়া গণ্য না হইলেও ইহা স্থানীয় লোকের নিকট যথেষ্ট পবিত্র বলিয়া আদৃত। 'পুরাণ' বা নদীর পুণ্যকাহিনী অনুসারে তপতীর তীরে ১০৮ তীর্থ সংস্থিত। তন্মধ্যে সুরাট হইতে ১৫ মাইল পূর্ব্বে বোধান নামক তীর্থ সর্ব্বপ্রধান—তথায় প্রত্যেক ১২ বৎসর অন্তর ধর্ম্মমেলা হইয়া থাকে। সুরাট হইতে নদীর উজানে দুই মাইল দূরে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বর নামক স্থানদ্বয়ও পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এতদুভয় স্থানেই বহু মন্দির, যাত্রীগৃহ ও জলাবতরণিক সোপানশ্রেণী আছে। প্রতি বৎসর বহু স্নানার্থী যাত্রী এস্থানে আগমন করে। গুপ্তেশ্বর শবদাহের প্রসিদ্ধ স্থান।

তপতী মধ্যে মধ্যে কূল ছাপাইয়া ভীষণ বন্যায় বহু ধনজনের বিনাশের কারণ হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ১৩টি বিশেষ বন্যা প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সুরাট সহরটি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নদীর ধারে ধারে সওয়া মাইল বিস্তৃত। ইহা প্রাচীরবেষ্টিত। সহরের ভিতর দিকের প্রাচীর বহুকাল অপসৃত হইলেও প্রাচীর ভিত্তির খাদ সহর ও সহরতলীর সীমা রেখা হইয়া আছে। সহরের রাস্তা প্রধান পথ ছাড়া প্রায়ই অপ্রশস্ত ও বক্র হইলেও পাকা, পরিষ্কার এবং দিব্য জলনিষিক্ত। সহরের মধ্যে স্থানে স্থানে ফাঁকা জমি থাকিলেও সহরটি ঘন বসতিযুক্ত। বক্র সরু পথের দুধারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও ধনী পার্সীদিগের সুগঠিত হর্ম্ম্যশ্রেণী। সহরের বাহিরে পূর্ব্ব পাড়ার দুই একটি অংশ ব্যতীত প্রায় সকল স্থানই বেশ ফাঁকা। কাঁচা গলি গুলি সংস্কারাভাবে খাল হইয়া গিয়া পার্শ্বস্থ জমি অপেক্ষা নিম্ন হওয়ায় বর্ষার সময় পয়োনালীর কাজ করে এবং অন্য সময়ে ধূলিপূর্ণ হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়দিগের পল্লী ও কয়েকটি ধনবান পার্সীর বাগান বাড়ী ভিন্ন সকল গৃহই এই ধূলিপূর্ণ গলির ধারে অবস্থিত অসুন্দর কুটীরশ্রেণী। সহরের উত্তরে ও পূর্ব্বে, প্রাচীরের বাহিরে জমি উর্ব্বর, জলসিক্ত ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন। দক্ষিণের জমি অনুর্ব্বর এবং ধনশালী মুসলমান বা পার্সী বণিকের উদ্যান ভিন্ন সেদিকের জমি নগ্ন। পশ্চিম দিকে নদীর ধারে ক্যাণ্টনমেণ্ট, কাওয়াজের মাঠ ও বৃক্ষাচ্ছাদিত গৃহশ্রেণী দেখিতে অতি রমণীয়।

সুরাটের প্রধান দর্শনীয় জিনিষ কেন্দ্রবর্ত্তী কেল্লা। ১৫৪০ ও ১৫৪৬ সালের মধ্যে খোদাবন্দ খাঁ নামক একজন তুর্কী-সৈনিক কর্ত্তৃক ইহার নক্সা ও নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছিল। গুজরাটের রাজা মামুদ বেগারা ইহাকে অভিজাত মর্য্যাদা দান করেন। এই দুর্গ শস্ত্রশালী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার পক্ষে যদিও বহুকাল হইতে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, তথাপি এযাবৎ ইহা সংস্কৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত এই দুর্গে য়ুরোপীয় ও দেশীয় সৈন্য কিছু করিয়া রাখা হইত। অনাবশ্যক বোধে সেই সৈন্য এক্ষণে অপসৃত হইয়াছে এবং তদবধি এখানে নানা সরকারী আপিসের অধিষ্ঠান হইয়াছে।

প্রাচীরবেষ্টিত সহরের মধ্যে ১৪টি পল্লী বা 'চাকলা' আছে। সহরের বাহিরে ক্রমশ আর একটি সহর গঠিত হইয়া উঠিতেছে—ইহাতে পূর্ব্বাবধি সুশৃঙ্খলায় বসতি হইতেছে। এখানকার প্রসিদ্ধ সাধারণ সৌধ এই—ইংরাজী গির্জ্জা, মিশন গির্জ্জা, রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা, য়ুরোপীয় গোরস্থান; মুসলমান মসজিদ, খাজে দেওয়ান সাহেবের মসজিদ, নও সৈয়দ সাহেবের মসজিদ, সৈয়দ ইদরাসের মসজিদ, এবং মির্জ্জা সামি মসজিদ, এবং গোরস্থান; দুইটি প্রধান পার্সী অগ্নি-মন্দির (আতস্‌বেহেরাম), একটি সাহানশাহী পার্সীর ও অপরটি কদমী পার্সীর; হিন্দুদিগের গোসাবি মহারাজের মন্দির, গোবিন্দজী মহারাজ ও লালজী মহারাজ বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের ঠাকুর-বাড়ী, রামজীর মন্দির, স্বামী নারায়ণের মন্দির, বালাজীমন্দির, হনুমানের দুইটি মন্দির, অম্বাজী ও কাল্কা মাতার মন্দির; শ্রাবক সম্প্রদায়ের মহাবীর স্বামী ও আদ্যেশ্বর ভগবানের মন্দির; কতকগুলি যাত্রীগৃহ ও ধর্ম্মশালা; মানুষের জন্য দুইটি ও পশ্বাদির জন্য চারিটি হাঁসপাতাল; রেলষ্টেসন ও বিভিন্ন সরকারী আপিস ও বাজার ইত্যাদি।

চারিটি পশু-হাঁসপাতালে সব সমেত এক হাজার পশুর বাসস্থান আছে। প্রত্যেকটিতেই রুগ্ন, সুস্থ, বৃদ্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি সকল পশুই নির্ব্বিচারে গৃহীত হয়। রুগ্ন পশু সকলকে যত্ন করিয়া ঔষধ দ্বারা সেবা করা হয়। দুর্ব্বল ও কর্ম্মশ্রান্ত পশুদিগকে কিয়দ্দূরে চরিতে পাঠান হয় এবং সুস্থ পশুদিগকে অন্যান্য পশুর খাদ্যসম্ভার বহন বা অন্য লঘু কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়। ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাঁসপাতালে ৫২২টি পশু ছিল; যথা—১০৭টি গরু, ১৩৪টি বলদ, ৩৯ মহিষ, ৩২ ঘোড়া, ৯৫ ছাগল, ৫ হরিণ, ৭ কুকুর, ১ গাধা, ৩ হাঁস, ও ১টা মোরগ। পূর্ব্বে এখানে ছারপোকা মশা প্রভৃতি কীট পতঙ্গেরও হাঁসপাতাল ছিল, সেখানে কোন দরিদ্র লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে রক্ত খাওয়ান হইত। এক্ষণে সেই স্থানে কীটপতঙ্গদিগকে শস্যাদি খাওয়ান হইয়া থাকে।

সুরাটের ইতিহাসে চারিটি কাল বিভাগ করা যায়—(১) আদিকাল হইতে ১৫৭৩ সাল পর্য্যন্ত, (২) মোগল শাসনকাল ১৫৭৩—১৭৩৩; (৩) স্বাধীন রাজত্ব ১৭৩৩—১৭৫৯; (৪) ১৭৫৯ সাল হইতে ব্রিটিশ রাজত্ব কাল।

সুরাট প্রাচীন নগর কি না, তাহা স্থির করা কঠিন। যতদূর জানা যায় ইহা প্রাচীন নহে। কিন্তু সার টি, হার্বার্ট (১৬২৬) ইহাকে টোলেমীর উল্লিখিত মুজিরিস এবং ওগিলবি (১৬৬০—৮৫) টোলেমির সাইরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্র) মনে করেন। কেহ কেহ ইহাকে হুয়েন স্যাঙের (৬২৫—৬৪০) গুজরাটের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্যবন্দর সৌ-রা-টা মনে করেন। কিন্তু এই নগর তপতীর তীরবর্ত্তী সুরাট নহে, ইহা সোরাথ বা কাঠিয়াবাড়। প্রাচীন সৌরাষ্ট্র আপ্টের সংস্কৃত অভিধানে বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়ের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। আবি রেনাল বলেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুরাট একটি ক্ষুদ্র পল্লী বই আর কিছু ছিল না। শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ইহাকে সূর্য্যপুর বলেন, এবং প্রাচীন সূর্য্যপুরের স্থানেই সুরাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তিও ইহা সমর্থন করে। রাসমালা নামক গ্রন্থে (১।৬১) ব্রোচের সহিত সূর্য্যপুরের উল্লেখ দেখা যায়। হামিল্টন প্রভৃতি অনেকে ইহাকে রামায়ণে উল্লিখিত সুরাষ্ট্র মনে করিয়া বহু প্রাচীন বলেন।

১৪৯৬—১৫২১ সালে একজন ধনী হিন্দু বণিক সুরাটে বাস স্থাপন করে। তাহার জাতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, কেহ নাগর ব্রাহ্মণ কেহ বা অনাবলা ব্রাহ্মণ বলেন। তাহার নাম ছিল গোপী। সে সুরাটে একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ও বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং বহু বণিককে সেখানে বাস করিতে সম্মত করাইয়াছিল। সহরের একটি পল্লী এখনো তাহার নামে গোপীপুর নামে অভিহিত হইতেছে। সে একটি পুষ্করিণী বড় করিয়া (১৫১৬) তাহার সকল পাড় পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিল। সুরাটের এই সকল উন্নতি সাধনের জন্য গুজরাটের রাজা তাহাকে 'মালিক' উপাধি দান করিয়াছিলেন, এবং গোপীর স্ত্রী রাণী আখ্যা পাইয়াছিলেন। সুরাটের একটি পল্লী রাণীচাকলা ও একটি পুষ্করিণী রাণীতলাও নামে তাঁহার স্মৃতি আজো বহন করিতেছে। গোপীর সংস্থাপিত স্থানের প্রথমে কোন নাম ছিল না, ইহাকে 'নূতন স্থান' বলা হইত। গোপী দৈবজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সহরের নাম 'সুরাজ' বা 'সূর্য্যপুর' রাখিয়া সেই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরকে তৎরক্ষিত নামেই পরিচিত করিবার জন্য গুজরাটের রাজার অনুমতি চাহে। কিন্তু রাজা তাঁহার রাজ্যে হিন্দুনামের কোন নগর নূতন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পছন্দ না করিয়া তাহার নাম কোরাণের অধ্যায়ের নামের সাদৃশ্যে সুরাজ অল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া সুরাট করেন।

গোপীর ধনশালিত্ব সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। গোপী কিরূপে দীন দশা হইতে ধনবান হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তি আছে। গোপী এক ব্রাহ্মণ বিধবার পুত্র ছিল। সে পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়া কোন চাকরি প্রাপ্তির আশায় মাতার সহিত দিল্লীতে যায়। কিছু দিন ধরিয়া সরকারি সেরেস্তায় কাজের উমেদারি করিয়াও সফলকাম হইল না। তথাপিও প্রধান সেরেস্তার কাছে সে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইত, যদি কখনো কোন সুযোগে কিছু সুবিধা ঘটিয়া যায়। একদা সকল কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে একখানি বিশেষ জরুরি পার্সী চিঠি আসিল। এই চিঠি পড়াইবার জন্য একজন লোক গোপীকে ডাকিয়া আনিল। সেরেস্তার কর্ত্তা চিঠি লইয়া শব্দগুলি বানান করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, গোপী সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। কতক্ষণ পরে সেরেস্তার কর্ত্তা গোপীকে চিঠি খানি দিতে গেলে গোপী বলিল যে সে চিঠি পড়িয়াছে এবং চিঠির লিখিত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। সেরেস্তার কর্ত্তা যখন চিঠি আলোর দিকে ধরিয়া বানান করিতে ছিল, গোপী সেই অবসরে চিঠির উল্টা পিঠ হইতে চিঠি পড়িয়া ফেলিয়াছিল। গোপীর বুদ্ধিমত্তা দর্শনে প্রীত হইয়া সেরেস্তার কর্ত্তা তাহার একজন মুরুব্বি হইল এবং গোপীর ধনাগমের সূত্রপাত হইল। গোপী যে কেন তৎপ্রতিষ্ঠিত নগরের নাম সুরাজ রাখিতে চাহিয়াছিল তৎসম্বন্ধেও বহু কৌতুকাবহ কিংবদন্তি আছে।

সুরাট বহুবার শত্রুকর্ত্তৃক দগ্ধ ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। আকবরের রাজত্বকালে সুরাট একটা প্রধান বন্দর বলিয়া খ্যাত ছিল। এই জন্য সম্রাট আকবর সুরাট শাসনের জন্য দুই জন দক্ষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতিপয় য়ুরোপীয় বণিক-সম্প্রদায়ের সুরাটে আগমন ও অবস্থিতি সুরাটের ইতিহাসের একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। ১৭৫৯ সালে ইংরাজ সুরাট অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের

সর্ব্বত্র যে অরাজকতা ও উপদ্রব জাগ্রত হইয়াছিল তাহার সহিত ১৭৮২ সালের ঝড় ও ১৭৯০ সালের দুর্ভিক্ষ মিলিত হইয়া সুরাটের সৌভাগ্যনাশে সহায়তা করিয়াছিল।

মুসলমান রাজত্বকালে সুরাটের শাসনবিধি এইরূপ ছিল:—সহরের শাসনকর্ত্তার অধীনে ১৫০০ বেতনভুক সৈন্য ছিল। দেওয়ানিকার্য্যে ফৌজদার কাজি ও বাকনবিশের সাহায্যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। শুল্ক বিভাগে শাহবন্দর নামক কর্ম্মচারী আমদানি রপ্তানির দ্রব্য চিহ্নিত করিয়া মাশুল আদায় করিতেন। ফৌজদারী বিভাগের কর্ম্ম সহর-কোতোয়াল দ্বারা সম্পন্ন হইত। সহরের পুলিশবন্দোবস্ত খুব ভালো ছিল—কদাচ কোন গোলমাল সংঘটিত হইত। কোতোয়ালের অধীনেও পুলিশ ফৌজ থাকিত, কিন্তু কোতোয়ালের প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা ছিল না। রাত্রিতে তিন বার ৯টা, ১২, ও ৩টায় তাহাকে রোঁদ দিতে হইত। এই সব সুব্যবস্থায় ভয়ানক অপরাধ এত কম ছিল যে ১৬৯০ সালের পূর্ব্ব ২০ বৎসরে একটিও প্রাণদণ্ড হয় নাই। সুরাটের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে শান্তিরক্ষার জন্য একজন ফৌজদারের অধীনে বহু সৈন্য নিযুক্ত ছিল। এইরূপে ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দুমুসলমান পরম সদ্ভাবে কালযাপন করিত।

১৬০৮ সালে কাপ্তেন হকিন্স পরিচালিত প্রথম ইংরাজ-জাহাজ তপতীর মোহানায় আসিয়া উপনীত হয়। সার টমাস রো ১৬১৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর সুরাটে পৌছিয়া একমাস পরে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাতের জন্য আজমীরে যাত্রা করেন। ১৬১৮ সালের প্রারম্ভে তিনি সুরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এই যাত্রাতেই জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে ইংরাজের বহু বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সুবিধা মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছিলেন। সে গুলি প্রধানত এই:—(১) ইংরাজ-দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইবে; (২) বাণিজ্যশুল্ক মাত্র দিয়া তাহারা সর্ব্বত্র অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে; (৩) সম্রাটকে প্রদত্ত উপহার সমূহ সুরাটে তল্লাস করা হইবে না (৪) কোন ইংরাজের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত না হইয়া অপর ইংরাজদিগকে প্রদত্ত হইবে।

এই সময়ে সুরাটশাসনের ভার শাহজাদা খরমের উপর ছিল। সার টমাস রো তাঁহার সহিতও নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত স্থির করিয়াছিলেন।—(১) সুরাটের শাসনকর্ত্তা ইংরাজদিগকে জাহাজ ধার দিয়া সাহায্য করিবেন; (২) ইংরাজ বণিকগণ অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে; (৩) ইংরাজগণ সুরাটে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে; (৪) এবং আপনাদের মধ্যে কোন বিবাদ সংঘটিত হইলে তাহা তাহারা আপনাদেরই সালিসী দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী বণিক অনায়াসে এই সকল বাণিজ্যবিষয়ক সুযোগ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এই বিংশশতাব্দীর সুসভ্যতার দিনে কোন পাশ্চাত্য খৃষ্টান রাজ্য কি কোন 'কালা আদমীকে' কোন সুবিধা দিতে সম্মত হইবে? শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানগণ বহুবিষয়ে 'কালা আদমী' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সাম্য, মৈত্রী, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্বার্থশূন্যতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে তাহারা কোন ক্রমেই সমকক্ষও নহে।

১৬০৮ সালে যখন ইংরাজগণ প্রথম সুরাটের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় তখন সুরাট বিশেষ সম্পন্ন ছিল; বহু বণিকের সুগঠিত হর্ম্ম্যাবলীতে সুসজ্জিত ছিল। তৎকালে ইংরাজ বণিকগণ দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিত এবং দেশীয় লোকের সহিত বেশ মিত্রভাবে মিশিত। কুঠিওয়ালা সাহেবরা মুসলমান প্রভৃতিকে আহারে নিমন্ত্রণ করিত এবং নিজেরাও মাটিতে আসনে বসিয়া আহার করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজবণিকসংহতির ভৃত্যদিগের অসাধুতার জন্য স্বার্থহানি ঘটিয়াছিল। তাহাদের প্রধান কর্ম্মচারী ল্যাম্বটন সুরাটে থাকিয়া কোম্পানীর বহু ধনরত্ন চুরি করে—এ জন্য ১৭৩৯ সালে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। এই সব কারণে বিলাতের কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ আদেশ দিয়াছিলেন যে কোম্পানির অর্থসিন্দুকে তিনটি তালা বন্ধ থাকিবে। তালার চাবি কর্ত্তাদের কাছে থাকিবে এবং প্রতি মাসে তহবিল মিল করা হইবে।

রেভারেণ্ড ফিলিপ এণ্ডারসন্ তদ্বিরচিত "পশ্চিম ভারতে ইংরাজ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—দেশীয় লোকেরা খৃষ্টানদের সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা পোষণ করে। সুরাটে প্রায়ই দেশীয় লোককে বলিতে শুনা যাইত খৃষ্টানধর্ম্ম সয়তানের ধর্ম্ম; খৃষ্টান মাতাল; যদি কোন দোকানদারকে তাহার নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রস্তাব করা যাইত

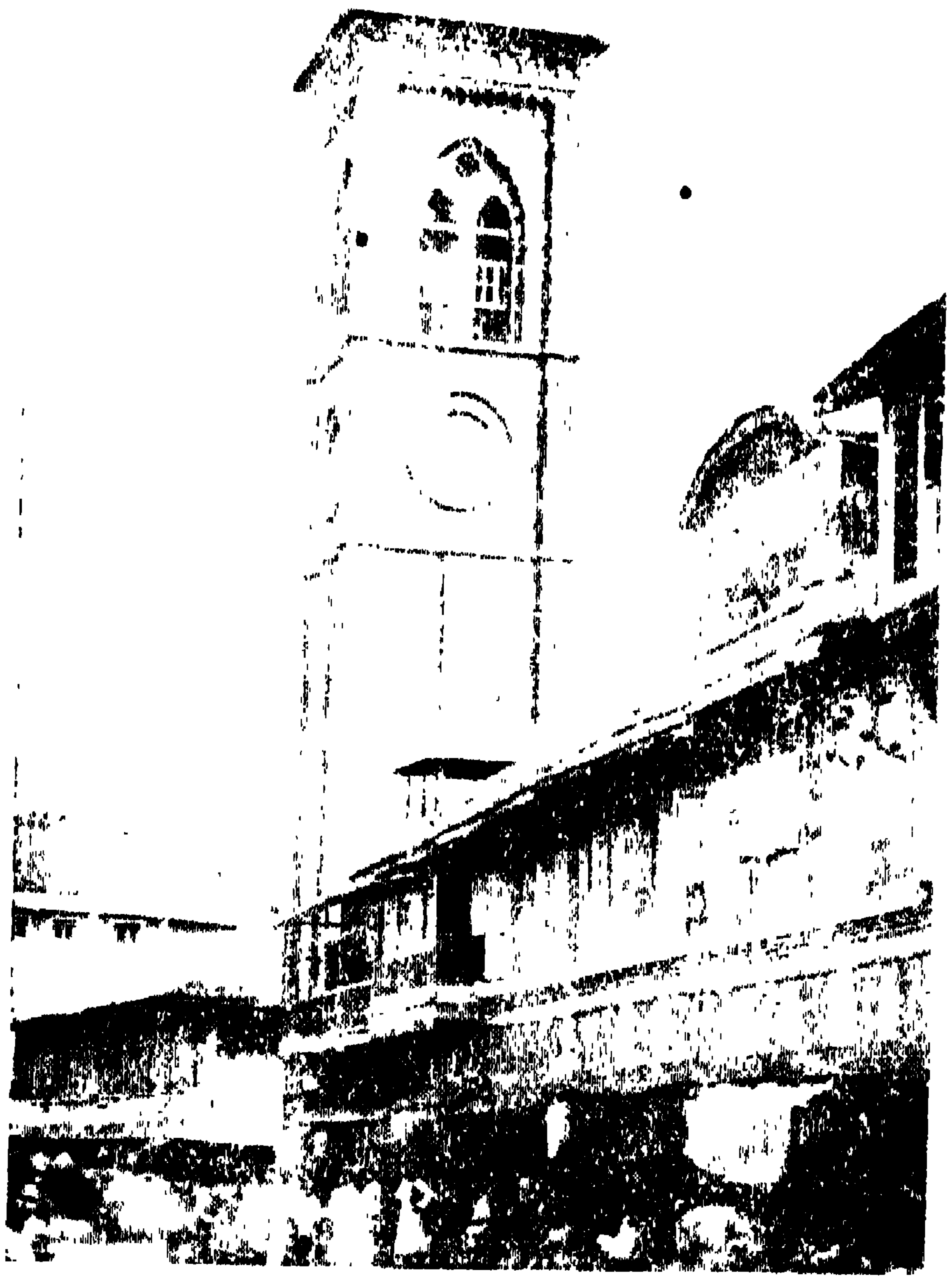

ক্লক টাওয়ার।

স্বামী নারায়ণ মন্দির।

[illegible]

বিষ্ণু মন্দির

তবে সে বলিত 'আমাকে কি খৃষ্টান পাইয়াছ যে আমি তোমায় ঠকাইয়া বেশি দাম লইব ?" ইংরাজেরই লিখিত পুস্তকে দেখা যায় যে তখনকার দেশী ব্যবসাদারেরা প্রবঞ্চক ছিল না।

১৮০০ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বল ও শঠতা প্রয়োগ করিয়া নবাবের কাছ হইতে সুরাট অধিকার করিয়া লয়।

ইংরাজঅধিকারের পূর্ব্বে (১৬০৮-২০) সুরাট জনবহুল ও বহুবণিকঅধ্যুষিত ছিল। সেখানকার লোকেরা দীর্ঘকায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহারে সংযমী ও সৎ ছিল। সুরাটের বাণিজ্য লোহিতসাগরোপকূলস্থ মোচা সহরের সহিত এবং সুমাত্রার অচিনের সহিত চলিত। সুরাট হইতে কাপাস ও কার্পাসবস্ত্র মোচাতে প্রেরিত হইত। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ট্যাভার্ণিয়ে ও বার্ণিয়ে সুরাটের বস্ত্রশিল্পের প্রশংসা করিয়াছেন (ঢাকার মসলিন প্রবন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য)। এই সকল বস্ত্র ক্রয়ের জন্য তুর্কিস্থান হইতে, আবিসিনিয়া হইতে এবং মিশর হইতে বণিকগণ মোচায় সমবেত হইত। সুমাত্রার অচিনে একটি পাড়া গুজরাতীদিগের জন্য স্বতন্ত্র ছিল। ১৬০৩ সালে যবদ্বীপে এবং ১৬১১ সালে দক্ষিণে ৫° অক্ষরেখাস্থিত বান্দা নামক দ্বীপেও গুজরাতীদিগকে দেখা গিয়াছিল। কাপ্তেন সারিস জাপানে গিয়া গুজরাতী ছিট ও কাপড় দেখিয়াছিলেন।

সুরাটে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় হইত—লৌহ, তাম্র ও ফটকিরি ; হীরক, চুনি, স্ফটিক, পান্না ; গম, ছোলা মটর, শুটি; ঔষধ ; মাখন ও খাদ্য, জ্বালানি, নানাবিধ তৈল ; সাদা ও কালো সাবান, চিনি, আচার ও মোরব্বা, কাগজ, গালা, এবং আফিম, নীল। ইহা কিনিবার জন্য ইংরাজ ও ওলন্দাজগণ সুরাটে সমবেত হইত। কিন্তু প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল রেশম ও কার্পাস বস্ত্র—এই সকল বস্ত্র য়ুরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার সর্ব্বত্র সবিশেষ সমাদৃত ছিল। কোন কোন কাপড় তুষারধবল ও অতি সূক্ষ্ম হইত। কোন কোন কাপড়ে রেশমী ফুল তোলা হইত এবং মধ্যে মধ্যে রূপালী বা সোণালী জরির কাজ করা থাকিত। রঙিন কাপড়ের ও ছিটের লেপের উপর এমন সুন্দর নক্সার সেলাই করা হইত যে দেখিলে অঙ্কিত চিত্র বলিয়া মনে হইত। সুরাটে ভালো ভালো কার্পেটও প্রস্তুত হইত। মূল্যবান কার্পেট রেশমে প্রস্তুত হইত এবং তদুপরি ফুল বা নক্সা অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর হইত। কোন কোন কার্পেটের জমি সোণালী রূপালী জরির এবং ফুল ও নক্সা রেশমের করা হইত। সুরাটের কাঠের কাজও খুব প্রসিদ্ধ ছিল। খাট পালঙ্ক প্রভৃতি গৃহসামগ্রীতে গালার রং করা হইত। লিখিবার ডেস্কের উপর ঝিনুক, হাতির দাঁত, সোনা রূপা বা জহরাত বসাইয়া মিনার কাজ করা হইত। কূর্ম্মপৃষ্ঠের ছোট ছোট বাক্সগুলি অতি মনোহর হইত। কিন্তু সব জিনিষই অত্যাশ্চর্য্য সস্তা ছিল। পর্ত্তুগালের একজন বণিক লিখিয়াছেন যে এই সকল জিনিষই পর্ত্তুগালের জিনিষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের নিকট হইতে পর্ত্তুগালের শিক্ষণীয় অনেক আছে। সুরাটের লোকেরা যাহা কিছু নূতন দেখে বা শুনে তাহাই তাহারা আয়ত্ত করিয়া ফেলে। তাহারা এত বুদ্ধিমান তবুও তাহারা সহজে কাহাকেও ঠকাইত না এবং নিজেরাও সহজে ঠকিত না। তাহাদের মত সজ্জন সদাচারী ভদ্রলোক আর দেখা যায় না—তাহারা সহজে পর্ত্তুগালের কোন রীতি নীতি নকল করিত না।

যে সকল বণিক এই বাণিজ্য ব্যাপারে লিপ্ত ছিল তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) ভারতের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান (২) এসিয়ার বিভিন্ন প্রদেশবাসী, যথা পারসিক, তাতার, আরব, আর্ম্মানি প্রভৃতি ; এবং (৩) য়ুরোপীয়, যথা ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাশী ও পর্ত্তুগীজ।

য়ুরোপ হইতে সুরাটে আমদানি হইত—তরবারি, ছুরী, আয়না, খেলনা, কুকুর, পারদ, হস্তিদন্ত, সীসক, সিন্দূর, প্রবাল এবং মুক্তা।

১৬৫৮ হইতে ১৭০৭ সালের মধ্যে সুরাটের পূর্ণ বাণিজ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৬৯৫ সালে সুরাট ভারতের প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল—জগতের যাবতীয় জাতি এখানে সমবেত হইত এবং ভারতসাগরযাত্রী কোন জাহাজই সুরাটে না আসিয়া অন্যত্র যাইত না। সুরাটের হিন্দু বণিকদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে তাহারা মনে মনে এত শীঘ্র এমন সকল অঙ্ক কশিত যে অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ আঙ্কিক তাহা কাগজ কলম লইয়া কশিতে পারে না। ১৬৬৪ সালে সুরাটের দুইটি বণিকপরিবার জগতের মধ্যে

শ্রেষ্ঠতম ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল (অর্ম্মের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। একজন হিন্দু বণিকের ধন পরিমাণ ৮০ লক্ষ (স্বর্ণ?) মুদ্রা ছিল এবং ১৬৬৪ সালে শিবাজী এক দোকানে ১১ সের মুক্তার মালা দেখিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোল্লা আবদুল জাফর ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে তাঁহার নিজের ১৯ খানি জাহাজ নিজেরই পণ্য বহন করিয়া বাণিজ্যযাত্রা করিত। ১৬৯৫ সালেও কোন কোন বণিক এরূপ ধনী ছিলেন যে তাঁহারা নিজের দ্রব্যসম্ভারে একখানা বড় জাহাজ বোঝাই দিতে পারিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বহির্বাণিজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে জাহাজ তৈয়ারিও একটি বিশেষ ব্যবসায় ছিল।

১৬৭৪, ১৬৮০, এবং ১৬৯৭ সালে ইংলণ্ডের রেশম ও কার্পাস তন্তুবায়গণ ভারতীয় বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে এমন ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করে যে ১৭০১ সালে এক আইন পাস করিয়া বিলাতে ভারতীয় বস্ত্র পরিধান দণ্ডনীয় করা হয়। ইহার ফলে সুরাটের বাণিজ্যে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অবসানসময়ে ফরাশী তন্তুবায়গণও আপত্তি উত্থাপন করে। সুরাটের শাসন কর্ত্তা রোস্তম আলি খাঁর শাসনকালের দুই বৎসরে (১৭২৩—২৫) যে সকল বণিক ইংরাজের সহিত কারবার করিত তাহাদিগকে অত্যন্ত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত—এই কারণেও গুজরাটের বাণিজ্য কতক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৭২১ সালে লণ্ডনের তাঁতিরা মহা দাঙ্গা ফসাদ আরম্ভ করায় ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র পরিধান একেবারে রোধ করার জন্য এক নূতন আইন করা হইয়াছিল।

আবি রেনাল (১৭৮০) বলেন যে য়ুরোপের বণিকগণ যখন জানিত না তখন সুরাটের বণিকগণ জানিত যে বাণিজ্য এক নির্দ্দিষ্ট রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতের যে কোন বাজারের জন্য সুরাটে হুণ্ডি পাওয়া যাইত। দূরদেশে পণ্য প্রেরণের সময় জাহাজ ইনসিওর করা সাধারণ ব্যাপার ছিল। বণিকদিগের সততা এত অধিক ছিল যে টাকার থলি গালামোহর করিয়া টিকিট আঁটিয়া আদান প্রদান চলিত, কেহ কখন গুণিয়া বা ওজন করিয়াও দেখিত না।

বর্ত্তমানকালে এতৎপ্রদেশে কৃষিব্যতীত কার্পাস ব্যবসায় প্রধান। কার্পাস হইতে সূত্র বয়ন ও বস্ত্র প্রস্তুত হস্ত দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৯০৪ সালে সুরাটে তিনটি কাপড়ের কল ছিল। ১৮৭৬ সালে বাষ্পচালিত ১৮টি কল ছিল। ১৮৭৭ সালে শ্রীযুক্ত জামাল উদ্দিন মহম্মদভাই বাষ্পচালিত কাগজের কল স্থাপন করেন। য়ুরোপীয় সস্তা ছিটের আমদানির প্রাবল্যে সুরাটের ছিটের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজো সুরাটে রেশমী বস্ত্র প্রচুর উৎপন্ন হয়, কিংখাব বয়ন সুরাটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়। সুরাটের সূচিশিল্পের খ্যাতি এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। সুরাটের ধারালো যাঁতি ভিন্ন ধাতুর দ্রব্য এখন আর কিছু ভালো হয় না। মোটের উপর সুরাটের পূর্ব্ব গৌরবের এখন অবশেষ অতি অল্পই আছে।

সুরাটের হিন্দু মুসলমান বা পার্সী সকলেই আনন্দ ও জাঁকজমকে ভালোভাবে থাকিতে ভালবাসে। সুরাটের বণিকসম্প্রদায় এক একটি সংঘ গঠন করে। প্রধান বণিক সংঘের নাম 'মহাজন'। এই সংঘের জন্য টাকা সংগ্রহের উপায় বড় অদ্ভুত। কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে কেবল একজন ভিন্ন সকলকে দোকান বন্ধ করিতে হয়। এবং সেই একটি দোকান খোলা রাখিবার অধিকার নিলামের সর্ব্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হয়। সেই নিলাম লব্ধ অর্থ সংঘে ব্যয়িত হয়।

সুরাটের প্রায় সকল গৃহেই একটি করিয়া কূপ ও একটি করিয়া বৃষ্টির জল ধরিবার চৌবাচ্চা আছে। দুই একটি কূপ ভিন্ন সহরের প্রায় সকল কূপের জলই ক্ষারস্বাদ, এজন্য তাহা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রায় সকল ধনী ব্যক্তিই বৃষ্টির জল পান করে। বৃষ্টির জল সিমেণ্ট করা ছাদে পড়ে এবং তথা হইতে ধাতব বা বাঁধান নালির মধ্য দিয়া বহিয়া চৌবাচ্চায় জমা হয় এবং সেখানে থিতাইয়া পানের উপযুক্ত হয়। এবং সেই জল সারা বৎসর পান করা হয়।' যাহাদের বৃষ্টির জল সংগ্রহের কোন উপায় নাই, তাহারা হয় তপতীর নয় ত সহরের বা বাহিরের কোন মিষ্টস্বাদ কূপের জল ব্যবহার করে।

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে সুরাট জেলার বুলসর সহরে প্লেগ আসিয়া মহা অনর্থ সংঘটিত করে। মোগোদ, সুরাট সহর, এবং র‍্যাণ্ডার টাউন প্লেগের তাণ্ডব ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল।

১৭৯৮ সালে সুরাটের জনসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ। ইংরাজ অধিকারের পর ১৮১৮ সালে জন সংখ্যা মাত্র ১৫৭১৯৫ হইয়াছিল। ১৯০১ সালের সেন্সস অনুসারে জন সংখ্যা হয় ১১৯৩০৬। ইহার মধ্যে হিন্দু ৮৫৫৭৭, মুসলমান ২২৮২১, পার্সী ৫৭৫৪, জৈন ৪৬৭১, খৃষ্টান ৪৫৬, শিখ ৩, ও অন্যান্য ২৪। সুরাটে লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা মোটের উপর শতকরা ১৩ জন; পুরুষের শতকরা ২৪ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ২ জন মাত্র। হিন্দুর মধ্যে লেখাপড়া জানা পুরুষ শতকরা ২২, স্ত্রী ১, মোটের উপর শতকরা ১২; মুসলমান মোটের উপর ১৬, পুরুষ ৩১, স্ত্রী ২; জৈন মোটের উপর ৪৫, পুরুষ ৭৪, স্ত্রী ৯। সুরাটের জৈনদিগের মধ্যেই বিদ্যা চর্চ্চা অধিক।

সুরাটের প্রধান ভাষা গুজরাতী। সুরাটের নিকটেই কার্পাসক্ষেত্র ব্রোচ। এই ব্রোচ প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ। এইখানে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের বাড়ী ছিল। কংগ্রেসযাত্রিগণ এই ব্রোচ বা ভড়োচ বা ভৃগুকচ্ছও দর্শন করিতে পারিবেন।*

সূর্যাদির পর্যায়ের অর্থ।

অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী 'একটী প্রশ্ন' নাম দিয়া বহুপ্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হউক বহু হউক, তাঁহার জিজ্ঞাসায় অনেকের চিত্ত প্রশ্নসম্বন্ধে আকৃষ্ট হইবে। সূর্যাদির পর্যায়ের অর্থ জানিতে এবং আধুনিক জ্ঞানের সহিত সে অর্থের ঐক্য দেখিতে পংডিত মাত্রেরই ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। অ-পংডিত যে আমি, সময়ে সময়ে আমারও ইচ্ছা হইয়াছে। এই সহানুভূতিহেতু প্রশ্নসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেছি। সম্প্রতি অবসর-অভাবে বাহুল্যে গেলাম না।

গোস্বামী মহাশয় জিজ্ঞাসিয়াছেন, 'আমাদের প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকেরা কি Solar Spectrumএর কথা অবগত ছিলেন?' কিন্তু প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিক—এই কথা শুনিবা মাত্র কোন কোন পাঠক হয় ত কানে আংগুল দিবেন। কারণ ইহাঁরা বিজ্ঞান বলিতে বর্ত্তমান দুই এক শতাব্দীর য়ুরোপের বিজ্ঞান বোঝেন, পুরাণের কথাকে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের উপযুক্ত ভাষায় দেখিতে অভিলাষ করেন, এবং পিতৃপিতামহ হইলেও প্রাচীন বলিয়াই প্রাচীনদিকে অশ্রদ্ধা করেন।

অন্য পাঠক আছেন। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যে-কোন কথারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাইতে উৎসুক হন, এবং প্রাচীনেরাও যে মানুষ ছিলেন, অন্ততঃ সকলেই যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন না,—একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। আমার সামান্য বিবেচনায়, বিষয়ের প্রতি রাগ-বিরাগে সত্য-নির্ণয়ে বিঘ্ন জন্মে।

প্রাচীন জ্ঞান-পরিমাণের সময় একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রাচীনেরা উপস্থিত নাই, তাঁহাদের জ্ঞানের যাবতীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, এবং যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হয় নাই। বিশেষতঃ, তাঁহাদের ভাষা এখন সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। অতএব তাঁহাদের পক্ষে একটু টানিলে অত্যন্ত দোষ হইবে না।

যেখানে বিজ্ঞানের—অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের কথা, সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞ সাক্ষীরূপে আনিতে হইবে। যেখানে সংস্কৃত ভাষার কথা, সেখানে সংস্কৃত পংডিত অবশ্য চাই। এই দুই সাক্ষী না পাইলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। যদি একই ব্যক্তি আধুনিক বিজ্ঞান শিখিয়া থাকেন, এবং অগাধ সংস্কৃত-শাস্ত্র-সমুদ্র মথিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই উপযুক্ত বিচারক হইতে পারেন। এরূপ পংডিতের অভাবে উক্ত দ্বিবিধ পংডিতের সম্মিলন আবশ্যক। সংস্কৃত-পংডিত প্রাচীন—অতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণ একত্র করিয়া স্থূলতঃ ব্যাখ্যা করিবেন, তার পর বিজ্ঞান-পংডিত সেই সকল প্রমাণ সমালোচনা করিবেন। সংস্কৃত-পংডিত ঐতিহাসিক ক্রম উপেক্ষা করিবেন না, পরন্তু গোড়া ছাড়িয়া আগা ধরিলে সত্যনিরূপণে বিঘ্ন হইবে। নদীর শাখা প্রশাখা কালক্রমে এত অধিক হয় যে, মূল নদী কোন্‌টা তাহা বলিতে পারা যায় না। গোড়ার দিকে গেলেই আসল নদীটা চেনা যায়।

পংডিতের প্রয়োজনের একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছিলাম জলে দুধে মিশাইয়া হাঁসকে খাইতে দিলে হাঁস নাকি নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ

* এই প্রবন্ধ প্রধানতঃ ইংরাজী Modern Review নামক মাসিক পত্র হইতে সংগৃহীত হইল।

করে। কথাটা এমনই অসম্ভব যে পরখ করিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। অথচ নাকি কেহ কেহ দুধ দেখা কলের পরিবর্তে হাঁস পুষিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, কেহ বা হাঁসের মুখের লালার রাসায়নিক পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কএক বৎসর পূর্বে 'ভারতী'তে পংডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কাব্য হইতে হংসের নীরত্যাগ ও ক্ষীর গ্রহণ বিষয়ে কতকগুলি প্রমাণ একত্র করিয়াছিলেন। তখন হাঁসের ক্ষমতার পরিচয় লইবার সুযোগ ঘটে। কারণ ভিতরে কিছু সত্য না থাকিলে উপমার সৃষ্টি হইত না। ফল 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, ক্ষীর অর্থে গবাদির দুগ্ধ নহে, পদ্মের মৃণালের ক্ষীর অর্থাৎ চলিত কথায় শাদা রস। সংস্কৃত ভাষায় ক্ষীর শব্দে গবাদি পশুর দুগ্ধ এবং বৃক্ষের ক্ষীর-বৎ রস—দুই-ই বুঝায়। পদ্মের ডাঁটার ক্ষীর ছাড়িয়া গবাদির ক্ষীরে আসাতেই হাঁসের ক্ষমতা হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রশ্ন করিলে উত্তর পাওয়া যায় না, উত্তরের সমালোচনা হয় না, সমালোচনা হইলে সময়ে সময়ে মানুষের হয়, উত্তরের হয় না। প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার দুই কারণ মনে হয়,—(১) আলস্য, (২) অবজ্ঞা। বাংগালীর আলস্যের পরিচয় বাংগালী অধিক আর কি দিবে? অবজ্ঞা কখনও নিজের প্রতি কখনও প্রশ্নকারকের প্রতি। অমুক ব্যক্তি লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, আমার মত লোকের কথা কহাতে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা হইবে, এই এক আশংকা। অন্যে ভাবে, কে কোথায় কি বলিতেছে লিখিতেছে, তার কথার উত্তর দিতে হইলে কিংবা তার ভুল দেখাইতে হইলে জীবনে আর কোন কাজ করিবার সময় থাকিবে না। বোধ হয়, একথাও ঠিক, অতি অল্প লোক সুস্থচিত্তে নিজের কাজের দোষ দেখিতে পারে। পরের কথা সহিতে পারা অল্প সংযমের ফল নহে। তার উপর, বাংগালীর ঔদ্ধত্য প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মাঝের পথও ত আছে। মানীর মান রাখিয়াও তর্ক করিতে পারা যায়, এবং মূর্খের ভুল শোধন জ্ঞানী না করিলে আর কে করিবে? জ্ঞানী সর্বজ্ঞ নহেন, এবং কোনও লোক যাবতীয় বিষয়ে মূর্খ হয় না। আলস্য ছাড়িয়া যিনি যতটুকু জানেন তিনি ততটুকু জানাইলে দেশের সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র দ্বারা জ্ঞান-বিস্তারের সাহায্য হয়।

এখন গোস্বামী মহাশয়ের দুই একটা প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে জানাইতেছি। তিনি ঠিক বলিয়াছেন, তাঁহার এক এক প্রশ্ন আলোচনা করিতে এক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক। আমার সামান্য বুদ্ধিতে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সূর্যাদি নবগ্রহের পর্যায়গুলির অর্থ 'আমাদের জোতিষী ও জ্যোতিষ' নামক পুস্তকে দেওয়া গিয়াছে। সংকর্ষণ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সম্বন্ধেও দুই এক কথা ঐ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। বোধ হইতেছে, সে পুস্তকে হরিদশ্ব ও লোহিতাশ্ব নামের কোন উল্লেখ করা হয় নাই। অশ্ব অর্থে কিরণ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ মনে হয় না। হরিত অর্থে হরি বা কপিল বর্ণ ও হরিদ্রাবর্ণ মনে হয়। হরিত অর্থে সবুজ আছে বটে, কিন্তু সূর্যের সবুজ রং কখনও দেখি না। জবাকুসুমসংকাশং ইত্যাদিতে লোহিতাশ্ব স্পষ্ট হইয়াছে।

সপ্তাশ্ব সম্বন্ধে নানা রকম অনুমান হইয়াছে। বেদ-পংডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন, সূর্য নিজ শক্তিতে—যেন রশ্মি বা রশা দিয়া সপ্ত গ্রহকে আকর্ষণ করিয়া আছেন বলিয়া সপ্তাশ্ব। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। প্রাচীনেরা তিন পাঁচ সাত নয়—এই কএকটি সংখ্যার ভক্ত ছিলেন। নানা গণনায় এই ভক্তির ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে সাত উষা, সাত দিক্‌, সাত পুরোহিত সাত আদিত্য এবং সূর্য সপ্তাশ্ব ও সপ্ত-চক্র। পরে আদিত্য আট, দশ, বার হইয়াছিলেন। পুরাণে আদিত্য বার, এক-চক্র। পৃথিবীতে সাত দ্বীপ, সাত সমুদ্র, সাত পবন, সাত সাত চৌদ্দ ভুবন। এই সকল সাত গণনার মূলে কোন নিত্য প্রত্যক্ষ নৈসর্গিক ব্যাপার ছিল। বোধ হয়, বেদের সাত গণনা হইতে পরে এত সাত আসিয়াছিল, এবং বেদের সাত মাস অপর সকল সাতের মূল ছিল। যে গণনা একবার চলে, তাহার লোপ করা দুঃসাধ্য। সপ্তাশ্ব ও সপ্ত আদিত্য সম্বন্ধে টিলক মহাশয়ের ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হইয়াছে।* প্রাতঃকালে ঘাসের উপরের শিশির-কণায় নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া

* তৎকৃত The Artic Home in the Vedas দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের অভাবে 'প্রবাসী' (১৩১০ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ) দ্রষ্টব্য। এখানে আর এক কথা মনে পড়িল। 'প্রবাসী'তে আলোচনায় এবং

দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকরলাল দেশাই, [illegible]

[illegible]

যায়, এবং অত্যন্ত গ্রাম্য লোকেও জানে সূর্যের আলোর গুণে সে সব বর্ণের উৎপত্তি। দিক্ বিশেষে জলের ফুৎকারে ইন্দ্রধনু দেখা যায়। ইহাও সূর্যের গুণে ঘটে, তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। আরও একটু জাইতে পারা যায়। পৃথিবীতে যে অসংখ্য বর্ণের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল বর্ণের মূলে সূর্যরশ্মি আছে, এ তথ্য অল্প অনুধাবনেই বোঝা যায়। প্রাচীনেরা বিশ্লেষণপটু ছিলেন, তাহাও সকলে স্বীকার করিবেন। কিন্তু সূর্যরশ্মির গুণে নানাবর্ণের উৎপত্তি, এবং নানাবর্ণের কিরণ মিশিয়া সূর্যের শ্বেতবর্ণ আলোর উৎপত্তি, এই দুই কথা এক নহে। যতদিন শেষোক্তভাবের কোন শব্দ না পাইতেছি, ততদিন বলিতে পারি না যে প্রাচীন আর্যেরা সৌর-কর-দৃশ্যের—solar spectrumএর কারণ অবগত ছিলেন।

অগ্নির এক নাম সপ্তার্চি। ইহার সহিত কৃত্তিকা নক্ষত্রের সাত তারার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। অগ্নি, কৃত্তিকার অধিপতি, এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কৃত্তিকার সাতটি তারার নাম পর্যন্ত আছে। (আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষের ২৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।) হয় ত বেদের সাতমাসের সাত পুরোহিতের সাত অগ্নি হইতে আগুনের সাত শিখা গণনা দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

পুরুরবা ও উর্বশীর উপাখ্যানের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' পুস্তকে করা গিয়াছে। বায়ু-পুরাণের উপাখ্যানে পুরুরবা গন্ধর্বদিগের নিকট হইতে অগ্নি পাইয়াছিলেন। আ'জকা'লকার দিনে আগুন উৎপাদন অতি সহজ হইয়াছে। পূর্বকালে—পূর্বকালে কেন, বিলাতী দিয়াশলাই প্রচলনের পূর্বে—আগুন উৎপাদন সহজ ছিল না। এখনও এদেশেই এমন স্থান আছে যেখানের লোকেরা দিবারাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখে; কারণ একবার নিবিলে পুনর্বার উৎপাদন সহজ নহে। ওড়িশার কোন কোন পার্বত্য স্থানের লোকেরা অরণি-প্রস্তর (অগ্নি-প্রস্তর বা চকমকির পাথর) এবং খর লৌহের পরস্পর আঘাতে আগুন উৎপাদন করিতে জানে না। কারণ অরণি-প্রস্তর সুপ্রাপ্য হইলেও খরলৌহ সুপ্রাপ্য নহে। বস্তুতঃ অগ্নিমন্থ (গনিআরি গাছ) এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের অরণি ও কুমার (মা এবং পো) কাষ্ঠদ্বয় ঘষিয়া আগুন করিতে দেখিয়াছি। অতএব বৈদিক কালের অরণি ও কুমার এখনও এদেশে বর্তমান। আগুন-উৎপাদন ও পুরুরবা ও উর্বশীর উপাখ্যান ময়মনসিংহ হইতে প্রচারিত আরতি নামক মাসিকপত্র (১৩০৯ সাল অগ্র) দ্রষ্টব্য। বঙ্কিম বাবু এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানিতাম না। সম্প্রতি জানিবার অবশরও নাই।

টিলকের গ্রন্থে এবং 'প্রবাসী'তে সে গ্রন্থের আলোচনায় যুগ ও মহাযুগ গণনার উল্লেখ আছে। কএক বৎসর পূর্বে 'নব্যভারতে' কল্পযুগাদি নামে প্রবন্ধে কল্প ও যুগের জ্যোতিষিক আলোচনা করা গিয়াছে। উহার দুই এক স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপর ঠিক আছে।

১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসের 'সাহিত্যে' ওষধিপতি চন্দ্রের কথা আছে। ওষধি হইতে সোমলতার কথা মনে আসিতেছে। সংস্কৃত পংডিতের সাহায্য কত আবশ্যক হয়, তাহার এক দৃষ্টান্ত দিতেছি। তিন চারি বৎসর হইতে একটি লতা পুষিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য কোন কোন পংডিত এই লতাকেই বেদের সোমলতা বলিয়াছেন। কিন্তু আমি সংস্কৃত শাস্ত্রের সোমলতার সহিত আমার পোষা লতা মিলাইবার সুবিধা পাই নাই। বেদ হইতে আয়ুর্বেদ পর্যন্ত সোমলতার যত বিশেষণ ও বিবরণ আছে, যদি তাহা কেহ অনুগ্রহ করিয়া একত্র করেন, তাহা হইলে মিলাইবার সুবিধা হয়। অবশ্য পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু 'প্রবাসী'র পাঠকদিগের মধ্যে কোন সংস্কৃতশাস্ত্রানুরাগী পাঠক নাই কি? যদি কেহ থাকেন, তাঁহার অবগতির নিমিত্ত আমার সোমলতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। এই লতা বাস্তবিকই মাটিতে লতাইয়া যায়, কারণ ডাঁটা সরু, পুঁই ডাঁটার মত।

...ত্র বালগংগাধর 'টিলক' লিখিয়াছিলাম বলিয়া কেহ কেহ 'টিলক' ...কে শুদ্ধ করিয়া 'তিলক' লিখিতে বলিয়াছিলেন। তিলক ... আমার অজানা ছিল না, এবং বলা বাহুল্য তি অল্পেই টি ...য়া পড়ে। কিন্তু সংজ্ঞা শুদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও ...ছে কি? বোনার্জী-সাহেবকে বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব বলিলে চিনিবে? বস্তুতঃ বালগংগাধর তিলক নহেন, টিলকও নহেন। ...দের মত মরাঠী, তেলুগু ও ওড়িয়াতে দুই প্রকার ল আছে। আমরা ... প্রকার জানি। অন্য প্রকার জানাইবার অক্ষর বাংগলায় নাই। ... এই লকে (লড) বলি, তাহা হইলে বালগংগাধর টি (লড) ক। ...শব্দ ও মরাঠী টিকলা, টিকা, টিক্কা ও বাংগলা টিকলী, টিকা একার্থ।

কিন্তু পুঁই ডাঁটার মত সবুজ নহে। পাতা নাই বলা যাইতে পারে, ডাঁটায় লম্বা রেখা আছে। অনেক শাখা প্রশাখা হয়। শাদা ক্ষীর, আস্বাদে ঈষৎ অম্ল। বৎসরে দুইবার ফুল হয়, একবার চৈত্র মাসে, আবার আশ্বিন মাসে! ফুল দেখিতে কতকটা আকন্দ ফুলের মত, প্রায় তার মতন বড়। এই লতা অর্কাদিবর্গের অন্তর্গত। (বৈজ্ঞানিক লাটিন নাম sarcostemma brevistigma, or Asclepias acida)

কতকগুলি বৃক্ষের প্রধান প্রধান পর্য্যায়ের অর্থ দিবার চেষ্টা প্রবন্ধান্তরে করিবার ইচ্ছা আছে। ইতি—

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। কটক।

প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।

নিবেদন।

তীর্থোপলক্ষে প্রয়াগে বিস্তর বাঙ্গালি ভদ্রলোক ও বাঙ্গালি সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এ স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাড়য়ারি, মহারাষ্ট্রীয়, হিন্দুস্থানি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অপরিচিত আগন্তুক ভদ্রলোক এবং সাধু-সন্ন্যাসীদিগের সুবিধার জন্য এ স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, অন্নক্ষেত্র প্রভৃতি আছে কিন্তু বাঙ্গালীদিগের এরূপ কোন স্থান নাই যেখানে দুই দিন বাস করিতে পারা যায় অথবা রেল হইতে নামিয়া অল্প সময়ের জন্য আশ্রয় লওয়া যায়। প্রয়াগে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অল্প নহে। উঁহাদের মধ্যে অনেকে পাণ্ডাদিগের পাল্লায় পড়িয়া সময় সময় বিস্তর কষ্ট পান। বিশেষতঃ উঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিবার ও বালকবালিকা সঙ্গে করিয়া আসেন তাঁহাদের আরও বিপদে পড়িতে হয়। এলাহাবাদের বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অল্প নহে। এইরূপ কাশী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানেও বিস্তর বাঙ্গালী আছেন। এই সকল প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য যে আমরা আমাদের স্বজাতীয় তীর্থযাত্রী ভদ্রলোক এবং সাধু সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ অসুবিধা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হই এবং উঁহাদের বাসের ও দুই এক দিবসের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

এলাহাবাদে একটি পুরাতন কালীবাড়ি আছে। উক্ত উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং উহা দ্বারা অল্পমাত্রায় উক্ত উদ্দেশ্য সাধিতও হইত। আজি কয়েক বৎসর যাবৎ সাধারণের অযত্নে এবং তত্ত্বাবধানের অভাবে উহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল গৃহাদি উপস্থিত বর্ত্তমান আছে তাহাও সংস্কারাভাবে পড় পড় হইয়াছে। অভ্যাগত অতিথি প্রভৃতির থাকিবার জন্য আদৌ কোন স্থানই নাই, পরিবার লইয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থানেরও বিশেষ অভাব। এই সকল অভাব দূর করিতে হইলে উক্ত কালীবাড়ির জীর্ণসংস্কার আবশ্যক এবং নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করাও দরকার। উহা বহুব্যয়সাপেক্ষ। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে যতদূর সাধ্য সাহায্য করা। অন্ততঃ দুই হাজার টাকা ওঠা চাই। আশা করি সকলেই সাধ্যমত সাহায্য দান করিতে ত্রুটি করিবেন না। সম্প্রতি উক্ত কালীবাড়ির বন্দোবস্তের ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, এডভোকেট, এলাহাবাদ হাইকোর্ট, উক্ত কমিটির সম্পাদক এবং—

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এডভোকেট
„ সুরেশচন্দ্র „ , ডাক্তার
„ হরিমোহন রায়, উকিল
„ অভয়চরণ বসু
„ কালীনাথ কীর্ত্তি
„ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
„ হরিদাস মুখোপাধ্যায়
„ „ গঙ্গোপাধ্যায়
„ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ জ্ঞানানন্দ চটোপাধ্যায়
„ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
„ রাখালদাস বসু

প্রভৃতি স্থানীয় বাঙ্গালি ভদ্রলোক কমিটীর সভ্য হইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক কমিটির পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা হইতে স্বীকার করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ নিম্নে লিখিত অর্থসাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ দিয়াছেন।

কলিকাতার বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং ...	৫০০৲
শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাদেব প্রসাদ, জমিদার, আহিয়াপুর	২০০৲
" বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৲
" দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৲
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪০৲
" হরিমোহন রায়	১০৲
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১০৲

ইত্যাদি।

এক্ষণে অপরাপর বঙ্গবাসী ভদ্রমহোদয়গণ কিছু কিছু সাহায্য করিলে আমরা কার্য্য আরম্ভ করি।

শ্রীহরিমোহন রায়।

কালীবাড়ির অতিথিসৎকার বিভাগ ও পূজা বিভাগ স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। ইহাতে এক্ষণে সকল সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীই যাঁহার যে বিভাগে ইচ্ছা দান করিতে পারেন।

গত দুই বৎসরের ন্যায়, এ বৎসরও, সরস্বতী পূজার সময় প্রয়াগবাসী বাঙ্গালীদের সম্মিলন হইবে। আগে হইতেই যুবক ও বালকদিগের নানারকম পৌরুষ ও বলবর্দ্ধক খেলা হইতেছে। সন্তরণের পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অশ্বারোহণ, লক্ষ্যবেধ, লাঠিখেলা প্রভৃতির পরীক্ষাও হইবে। কবিতা আবৃত্তি, মেয়েদের জন্য রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম, সূচিশিল্প প্রভৃতির পরীক্ষারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্মিলন-সভায় সঙ্গীতাদিও হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি বৃদ্ধির, এবং একতা স্থাপন উদ্দেশ্যে, এবং বালক ও যুবকদের মধ্যে পৌরুষ ও দৈহিক বল প্রভৃতির অনুরাগ বাড়াইবার জন্য, এই সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু একটি একান্ত প্রয়োজনীয় কাজে এখনও প্রবাসী বাঙ্গালীরা হাত দেন নাই। সকলেই জানেন, বাঙ্গালীর প্রতি এখন গবর্ণমেণ্ট,—এবং বে-সরকারী ইংরাজও, বিরূপ। অথচ সরকারী ও রেলের চাকরীই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রধান অবলম্বন। প্রবাসী বাঙ্গালীর চাকরী পাওয়া এখন খুব কঠিন হইয়াছে। পরে তাঁহারা মোটেই চাকরী পাইবেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ইংরাজের বাঙ্গালী-বিদ্বেষ ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। দ্বিতীয় কারণটি সুখের বিষয়। চাকরী ছাড়া ওকালতী ও ডাক্তারী আছে। কিন্তু এই দুই ব্যবসায়ে অধিক লোকের প্রতিপালন হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, এখানেও হিন্দুস্থানীগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ায় প্রবাসী বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতেছে। অবশ্য বিশেষ গুণ ও শক্তিসম্পন্ন লোক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেনই। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে হিন্দুস্থানী মক্কেল ও রোগীর পক্ষে হিন্দুস্থানী উকীল ও ডাক্তারের সাহায্য লওয়াই স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন ইংরাজ বিচারকেরাও আজ কাল বাঙ্গালী উকীলদের কাজ করা শক্ত করিয়া তুলিতেছেন।

এই সব কারণে প্রবাসী বাঙ্গালাদের স্বাধীনবৃত্তি শিক্ষার, শিল্পবাণিজ্যাদি ব্যবসায় অবলম্বনের প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। কলিকাতাস্থ মাননীয় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিজ্ঞান সমিতির সহিত যোগ দিয়া বৎসরে দুই একজন ছাত্রকেও বিদেশে পাঠাইতে পারিলে কিছু ফল হয়। কিন্তু প্রকৃত সফলতা লাভ করিতে হইলে স্বদেশেই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রবাসী বাঙ্গালাদিগের নেতাগণ এ বিষয়ে মন দিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ হইবে।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, এল্ এল্ বী, মহাশয় এবার অনারস্-ইন্-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; যথাসময়ে ডী এল্ অর্থাৎ আইনাচার্য্য হইয়া হাইকোর্টের এড্ভোকেট হইবেন। সুরেন্দ্রবাবু বিদ্বান্ ও বিনয়ী; তিনিও কবি;—দাদার সমান নহেন বলিয়া কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সুরেন্দ্র বাবুর উন্নতিতে আমরা সুখী।

প্রবাসী-সম্পাদক।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।

শাস্ত্রে লিখিত আছে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত। কিরূপে সেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়? সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য অর্থে শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করা,—চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সংযম, ভোগবাসনার ত্যাগ, ঈশ্বরচিন্তা, অল্পাহার, শম দম প্রভৃতি নিয়ম সকল, ও বিলাসজনিত মোহকর বস্তু মাত্রেরই

পরিত্যাগ,—ব্রহ্মচর্য্যার প্রধান অঙ্গমধ্যে গণ্য। বিধবা উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে দেহমনের পবিত্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ যে আত্মজ্ঞান,—তাহা লাভ করিয়া চরমে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, ইহাই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভ হয় না। যদি আত্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি লাভের—সংসার কারাগার হইতে উদ্ধারের—অন্য উপায় না থাকে, তবে মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, সেই আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র নানাবিধ রূপক ও উপাখ্যানের মধ্য হইতে সেই এক ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞানের কথাই প্রচার করিয়াছেন। আমরা শাস্ত্রার্থ ঠিক বুঝিতে পারি না বলিয়াই নানামুনির নানামত ভাবিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি।

যে আত্মজ্ঞান যোগীঋষি গণের সদা প্রার্থনীয়, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বিধবাদিগের জন্য সেই আত্মতত্ত্ব লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন; বিধবাগণকে সংসারের জ্বালাময় দুঃখ অশান্তি হইতে মুক্ত করিয়া অবিনশ্বর আনন্দ ও নির্ম্মল সুখকর বস্তু করতলগত করিবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদের এমনই অধঃপতন হইয়াছে,—এমনই অবোধ আমরা যে তাঁহাদিগের সেই মঙ্গল উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, হিন্দু বিধবাগণের প্রতি, শাস্ত্রকারদিগের কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়ন হেতু, নিত্য তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া থাকি। হায়রে! সংসারের ক্ষণিক সুখের মোহজাল আমাদিগকে মরীচিকার মত ভুলাইতেছে, আপাত মনোরম যে ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়া শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকে কঠোরতম মনে করি, পরিণামে সেই সুখ যে গরলে পরিণত হইয়া বিষের জ্বালায় দগ্ধ করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আর একাদশীর ব্যবস্থা,—ইহাও হিন্দু বিধবাগণের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই একাদশী লইয়া আজকাল হিন্দু সমাজে খুব আন্দোলন আলোচনা হইতেছে। এই নিষ্ঠুর কঠোরতম ব্যবস্থা এখন হিন্দুগণ আর মানিতে চাহেন না। কারণ সমাজে এখন দিন দিন বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পানভোজনতৃপ্ত পিতামাতার সম্মুখে যে কুসুম-কোমলা বালিকাগণ একাদশীপীড়িতা ক্ষুৎপিপাসাকাতরা হইয়া অৰ্দ্ধমৃতাবস্থায় দিন কাটাইবে, তাহা বড়ই নৃশংস কাণ্ড ও শোচনীয় দৃশ্য। কে এই একাদশীর সৃষ্টি করিয়াছে? ইহা কি শাস্ত্রসঙ্গত? কেহ যদি একথা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে ইহাই বলিতে পারি, হিন্দুর রীতি, নীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি যদি শাস্ত্রসঙ্গত উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া আমরা মানিয়া থাকি, তবে এই একাদশীও সেই শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু বেদান্ত উপনিষদাদি গীতা ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও এই একাদশী ব্রতাদির উল্লেখ নাই। ইহা পুরাণ সমূহের অন্তর্গত, মহাভারতেও এই একাদশী ব্রতের কথা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা স্ত্রী, পুরুষ, সধবা, বিধবা প্রভৃতি সকলের জন্যই বিহিত। আর বৈষ্ণবদিগের ক্রিয়াযোগসারে হরিবাসর নামক যে ব্রতের উল্লেখ আছে তাহা এই একাদশীরই নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। বোধ করি সেই একাদশীর ব্রতই বিধবাগণের জন্য অবশ্যকরণীয় একাদশী রূপে নিয়মিত হইয়াছে। কারণ ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম অভ্যাস করাই বিধবার কর্ত্তব্য, একাদশী—বা পক্ষান্তরে একদিন উপবাস সেই ইন্দ্রিয়সংযমের অনেক সহায়তা করে।

উপবাস করা কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তু বাসোগুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ॥

সমুদয় পাপবৃত্তি হইতে উপরত হইয়া সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত-রূপে সাত্ত্বিক গুণে অবস্থান করার নাম উপবাস।

তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথা শ্রবণাদিকং।
উপবাস কৃতো হ্যেতে গুণা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।

যাঁহার জন্য উপবাস সেই দেবের ধ্যান, সেই দেবতার যশ, দেবকথা শ্রবণাদি উপবাসকৃতের গুণ বলিয়া মনীষিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতএব ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে একাদশীর ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইলে, একাদশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন,—এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত ও নিগৃহীত করিলেই প্রকৃত একাদশী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। বিধবাগণ উক্ত নিয়মে একাদশী ব্রত পালনপূর্ব্বক ব্রতপতি স্বামী দেবতার ধ্যান জপ ও স্মরণ করিবেন। ইহাই শাস্ত্রকারগণের আদেশ।

কিন্তু অসমর্থ পক্ষে একাদশীর দিন জলপান করিলে

ইংরেজ কুঠি। ১৬০২ খৃঃ অঃ সংস্থাপিত।

সিভিল হাসপাতাল

স্ত্রীলোকদিগের হাসপাতাল

ইংরাজদিগের সমাধিস্থান

যে তাঁহাদিগকে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে, এ ব্যবস্থা বোধ করি কোনও শাস্ত্রে লিখিত নাই। উল্লিখিত একাদশীর বিধান কালমাহাত্ম্যে লোকাচারে পরিণত হইয়া এমন কঠোরতম হইয়া উঠিয়াছে। যখন একাদশীর প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বোধ করি হিন্দুসমাজে বালবিধবার অস্তিত্ব ছিল না। তাহা হইলে করুণহৃদয় শাস্ত্রকারগণ,—আজীবন তপস্যারত থাকিয়া শুধু মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত যাঁহারা শাস্ত্রবিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর ইহপরকালের কল্যাণসাধন করাই যাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই পরম কৃপালু মহাত্মাগণ যদি জানিতেন, তাঁহাদের প্রণীত একাদশী ব্রতের শুভ উদ্দেশ্য, বুঝিবার ভ্রমে ইদানীং বঙ্গবিধবাগণের পক্ষে ঘোরতর অশুভজনক হইয়া উঠিবে,—কোমলপ্রাণা বালিকাগণের জীবনসংহারক হইবে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমন কি, একাদশীর দিন আসন্ন মৃত্যু মুমূর্ষু বিধবার শুষ্ককণ্ঠে জলদান করাও লোকে নিষিদ্ধ পাপ বলিয়া মনে করিবে,—সেই মঙ্গলময় প্রথা বুঝিবার দোষে হিন্দুসমাজে এমন নিষ্ঠুরতা প্রবর্ত্তিত হইবে, তবে বোধ করি তাঁহারা কখনও এ বিধান বিধিবদ্ধ করিতেন না। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, সমস্তই মানবের শুভফলদায়ক, কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে একাদশীর প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে তাহা ঘোর নৃশংসতার কার্য্য। উহা কখনই শাস্ত্রানুমোদিত নহে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

যে সংযতেন্দ্রিয়া শুদ্ধপ্রাণা বিধবা প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী রূপে নিঃস্বার্থভাবে, নিষ্কাম কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহার পক্ষে একাদশী করা না করা সমান, কারণ যে জন্য একাদশীর নিয়ম, তাহা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। আর যে জ্ঞানহীনা বালিকা একাদশীর মাহাত্ম্য না বুঝিয়া, শুদ্ধ লোকাচারের জন্য একাদশীর নিয়ম পালন করে, তাহার পক্ষেও একাদশী করা না করা সমান। কারণ একাদশীর ফল না জানায় সে তজ্জনিত কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু উপবাসজনিত শারীরিক ও মানসিক গ্লানি উপস্থিত হইয়া তাহাকে অধিকতর পীড়া ও অশান্তি প্রদান করে। কারণ শাস্ত্রেই আছে—

অশ্রুপ্রপাতো রোষশ্চ কলহশ্চ কৃতিঃ সতি।
উপবাসাদ্ ব্রতাম্বাপি সদ্যো ভ্রংশয়তি স্ত্রিয়ম্॥

কলহ, রোষ, অশ্রুত্যাগ প্রভৃতি স্ত্রীলোকদিগের উপবাস বা ব্রতকে সদ্য ভ্রষ্ট করে। আমার এ সকল কথা পাঠিকা ভগিনীগণের বিরক্তি উৎপাদন করিবে কি না, জানি না, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফলে আমার জ্ঞান ও শিক্ষা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ আমি অসঙ্কোচে আমার ভগিনীদিগের নিকট তাহা ব্যক্ত করিলাম। বিধবার ব্রহ্মচর্য্যার আর একটা গৌণ কারণ,—শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, বিধবা মৃত পতির স্মরণার্থে দীন হীন ব্রহ্মচারিণীর বেশে কাল হরণ করিবেন। পতিই যে স্ত্রীর প্রত্যক্ষ দেবতা, তাহা হিন্দুরমণী মাত্রেই অবগত আছেন বোধ হয়। পতিব্রতা সতী রমণী কিরূপ ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, কিরূপে পতির মনোরঞ্জন করিবেন, প্রভৃতির সদুপায় হিন্দুশাস্ত্রে ভূরি ভূরি উপদেশ দেওয়া আছে। সতী রমণীর উন্নত আদর্শ, অসামান্য পতিপ্রেম, সংসারনির্ব্বাহের সুপ্রণালীর জ্বলন্ত উদাহরণ, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে উদ্ভাসিত। শিক্ষিতা ভগিনী মাত্রেই তাহা জানেন, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পতি রমণীর দেবতা, পতিই রমণীর সমস্ত সুখের কারণ। সুতরাং পতিব্রতা পতির মৃত্যুর পর যাবতীয় ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া মৃত পতির চিন্তায় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রকারগণের আদেশ। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে এমন মধুর এমন পবিত্র নিয়ম আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। সংসারে পতিসেবা করিয়া যাঁহারা রমণীজন্ম সফল করিতেছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাগ্যহীনা বিধবা একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য ও পতিচিন্তা হইতে যে পরমা শান্তি ও অতুলনীয় সুখলাভের অধিকারিণী হন, তাহা সৌভাগ্যবতীগণেরও অননুভূত। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সংসারের অনেক উর্দ্ধে বিধবাদিগকে আসন প্রদান করিয়াছেন, ঠিক শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য যদি বিধবাগণ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের সুখের তুলনা কোথায়? সংসারের শত অশ্রদ্ধা অবহেলা আর্থিক মানসিক কোন কষ্টই তাঁহাদিগকে আর বিচলিত করিতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে পালন করা যায়, তাহা একরূপ বুঝা গিয়াছে। কিন্তু পতিচিন্তা করিবে কিরূপে? মৃত পতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট যে মূর্ত্তি, তাহাই কি চিন্তা করিতে হইবে? কিন্তু তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে মোহ ও শোকের একত্র সমা-

বেশে হৃদয় অধিকতর আকুল হইয়া উঠিবে। কারণ যে পতির পরিত্যক্ত বস্তু সমূহ দেখিলেই স্মৃতির তাড়নায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, তাঁহার আকৃতি দিবানিশি চিন্তা করিলে তাঁহার জড়দেহকে নিকটে পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে থাকিবে, এবং অতৃপ্তিতে জীবন অত্যন্ত যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং তাহাতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ও সংযম-জনিত শান্তি কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে?

এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার জন্য একদিন ভগবানকে ধরিয়াছিলাম, "দীনবন্ধু! তোমাকেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে, নহিলে সন্দেহে অস্থির হইয়াছি। যদিও জানি পতি স্ত্রীর ঈশ্বর, অতএব ঈশ্বর ভাবেই তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে; কিন্তু তাহা ত বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর কি, —অজ্ঞান রমণী, তাহাই যখন জানি না, তখন মানবে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া কিরূপে তাঁর উপাসনা করিব? হে করুণাময়! বড় বিশ্বাসে তোমার কাছে আসিয়াছি, নিরাশ করিও না। তুমি ভিন্ন একথা আর আমায় কেহ বুঝাইয়া দিবার লোক নাই। হে দয়াল! ঈশ্বরত্ব কি, তাহাই আমাকে বুঝাইয়া দাও। তুমি না চিনাইলে আর কে সন্দেহ ভঞ্জন করিবে?" ডাকিতে ডাকিতে তন্ময় হইয়া গেলাম।

তখন শুনিলাম,—মর্ম্মের মর্ম্মস্থল হইতে কে যেন বলিতে-ছেন, "স্থির হইয়া আমার কথা শুন, বিশ্বাস রাখ। আমিই ঈশ্বর, ঈশ্বরকে যে না বুঝে, তাহাকে ঈশ্বরত্ব বুঝান বড় কঠিন কথা। যে চিনিতে চায়, যে বুঝিবার চেষ্টা করে, সেই আমাকে বুঝিতে পারে। আমার ঈশ্বরত্ব কি, বুঝিয়া দেখ। ঘটে, পটে, মৃত্তিকায়, পাষাণে, লিঙ্গ মূর্ত্তিতে, যে কোন স্থলে, যে কোন আকারে লোকে ঈশ্বরের পূজা করে, তাহা গ্রহণ করিয়া, যাহার যেমন প্রবৃত্তি তাহাকে সেইরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করাই আমার ঈশ্বরত্ব। আমি আত্মাস্বরূপ, আমি জীবের চৈতন্য, বিশ্বময় তাবৎ পদার্থে চৈতন্য স্বরূপ ব্যাপ্ত আছি। আমি সকলের প্রাণ, আমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, আমি সর্ব্বশক্তিমান, ইহাই আমার ঈশ্বরত্ব। যখন স্থাবর বা জড় পদার্থে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিলে আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তখন মানবশরীরস্থ চৈতন্যরূপী যে আত্মা আমি,- আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলে তাহা গ্রহণ না করিব কেন? দেখ আমিই তোমার স্বামী; স্বামীর অবয়বের পূজা না করিয়া আত্মার উপাসনা কর, কেন না আত্মাই আমি। শরীরের ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু আমার ধ্বংস নাই; আমি অমর, অবিনাশী। তোমার প্রাণ তোমার স্বামীর প্রাণ এবং সমস্ত জীবলোকের প্রাণ—আমি,—আমি বিশ্বাত্মা। আমাকে তোমার পতিরূপেই চিন্তা কর, আর ঈশ্বর ভাবেই ভাবনা কর, কিছুই বিফল হইবে না।"

বক্তা নীরব হইলেন। অপার্থিব হর্ষপুলকে আমার প্রাণ অভিভূত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম, পতি সাধ্বী স্ত্রীর নিকট কিরূপে উপাস্য। পতির উপাসনা করিয়াই সতী রমণী অদ্ভুত শক্তি ও মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। এই পতিরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার দ্বারা বিধবা মোক্ষ লাভের অধিকারিণী হন, জগতে তিনি আর কিছুরই অভাব বোধ করেন না। এই পতিচিন্তা ও ব্রহ্মচর্য্যযোগসাধন দ্বারা যে বিধবা দেবীরূপে মহিমান্বিতা হইয়া উঠেন, তাঁহারই জীবন সার্থক; মরজগতে তাঁহার অপার্থিব সুখের তুলনা হয় না।

জনৈক বিধবা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রমাসুন্দরী—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ২৩১ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹। প্রভাতবাবু ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধ হস্ত। নভেল রচনাতেও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় এই রমাসুন্দরী দিয়াছে। সরল অনাড়ম্বর ভাষায় নভেলের প্রত্যেক চিত্রটি জীবন্ত ও সরসভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। লেখকের মানব চরিত্র, দেশ ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি অতি চমৎকার। বাংলা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভ্রমণের বৃত্তান্তটিই অতীব মনোজ্ঞ, তাহার সঙ্গে কৌতুহল পূর্ণ উপাখ্যান যুক্ত হইয়া নভেলখানিকে রম্য করিয়াছে। প্রত্যেক পাত্র পাত্রীর কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী সুন্দর স্বাভাবিক হইয়াছে। রমার সরল অকুতোভয় মধুময় মনটি, রাজলক্ষ্মীর সচঞ্চল ব্যবহার, কমলা দেবীর মাতৃত্ব ও শিব পূজা, নবগোপালের স্বাধীনচিত্ততা ও আবাল্য আজ্ঞা দিতে অভ্যস্ত নবগোপালের অপরিচিত হরিপদ জেলেকে নিঃসঙ্কোচে অনুজ্ঞা, হিন্দুস্থানী দরোয়ানের তুলসীকৃত রামায়ণ পাঠ, কান্তিবাবু, রায় গৃহিণী ও সীতানাথের চরিত্র প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপরি পাণ্ডা শ্যামলালের বিচিত্র বাংলাভাষাজ্ঞান নিপুণ সূক্ষ্ম দর্শনের ফল। আমরা পশ্চিম-প্রবাসী বাঙালী শ্যামলালের উক্তি "আমি একটি বাঙালী হচ্ছি" যে কি উপাদেয় উপভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, বাংলার বাঙালীদিগকে তাহা বুঝাইতে পারিব না। বইখানির মধ্যে সরস পরিহাস ও রসিকতা সর্ব্বত্র ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এক এক স্থান পড়িতে পড়িতে হৃদয় ভাবের প্রাবল্যে ভরিয়া উঠে। সর্ব্বোপরি লেখকের স্বদেশ-প্রীতি এই বইখানির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই বইখানি না পড়িয়াছেন, তাঁহারা একবার পড়িয়া দেখিলে সুখী ও উপকৃত হইবেন।

নূতন হাসির গান—শ্রীচন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। ৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য এক আনা। এই ক্ষুদ্র বইখানিতে কতকগুলি গান আছে -তাহার সকল-

গুলিই হাসির নহে বোধ হয়, অন্ততঃ আমাদের হাস্যোদ্রেক করিতে অনেকগুলিই সমর্থ হয় নাই। আমরা যে একেবারে মূর্তিমান বিরসতা, তাহা কিন্তু স্বীকার করি না। কবির হাস্যরস কিছু ঘন জমাট হইয়া গিয়াছে, তাই সকলের মন ভালো করিয়া সিক্ত করিতে পারিতেছে না। কতকগুলি গানে বাঙালী চরিত্রকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে; সেগুলি পড়িয়া চক্ষু আর্দ্র হয়, হাস্য বিকশিত হয় না। সর্ব্বশেষের "কয় দিন আর থাকবে ভবে, ভেবে একবার দেখলে না" গানটি হাসাইবার জন্য কি বিভীষিকা দেখাইবার জন্য তাহা কবিই জানেন। কতকগুলি গান অবশ্য হাস্যোদ্রেককারী আছে। যাহাই হউক, সকল গানগুলিরই রচনা সুন্দর, কিন্তু তাহাও ছন্দের নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে ছাপা হওয়ায় ছন্দ রক্ষা করিয়া পাঠ করা সুকঠিন হইয়াছে; পাঠ অবাধগতি না হইলে রসভঙ্গ পদে পদে ঘটে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি সুকবিগণ দেখাইয়াছেন যে গান 'সে রসে বঞ্চিত' দিগের নিকট সুখপাঠ্য ছন্দোময়ী কবিতারূপেও আদৃত হইতে পারে।

স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী বা মহারাণা প্রতাপ সিংহ—শ্রীভুবনমোহন-ঘোষাল প্রণীত। মূল্য সডাক ১৵০, ২১১ পৃষ্ঠা। এখানি নাটক। ইহা তথাকথিত গৈরিশ ছন্দে লিখিত, কারণ লেখক একজন গিরিশ বাবুর অনুগত ভক্ত, উৎসর্গপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিয়মহীন বিশৃঙ্খল রচনার নাম কোন্ পরিহাসরসিক ছন্দ রাখিয়াছিলেন জানি না। কিন্তু এ নাম যখন চলিয়া গিয়াছে, আমাদিগকেও মানিয়া লইতে হইবে। এই ছন্দ নাট্যমঞ্চের উপযোগী হইলে হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে ইহার স্থান নাই। নাটক রচনায় শুধু নাট্যমঞ্চের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না, সাহিত্যের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে নাটক দুদিনের উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া বিস্মৃতিতে ডুবিয়া যায়। নাট্যমঞ্চ ও সাহিত্যের তুল্য উপযোগী নাটক দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ভিন্ন আর কাহারো আছে কি না জানি না। এই গ্রন্থখানিতে পাত্র পাত্রীগণের কথোপকথন অঙ্ক ও দৃশ্য পর্য্যায়ে সজ্জিত আছে, কিন্তু ইহাতে প্রকৃত নাটকত্ব ফুটে নাই। প্রতাপের ইতিহাস মাত্র বর্ণিত হইয়াছে, কথার মধ্য দিয়া চরিত্র-গুলি ভালো ফুটে নাই। সকল চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতাপ, ভামশা ও পৃথিরাজ কতক ফুটিয়াছে এবং তন্মধ্যে পৃথিরাজের চরিত্রই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। লেখকের এই প্রথম উদ্যম, শক্তি আছে, সাফল্য কিন্তু সাধনার অপেক্ষা করে। লেখনী যাহা উদ্গার করিবে তাহা ছাপাইয়াই সাধারণকে বিড়ম্বিত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এ রকম ২।৪ খানা লিখিয়া হাত মক্‌স করিয়া আত্মপ্রকাশ করা ভালো। সংযম সকল অবস্থাতেই অবলম্ব্য। মিবারের মহারাণীকে দিয়া গান গাওয়ানো নিতান্তই অশোভন হইয়াছে। লেখকের রচনাশক্তি আছে বলিয়াই এতগুলি ত্রুটির কথাই শুধু উল্লেখ করিলাম। বিভূষণা মানে বিশিষ্টভূষণা, বিগতভূষণা নহে।

পরলোকে—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে ভগিনীর শোক-সন্তপ্ত ভ্রাতার পবিত্র অমল অশ্রু-বিন্দুগুলি মুক্তাফলের মত টল টল করিতেছে। কবিতার গতিবেগ আছে, সাহিত্যের হিসাবে অতি উচ্চাঙ্গের না হইলেও কবিতাটি প্রাণ-স্পর্শী হইয়াছে। আমরা পড়িয়া ব্যথিত ও তৃপ্ত উভয়ই হইয়াছি।

মনস্তাপ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসু মল্লিক বিরচিত। (মূল্য নহে) সাহায্য দুই আনা মাত্র। বঙ্গের জাতীয় জাগরণের সূত্রপাতে যে সকল সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, বক্ষ্যমান পুস্তক খানিও তাহার একটি। ইহাতে স্বদেশপ্রীতি, বঙ্গসন্তানের প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পদ্যে ও গানে যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইহাতে নাই শুধু কবিত্ব, নাই শুধু বিশেষত্ব, যাহার অভাবে সাহিত্যের ভাণ্ডারে কোন লেখারই স্থান হয় না। এই পুস্তকের প্রস্তাবনা হইতে একটু নমুনা দিতেছি:—

কি কহিব সুধিগণ! "মনস্তাপ" কথা,
মরমে মরমে বিদ্ধ বঙ্গচ্ছেদ দশা।
তাহা ছাড়া দিন দিন—
দৈন্য বৃদ্ধি যে কারণে,
ভুলেও ভাবি না মোরা হেন মতিহীন!
যশোদৃপ্ত—শিল্পভূমি
শিল্পশূন্য ক্রমে,
শিল্পীগণ অন্নহীন তাহে।
তার স্থলে—
বিদেশীয় পণ্যশিল্পরাজী
ধীরে ধীরে অতি সুকৌশলে
লভিয়াছে স্থান।

ইত্যাদি। ইহা ছন্দে, মিলে, ভাবে, সকল বিষয়েই কবির একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি।

আমলক—শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য দুই আনা মাত্র। ৪৮ পৃষ্ঠা। এই পুস্তক খানিতে কতকগুলি সনেট আছে। কোন কোন সনেটে বেশ হইয়াছে। তবে অধিকাংশই কবিত্বের হিসাবে মূল্যহীন একটি সনেট কবিত্বের হিসাবে সুন্দর না হইলেও বর্ত্তমান কালের উপযোগী বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

আইনের মুলুকে থাক, আইন শেখ ভাই!
'আইন নাহি জানি' বলি পাবে না রেহাই।
লোণাজল সিদ্ধ করা আইনে আছে মানা,
কড়ি বিনে লুণ খাবে—দিবে জরিমানা।
সাপে বাঘে খাবে ইহা নাহি ডরি মনে,
কুড়াও জ্বালানী কাঠ গিয়ে যদি বনে,
তোমার পালিত পশু কিংবা যদি ছুটি'
খায় জঙ্গলের ঘাস, লতাটি, পাতাটি,
পাবে শাস্তি তুমি, ইথে নাস্তি অব্যাহতি।
অস্ত্র রাখ যদি, জেনো শ্রীঘরে বসতি।
বুঝে শুনে ক'রো সভা-সমিতির সাধ,
পাঁচের মিলন হলে' ঘটে অপরাধ!
প্রকৃত দোষের কথা কহ কারো যদি—
জানিও তোমার জন্য আছে দণ্ডবিধি!

গৃহসুখ—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য দুই আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানিতে "ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও তৎসংস্রবে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও সুখ বিষয়ে" নববিবাহিত দম্পতিদিগকে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বই খানি বিবাহের উপহার দিবার উপযুক্ত হইয়াছে। অনেক সৎ কথা সুন্দরভাবে সুন্দর ভাষায় প্রকাশ হইয়াছে। পুস্তক খানিকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া লিখিলে আরো ভালো হইত; ইহার মধ্যে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজেই কেবল প্রযোজ্য তাহা নহে। বঙ্গভাষাভাষী অন্য সমাজকে গ্রন্থকার কেন বঞ্চিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। উপহারের উপযুক্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও বাহ্যসৌষ্ঠব আরো সুচারু হওয়া উচিত ছিল। পুস্তকের ভবিষ্য সংস্করণে লেখক এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করিবেন আশা করি।

সমাজ সংস্কারে মানুষের সম্পর্ক বিচার—শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য পাঁচ পয়সা। এই বই খানিতে চারিটি পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়া গ্রন্থকার তাহার উত্তর সমাধান করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ এই—

(১) সময়ের মত দ্বিতীয় সংস্কারক নাই। (২) পুরাতন হিন্দু-সমাজে জলাঞ্জলি দিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার আবশ্যকতা নাই। (৩) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন হিন্দুসমাজে থাকিয়াও করা যায়। (৪) ব্রাহ্ম সমাজের

লোকেরা অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রকৃত সমাজসংস্কারের দিকে লক্ষ্য না করিয়া দেশে ও সমাজে বিপ্লব আনিয়াছেন।

(১) উত্তর পক্ষে লেখক সময়ের সংস্কার-ক্ষমতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন মানুষ সচেষ্ট হইয়া কোন অপূর্ণতা বা জীর্ণতার সংস্কার না করিলে সংস্কার হয় না। একথা আংশিক সত্য, পূর্ণভাবে নহে। চেষ্টা ব্যতীত কিছু হয় না ইহা ঠিক, কিন্তু সেই চেষ্টা আপনা হইতে জাগ্রত না হইলে, [illegible] করিয়া জাগ্রত করাইয়া থাকে। এ কথা লেখক নিজেই পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কার বিষয়ে আত্ম-চেষ্টাও যেমন কার্য্যকরী, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তেমনি। চেষ্টাজাত সংস্কারে গৌরব আছে, বাধ্য হইয়া সংস্কারে কোন গৌরব নাই, এই যাহা পার্থক্য।

(২) লেখক দেখাইয়াছেন যে যাহা কিছু সংস্কৃত, যাহা কিছু স্বাধীন চিন্তার অনুসারী, তাহাই ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ। সেই আদর্শ গ্রহণ করিলেই কেহ আর হিন্দু থাকিতে পারে না, সে নামে না হোক কর্ত্তব্যে ব্রাহ্ম হইবে। এবং কর্ত্তব্যে ব্রাহ্ম হইলেই হিন্দুসমাজচ্যুত হইয়া পড়িবে। এইখানে লেখকের গোড়ায় গলদ হইয়াছে। তিনি হিন্দুসমাজ অর্থে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতম নিম্নস্তরের হীনাদর্শ সমাজকে বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমার ত ধারণা ব্রাহ্মগণও হিন্দুসমাজেরই অঙ্গ; ব্রাহ্মের আদর্শ হিন্দুসমাজেরই আদর্শ। হিন্দুসমাজ উন্নত আদর্শের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে—শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সংস্কার ব্যাপক হইবে—যাঁহার ইচ্ছা সেই উন্নত সংস্কৃত সমাজকে ব্রাহ্মসমাজ বলিতে পারেন, আমি কিন্তু তাহাকে হিন্দুসমাজেরই সাময়িক বিবর্ত্তন মনে করি। ইহা প্রকারান্তরে লেখক পুস্তকের অনেক স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন।

(৩) এখানেও আমার আপত্তি এই যে লেখক হিন্দু সমাজের অর্থ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও হীন করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে থাকিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব এ কথা স্বীকার্য্য নহে।

(৪) এই পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই সমর্থন করিবেন না। কিন্তু মানুষ মাত্রেই স্থিতিশীল। পুরাতন হিন্দু নাম ছাড়িয়া নূতন ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিতে অনেকেই ইতস্তত করেন। এই জন্যই অনেকে মনে করেন পুরাতন হিন্দুসমাজে জলাঞ্জলি দিয়া নূতন ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়ার আবশ্যকতা নাই। লেখক আবেগের আতিশয্যে ভাব অপেক্ষা নামের উপরই ঝোঁকটা দিয়া ফেলিয়াছেন অতিরিক্ত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সহিত আমাদের কোন বিষয়ে মত-পার্থক্য নাই।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি খুব বিচক্ষণতার সহিত লেখা হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য।

সরল কৃত্তিবাস। বালক বালিকাদিগের এবং মহিলাগণের পাঠোপযোগী করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ সম্পাদিত। মূল্য ১॥০।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের ইহা অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ, যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের সকল অংশ বালক বালিকাদের পাঠের উপযোগী নহে। সেই সকল অংশ ত্যাগ করিয়া অথচ মূল গল্পটি ঠিক্ রাখিয়া যোগীন্দ্র বাবু এই রামায়ণ প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা ও সম্পাদক লিখিত কৃত্তিবাসজীবনী ইহার উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। ২।১টি ছাড়া ইহার সমুদয় ছবিই অতি সুন্দর হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারত ছাড়িয়া দিলে আমাদের জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। সেই রামায়ণের এমন সুন্দর সুসংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া যোগীন্দ্র বাবু সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গল্পাংশের সংযোগরক্ষার জন্য যোগীন্দ্র বাবু নিজরচিত যে কয় ছত্র যোগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা ক্ষুদ্রতর অক্ষরে ছাপিলে একটি ত্রুটি দূর হইবে।

শ্রীমুদ্রারাক্ষিক শর্ম্মা।

চিত্রপরিচয়।

রামায়ণবর্ণিত জটায়ুবধের বৃত্তান্ত সকলেই জানেন। এই উপাখ্যানের রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের একটি প্রতিলিপি আমরা মুদ্রিত করিলাম।

সুরাটে এবার কংগ্রেস্ হইবে। তথাকার ১৭ খানি ছবি দিলাম। তদ্ভিন্ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতিরও ছবি দিলাম।

গত মাসের ছবিতে, ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা ও পূর্ণপরিচ্ছদ ধারিণী শানরমণীর ছবি দেওয়া হইয়াছে। নাম দুটি ভ্রম ক্রমে উল্টা বসিয়াছে। শানরমণীর স্থলে ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা হইবে।

ভ্রমসংশোধন।

গতমাসে প্রকাশিত "সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রবাসী বাঙ্গালী" প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে প্রয়াগের কালীবাড়ির জমী ৺ রাসবিহারী বাবুর দেওয়া। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে উহা তাঁহার ভ্রাতা বেণীমাধব ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত। ৺ রাসবিহারী বাবুর সর্পদংশন চিকিৎসা প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার মহাশয়ের যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাও শুনিলাম অপ্রকৃত। ইহা ছাড়া এই প্রবন্ধে আরও অতিরঞ্জিত ও ভ্রমপূর্ণ কথা আছে অবগত হইলাম।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। মাঘ, ১৩১৪। ১০ম সংখ্যা।

দেবদূত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—অরবিন্দের শয়ন-কক্ষের সম্মুখস্থ মুক্ত ছাদ।

কাল—দ্বিপ্রহরাতীতা অমানিশা।

অরবিন্দ একাকী।

অরবিন্দ। কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন, সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে
ধীরে ধীরে ডুবে' গেছে গভীর সুপ্তির পারাবারে
এ নিখিল। এই মত ক্ষুদ্র এই মানব-জীবন
রহস্য-তিমির-তলে চিরদিন রহিয়া মগন,
নৈরাশ্য-কুহেলি-জালে সংবৃত হইয়া, ক্রমে হায়—
অসহ ক্লান্তির ভরে কেহ নাহি জানে গো কোথায়
ডুবে' যায় ধীরে! এবে, চারিধার শান্ত, স্তব্ধ, স্থির।
শুধু, মৃদু শ্বসিতেছে সুমধুর, শীতল সমীর,—
এই সুপ্ত প্রকৃতির নিশ্বাসের মত। ঊর্দ্ধে জাগে—
অনিমিখে, অবিরাম, করুণ-সতৃষ্ণ অনুরাগে
পুঞ্জে পুঞ্জে অগণন গ্রহ-তারা। হেরি মনে হয়—
যেন আরতির শেষে সংখ্যাহীন প্রদীপনিচয়
ভাসা'য়ে দিয়াছে ওই সীমাহীন অনন্তগগনে—
রহস্য-তিমির-প্রান্তে; কিম্বা, চিরন্তন জ্যোতিরাশি
চির-দীপ্তিমান কোন রহস্য-গোলক হ'তে ভাসি'
নেত্রপথে আসিতেছে বুঝি।—কিছু বুঝা নাহি যায়!
শুধু, মানবের মন মোহ-মদে ভাসিয়া বেড়ায়
অসীম, অতলস্পর্শ রহস্য-পাথারে। হায় নর,
হায় অন্ধ, অসহায়, গাঢ়তম রহস্য ভিতর
আছিলে ডুবিয়া; শুধু, নাহি জানি—ক্ষণেকের তরে
কিহেতু প্রদীপ্ত রহি' মুহূর্ত্ত লাগিয়া, তা'র পরে
কেন পুনঃ ডুবে যা'বে সেই ঘন তিমিরের তলে
আচম্বিতে অকারণে! তবু, বৃথা দম্ভ-কোলাহলে
উদ্ভ্রান্ত হইয়া আছ!

(অলক্ষিতে মাধবীর প্রবেশ।)

চারিদিকে কি মহা বিস্ময়
প্রগাঢ় রহস্যে ঢাকা! যত ভাবি, এ ক্ষুদ্র হৃদয়
ততই ব্যাকুল ভাবে গুমরিয়া কেঁদে হয় সারা;—
চিন্তা সনে ভ্রান্ত মন ধীরে ধীরে হয় দিশাহারা!
এই তো জীবন! হায়—এই তো চরম পরিণতি!
ইহারি মাঝারে পুনঃ আছে শোক, আছে দুঃখ-ক্ষতি,
আছে স্বার্থ, হিংসা-দ্বেষ, আছে পুণ্য, আছে উচ্চ আশা,
আছে এই ক্ষুদ্র বক্ষে প্রবল, বিরাট ভালবাসা,
আকাঙ্ক্ষা অপরিমেয়! বিনশ্বর জগতে এ সব
প্রতিক্ষণে এ জীবনে করিতেছি নিত্য অনুভব,—
এও এক অপূর্ব্ব বিস্ময়! ধ্রুব,—যাহা অকস্মাৎ

ক্ষণপরে পা'বে লয়, তা'র মাঝে ভাবের সংঘাত
কেন হেন নিরন্তর,— এ জগত কিছু নহে যদি ?
এ বিশ্ব—অনুভূতির ঘনীভূত জীবন্ত মূরতি !
(তৃতীয় প্রহরাগমে শৃগাল-কুক্কুর ডাকিয়া উঠিল।)
নিঃশব্দ, উচ্চ, তীব্রধ্বনি। যবে ঘুমায় ধরণী—
প্রগাঢ় শ্রান্তির মাঝে, মত্তোল্লাসে তথনো এমনি
সাগ্রহে চীৎকারে মদদৃপ্ত শিবা-সারমেয় গণে ;
যেন বা কহিছে ডাকি' "সূচীভেদ্য তমিস্রার সনে
মৃত্যুর দোসর মোরা,— মরতের চিরনিদ্রা লাগি'
বিশ্বের শিয়রদেশে নিদ্রাহীননেত্রে আছি জাগি'।"
রহ জাগি' চিরকাল এমনি উৎসুক ক্ষুধাভরে
মহাকাল-সহচর। এ সংসারে, প্রতি ঘরে ঘরে
প্রকৃতির মায়া-মূর্ত্তি সযতনে করি অপসার,
অক্ষুণ্ণ প্রতাপে নিত্য উচ্চকণ্ঠে করহ প্রচার
এইমত ব্যাকুলতা—এ জগত অনিত্য, অসার।
জাগাও বিমুগ্ধ জনে অন্ধ মনে করিয়া সঞ্চার
নবীন চেতন জ্যোতিঃ।

মাধবী। (মৃদুকণ্ঠে) প্রভু !

অরবিন্দ। ভাঙি' এই ঘুম-ঘোর
জাগুক্ সকলে। এই দৃশ্যমান বিশ্ব মনোহর
পরিহরি' ছদ্মবেশ অপরূপ চিত্ত-সম্মোহন,
কালের প্রভাব বলে মুহূর্ত্তেকে করুক ধারণ
ভয়াল মূরতি তা'র। বিশ্ববাসী দেখুক্ সভয়ে—
উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত, এই সুসজ্জিত বিশ্ব রঙ্গালয়ে
নির্ব্বাপিত দীপ্তিরাশি ! সেথা শুধু ওঠে অনিবার
ভয়ার্ত্ত, অম্বরভেদী, উচ্চতম, তীব্র হাহাকার
অসহায়, ব্যথাতুর জীবকণ্ঠ হ'তে নিত্য।

মাধবী। নাথ,—

অরবিন্দ। সুখ স্বপ্ন-ভোর এই জীবনেতে আজি অকস্মাৎ
চেতনার কশাঘাতে যাতনায় জাগুক্ সকলে ;—
বন্ধুত্ব-প্রণয়-স্নেহ চিত্ত হ'তে তপ্ত নেত্র-জলে
ভাসাইয়া ধু'য়ে ফেলে' দিক্।
যবে ভেবে' দেখি মনে—
প্রাণাধিক প্রিয়জন আচম্বিতে, অজ্ঞাত কারণে
সহসা নিস্পন্দ হ'য়ে ভূমিতলে র'বে পড়ি' হায় ;
আমারেই পুনঃ সেই উৰ্দ্ধ-শিখা, জ্বলন্ত চিতায়
সেই প্রিয় তনুখানি দিতে হ'বে ধীরে বিসর্জ্জন ;—
দুর্ব্বিসহ অবসাদে সে চিন্তায় দগ্ধ এ জীবন
অসহ্য বেদনাভরে দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। প্রাণ
সেই মহা ভাবনায় চিরতরে হয় মুহ্যমান !
বৃথা চিন্তা, বৃথা আশা ;—কিছু নহে! সকলি এ ভবে
মায়া-মরীচিকাসম সহসা—নিমেষে লুপ্ত হবে !
মিথ্যা প্রেম, মিথ্যা আশা-তৃষা !
— প্রেম,—সে ও কিছু নহে !
এ জীবন-মরুভূমি স্নিগ্ধ করি' যে তটিনী বহে
নিরন্তর, সে ও— সে-ও শুধুই কি মায়া ! তবে, হিয়া
কেন তা'রি চিন্তা মাঝে—বিশ্ব-চরাচর বিস্মরিয়া—
ডুবে' যায় অজানিতে ? কেন তবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ওঠে প্রাণ তারে যবে মনে হয় ? অমিয়া, অমিয়া,
কোথা তুমি ? প্রাণময়ি, জীবনের অমৃত আমার,
সান্ত্বনা মানে না মন—যবে আমি নেহারি তোমার
অতুল সৌন্দর্য্য-প্রভা কল্পনা-নয়নে !

মাধবী। প্রাণেশ্বর।

অরবিন্দ। (চমকিয়া)
একি ! এ গভীর রাত্রে শ্রবণে পশিল কা'র স্বর !—
এখনো কি বিনিদ্র মাধবী ?
(মাধবীকে দেখিয়া স্বগত)
একদৃষ্টে চে'য়ে বসে' আছে
মোর পানে। কেন ? বুঝি নিরালায় ভয় পাইয়াছে।
—অনাথা বালিকা মরি !
(মাধবীর নিকটে আসিয়া)
মাধবী, এখনো আছ জাগি' ?

মাধবী। (কম্পিত কণ্ঠে) প্রভু,—

অরবিন্দ। বুল—নহ তো পীড়িত ? বল—কি হেতু, কি লাগি'
এখনো নয়নে নিদ্রা নাহি ? (স্বগত) এই শুভ্র
রমণী-জীবন
জন্মেছিল শুধু কিগো সহিবারে হেন অযতন
নিতান্তই অকারণে ! (প্রকাশ্যে) বালা,

মাধবী। দেব,

অরবিন্দ। নহ তো পীড়িত ?

মাধবী। নহি।

অরবিন্দ। বুঝি,—এ বিজন অন্ধকারে হইয়াছ ভীত ?

মাধবী। কি ভয় আমার—যবে আছি তব অভয় আশ্রয়ে
প্রিয়তম !

অরবিন্দ। তবে, কেন এ নিশীথে,- হেন অসময়ে
শয্যা ত্যজি', সন্তর্পণে, সুখ-নিদ্রা ধীরে পরিহরি'
আসিয়াছ এ নির্জ্জন অন্ধকার মাঝারে সুন্দরি,
মৃদু মৃদু পদক্ষেপে ? কেন তবে আছ দাঁড়াইয়া
সোৎসুক, ব্যাকুল আঁখি অনিমিখ আগ্রহে মেলিয়া
এ দীনের পানে ?

মাধবী। এবে তৃতীয় প্রহরাতীতা নিশা।
গাঢ় সুষুপ্তির কোলে নীরব, নিস্পন্দ দশদিশা
শান্তিতে শুইয়া আছে। শুধু নাথ, তোমারি নয়নে
এখনো নাহিক নিদ্রা !

অরবিন্দ। নিরন্তর চিন্তা-হুতাশনে
দহিছে অন্তর যা'র—শান্তি বা বিরাম কোথা তা'র!
ঝরিছে এ হৃদিতলে উত্তপ্ত রুধির- নিরাশার
প্রচণ্ড পীড়নে নিত্য। হা মাধবী, বুঝিবে কেমনে
—সরলা রমণী তুমি,—সে অসহ দারুণ বেদনে,
সহিতেছি কি ব্যথা নিয়ত !

মাধবী। হায়—নাথ, হেন
দুঃসহ যাতনা তব ! নাথ,—
(বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে, অবনত মুখে বসিয়া পড়িলেন।)

অরবিন্দ। (স্বগত) মরি—মরি রে অজ্ঞান
নারি, এ লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত চির-হতভাগ্য তরে
তুমি কি সহিছ দুঃখ ! এ বিশাল ধরণী ভিতরে
কেহ তো চাহে না মোরে ! কেন তবে ওই মূক হিয়া
মোর দুঃখে ব্যথা ভরে উঠিল রে নীরবে কাঁদিয়া !
তবে কি ইহারি লাগি' নিদ্রাহীন নয়নে এখনো
মোর পানে চাহি আছ জাগি' ?
(প্রকাশ্যে) সখি,

মাধবী। (চরণ ধারণ করিয়া) এস গৃহে।

অরবিন্দ। শোন,—
যা'ব গৃহে। কিন্তু, নারি, কহ আগে সত্য করি' মোরে
—ব্যথা কেন বাজি'ছেরে ওই ক্ষুদ্র, কোমল অন্তরে
এ চির-লাঞ্ছিত তরে ?

মাধবী। (সরোদনে) স্বামী মোর,

অরবিন্দ। (স্বগত) একি করুণার
অপূর্ব্ব, মোহন দৃশ্য হেরিতেছি। শুষ্ক বিশ্বে কভু
এও কি সম্ভব ?- না, এ স্বপ্ন !

মাধবী। (উঠিয়া হস্ত ধারণ করিয়া) এস গৃহে প্রভু,
নিশা অবসান-প্রায়।

অরবিন্দ। —চল তবে। ঊষার বাতাসে
শ্রান্ত এ নয়ন-পুটে শান্তি সম যদি নিদ্রা আসে।
[উভয়ের প্রস্থান।

গোরা।

১৫

গোরা সেদিন সকালে বিনয়কে বাড়িতে ফেলিয়া অবিনাশকে লইয়া যে বাহিরে গেল তাহার মধ্যে একটা শাস্তির অভিপ্রায় ছিল সন্দেহ নাই। সে বুঝিয়াছিল যে বিনয় তাহাদের আহত বন্ধুত্বের শুশ্রূষা করিবার জন্যই সকালে তাহার কাছে আসিয়াছিল কিন্তু গোরা তাহাকে ক্ষমা করিল না।

ক্ষমা না করিবার বিশেষ একটু কারণ ছিল। ইতিপুর্ব্বে মতামত লইয়া গোরার সঙ্গে বিনয়ের সর্ব্বদাই তর্ক বিতর্ক, এমন কি, ঝগড়াঝাঁটিও হইয়া গেছে কিন্তু সে কেবল নিজেদের মধ্যে। বাহিরের লোকের সম্মুখে কোনো দিন বিনয় গোরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই। এমন কি, যে কথা লইয়া বিনয় গোরার সঙ্গে ঘোর তর্ক করিয়াছে ও হার মানে নাই, বাহিরের লোকের সঙ্গে সে তাহাই লইয়া গোরার পক্ষে ওকালতি করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মত জিনিষটা ত তর্কের বিষয়- বুদ্ধির জোরে "হাঁ"কে না ও "না"কে হাঁ করিতে বিনয়ের আনন্দই হইত কিন্তু গোরার বন্ধুত্ব তাহার কাছে অত্যন্ত সত্য বস্তু ছিল সুতরাং সেটাকে রক্ষা করিবার ও তাহার সম্মান বাড়াইবার জন্য বিনয় সকল অবস্থাতেই প্রস্তুত থাকিত।

এমন অবস্থায় যখন সেদিন বিপক্ষের দুর্গের মাঝখানে সে গোরাকে একলা ফেলিয়া যেন স্পর্দ্ধা করিয়াই অন্যদলে গিয়া দাঁড়াইল তখন সেটা যে গোরার দলগৌরবে ঘা দিল তাহা নহে তাহার প্রণয়কেই পীড়িত করিয়া তুলিল। এক

দিকে তাহাদের আশৈশব বন্ধুত্ব, আর একদিকে কেবলমাত্র দুইদিনের আলাপ অথচ কাঁটা এত অনায়াসে এই দিকেই হেলিয়া পড়িল! একি কথনো সহ্য করিতে পারা যায়! যে বিনয়কে গোরা নিঃসংশয়ে অত্যন্তই আপনার বলিয়া জানিত তাহার আজ একি দশা!

ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একদল গোরার অনুবর্ত্তী ভক্ত ছিল। রবিবারে গোরা তাহাদিগকে লইয়া কোনো দিন ক্রিকেট খেলাইত, কোনো দিন ধাপার মাঠে শিকার করিতে লইয়া যাইত, কোনো দিন মাণিকতলার কোনো একটা পোড়ো বাগানে লইয়া গিয়া বনভোজনে প্রবৃত্ত হইত।

বিনয়ের স্বভাবটা কুনো—সে ঘরে বসিয়া বই পড়িতে গল্প করিতে ভাল বাসে, লোকজন দেখিলে ডরায়। তাহার সেই স্বভাবটা ছাড়াইবার জন্য গোরা তাহাকে তাহাদের রবিবারের কাণ্ডে টানাটানি করিয়া লইয়া যাইত এই জন্য রবিবারের দিনে বিনয় প্রায়ই পালাইয়া বেড়াইত।

আজ রবিবারের সকালে বিনয় নিজে ধরা দিল; গোরা আজ তাহাকে মাঠে হোক ঘাটে হোক যেখানে হোক টানিয়া লইয়া যাইবে এবং সে তাহার সমস্ত অত্যাচারে মাথা পাতিয়া দিবে ইহাই তাহার মনের ইচ্ছা ছিল কিন্তু তবু গোরা যখন বিনয়কে ফেলিয়া একা অবিনাশকে লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল তখন অবিনাশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল গোরা এবং বিনয়ের মাঝখানে একটা কি গোল বাধিয়াছে।

অবিনাশ বিনয়ের মত লইয়া ব্যবহার লইয়া গোরার কাছে কিছু না কিছু আপত্তি যখন তখন প্রকাশ করিত গোরা তাহাতে সকল সময়ে অসন্তুষ্ট হইত না। অবিনাশের গোঁড়ামি গোরা পছন্দ করিত। গোরা বলিত, যাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি অধিকমাত্রায় নাই তাহারা হয় উদাসিন নয় গোঁড়া হইবেই; এ সব লোকের গোঁড়ামি মারিয়া দিলেই ইহাদিগকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দেওয়া হয়; ইহাদের গোঁড়ামিতে দম দিলে তবেই ইহারা চলে।

তা ছাড়া গোরার মতে সকল বড় ব্যাপারে গোঁড়ামির একটা সময় আছে। রান্নার সময় আগুন নহিলে খাবার পাকিয়া উঠে না—খাবার সময় আগুন অনাবশ্যক এবং অপ্রিয়। গোঁড়ামির উত্তেজনাও সেই আগুনের মত—যে কোনো বড় উদ্যোগের গোড়ায় তাহার খুবই প্রয়োজন—সে নহিলে জল ফুটিয়া উঠে না, ডালেচালে মিশিয়া এক হয় না;—যখন পরিবেষণের দিন উপস্থিত হইবে তখন এই আগুনকে গালি পাড়িলে ক্ষতি হইবে না।

বিনয়ের দোষ এই সে একটা জিনিষের দুই দিক না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। গোরা বলে দুই দিক দেখিতে পাওয়া দৃষ্টিশক্তির একটা ব্যাধি, তাহাতে কোনো-দিক স্পষ্ট দেখা যায় না। তা হোক, কোনো একটা মত লইয়া অন্ধভাবে জেদ করা বিনয়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। অথচ গোরার প্রবলতার দ্বারা তাহার জেদের দ্বারা চালিত হইতে সে ভালবাসে, সে হাজার তর্ক করুক বিচার করুক গোরার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াই তাহার তৃপ্তি।

বাল্যকাল হইতে এমনি ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য বিনয়ের মতামত তর্কবিতর্ককে গোরা বড় একটা গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু অবিনাশের মতো যাহারা তাহার দলের বাহন বিনয়ের তর্কে তাহারা কান না দেয় ইহাও গোরার ইচ্ছা। সেই জন্য বিনয়ের বিরুদ্ধে অবিনাশ অসহি-ষ্ণুতা প্রকাশ করিলে গোরা অনেক সময় তাহাতে উৎসাহই দিয়াছে, আপত্তি করে নাই।

আজ রাস্তায় যাইতে যাইতে অবিনাশ কথা পাড়িল যে, বিনয় বাবু মতামতে ধরণ ধারণে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্ম, কেবল গোরাই তাহাকে জোর করিয়া হিন্দুয়ানির গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া রাখি-য়াছেন ইহার চেয়ে যদি তিনি প্রকাশ্যে ব্রাহ্ম হইতেন তাহা হইলে হিন্দুহিতৈষী দলের পক্ষে ভাল হইত। ইত্যাদি।

আজ গোরা অবিনাশের এ সমস্ত কথা সহিতে পারিল না—সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বিনয়কে আমি হিন্দুর দলে টেনে রেখেছি! তুমি কি মনে কর বুদ্ধিতে ক্ষমতাতে বিনয় আমার চেয়ে কোনো অংশে ছোট! তুমি জান তার সাহায্য না পেলে আমার নিজের মত ও বিশ্বাস আমার নিজের কাছে আজ এত স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ত না!"

তাহার চিরবন্ধু বিনয়ের সম্বন্ধে যখন তাহার নিজের অন্তরাত্মাই তাহাকে পীড়ন করিতেছিল, যখন রাস্তার সমস্ত ভিড়ের মধ্যে বিনয়ের ক্ষুণ্ণমুখ গোরার মনে জাগিতেছিল তখন সেই বিনয়ের উপর আর কাহারো হাতের লেশমাত্র আঘাত সে সহিতে পারিবে কেন?

অবিনাশের বোধশক্তি সূক্ষ্ম নহে; গোরার হৃদয়ের গভীর

বেদনা বুঝিবার সাধ্য তাহার ছিল না। তাই সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "আপনি জানেন বিনয় বাবু কেন রবিবারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান না! পাছে ব্রাহ্ম সমাজে কেশব বাবুর বক্তৃতা শোনা ফাঁক যায়।"

গোরার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "জানিনে ত কি? বিনয় কি লুকিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে যায়? সে জন্যে তার কি ছল করবার কোনো দরকার আছে? তুমি যদি ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মিত যেতে তাহলে তোমার জন্য ভাবনা হতে পারত—কিন্তু বিনয়ের জন্য কারো ভয় করবার কোনো দরকার নেই।"

অবিনাশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—"তা হতে পারে তিনি খুব সরল স্বভাবের লোক—কিন্তু দলের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত কি ভাল! আপনিত বল্চেনই সকলে তাঁর মত বুদ্ধিমান নয়।"

এটা গোরারই কথা। গোরা অনেকবার বলিয়াছে সাধারণের পক্ষে বিনয়ের দৃষ্টান্ত ভাল নয়। গোরা চুপ করিয়া রহিল।

গোরা আজ ছাত্রদের সঙ্গে বেশিক্ষণ মেলামেশা করিতে পারিল না সে অন্য লোকের উপর ভার দিয়া আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

প্রথমে সে নিজের বসিবার ঘরে গিয়া দেখিল কেহ নাই। তাহার পরে আনন্দময়ীর মহলে ঘুরিয়া আসিল—সেখানেও বিনয়কে দেখিতে পাইল না।

গোরা মনে মনে আশা করিয়াছিল বিনয় মার কাছে বসিয়া তাহার ফেরার জন্য প্রতীক্ষা করিবে।

গোরা যখন মধ্যাহ্নে খাইতে বসিল—আনন্দময়ী আস্তে আস্তে কথা পাড়িলেন—"আজ সকালে বিনয় এসেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?"

গোরা খাবার থালা হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল—"হাঁ হয়েছিল।"

আনন্দময়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—তাহার পর কহিলেন—"তাকে থাকতে বলেছিলুম কিন্তু সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে চলে গেল।"

গোরা কোনো উত্তর করিল না। আনন্দময়ী কহিলেন—"তার মনে কি একটা কষ্ট হয়েচে গোরা। আমি তাকে এমন কখনো দেখিনি। আমার মন বড় খারাপ হয়ে আছে।"

গোরা চুপ করিয়া খাইতে লাগিল। আনন্দময়ী অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়াই গোরাকে মনে মনে একটু ভয় করিতেন। সে যখন নিজে তাঁহার কাছে মন না খুলিত তখন তিনি তাহাকে কোনো কথা লইয়া পীড়াপীড়ি করিতেন না। অন্যদিন হইলে এইখানেই চুপ করিয়া যাইতেন, কিন্তু আজ বিনয়ের জন্য তাঁহার মন বড় বেদনা পাইতেছিল বলিয়াই কহিলেন—"দেখ, গোরা, একটি কথা বলি রাগ করো না। ভগবান অনেক মানুষ সৃষ্টি করেচেন কিন্তু সকলের জন্যে কেবল একটিমাত্র পথ খুলে রাখেননি। বিনয় তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসে তাই সে তোমার কাছ থেকে সমস্তই সহ্য করে—কিন্তু তোমারই পথে তাকে চল্‌তে হবে এ জবরদস্তি করিলে সেটা সুখের হবে না।"

গোরা কহিল—"মা, আর একটু দুধ এনে দাও!"

কথাটা এইখানেই চুকিয়া গেল। আহারান্তে আনন্দময়ী তাঁহার তক্তপোষে চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতে লাগিলেন। লছমিয়া বাড়ির বিশেষ কোনো ভৃত্যের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধীয় আলোচনায় আনন্দময়ীকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল।

গোরা চিঠিপত্র লিখিয়া অনেকটা সময় কাটাইয়া দিল। গোরা তাহার উপর রাগ করিয়াছে বিনয় তাহা আজ সকালে স্পষ্ট দেখিয়া গেছে তবু যে সে এই রাগ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য গোরার কাছে আসিবে না ইহা হইতেই পারে না জানিয়া সে সকল কর্ম্মের মধ্যেই বিনয়ের পদশব্দের জন্য কান পাতিয়া ছিল।

বেলা বহিয়া গেল—বিনয় আসিল না। লেখা ছাড়িয়া গোরা উঠিবে মনে করিতেছে এমন সময় মহিম আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আসিয়াই চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—"শশিমুখীর বিয়ের কথা কি ভাব্‌চ গোরা?"

একথা গোরা একদিনের জন্যও ভাবে নাই সুতরাং অপরাধীর মত তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

বাজারে পাত্রের মূল্য যে কিরূপ চড়া এবং ঘরে অর্থের অবস্থা যে কিরূপ অসচ্ছল তাহা আলোচনা করিয়া গোরাকে একটা উপায় ভাবিতে বলিলেন। গোরা যখন ভাবিয়া কিনারা পাইল না তখন তিনি তাহাকে চিন্তা সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিনয়ের কথাটা পাড়িলেন। এত

ঘোর ফের করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মহিম গোরাকে মুখে যাই বলুন মনে মনে ভয় করিতেন।

এ প্রসঙ্গে বিনয়ের কথা যে উঠিতে পারে গোরা তাহা কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিশেষত গোরা এবং বিনয় স্থির করিয়াছিল তাহারা বিবাহ না করিয়া দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবে। গোরা তাই বলিল "বিনয় বিয়ে করবে কেন?"

মহিম কহিলেন—"এই বুঝি তোমাদের হিঁদুয়ানি! হাজার টিকি রাখ আর ফোঁটা কাট সাহেবিয়ানা হাড়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে। শাস্ত্রের মতে বিবাহটা যে ব্রাহ্মণের ছেলের একটা সংস্কার তা জান?"

মহিম এখনকার ছেলেদের মত আচারও লঙ্ঘন করেন না আবার শাস্ত্রের ধারও ধারেন না। হোটেলে খানা খাইয়া বাহাদুরী করাকেও তিনি বাড়াবাড়ি মনে করেন আবার গোরার মত সর্ব্বদা শ্রুতিস্মৃতি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করাকেও তিনি প্রকৃতিস্থ লোকের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করেন না। কিন্তু যস্মিন দেশে যদাচারঃ—গোরার কাছে শাস্ত্রের দোহাই পাড়িতে হইল।

এ প্রস্তাব যদি দুইদিন আগে আসিত তবে গোরা একেবারে কানেই লইত না। আজ তাহার মনে হইল কথাটা নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। অন্তত এই প্রস্তাবটা লইয়া এখনি বিনয়ের বাসায় যাইবার একটা উপলক্ষ্য জুটিল।

গোরা শেষকালে বলিল—"আচ্ছা, বিনয়ের ভাবখানা কি বুঝিয়া দেখি।"

মহিম কহিলেন—"সে আর বুঝতে হবে না। তোমার কথা সে কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। ও ঠিক হয়ে গেছে। তুমি বললেই হবে।"

সেই সন্ধ্যার সময়েই গোরা বিনয়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। ঝড়ের মত তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, বাবু আটাত্তর নম্বর বাড়িতে গিয়াছেন।

শুনিয়া গোরার সমস্ত মন বিকল হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন যাহার জন্য গোরার মনে শান্তি ছিল না সেই বিনয় আজকাল গোরার কথা মনে করিবার অবকাশ মাত্র পায় না। গোরা রাগই করুক আর দুঃখিতই হউক্ বিনয়ের শান্তিও সান্ত্বনার কোনো ব্যাঘাত ঘটিবে না!

পরেশ বাবুর পরিবারদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে গোরার অন্তঃকরণ একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বিদ্রোহ বহন করিয়া পরেশ বাবুর বাড়ির দিকে ছুটিল। ইচ্ছা ছিল সেখানে এমন সকল কথা উত্থাপন করিবে যাহা শুনিয়া এই ব্রাহ্ম পরিবারের হাড়ে জ্বালা ধরিবে এবং বিনয়েরও আরাম বোধ হইবে না।

পরেশ বাবুর বাসায় গিয়া শুনিল তাঁহারা কেহই বাড়ীতে নাই, সকলেই উপাসনামন্দিরে গিয়াছেন। মুহূর্ত্ত কালের জন্য সংশয় হইল বিনয় হয়ত যায় নাই—সে হয়ত এই ক্ষণেই গোরার বাড়িতে গেছে।

থাকিতে পারিল না। গোরা তাহার স্বাভাবিক ঝড়ের গতিতে মন্দিরের দিকেই গেল। দ্বারের কাছে গিয়া দেখিল বিনয় বরদাসুন্দরীর অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের গাড়িতে উঠিতেছে;—সমস্ত রাস্তার মাঝখানে নির্লজ্জের মত অন্য পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়া বসিতেছে! মূঢ়! নাগপাশে এমনি করিয়াই ধরা দিতে হয়! এত সত্বর! এত সহজে! তবে বন্ধুত্বের আর ভদ্রস্থতা নাই। গোরা ঝড়ের মতই ছুটিয়া চলিয়া গেল—আর গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বিনয় রাস্তার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বরদাসুন্দরী মনে করিলেন আচার্য্যের উপদেশ তাহার মনের মধ্যে কাজ করিতেছে—তিনি তাই কোনো কথা বলিলেন না।

১৬

রাত্রে গোরা বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া অন্ধকার ছাতের উপর বেড়াইতে লাগিল। তাহার নিজের উপর রাগ হইল। রবিবারটা কেন সে এমন বৃথা কাটিতে দিল! ব্যক্তিবিশেষের প্রণয় লইয়া অন্য সমস্ত কাজ নষ্ট করিবার জন্য ত গোরা পৃথিবীতে আসে নাই। বিনয় যে পথে যাইতেছে সে পথ হইতে তাহাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে কেবলই সময় নষ্ট এবং নিজের মনকে পীড়িত করা হইবে। অতএব জীবনের যাত্রাপথে এখন হইতে বিনয়কে বাদ দিতে হইবে, জীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্ম্মকে সত্য করিয়া তুলিবে। এই বলিয়া গোরা জোর করিয়া হাত নাড়িয়া বিনয়ের সংস্রবকে নিজের চারিদিক হইতে যেন সরাইয়া ফেলিল।

এমন সময় মহিম ছাতে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন—কহিলেন—"মানুষের যখন ডানা নেই তখন এই তেতলা বাড়ি তৈরি করা কেন? ডাঙার মানুষ হয়ে আকাশে বাস করবার চেষ্টা করলে দেবতার সয় না। বিনয়ের কাছে গিয়েছিলে?"

গোরা তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল—"বিনয়ের সঙ্গে শশিমুখীর বিয়ে হতে পারবে না।"

মহিম। কেন বিনয়ের মত নেই না কি?

গোরা। আমার মত নেই।

মহিম হাত উলটাইয়া কহিলেন—"বেশ! এ আবার একটা নতুন ফ্যাসাদ্ দেখ্‌চি! তোমার মত নেই! কারণটা কি শুনি?"

গোরা। আমি বেশ বুঝেচি বিনয়কে আমাদের সমাজে ধরে রাখা শক্ত হবে। ওর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিবাহ চলবে না।

মহিম। ঢের ঢের হিঁদুয়ানি দেখেছি কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখ্‌লুম না। কাশী ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! তুমি যে দেখি ভবিষ্যৎ দেখে বিধান দাও। কোন দিন বলবে স্বপ্নে দেখ্‌লুম খৃষ্টান হয়েচ, গোবর খেয়ে জাতে উঠ্‌তে হবে।

অনেক বকাবকির পর মহিম কহিলেন—"মেয়েকে ত মূর্খর হাতে দিতে পারিনে! যে ছেলে লেখাপড়া শিখেছে যার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে সে ছেলে মাঝে মাঝে শাস্ত্র ডিঙিয়ে চলবেই! সে জন্যে তার সঙ্গে তর্ক কর তাকে গাল দাও—কিন্তু তার বিয়ে বন্ধ করে মাঝে থেকে আমার মেয়েটাকে শাস্তি দাও কেন! তোমাদের সমস্তই উল্টো বিচার!"

মহিম নীচে আসিয়া আনন্দময়ীকে কহিলেন—"মা, তোমার গোরাকে তুমি ঠেকাও!"

আনন্দময়ী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

মহিম। শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ আমি একরকম পাকা করেই এনেছিলুম। গোরাকেও কাল রাজি করেছিলুম, ইতিমধ্যে একরাত্রেই গোরা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পেরেচে যে বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে হিঁদু নয়—মনু পরাশরের সঙ্গে তার মতের একটু আধটু অনৈক্য হয়ে থাকে। তাই গোরা বেঁকে দাঁড়িয়েছে—গোরা বাঁকলে কেমন বাঁকে সে ত জানই। কলিযুগের জনক যদি পণ করতেন যে বাঁকা গোরাকে সোজা করলে তবে সীতা দেব তবে শ্রীরামচন্দ্র হার মেনে যেতেন এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। মনু পরাশরের নীচেই পৃথিবীর মধ্যে সে একমাত্র তোমাকেই মানে। এখন তুমি যদি গতি করে দাও ত মেয়েটা তরে যায়। অমন পাত্র খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

এই বলিয়া, গোরার সঙ্গে আজ ছাতে যা কথাবার্ত্তা হইয়াছে মহিম তাহা সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলেন। বিনয়ের সঙ্গে গোরার একটা বিরোধ যে ঘনাইয়া উঠিতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ীর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

আনন্দময়ী উপরে আসিয়া দেখিলেন গোরা ছাতে বেড়ানো বন্ধ করিয়া ঘরে একটা চৌকির উপর বসিয়া আর একটা চৌকিতে পা তুলিয়া দিয়া বই পড়িতেছে। আনন্দময়ী তাহার কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। গোরা সামনের চৌকি হইতে পা নামাইয়া খাড়া হইয়া বসিয়া আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিল।

আনন্দময়ী কহিলেন—"বাবা গোরা, আমার একটি কথা রাখিস্ বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস্‌নে। আমার কাছে তোরা দুজনে দুটি ভাই—তোদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে আমি সইতে পারব না।"

গোরা কহিল—"মা, তুমি মনে কোরো না, বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে আছি। কিন্তু বন্ধু যদি বন্ধন কাটতে চায় তবে তার পিছনে ছুটোছুটি করে আমি সময় নষ্ট করতে পারব না। আমার যে অনেক কাজ আছে।"

আনন্দময়ী কহিলেন—"বাবা, আমি জানিনে তোমাদের মধ্যে কি হয়েচে কিন্তু বিনয় তোমার বন্ধন কাটাতে চাচ্চে একথা যদি বিশ্বাস কর তবে তোমার বন্ধুত্বের জোর কোথায়?"

গোরা। মা, আমি সোজা চলতে ভালবাসি, যারা দুদিক রাখ্‌তে চায় আমার সঙ্গে তাদের বনবে না। দুনৌকায় পা দেওয়া যার স্বভাব আমার নৌকো থেকে তাকে পা সরাতে হবে—এতে আমারই কষ্ট হোক্ আর তারই কষ্ট হোক্।

আনন্দময়ী। তাই যদি তোমার পণ হয় অত ব্যস্ত হও

কেন! বন্ধুত্ব কি এত সহজেই চুকিয়ে ফেল্‌বার জিনিষ! তোমার নৌকো থেকে বিদায় করবার আগে না হয় বল না অন্য নৌকো থেকেই সে পাটা তুলে আনুক। একবার বল্লেই যদি না শোনে তবে একটু সবুর করেই দেখ না। গোরা, আমার কথা শোন্ গোরা, তাড়াতাড়ি যদি একটা কিছু করে বসিস্ তবে বড় দুঃখ পাবি। কি হয়েছে বল দেখি! ব্রাহ্মদের ঘরে সে যাওয়া আশা করে এই ত তার অপরাধ?

গোরা। সে অনেক কথা মা।

আনন্দময়ী। হোক্ অনেক কথা—কিন্তু আমি একটি কথা বলি। গোরা, সব বিষয়েই তোমার এত জেদ, যে তুমি যা ধর তা কেউ ছাড়াতে পারে না—কিন্তু বিনয়ের বেলাই তুমি এমন আলগা কেন? তোমার অবিনাশ যদি দল ছাড়তে চাইত তুমি কি তাকে এত সহজে ছাড়তে? তোমার উপর যদি কিছু রক্ষা করবার ভার থাকে তবে এম্‌নি করেই কি রক্ষা করতে হয়! বিনয় যাই বলুক আর যাই করুক্ তুমি ওকে যেতে দেবে কেন? বন্ধু বলেই কি ও তোমার সকলের চেয়ে কম?

গোরা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ীর এই কথাতে সে নিজের মনটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল। এতক্ষণ সে মনে করিতেছিল যে, সে কর্ত্তব্যের জন্য তাহার বন্ধুত্বকে বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছে এখন স্পষ্ট বুঝিল ঠিক তাহার উল্টা। তাহার বন্ধুত্বের অভিমানে বেদনা লাগিয়াছে বলিয়াই বিনয়কে বন্ধুত্বের চরম শাস্তি দিতে সে উদ্যত হইয়াছে। বিনয় যদি তাহার চিরবন্ধু না হইত, যদি সামান্য কেহ হইত তবে নিজের অধিকার হইতে এত সহজে তাহাকে চলিয়া যাইতে দিত না। সে মনে জানিত বিনয়কে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বন্ধুত্বই যথেষ্ট—অন্য কোনো প্রকার চেষ্টা প্রণয়ের অসম্মান।

আনন্দময়ী যেই বুঝিলেন তাঁহার কথাটা গোরার মনে একটুখানি লাগিয়াছে অমনি তিনি আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিবার উপক্রম করিলেন। গোরাও হঠাৎ বেগে উঠিয়া পড়িয়া আলনা হইতে চাদর তুলিয়া কাঁধে ফেলিল।

আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন– কোথায় যাও গোরা?

গোরা কহিল—আমি বিনয়ের বাড়ী যাচ্চি।

আনন্দময়ী। খাবার তৈরি আছে খেয়ে যাও।

গোরা। আমি বিনয়কে ধরে আন্‌চি সেও এখানে খাবে।

আনন্দময়ী আর কিছু না বলিয়া নীচের দিকে চলিলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া হঠাৎ থামিয়া কহিলেন "ঐ বিনয় আস্‌চে।"

বলিতে বলিতে বিনয় আসিয়া পড়িল। আনন্দময়ীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। তিনি স্নেহে বিনয়ের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন—"বিনয়, বাবা, তুমি খেয়ে আসনি?"

বিনয় কহিল—"না, মা।"

আনন্দময়ী। তোমাকে এইখানেই খেতে হবে।

বিনয় একবার গোরার মুখের দিকে চাহিল। গোরা কহিল—"বিনয়, অনেকদিন বাঁচ্‌বে। তোমার ওখানেই যাচ্ছিলুম।"

আনন্দময়ীর বুক হাল্‌কা হইয়া গেল—তিনি তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেলেন।

দুই বন্ধু ঘরে আসিয়া বসিলে গোরা যাহা তাহা একটা কথা তুলিল—কহিল, "জান, আমাদের ছেলেদের জন্যে একজন বেশ ভাল জিম্‌নাষ্টিক্ মাষ্টার পেয়েছি। সে শেখাচ্চে বেশ।"

মনের ভিতরের আসল কথাটা এখনো কেহ পাড়িতে সাহস করিল না।

দুই জনে যখন খাইতে বসিয়া গেল তখন আনন্দময়ী তাহাদের কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিলেন এখনো তাহাদের উভয়ের মধ্যে বাধো-বাধো রহিয়াছে—পর্দ্দা উঠিয়া যায় নাই। তিনি কহিলেন—"বিনয়, রাত অনেক হয়েছে তুমি আজ এই খানেই শুয়ো। আমি তোমার বাসায় খবর পাঠিয়ে দিচ্চি।"

বিনয় চকিতের মধ্যে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ। খেয়ে রাস্তায় হাঁটা নিয়ম নয়। তাহলে এইখানেই শোয়া যাবে।"

আহারান্তে দুই বন্ধু ছাতে আসিয়া মাদুর পাতিয়া বসিল। ভাদ্রমাস পড়িয়াছে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। হালকা পাতলা শাদা মেঘ ক্ষণিক ঘুমের

ঘোরের মত মাঝে মাঝে চাঁদকে একটুখানি ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে উড়িয়া চলিতেছে। চারিদিকে দিগন্ত পর্য্যন্ত নানা আয়তনের উচুনীচু ছাদের শ্রেণী ছায়াতে আলোতে এবং মাঝে মাঝে গাছের মাথার সঙ্গে মিশিয়া যেন সম্পূর্ণ প্রয়োজনহীন একটা প্রকাণ্ড অবাস্তব খেয়ালের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

গির্জ্জার ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজিল; বরফওয়ালা তাহার শেষ হাঁক হাঁকিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীর শব্দ মন্দ হইয়া আসিয়াছে। গোরাদের গলিতে জাগরণের লক্ষণ নাই কেবল প্রতিবেশীর আস্তাবলে কাঠের মেঝের উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ এক একবার শোনা যাইতেছে এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিতেছে।

দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে বিনয় প্রথমটা একটু দ্বিধা করিয়া তাহার পরে পরিপূর্ণবেগে তাহার মনের কথাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল। বিনয় কহিল—"ভাই গোরা, আমার বুক ভরে উঠেছে। আমি জানি এ সব বিষয়ে তোমার মন নেই কিন্তু তোমাকে না বল্‌লে আমি বাঁচব না। আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে—কিন্তু এটা নিশ্চয় এর সঙ্গে কোনো চাতুরী খাটবে না। বইয়েতে অনেক কথা পড়েছি এবং এত দিন মনে করে এসেছি সব জানি। ঠিক যেন ছবিতে জল দেখে মনে করতুম সাঁতার দেওয়া খুব সহজ—কিন্তু আজ জলের মধ্যে পড়ে এক মুহূর্ত্তে বুঝ্‌তে পেরেছি এ ত ফাঁকি নয়।"

এই বলিয়া বিনয় তাহার জীবনের এই আশ্চর্য্য আবির্ভাবকে একান্ত চেষ্টায় গোরার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে লাগিল। কিছুতেই কোনো কথায় সে যেন ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। সে বলিল ইহাকে সুখ বা দুঃখ বলিলে কিছুই বুঝা যায় না—ইহা সুখ এবং দুঃখ দুয়ের চেয়েই অনেক বেশি। ইহার জন্য আজও কোনো ভাষা তৈরি হয় নাই—ইহা পরিপূর্ণতার পরম বেদনা।

বিনয় বলিতে লাগিল, আজকাল তাহার কাছে সমস্ত দিন ও রাত্রির মধ্যে কোথাও যেন কিছু ফাক নাই—সমস্ত আকাশের মধ্যে কোথাও যেন কোনো রন্ধ্র নাই সমস্ত একেবারে নিবিড়ভাবে ভরিয়া গেছে—বসন্তকালের মৌচাক যেমন মধুতে ভরিয়া ফাটিয়া যাইতে চায় তেমনিতর। আগে এই বিশ্বচরাচরের অনেক খানি তাহার জীবনের বাহিরে পড়িয়া থাকিত—যেটুকুতে তাহার প্রয়োজন সেই টুকুতেই তাহার দৃষ্টি বদ্ধ ছিল। আজ সমস্তই তাহার সম্মুখে আসিতেছে, সমস্তই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, সমস্তই একটা নূতন তাৎপর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে জানিত না পৃথিবীকে সে এত ভালবাসে, আকাশ এমন আশ্চর্য্য, আলোক এমন অপূর্ব্ব, রাস্তার অপরিচিত পথিকের প্রবাহও এমন গভীরভাবে সত্য! তাহার ইচ্ছা করে সকলের জন্য সে একটা কিছু করে, তাহার সমস্ত শক্তিকে আকাশের সূর্য্যের মত সে জগতের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

বিনয় যে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গে এই সমস্ত কথা বলিতেছে তাহা হঠাৎ মনে হয় না। সে যেন কাহারো নাম মুখে আনিতে পারে না—আভাস দিতে গেলেও কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। এই যে আলোচনা করিতেছে ইহার জন্য সে যেন কাহার প্রতি অপরাধ অনুভব করিতেছে। ইহা অন্যায়, ইহা অপমান—কিন্তু আজ এই নির্জ্জন রাত্রে নিস্তব্ধ আকাশে বন্ধুর পাশে বসিয়া এ অন্যায়টুকু সে কোনো মতেই কাটাইতে পারিল না।

সে কি মুখ! প্রাণের আভা তাহার কপোলের কোমলতার মধ্যে কি সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে! হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কি আশ্চর্য্য আলোর মত ফুটিয়া পড়ে! ললাটে কি বুদ্ধি! এবং ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কি নিবিড় অনির্ব্বচনীয়তা! আর সেই দুটি হাত—সেবা এবং স্নেহকে সৌন্দর্য্যে সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, সে যেন কথা কহিতেছে! বিনয় নিজের জীবনকে যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে, এই আনন্দে তাহার বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যাহা না দেখিয়াই জীবন সাঙ্গ করে—বিনয় যে তাহাকে এমন করিয়া চোখের সাম্‌নে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইবে ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

কিন্তু একি পাগ্‌লামি! একি অন্যায়! হোক্ অন্যায়, আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায় না! এই স্রোতেই যদি কোনো একটা কূলে তুলিয়া দেয় ত ভাল, আর যদি ভাসাইয়া দেয়, যদি তলাইয়া লয় তবে উপায় কি! মুস্কিল এই যে, উদ্ধারের

ইচ্ছাও হয় না—এতদিনকার সমস্ত সংস্কার, সমস্ত স্থিতি হারাইয়া চলিয়া যাওয়াই যেন জীবনের সার্থক পরিণাম!

গোরা চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। এই ছাতে এমনি নির্জ্জন নিসুপ্ত জ্যোৎস্নারাত্রে আরো অনেক দিন দুই জনে অনেক কথা হইয়া গেছে—কত সাহিত্য, কত লোকচরিত্র, কত সমাজহিতের আলোচনা; ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দুই জনের কত সংকল্প; কিন্তু এমন কথা ইহার পূর্ব্বে আর কোনো দিন হয় নাই। মানবহৃদয়ের এমন একটা সত্য পদার্থ, এমন একটা প্রবল প্রকাশ এমন করিয়া গোরার সাম্নে আসিয়া পড়ে নাই। এই সমস্ত ব্যাপারকে সে এত দিন কবিত্বের আবর্জ্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে আজ সে ইহাকে এত কাছে দেখিল যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। শুধু তাহাই নয় ইহার বেগ তাহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দ্দা মুহূর্ত্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এত দিনকার রুদ্ধ কক্ষে এই শরৎ নিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।

চন্দ্র কখন এক সময় ছাদগুলার নীচে নামিয়া গেল। পূর্ব্বদিকে তখন নিদ্রিত মুখের হাসির মত একটুখানি আলোকের আভাস দিয়াছে। এতক্ষণ পরে বিনয়ের মনটা হালকা হইয়া একটা লজ্জার সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আমার এ সমস্ত কথা তোমার কাছে খুব ছোট। তুমি আমাকে হয়ত মনে মনে অবজ্ঞা করচ। কিন্তু কি করব বল—কখনো তোমার কাছে কিছু লুকোইনি—আজও লুকোলুম না তুমি বোঝ আর না বোঝ।"

গোরা বলিল—"বিনয়, এ সব কথা আমি যে ঠিক বুঝি তা বল্‌তে পারিনে। দু'দিন আগে তুমিও বুঝ্‌তে না। জীবনব্যাপারের মধ্যে এই সমস্ত আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত ছোট ঠেকেছে সে কথাও অস্বীকার করতে পারিনে। তাই বলে এটা যে বাস্তবিকই ছোট তা হয়ত নয়—এর শক্তি, এর গভীরতা আমি প্রত্যক্ষ করিনি বলেই এটা আমার কাছে বস্তুহীন মায়ার মত ঠেকেছে—কিন্তু তোমার এত বড় উপলব্ধিকে আজ আমি মিথ্যা বল্‌ব কি করে? আসল কথা হচ্চে এই, যে লোক যে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরের সত্য যদি তার কাছে ছোট হয়ে না থাকে তবে সে ব্যক্তি কাজ করতেই পারে না। এই জন্যই ঈশ্বর দূরের জিনিষকে মানুষের দৃষ্টির কাছে খাটো করে দিয়েছেন—সব সত্যকেই সমান প্রত্যক্ষ করিয়ে তাকে মহা বিপদে ফেলেননি। আমাদের একটা দিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে আঁকড়ে ধরবার লোভ ছাড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই পাব না। আজ তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে সত্যের যে মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করচ—আমি সেখানে সে মূর্ত্তিকে অভিবাদন করতে যেতে পারব না—তাহলে আমার জীবনের সত্যকে হারাতে হবে। হয় এদিক্ নয় ওদিক্।"

বিনয় কহিল—"হয় বিনয়, নয় গোরা। আমি নিজেকে ভরে নিতে দাঁড়িয়েছি, তুমি নিজেকে ত্যাগ করতে দাঁড়িয়েছ।"

গোরা অসহিষ্ণু হইয়া কহিল—"বিনয়, তুমি মুখে মুখে বই রচনা কোরো না। তোমার কথা শুনে আমি একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তোমার জীবনে তুমি আজ একটা প্রবল সত্যের সাম্নে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ,—তার সঙ্গে ফাঁকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে—সে আর থাকবার যো নেই। আমি যে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও অম্নি করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা। তুমি এত দিন বই পড়া প্রেমের পরিচয়েই পরিতৃপ্ত ছিলে—আমিও বই পড়া স্বদেশ প্রেমকেই জানি—প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝ্‌তে পেরেছ বইয়ের জিনিষের চেয়ে এ কত সত্য—এ তোমার সমস্ত জগৎ চরাচর অধিকার করে বসেছে—কোথাও তুমি এর কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্চ না—স্বদেশপ্রেম যে দিন আমার সম্মুখে এমনি সর্ব্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সে দিন আমারও আর রক্ষা নাই—সে দিন সে আমার ধন প্রাণ আমার অস্থি মজ্জা রক্ত আমার আকাশ আলোক আমার সমস্তই অনায়াসে আকর্ষণ করে নিতে পারবে;—স্বদেশের সেই সত্য মূর্ত্তি যে কি আশ্চর্য্য অপরূপ, কি

সুনিশ্চিত সুগোচর, তার আনন্দ তার বেদনা যে কি প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্যার স্রোতের মত জীবন মৃত্যুকে এক মুহূর্ত্তে লঙ্ঘন করে যায় তা আজ তোমার কথা শুনে মনে মনে অল্প অল্প অনুভব করতে পারচি—তোমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনকে আজ আঘাত করেছে—তুমি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝ্‌তে পারব কিনা জানি না—কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্বাদ যেন তোমার ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করচি।"

বলিতে বলিতে গোরা মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া ছাতে বেড়াইতে লাগিল। পূর্ব্বদিকের উষার আভাস তাহার কাছে যেন একটা বাক্যের মত বার্ত্তার মত প্রকাশ পাইল, যেন প্রাচীন তপোবনের একটা বেদমন্ত্রের মত উচ্চারিত হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল—মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, এবং ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটি জ্যোতির্লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় শতদলে সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিকশিত হইল—তাহার সমস্ত প্রাণ সমস্ত চেতনা সমস্ত শক্তি যেন ইহাতে একেবারে পরম আনন্দে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

গোরা যখন আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল তখন সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"বিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পার হয়ে আস্‌তে হবে—আমি বলচি ওখানে থাম্‌লে চল্‌বে না। আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করচেন, তিনি যে কত বড় সত্য একদিন তোমাকে আমি তা দেখাব। আমার মনের মধ্যে আজ ভারি আনন্দ হচ্চে—তোমাকে আজ আমি আর কারো হাতে ছেড়ে দিতে পারব না।"

বিনয় মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া গোরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোরা তাহাকে একটা অপূর্ব্ব উৎসাহে দুই হাত দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল—কহিল—"ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব—আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

গোরার এই গভীর উৎসাহের বেগ বিনয়েরও হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল;—সে কোনো কথা না বলিয়া গোরার এই আকর্ষণে আপনাকে ছাড়িয়া দিল।

গোরা বিনয় দুইজনে নীরবে পাশাপাশি বেড়াইতে লাগিল। পূর্ব্বাকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। গোরা কহিল—"ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখ্‌তে পাচ্চি সে ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো করতে হবে—আমার কাছে সেইটেই সব চেয়ে বড় আনন্দ মনে হচ্চে—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই—সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগ্‌তে হবে সম্পূর্ণ দিতে হবে—মাধুর্য্য নয়, এ একটা দুর্জ্জয় দুঃসহ আবির্ভাব—এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ঙ্কর—এর মধ্যে সেই কঠিন ঝঙ্কার আছে যাতে করে সপ্তসুর এক সঙ্গে বেজে উঠে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। মনে করলে আমার বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে উঠে—আমার মনে হয় এই আনন্দই পুরুষের আনন্দ—এই হচ্চে জীবনের তাণ্ডব নৃত্য—পুরাতনের প্রলয়যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্ত্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা। রক্তবর্ণ আকাশক্ষেত্রে একটা বন্ধনমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যৎকে দেখ্‌তে পাচ্চি—আজকেকার এই আসন্ন প্রভাতের মধ্যেই দেখ্‌তে পাচ্চি—দেখ আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্চে।"—বলিয়া বিনয়ের হাত লইয়া গোরা নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল।

বিনয় কহিল—"ভাই গোরা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমি তোমাকে বলচি আমাকে কোনো দিন তুমি দ্বিধা করতে দিয়ো না। একেবারে ভাগ্যের মত নির্দ্দয় হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যেয়ো। আমাদের দুই জনের এক পথ—কিন্তু আমাদের শক্তি ত সমান নয়।"

গোরা কহিল—"আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু একটা মহৎ আনন্দে আমাদের ভিন্ন প্রকৃতিকে এক করে দেবে—তোমাতে আমাতে যে ভালবাসা আছে তার চেয়ে বড় প্রেমে আমাদের এক করে দেবে। সেই প্রেম যতক্ষণে সত্য না হবে ততক্ষণে আমাদের দুজনের মধ্যে পদে পদে অনেক আঘাত সংঘাত বিরোধ বিচ্ছেদ ঘটতে থাক্‌বে—তার পরে একদিন আমরা সমস্ত ভুলে গিয়ে আমাদের পার্থক্যকে, আমাদের বন্ধুত্বকেও ভুলে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড একটা প্রচণ্ড আত্মপরিহারের মধ্যে অটল বলে মিলে গিয়ে দাঁড়াতে পারব—সেই কঠিন আনন্দই আমাদের বন্ধুত্বের শেষ পরিণাম হবে।"

বিনয় গোরার হাত টিপিয়া ধরিয়া কহিল—"তাই হোক্।"

গোরা কহিল—"ততদিন কিন্তু আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দেব। আমার সব অত্যাচার তোমাকে সইতে হবে—কেন না আমাদের বন্ধুত্বকেই জীবনের শেষ লক্ষ্য করে দেখ্‌তে পারব না—যেমন করে হোক্ তাকেই বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করে তার অসম্মান করব না। এতে যদি বন্ধুত্ব ভেঙে পড়ে তাহলে উপায় নেই কিন্তু যদি বেঁচে থাকে তাহলে বন্ধুত্ব সার্থক হবে।"

এমন সময়ে দুইজনে পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল আনন্দময়ী ছাতে আসিয়াছেন। তিনি দুই জনের হাত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন—"চল শোবে চল।"

দুই জনেই বলিল—"আর ঘুম হবে না মা।"

"হবে" বলিয়া আনন্দময়ী দুই বন্ধুকে জোর করিয়া বিছানায় পাশাপাশি শোওয়াইয়া দিলেন এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দুজনের শিয়রের কাছে পাখা করিতে বসিলেন।

বিনয় কহিল—"মা, তুমি পাখা করতে বসলে কিন্তু আমাদের ঘুম হবে না।"

আনন্দময়ী কহিলেন—"কেমন না হয় দেখ্‌ব। আমি চলে গেলেই তোমরা আবার কথা আরম্ভ করে দেবে সেটি হচ্চে না।"

দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িলে আনন্দময়ী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দেখিলেন, মহিম উপরে উঠিয়া আসিতেছেন। আনন্দময়ী কহিলেন—"এখন না—কাল সমস্তরাত ওরা ঘুমোয়নি। আমি এই মাত্র ওদের ঘুম পাড়িয়ে আস্‌চি।"

মহিম কহিলেন—"বাস্‌রে—একেই বলে বন্ধুত্ব! বিয়ের কথাটা উঠেছিল কি জান?"

আনন্দময়ী। জানিনে।

মহিম। বোধ হয় একটা কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ঘুম ভাঙ্‌বে কখন? শীঘ্র বিয়েটা না হলে বিঘ্ন অনেক আছে।

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন—"ওরা ঘুমিয়ে পড়ার দরুণ বিঘ্ন হবে না—আজ দিনের মধ্যেই ঘুম ভাঙ্‌বে।"

হিমাচলের উপদেশ।

স্থান হিমাদ্রিশৃঙ্গ—সময় সন্ধ্যা।

(একজন তপস্বীর প্রবেশ।)

তপস্বী। হে হিমাদ্রি, পূর্ণ আজ দ্বাদশ বৎসর,
একদিন, শরদের বিমল উষায়,
কিরণ-মণ্ডল মাঝে, দেখেছিনু তব
পবিত্র তাপস-মূর্ত্তি। দীর্ঘ জটাভার,
আপিঙ্গল নবোদিত ভানুরশ্মিরূপে,
পড়িয়াছে নভস্তলে; তুষার-চন্দন
শোভিছে ললাট দেশে; শুভ্র মেঘজাল
ধবল উত্তরী তব উড়ে উর্দ্ধানিলে;
দিব্য যজ্ঞ-উপবীত নির্ঝরিণী এক
বিরাজিত বক্ষস্থলে; হিমস্নাত দেহ;
সুরম্য দুহিতা দেবী ভারত-ভূমির
দাঁড়াইয়া শিরোদেশে উচ্চারিছ, যেন,
আশীর্ব্বাদ মহামন্ত্র। ভক্তি-মুগ্ধ আমি
সাষ্টাঙ্গে পড়িনু লুটি; প্রণমি তোমারে
বরিলাম গুরুরূপে। ত্যজি লোকালয়,
ত্যজি গৃহ, পরিজন, আসিনু ছুটিয়া
তোমার চরণতলে। সেই দিন হ'তে,
দ্বাদশ বৎসর, আছি তব পদাশ্রয়ে,
নিঃসঙ্গ, সেবিতে তোমা; শুনিতে বাসনা
অই শ্রীমুখের বাণী, শিখিবারে সাধ
তব মুখে মহামন্ত্র ভারত-মঙ্গল।

(কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া)

এখনও নীরব তুমি? সেই সমভাব,
অনাহারে, অনিদ্রায়, দ্বাদশ বৎসর,
এত যে সাধিনু তপ, সকলই কি বৃথা;
নহি শিষ্যযোগ্য তব? তাই নিরুত্তর?
কি আর করিব তবে? ভক্তি, প্রীতি, প্রেম,
যা কিছু, আমার ছিল, দিয়াছি ত সব,
কি আছে দিবার আর? শত অশ্রুধারা
ঢালিয়াছি পাদ্যরূপে; স্পর্শে, স্পর্শে তব
রোমাঞ্চিত তনু মম; কিনা জান তুমি?

অপূর্ব্ব মোহন সাজে সেজেছ যে দিন,
প্রতপ্ত কাঞ্চন তনু, জ্যোতির মুকুট
বিভূষিত শিরোদেশ, শত ইন্দ্রধনু-
সম বাস শোভে অঙ্গে, বিমোহিত চিতে,
প্রেমিক যেমতি চাহে প্রেমাস্পদ পানে,
অনিমেষ আঁখি, আমি দেখেছি তোমারে।
আবার যে দিন, ঘোর বরষা-নিশীথে,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবরিয়া তনু,
বজ্রের ঘর্ঘর নাদে করেছ হুঙ্কার,
হানিয়া ভ্রুকুটী ভীম চপলার ছলে,
উৎপাটিয়া তরুরাজী নিশ্বাসপবনে,
দেখায়েছ রুদ্র বেশ; সে দিন কাতরে
পড়েছি লুটায়ে তব বক্ষের উপর,
কহিয়াছি করযোড়ে, "ক্ষম, গুরুদেব,
সম্বর এ রুদ্র মূর্ত্তি।" তুষার নির্ঝর,
চূর্ণ করি গিরিশৃঙ্গ, প্লাবি তটভূমি,
ভাসায়ে পাষাণস্তূপ, ছুটেছে যে দিন,
পরস্পর আঘাতনে শিলাখণ্ড যত
ধাইয়াছে কড় কড়; তব লীলা ভাবি
নির্ভীক অন্তরে আমি এই বক্ষ মম
পাতিয়াছি পুরোভাগে। দংশিয়াছে কীট,
বৃশ্চিক দংষ্ট্রায় তীক্ষ্ণ ভেদিয়াছে ত্বক,
সহিয়াছি অকাতরে। যা দিয়াছ তুমি,
তিক্ত ফল, মূল, কটু, কষায় সলিল,
ভুঞ্জিয়াছি সুধা সম। কি করিব আর?
নহ পরিতুষ্ট যদি, শিখাও আমারে
সেবাধর্ম্ম, গুরু তুমি, শিখাও আমারে।
(পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া)
তবে কি পাষাণ তুমি? এ স্থাবর দেহে
নাহি আত্মা? বৃথা মোর সেবা, আরাধনা,
নিষ্ফল প্রয়াস শুধু? না না, কভু নয়;
আত্মাময় এ ব্রহ্মাণ্ড, প্রতি রেণু মাঝে,
প্রতি জলকণে, দেব বিশ্বাত্মা আপনি
রহেছেন বিরাজিত। নহে তবে কভু
বিধির এ মহাসৃষ্টি সংজ্ঞা-আত্মা-হীন।
সাধিব আবার তপ। দেখ, গুরুদেব,
অবসন্ন তনু মম, অস্থি-চর্ম্ম-শেষ,
নাহি মেদ, নাহি মাংস; তথাপি যদ্যপি
পরিতুষ্ট নহ তুমি, শেষ উপহার
দিব আজি, আছে প্রাণ, হানি... ;
লও প্রাণ;
(বক্ষে ত্রিশূল প্রহারোদ্যম)
কিন্তু এ কি! গিরিগুহা হ'তে
সজল জলদ-নাদে কে বলিল অই
"তিষ্ঠ, বৎস"! ভ্রান্তি মম? স্বপ্নমুগ্ধ আমি?
না, না, সত্য! নহে ভ্রম! কে আসিছে অই?
(আকাশে মধুর বাদ্যধ্বনি, মূর্ত্তিমান
হিমাচলের প্রবেশ।)

তপস্বী। কি সুন্দর, সুপ্রশান্ত, গম্ভীর মূরতি!
তুষার-কিরীট শিরে; শুভ্র জটাজাল
পড়িয়াছে বিলম্বিত, বাহু, পৃষ্ঠ 'পরে;
শাল সমুন্নত দেহ; কণ্ঠে পুষ্পদাম;
গৈরিক বসন অঙ্গে। এই বটে মম
গুরুদেব হিমাচল; করি প্রণিপাত।

হিমাচল। কে তুমি তাপস? কেন ত্রিশূল আঘাতে
চাহ আত্মবিনাশিতে? জান না কি তুমি
পবিত্র এ দেবভূমি? জান না কি তুমি
অনন্ত নরক ভুঞ্জে আত্মঘাতী জন?

তপস্বী। জানি, প্রভো! কিন্তু এই সুদীর্ঘ জীবন
বহিতেছি যে নরক হৃদয় মাঝারে,
দণ্ডে, দণ্ডে, পলে, পলে, যে তীব্র দহন
করিতেছে ভস্ম বক্ষ, নরক-অনল,
গুরুদেব, তার হ'তে নহে ভয়ঙ্কর।

হিমাচল। হে মানব, কহ মোরে, মহাপাপে কোন (ও)
হয়েছে কি কলঙ্কিত জীবন তোমার?

তপস্বী। না, না, গুরুদেব, মোর পড়ে না স্মরণে
জ্ঞান-কৃত মহাপাপ করিয়াছি কোন (ও)।

হিমাচল। বঞ্চিত কি প্রেমে তুমি? নিরাশ প্রণয়ে
সুখহীন, শান্তিহীন জীবন কি তব?

তপস্বী। আছে প্রিয়া পত্নী মম; চিন্তা, ধ্যান তাঁর

আমি মাত্র, প্রেমে' তাঁর সুধাসিক্ত প্রাণ।
হিমাচল। প্রতিহিংসা-বিষ তবে হৃদয় তোমার
করিছে কি জর্জ্জরিত ? কহ, নর, মোরে।
তপস্বী। প্রতিহিংসা মহাপাপ। প্রতিহিংসা-বিষে
নহে, গুরুদেব, চিত্ত বিষাক্ত আমার ;
চাহি আমি শত্রু, মিত্র সবার কল্যাণ।
হিমাচল। না পারি বুঝিতে তবে কি যাতনা তব ?
চাহ অর্থ ? এস শীঘ্র, আছে বক্ষে মোর
অসংখ্য, অমূল্য রত্ন, তুলনায় যার
বিমলিন কোহিনুর, দিব তা' তোমারে।
তপস্বী। তুচ্ছ অর্থ! নাহি মোর অর্থের প্রয়াস।
হিমাচল। চাহ রাজ্য? আছে মোর অজ্ঞাত প্রদেশ
সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর সম। বাঞ্ছা যদি তব,
দিব তাহা। ত্যজ পাপ আত্মহত্যা-সাধ।
তপস্বী। গুরুদেব! কি বলিব ? এ সবার তরে
নহে ব্যাকুলিত প্রাণ। তুচ্ছ রাজ্য, ধনে
নাহি মোর অভিলাষ। আরাধনে যদি
পরিতুষ্ট মোর প্রতি, কৃপা করি তবে
করুন সে মন্ত্র দান, যে মন্ত্রের জপে
মাতৃভূমি ভারতের হইবে উদ্ধার।
হিমাচল। সাধু নর, সাধু তুমি! যুগ, যুগান্তরে
হেন বাঞ্ছা লয়ে নর জন্মে ভূমণ্ডলে ;
সাধু তব অভিলাষ। ভারতের শিরে
সৃষ্টির প্রথম হ'তে আছি দাঁড়াইয়া,
দেখিয়াছি গুণী, জ্ঞানী কত মহাজন
আসিয়াছে মোর কাছে। সাধিয়াছে তপ,
ধন, পুত্র, জ্ঞান তরে ; যার বাঞ্ছা যাহা ;
কিন্তু এই মাতৃভূমি ভারতমঙ্গল
চাহে নাই কোনজন। অভাগী ভারত,
এত দিনে ধন্যা তুই, কোটি পুত্র মাঝে
একটী তনয় তোর তব্ তোর কথা
ভাবে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে। কি বাসনা তব ?
তপস্বী। চাহি, দেব! ভারতের চাহি স্বাধীনতা।
হিমাচল। অজ্ঞ নর! একি বাঞ্ছা! বামন হইয়া
চাহ ধরিবারে চাঁদে ? ভাবিয়াছ তব
দ্বাদশ বর্ষের তপে হইবে মোচন
যুগান্তের মহাপাপ ? অশ্রুবিন্দু দানে
নিবাইবে দাবানল ? চাহ অন্য বর।
তপস্বী। না চাহি অপর কিছু। মুক্ত কর, দেব,
মুক্ত কর এ বন্ধন ; ছেঁড় নাগপাশ,
বিষ-দাহে যায় প্রাণ ; বক্ষে, কণ্ঠে, শিরে,
প্রতি অঙ্গে, দেখ জ্বালা। পিঞ্জরের পাখী
করুণ ক্রন্দনে-সেও ভুলে মর্ম্মব্যথা,
কিন্তু দুরদৃষ্ট মোরা, সহি পদাঘাত,
কাঁদিব যে তাহাতেও নাহি স্বাধীনতা।
গুরুদেব! কোন পাপে সহি এ যাতনা ?
হিমাচল। কোন্ পাপে ? মূঢ় নর! গিয়াছ ভুলিয়া
অতীতের ইতিহাস ? পড়ে না স্মরণে
আর্য্য, অনার্য্যের সেই মহা সংঘর্ষণ ?
কে ধ্বংসিল অনার্য্যেরে, ভারতভূমির
প্রথম সন্তান তারা ? হত-শেষ গণে
কে বাঁধিল হীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
অযাজ্য, অস্পৃশ্য করি ? দ্বিজ, শূদ্র মাঝে
কে সৃজিল এ বৈষম্য ? লঙ্ঘি বেদ-বিধি
অধর্ম্মে ধর্ম্মের পদে কে স্থাপিল বল ?
জ্বালি চিতানল নিজ মাতা, সুতা গণে
কে দিল আহুতি ঢালি? জিজ্ঞাসিছ মোরে
কোন্ পাপে ? স্বয়ম্বরে, অশ্বমেধকালে
অকারণে সর্ব্বধ্বংসী বিগ্রহ-অনল
প্রজ্বালিল কোন্ জাতি ? অসংখ্য শূদ্রেরে
কে রাখিল মোহাচ্ছন্ন, বাঁধি জ্ঞানসীমা
মুষ্টিমেয় দ্বিজমাঝে ? অতীতের কথা
বিস্মৃত যদ্যপি, তবে, স্মর একবার
কে ডাকিল দেশ-বৈরী মহম্মদীঘোরে
দণ্ডিবারে পৃথ্বীরাজে ? মিবার-কেশরী
প্রতাপে দণ্ডিতে, বল, কোন্ ভ্রাতৃদ্রোহী
দাঁড়াইল হলদিঘাটে ? এ সকল যদি
ভুলে থাক, বর্ত্তমান আছে ত স্মরণে ?
কে বঞ্চিল সিরাজেরে ? পাপিষ্ঠ সিরাজ
সত্য ; কিন্তু শতগুণে আর(ও) পাপী তারা

সিরাজের অন্নে যারা হইয়া পালিত
গোপনে বিষাক্ত অস্ত্র করিল আঘাত
বক্ষে তার। আছে পাপী তা'সবার সম,
নিজ স্বার্থ তরে, যারা জনমভূমিরে
বিকাইল হীনচেতা বণিকের পদে?
কর্ম্মগুণে ফলে ফল; রোপিলা যে তরু
ফলিতেছে ফল তার;—বৃথা মনস্তাপ।
জানি গুণহীন নহে ভারতসন্তান,
আছে ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রাণে; আছে কোমলতা,
আছে দয়া, মায়া, স্নেহ; কিন্তু তার সম
মাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃঘাতী নাহি এ জগতে।
তপস্বী। মানিলাম, গুরুদেব, মহা পাপী মোরা,
কিন্তু যুগ, যুগ, এই তীব্র তুষানলে
হ'ল না কি প্রায়শ্চিত্ত? এই মর্ম্মদাহ,
এই পদাঘাত, এই শোণিত-শোষণ
করিল না আমাদের পাপ অবসান?
কি আর করিব মোরা? চাহি উপদেশ।
হিমাচল। শুন, বৎস, প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই আজ(ও),
এত ক্লেশে চিনে নাই ভারত-সন্তান
আজ(ও) নিজ জননীরে। হিন্দু, মুসলমান,
বাঙ্গালী, পেঞ্জাবী, শিখ, মারাঠী, দ্রাবিড়ী
এখনও ঈর্ষানলে দহে পরস্পরে,
চাহে পরস্পর কণ্ঠ করিতে ছেদন:
শকটে যোজিত দুষ্ট বলীবর্দ্দদ্বয়,
স্কন্ধে গুরুভার, অঙ্গে বহে শ্রমজল,
নাসাবিদ্ধ বজ্জু মুহুঃ করি আকর্ষণ
চালক সঘনে পৃষ্ঠে করে কশাঘাত,
তবু, আস্ফালিয়া শির, চাহে পরস্পরে
শৃঙ্গ-আঘাতনে যথা। ভারতবাসীর
এত ক্লেশে জ্ঞাননেত্র খুলে নাই তবু!
তপস্বী। গুরুদেব! দীন আমি; নাহি কিছু মোর
সম্পদ, সম্ভ্রম, পুণ্য; আছে মাত্র প্রাণ,
এই লও; ভারতের কর পরিত্রাণ।
হিমাচল। তুচ্ছ তব প্রাণ, বৎস! মহা পাপে পাপী
ভারত সন্তানগণ; বহু প্রাণ হেন
না সঁপিলে ভারতের হবে না উদ্ধার।
তপস্বী। নাহি কি উপায় তবে? এ ঘোর তিমির
রহিবে কি চির দিন? চিরশৃঙ্খলিত
রহিবেন মা মোদের? কি আছে উপায়?
হিমাচল। আছে, বৎস! বিশ্ব ন্যায়ে, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত;
দয়াময় বিশ্বরাজ। হয়ো না হতাশ,
হয়ো না অধীর, বৎস, হও অগ্রসর,
দৃঢ় পদে, গম্য স্থান মিলিবে অচিরে।
ভারতের পরিত্রাণ ইচ্ছা বিধাতার,
এই শাস্তি তাঁর বিধি; তাঁহারই বিধানে
ভারতবাসীর, দেখ, হইতেছে ক্রমে
দুঃখে দুঃখবোধ, জড়দেহে সংজ্ঞা যথা।
ভারতের পরিত্রাণ বাঞ্ছা তব যদি
যাও ফিরি লোকালয়ে; কর কর্ম্ম-তপ,
কর্ম্মক্ষেত্র এ ধরণী; যোগ, যাগ, ব্রত
কর্ম্মবিনা বৃথা সব। রয়েছে পড়িয়া
সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র, নাহি কর্ম্মী সেথা।
হের, কত নর, নারী অজ্ঞান-তিমিরে
রহিয়াছে সমাচ্ছন্ন, শিখাও তা' সবে;
কাঁদে কত জন অন্ন অন্ন, অন্ন বলি,
অন্ন-লাভে কর পথ। কি কব অধিক,
শিল্পে, শৌর্য্যে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে কর সমুজ্জ্বল
ভারতভূমির মুখ। দেখ, গুপ্তভাবে
জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষ জ্বলে এখনও ভারতে
গিরিস্থ পাবক সম; প্রেম বরষণে
নিবাও সে মহাবহ্নি। হিন্দু, মুসল্মান
নির্ব্বিশেষে, সমভাবে, শিখাও সবারে
মাতৃভূমি সেবা-মন্ত্র। রাখিও স্মরণে
ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্য বিধির বিধানে
হইয়াছে প্রতিষ্ঠিত; থাকে অত্যাচার,
ভাবিও না, ঘুচিবেক বিধির নিয়মে।
ন্যায়-দণ্ডে এই বিশ্ব হইছে শাসিত;
সাক্ষী তার আর্য্যজাতি বর্ণ-অভিমানে
চূর্ণিল যে অনার্য্যেরে, এবে তার সনে
একই শৃঙ্খলে বাঁধা। অন্ধ মুসল্মান

দলিল্ যে হিন্দুগণে, সেই হিন্দু এবে,
জ্ঞানে, গুণে সমুন্নত, তুলিয়াছে শির;
মোহাচ্ছন্ন মুসলমান। ইংরাজ যদ্যপি,
স্বার্থে অন্ধ, দর্পে স্ফীত, বলী পশু-বলে,
করে অবিচার, তার পাবে প্রতিফল;
দর্পহারী ভগবান, বিধির এ বিধি,
যতো ধর্ম্ম স্ততোজয়। প্রায়শ্চিত্তে পূত
করিয়া ভারত-সুতে, স্থাপিবেন বিধি
নব মহারাজ্য এক এ ভারতভূমে;
ভুলি জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষ নর, নারী সেথা
আনন্দে করিবে বাস। যাও, বৎস, তুমি
এই মহা সত্য গিয়া করহ প্রচার;
হিন্দু, মুসলমান, শিখ্ ইংরাজ, সাম্ভাল
সবাই ভারত-সুত। কহিও সবারে
থাক্ ভাষা-ভেদ, থাক্ জাতি-ধর্ম্মভেদ,
তবু ভাই, ভাই মোরা; জননীর বুকে
সকলেরই আছে স্থান; "দে মা, অন্ন" বলি
যে ডাকিবে ভারতেরে, মাতার ভাণ্ডারে
আছে তার অধিকার; কেন হিংসা, দ্বেষ?
কেন জেতাজিত ভাব? যাও, বৎস, তুমি
যাও, দেশে, দেশে গিয়া শিখাও সবারে
প্রেমময় এই মন্ত্র; যেন নর, নারী
দিনান্তে, নিশান্তে, নিজ, নিজ ইষ্টদেবে
কহে করযোড়ে সবে;—কর, কৃপাময়,
কর আমাদের এই জনম ভূমির
এ দুর্দ্দশা বিমোচন। কোটিকণ্ঠে যদি
উঠে এ প্রার্থনা বাণী, শুনিবেন দেব,
মুক্ত হবে পাপ ভার; কি বলিব আর,
মাতৃভক্ত তুমি, বৎস, তপস্যায় তব
পরিতুষ্ট বিশ্বরাজ, তাঁর কৃপাবলে
পুরিবে বাসনা তব; যাও কর্ম্মভূমে।

তপস্বী। গুরুদেব! উপদেশ শিরোধার্য্য তব;
জানিবারে চাহি শুধু, কত দিন পরে
ভারতের পরিত্রাণ হইবে সাধন।

হিমাচল। শুন, বৎস! দিব্য চক্ষু দিতেছি তোমারে
যাও লোকালয়ে ফিরি; নগরে, প্রান্তরে,
গ্রামে, বনে, নদীতীরে, পর্ব্বতশিখরে,
প্রাসাদে, কুটীরে, তীর্থে দেখ অন্বেষিয়া,
হ'ক নারী, হ'ক নর, বাল, বৃদ্ধ, যুবা,
যোগী, ভোগী, ধনী, দুঃখী, জ্ঞানী, মূর্খ মাঝে,
এ হেন দ্বাদশ জন, সর্ব্বত্যাগী যারা
ভারত মঙ্গলতরে; নাহি চাহে যশ,
নাহি চাহে সুখ, স্বার্থ; হেন মহাপ্রাণ
আর্য্যে, অনার্য্যেরে পারে প্রেম-আলিঙ্গনে
বাঁধিবারে বক্ষস্থলে; সম নিন্দা, স্তবে,
নির্য্যাতনে হাস্যমুখ; লক্ষ্য যাহাদের
ভারতের হিতমাত্র; পাও খুঁজি যদি
আসিও সে দিন, আমি কহিব তোমারে
সেই গুহ্য মহামন্ত্র, যে মন্ত্রের বলে
ভারতভূমির, বৎস, হবে পরিত্রাণ।
কিন্তু দেখ, ধীরে ধীরে, সন্ধ্যার তিমির
হইতেছে ঘনীভূত। মিলি চরাচর
করিছে আরতি এবে বিশ্বদেবতার;
দেখ, কত দীপাবলী ফুটেছে আকাশে,
উঠিছে ধূপের বাস কুসুম-সৌরভে,
গাইছে সঙ্গীত পাখী। অই উর্দ্ধলোকে
বিশ্বরাজ সিংহাসন বেড়ি করযোড়ে
মাগিতেছে দেবশিশু বিশ্বের কল্যাণ;
যাই আমি বিশ্বনাথে করিতে প্রণাম;
করি আশীর্ব্বাদ, বৎস, হউক মঙ্গল।

(হিমাচলের অন্তর্দ্ধান।)

তপস্বী। (অবনত জানু হইয়া।)
হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি, অন্তর্যামী তুমি,
জানিছ অন্তর-ব্যথা। হে পূর্ণমঙ্গল,
তোমার মঙ্গলরাজ্যে নাহি জানি, কেন,
এত জাতি-ধর্ম্ম-দ্বেষ? হে শান্তি-সদন,
দাও শান্তি-বারি হেথা; কোটি নর, নারী
আছে শুষ্ক কণ্ঠে সবে; দাও সত্য, জ্ঞান,
দাও ধর্ম্ম, দাও প্রেম; শিখাও সবারে
মাতৃভূমি-সেবা-ব্রত, আত্ম-বিসর্জ্জন।

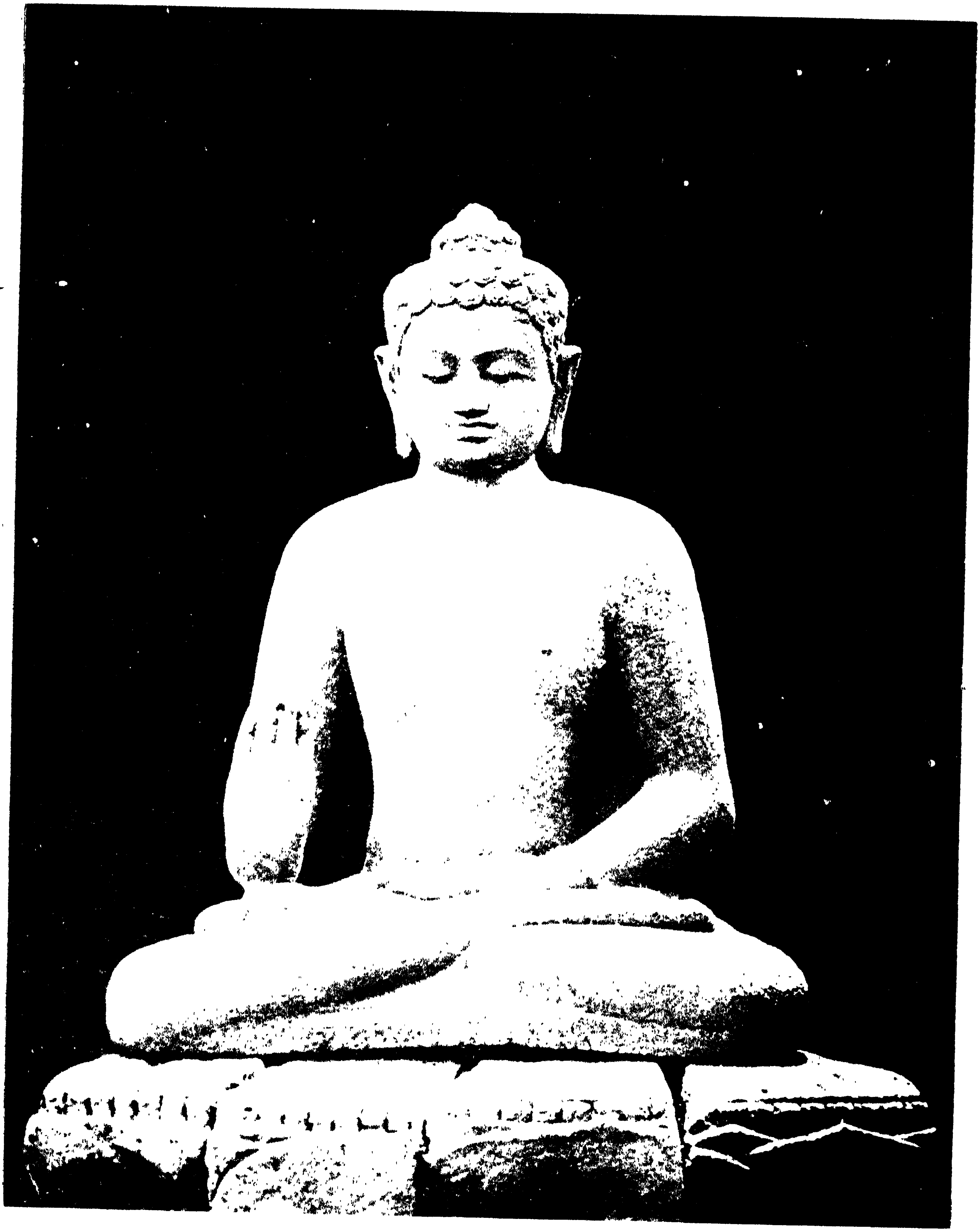

ধ্যানিবুদ্ধ।

জাভা অর্থাৎ যবদ্বীপে একটি প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে।)

পতিত-পাবন তুমি, যুগে যুগে, দেব,
কতই পতিত জাতি করেছ উদ্ধার ;
অধম পতিত এই ভারতবাসীরে
করহ উদ্ধার তবে। চলিলাম, দেব,
দেখিব খুঁজিয়া এই ভারত মাঝারে,
রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, মূর্খ, নর, নারী মাঝে,
আছে কিনা হেন জন, চিন্তা, ধ্যান যার
ভারত-মঙ্গল মাত্র। পাই অন্বেষিয়া
সে হেন দ্বাদশজন পূর্ণ হবে সাধ ;
নহে, হে জনমভূমি, তোমার সেবায়
এ তনু করিব শেষ ; দেখিব, জননি,
তোমার দুঃখের অন্ত হয় কিনা হয়।
হে গিরীন্দ্র, গুরু তুমি, কর আশীর্ব্বাদ,
বিদায় চরণে এবে, করি প্রণিপাত।*

[প্রস্থান।

দেরাদুন,
৩রা নবেম্বর, ১৯০৭। 　　　　শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

শাঙ্কর দর্শন।

আশ্বিন মাসের "প্রবাসী"তে "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রন্থখানা আগাগোড়া আত্মবিরোধে পূর্ণ এবং ইহাতে শঙ্কর-দর্শনের অতি বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে গ্রন্থকার স্বতন্ত্র প্রবন্ধচ্ছলে ইহার প্রতিবাদ বাহির করিয়াছেন। প্রবন্ধেও দেখিতেছি লেখক স্বকপোল কল্পিত কতকগুলি মত শঙ্করের নামে প্রচার করিতেছেন। শঙ্কর-দর্শনের ভিত্তি কোথায়, বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহাই জানেন না, অথচ জনসমাজে তাঁহার মত প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যই যে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহা নহে, শঙ্করের প্রকৃত মত কি তাহা আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক মনে হইতেছে।

শঙ্কর-দর্শনের ভিত্তি।

ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও জগৎ---এই তিনটী বস্তু লইয়াই দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু সমুদয় দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি এক নহে। জড়বাদী বলেন জগৎকে ভিত্তি করিয়াই ব্রহ্ম ও জীবাত্মাবিষয়ে বিচার করিতে হইবে। অধ্যাত্মবাদীর মতে জীবাত্মাই দর্শনের ভিত্তি আর ব্রহ্মবাদী বলেন ব্রহ্মরূপ ভিত্তির উপরই দর্শনশাস্ত্রকে দাঁড় করাইতে হইবে। শঙ্কর একজন ব্রহ্মবাদী। তাঁহার মতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সত্যস্বরূপ অনন্তস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দর্শনকে দাঁড় করাইলে জগৎ ও জীবাত্মা 'থাকে থাক্, যায় যাক্' শঙ্কর এই ভাবেই অগ্রসর হইয়াছেন। আগে জগৎকে বজায় রাখিব, তৎপর ব্রহ্মের স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে ইহা শঙ্কর-দর্শন নহে। কিন্তু শঙ্কর দর্শনের ভিত্তি কি ইহা অনেকে না বুঝিয়াই শঙ্করমত ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়টা যে বুঝা আবশ্যক, তাহা অনেকের ধারণার মধ্যেই আসে না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও এই শ্রেণীর লোক।

তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন, "ব্রহ্ম সেই শক্তি হইতে ভিন্ন......ইহা স্বীকার না করিলে নির্গুণ ব্রহ্মের স্থান থাকে না" আর একস্থলে বলিয়াছেন, "শঙ্কর সগুণ ব্রহ্ম ছাড়াও নির্গুণ ব্রহ্মের স্থান রাখিয়াছেন।" তৃতীয় একস্থলে আছে, "এখন দেখিতে হইবে যে, যদি শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মের গতি কি হইবে।" লেখকের অভিপ্রায় এই যে, আগে বলিতে হইবে ব্রহ্মে শক্তি আছে, ব্রহ্ম শক্তি হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম সগুণ, তাহার পর দেখিতে হইবে---নির্গুণ ব্রহ্মের কোন গতি হইতে পারে কি না, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন স্থান থাকে কি না। গোড়াতেই গলদ। নির্গুণ ব্রহ্মের কোন একটী গতি করিতে হইবে, যোগাড় যন্ত্র করিয়া কোন উপায়ে নির্গুণ ব্রহ্মের জন্য একটা স্থান করিয়া দিতে হইবে ইহা শঙ্কর-দর্শন নহে। শঙ্করকে এ সব ভাবনা ভাবিতে হয় নাই। যিনি শঙ্কর-দর্শনের ভিত্তি, যিনি শঙ্কর-দর্শনের সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাঁহার জন্য কি স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়? দর্শনকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপর দাঁড় করান হইয়াছে, এখন যদি তুমি সগুণ ব্রহ্মকে রাখিতে পার ভাল, আর না রাখিতে পার সেও ভাল।

শঙ্কর দর্শন আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম "(১) ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' ব্রহ্ম স্বগত ভেদরহিত, তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করা যায় না (২) অবিকৃত পরব্রহ্মই জীব (৩) শঙ্কর ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করেন না, তিনি বিবর্ত্তবাদী---পরিণামবাদী নহেন।" কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন (১) শঙ্কর ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেন (২) শ　বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ উভয়ই স্বীকার করিতেন। জীবাত্মাবিষয়ে এখনও নূতন কোন কথা বলেন নাই।

বিচারপ্রণালী।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই স্থির করা আবশ্যক আমরা কি প্রণালীতে অগ্রসর হইব। একজন নিজমত সমর্থন করিবার জন্য শঙ্করভাষ্য হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলেন এবং অপর জনও ইহার বিরোধী মত সমর্থন করিবার জন্য উক্ত ভাষ্যের অপরাংশ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলেন---এই ভাবে অগ্রসর হইলে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। বাদী বলেন আমারই জয়, প্রতিবাদীও বলেন আমারই জয় আর জনসাধারণের মনে শঙ্করের মত বিষয়ে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। আমরা বলি যে সমুদয় স্থলে শঙ্কর উভয় মতেরই আলোচনা করিয়াছেন, বিচার করিয়া একটী মত নিরাস করিয়াছেন এবং তৎপর নিজমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন - সেই সমুদয় স্থলই উদ্ধৃত করা আবশ্যক ; নতুবা কোন বিষয়ই নিষ্পত্তি হইবে না। সুতরাং আমরা এই দ্বিতীয় প্রণালীই অবলম্বন করিব।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রণালী।

১। 'একতরফা'।

ব্রহ্মে কেন শক্তি স্বীকার করা যায় না শঙ্কর সে বিষয়ে বিশেষ যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে এই সমুদয় যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া-

* এই কবিতাটী লেখক কর্ত্তৃক দেরাদুন-বঙ্গীয়-সাহিত্যসভায় পঠিত হইয়াছিল।—ইতি

ছিলাম। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার একটীরও নিরাস করেন নাই। সুতরাং আমাদের মত অখণ্ডিতই রহিয়া গিয়াছে।

২। 'বাজে সাক্ষী'।

বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজমত সমর্থন করিবার জন্য ১২০টা স্থলে টীকাকার ও অন্যান্য লোকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনটী কারণে আমরা এই সমুদয় মতামত আলোচনা করিব না। প্রথমতঃ এ সমুদয় Hearsay evidence অর্থাৎ 'শুনা কথা'। ইহার কোন মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের মতবিষয়ে কে কি বলিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে গেলে কোন মীমাংসাই হইবে না। এ বিষয়ে যদি মতভেদ হয় তবে উপায় কি? আমাদের আলোচ্য বিষয় শঙ্কর-দর্শন এবং শঙ্কর বিস্তীর্ণ ভাষ্য লিখিয়াছেন সুতরাং শঙ্কর স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা লইয়াই আমরা বিচার করিব। তৃতীয়তঃ আমাদের স্থানাভাব।

৩। 'মিথ্যা সাক্ষী'।

বিদ্যারত্ন মহাশয় চারিটী স্থলে শঙ্করভাষ্য অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ কিপ্রকার বিকৃত ও বিপরীত তাহাই প্রথমে দেখাইব।

(ক) শঙ্করভাষ্যে আছে "ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ (বেঃ ভাঃ ১।৪।৩)। জগতের পূর্ব্বাবস্থার বিষয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই বিষয় বিচার করিবার সময় শঙ্কর পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত অনুবাদ এই "ইহা ব্যতীত (অর্থাৎ জগতের পূর্ব্বাবস্থা ব্যতীত) পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ তিনি শক্তিরহিত, সুতরাং তাঁহার (সৃষ্টি) প্রবৃত্তি হইতে পারে না।" "শক্তিরহিতস্য তস্য" এই অংশের অর্থ শক্তিরহিত যে তিনি তাঁহার"। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন "এই শক্তি স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবেন কাহার দ্বারা? শক্তিরহিত পদার্থের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না"। লেখকের বুঝাইবার ইচ্ছা যে "ব্রহ্মেরই শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন"। কিন্তু উদ্ধৃত অংশে শঙ্কর যে ব্রহ্মকে শক্তিরহিত বলিয়াছেন বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহা গোপন করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশের ঠিক পরেই শঙ্কর বলিয়াছেন "মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিঃ, অব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা, পরমেশ্বরাশ্রয়া, মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপ প্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ অর্থাৎ "জগতের এই বীজ শক্তিরূপিণী পূর্ব্বাবস্থা-অবিদ্যাত্মিকা। বিদ্যা দ্বারা এই বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই মুক্ত আত্মাদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহার অপর নাম অব্যক্ত। ইহা পরমেশ্বরের আশ্রিত; ইহা মায়াময়ী ও মহাসুষুপ্ত। সংসারী জীব প্রতিবোধশূন্য হইয়া ইহাতেই শয়ান থাকে"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উদ্ধৃত অংশ হইতে "ব্রহ্মের শক্তি আছে," ইহা ত প্রমাণিতই হয় না, প্রত্যুত ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে "তিনি শক্তিরহিত"। বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহাকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে, অবিদ্যা, মায়া, মহাসুষুপ্ত। যে অবিদ্যাতে প্রতিবোধশূন্য সংসারী জীব শয়ান থাকে সে অবিদ্যা কি ব্রহ্মশক্তি? এ অবিদ্যা যদি ব্রহ্মশক্তি না হয় তবে ইহাকে পরমেশ্বরের আশ্রিত বলা হইল কেন? বিদ্যারত্ন মহাশয় বড়ই টীকা কারভক্ত, সুতরাং দেখা যাউক ভামতী টীকায় এবিষয়ে কি বলা হইয়াছে। "প্রপঞ্চ বিভ্রমস্য হি ঈশ্বরাধিষ্ঠানত্বম্ অহি বিভ্রমস্যেব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বং" অর্থাৎ সর্পভ্রম যে অর্থে রজ্জুর আশ্রিত, প্রপঞ্চ বিভ্রমও ঠিক সেই অর্থেই ঈশ্বরের আশ্রিত। যেমন রজ্জু হইতে কখন সর্প উৎপন্ন হয় না—তেমনি ব্রহ্ম হইতেও অবিদ্যা উৎপন্ন হয় না; সর্প রজ্জুরই অঙ্গীভূত ইহা বলা যেমন অসঙ্গত, তেমনি "অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত" ইহা বলাও অসঙ্গত। ব্রহ্ম এ অবিদ্যার আধার নহেন (ন তু আধারতয়া ভামতী)। ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস হয় এই অর্থে অবিদ্যা ব্রহ্মের আশ্রিত। প্রকৃত কথা—এই রজ্জুই প্রকৃত বস্তু সর্প জ্ঞান মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মই প্রকৃত বস্তু অবিদ্যা মিথ্যা বস্তু।

উদ্ধৃত অংশে পরমেশ্বরকে কেন স্রষ্টা বলা হইয়াছে তাহা পরে আলোচনা করিব।

(খ) আর ঈশোপনিষদের ভাষ্য হইতে যে অংশ অনুবাদ করা হইয়াছে তাহা আরও বিকৃত। মূলে আছে "সর্ব্ব ব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্ব্ব সংসারে ধর্ম্ম বর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণ অক্রিয়মেব সৎ উপাধিকৃতাঃ—সর্ব্বাঃ সংসার ক্রিয়া অনুভবতি ইব"। লেখক অনুবাদ করিয়াছেন—"এই প্রাণ শক্তি—অবিক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়া জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে"। প্রকৃত অনুবাদ এই: "সর্ব্ব সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে নিষ্ক্রিয় হইলেও উপাধি জনিত সমুদয় সংসার কার্য্য অনুভব করিতেছেন বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ ভ্রম হয়।" "অনুভবতি ইব" এই অংশের অর্থ "তিনি যেন অনুভব করিতেছেন।" 'ইব' শব্দ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য বুঝাইতেছেন যে তিনি সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না তবে 'তিনি করেন' এই বলিয়া ভ্রম হয়।

ঠিক ঐ মন্ত্রেই (ঈশ ৪) আছে "তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ" অর্থাৎ তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান।—এখানে 'অত্যেতি' শব্দের অর্থ 'অতিক্রম করিয়া যান' কিন্তু শঙ্করের মতে 'অত্যেতি=অতীত্য গচ্ছতি ইব' অর্থাৎ মনে হয় যেন অতিক্রম করিয়া যান। এখানেও 'ইব' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। শঙ্কর প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন কি না আমরা তাহা বিচার করিতেছি না। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ব্রহ্মে কোন শক্তিই স্বীকার করিতেছেন না। "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি ব্রহ্মের সমুদয় কার্য্যকেই ভ্রমাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বিদ্যারত্ন মহাশয় সগর্ব্বে বলিতেছেন "ইহা অপেক্ষা আর কি সুস্পষ্ট উক্তি হইতে পারে? নির্গুণ ব্রহ্মই যখন সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত তখনই তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যায়। বস্তুতঃ নির্গুণেও সগুণে কোন ভেদ নাই।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কি সংস্কৃত বুঝেন না? না—ইচ্ছা করিয়াই সত্য গোপন করিয়াছেন?

(গ) ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যও বিকৃত করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। "নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিত ব্রহ্মই এই অব্যাকৃত শক্তির প্রবর্ত্তক।" এখানে "উপাধি সম্বন্ধেন" কথাটী অনুবাদের সময় গোপন করিয়াছেন। কেন, পাঠকগণ তাহা কি বুঝিয়াছেন? শঙ্করের মতে "উপাধি অবিদ্যা কল্পিত এবং ভ্রমাত্মক"। উপাধি বশতঃ—অবিদ্যাবশতঃ—ভ্রান্তিবশতঃ—নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া ভ্রম হয় ইহাই শঙ্করের অর্থ এই অর্থেই শঙ্কর বলিয়াছেন নির্গুণ ব্রহ্ম উপাধিযোগে সগুণ সংজ্ঞা লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে লেখক উদ্ধৃত অংশে বিকৃত অনুবাদ করিয়া যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন প্রকৃত অর্থ ঠিক তাহার বিপরীত। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে।

(ঘ) কঠোপনিষদের ভাষ্যানুবাদে লেখক বলিয়াছেন—"অব্যক্তই জগতের বীজ.........এই অব্যক্তশক্তি ব্রহ্মে নিহিত"। ভাষ্যে (৩।১১) 'নিহিত' শব্দ নাই, আছে 'সমাশ্রিত'। বেদান্ত ভাষ্যের (১।৪।৩) অনুবাদ সমালোচনায়, (ক) অংশে আমরা দেখাইয়াছি যে অব্যক্ত=অবিদ্যা। জ্ঞান দ্বারা ইহা দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং অব্যক্ত নামক জগতের বীজশক্তি ভ্রমাত্মক বই আর কিছুই নহে। শঙ্কর কি অর্থে এই অব্যক্তকে পরমেশ্বরের আশ্রিত বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "অহিবিভ্রম যেমন রজ্জুর আশ্রিত, তেমনি প্রপঞ্চবিভ্রমও পরমেশ্বরের আশ্রিত"। (বিস্তৃত আলোচনা (ক) অংশে দ্রষ্টব্য)।

বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কঠোপনিষদ্ভাষ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই উপনিষদের ভাষ্যেই এক স্থলে (৫।১১) শঙ্কর বলিয়াছেন, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন রজ্জুর সহিত সর্পের কোন সংস্পর্শ হয় না তেমন ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস হইলে, অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের কোন সংযোগ হয় না—সংযোগ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। (এই অংশের সম্পূর্ণ অনুবাদ 'বিবর্ত্ত ও বিকার' প্রকরণে দেওয়া হইল)। আরও যুক্তি দ্বারা আমরা পরে প্রমাণ করিব যে শঙ্করের মতে জগৎ, জগতের সৃষ্টি, ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব ইত্যাদি সমুদয়ই, অবিদ্যাকল্পিত।

নির্গুণই কি সগুণ ?

বিদ্যারত্ন মহাশয় শঙ্করভাষ্যের বিকৃত ও বিপরীত অর্থ করিয়া সগর্ব্বে বলিতেছেন—"ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা সম্ভবে কি?—এই ত শঙ্কর স্পষ্ট ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করিতেছেন।" তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করিলাম "হাঁ সত্য"। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিষম "কিন্তু" আছে।

সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমারের বিচার হইতেছে, সাক্ষীর জবান বন্দী চলিতেছে। সাক্ষ্য শুনিয়া হেষ্টিংস পক্ষীয় লোকগণের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। সকলেই ভাবিল- 'প্রমাণ হইয়া গেল যে নন্দকুমার জাল করিয়াছে'। কিন্তু সর্ব্বশেষে সাক্ষী বলিয়া উঠিল,—"এমন সময়ে মোরগ ডাকিয়া উঠিল, আমার ঘুম ভাঙ্গিল, জাগিয়া দেখি ভোর হইয়াছে।"

সাক্ষী কি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয় নাই? দিয়াছিল বই কি। তবে কিনা একটা 'কিন্তু' আছে শঙ্কর কি ব্রহ্মে শক্তি অর্পণ করেন নাই? করিয়াছেন বই কি। তবে কিনা একটা 'কিন্তু' আছে। তিনি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মে শক্তি আছে"—তবে কিনা ইহা 'অজ্ঞানতা বিজৃম্ভিত,'—অবিদ্যা কল্পিত, লৌকিক ভাবে -ব্যবহারিক ভাবে, অজ্ঞ সাংসারিক লোকদিগের কাজ চালাইবার পক্ষে ইহা সত্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে—পারমার্থিক ভাবে—বস্তুতঃ—ইহা সত্য নহে। পারমার্থিক ভাবে ব্রহ্ম নির্গুণ—নির্ব্বিশেষ কিন্তু অবিদ্যাজনিত কল্পনায় তিনি সগুণ। এই মত সমর্থন করিবার জন্য আমরা শঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি।

শঙ্কর ভাষ্য।

(১) "শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গই বলা হইয়াছে অর্থাৎ বলা হইয়াছে তিনি সবিশেষ (সগুণ) ও নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) উভয়ই। 'তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস,' ইত্যাদি শ্রুতি সবিশেষ ব্রহ্ম বোধক। 'তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন' ইত্যাদি শ্রুতি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বোধক। এই সমুদয় শ্রুতিতে কি প্রতিপন্ন করা হইয়াছে? তিনি কি উভয় লিঙ্গ (অর্থাৎ তিনি কি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয়ই)? না তিনি অন্যতর লিঙ্গ? যদি তিনি অন্যতর লিঙ্গ হন তবে তিনি কোন্‌টী—সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ?

যখন উভয় লিঙ্গসূচক শ্রুতি রহিয়াছে তখন হয়ত 'তিনি উভয় লিঙ্গই' এই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা বলি বস্তুতঃ ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গত্ব স্বীকার করা যায় না (ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয় লিঙ্গত্বম্ উপপদ্যতে)। একটী বস্তু আছে তাহার বিশেষ বিশেষ রূপও আছে। এই বস্তু স্বতঃ ইহার বিপরীত হইবে অর্থাৎ রূপাদি বিহীন হইবে ইহা আত্মবিরোধী কথা (ন হি একং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেতি অভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ)।

যদি বল স্থানতঃ পৃথিব্যাদি উপাধিযোগে এরূপ সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ উভয় লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে আমরা বলি 'না ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।' উপাধি যোগে এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হইতে পারে না। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কখন অলক্তাদি উপাধির যোগে অস্বচ্ছ হয় না। তবে যে অস্বচ্ছ বলিয়া মনে হয় তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। উপাধি সমূহ অবিদ্যা মূলক। এখন যদি 'অন্যতর লিঙ্গ' স্বীকার কর তাহা হইলে বলিতে হইবে ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষ রহিত নির্ব্বিকল্পক অর্থাৎ নির্গুণ এবং তিনি ইহার বিপরীত নহেন (অতশ্চ অন্যতর লিঙ্গ পরিগ্রহেঽপি সমস্ত বিশেষ রহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্)।"

বেদান্ত ভাষ্য ৩।২।১১।

এখানে শঙ্কর বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন (১) ব্রহ্মকে সগুণ ও নির্গুণ—উভয়ই বলা যায় না। (২) তিনি সগুণ নহেন, (৩) তিনি নির্গুণ।

(২) "সর্ব্ব প্রকার 'বিশেষ' ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 'তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন'; 'তিনি অস্থূল অসূক্ষ্ম, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ'; 'তিনি বাহ্য রহিত, অভ্যন্তর রহিত, জন্মরহিত'; 'সেই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, অজর, অমর, অমৃত, ও অভয় ব্রহ্ম'; তিনি 'নেতি, নেতি'—'ইহা নয়' 'ইহা নয়' এই প্রকার—ইত্যাদি শ্রুতি এবং স্মৃতি ও যুক্তের বলে পরমাত্মায় দেশকালাদি বিশেষ যোগ কল্পনা করা যায় না।……যদি বল শ্রুতি বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু সুতরাং তাঁহার অনেক শক্তি' তাহার উত্তর এই:—'না তাহা বলিতে পার না,' কারণ যে সমুদয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই সেই সমুদয় শ্রুতি 'অনন্যার্থ' (অর্থাৎ ইহা স্বার্থে অর্থাৎ নিজের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অন্য অর্থ নাই, ইহাই ইহার মুখ্য অর্থ এ অর্থ অন্যশ্রুতির উপর নির্ভর করে না)। যদি আপত্তি কর জগতের উৎপত্তিসূচক শ্রুতিকেই 'অনন্যার্থ' বল না কেন?—ইহার উত্তরে বলিব 'না তাহা পার না'—কারণ এই সমস্ত উৎপত্তি মূলক শ্রুতি একত্ব প্রতিপাদক ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় হেতুত্বশ্রুতেঃ অনেক শক্তিত্বং ব্রহ্মণ ইতি চেৎ। ন। বিশেষ নিরাকরণ শ্রুতীনাম্—অনন্যার্থত্বাৎ। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনামপি সমানম্ অনন্যার্থমিতি চেৎ। ন। তাসাং একত্বপ্রতিপাদন পরত্বাৎ।"

বেদান্ত ভাষ্য ৪।৩।১৪।

এখানেও শঙ্কর বিচার করিয়া বলিতেছেন (১) ব্রহ্ম নির্গুণ, (২) তাঁহাতে শক্তি অর্পণ করা যায় না, (৩) উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় সূচক শ্রুতি অর্থবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা—'একত্ব প্রতিপাদন পর'—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বর্ণনা করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

(৩) "ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই অথচ বলা হয় তিনি সর্ব্বশক্তিমান ইহার অর্থ কি? উত্তর এই যে অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ প্রসঙ্গেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে এই প্রকার বলা হইয়াছে (প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ব বিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তি যোগঃ সম্ভবতীতি; এতদপি অবিদ্যা কল্পিতরূপ ভেদোপন্যাসেন উক্তমেব)।"

বেদান্ত ভাষ্য ২।১।৩১।

এখানে শঙ্কর বিচার করিয়া বলিলেন যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা অবিদ্যাজনিত কল্পনা বই আর কিছুই নহে।

(৪) "এই প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধিভেদ বশতই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব। কিন্তু ইহা পরমার্থ সত্য নহে ' তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ; ন পরমার্থতঃ)।"

বেদান্ত ভাষ্য ২।১।১৪।

এখানেও বলা হইল ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্বাদি সমুদয়ই অবিদ্যামূলক; এ সমুদয়ের পারমার্থিক সত্তা নাই।

(৫) "যদি বল ব্রহ্ম বহুরূপ; বৃক্ষ যেমন বহুশাখাসমন্বিত তেমনি ব্রহ্মও বহু-শক্তি-প্রবৃত্তি যুক্ত (এবং অনেক-শক্তি-প্রবৃত্তি-যুক্তং ব্রহ্ম); সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষ বৃক্ষরূপে

এক কিন্তু শাখাদিরূপে বহু; সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক কিন্তু ফেন তরঙ্গাদিরূপে বহু, মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারূপে এক কিন্তু ঘট শরাবাদি রূপে বহু—তেমনি ব্রহ্মের একত্বাংশে জ্ঞানজনিত মোক্ষ ব্যবহার এবং নানাত্বাংশে কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাতেও (উপনিষদোক্ত) মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয়। এ বিষয়ে আমাদের উত্তর এই:—'না তাহা হইতে পারে না' কারণ মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে মৌলিক বস্তুরই সত্যতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আর 'বাচারম্ভণ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিকার জনিত বস্তুকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। (নৈবং স্যাৎ; মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং ইতি প্রকৃতি মাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্ব-অবধারণাৎ। বাচারম্ভণ শব্দেন চ বিকার জাতস্য অনৃতত্বাভিধানাৎ)"।

যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিয়া এখানে শঙ্কর প্রমাণ করিলেন যে ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করা যায় না।

(৬) "যখন 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি সূচক উপদেশের দ্বারা অভেদ-জ্ঞান জাগ্রত হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব উভয়ই অপগত হয়। মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত এই যে ভেদব্যবহার সম্যক জ্ঞান তাহা বিনষ্ট হয়। তখন কোথায় সৃষ্টি? আর কোথায় থাকে অহিত-করণাদি দোষ? (অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বম্। সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞান ভেদ-বিজৃম্ভিতস্য ভেদ ব্যবহারস্য সম্যক্‌-জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্রকুত এব সৃষ্টিঃ কুতো বাহিত করণাদয়ো দোষাঃ)। এ সমুদয় অবিদ্যাজনিত অবিবেককৃত ভ্রান্তি। হিতাহিত করণাদি লক্ষণযুক্ত এই সংসারের পারমার্থিক সত্ত্বা নাই এ কথা বহুবার বলিয়াছি' (সংসারো নতু পারমার্থতঃ অস্তি ইতি)।"

বেঃ ভাঃ ২।১।২২।

এখানে শঙ্কর বলিতেছেন—

(১) সংসারের পারমার্থিক সত্ত্বা নাই—সমস্তই মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিত। (২) 'জীবের সংসারিত্ব' একটী ভ্রান্ত বিশ্বাস (৩) সৃষ্টি এবং ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব ইহাও অজ্ঞানতা প্রসূত।

(৭) "অনেক লোকে নেত্রের তিমির দোষে এক চন্দ্রকে বহুচন্দ্র বলিয়া বোধ করে। কিন্তু চন্দ্রমা কখন বহু হয় না। তেমনি নামরূপ মূলক রূপভেদ অবিদ্যাকল্পিত। ইহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত—এই উভয়াত্মক। ইহা বস্তু, কি অবস্তু, তাহা নিরূপণ করা যায় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভেদ বশতই ব্রহ্মকে পরিণামী ও সর্ব্ব ব্যবহারাস্পদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পারমার্থিকরূপে তিনি সর্ব্ব ব্যবহারের অতীত ও অপরিণামী (পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্ব ব্যবহারাতীম অপরিণতম্ অবতিষ্ঠতে)।......পরিণাম শ্রুতিসমূহ (অর্থাৎ যে সমুদয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম রূপান্তরিত হইয়াছেন সেই সমুদয় শ্রুতি) পরিণাম প্রতিপাদন করিবার জন্য অভিহিত হয় নাই (ন চেয়ং পরিণাম শ্রুতি পরিণাম প্রতিপাদনার্থা)।...... সর্ব্ব ব্যবহারবিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতি-পাদনই ইহার উদ্দেশ্য (সর্ব্বব্যবহারহীন ব্রহ্মাত্ম ভাব প্রতিপাদনার্থা তু এষা)।"

বেঃ ভাঃ ২।১।২৭।

এখানে শঙ্কর বলিতেছেন যে (১) ব্রহ্মের কখন পরিণাম হয় না (২) ব্রহ্মের নাম রূপাদি সমুদয়ই অবিদ্যাকল্পিত (৩) 'পরিণাম শ্রুতি' সমূহের অর্থ ইহা নহে যে ব্রহ্ম রূপান্তরিত হয়েন—ব্রহ্মাত্ম-ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই এই সমুদয় শ্রুতি।

(৮) "শ্রুতিতে সৃষ্টিসূচক ও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সূচক অনেক কথা আছে। এই যে সৃষ্টি শ্রুতি—ইহা পরমার্থ-বিষয়িনী নহে। ইহা অবিদ্যা-জনিত নামরূপ-ব্যবহার-যোগ্য কল্পনা। ব্রহ্মাত্ম-ভাব প্রতিপাদন করাই যে ইহার উদ্দেশ্য—ইহা কখন বিস্মৃত হইও না (ন চেয়ং পরমার্থ বিষয়া সৃষ্টি শ্রুতিঃ। অবিদ্যা-কল্পিত-নামরূপ ব্যবহার-গোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্ম-ভাব-প্রতিপাদন-পরত্বাচ্চ ইতি এতদপি নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্)"।

বেঃ ভাঃ ২।১।৩৩।

এখানেও বলা হইল (১) সৃষ্টি ও সর্ব্বজ্ঞতা অবিদ্যাকল্পিত (২) সৃষ্টি-শ্রুতি সৃষ্টি বুঝাইবার জন্য উক্ত হয় নাই (৩) ব্রহ্মাত্ম-ভাব বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি শ্রুতি। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত যাঁহারা এই সমুদয় তত্ত্ব জানেন না বা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে শঙ্কর বিশেষভাবে বলিতেছেন—"সাবধান—এই কথাগুলি কখন বিস্মৃত হইও না।" 'নৈব প্রস্মর্ত্তব্যম্'।

(৯) "ব্রহ্ম কি তবে দুই প্রকার? হাঁ দুই প্রকার—পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম। কারণ, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'হে সত্যকাম! এই যে ওঁকার ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম'। তবে প্রশ্ন—পরব্রহ্ম কি? আর অপরব্রহ্মই বা কি? ইহার উত্তর এই:—যে স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মে অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি বিশেষণ নাই, যে স্থলে 'তিনি অস্থূল' এই প্রকার নিষেধমুখে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে—বুঝিতে হইবে সেই স্থলেই পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। আর যে স্থলে উপাসনার জন্য ব্রহ্মে নামরূপাদি বিশেষণ অর্পণ করা হইয়াছে যে স্থলে বলা হইয়াছে যে 'তিনি মনোময়, প্রাণ-শরীর, ভা-রূপ ইত্যাদি' বুঝিতে হইবে সেই স্থলেই অপর ব্রহ্মের কথা। যদি বল এরূপ (দুই ব্রহ্ম) স্বীকার করিলে 'ব্রহ্ম অদ্বিতীয়' এই প্রকার শ্রুতির বিরোধী কথা বলা হয় আমরা ইহার উত্তরে বলিব 'না, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না' কারণ অবিদ্যা জনিক নামরূপাদি উপাধিবশতই এই প্রকার হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেই সমুদয় বিরোধ পরিহৃত হয়।"

বেঃ ভাঃ ৪।৩।১৪।

শঙ্কর বলিতেছেন যে অপরব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম অবিদ্যা জনিত কল্পনা।

(১০) "নামরূপবিহীন ব্রহ্মে অনুচিত নামরূপাদি লক্ষণ অর্পণ করা হইয়াছে। যেমন 'তাঁহার নাম উৎ'; 'তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু' ইত্যাদি। সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও উপাসনার জন্য নামরূপাদির গুণ আরোপ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সগুণভাবে উপদেশ করা হইয়াছে।"

বেঃ ভাঃ ১।২।১৪।

এখানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ। কেবল উপাসনার জন্যই তাহাতে গুণ আরোপ করা হইয়াছে।

(১১) "অপরব্রহ্ম পরব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী এই জন্য অপরব্রহ্মকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে (পরব্রহ্ম সামীপ্যাৎ অপরস্য ব্রহ্মণঃ তস্মিন্নপি ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগো ন বিরুধ্যতে)।"

৪।৩।৯ ভাষ্য।

এই ভাষ্যেই শঙ্কর স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই নিত্যতা নাই (ন হি পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যত্র কচিৎ নিত্যতা সম্ভবতি)।

নির্গুণ ব্রহ্মই যে সগুণ, শঙ্কর এখানে ইহা স্বীকার করিলেন না, প্রত্যুত বলিলেন অপরব্রহ্ম পরব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী। এখানে সগুণ ব্রহ্মের অনিত্যতাও স্বীকার করা হইয়াছে।

(১২) "পরমাত্মাতে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—এই অবস্থাত্রয় অবভাসিত হয় ইহা মায়ামাত্র—রজ্জুতে সর্প প্রতীতির ন্যায় (মায়ামাত্রং হ্যেতৎ পরমাত্মনঃ অবস্থা ত্রয়াত্মনাবভাসনং রজ্জু ইব সর্পাদি ভাবনেতি। বেঃ ভাঃ ২।১।৯)। এই মায়া কি প্রকারে প্রসারিত হয়? শঙ্কর বলেন এ মায়া স্বয়ং প্রসারিত হইতে পারে না। ইহা ব্রহ্মে অধ্যস্ত হয়—এই জন্যই ভ্রম হয় যে ব্রহ্মই মায়া প্রসারিত করেন। পরমাত্মা এই সংসার-মায়া দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয়েন না। কেন? শঙ্কর বলিতেছেন 'অবস্তুত্বাৎ' (বেঃ ভাঃ ২।১।৯) অর্থাৎ মায়া অবস্তু—এই জন্য। মায়া লইয়া শঙ্কর

মহা বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন 'এই মায়া, বস্তু কি অবস্তু, তাহা নিরূপণ করা যায় না' (অব্যক্তা হি সা মায়া তত্ত্ব অন্যত্ব নিরূপণস্য অশক্যত্বাৎ। বেঃ ভাঃ ১।৪।৩)। সে যাহাই হউক ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মায়াও ভ্রমাত্মক—ইহা কখনই ব্রহ্মশক্তি নহে।"

(১৩) "তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের ভাষ্যে (২।১) শঙ্কর বলিয়াছেন ব্রহ্ম জ্ঞানং কিন্তু তাঁহাতে জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ যেখানে জ্ঞানকর্তৃত্ব, সেই খানেই কার্য্য, সেই খানেই পরিবর্তন। সুতরাং জ্ঞানকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে সত্য এবং অনন্ত বলা যায় না (জ্ঞান-কর্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং ভবেৎ অনন্তঞ্চ)"।

সুতরাং এখানেও দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের মতে ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করা যায় না।

আর অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করা অনাবশ্যক।

কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় শঙ্করের নামে কি প্রচার করিতেছেন শ্রবণ করুন :—

"নির্গুণ ব্রহ্মই যখন সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত তখন তাঁহাকেই সগুণ বা কারণ ব্রহ্ম বলিয়া তিনি (অর্থাৎ শঙ্কর) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মই শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন (প্রঃ ৪৪৯ ও ৪৫০ পৃঃ)।

এ মত যে সম্পূর্ণ শঙ্করবিরোধী তাহা উদ্ধৃত অংশ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমতঃ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ নহেন 'তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই' ইহা বলা অসঙ্গত। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ হয়েন ইহা শঙ্করের মত নহে। (২) শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মে শক্তির অধ্যাস হয়, ব্রহ্ম শক্তি আছে বলিয়া ভ্রম হয়—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি "শক্তি রহিত"। আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে শঙ্করের মতে জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব স্রষ্টৃত্ব—ইত্যাদি সমুদয়ই নাস্তি। এ সমুদয়ের কিছুই ব্রহ্মে অর্পণ করা যায় না। সুতরাং তিনি "শক্তি দ্বারা" জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এই মত শঙ্করবিরোধী। (৩) স্রষ্টৃত্ব ও সৃষ্টি উভয়ই যখন অবিদ্যাকল্পিত তখন তিনি জগৎ "সৃষ্টি করিয়াছেন" ইহা বলা নিতান্তই অসঙ্গত।

উৎকট যুক্তি ও বিকট পরিণাম।

(১)

শঙ্করের মতে যে শক্তি 'কল্পিত' এবং 'মিথ্যা' ইহা বিদ্যারত্ন মহাশয়কেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি ইহার এক উৎকট যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। "এই শক্তি—ব্রহ্মেরই শক্তি, ব্রহ্মেরই আত্মভূত; ইহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম হইতে এই শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বাধীনতা নাই। এই জন্য অনেক স্থলে ইহাকে 'কল্পিত' শব্দেও উল্লেখ করা গিয়াছে। ......অনেক স্থলে ইহাকে মিথ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে।" (প্রঃ পৃঃ ৪৫৪)। যুক্তিটী অতি সারগর্ভই বটে। শক্তি ব্রহ্মেরই সুতরাং শক্তি মিথ্যা ও কল্পিত। শক্তি ব্রহ্মের আত্মভূত সুতরাং শক্তি কল্পিত ও মিথ্যা। এবং শক্তি=ব্রহ্ম সুতরাং শক্তি কল্পিত ও মিথ্যা। এ সমুদয় যুক্তি অতি অকাট্য! শক্তি=ব্রহ্ম এজন্যও শক্তি মিথ্যা ও কল্পিত আবার শক্তি ব্রহ্মের অধীন সেজন্যও শক্তি মিথ্যা ও কল্পিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্ম ছাড়া থাকিতে পারে না বলিয়া শক্তি যদি মিথ্যা ও কল্পিত হয় সর্ব্বশক্তিমানকেও মিথ্যা ও কল্পিত বল না কেন? কারণ শক্তি ছাড়া শক্তিমানের কোন অর্থ নাই, শক্তি ছাড়া শক্তিমানের অস্তিত্বই নাই। লেখক নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে "শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের কারণ। শক্তি দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের কর্তা।" (প্রঃ পৃঃ ৪৫১)। ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব ও কর্তৃত্ব যখন শক্তির উপর নির্ভর করে তখন পূর্ব্বোক্ত কারণে ব্রহ্মকেও মিথ্যা ও কল্পিত বলিতে হয়।

(২)

প্রশ্ন উঠিয়াছিল জগৎ কোন্ বস্তুর পরিণাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন "অবিদ্যাই পরিণত হয়" (প্রঃ পৃঃ ৪৫৩)। ঐ পৃষ্ঠাতেই অপর এক স্থলে বলিয়াছেন "শক্তিরই পরিণাম হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে

শক্তি=অবিদ্যা।

লেখক আবার ইহাও বলিয়াছেন

শক্তি=ব্রহ্ম।

সুতরাং ন্যায় শাস্ত্রের নিয়মানুসারে

ব্রহ্ম=অবিদ্যা।

বিদ্যারত্ন মহাশয় এমন সুন্দর ভাবে শঙ্করমত ব্যাখ্যা করিতেছেন যে অবশেষে বলিতে হইল ব্রহ্ম ও অবিদ্যা একই বস্তু। উপযুক্ত শিষ্যই বটেন। ইনিই একজন উপনিষদের উপদেশক!

বিকার ও বিবর্ত্ত।

আমরা বলিয়াছিলাম "শঙ্কর ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করেন না, তিনি বিবর্ত্ত-বাদী—পরিণাম-বাদী নহেন।" বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন "শঙ্কর যে কেবল বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিতেন, তাহা নহে, তিনি পরিণাম-বাদও স্বীকার করিতেন।" (প্রঃ ৪৫২ পৃঃ)। প্রথমে দেখা যাউক 'বিবর্ত্ত' ও 'বিকার' শব্দের অর্থ কি।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা
বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা
বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ।

অর্থাৎ সত্যসত্যই যদি এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় তবে তাহা বিকার। আর যদি একবস্তু মিথ্যা অন্যবস্তুরূপে প্রতীত হয়, তবে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় সুতরাং দধি দুগ্ধের বিকার। আর রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে বিবর্ত্ত হইল। এখন প্রশ্ন এ জগৎ ব্রহ্ম-বিকার, না ব্রহ্মবিবর্ত্ত, না উভয়ই। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন শঙ্করের মতে এ জগৎ উভয়ই। আমরা বলি এই মত শঙ্করবিরোধী। বিকারে বস্তুটীর পরিবর্তন হয় আর বিবর্ত্তে বস্তুটীর কোন পরিবর্তন হয় না—পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। দুগ্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া দধি হয় কিন্তু রজ্জু কখন সর্প হয় না, রজ্জু অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়। সুতরাং যদি বল 'ব্রহ্মবিকারও সত্য এবং ব্রহ্মবিবর্ত্তও সত্য' তাহা হইলে ইহাই বলা হইল যে ব্রহ্মের পরিবর্তন হয় এবং ব্রহ্মের পরিবর্তন হয় না। ইহার মত আত্মবিরোধী কথা আর কি হইতে পারে? সুতরাং এ জগৎ উভয়ই ইহা স্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ শঙ্করের মতে যে ব্রহ্ম বিকারবিহীন তাহা বহুভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং বিকারবাদ বা পরিণামবাদ উড়িয়া গেল। এখন রহিল বিবর্ত্তবাদ। শঙ্কর বলেন ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস হয় সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্মে বিবর্ত্ত। সুতরাং শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী।

যাহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলা হয় তাঁহার সহিত সংসারের কি প্রকার সম্বন্ধ—শঙ্কর কঠোপনিষদ্ভাষ্যে (৫।১১) ইহার বিচার করিয়াছেন। ভাষ্যানুবাদ এই :—

"সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সংসার দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না কারণ তিনি ইহার 'বাহ্য' (=বাহিরে)। আত্মাতে অবিদ্যার অধ্যাস বশতঃ এই সংসার কামনা ও কর্ম্মজনিত দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই অবিদ্যা আত্মাতে নহে (ন তু সা পরমার্থতঃ স্বাত্মনি) রজ্জু, শুক্তিকা, মরুভূমি এবং গগনে সর্প, রজত, উদক ও মলিনতার অধ্যাস হয়। কিন্তু সর্পরজতাদিরূপ যে দোষ এ সমুদয় কখনই রজ্জু প্রভৃতির নহে। বিপরীত বুদ্ধিজনিত অধ্যাস

বশতঃ মনে হয় রজ্জু প্রভৃতির সহিত সর্পাদির সংসর্গ আছে এবং এই জন্যই সর্পাদি বস্তুসমূহকে রজ্জু প্রভৃতির দোষ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু তাহারা এই সমুদয় দোষ দ্বারা লিপ্ত হয় না। কারণ তাহারা বিপরীত বুদ্ধিজনিত অধ্যাসের বহিভূর্ত। তেমনি সর্ব্বলোক সর্পাদি অধ্যাসের ন্যায় আত্মাতে কার্য্য, কর্ত্তৃত্ব ও ফলাত্মক বিপরীত জ্ঞান অধ্যাস করে এবং তজ্জনিত জন্মমরণাদি দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বলোকের আত্মারূপী হইলেও বিপরীত অধ্যাসজনিত সংসার দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। কেন লিপ্ত হয়েন না? কারণ আত্মা সকলের বাহ্য। রজ্জু প্রভৃতির ন্যায় তিনি বিপরীত বুদ্ধিজনিত অধ্যাসের বহিভূর্ত।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে শঙ্করের মতে অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের কোন সংসর্গ নাই, তবে যে সংসর্গ আছে বলিয়া মনে হয় উহা অধ্যাস—ইহা ভ্রম। এখানেও দেখা যাইতেছে শঙ্কর বিবর্ত্তবাদী। পূর্ব্বে শঙ্করভাষ্য হইতে যে সমুদয় অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও এই বিবর্ত্তবাদই সংস্থাপিত হইয়াছে।

বিদ্যারত্ন মহাশয় বিকারবাদ সমর্থন করিবার জন্য বেদান্তভাষ্যের এক অংশ (২।১।১৪) উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন "সূত্র ভাষ্যের শেষাংশে শঙ্কর স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্যবহারতঃ সূত্রকার পরিণামবাদই স্বীকার করিয়াছেন......কিন্তু পরমার্থতঃ বিবর্ত্তবাদই এই সূত্রে গৃহীত হইয়াছে"। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন—এ জগৎ ব্রহ্মবিবর্ত্ত বটে তবে ব্যবহারতঃ পরিণামবাদও সত্য। শঙ্কর সর্ব্বত্র (এবং ঐ সূত্রের ভাষ্যেও) বলিয়াছেন যে ব্যবহারিক সত্ত্বা অবিদ্যা-কল্পিত – মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। (মিথ্যাজ্ঞান বিজৃম্ভিতঞ্চ নানাত্বম্। বেঃ ভাঃ ২।১।১৪)। ব্যবহারতঃ পরিণামবাদ সত্য ইহার অর্থ এই যে অবিদ্যাজনিত কল্পনায় মিথ্যাজ্ঞানে পরিণামবাদ সত্য। মিথ্যাজ্ঞানে যদি পরিণামবাদ সত্য হয়, সত্যজ্ঞানে পরিণামবাদ নিশ্চয়ই অসত্য। সুতরাং এ যুক্তিতেও পরিণামবাদ উড়িয়া গেল। প্রবন্ধে লেখক স্বীকার করিয়াছেন "ব্রহ্মের কোন পরিণাম হয় না"—"চেতনের অবস্থান্তর বলিয়া প্রতীত হয়"। (প্রঃ ৪৫৩ পৃঃ)। আমরা ত বরাবরই এই কথাই বলিয়া আসিতেছি যে শঙ্করের মতে ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, পরিণাম হয় বলিয়া ভ্রম হয়। বিদ্যারত্ন মহাশয়ই ত স্বীয় গ্রন্থে ব্রহ্মবিকারবাদ প্রচার করিয়াছেন। যথাঃ (১) বিশ্ব এই সদ্বস্তুরই রূপান্তরিত অবস্থা (পৃ ২১)। (২) ব্রহ্মচৈতন্য এই স্থূল বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাঁহারই রূপ, তাঁহারই অভিব্যক্তি (পৃঃ ১৫০)। (৩) এ বিশ্ব সংসার তাঁহারই স্বরূপের পরিচয় দিয়া আসিতেছে (পৃঃ ৩১৬)। ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বস্তুতঃ নামরূপগুলি সত্য ও নিত্য (পৃঃ ২৪)" ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্বে স্বীকার করিতেন যে "বস্তুতঃ" ব্রহ্মেরই পরিণাম হয়। কিন্তু এখন বলিতেছেন ব্রহ্মের কোন পরিণাম হয় না (প্রঃ ৪৫৩ পৃঃ ২য় স্তম্ভ, ২৬ পংক্তি)। অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন "আমি পুস্তকে যাহা লিখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ভুল।" অথচ প্রবাসীর পাঠকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন হে প্রবাসীর পাঠকবর্গ! "মৎপ্রণীত 'উপনিষদের উপদেশ' নামক গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় ও ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি" অর্থাৎ আমার পুস্তক খানা কিনিয়া পড়।

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

চীনসম্রাটের জন্মদিনের উৎসব।

সম্রাটের জন্মদিনোৎসব প্রকৃত জন্মদিনের দুই দিন পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কারণ তাহার প্রকৃত জন্মদিনের সময় পিতৃপুরুষের শরৎকালীয় শ্রাদ্ধ সম্পন্নের দিন। চীনদেশে প্রতি সহরে প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে ঐ সময়ে সকলে আপন আপন পিতৃপুরুষের পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। পিতৃলোকের আত্মাদিগকে অন্নজল দান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করাই ইহার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। অবশ্য হিন্দুগণ আপনাদের পিতৃলোককে অন্নজল দান করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা অপেক্ষাও এদেশে আড়ম্বর আগ্রহ ও বিশ্বাস অধিকতর। এই শ্রাদ্ধের সময় তিন দিবস নিরামিশ ভোজন করিয়া সংযম করার প্রয়োজন। সুতরাং জন্মদিনের উৎসব ঐ সময়ে পড়িলে পানাহার ও আমোদ আহ্লাদের বিঘ্ন ঘটে। এই জন্মদিনোৎসব রাজকীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা সম্রাট পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

এই উৎসবোপলক্ষে দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। এবং রাজপুরীর প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা সকল অতি জাঁক জমক ভাবে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। উৎসবের পূর্ব্বে রাজপুরীর মধ্যে যে স্থানে যে প্রকার ভাস্করের চিত্রকার্য্য করিতে হইবে তাহার নমুনা খোজাগণ কর্ত্তৃক বৃদ্ধা রাণীকে দেখান হইয়া থাকে এবং তাঁহার আদেশ মত চিত্রকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাহিত্যে সুপণ্ডিতগণ জন্মদিন উপলক্ষে নানাবিধ সুললিত পদ্য রচনা করিয়া তাহার নমুনাও রাজমাতাকে পূর্ব্বে দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার রুচি অনুসারে ঐ সকল পদ্য সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

উৎসবের চারি দিন পূর্ব্ব হইতেই রাজবাটীতে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হইয়া থাকে। এই সময়ে সমস্ত রাজপুরী এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। পুরীর মধ্যে নানা স্থানে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র সকল সুর তান লয়ে বাজান হইয়া থাকে। এই সকল অদ্ভুতধরণের বাদ্যযন্ত্র সকল অন্যত্র বিশেষ দৃষ্ট হয় না। রাজবাটীতে যত বড় বড় উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে রাজবাটীর প্রধান দরজার সম্মুখে তাঁবু সদৃশ এক প্রধান পীতবর্ণের পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত ছত্র প্রোথিত হইয়া থাকে। ঐ ছত্রের ঝালর প্রভৃতি এত শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তত যে দেখিতে চিত্তহারী। এই উপলক্ষে বিশাল চীন সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে রাজকীয়

কর্ম্মচারিগণ রাজ বাড়ীতে মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া থাকেন নানা প্রদেশ হইতে সম্ভ্রান্ত অভিজাতগণ পেকিন, মাঞ্চুরিয়া ও মংগোলিয়া হইতে রাজকুমারগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন। দলে দলে রাজকুমারীগণ পুরী মধ্যে প্রত্যহ আসিয়া জমা হইতে থাকেন।

রাজপুরীর নাট্যমঞ্চ প্রায় ১২ ফুট উচ্চ এবং রাজকীয় নাট্যদর্শনমন্দিরটী ঐ নাট্যমঞ্চের প্রায় সমোচ্চভাবে নির্ম্মিত। নাট্যমঞ্চের ষ্টেজ ঘরটীর তিনদিক মুক্ত। অভিনেতাগণ কক্ষের বামদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া অভিনয় সম্পন্ন হইলে দক্ষিণদিক দিয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। এদেশে নাট্যশালায় অভিনেত্রী নাই। রমণীগণের নাট্যাংশ রমণী-বেশধারী পুরুষগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। জন্মোৎসবের দিনে রাজবাটী লাল, নীল, সবুজ ও পীতবর্ণের শিবিকায় পূর্ণ হইয়া যায়, কারণ যাঁহার যেমন পদমর্য্যাদা তিনি সেই বর্ণের শিবিকায় আরোহণ করিতে পারেন উচ্চশ্রেণীর খোজাগণ জোড়া নাগের আকৃতি ও জড়ির কার্য্য যুক্ত, সাটিনের পোষাক পরিধান করিয়া যথাস্থানে অপেক্ষা করিতে থাকে। নিম্নশ্রেণী খোজাগণের পোষাক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের হইয়া থাকে।

জন্মদিনে সম্রাট সর্ব্বপ্রথমে ভূমিষ্ঠ হইয়া রাজমাতাকে প্রণাম করার পর, নবীন সম্রাজ্ঞীগণ ও অন্যান্য মহিলাগণ যথা ক্রমে সম্রাটকে প্রণাম করিয়া থাকেন। অতঃপর সম্রাট রাজমাতার সঙ্গে দরবারগৃহে গমন করিয়া থাকেন। সম্রাট সচরাচর সামান্য ধরণের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও জন্মদিন উপলক্ষে তিনি জাঁকাল পোষাক পরিয়া থাকেন। স্বর্ণখচিত পীতবর্ণের পট্টবস্ত্রের জোব্বা পরিধান করিয়া মূল্যবান জেডপ্রস্তরখচিত কোমরবন্ধ দ্বারা তাঁহার সরু কোমরটী বাঁধিয়া রাখেন। এই দিনে রাজকীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি তাঁহার মুকুটে শোভা পাইয়া থাকে এই মুকুটের চূড়া (Button) দ্বারা মাণ্ডারিণগণের পদমর্য্যাদা নির্ণীত হইয়া থাকে। সম্রাটের জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজমাতা অন্যান্য দিনে যেমন জাঁকাল পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, সে দিন তাদৃশ নহে। অদ্য তিনি অতি সাদা সিদে ধরণের পরিচ্ছদ পরিয়া থাকেন। ইহার কারণ বুঝা যায় না। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই দিনে সম্রাট ও নবীন সম্রাজ্ঞীর প্রতি লোকের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করাই নাকি তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

রাজপুরীতে বিবাহিতা মহিলাগণের পরিচ্ছদ গাঢ় লাল বর্ণের সাটিন দ্বারা প্রস্তুত বিধবাগণের পরিচ্ছদ নীল বর্ণের এবং কুমারীগণের পরিচ্ছদ উজ্জ্বল লালবর্ণের পটবস্ত্র নির্ম্মিত। সম্রাটের পাটরাণীর পীতবর্ণের এবং দ্বিতীয়া রাণীর কমলা লেবুর (orange colour) বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবার রীতি। ইহাঁদের সকলের পরিচ্ছদই স্বর্ণখচিত জড়ির কার্য্য ও জোড়া নাগমূর্ত্তিবিশিষ্ট। নবীন সম্রাজ্ঞীর পরিচ্ছদ নানা রত্নমণ্ডিত। তাহার শিরভূষণ বহু মূল্যবান মণি মুক্তা খচিত। তাহার শিরভূষণ হইতে মুক্তার ঝালর সকল স্কন্ধদেশ ও কপোলদেশ ছাইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত নানা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পুষ্প তাহাতে শোভা পাইয়া থাকে। তিনি গলায় এক ছড়া মূল্যবান মুক্তার মালা পরিয়া থাকেন।

রাজপুরীতে নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইলে সম্রাট ও রাজমাতা দরবারগৃহে প্রবেশ করেন। তখন ক্রমে ক্রমে দরবার গৃহে রাজকুমারগণ, উচ্চ রাজপুরুষগণ, ও মহামান্য অভিজাতবর্গ একে একে অবনতমস্তক পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া সম্রাটের জন্মদিনের শুভকামনা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারি-গণ—যাঁহাদের দরবারগৃহে প্রবেশের অধিকার নাই—, দূরস্থ আঙ্গিনা হইতে "স্বর্গের সন্তান"কে (Son of Heaven) অভিবাদন করিয়া শুভকামনা করিয়া থাকেন। অন্যান্য দিবস রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় সম্রাট রাজমাতার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু আজ তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন। এই সকল আগন্তুক অভিজাতবর্গ সম্রাটকে যথেষ্ট মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। জেডপ্রস্তরনির্ম্মিত একপ্রকার উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে "রুইয়ে" কহে। এক একজন ভদ্রলোক অবনত হইয়া প্রণাম করিয়া সম্রাটের হস্তে এক একটী উপহার দিয়া থাকেন। সম্রাট তাহা খোজার হাতে দেন এবং খোজা তাহা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মেজের উপর সজ্জিত করিয়া রাখে। সমস্ত অভিজাতবর্গের অভিবাদনকার্য্য সম্পন্ন হইলে তাঁহারা দরবারগৃহ পরিত্যাগ করেন। এবং শেষে রাজপুরীর

মহিলাগণ দরবারগৃহে সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ পাটরাণী সম্রাটকে প্রণাম করিয়া একটী "রুইয়ে" উপহার দেন, তার পর দ্বিতীয়া রাণী এবং ক্রমে অন্যান্য রাজকুমারীগণ একে একে সম্রাটকে প্রণাম করিয়া একটী করিয়া "রুইয়ে" সম্রাটকে উপহার দিয়া থাকেন।

এই প্রকারে অভিবাদনকার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, বৃদ্ধা-রাণী, সম্রাট ও অন্যান্য মহিলাগণ সহ নাট্যাভিনয় দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন। রাজবংশের রাজকুমারগণের ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্য এক স্বতন্ত্র কক্ষ আছে। রাজপুরীর মহিলাগণের নাট্যাভিনয় দেখিবার জন্যও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। পুরুষগণ মহিলা-গণকে তথা হইতে দেখিতে পায় না।

সম্রাট ও বৃদ্ধারাণী আসন গ্রহণ করিলে প্রধান অভিনেতাগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া শুভকামনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক স্বরচিত পদ্যের আবৃত্তি করিয়া থাকে। এবং সম্রাট দশহাজার বৎসর যাবৎ জীবিত থাকিবেন এমন আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে সকল পদ্য রচনা অভিনেতাগণ পাঠ করিয়া থাকে তাহার একটীর ভাবার্থ এই:—

"হে মহান স্বর্গরাজ্যের নন্দন! আপনার পূর্ব্বপুরুষ-গণের পুণ্যফলে ও বিচক্ষণতায় এই সাম্রাজ্য সুশাসিত হইয়া, উহা অবশেষে আপনার মহৎ হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

"আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যফলে আমরা প্রজা-সাধারণ মহা সুখে আছি।

"আমাদিগের শাসনকর্ত্তা আমাদিগের মঙ্গলের জন্য নানা সদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। আমরা রাজ্যের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।"

অভিনেতাগণ প্রাচীন কীর্ত্তি ও গৌরবের অভিনয় করিয়া থাকে। বড় বড় উৎসবে দিবারাত্রি সমভাবে অভিনয় চলিতে থাকে। অভিনয়কালে বেলা দশ ঘটিকার সময় নাট্যাভিনয়ের স্থানেই সকলের জলযোগের আয়োজন হইয়া থাকে। জন্মোৎসব উপলক্ষে যত খাদ্য পাত্র তথায় উপস্থিত হয় তাহা লাল কাগজ মণ্ডিত এবং তাহার কোনটীর উপর লিখিত থাকে "দীর্ঘজীবন লাভ হউক," কোনটীর উপর "শান্তি," কোনটীর উপর "সুখ," কোনটীর উপর "সৌভাগ্য," ইত্যাদি। রাজপুরীতে যে সকল সুরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা বিলাতী সুরা নহে, চীনদেশী সুরা। তাহা অতি সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। তাহার কোন কোন সুরার নাম "গোলাব পুষ্পস্থ শিশিরবিন্দু," কোনটীর নাম "বুদ্ধ-হস্ত-নিঃসৃত-অমৃতবিন্দু," ইত্যাদি।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলিকে আর এক প্রকার পানীয় পান করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহা বাদাম ঘুঁটিয়া দুগ্ধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাঞ্চুগণের নিকট এই পানীয় অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদিগের দেশেও পঞ্জাব অঞ্চলে এই প্রকার বাদাম ঘুঁটিয়া পান করিবার প্রথা আছে। আগন্তুক ভদ্রমণ্ডলি বাদাম ঘোঁটা গরম দুগ্ধপাত্র মুখে তুলিবার কালে সম্রাটের শুভকামনা জ্ঞাপন করেন (drinking health) অথবা অন্য ভাষায় "স্বাস্থ্য পান" করিয়া থাকেন। এই প্রকার জলযোগ ও আহারাদি সম্পন্ন হইলে খোজাগণ জোড়ায় জোড়ায় এক একখানি পরাত আনিতে থাকে। ঐ সকল পরাতে নানা প্রকারের উপহারদ্রব্য সকল রক্ষিত হইয়া থাকে। সম্রাট নিজের জন্মদিনে যেমন বহুমূল্য উপহার পাইয়া থাকেন, তাদৃশ সেই দিনে বহুপ্রকার উপহার আগন্তুক ভদ্রলোকগণকে দিয়া থাকেন। এই সকল উপহারের মধ্যে রাজপুরীস্থ কারিকরগণ-প্রস্তুত মৃণ্ময় পুষ্পাধার (Vases), ব্রঞ্জধাতুনির্ম্মিত ধূপাতি, কন্‌ফুসিয়ান ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত নানা বচনযুক্ত পট সকল এবং জেডপ্রস্তর নির্ম্মিত "রুইয়ে" ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। পদমর্য্যাদানুসারে এই উপহারের কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। প্রত্যেককেই এই জিনিষ এক এক প্রস্ত প্রদত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মকথাযুক্ত পটগুলি পীতবর্ণের পট্টবস্ত্রাচ্ছাদিত আধারে রক্ষিত থাকে।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় অভিনেতাগণ জাঁকজমক-শালী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়া সম্রাটের স্তুতিগান করিতে থাকে, সেই গানে সম্রাটকে "স্বর্গের সন্তান," "পৃথিবীতে বুদ্ধদেবের প্রতিনিধি," ইত্যাদি আখ্যায় বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ঐ স্তব পাঠের পর এক মিছিল বাহির হয়। মিছিলে পৌরাণিক ধরণের নানা জীবজন্তুর মূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি, নাগমূর্ত্তি, পরীর মূর্ত্তি ইত্যাদি যথাক্রমে বাহির হইয়া থাকে। মিছিলের সঙ্গে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃত্রিম

ফল সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার কোনটীর উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিত "স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য", "সুখসৌভাগ্য" "শান্তিময় বার্দ্ধক্য" ইত্যাদি। পিচফল দীর্ঘায়ুর চিহ্ন। অবশেষে রাজকীয় প্রকাণ্ড নাগমূর্ত্তি বাহির হইয়া থাকে। নাগমূর্ত্তি উজ্জল প্রভাযুক্ত একটী মুক্তা (Flaming pearl) ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সেই দৃশ্য ইহাতে দেখান হইয়া থাকে। নাগমূর্ত্তির পশ্চাতে যুদ্ধবেশ পরিহিত রাজকুমারগণ এবং জাঁকজমক বিশিষ্ট পরিচ্ছদধারী অপরাপর সকলে ক্রমে চলিতে থাকে। এই নাগমূর্ত্তি দ্বারা সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন করান হইয়া থাকে। এই মিছিল বাহির হইয়া গেলে আগন্তুক ভদ্রগণ সম্রাট ও বৃদ্ধা মহারাণীকে অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন। অভিজাতবর্গ প্রস্থান করিলে প্রাঙ্গণমধ্যে দুইখানি ক্ষুদ্র গদি রাখা হয়, তাহার উপর সম্রাট ও নব সম্রাজ্ঞীদ্বয় আসিয়া জানুপাতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করেন। তখন বৃদ্ধা মহারাণী সুগন্ধি ধূনাযুক্ত ধূপতি হস্তে পরিচারিকা সহ উপস্থিত হন। সম্রাট ও নব সম্রাজ্ঞীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং নানা প্রকার বাদ্য বাদিত হয়। তখন বৃদ্ধা মহারাণী সর্ব্বাগ্রে এবং তাঁহার পশ্চাতে আর সকলে মিছিলের ধরণে চলিতে থাকেন। এই পারিবারিক ক্ষুদ্র মিছিল এক পবিত্র কক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। এই কক্ষে মাঞ্চুবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মরণচিহ্ন সকল রক্ষিত আছে। কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইয়া সম্রাট ও নবীন সম্রাজ্ঞীদ্বয় তাঁহাদের পিতৃপুরুষের স্মরণচিহ্নের নিকট প্রণাম করিয়া জন্মদিনের উৎসব সমাপ্ত করেন।

শ্রীরামলাল সরকার।

ওমার খায়ামের ধর্ম্মমত।

কাব্যকুঞ্জ পারস্যের বহু মহাকবির মধ্যে ওমার খায়াম একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি শুধু কবি নহেন, তিনি পণ্ডিত কবি, তিনি জ্যোতিষ কবি। তিনি নয়সাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন—কেহ তাঁহাকে নাস্তিক, কেহ বা অজ্ঞেয়বাদী, কেহ বা সংশয়বাদী, কেহ বা অদৃষ্টবাদী, কেহ বা বহুদেববাদী এবং কেহ বা একেশ্বরবাদী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার কোনটাই মিথ্যা নহে, এবং কোন মতটাই সত্য নহে।

স্বাধীন চিন্তা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে প্রকাশ পাইয়াছে—যে বীর সেই চিন্তা-স্রোতে আপনার চতুষ্পার্শ্বের নরনারীকে মুগ্ধ লুব্ধ করিয়া একটানা ভাসাইয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা জগতে এক এক নূতন ধর্ম্মমত স্থাপন করিয়া আপনার চিত্তের প্রসারতার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। য়িহুদিধর্ম্মের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম্ম, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মকেই কত প্রকারে পরিমার্জ্জিত করিয়া লুথার প্রভৃতি অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন। বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব এবং পুরাণ-তন্ত্রের প্রভাবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া চৈতন্যদেব, নানক, কবির, তুকা অমর হইয়া রহিয়াছেন। আর যে সকল পুরুষ স্বাধীন চিন্তা দ্বারা বলিষ্ঠ লোকাচারকে পরাভূত করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা অধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে নিগ্রহভাজন হইয়াছেন। কিন্তু সেই অধার্ম্মিক ও মহাধার্ম্মিকের মধ্যে পার্থক্য বড় অল্পই—শুধু একটু বেগ, একটু আকর্ষণীর অভাবে তাঁহারা আপন মতের সাড়া সমাজের নিকট হইতে পাইতে বঞ্চিত থাকিয়া যান।

ওমার খায়াম এই শেষোক্ত শ্রেণীর মহাপুরুষ। তিনি সমাজের চিরানুগত প্রথা, ধর্ম্মমত ও ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতিতে নিরাপত্তিতে 'ডিটো' দিতে পারিতেন না—এবং সেই স্বাধীন চিন্তাটুকু প্রকাশ করিয়া বলিবার মত সাহস ও শক্তি তাঁহাতে ছিল। এই মনীষীর চিন্তাপ্রণালী অভিব্যক্ত হইয়া যখন যে অবস্থায় প্রকাশ হইয়াছে, শুধু তৎকালের রচনা পাঠ করিলে তাঁহাকে ভুল বুঝা অসম্ভব নহে। ওমার খায়ামের রচনা—তাঁহার সুমধুর চতুষ্পদী শ্লোক—পাঠ করিলে, তাঁহার ধর্ম্মমতের একটি চমৎকার অভিব্যক্তি জানিতে পারা যায়। তাঁহার শ্লোকাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু আমরা তাঁহাকে ক্রম-উন্নত স্থির করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের বিবর্ত্তন স্থির করিব।

ওমারের সহপাঠী, নয়সাপুরের রাজার উজির নিজাম্-উল্-মুল্ক্ তাঁহার 'ওয়াসিয়াৎ'এ লিখিয়াছেন যে ওমার নিষ্ঠাবান, সংযত-চরিত্র সাধু-পুরুষ ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত

জ্যোতিষ ও বীজগণিত প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি তৎকালে পঞ্জিকা সংস্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

ওমারকে অনেকে চার্ব্বাকপন্থী মনে করিত। চার্ব্বাকের মত—

খাও দাও মজা কর, কাহারো না ধারো ধার,
মরা দেহ ছাই হয়ে' ফিরে নাহি আসে আর।

ওমারের বহু শ্লোক এই ধরণের হইলেও, তিনি কখন নিজে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না। পারস্যের শুফি সম্প্রদায় সমাজ-ঘৃণ্য দ্রব্য ও ব্যবহার প্রভৃতির অন্তরালে আপনাদের ভক্তি ও শুচিতা গোপন রাখিয়া চলিতেন; তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমকে মদ্যের সহিত, ঈশ্বরসাযুজ্য সুন্দরী সহবাসের সহিত একাকার করিয়া গিয়াছেন। যাহারা স্থূলদর্শী তাহারা শুফিধর্ম্মকে অনাচারী মনে করে। সেইরূপ ওমারও আপনাকে অনাচারের অন্তরালে রাখিয়া সাধনা করিতেন। কথিত আছে যে শুফিগণও ওমারের বিরোধী ছিলেন। ওমার নিতান্ত স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন, কাজেই কখন কোন সম্প্রদায়েরই সহানুভূতি লাভ করেন নাই। এই নিন্দিত কবিটির প্রাণের মাধুর্য্য আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

প্রথমত আমরা তাঁহাকে ঘোর অদৃষ্টবাদীরূপে দেখিতে পাই। তিনি বলিতেছেন—

সঞ্চল অঙ্গুলি লেখে, লিখে চলে' যায়,
ধর্ম্ম, বুদ্ধি, যত তব কি সাধ্য নড়ায়;
অনড় অচল সেই অদৃষ্টের লেখা
শত অশ্রু মুছিবে না এতটুকু রেখা।
নাহি কি কোথাও কোন এমন দেবতা
মুছে দেয় অদৃষ্টের গোপন বারতা,
কিংবা সে গো অদৃষ্টেরে বাধ্য করি বলে
নূতন ললাটলিপি লিখায় কৌশলে।

কখন আবার তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের উপাসক, প্রকৃতি-শক্তির বিস্মিত পূজক রূপে দেখিতে পাই। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের চণ্ডমূর্ত্তি ও নিশীথ রজনীর ঘুমন্ত চাঁদের নীরব হাসি তাঁহাকে তুল্যরূপে আনন্দ দিতেছে, তিনি সে আনন্দে আত্মহারা। তার পরে তিনি আপনার পরিণত বুদ্ধিতে বুঝিয়াছেন যে তিনি স্বরূপ ছাড়িয়া আভাসে, সত্য ছাড়িয়া ছায়ায় মগ্ন হইয়াছেন। তখন তিনি বলিতেছেন—

যৌবনের অহমিকা না হইতে গত
ভাবিতাম জীবনের সমস্যা সে যত
সকলি বুঝেছি। এবে বৃদ্ধ হয়ে' বুঝি
জীবন বিগত, হায় শুধু মিছামিছি।

কখন কখন তাঁহাকে বিশ্বদেব দেখিতে দেখিতে নাস্তিক রূপেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা ক্ষণিক—ঐ ভাব হৃদয়ের জটিলতা অসমাধানের সংশয় মাত্র, একটি মহাপ্রাণের সত্য-আবিষ্কারের সংশয় মাত্র—হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয় নহে। একটি সজীব চিত্তের সংশয় নানা সময়ে নানা আকার ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার বহু কবিতা বহিতঃ এমন উচ্ছৃঙ্খলতাময়, এমন অধার্ম্মিকতাময় যে তাহা একজন সমাজ-দ্রোহী দুরাচারের রচনা বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সেই ছদ্মভাষার ভিতরে, সেই উচ্ছৃঙ্খলতার অন্তরালে ভাবুক ব্যক্তি গূঢ় ভগবৎ-প্রেম, শুচিতা প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাইবেন। Mysticism বা প্রচ্ছন্নতা শুফি ধর্ম্মের এক অঙ্গ; যদিও ওমার খায়াম শুফিদিগকেও গালি ও বিদ্রূপ হানিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে একজন ভক্তপ্রেমপ্রাণ শুফি বলিয়া মনে হয়, তাঁহার বহু কবিতা প্রমোদগৃহে ও মন্দিরে তুল্যরূপে পাঠ করা যায়। উচ্ছৃঙ্খলতার ছদ্ম আবরণের অন্তরালে যে ব্যক্তি খাঁটি মানুষটির সন্ধান করিয়া লইতে পারেন, তিনি বুঝিবেন যে তাঁহার মদিরা সামান্য নহে, তাহা ঐশ প্রেমের মত্ততা—জ্ঞানের পাত্রে পীত হইতেছে। এই ঐশ প্রেমে তিনি মত্ত, সংজ্ঞাহীন, নিন্দাযশ-উদাসীন মাতাল। যাহারা শুধু বাহির দেখিয়া বিচার করে, মানুষটির অন্তরের পরিচয় পাইতে চাহে না, তাহারা ওমারকে বর্ব্বর, ইন্দ্রিয়দাস, চার্ব্বাকপন্থী মনে করিবে সন্দেহ কি? যখন পার্থিব প্রেম উন্নত হইয়া ঐশ প্রেমের অভিমুখী হয়, তখন উভয়ের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না। আমি যখন রবিবাবুর এই গানটি প্রথম শুনি,—

"তুমি দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে
* * *
আমার পরাণ পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে?
* * *
দাঁড়াও যেথানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে?"

তখন মনে হইয়াছিল ইহা কোনো বিরহী প্রেমিকার ব্যাকুল গাথা! কিন্তু পরে জানিলাম ইহা কবির ব্রহ্মবিরহের ব্যাকুলতা! আবার—

"এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত, তাপিত চিত,
নাথ হে ফিরে এস!"

গানটিকে আমি ব্রহ্ম সঙ্গীত ভিন্ন,—ভগবানের মিলনের জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা ভিন্ন—আর কিছু মনে করিতে পারি না; মনে করিতে কেমন ক্লেশ অনুভব করি। এই দুইটি গান নমুনা মাত্র, আরো কত গান এমনি ভাবে রচিত যে তাহা প্রিয় ও দেবতাকে তুল্যভাবে নিবেদন করিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই এক স্থানে লিখিয়াছেন—

——————"প্রেম গীতি হার
গাঁথা হয় নর নারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে· প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

ওমারের ধর্ম্মমতও এমনি জটিল, তাঁহার প্রেম এমনি নির্ব্বিচার—তাহা প্রিয়ের মধ্যে দেবতাকে এবং দেবতার মধ্যে প্রিয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের মত স্বল্পপ্রাণ ধূলিলুণ্ঠিত জীবদিগকে ভ্রমে ফেলিয়াছে। এই উচ্চ প্রেমের সহিত স্বাধীন চিন্তা সংযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সমাজের কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের মহা বিরোধী করিয়াছিল, কাজেই তিনি সমসাময়িকদিগের নিকট অধার্ম্মিক রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণ যে সকল সমাজের গণ্ডি ছাড়াইয়া বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পরিচয় তাঁহার শ্লোকে পাওয়া যায়—

গোলাপ যদি না ফুটে স্বরগে আমার
আয়োজন করি দিব কাঁটার বাহার।
জপমালা পুজাসন মিলে গো যদি না,
খৃষ্টানের গির্জ্জা ঘণ্টা করিব না ঘৃণা।
মন্দির মসজিদ, তুল্য উপাসনা স্থান
গির্জ্জা ঘণ্টা করে' থাকে তাঁহারি সন্ধান।
কাবা ও মন্দির, ক্রুশ জপমালা আর
ভিন্ন ভাবে বিশ্বব্যাপী উপাসনা তাঁর।

একটি কিংবদন্তি আছে, এবং তাহা শাহরজোরি, বোগদাদের মহম্মদ এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য বিশিষ্ট লেখক কর্ত্তৃক সমর্থিতও হইয়াছে যে তিনি মৃত্যুর সময়ে বলিয়াছিলেন, তিনি যে সত্যপথ-ভ্রষ্ট হইয়া দূরে ঘুরিতেছিলেন, তাহাতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুশয্যাতে ওমার একখানি দার্শনিক গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমবেত বন্ধুবর্গকে তাঁহার শেষ আত্মপ্রকাশ শুনিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যখন সকলে সমবেত হইলেন, তখন তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে উপাসনা শেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে পরমেশ্বর, আমার যথা-শক্তি, যথা-জ্ঞান আমি তোমাকে জানিয়াছি, অতএব আমার সকল ত্রুটি ক্ষমা কর। তোমার সত্তা উপলব্ধিই তোমার নিকটে আমার প্রধান সুপারিশ।' তার পরে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া অমরধামে যাত্রা করিলেন—

শ্রান্ত করিয়াছে মোরে আমারি নীচতা,
অন্তরের দুঃখ ও আত্মার এককতা।
হে ঈশ্বর, শূন্য হ'তে সত্তা লও টানি,
তোমার সত্তায় লহ মোরে শূন্য মানি।

ওমার পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন। একটি কিংবদন্তি আছে যে একদা তিনি একটি ভগ্ন পাঠশালায় কয়েকজন ছাত্র-পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন একটি গর্দ্দভ ইটের ভার বহন করিয়া সেই পাঠশালায় প্রবেশ করিতেছে। ইহাতে কবি ওমার নিম্নলিখিত শ্লোক উচ্চারণ করেন—

হে বিজ্ঞ গর্দ্দভ, তুমি গিয়েছিলে সোজা,
ফিরিয়া এসেছ কুব্জ পিঠে বহি বোঝা।
নাম তব লুপ্ত এবে যত নাম মাঝে
নখ সব জুড়ো হ'য়ে খুর সে হয়েছে।
দীর্ঘ তব দাড়ি ছিল, পিঠে সরে' আজ
সরু হ'য়ে হ'য়ে গেছে মনোহর ল্যাজ।

ইহা শুনিয়া ছাত্রবৃন্দ সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলে ওমার বলিলেন যে এই গর্দ্দভ পূর্ব্ব কোন জন্মে এই পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি গর্দ্দভ আকারেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। ইহা কবিবরের পরিহাস কি দৃঢ়বিশ্বাস তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন নহে, কারণ কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

যেই সুরা কর পান, যেই ওষ্ঠে খাও চুম্
শেষ হয় সর্ব্বশেষে তিনি সে শাশ্বত ওঁ।
আজো তুই, কালো ছিলি,
থাকিবি এমনিতর
আগামী কালেও তুই, তবে
কেন ভয় কর?

———

এই যে শিবির এতে দিনেকের তরে
যমালয়যাত্রী রাজা বিশ্রাম করিয়া
চলে যায়, আঁধার ফরাশ থাকে পড়ে
নূতন অতিথি তরে আবার সাজিয়া।

———

মিথ্যায় মৃত্তিকা হতে গড়ি এই দেহ
ভগ্ন করি ফেলিবে না নিশ্চয় জানিয়ো।

যেই পাত্র হতে সুখে করে শিশু পান
ক্রোধেও ভাঙ্গিয়া নাহি করে খান খান।
তিনি যিনি নিজহাতে গড়িলা এ বাটি
রাগ করি ভাঙ্গিবে না জানো তথা খাঁটি।

জ্যোতিষ কবি যখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং 'যৌবনের গ্রন্থ বন্ধ হইয়াছিল', তখন তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও অনেককে যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল থাকিয়া বার্দ্ধক্যে পরম ঈশ্বরপরায়ণ হইতে দেখা যায়; ইহার কারণ হয় তাঁহারা স্বাধীন বিচার দ্বারা ধ্রুব সত্যে উপনীত হইয়া থাকেন, বা বার্দ্ধক্যে চিন্তাশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ায় প্রচলিত গণ্ডির মধ্যে ধরা দিয়া থাকেন। কিন্তু ওমারের এই দুয়ের একটাও ঘটে নাই। তিনি এত ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন যে সকলের চক্ষে তিনি অধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ইহা প্রাচ্য প্রকৃতির অনুযায়ী প্রেমে একাগ্রতা ও মত্ততা প্রাচ্যের স্বভাব। পারস্যের দরবেশ ও শুফি সম্প্রদায়, ভারতের বাউল সম্প্রদায় প্রেমের মত্ততায় চিরপ্রসিদ্ধ। ওমার বলিয়াছেন—

বিগ্রহ বলিল ডাকি ভক্ত পূজকেরে
'কেন ভক্ত পূজ মোরে নির্জীব পস্তরে'?
ভক্ত কহে, 'তব নামে যাঁরে আমি ডাকি
তোমারি মাঝারে আমি তাঁহারেই দেখি'।

পুনরপি—

একদা আমার আত্মা কহিল কাতরে
'সারধর্ম্ম শিখাও হে মোরে কৃপা করে'।'
আমি কহিলাম, 'শিখ আলিফ কেবল,
শিখিলে তাহার তত্ত্ব আয়ত্ত সকল'।*

অর্থাৎ 'আলিফ' পারস্য বর্ণমালার এবং 'আল্লা' শব্দের আদ্যাক্ষর। যিনি সর্ব্বাদি আল্লা তাঁহাকে জানিলেই সব জানা হয়।

তাঁহার উন্নতচিত্ততা এবং প্রচলিত নিয়ম ও কুসংস্কারের প্রতিকূলতার পরিচয় দিয়াছেন—

সারা সপ্তা তৃষ্ণা বারি যেই করে দান,
শুক্রবারে জলপানে নাহি অসম্মান
হয় তাঁর, ওহে ভাই ধর্ম্মধ্বজী শোন
মোর ধর্ম্মে দিন লয়ে ভেদাভেদ কোন
নাহি, আমি সব দিন সমতুল্য বুঝি
দিনের পূজক নহি, ভগবানে পূজি।

শুক্রবার মুসলমানদিগের পবিত্র দিন, সে দিন উপবাস বিধি; এইরূপ তুচ্ছ বিধিনিষেধ হিন্দুধর্ম্মকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ওমারের এই সত্যবাণী আমাদের হিন্দুমুসলমানের অবধান যোগ্য।

ওমার সাধুকর্ম্মী ও অদ্বৈতবাদী ছিলেন তাহার প্রমাণ—

মিথ্যাধর্ম্মে সাধু কর্ম্ম তুচ্ছ সূত্রে রত্ন সম,
যদি ভুলে গেথে থাকি, বলিবার আছে মম—
এক কভু দুই বলি ভ্রমে আমি পূজি নাই,
আমার মুক্তির তরে যথেষ্ট হইবে তাই।

ওমার বাহিক ক্রিয়াকলাপ পছন্দ করিতেন না—

উষার ছায়া না মিলাতে মনে হ'ল যেন
মদ্যশালার মাঝে ডাকি কহে কণ্ঠ কোন
মনের মাঝে সবার সেরা মন্দির থাকতে খাড়া
তন্দ্রা আতুর পূজক কেন বাইরে মাথা খোঁড়া?

তিনি বর্ত্তমানজীবী ও ভ্রান্ত ভবিষ্যবিশ্বাসী উভয়কেও তুল্যরূপে ঘৃণা করিতেন—

আজিকার তরে যারা করে শুধু আয়োজন,
কিংবা যার আজ ছেড়ে কালিকার প্রয়োজন,
আঁধার মিনার থেকে মোয়াজ্জিন ফুকারিছে
'মূঢ়! তোর পুরস্কার না হেথা না হোথা আছে'।

ওমার আত্মায় পরমাত্মার আভাস পাইয়া বলিয়াছেন—

একটা দুয়ার বন্ধ আছে চাবি পাইনা খুঁজে
পরদা একটা ফেলা আছে আছি চক্ষু বুঁজে,
আড়াল থেকেই তোমায় আমায় মৃদু কাণাকাণি,
বারেক হয়, পরেই মোদের নাহি জানাজানি।

ইহা রবীন্দ্রের—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চিরদিন কেন পাই না।"

গানটি স্মরণ করাইয়া দেয়। আবার ওমার বলিয়াছেন—

আমি মাঝে তুমি যে গো আড়ালে বসিয়া—
অন্ধকারে খুঁজি আলো দেখিব বলিয়া,
অমনি শুনি গো আমি তুমি ডেকে কও
'ওরে অন্ধ! তোরি মাঝে মোরে দেখে লও!'

ইহা হইতে বুঝা যায় ওমার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন।

স্বর্গ নরক বলিয়া যে কোন পৃথক স্থান নাই, নিজের মনই যে স্বর্গ নরক তাহা নিম্নের শ্লোকে ওমার বলিয়াছেন—

আত্মারে পাঠায়ে দিনু অদৃষ্টের মাঝে
পরজন্ম কথা কিছু জানিবার তরে।'
অবশেষে মোর আত্মা ফিরে মোর কাছে
উত্তরে 'নরক স্বর্গ আমারি ভিতরে!'

---

* "দেল্ গুফ্ত্ মারা ইল্‌ম্ লদন্নী হওস্ অস্ত্
তালিম্ কুন্ আগর তুরা দস্ত্‌রস্ অস্ত্।
গুফ্তম্ 'আলিফ' গুফ্ত্ দিগর হেচ্ মগো
দরখানা আগর কস্ অস্ত্ এক হরফ্ বস্ অস্ত্॥"

মিল্টনও বলিয়াছেন—

The mind is its own place
It can make a hell of heaven and a heaven
of hell.

স্বর্গনরক কাহাকে বলে ওমার তাহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

স্বর্গ সে ত' পরিতৃপ্ত বাসনার ছায়া
নরক আত্মার কালো আঁধারের কায়া
যে আঁধার হ'তে মোরা এসেছি বাহিরে
আবার ত্বরায় মোরা সেথা যাব ফিরে।

অনেকের মতে ওমার দুঃখবাদী ছিলেন। আমরাও দেখিতে পাই তিনি প্রেম দিয়া জগতের দুঃখ জয় করিবার প্রয়াসী—

ওগো প্রেম। তুমি আমি পরামর্শ করি তাঁর সাথে
বিষাদ নিয়মতন্ত্র জগতের নিতে পারি হাতে,—
তা হ'লে ভাঙ্গিয়া তাহা করি চুরমার; তারপর
মনের মতন করি গড়ে তুলি বিশ্বচরাচর!

সংশয় বিশ্বাসের প্রাণ; যাহার সংশয় নাই, তাহার বিশ্বাস মৃত; তাহার বিশ্বাস 'তন্ত্র মন্ত্র সংহিতার নিষেধের ডোরে বাঁধা পড়ে; তখন শুধু ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান আয়োজনই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে—ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন করাই যে ধর্ম্ম তাহা তখন মনে থাকে না। ওমারের ধর্ম্ম এরূপ ছিল না। বিধি নিষেধের বাধা বিরহিত স্বাধীন ধর্ম্ম তাঁহার ছিল; তাঁহার সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ জ্ঞানলিপ্সু আত্মার ব্যাকুলতা মাত্র। তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া সমাজের চক্ষে অধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্ব-দেব ছিলেন—প্রকৃতির প্রতিটি লীলায় ঈশ্বরের সত্তা ও বিকাশ অনুভব করিতেন।

"তাঁহারি সাধনা করি জীবে, অচেতনে,
যত ভুল যত ভ্রান্তি তাঁহারি সন্ধান।"

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত।

(সিরিউর ফরাসী হইতে)

১

বিলাতী ভাব ও বিলাতী শিক্ষা।

আমি যখন আলিগড়ের ইঙ্গ-প্রাচ্য কালেজ দেখিতে গিয়াছিলাম, আমার 'পাণ্ডা' একজন মুসলমান যুবক, প্রসন্নচিত্তে আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন; তিনি বলিলেন, অধ্যয়নের প্রণালী, 'বোর্ডিং'এর ব্যবস্থা, দৈনিক যাতায়াতকারী ছাত্র—সমস্তই ছোটখাট দুই একটা কথা বাদে, ক্যাম্‌ব্রিজকে মনে করাইয়া দেয়। এই কথার মাঝে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;—"অত্রত্য বিদ্যালয়ে ক্রিকেটের দল, ভারতের সকল ক্রিকেট-দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ * * * কলিকাতা ও বোম্বাইকে আমরা হারাইয়া দিয়াছি, এবং এই বৎসরে আমরা মাদ্রাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিব।" একথা সত্য, কিন্তু পার্শি ক্রিকেটদলের জন্য বোম্বাইও কম গর্ব্বিত নহে। ১৮৯৬ অব্দে, একজন রাজপুত রাজকুমার, ইংলণ্ডের বিজয়ী ক্রিকেটদলকে, তাহাদের নিজের দেশে, নিজের জমিতে হারাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে টাইম্‌সপত্র বলিয়াছিল;—এই যে জয়লাভ হইল, ইহাতে ইংরাজ-জনসাধারণের নিকট ভারত পরিচিত হইবে! এবং ঐ একই বৎসরে, একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সিভিল-সার্ভিস-পরীক্ষায় প্রথম আসন লাভ করেন, সমস্ত ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। ইহা কম কথা নহে। ভারত বিলাতীভাবে দীক্ষিত হইয়াছে। এখন ভারত, উহার প্রভুদের অপেক্ষাও বেশী বলবান, বেশী আধুনিক বেশী 'একেলে'। ইংরাজি শিক্ষার ফল ফলিয়াছে। এসিয়ার পুরাতন আদর্শ পিছনে পড়িয়া গিয়াছে! ব্যায়াম-ক্রীড়ার জয়! জীবনসংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নব্য-যুবকের দল তৈয়ারী হইতেছে! সামন্ত-তন্ত্রের পুরাতন রাজপুত, বড় বড় রাজা, বড় বড় শিকারী, বড় বড় যোদ্ধা, এখন তাঁহাদের পৌত্রদের মধ্যে হয় ত কোন একজন ক্রিকেটবিজয়ীকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু আমি বেশ কল্পনা করিতে পারিতেছি, দেব-ভক্ত, অতীতের ভক্ত, ভারতের সন্ন্যাসীরা, পবিত্র নদীতীরে বসিয়া যাঁহারা ধ্যানধারণায় মগ্ন থাকিতেন সেই সব মুনি ঋষিরা, এই নবজাত সামগ্রীকে বিস্ময়বিহ্বলনেত্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিবেন। জয়মাল্য ও প্রশংসাপত্রে বিভূষিত, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ, তাঁহাদেরই একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের চক্ষে "ভেড়ার লড়াইয়ের পশু" ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না।

মনে কর, একজন বোম্বায়ের ছাত্র, আর একজন কেম্ব্রিজের ছাত্র;—উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য আছে—প্রায়

কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। উহারা একই জননীর স্তন্যে বর্দ্ধিত; অধ্যাপকেরা ইংলণ্ড হইতে আইসে, একই শিক্ষার বিষয়, একই পাঠাভ্যাস, একই পরীক্ষা, একই ল্যাটিন গদ্য প্রবন্ধ, একই ল্যাটিন পদ্য, গ্রীক ল্যাটিন ভাষার কোন অঙ্গই বাদ পড়ে না। আমি যদি এই কথা ইন্দো-চীনের সম্বন্ধে বলিতাম, তাহা হইলে সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিত;—এ ত, খাঁটি ফরাসী-ভাব। কিন্তু আমি ভারতের সম্বন্ধেই বলিতেছি,— ইংরাজের সম্বন্ধেই বলিতেছি; ইংরাজ মেকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্রষ্টা; এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনিই দায়ী, তিনি জানিয়া বুঝিয়াই ইহা স্থাপন করেন। ইহার দ্বারা তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির মাথায় সজোরে লগুড়াঘাত করিয়াছেন।

ক্রিকেট্ ও পোলোর দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়, প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌশুলী ও সংবাদপত্র পরিচালক- এই "নব্য-ভারত,"—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্ত শিক্ষিত ছাত্রমণ্ডলী— ইহারা এক প্রকার মেকলের মরণোত্তর-জাত সন্তান।

য়ুরোপীয় লোকের দ্বারা এসিয়িকদিগকে শিক্ষাদান—ইহা একটি দুরূহ ও ভীষণ সমস্যা! এই সম্বন্ধে অনেকে জাপানের দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, আমি জানি। বাহ্যতঃ, এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই যেন সমস্ত মীমাংসা হইয়া যায়। জাপানীদের অভাবনীয় নূতন নূতন কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া এই অতি প্রাচ্য জাতির সম্বন্ধে আমরা বিস্ময়ান্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আত্মসাৎ করিবার ইহাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি! স্বাত্মীকরণে ইহাদের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, একেবারে সমস্ত জাতি-কে-জাতি ইস্কুলে ভর্ত্তি হইল। উহারা আমাদের প্রণালী, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের ভাষা, আমাদের অধ্যাপক, আমাদের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়াছে; এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এক বংশব্যাপী কালের মধ্যেই উহারা আমাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে— উহারা বলে, আমাদিগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরা মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে যে উহারা য়ুরোপীয় হইয়া গিয়াছে,—উহারা আপাদমস্তক আধুনিক ভাবাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা বাহ্যাকার মাত্র; বিলাতী ভাবটা শুধু উপরে-উপরে ভাসিতেছে। শুধু তাহা নহে, জাপান আপনার সীমা বুঝিয়াছে; সে সীমা লঙ্ঘন করিতে জাপান সাহস করে না। জাপান প্রথমে স্পর্দ্ধা করিয়া অসম্ভবকে অবজ্ঞা করিয়াছিল,—মনে করিয়াছিল, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই; তাহার দৃষ্টান্ত, জাপান মনে করিয়াছিল, নিজের ভাষা ছাড়িয়া, য়ুরোপীয় ভাষা গ্রহণ করিবে। এইরূপ সংকল্প করিয়াছিল বটে কিন্তু সে সংকল্প জাপান পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু মেকলের এরূপ ভীরুতা ছিল না। তিন সহস্র বৎসরের শিক্ষাদীক্ষাকে মেকলে একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় হইতে ভারতীয় ভাষাদিগকে দূরীভূত করিলেন বলিলেও হয়—অন্ততঃ উহাদিগকে বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে নামাইয়া দিলেন,—উহাদিগকে অন্তরালে রাখিলেন। কালেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, মুখ্যভাবে ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা সখের শিক্ষারূপে রহিল—উহা শেখা, না শেখা ছাত্রের ইচ্ছাধীন। জাপানের রাজমন্ত্রিরা যাহা করিতে সাহস করেন নাই, মেকলে তাহা নির্ভয়ে সম্পন্ন করিলেন। তিনি এমন একটা কাজ করিলেন যাহা বিস্ময়জনক; যাহার তুলনা অত্যন্ত বিসদৃশ; তিনি সমসাময়িক ভারতকে গড়িয়া তুলিলেন।

যে সময়ে মেকলে ভারতের হস্তে পাশ্চাত্য সভ্যতার রত্নরাজি ঢালিয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন সে সময়ে ভারতের লোক যদি অভিনব জাতি হইত, সেও এক কথা ছিল। কিন্তু ভারতের স্বকীয় ঐতিহ্য ছিল, সুদীর্ঘ ইতিহাস ছিল, খুব নিজত্ববিশিষ্ট, খুব মৌলিকধরণের তিন সহস্র বৎসরের বিদ্যাসম্পদ ছিল। ভারতের যে গভীর মৌলিকতা ছিল, সেরূপ মৌলিকতার পরিচয় জাপান কস্মিনকালেও দিতে পারে নাই। জাপান চীনের নিকট হইতে ধার করিয়া যে ঢিলেঢালা পোষাক পরিয়াছিল, যখনই দেখিল আর তাহাতে সুবিধা হয় না, অমনি সে খুলিয়া ফেলিল। টানাটানি করিয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া খুলিতে হয় নাই। সে পোষাক তাহার গায়ে আঁটিয়া ধরে নাই। কিন্তু পুরাতন ভারতের কথা স্বতন্ত্র। যে আর্য্যজাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় আসিয়া বসতি করে, সেখানে তাহারা অতীব উচ্চ, মৌলিক ধরণের দর্শনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিল;—উহাতে যাহা আছে

এবং যাহা নাই—এই উভয়েতেই মৌলিকতা প্রকাশ পায়। এবং বহুদিন হইতে, নিতান্ত অনক্ষর হিন্দুর নিকটেও অবিনশ্বর দর্শনের একটা দিক্ উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। এই ভাবে দৃষ্টি করিলে, হিন্দু-জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা অর্থ পাওয়া যায়—একটা সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমরা য়ুরোপীয়গণ অন্য প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা জীবনের ওরূপ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারি না। হিন্দুরা জন্ম-দার্শনিক। তাহারা মীনের ন্যায় দর্শন-সিন্ধুগর্ভেই নিয়ত বাস করে। কোন ক্ষুদ্রতম হিন্দুর পক্ষেও একথা খাটে। অসীম স্বপ্নরাজ্যে যদৃচ্ছা ভ্রমণ, উদ্দামনিরঙ্কুশ খামখেয়ালী কল্পনার পথে বিচরণ, অনন্তের জন্য আকুলতা, যথাযথতার বিপরীত পথে গমন, প্রত্যক্ষসত্যে অনাস্থা—এক কথায় অহিফেন ও গঞ্জিকায় পরিপুষ্ট বুদ্ধি—ইহাই হিন্দুর প্রকৃত ভাব,—ইহাই হিন্দুর অন্তরের অন্তস্তল। হিন্দু বিশুদ্ধ চিদাকাশে সন্তরণ করে। হিন্দু সহজ্ঞানের দ্বারা উচ্চ গণিততত্ত্বের আবিষ্কার করে। পৃথিবীর মধ্যে পাণিনীর ব্যাকরণ একটি পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী। কিন্তু সমস্ত এসিয়িক জাতির মধ্যে, হিন্দুর এক বিষয়ে যার পর নাই হীনতা পরিলক্ষিত হয়। দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধানের দিকে, হিন্দুর রুচি নাই—হিন্দুর পরীক্ষাসাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নাই—প্রত্যক্ষমূলক ঐতিহাসিক বুদ্ধি নাই।

আমি এ কথা বলি না, হিন্দুরা স্বাত্মীকরণে একেবারেই অসমর্থ, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। উহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু উহাদের ভাষা উহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়া, উহাদের ঐতিহ্যকে হঠাৎ ছেদন করিয়া ফেলা, উহাদের আধ্যাত্মিক ভূমি হইতে উহাদিগকে উন্মূলিত করা—ইহার মত দুষ্টতা আর কি হইতে পারে? ইহার দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই। আমি বোম্বায়ের কালেজে কতকগুলি ছাত্র দেখিয়াছি তাহারা ইংরাজি জানে, এবং তাহার উপর অধিকন্তু ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পারে। কিন্তু তাহারা সংস্কৃত জানে না। ইহা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার প্রয়োজনই বা কি? ইংরাজি শিক্ষা কি, হিন্দুর কৌলিক প্রথার উপর, হিন্দুর মানসিক প্রকৃতির উপর, মনের গতির উপর, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর, দেশের আব্হাওয়ার উপর জয়লাভ করিতে পারে? এতগুলা শত্রুর সহিত যুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার। তা ছাড়াও আর একটা আশঙ্কা এ সংগ্রাম শেষ হইবার নহে।

ইন্দো-চীনে এ বিষয়ে আমাদের কি কর্ত্তব্য একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। যখন "সাইগণের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম, আমি তত্রত্য শিক্ষাবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষের নিকট এই কথা উত্থাপন করায়, তিনি বলিলেন আক্ষরিক চীনে ভাষার শিক্ষা যে আমরা এখনও দিতেছি—ইহা আমাদের একটা ভারি ভুল হইয়া গিয়াছে, মহাশয়। ইহাতে করিয়া আমরা নিজেই চীনের প্রভাব প্রতিপত্তি দেশময় প্রচার করিতেছি।" আমি বলিলাম, "অধ্যক্ষ মহাশয়! আপনি তবে ফরাসী শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী? ফরাসী ভাষা শিখিলেই উহারা আমদের স্থানীয় ছোট ছোট সংবাদ পত্রে এই কথা পড়িবে যে, গবর্ণর সাহেব একজন দস্যু, কিংবা একটি আস্ত গাধা আরও কত কি অপবাদের কথা পড়িবে। আমরা ফরাসী আমরা জানি, এ-সমস্ত সিসিরো-ধরণের অতিরঞ্জিত আলঙ্কারিক কথা; কিন্তু দেশীয় লোকেরা এই সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে ঠিক্ বলিয়া বুঝিবে।" ভাবে বোধ হইল অধ্যক্ষ মহাশয়ের মতে, এই সমস্যার একমাত্র মীমাংসা—শিক্ষা একেবারেই রহিত করা।

পক্ষান্তরে, মেকলের বিশ্বাস ছিল, শিক্ষার অসাধ্য কিছুই নাই; তিনি যে যুগের লোক, যে দলের লোক—সেই যুগ ও দলেরই অনুরূপ তাঁহার এই বিশ্বাস। যে সময়ে ইংলণ্ডের উদার নৈতিকের দল নিজ বিশ্বাস অনুসারে অকুতোভয়ে কার্য্য করিতেন, মেকলে সেই উদারনীতি-যুগের লোক ছিলেন। সাম্রাজিক তন্ত্র কোন মতবাদের বাধা মানে না। উহারা স্বকীয় অধিকৃত উপনিবেশ রাজ্যগুলিকে লাট্দিগের ও ইংরাজ-শিল্পব্যবসায়ীদিগের পরিরক্ষিত মৃগয়াভূমি বলিয়া মনে করে। উহারা দেশের ধন ঐশ্বর্য্যের মূল উৎসের দিকে সোজা চলিয়া যায় এবং সেই উৎসকে নিজ করায়ত্ত করিয়া উহার মুখ ভিন্নদিকে ফিরাইয়া দেয়। উহারা বিনা সংকোচে দেশকে শোষণ করিতে থাকে। উদারনৈতিক দল,—মানবহিতৈষিতা ও ইংরাজ স্বার্থ—এই দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করে। দেশ-শোষণ অপেক্ষা সভ্যতা বিস্তারের দিকেই তাঁদের বেশী দৃষ্টি। ইংলণ্ড স্বীয় উপনিবেশ রাজ্যসমূহের প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন; উহাদিগকে বিপদে-

আপদে সাহায্য করেন, উহাদের উন্নতি সাধন করেন; এবং সেই রূপ উহারাও কৃতজ্ঞ হইয়া ঐ ঋণ শতগুণে পরিশোধ করে। এই সকল স্বাধীন ও সমৃদ্ধ উপনিবেশ রাজ্য মূল-রাজধানীর সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় করে। এই বিধান শুধু ভারতের সম্বন্ধেই বর্জ্জিত হইবে তাহার কোন হেতু নাই। মেকলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১০ জুলাই তারিখে পার্লেমেণ্টের সমক্ষে তাঁহার দলের কার্য্যপ্রণালী বিবৃত করিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহার সমস্ত পাঠ করিয়া দেখঃ—

"শুধু রাজ্যবিস্তার করিলেই যে লাভ হয় তাহা নহে * * প্রাচ্যদেশের বিশাল লোকসংখ্যার মধ্যে বিলাতী সভ্যতা বিস্তার করিতে পারিলে আমাদের যে কত লাভ হইবে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের কারবার সভ্য লোক-দের সহিত—বন্য অসভ্যজাতির সহিত নহে, সুতরাং আর' লাভ হইবার কথা। এসিয়িক প্রজাদিগকে আপনার সমান গড়িয়া তোলা, উন্নত করিয়া তোলা, ইহা অপেক্ষা ইংলণ্ডের উচ্চ উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? এই প্রকার জয়সাধনই শান্তিময় জয়সাধন—বর্ব্বরতার উপর জ্ঞানের বিজয়সাধন; এই সাম্রাজ্যই অবিনশ্বর—যেহেতু, ইহা আমাদের শিল্পের সাম্রাজ্য, আমাদের নীতির সাম্রাজ্য, আমাদের সাহিত্যের সাম্রাজ্য, আমাদের আইনের সাম্রাজ্য।"

এই কথার মধ্যে খুবই উদারতা, বাগ্মিতা ও মহত্ত্ব আছে, কিন্তু একটু জ্ঞানের অভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার লোকেরা বর্ব্বর নহে। হিন্দুরা অসভ্য বন্যজাতি নহে। উহাদের সম্বন্ধে মেকলের যে ধারণা, সে ধারণা এক্ষণে সভ্য-জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানকার লোকে, জাতিগত ও সভ্যতাগত প্রভেদের উপর বেশী বিশ্বাস স্থাপন করে;—কতকগুলি সুকথিত বীজমন্ত্রের অন্তর্নিহিত অলৌকিক গুণের উপর ততটা বিশ্বাস করে না। গায়ের রংকে যেমন সহজে বদলান যায় না, মনঃপ্রকৃতির গঠনকেও সেইরূপ সহজে পরিবর্ত্তিত করা যায় না।

আমার মতে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা উৎকৃষ্ট। কিন্তু হিন্দুরা এই সভ্যতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কি না. এই সভ্যতা তাহাদের উপযোগী কি না, তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি? উহাদের ঘাড়ে এই সভ্যতা পূরাপূরি চাপাইয়া দেওয়া আমাদের কতদূর ধৃষ্টতা! মেকলের নিকট এবং যাঁহারা তাঁহার মতাবলম্বী তাঁহাদের নিকট, এই সমস্যাটি অতীব সহজ। দুই শ্রেণীর লোক মানবজাতিতে আছে; এক সভ্য য়ুরোপীয়; আর এক—রূঢ়, সরল-প্রকৃতি অসভ্য জাতি, যাহারা আমাদের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে সুসংস্কৃত ও মার্জ্জিত হইতে পারে। ইহার জন্য কি করা আবশ্যক?—শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। শিক্ষালাভ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই, উহাদের চোখ্ খুলিয়া যাইবে, উহারা এই নূতন "সুসমাচার"কে উন্মত্ত ভাবে গ্রহণ করিবে এবং এই নব সভ্যতায় দীক্ষিত হইয়া, শ্রেষ্ঠ জাতির শিষ্টতা ও পরিস্ফুট জ্ঞানালোক সত্বর অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মেকলে, কলিকাতায় বড় লাটের মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যরূপে মনোনীত হইলেন। তিনি যে সকল মত পরিব্যক্ত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর পাইলেন।

একথা যেন মনে থাকে, এ দেশের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তি-গত কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাঁহার সঙ্কল্পগুলি জাহা-জেই স্থিরীকৃত হয়। যাঁহারা স্বকীয় কৃতপূর্ব্ব সিদ্ধান্তগুলি রাজাধিরাজের হুকুমের মত জোর করিয়া সমাজের মধ্যে চালাইতে চেষ্টা করেন, তিনি সেই শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ। যেরূপ সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে, ভাবী-ভারত সুশিক্ষিত হইতে পারে, নবজীবন লাভ করিতে পারে, স্বকীয় অদৃষ্টের প্রভু হইতে পারে, জাহাজ হইতে কলিকাতায় নামিবার পূর্ব্বেই, সেই সংস্কারের কল্পনা তাঁহার মনে স্পষ্টরূপে প্রতি-ভাত হইয়াছিল।

মেকলে ঠিক্ সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল। শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছিল তাহা অসম্বদ্ধ ও ভীরুতা-ব্যঞ্জক; কোথাও কোথাও সংস্কৃত কালেজ ও আরবী কালেজ স্থাপিত হয় এবং তাহার পরিপোষণের জন্য যে অর্থ নির্দ্ধারিত হয় তাহা যৎসামান্য এই শিক্ষা-সমস্যার কবে যে মীমাংসা হইবে তাহার কোন স্থিরতা ছিল না; কেন না, মীমাংসার ভার যে কমিটীর হস্তে ছিল, সেই কমিটী দুই দলে বিভক্ত; দুই দলেরই সমান সংখ্যা। একদল—প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী; অপর দল ইংরাজীশিক্ষার পক্ষপাতী। প্রথমোক্ত দলটির মধ্যে কতকগুলি সুযোগ্য ভারত-পক্ষপাতী লোক ছিলেন—

দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সাকারলাল দেশাই, এম্, এ, এল্, এল্, বি

তাঁহারা এই সমস্যা, উদারভাবে ও সর্ব্বসমন্বয়ের ভাবে মীমাংসা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—সংস্কৃত ও আরবী, এই দুই দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে উৎসাহ দেওয়া ও উহাদের পুনরুদ্ধার সাধন করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

কালেজ-সমূহের পরিপোষণের নিমিত্ত এবং পুরাতন প্রাচ্য সাহিত্য মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অল্পসল্প অর্থসাহায্য প্রদান করা যাউক। তা ছাড়া ইংরাজীশিক্ষা একেবারে উঠাইয়া না দিয়া, উহাকে দ্বিতীয় পদবীতে রাখা যাউক। লোকের যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইবে, সেই অনুসারে ইংরাজীশিক্ষা বিদ্যালয়ে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত করা যাইবে। ইংরাজীর পক্ষপাতী দল দেখিলেন, এরূপ করিলে ইংরাজীশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট সম্মান করা হয় না। কেবল ইংরাজীশিক্ষার দ্বারাই এদেশের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। এই সময়েই মেকলে অনুসন্ধান-সমিতির সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চমৎকার বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করিয়া ইংরাজীশিক্ষার সুবিধাগুলি বিবৃত করিলেন; তাঁহার সমস্ত শ্লেষবাক্য, তাঁহার সমস্ত ধৃষ্টতা, তাঁহার সমস্ত অজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া, দীন প্রাচ্য ভাষাকে একেবারে পদদলিত করিলেন— তিনি বলিলেন, এই সকল প্রাচ্যভাষা, নিকৃষ্টতর ভাষা, শিশুজনোচিত ভাষা, নির্ব্বোধ লোকের ভাষা,—বড়-জোর এই সকল ভাষা কৌতূহলের জিনিস্। এই অপবাদগুলি নিতান্তই অসঙ্গত। যাহাই হউক, ইহার একটা মীমাংসা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং মেকলে একটা মীমাংসার প্রস্তাব লইয়া আসিলেন। একটা কিছু স্থির করিয়া ফেলা আবশ্যক হইল, এবং মেকলে তাঁহার প্রস্তাবটি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে উপস্থিত করিলেন। এই পাশার "দানের" উপর ভারতের ভবিষ্যৎ স্থিরীকৃত হইল। তাঁহার মন্তব্য-লিপিটি আমার হাতে রহিয়াছে। সহজ কথায় সমস্যাটি এই;—"ইংরাজীশিক্ষা না দিয়া আমরা কি সেই সকল ভাষার শিক্ষা দিব যাহাতে এমন কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নাই যাহা আমাদের সহিত তুলনা হইতে পারে; আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্র থাকিতে, আমরা কি সেই সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা দিব যাহা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট; উপাদেয় দর্শনশাস্ত্র ও সত্য ইতিহাস না শিখাইয়া আমরা কি সরকারী ব্যয়ে সেই চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষা দিব, যাহা একজন ইংরাজ গোবৈদ্যের পক্ষেও লজ্জাজনক, আমরা কি সেই জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিব যাহা শুনিয়া আমাদের বালিকা-বিদ্যালয়ের বালিকারাও হাসিয়া উঠিবে; আমরা কি সেই ইতিহাসের শিক্ষা দিব যাহার মধ্যে এমন সব রাজার কথা আছে যাহারা ত্রিশ ফীট উচ্চ ত্রিশ হাজার বৎসর যাহাদের রাজত্ব কাল; আমরা কি সেই ভূগোল শাস্ত্রের শিক্ষা দিব যাহা দধি সমুদ্র ও ক্ষীর সমুদ্রের বর্ণনায় পরিপূর্ণ?" একথা যদি বল, তবে বাইবেলকেও মেকলের বাদ দেওয়া উচিত। "অঙ্গীকৃত ভূমি"তে যে দুগ্ধ-নদীর কথা আছে সে বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য? মেকলে মনে করেন, ছেলে-মান্‌সি কথা শুধু হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই আছে। তৌলদণ্ডের একদিকে হিন্দু গ্রন্থ এবং অন্য দিকে ইংরাজি গ্রন্থ রাখিয়া তিনি এইরূপ বলেনঃ—"দেখিতেছ না, ওজনে কোন গ্রন্থের ভার বেশী?" কথাটা সত্য; এবং মেকলেও একজন মনস্বী লোক ছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে পারে;—মানিলাম, আমাদের গ্রন্থ তোমাদের গ্রন্থের মত অত উৎকৃষ্ট নহে; তাই বলিয়া উহা কি আমাদিগকে পাঠ করিতে নিষেধ করিবে? ঐ সকল গ্রন্থ আমাদের জাতীয় বাল্যকালের স্মৃতি-সামগ্রী। আমরা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিব না কেন?—অবশ্য পাঠ করিব—উহার পৌরাণিক জঞ্জাল হইতে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া লইব।

মেকলে আরও এই কথা বলেনঃ—"যদি ইংরাজ সরকার সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করেন এবং সরকারী খরচে, ঐ দুই ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে মনে হইবে যেন হিন্দুধর্ম্মেরই প্রচারে সাহায্য করা হইতেছে।" কি ভীষণ ব্যাপার! দেখিতেছ না, তাহা হইলে প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারির দল-কে-দল ক্ষেপিয়া উঠিবে! সরকারের যে প্রথম কর্ত্তব্য ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীনতা রক্ষা করা, সেই কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে। একটা গাধাকে স্পর্শ করিলে, কিংবা একটা ছাগলকে বধ করিলে, বেদের কি মন্ত্র পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, হিন্দুদিগকে সেই সব কি আমাদের শিখাইতে হইবে? না, তোমাদের তাহা শিখাইতে হইবে না। এখন কথা হইতেছে, হিন্দুদের অর্থব্যয়ে

হিন্দুদের পবিত্র প্রাচীন গ্রন্থ সকল যদি ছাপান যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া লোকে কি জন্য তোমাদিগকে সন্দেহ করিবে? করদাতা হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যে সরকারি তহবিল পরিপুষ্ট হয়, সেই তহবিল হইতে অর্থ লইয়া হিন্দুরা যদি হিন্দু ধর্ম্মের পুষ্টি সাধন আবশ্যক মনে করে, ইংরাজের তাহাতে বাধা দিবার কি হেতু আছে?—কেন না, ধর্ম্ম বিষয়ে ইংরাজ ত উদাসীন। * * * *

মেকলের এই যুক্তির মধ্যে একটা বাহ্য চটক ভড়ং আছে। বড়-জোর উহার দ্বারা মিশনারিদিগের নিকট হইতে খুব বাহবা কুড়ান যাইতে পারে। কিন্তু আর একটা যুক্তি যাহা খুব দৃঢ়তা ও আবেগের সহিত বিবৃত হইয়াছে তাহা এই:—"সরকারি অর্থ লুণ্ঠন করিবার জন্যই কতকগুলা নিকৃষ্ট পুস্তক ছাপাইবার জন্য, অসঙ্গত অদ্ভুত ইতিহাসকে, অযৌক্তিক দর্শনশাস্ত্রকে, হাস্যজনক পরমার্থ বিদ্যাকে কৃত্রিম উৎসাহ প্রদান করিবার জন্যই কি আমাদের এই সমিতি গঠিত হইয়াছে?" তোমার বিশ্বাস, একজন ইংরাজ ডাক্তার এই কথা বলিতেছেন; কিন্তু সে ভুল করিও না—আসলে ইহা স্বয়ং মেকলেরই কথা:—হিন্দু মনোবিজ্ঞান, স্বপ্নদর্শী হিন্দুদের দুঃসাহসিক ও গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা, পরমার্থ-বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, বেদ, ভগবদ্গীতা, কপিল ও বুদ্ধের উপদেশ, চিত্তবিমোহন কথা-উপাখ্যান! সমস্তই যারপর নাই অযৌক্তিক, অসঙ্গত, হাস্যজনক!

কিরূপ ধারণা হইতে এই সক্তির উৎপত্তি তোমরা বোধ হয় জান! সে ধারণাটি এই:—সমস্ত জগতের শিক্ষার ভার আবার য়ুরোপের হাতে আসিয়াছে। কেন না, য়ুরোপের সভ্যতা শুধু উৎকৃষ্ট নহে, উহা আবার সহজে ও অবিলম্বে অন্য দেশে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা দিলে, ভারতকে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ লোকের সংসর্গে আনা হইবে। সেই বহুমূল্য রত্নভাণ্ডারের চাবি তাহার হাতে দেওয়া হইবে, যে ভাণ্ডারে বিভিন্ন সভ্য জাতির অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার বহুশতাব্দি হইতে সঞ্চিত হইয়া আছে। প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতী লোকেরা দেখিলেন—সমূহ বিপদ উপস্থিত। য়ুরোপীয় শিক্ষাদীক্ষায় হয়ত বিশেষ কিছু ফল হইবে না কিংবা হয়ত যাহারা চিরন্তন প্রথা ও দেশাচারের বশীভূত, অভ্যাসের দাস, জাতিকুল দেশকালের সহিত যাহারা ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই সকল হিন্দু একেবারে মার্গভ্রষ্ট হইবে—তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। মেকলে ইহার উত্তরে, অতীব শোভন ভাবে ষোড়শ শতাব্দিতে "পুনরভ্যুত্থানের" (renaissance) দৃষ্টান্ত, সপ্তদশ শতাব্দির রুসিয়ার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। চল্লিশ বৎসর পরে, তিনি জাপানের দৃষ্টান্তও দেখাইতে পারিতেন।

আমাদের লেখকদিগের উপর পুনরুত্থানের প্রভাব এত অধিক যে সেই প্রভাব আমাদের সাহিত্য-ইতিহাসকে ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিয়াছে; সেই দুই যুগ আবার যে যোড়া লাগিবে তাহার জো নাই। কিন্তু যাই হোক, ফলে কি ঘটিয়াছে?—পুরাতন ভাষাগুলি আমাদের ভাষার স্থলাভিষিক্ত হওয়া, দূরে থাক্—আমাদের ভাষাকে শুধু নমনীয় ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মেকলে চাহেন, ভারত নিজের ভাষাকে, নিজের পুরাতন সাহিত্যকে, নিজের দর্শনকে, নিজের দেবতাদিগকে, নিজের সমস্ত অন্তরাত্মাকে প্রত্যাখ্যান করুক। গর্ব্বিত ভারতবাসী, তোমার গর্ব্বকে একটু খর্ব্ব কর * * * যদি মনে কর যোড়শ শতাব্দিতে ফরাসীর পরিবর্ত্তে গ্রীকভাষা প্রবর্ত্তিত হইত, "Paradis"র বদলে "ওলিম্পিয়া" স্থাপিত হইত, তাহলে কতকটা বুঝিতে পারিতে মেকলে কি বিপ্লবকাণ্ড করিয়াছেন। প্রাচ্য শিক্ষাবাদীদের ভিত্তি দৃঢ় ছিল, "পুনরুত্থান" ও রুসের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের নিকট বলা বৃথা। কেন না, তাঁহারা ঠিকই মীমাংসা করিয়াছিলেন যে জাতীয় ভাষা ও বাক্-পদ্ধতি বিদ্যাশিক্ষার পত্তনভূমি হইবে এবং তাহার সঙ্গে, ইচ্ছা করিলে, ইংরাজীভাষাও শিখান হইবে।

মেকলে যে কাজ করিয়াছেন তাহার দূর-পরিণাম ও গুরুত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক্। মাতৃ ভাষার স্থলে বিদেশী ভাষা প্রবর্ত্তিত করিলে, জাতীয় মনকে বিগড়াইয়া দেওয়া হয়—শুধু তাহা নহে, জাতীয় মনের জীবন্ত উৎস শুষ্ক করিয়া তাহার মৌলিকতাকে নষ্ট করা হয়। কেন না, কোন ভাষাকে পরিত্যাগ করিলে তদন্তর্গত শিল্প-কল্পনাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, দার্শনিক চিন্তাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই ভাষার বিশেষ ধরণে যে নীতিতত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহাও পরিত্যাগ করিতে হয়। সত্য কথা বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা পাগ্‌লামি আর কিছু হইতে পারে না। ভারতের প্রাচীন রচনাবলী অপূর্ব্ব উপাখ্যান ও চিত্রোপমরূপকে পরিপূর্ণ—

সেই মানসিক 'সার-ভূমি' হইতেই হিন্দু-শিল্প অঙ্কুরিত, মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পী ব্রাহ্মণিক চিত্র শালায় এক একটী নূতন মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিল। আর এখন সেই সব পুরাতন সাহিত্যরচনা বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা হইতে বহিষ্কৃত হইবে! একথা সভ্য, ইংরাজ সরকারের একটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল। ইংরাজ সরকার মনে করিয়াছিলেন, দেশীয় শিল্পকে আবার নবীকৃত করিবেন—'কিন্তু কি প্রকারে?—য়ুরোপ হইতে 'মডেল' আনিয়া। আলঙ্কারিক শিল্প ও পুরাকালের প্রাচীন শিল্প-রচনা সকল পরিত্যক্ত হইল। যে দিব্য ভাবোচ্ছ্বাস হইতে, বৌদ্ধ গুহা-মন্দির, জৈনদিগের শ্বেতমঠ, বিরাটাকৃতি দেবালয় সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যবিশিষ্ট মসজেদ---এই সকল পরমাশ্চর্য্য শিল্প ভারতের পুণ্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে,---বিলাতী ভাস্কর ও বাস্তু শিল্পীগণ তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কিংবা পুনরুৎপাদন করিতে না পারিয়া, ইংরাজ-রাজমিস্ত্রিরা, "লোকোমোটিভ ডেপোর" ও আদালতের ইমারৎ সকল যে 'নকল-গথিক' রীতি-অনুসারে যদৃচ্ছাক্রমে নির্ম্মাণ করে, সেই নকল-গথিকের রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে চাহিলেন। নৈতিক শিক্ষা ও দার্শনিক শিক্ষার কথা আর কি বলিব! এ দেশে দর্শন ও নীতিশাস্ত্র পরমার্থ বিদ্যার পরিচায়ক মাত্র। ধর্ম্মভাবরূপ শক্তিমান পক্ষের সাহায্যে, সন্ন্যাসী, যোগী ও দার্শনিকেরা চিন্তার অনন্ত আকাশে অবাধে উড়িয়া বেড়ান। এদিকে ইংরাজ-সরকার সমস্ত শিক্ষাকে লৌকিক শিক্ষায় ও অপরমার্থিক শিক্ষায় পরিণত করিলেন। তাহার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজ সরকার, যেমন এক হস্তে হিন্দুদের নিকট হইতে শাস্ত্রাদি লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তেমনি অপর হস্তে তাহাদিগকে বাইবেল দিতে পারিলেন না। মনে করিয়া দেখ, ইহাতে হিন্দুর মনোরাজ্যে যেরূপ বিপর্য্যয় ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইল।

অতৃপ্ত ও ক্ষুধাকুল কল্পনার নিকট বিশুদ্ধ "জ্ঞানান্নের" ও প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টধর্ম্মের হিত-বাদ নীতির কি কোন আকর্ষণ থাকিতে পারে? হিন্দুরা হয় বহুদেববাদী, নয় জগৎব্রহ্মবাদী। আমাদের ঈশ্বর, যিনি পর্য্যায়ক্রমে প্রখ্যাত যাদুকর ও 'দশ-আদেশের' রক্ষক, এরূপ ঈশ্বরকে হিন্দুরা বুঝিতে পারে না। আমাদের এই ধর্ম্মটা কিরূপ?---ইহা সাংসারিক লোকদিগের ব্যবহার্য্য একটা লৌকিক দর্শনশাস্ত্র। এই সকল ধ্যানপরায়ণ হিন্দুদের নিকট, এই ধর্ম্ম চিরকালই অনাত্মীয় ও অপরিপাচ্য রূপেই থাকিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা।

আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ যে সকল প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয় তাহা বিদেশী প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ব্যয়সাধ্য, সুতরাং বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদিগের চিরপ্রচলিত প্রণালীগুলি কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে উন্নত করিয়া সহজ ও সুলভ করা আবশ্যক। জর্ম্মাণি, যাভা, মরিশস্ প্রভৃতি স্থান হইতে সুলভ চিনি বহুল পরিমাণে আমদানি হওয়ায় আমাদিগের বিশুদ্ধ স্বদেশী চিনি মহার্ঘতাহেতু লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছে। যদ্যপি বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কেহ প্রকৃত কারণানুসন্ধানে উদ্যোগী না হওয়ায় এ বিষয়ের চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না। সামাজিক শাসন বা অন্যান্য বিবিধ উপায়ে এই ব্যবসায়ের ভিত্তি দৃঢ় করিবার অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ইহার প্রস্তুতপ্রণালীর বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য না থাকায় আমরা কার্য্যক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আমাদিগের দেশে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে। তথাকার সামান্য কুলি মজুরের পারিশ্রমিক এখানকার ক্ষুদ্র কেরাণী বাবুদের সমতুল্য; বরং অধিক, তথাপি কম নহে। কার্য্য-কুশল ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। এখানে ১০৲ ১২৲ টাকায় যে ফিটার (মিস্ত্রী) বা ৩০৲ ৪০৲ টাকায় যে প্যান-ম্যান পাওয়া যায় উহার চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ বেতনেও সেখানে সেরূপ লোক পাওয়া সুকঠিন। কারখানা করিবার উপযুক্ত স্থানের দুর্ম্মূল্যতা এখানকার হিসাবে অনেক বেশী; গৃহাদি নির্ম্মাণ ব্যাপারেও তদ্রূপ—অবশেষে সমুদ্রপথে এখানে মাল পাঠাইবার খরচাও বড় কম নহে। এই সকল এবং অপরাপর অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়াও যে বিদেশী

বণিকেরা আমাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় অনায়াসে লাভবান হইতেছেন তাহার কারণ কি ?

অধুনা স্বদেশী আন্দোলনে উৎসাহিত হইয়া অনেকে চিনির ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পুরাতন দেশীয় প্রণালী বা কলকারখানার সাহায্যে রাব (গুড়,) সক্কর (raw sugar) প্রভৃতি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত করিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা চিনির কুঠীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সম্ভাবনা কোথায় ?

যে সকল কারখানাতে পূর্ব্বোক্ত উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, তৎসংলগ্ন Distilleryই উহাদের স্থায়িত্বের প্রধান উপায়। কেবল চিনির আয় উহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, লাভ ত দূরের কথা। Distilleryর আয়ে কোন গতিকে লোকসান পুরাইয়া কিঞ্চিৎ লাভ হয় মাত্র। জর্ম্মাণির সহিত প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডের কারখানা সমূহের অবনতির ইহাই একমাত্র কারণ। জর্ম্মাণি, মরিশস্ প্রভৃতি স্থানে একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, ইংলণ্ডের অধিকাংশ স্থলে রাব, সক্কর ইত্যাদি উপাদান হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহাদের ব্যয়বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে আমাদের দেশে এই ব্যবসায় স্থায়ী ও উন্নত করিতে হইলে, নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিতঃ—

(ক) প্রধানতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়— জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইক্ষু আবাদ করিয়া তাহা ষ্টীম পরিচালিত কলের সাহায্যে মাড়িয়া ইক্ষুরস হইতে একবারে চিনি প্রস্তুত করা— ইহাতে চিনি প্রতিমণ ২৷৷০, ৩৲ টাকা খরচে প্রস্তুত হইতে পারে।

(খ) এতদভাবে ইক্ষু খরিদ করিয়াও কাজ চালান যাইতে পারে—ইহা মধ্যমতর উপায়—ইহাতে প্রতি মণে ৬. ৬৷৷০ টাকা হিসাবে পড়তা হইবে।

উপরি উক্ত উপায় অত্যন্ত সহজ হইলেও সাধারণ গৃহস্থ বা অল্প পরিমাণে প্রস্তুতকারকদিগের আয়ত্তাধীন নহে। জমিদার, ধনীমহাজন বা যৌথকারবারী কেবল ইঁহারাই মনোযোগ করিলে উক্ত উপায়ে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবেন। যেহেতু একটী সামান্য কারখানা স্থাপন করিতে হইলেও অন্ততঃ পশ্চিমাঞ্চলের মাপের ৪০০/০ চারিশত বিঘা জমি আবশ্যক। প্রতি বৎসর ২০০/০ দুইশত বিঘা জমিতে ইক্ষু আবাদ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ আগামী বৎসরের ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী করিতে হইবে। ১৫ই পৌষ হইতে ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত ইক্ষু মাড়াই করিবার প্রশস্ত সময়। এই অল্প কালের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে তদুপযোগী নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১। যন্ত্রাদি।

প্রধানতঃ steam পরিচালিত crushing plant (মাড়াই কল) একটী এবং vacuum pan একটী বিশেষ আবশ্যক, এই দুইটা অধিক মূল্যবান। তদ্ব্যতীত turbine (তুরপিন) ২।১টী ও অন্যান্য খুচরা কয়েকটী জিনিষ অল্প ব্যয়েই হইতে পারে। সর্ব্ব মোট আনুমানিক ৩০০০০৲ ৩৫০০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্রাদির সাহায্যে ২০০ দুইশত বিঘার উৎপন্ন ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুতকার্য্য সমাধা হইতে পারে। এই উপায়ে প্রত্যহ আন্দাজ ১০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইবে।

২। আবাদের প্রণালী।

সাধারণ গৃহস্থেরা বা কৃষকেরা যেরূপ ভাবে আবাদ করে, তাহা অপেক্ষা উন্নত (বৈজ্ঞানিক) উপায়ে আবাদ করিতে হইবে। কৃষকেরা সারাদি (manure) অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং যাহা কিছু অভিজ্ঞতা আছে তাহাও অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে অক্ষম, সুতরাং ইহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই। যদি জমিতে সময়ানুযায়ী আবশ্যক মত সারাদি নিক্ষেপ করা যায় এবং জমির উৎপাদিকা শক্তিবৃদ্ধির অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে শেষে অত্যধিক পরিমাণে ফল লাভ হইবে। সর্ব্ব প্রথমে এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকা উচিত।

৩। ইক্ষুমাড়া

গৃহস্থেরা গরু দ্বারা চালিত যন্ত্রে মাড়াই করে। ইহাতে ১০০/০ মণ ইক্ষু হইতে প্রায় ৫০/০ মণের অধিক রস বাহির হয় না। কিন্তু বাষ্পপরিচালিত পেষণযন্ত্রে ঐ পরিমাণ ইক্ষু হইতে ৮০/০ মণ পর্য্যন্ত রস বাহির হইতে পারে অর্থাৎ দেড় গুণ অধিক রস পাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রকরণে আবাদ ও এই প্রকারে মাড়াই হইলে উৎপন্ন রস

ধারণতঃ গৃহস্থেরা যে পরিমাণে পাইয়া থাকে, তাহার তিন গুণ অধিক হইবে। রসই চিনির উপাদান— মাদিগের দেশে এত রস কম আদায় হয় বলিয়াই চিনির য় এত বেশী পড়িয়া যায়।

৪। রস হইতে একবারে চিনি।

গৃহস্থেরা ইক্ষুরস হইতে রাব বা গুড় তৈয়ারি করিতে তিমন প্রায় ১৲ টাকা হিসাবে খরচ করিয়া থাকে; ইহাতে নের মূল্য ২॥০, ৩৲ টাকা বেশী হয়: কারণ ২॥০ মণ মণ রাব বা গুড় না হইলে ১৷০ মণ চিনি হয় না। ন একবারে রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, তখন স্থেরা রাব তৈয়ারি করিতে যে খরচ করে, তাহা সম্পূর্ণ রর্থক। যে খরচে রাব হয়, সেই খরচেই নূতন উপায়ে নি তৈয়ারি হইতে পারে।

৫। পাক-প্রণালী।

দেশীয় প্রণালীতে আমরা চিনি কম পাই, তাহার প্রধান রণ আরও দুইটী ঃ—

(ক) চিনি সত্ত্ব প্রস্তুত না হওয়ায় রসে এসিডের বা ম্লের অংশ বেশী জন্মায়—অম্লাধিক্য হইলে চিনি উৎপন্ন ম হয়।

(খ) রসটী তিনবার কড়া জ্বালে পাক করিতে হয় ইহাতে চিনির রং অপেক্ষাকৃত কাল হয়) এবং কড়াপাকে তক অংশ জ্বলিয়া যাওয়ায় উৎপন্ন চিনির পরিমাণও কম । কিন্তু ষ্টীম পরিচালিত Vacuum Panএর পরিমিত াচে একবার মাত্র পাকাইলেই ঐ উপাদান হইতেই রিষ্কার চিনি অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। সুতরাং ই পাক-প্রণালীই উত্তম ও লাভজনক।

৬। রিফাইন বা পরিষ্কারকরণ।

বিদেশে যে সকল চিনি প্রস্তুত হয় তাহা প্রায়শঃ Bone harcoal বা হাড়ের কয়লার দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। ামাদের দেশীয় প্রথা মতে এই অস্পৃশ্য বস্তুর কোন আবশ্যক ই। ইহার পরিবর্ত্তে সাধারণ শেওলা (বা পাটা বা মার) দ্বারা অতি সুন্দররূপে, বিশুদ্ধভাবে চিনি পরিষ্করণের ার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইহা অপেক্ষা সহজ ও উৎকৃষ্টতর উপায় ার দেখা যায় না। বিদেশী চিনি দেখিতে যতই পরিষ্কার হউক, উহার স্থায়িত্বগুণ কম, অল্প সময়ের মধ্যে বস্তা রসিয়া যায় ও এসিড আক্রমণ করে। তখন ঐ চিনি হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়; সুতরাং পূর্ব্বেকার ন্যায় তত কার্য্যোপযোগী থাকে না। কিন্তু শেওলা দ্বারা পরিষ্কৃত দেশী চিনি অনায়াসে তদপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয় এবং তাহাতে সদ্‌গন্ধ ব্যতীত কখন কোন প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। অতএব রিফাইন করা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় প্রথাই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য।

আমরা বিদেশী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যে সকল কারণে সমর্থ নহি, তাহা এই—প্রথমতঃ, আবাদের সময় জমির উর্ব্বরতার প্রতি লক্ষ্য না থাকায় উৎপন্ন কম হয়, দ্বিতীয়তঃ, মাড়াই কার্য্যের অসম্পূর্ণতা হেতু রস অনেক কম পাওয়া যায়; তৃতীয়তঃ কড়াপাকে রস জ্বাল দেওয়ার দরুণ রং খারাপ হয় এবং অনেক জলতি বাদ যায় আর গুড় করিয়া তাহা হইতে চিনি তৈয়ারি করিলে তদুপরি আরও কিছু অনর্থক খরচা বাড়িয়া যায়। অতএব দেখা গেল, নিম্নলিখিত উপায়ে পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিসমূহের প্রতীকার হইতে পারে;—

(১) নিজ আয়ত্তাধীনে উপযুক্ত পরিমাণ জমি রাখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ করা।

(২) ষ্টীম পরিচালিত কলে মাড়াই কার্য্য সম্পন্ন করা।

(৩) ষ্টীমের আঁচে Vacuumএ রস পাক করা।

(৪) শেওলা দ্বারা রিফাইন করা।

তাহা হইলেই অতি সুলভে উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ চিনি নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইবে।

আমরা কারবারসূত্রে ত্রিহুত অঞ্চলের সাকরি মোকামে আছি। এখানে অধিক পরিমাণে ইক্ষুর আবাদ হয় সুতরাং রাব ও (গুড়) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গত পৌষ মাসে আমরা উপরি উক্ত প্রণালীতে ইক্ষুরস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার Experiment করিয়া বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছি। অবশ্য আমাদের আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির অভাবে সাধারণ নিয়মে বলদের দ্বারা ইক্ষু মাড়াই করিতে হইয়াছিল এবং কড়া পাকে রস জাল দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পরীক্ষার ফলাফল।

১০০/০ মণ ইক্ষুতে ৬২॥০ মণ রস বাহির হইয়াছিল। ঐ রস হইতে ৬৷০ মণ চিনি ও (৬৷০ মণ সিরা বা ছোয়া) পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ পরিমাণ রসে রাব প্রস্তুত করিয়া চিনি করায় ৪৷০ মণের অধিক মাল পাওয়া যায় নাই। উৎপন্ন চিনি, উৎকৃষ্ট বেনারস চিনি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

বিনা কলের সাহায্যে কেবলমাত্র চিরপ্রচলিত সাধারণ উপায় অবলম্বন করিয়া যখন আমরা রস হইতে একবারে চিনি করিলে প্রায় ২/০ দুই মণ চিনি উৎপন্ন বেশী পাইতেছি. তখন আধুনিক কলকারখানায় উন্নত উপায়ে আরও বেশী ফললাভ করিব তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহাও বক্তব্য যে আমরা পৌষ মাসে এই কার্য্য পরীক্ষা করিয়াছিলাম; তখন প্রকৃত পক্ষে ইক্ষুদণ্ড গুলি মাড়াই করিবার উপযোগী হয় নাই। মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয় আরও অধিক চিনি পাওয়া যাইত, যেহেতু ইক্ষু পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত না হইলে উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শ্বেতসার (starch) জন্মে না।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

আমি পূর্ব্বে যেপ্রকার কলকারখানার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটা তালিকা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ব্যয়—৪০০/০ বিঘা জমির মালগুজারি ৫৲ টাকা হিসাবে ... ... ২০০০৲

তন্মধ্যে ২০০/০ দুই শত বিঘার আবাদী খরচা প্রতি বিঘা ৭৫৲ টাকা হিসাবে ... ১৫০০০৲

ইক্ষু মাড়াই করিয়া চিনি প্রস্তুত করিবার খরচা প্রতি বিঘা ১০০৲ টাকা হিঃ ... ২০০০০৲

মোট খরচা ৩৭০০০৲

আয়—প্রতি বিঘায় ৫০/০ মণ হিঃ উৎপন্ন ১০০০০/০ মণ চিনি মণকরা ৭৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় মূল্য ... ... ৭০০০০৲

ঐ হিসাবে ছোয়া ১০০০০/০ মণ মণকরা ১॥০ টাকা হিসাবে বিক্রয় মূল্য ... ১৫০০০৲

যে ২০০/০ দুই শত বিঘা জমি গরআবাদী থাকিবে, তাহাতে অনায়াসে অন্যান্য ফসল জন্মাইয়া পরে ইক্ষুর জন্য তৈয়ারি করিতে পারা যায়। সুতরাং উহাতেও ন্যূনকল্পে খরচা বাদে ২০০০৲ দুই হাজার টাকার ফসল পাইবার সম্ভাবনা ... ২০০০৲

৮৭০০০৲

পূর্ব্বলিখিত খরচা ৩৭০০০৲

মোট লভ্যাংশ ৫০০০০৲

এই হিসাব, আমাদের Experimentএ যে ১০০/০ মণ ইক্ষুতে ৬৷০ মণ চিনির বিষয় লিখিত হইয়াছে তদনুযায়ী দেওয়া হইল। যদি পূর্ব্ব প্রস্তাবিত কলকারখানার সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করা যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যয়ে উক্ত লভ্যাংশ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে বরং অধিক পাইবারই সম্ভাবনা। কেবলমাত্র ষ্টীম চালিত মাড়াই কলে ইক্ষু মাড়াই করিয়া Vacuum Panএ রস পাক না করিয়া দেশীয় উপায়ে পাক করিলেও উক্ত লভ্যাংশ পাওয়া যাইতে পারে। যেহেতু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বলদ দ্বারা চালিত মাড়াই কলে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাতেই ৬৷০ মণ চিনি জন্মে। সুতরাং ষ্টীম চালিত কলে ৮০/০ মণ পর্য্যন্ত রস পাওয়া গেলে ৮/০ মণ পর্য্যন্ত চিনি অনায়াসে পাওয়া যাইবে। ৬৷০ মণ হিসাবে উৎপন্ন হইলেও আমরা অক্লেশে বিদেশীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারি। ৮/০ মণ হইলে ত কথাই নাই। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকেরা উক্ত পরিমাণ জমি বা কলকারখানা চালাইবার উপযোগী অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ বিধায়, সদাশয় জমিদার ও ধনী মহাজনদিগের এবিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহাদিগকে এই বিষয় সম্যকভাবে জ্ঞাপন করাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের দেশস্থ যে কোন জমিদার মহোদয় একার্য্যে ব্রতী হইলে সফলতা লাভ করিবেন। যেহেতু ৪০০/০ কি ৫০০/০ বিঘা কর্ষণোপযোগী জমি নিজ কর্তৃত্বাধীনে নাই এমন জমিদার খুব অল্পই আছেন। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা এই সকল

াপাততঃ কষ্টকর কিন্তু পরিণামে ধ্রুব লাভজনক ব্যাপারে ক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠা বোধ করেন। ইঁহারা াজের মেরুদণ্ড। ইঁহাদের উদাসীনতায় সমগ্র সমাজ শ্চল।

জনসাধারণের সম্মিলিত মূলধনে কারখানা করিলেও কার্য্য চালান যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এসব র্য্য সম্মিলিত মূলধনেই পরিচালিত হইয়া থাকে। খানকার দৈনিক শ্রমজীবীরাও কোন মতে উদরান্নের স্থান করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা ন না কোন কোম্পানির ২।১টী অংশ ক্রয়ে নিয়োজিত র। আমাদের দেশস্থ সঞ্চয়ী লোকেরা কোম্পানির কাগজ য়ে যেমন সিদ্ধহস্ত, বিলাতের জনসাধারণ, সম্মিলিত ধনের কারবারের অংশ ক্রয়ে প্রায় তদ্রূপ উৎসাহ প্রদর্শন রিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের উন্নতিও সর্ব্বতোমুখী। দিন আমাদের দেশের লোকেরা ঐরূপ সম্মিলিত মূলধনের রবার করিবার অশেষ উপকারিতা ও আত্যন্তিক বশ্যকতা উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন আমাদের বসা বাণিজ্যের উন্নতি সুদূর পরাহত।

চিনি প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় সম্বন্ধে আরও অনেক ব্য থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে লিখিতে পারিলাম না। া হউক, যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে দেশের একটী তর অভাব মোচনের আশা করা যায়। এসম্বন্ধে কেহ ান বিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিলে আমার নিকট লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীকেদারনাথ দাস।
গুসকরা, বর্দ্ধমান।

বক্‌শিশ্‌।

শিশ্‌ পদার্থটা কি তাহা অনেকেই ভালরূপ জানেন। লার মাজিষ্ট্রেট্‌, আফিসের বড় সাহেব প্রভৃতি উচ্চপদস্থ াজগণের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে গ্র "বেহারা"কে দু'একটী রজতমুদ্রা দ্বারা পরিতুষ্ট না রলে প্রায়ই সাহেব বাহাদুরের দর্শনলাভ কালা আদমির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই রজতমুদ্রা দান বক্‌শিশ্‌ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বন্ধুবান্ধবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে, বিদায়গ্রহণকালে বাড়ীর ভৃত্যবর্গকে কিছু দেওয়া একটা প্রথা হইয়া গিয়াছে। ইহার নামও বক্‌শিশ্‌। যদি এ বক্‌শিশ্‌ না দেওয়া যায় ত ভুক্তভোগীরা বেশ জানেন যে নেড়া যদি ফের বেলতলায় যায় তাহা হইলে তাহার অবস্থাটা কিরূপ হয়। অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় বার সেই বন্ধু বা আত্মীয়ের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইত আমাকে আর ভৃত্যগণ পূর্ব্বেকার মত আদর অভ্যর্থনা করিবে না—যেন বেটা গেলেই বাঁচি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিবে। আফিসের চাপরাসীকেও বক্‌শিশ্‌ দিতে হয়। যদি তাহাকে তাহার এই প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা হইলে সে আর ভালরূপ খিদ্‌মদ্‌ করিবে না, এবং বড় সাহেবের নিকট বাবুর গুণগান করিবে না। অতএব এ বক্‌শিশ্‌ দেওয়াও অনিবার্য্য। রেলের গাড়ীতে বক্‌শিশের বড়ই ধূম। এখানে একটা সামান্য কুলি হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ পার্শেল বাবু ও টিকেট্‌ কলেক্টার পর্য্যন্ত বক্‌শিশ্‌ দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকেন। কুলিকে কিছু বক্‌শিশ্‌ দিলে বাবুর ত্রিশসের লগেজ অনায়াসে বিনা ওজনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে প্রবেশ লাভ করে। হায়! অধুনা ই, আই, আরের কর্ত্তৃপক্ষ বেচারা কুলিদের এ আয়টী একরকম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এখন চলন্ত গাড়ীতেই যাত্রীগণের মাল ওজন করা হয়; কাজেই যাত্রীরাও আর লুকাইয়া মাল লইয়া যাইতে বড় একটা ইচ্ছুক নয় এবং সেই জন্য কুলি বেচারাও যাহা কিছু বেশী পাইত তাহা আর এখন পায় না। পার্শেল বাবুকে কিছু বক্‌শিশ্‌ দিলে মালের ওজন অনেক কম হইয়া যায়। টিকেটকলেক্টারের হাতে কিছু পড়িলে গাড়ীতে সুবিধামত স্থান লাভ হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট মাল বাবু কিছু প্রত্যাশা করেন। যিনি ভালরূপ বক্‌শিশ্‌ দিতে পারেন তাঁহারই মাল সর্ব্বাগ্রে পাঠান হয় বা ছাড়ান হয়। পানি পাঁড়েকে একটী তাম্রখণ্ড প্রদত্ত হইলে, তিনি যে রেল কোম্পানির চাকর, সকলকে সমভাবে জল জোগান যে তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়া গিয়া, পাঁড়েজী বক্‌শিশ্‌দাতারই গোলাম হইয়া যান। বস্তুতঃ রেলের মশা মাছিটী পর্য্যন্ত বক্‌শিশের বশ। আর এক শ্রেণীর

জীব আছেন যাঁহাদিগকে রক্ষক নামে অভিহিত করা হয়; তাঁহারাত আগে বকৃশিশ্ পিছে বাত্ এই নীতির উপাসক। দস্তুরমত বকৃশিশ্ পাইলে তাঁহারা নয়কে ছয় ও ছয়কে নয় করিতে পারেন, দোষীকে তাঁহারা ন্যায্য দণ্ড হইতে দূরে রাখিতে পারেন আর নির্দ্দোষীকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইবার আয়োজন করিতে পারেন। এ বকৃশিশ্কে সাধারণ অজ্ঞ লোকে "ঘুষ" নাম দিয়া বদনাম করে; কিন্তু রক্ষক মহাশয়েরা ইহাকে "নজরানা" এইমধুর নামটী দিয়া গৌরবান্বিত করেন।

এখানে একটা কথা মনে পড়িল। বকৃশিশ্ কথাটা লইয়া নশ্বর—আজ আছে কাল নাই—মানুষকে কেন দোষ দিই। দেবতারা কি বড় ফেলা যান? তাঁহাদের বেলাই কি লীলাখেলা আর পাপ কেবল মানুষের বেলা? ওমুক দেবতা ওমুক পুষ্পটী না পাইলে তুষ্ট হন না, ওমুক দেবতার মূর্ত্তি সমীপে দু একটী রজত বা অন্ততঃ পক্ষে তাম্রখণ্ড না রাখিলে তিনি সন্তুষ্ট হন না, এসব কি? ইহাও কি বকৃশিশ্ নয়! আর শুধু কলির দেবতারাই যে বকৃশিশ্ প্রিয় তাহাও নয়। এ বকৃশিশ্ প্রথাটা বহু প্রাচীনকাল হইতে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। দ্বাপরযুগেও বকৃশিশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন তেমন দেবতা নয় স্বয়ং ত্রিপুরারি মহেশ্বর একবার বকৃশিশ্ লাভ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় মহাদেব পাণ্ডবের পঞ্চশিশুপুত্রের রক্ষণভার লইয়াছিলেন। যখন তিনি এই পঞ্চ-শিশুর গৃহদ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তখন অশ্বত্থামা তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। ভোলানাথের এমনই কর্ত্তব্য জ্ঞান যে অশ্বত্থামার নিকট হইতে গোটাকতক বিল্বপত্র বকৃশিশ্ পাইয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। তাই বলিতেছিলাম যে যখন বড় বড় দেবতারাও বকৃশিশ্ না পাইলে তুষ্ট হন না তখন মানুষ ত কোন ছার!

আবার ভেবেছিলাম যে এই কালা আদমির দেশটারই বুঝি বকৃশিশ্রূপ কুপ্রথা সকল একচেটিয়া। কিন্তু যেরূপ শুনা যায় তাহাতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা আরও অধিক প্রবল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেখানে বকৃশিশের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে এক শিলিং দিলে চলিত সেখানে এখন এক পাউণ্ড না দিলে মান থাকে না এবং অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আবার বকৃশিশ্ প্রার্থীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় লোক দেশপর্য্যটন কালে পান্থ-নিবাসে বা ভোজনাগারে আশ্রয়গ্রহণ করে। সকল ভোজনাগারের চাকরবাকরকে ভালরূপ বকৃশিশ্ দিতে হয়। বকৃশিশ্ খাইয়া এই সকল চাকরবাকরের উদর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। যিনি বড় লোক তিনি খুব বেশী বকৃশিশ্ দিয়া গেলেন। তাঁহার পরে যদি অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিপন্ন কোন লোক আসেন, তাঁহার নিকটও হোটেলের চাকরেরা সমান বকৃশিশ্ প্রত্যাশা করে। কাজেই ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ ক্রমশঃ অধিক ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে রেলের কুলিদিগকেও ভালরূপ বকৃশিশ্ দিতে হয়।

কথিত আছে একবার একজন দৃঢ়মতি ইংরাজ পুরুষ প্যারিসের একটী বড় হোটেল হইতে বিদায়গ্রহণকালে ভৃত্যদিগকে এক পয়সাও না দিয়া গম্ভীর ভাবে স্ফীতবক্ষে তাহাদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। হলগৃহের রক্ষক তাঁহার এরূপ অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইংরাজ ভদ্রলোকটী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে পর রক্ষকের চমক ভাঙ্গিল। তখন সে এবং তাহার সহকারী অন্যান্য ভৃত্যগণ তাহাদের প্রাপ্য বকৃশিশ্ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিত বোধ করিল। তাহারা এ অপমানের শোধ এইরূপে লইল, ইংরাজ পুরুষটী যাইবার সময় তাঁহার জিনিসপত্রগুলি ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন; হল রক্ষক সেগুলিকে ঠিক ষ্টেশনে না পাঠাইয়া অন্য ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিল।

অনেক সময় হোটেলের ভৃত্যেরা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বকৃশিশ না পাইলে অন্য উপায়েও স্বীয় বিরক্তি জ্ঞাপন করে। তাহারা লগেজের গায় সাধারণ লোকের অবোধ্য খড়ির আঁক কাটিয়া দেয়; কখন কখন লগেজের লেবেল (label) গুলি যেরূপভাবে লাগান উচিত সেরূপ ভাবে না লাগাইয়া যেমন তেমন করিয়া লাগাইয়া দেয়; কখন বা লগেজের গায় গালিসূচক কথা সকল লিখিয়া দেয়। ইহার ফল এই হয় যে রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁহুছিলে কুলিরা লগেজের গায়

রায় বাহাদুর লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর।

ড়ির আঁক প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিয়া লয় যে যাত্রীটীর নিকট শেষ প্রাপ্তির আশা নাই। এইজন্য তাঁহার কুলি পাওয়া ষ্কর হইয়া উঠে। কুলিগণ প্রয়োজনীয় কার্য্যব্যপদেশে ন্যত্র চলিয়া যাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় ভদ্রলোককে শেষ কষ্টে পড়িতে হয়।

হোটেল পরিত্যাগের সময় কোন্ ভৃত্যকে কত দেওয়া চিত তাহার কোন বাঁধাবাঁধি হিসাব নাই; তবে মোটামুটি সাব, যদি এক সপ্তাহকাল হোটেলে থাকা হয় ত যাইবার ময় অন্ততঃ নিম্নলিখিত হারে বক্শিশ্ বণ্টন করা উচিত। র্দার বেহারা (head waiter) পাঁচ শিলিং, বেহারা vaiter) আড়াই শিলিং, শয়নাগারের দাসী (chamber naid) ও হলরক্ষক (hall porter) প্রত্যেকে দুই শিলিং, নিসপত্র রক্ষক দেড় শিলিং, এবং যে জিনিসপত্র গাড়ীতে ঠাইয়া দেয় সে এক শিলিং। এইরূপ বক্শিশ্ পাইয়া ত্যগণ বিশেষ পরিতুষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু একেবারে সন্তুষ্টও হইবে না

থিয়েটারগুলিতে পূর্ব্বে বক্শিশ্ দানপ্রথা ছিল না। থানেও এখন এ প্রথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যে ভৃত্য- দর্শকবৃন্দকে স্ব স্ব বসিবার স্থান দেখাইয়া দেয় তাহারা ত্যেক দর্শকের নিকট হইতে অৰ্দ্ধশিলিং বক্শিশের আশা খে। যে কক্ষে দর্শকগণকে ওভারকোট ও যষ্ঠি রাখিতে , তাহার রক্ষকও অনেক স্থলে প্রত্যেকের নিকট এক লিং বক্শিশ্ পাইবার প্রত্যাশা করে।

পল্লীগ্রামের গৃহেও বক্শিশ্ প্রথা প্রবেশ করিয়াছে। াবার সেখানে বক্শিশের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে হ বন্ধুবান্ধবের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে সহরের বড় ড় হোটেলে তাঁহার যে খরচ হইত তাহা অপেক্ষা কম খরচ না। এই জন্য অনেক সময় মধ্যবিত্ত লোকেরা পল্লী- ামের বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে র্থ হন না। অনেক গৃহে গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রীগণ এ কুপ্রথাকে মন করিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বিশেষ কিছুই রিয়া উঠিতে পারেন না। এখানে যে সকল ভৃত্য শিকারের ন্দাবস্ত করিয়া দেয়, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা তাহারা নেক অধিক বক্শিশ্ পাইয়া থাকে। এক দিনের কারের জন্য যদি তাহারা দুই পাউণ্ড অর্থাৎ ত্রিশ টাকা পাইল ত কিছু বেশী পাইল না। একবার একজন ভৃত্যকে দুই পাউণ্ড দেওয়ায় সে উহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল সে কাগজ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে না। কাগজের অর্থ এই যে সে পাঁচ পাউণ্ডের নোটের কম লয় না। ভদ্রলোকটী গৃহস্বামীকে তাঁহার ভৃত্যের এই অশিষ্টাচারের কথা জ্ঞাপনকরায় ভৃত্যটী সত্য সত্যই একখণ্ড কাগজ পাইল অর্থাৎ তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া একমাসের নোটিস দেওয়া হইল। আর একবার একটী ভদ্রলোক এক বেলার শিকারের জন্য বন্দোবস্তকারী ভৃত্যটীকে একটী পাউণ্ড অর্থাৎ পনর টাকা বক্শিশ্ দিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটী যখন লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন দেখিলেন যে বন্দুকটী ভুলিয়া আসিয়াছেন। শিকার রক্ষককে বন্দুকটী পাঠাইয়া দিতে লেখায় সে পত্রের এইরূপ উত্তর দিল, "মহাশয়, আপনার বন্দুকটী আমার নিকট আছে। আপনি আমার যে চার পাউণ্ড ধারেন তাহা আমাকে যখন প্রদান করিবেন তখন আপনার বন্দুকটী পাঠাইয়া দিব।"

জলপথে ভ্রমণের সময়ও বক্শিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না। জাহাজের ভৃত্যদিগকে বক্শিশ্ না দিলে অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যিনি বক্শিশ্ না দিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন যে সকালে ঠিকসময় তাঁহাকে ডাকা হইল না, স্নানের সময় স্নানগৃহ খালি নাই, আহারের সময় টেবিলের নিকট ভাল স্থান পাওয়া ভাগ্যে ঘটিল না, রাত্রিকালে তাঁহার ডেকের চেয়ার ঢেউ লাগিয়া ভাসিয়া গেল, এবং জাহাজ ত্যাগকালে তাঁহার জিনিষপত্রের কিয়দংশ আশ্চর্য্য রূপে অদৃশ্য হইয়া গেল। কোন কোন জাহাজে প্রত্যেক ভৃত্যকে পৃথক ভাবে বক্শিশ্ দানের প্রথা নাই। সেখানে ধূমপানাগারে কিম্বা সাধারণের বসিবার কক্ষে একটী বাক্স রাখা থাকে; সেই বাক্সের ভিতরে যাত্রী- গণকে ইচ্ছানুরূপ বক্শিশ্ ফেলিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়; পরে এই বাক্সস্থিত অর্থ ভৃত্যদিগের মধ্যে যথারীতি বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ নিয়ম যাত্রীগণের নিকট সুবিধা জনক; কিন্তু ভৃত্যগণ ইহা বড় একটা পছন্দ করে না।

এইত সাদা আদমিদের দেশের কথা। এঁরাই আবার কালা আদমিদের দোষ দেখান। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীঅধরচন্দ্র মিত্র।

হজরত পাণ্ডুয়া।

পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এখন "পাণ্ডুয়া" নামে পরিচিত। মালদহের লোকে তাহাকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া "পরুয়া" নামে অভিহিত করিতেছে! হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া নামে আর একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সহিত পার্থক্য রক্ষার্থ গ্রন্থকারগণ মালদহের পাণ্ডুয়াকে "হজরত পাণ্ডুয়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ইলাহি বক্সের হস্তলিখিত ইতিহাসে পাণ্ডুয়ার বিবিধ বিবরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,---"পুরাকালে পাণ্ডুয়া একটি বৃহৎ নগর বলিয়া সুপরিচিত ছিল। তাহা ইংরাজবাজার হইতে দ্বাদশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তথায় এক সময়ে বহু লোকের বসতি দেখিতে পাওয়া যাইত। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে রাজা কংসের (গণেশের) রাজ্যাধিকারের শেষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীকাল ছয়জন গৌড়ীয় বাদশাহ পাণ্ডুয়ার রাজধানীতে বাস করিয়া গিয়াছেন। হিজরী ৭৯৫ সালে (১৩৯২ খৃষ্টাব্দে) কংসপুত্র জালালুদ্দীন গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।"*

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাতন রাজধানীতে হিন্দু এবং বৌদ্ধমন্দিরের অভাব ছিল না। তাহার কথা হিয়াঙ্গথ্সাঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে এবং "রাজতরঙ্গিণী"তে উল্লিখিত আছে। ইলাহিবক্স লিখিয়া গিয়াছেন,—"কংস সিংহাসনে আরোহণ করিলে, পাণ্ডুয়া আবার দেবমন্দিরে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছি‍ং। এই সকল হিন্দু এবং বৌদ্ধমন্দির হইতে ইষ্টক প্রস্তর ভাঙ্গিয়া আনিয়া মুসলমানগণ তাঁহাদিগের সমাধিমন্দিরাদি গঠিত না করিলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এখনও অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির বর্ত্তমান থাকিতে পারিত!

* Pandua was a large city in olden times, and is situated twelve miles north of Angrezabad. It used to be well-peopled, and from the begining of the reign of Shamsuddin Ilyas Shah to the end of the reign of Rajah Kans, six kings ruled there for the period of fifty-two years. In 795 A. H. (1392) Jalaluddin, the son of Rajah Kans, removed the seat of sovereignty to Gour.--Khursidjahannamah, as published in J. A. S. B. (1895.)

এখন আর পাণ্ডুয়ার সে পুরাতন সৌভাগ্যগর্ব্ব বর্ত্তমান নাই,—চারিদিকে বিজন বন,—তাহার মধ্যে মুসলমান কীর্ত্তির কতিপয় ধ্বংসাবশেষ, —তাহাই এখন পাণ্ডুয়ার একমাত্র দৃশ্য। তাহাতেও কত ভাগ্যবিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। যে সকল স্বাধীন ভূপতি "গৌড়-বাদশাহ" নামে পাণ্ডুয়ায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একালের অধিবাসিগণের নিকট তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া যে সকল মুসলমান সাধুপুরুষ ধর্ম্ম বিস্তার করিতেন, তাঁহাদিগের কথাই পাণ্ডুয়ার আধুনিক অধিবাসিগণের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং পাণ্ডুয়ার পুরাকীর্ত্তির উল্লেখ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের কথারই উল্লেখ করিতে হয়।

পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে "বড় দরগা" এবং "ছোট দরগা" নামক দুইটি দরগা দেখিতে পাওয়া যায়। "বড় দরগা" মকদুম শাহ জালালের এবং "ছোট দরগা" নুর কুতব আলমের নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। উভয় দরগাই ভূসম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। "বড় দরগার" ভূসম্পত্তি "বাইশ হাজারী" এবং "ছোট দরগার ভূসম্পত্তি "ষস্ হাজারী" নামে কথিত হইয়া থাকে। রাজপথপার্শ্বে যে তোরণদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, উভয় দরগা দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

বড় দরগা।

"বড় দরগা" নামক স্থানে অনেকগুলি অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে। সকল গুলিই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মকদুম শাহ জালালের বাসের জন্য হিজরী ৭৪২ সালে (১৩৪১ খৃষ্টাব্দে) সুলতান আলি মবারক এক অট্টালিকা নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। সে পুরাতন অট্টালিকা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। গোলাম হোসেন "রিয়াজ-উস্-সলাতিন" রচনা করিবার সময়েও তাহার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। * ইলাহি বক্স লিখিয়া গিয়াছেন,—"তাঁহার সময়ে সে পুরাতন অট্টালিকার

* Ghulam Husain, writing in 1786, speaks of there still being traces of the building.--H. Beveridge.

ঙ্ক মাত্রও বর্ত্তমান ছিল না।"* নিরক্ষর মুসলমানগণ হা স্বীকার করিতে অসম্মত। তাহারা বর্ত্তমান ট্টালিকাকেই পুরাতন অট্টালিকা বলিয়া বিশ্বাস রিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের বিশেষ অপরাধ নাই। অট্টালিকাটি এক্ষণে শাহ জালালের নিবাসস্থান বলিয়া র্শিত হইয়া থাকে, তাহার রচনাকাল ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। শাহ য়ামতুল্লা নামক মোতওয়াল্লি কর্ত্তৃক তাহা নির্ম্মিত হইয়া-ল। কিন্তু প্রস্তরফলকে লিখিত আছে,—শাহ নিয়ামতুল্লা রাতন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কার সাধিত করিয়াছিলেন।† হা সত্য হইলে, নিরক্ষর লোকের আর অপরাধ কি? কিন্তু হার সহিত গোলাম হোসেন এবং ইলাহি বক্সের উক্তির মঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। শাহ নিয়ামতুল্লা কি নূতন অট্টা-কা নির্ম্মিত করিয়া, তাহাকে মিথ্যা করিয়া "জীর্ণসংস্কার" লিয়া প্রস্তর ফলকে লিখিয়া গিয়াছেন? বর্ত্তমান অট্টালিকা রাতন অট্টালিকা হইলে, গোলাম হোসেন ও ইলাহিবক্স মিথ্যা করিয়া পুরাতন অট্টালিকা লুপ্ত হইবার কথা খিয়া গিয়াছেন? ইহা একটি ঐতিহাসিক কৌতূহলের পার হইয়া রহিয়াছে! প্রকৃত ব্যাপার এই সকল তর্ক তর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শাহ জালাল যখন পৌণ্ড্র-র্দ্ধনে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান র্ত্তমান ছিল না। তিনি সে কালের মুসলমান সাধুপুরুষের পরিচিত ব্যবহার অনুসারে কোনও ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন ন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাহাই সেকালে াহার আদিবাসস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। গোলাম োসেন তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, ইলাহি-ক্সের সময়ে তাহা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে াহ জালালের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, সুলতান ালি মবারক তাঁহার জন্য এক নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত রিয়া দিয়াছিলেন। শাহ নিয়ামতুল্লা তাহারই জীর্ণসংস্কার াধিত করিয়া থাকিবেন। "বড় দরগার" ইষ্টক প্রস্তরে ন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই সিদ্ধান্তকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ শাহ নিয়ামতুল্লা অথবা গোলাম হোসেন, এতদুভয়ের মধ্যে একজনকে না একজনকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়! এই সকল কারণে, শাহ জালালের "বড় দরগাকে" একটি পুরাতন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থানভূমি বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হয়।

লক্ষ্মণসেনী দালান।

বড় দরগার অট্টালিকাদির মধ্যে একটি অট্টালিকা "লক্ষ্মণসেনী দালান" নামে পরিচিত। তাহা একটি সরোবর-তীরে প্রতিষ্ঠিত। রাভেন্‌শা ইহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইলাহিবক্স ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা একটি পুরাতন অট্টালিকা। প্রস্তরফলকে দেখিতে পাওয়া যায়,—"বিকল রাজের পুত্র রামরাম কর্ত্তৃক মহম্মদ আলি নামক অধ্যক্ষের আদেশে বাঙ্গালা ১১১৯ সালে এই পুরাতন অট্টা-লিকার জীর্ণসংস্কার সুসম্পাদিত হইয়াছিল।" ইহা "লক্ষ্মণ-সেনী দালান" নামে কথিত হইতেছে কেন, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। ইলাহিবক্সের সময়ে কেহ সেরূপ সন্ধান প্রদান করিলে, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিতে ক্রটি করিতেন না। বহুকাল পূর্ব্বে তাহার সমস্ত জনশ্রুতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল সেই পুরাতন নাম এখনও লোকসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এই অট্টা-লিকা প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণসেনের অট্টালিকা হইলে, মুসলমানগণ ইহাকে না ভাঙ্গিয়া যত্নপূর্ব্বক জীর্ণসংস্কার করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন কেন, তাহাও অল্প কৌতূহলের বিষয় নহে। এই কৌতূহল এক্ষণে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। "লক্ষ্মণসেনী দালানের" প্রস্তরফলকে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঐতিহাসিক তথ্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহি-য়াছে। গৌড়ীয় অট্টালিকার গঠনপ্রতিভা কাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে, ইহাতে তাহার একটি আনুসঙ্গিক প্রমাণ ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। যে সকল মুসলমান নরপতি এই প্রদেশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্ম-ভূমি কখনও অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। তাঁহারা এদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক দেবমন্দির দর্শন করিয়া মসজেদ নির্ম্মাণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, মন্দির ভাঙ্গিয়া

* It is now so destroyed that no trace of it re-ains.—Khursidjahannamah.

† This is the building of the holy Shah Jalal, the ›ly Shah Niamutulla repaired it.—Translation of the scription.

মস্জেদ রচনার উপকরণ সংগৃহীত করিয়াছিলেন। সে কথা সমস্ত মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। উপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না,—যে কেহ লৌহদণ্ডাঘাতে তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু সেই উপকরণ লইয়া মস্জেদ নির্ম্মাণ করিতে রাজের সহায়তা আবশ্যক। তাহারা হিন্দু না মুসলমান? গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও যে সকল গঠনপ্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে হিন্দু-গঠন-প্রতিভাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র মনে হয়,—মন্দিরগুলি যেন সহসা মস্জেদরূপে যথাসম্ভব আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে! "বড় দরগার" অট্টালিকার মধ্যে "লক্ষ্মণসেনী দালান" এইরূপে যে কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া আসিতেছে, তাহা আর একটি কারণে আরও কৌতূহলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এখানে একখানি তালপত্রের পুরাতন পুস্তক রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। নিরক্ষর মুসলমানগণ তাহাকে শাহ জালালের পুস্তক বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে,—সহসা কোন হিন্দুকে তাহা স্পর্শ করিতেও অনুমতি প্রদান করে না। এই পুস্তক কিরূপে এখানে আসিল, কি জন্যই বা শাহ জালালের দ্রব্যজাতের সঙ্গে পরম সমাদরে সুরক্ষিত হইতেছে, তাহার কোনও তথ্যাবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। ইলাহিবক্স ইহাকে একখানি "নাগরী" পুস্তক বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি "নাগরী" নহে, "সংস্কৃত", ইহা সেকালের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত। বহু পুরাতন বলিয়া তালপত্রগুলি পরস্পরের সহিত এরূপ দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, খুলিতে গেলে ছিঁড়িয়া যায়। বিভারিজ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—এই গ্রন্থ "হলায়ুধ-বিরচিত" বলিয়া স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। একটি শ্লোকের পাঠোদ্ধার সাধিত হইয়াছে। তাহাতে একজন পাল নরপালের পরলোক গমনের কথা লিখিত আছে। এই গ্রন্থ একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে। ইহা কি মহা ধর্ম্মাধিকার মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধের স্বহস্তলিখিত বঙ্গদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী?

শাহ জালাল।

শাহ জালালের সম্পূর্ণ নাম "মকদুম শাহ জালালুদ্দীন তব্‌রিজি"। তিনি একজন ইতিহাস বিখ্যাত সাধু পুরুষ। তাঁহার কথা বহুগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়া, অদ্যাপি মুসলমান-সমাজে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার জীবনকাহিনী বিবিধ অলৌকিক কাহিনীর আধার। তাঁহার গুরুভক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, তাঁহার বর্ষীয়ান্ গুরু মক্কাযাত্রা করিলে, তিনি একটি চুল্লী মস্তকে বহন করিয়া রন্ধন করিতে করিতে অনুগমন করিতেন;—বৃদ্ধ পথশ্রান্ত হইবামাত্র, তাঁহাকে খাদ্য দানে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেন। "বড় দরগার" অভ্যন্তরে এখনও একটি "তন্দুর" দেখিতে পাওয়া যায়। নিরক্ষর মুসলমান বলিয়া থাকে,—শাহ জালাল সেই সুবৃহৎ "তন্দুরকেই" মস্তকে বহন করিয়া গুরুশুশ্রূষা করিতেন! ইলাহি বক্স্ ভক্ত মুসলমানের ন্যায় ইহার উল্লেখ করিয়া, সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"ঈশ্বর জানেন, এই কাহিনী কতদূর সত্য!"

এক সময়ে সমুদ্রযাত্রা প্রভাবে বঙ্গদেশের নাম পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য মুসলমানগণ আরবসাগরে ও পারস্যোপসাগরে পোতারোহণ করিয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইতেন। এইরূপে বক্তিয়ার খিলিজির বহুপূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের গতিবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা বণিক্,—বাণিজ্য লোভে এ দেশে পদার্পণ করিয়া দেশীয় রাজশক্তির অনুগত হইয়াই সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। এ দেশে মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে ক্রমে ক্রমে অনেকে এ দেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শাহ জালাল কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে, দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্‌বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই। কিন্তু তিনি যে সত্য সত্যই পাণ্ডুয়ার "বড় দরগায়" বাস করিতেন, তাহাতে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইলাহি বক্স্ লিখিয়া গিয়াছেন,—"পারস্যদেশের অন্তর্গত তব্‌রিজ নগরে শাহ জালালের জন্ম হয়। তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া কিছুদিন দিল্লী-নগরীতেও বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তাঁহার শত্রুদল তাঁহাকে লোকসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কুৎসিৎ অভিযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিচারকালে অভিযোগকারিণী নিজমুখে সকল কথা ব্যক্ত করায়, সাধু-পুরুষের চরিত্রগৌরব রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে

তিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া, শাহ জালাল দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া ণ্ডুয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন। এখানে অল্পদিনের মধ্যেই হার প্রতিপত্তি এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, তিনি াইশ হাজারী" নামক ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। াহি বক্স লিখিয়া গিয়াছেন,—বঙ্গদেশের "দেওমহল" মক বন্দরে শাহ জালালের সমাধি বর্ত্তমান আছে। হেবেরা ইহাতে আস্থা স্থাপন না করিয়া, মালদ্বীপ নামক পপুঞ্জে শাহ জালালের দেহান্তর সংঘটিত হইবার কথা ক্ত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের "বড় রগার" অভ্যন্তরে শাহ জালালের যে সমাধিমন্দির বর্ত্তমান াছে, তাহা জাল সমাধিস্থান,—প্রকৃত সমাধিস্থান ভারত- াগর বেষ্টিত মালদ্বীপে। ইহার প্রধান প্রমাণ—মালদ্বীপের নশ্রুতি। সে দেশের লোকে তব্‌রিজ নিবাসী কোনও াধুপুরুষ কর্ত্তৃক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তাঁহার াধিস্থান অদ্যাপি পীরস্থানরূপে পূজিত হইয়া থাকে। ই প্রমাণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা কঠিন। শ্রীহট্টেও শাহ ালাল নামক এক মুসলমান সাধুপুরুষের সমাধিস্থান খিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুসলমান পর্য্যটক ইবন তোতা তাঁহার আশ্রমে আতিথ্য লাভ করিয়াছিলেন। াহট্টের শাহ জালাল ভিন্ন ব্যক্তি। সেইরূপ মালদ্বীপের ব্‌রিজিও ভিন্ন ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। কেবল এরূপ ামসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়াই, ইলাহিবক্সের উক্তিকে ্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হয় না। তাঁহার কথা ত্য হইলে, এদেশের চিতাভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন ইতিহাস কিয়ৎ রিমাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। যেখানে শাহজালাল াসস্থান গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার াম—দেবমহল। তথায় গোলাম হোসেনের সময়েও রাতন ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। এখনও "লক্ষ্মণসেনী ালান" জীর্ণসংস্কার প্রভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে। দরগার ব্যজাতের মধ্যে একখানি পুরাতন জরাজীর্ণ সংস্কৃত স্তকও বর্ত্তমান আছে। এই সকল বিষয়ের একত্র বিচার রিতে বসিলে, শাহ জালালের সমাধিস্থানকে একটি পুরাতন বস্থান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। এক সময়ে শাহ- ালালের স্মৃতিসমাদর রক্ষার্থ নবাব সিরাজদ্দৌলা "বড় রগার" সাধনস্থান রৌপ্যনির্ম্মিত "রেলিং" দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছিলেন। তাহা কে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; কেবল তাহার কথা এখনও সিরাজদ্দৌলার সাধুভক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই হতভাগ্য তরুণযুবক যে সকল অলীক কলঙ্কে কলঙ্কিত, সাধুপুরুষের অবমাননাও তাহার মধ্যে একটি। প্রকৃত পক্ষে সিরাজদ্দৌলা যে সাধুভক্ত ছিলেন, পাণ্ডুয়ার "বড় দরগায়" সে কথা এখনও উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ছোট দরগা।

"ছোট দরগায়" যে সকল অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে, তাহা "বড় দরগার" অট্টালিকা অপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য। "ছোট দরগা" নুর কুতব আলম নামক সম্ভ্রান্ত সাধুপুরুষের সমাধিস্থান। অট্টালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তাহাতে অনেক পুরাতন বিলুপ্ত অট্টালিকার ফলকলিপি সংযুক্ত আছে। "মিঠা তালাও" নামক একটি ক্ষুদ্র সরোবর "ছোট দরগার" দৃশ্যশোভা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। মীরকাসিম এই দরগায় তাম্রনির্ম্মিত জয়ডঙ্কা উপঢৌকন প্রদান করিয়া- ছিলেন। তাহা আর এখন ব্যবহৃত হয় না।

নুর কুতব সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাহারদীঘির অনতিদূরে মকত্তুম আখি সিরাজউদ্দীন নামক যে সাধুপুরুষের সমাধি- মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জনৈক প্রিয় শিষ্যের নাম—সেখ আলা-উল-হক্। তিনি লাহোর নিবাসী ধনাঢ্য মুসলমানের পুত্র, পিতার সহিত এ দেশে আগমন করিয়া- ছিলেন। পিতা গৌড়ীয় বাদশাহের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, পুত্র সাধুপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া "ফকির" হইয়াছিলেন। তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া অতিথিসেবা করিতেন। ইহাতে বাদশাহের সন্দেহ হয়—হয় ত কোষাধ্যক্ষ পুত্রকে রাজকোষ হইতে অর্থদান করিয়া থাকেন। সন্দেহে পড়িয়া সাধু আলা-উল্-হক্ সুবর্ণগ্রামে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার অর্থব্যয়ের অবধি ছিল না। কিছু দিন পরে বাদশাহ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ফকিরকে মার্জ্জনা করিলে আলা-উল্-হক্ পুনরায় পাণ্ডুয়ায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া নগরেই তাঁহার দেহান্তর সংঘটিত হয়। তথায় তাঁহার

সমাধিমন্দির বর্ত্তমান আছে। তাঁহার পুত্র নুর কুতব গদী অধিকার করিয়া ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

বাদশাহী সনন্দ।

"ছোট দরগার" ভূসম্পত্তির "এক বাদশাহী সনন্দ" অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহা সম্রাট শাহ জাঁহার রাজ্যাব্দের দ্বাবিংশ বর্ষের (সুলতান সুজাখাঁর স্বাক্ষরযুক্ত) ভূমিদান পত্র। ইহার পূর্ব্বে যে দানপত্র ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হোসেন শাহের "ছোট দরগায়" ভূমিদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার কোনও দানপত্র বর্ত্তমান নাই। সুজা খাঁ রাজমহলের রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর পাণ্ডুয়ার ছোটদরগার "বাদশাহী সনন্দে" রাজপ্রতিনিধির স্বাক্ষর বলিয়া কথিত।

বাদশাহী মস্‌জেদ।

নুর কুতব আলমের সমাধির নিকটে যে মস্‌জেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে বাদশাহ ইউসফ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তরফলকে তাঁহার নাম উল্লিখিত আছে। নুর কুতবের সমাধির সম্মুখেই তাঁহার পিতার সমাধি। তাহার দ্বারদেশে যে প্রস্তর ফলক সংযুক্ত আছে, তাহাতে প্রথমে কোরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত—তাহার পর আলা-উল্‌-হকের দেহত্যাগের বিবরণ। তিনি বাদশাহ আবুল মোজাফ্‌ফর মাহামুদ শাহের শাসনসময়ে পরলোক গমন করেন। এই প্রস্তর ফলকে আলা-উল্‌-হকের নাম উল্লিখিত নাই, কেবল সাধুপুরুষ বলিয়াই উল্লেখ আছে। তজ্জন্য নানা তর্ক বিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। ছোটদরগার সহিত বাদশাহদিগের বিশেষ সংস্রব ছিল। যে রাষ্ট্রবিপ্লবে মুসলমানের সিংহাসনে ভাতুড়িয়ার জমিদার গণেশ বাদশাহ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাতে ছোট দরগার সংস্রব ছিল।

পুরাতন স্মৃতি-চিহ্ন।

ছোট দরগার পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুবৃহৎ স্তম্ভের ও মকরের আকৃতিযুক্ত জলনির্গমনের মুরির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটি স্তম্ভের পাদপীঠ চারিহস্ত ব্যাসবিশিষ্ট,—যে অট্টালিকায় তাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ বৃহৎ ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ছোট দরগায় এরূপ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে মকরের মুখ ব্যবহৃত হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বনাভ্যন্তরে এই সকল পুরাতন প্রস্তরশিল্পের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিলে মনে হয়—ইহা অতি পুরাতন হিন্দু বা বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তাহার যে সকল উপকরণ মস্‌জেদ নির্ম্মাণের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাই মুসলমান কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছিল;—যাহা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা অদ্যাপি পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে যে সকল পুরাতন সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়—এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এই অংশ জনকোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল। এখন সকল স্থানই নীরব। কেবল মেলা উপলক্ষে বৎসরের মধ্যে কখন কখন মুসলমান তীর্থযাত্রীর সমাগম বশতঃ পাণ্ডুয়ার বনভূমি কিয়ৎকালের জন্য মুখরিত হইয়া থাকে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

যজ্ঞ ভঙ্গ।

কন্‌গ্রেস্‌ত ভাঙ্গিয়া গেল।

এবারকার কন্‌গ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্ব্বে হইতেই জাগিয়াছে কিন্তু ঠিকমত প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

সমস্ত দেশকে লইয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞের কর্ত্তারা কে কোন্ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খালাস পাইতে পারেন না। চারিদিকের অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাঁহাদের উপর। কোনো কারণে কর্ম্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে গালি দিয়া তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বারুদের ভাণ্ডারে দেশলাই জ্বালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে সন্দেহ নাই—এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই না হয় বারুদকেই কর্ত্তৃপক্ষেরা আসামীর দলে দাঁড় করাইয়া থাকেন—জগতের সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়।

াপুরী হত্যাকাণ্ড যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের ৷ দিয়া তাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়াছেন এবং আজ ালাদেশে যে বিচিত্র রকমের উৎপাত বাধিয়া উঠিয়াছে জন্য বাঙালীকেই বন্ধনপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে ঁকে কার্জ্জন ও মর্লির জয়ধ্বনির বিরাম নাই।

বস্তুত বারুদকে ও দেশলাইকে যাহারা সত্য বলিয়া নে ও স্বীকার করে তাহারা এই ছুটোর সংস্রবকে াইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। ষ যাহারই হৌক বা রাগ যাহার পরেই থাক্ সে কথা য়া গরম না হইয়া হাতের কাজটা [illegible]রিলে সিদ্ধ এই ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাহার তৎপ[illegible]।

এবারকার কন্‌গ্রেসের যাঁহার অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা প্রয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর তে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই ছ তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে কারণেই হৌক দেশে গিয়া উঠিয়াছে এ কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার স্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পার না। এই দলের ন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। স্তু যখন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের ত কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ন নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্ত্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে য়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কন্‌গ্রেসের াজকে কূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা । না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার ঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম , দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই ক্তকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ করিতে উৎসাহিত াই যে ইহার সকলের চেয়ে বড় উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক ত্তজনায় তিনি মনে রাখেন নাই। তিনি এমন ভাবে গ্রেসের হালের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন ঐ চরম-র দলটা জলের একটা ঢেউ মাত্র, উহা পাহাড় নহে, কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে াইয়া যাওয়া চলিবে।

আবার চরমপন্থীরাও এমন ভাবে কোমর বাঁধিয়া কন্‌গ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে মধ্যম-পন্থীরা এতদিন ধরিয়া কন্‌গ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হোক্। এবং এটা এখনি করিতে হইবে—এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কন্‌গ্রেসের সভায় মধ্যম-পন্থীর স্থানটা যে কি তাহা সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।

এই যে লুব্ধতা এই যে অন্ধ নির্ব্বন্ধ ইহা যদি দলবর্ত্তী সাধারণ লোকের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা হইলে সেটাকে মার্জ্জনীয় বলিয়া গণ্য করা যায়—কিন্তু যাঁহারা দলের কর্তৃপদে আছেন তাঁহারাও যদি না বুঝেন কোন্‌খানে রাশ টানিলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয় এবং, কোন্‌খানে হার মানিলে তবেই যথার্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই বলিতে হইবে সংসারে যাঁহারা বড় জিনিষকে গড়িয়া তুলিতে পারেন যাঁহারা কার্য্য সিদ্ধির লক্ষ্যকে কোনো মতেই ভুলিতে পারেন না ইঁহারা সে দলের লোক নহেন। ইঁহারা কবির লড়াইয়ের দলের মত উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখেন—দায়িত্বদৃষ্টিকে অবিচলিত স্থৈর্য্যের সহিত সুদূরে প্রসারিত করেন না।

বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কন্‌গ্রেস ভাঙিয়াছে। এক গাড়ির এঞ্জিন যদি সামনের গাড়ির এঞ্জিনকে একেবারে নাই বলিতে চায়, এমন কি, ঠেকাঠেকি হইলেও তখনো পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া যদি ষ্টীম চড়াইয়া দেওয়াকেই নিজের পথ খোলসার উপায় বলিয়া মনে করে তবে একটা চুরমার ব্যাপার না বাধিয়া থাকিতে পারে না। এ অবস্থায় যাঁহারা চালক তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না।

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কন্‌গ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি

পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কন্‌গ্রেস্ সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না। কন্‌গ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না;—শনৈঃ শনৈঃ প্রত্যহ প্রত্যেকের অশ্রান্ত চেষ্টায় দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই পথের চরম গম্য স্থান সভাপতির আসন নহে, এমন কি, ঐ মঞ্চটা তাহার পান্থশালাও নহে।

আর যদিই মনে কর কন্‌গ্রেসের কর্তৃত্বলাভ দেশহিতসাধনের একটা চরিতার্থতা তবে কি এতবড় একটা সম্পদকে এমন অধৈর্য্য ও প্রমত্ততার সহিত কাড়াকাড়ি করিতে হয়! ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকেই কি অপমান করা হয় না?

কাজির বিচারের কথা মনে আছে? দুই স্ত্রীলোক যখন একটি ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া কাজির কাছে নালিশ করিয়াছিল তখন কাজি বলিয়াছিলেন ছেলেটাকে দুইভাগে কাটিয়া দুই জনকে দেওয়া হউক। এই কথা শুনিয়া যথার্থ মা বলিয়া উঠিল ছেলে আমি চাই না অপরকেই দেওয়া হউক্। যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ করা এবং মকদ্দমায় হারমানা অনায়াসে স্বীকার করে।

এবারকার কাজির বিচারে কি দেখা গেল? দুই দিকেরই এই জিদ্ যে বরং কন্‌গ্রেস ভাঙ্গিয়া যায় সেও ভাল তবু হার মানিব না। ইহাতে এই প্রমাণ হয় কোনো পক্ষই কন্‌গ্রেসকে তেমন সত্য ও তেমন বড় করিয়া মনে করেন না। ইহা যে একটা জীবধর্ম্মী পদাথ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণহানি ও আঘাত লাগিলে ইহা দুর্ব্বল হয় তাহা কেহ নিজের প্রাণের মধ্যে তেমন করিয়া অনুভব করেন না। তাহার কারণ কি এই নহে এই জিনিষটাকে বিশবৎসর তা' দিয়াও ইহার মধ্যে প্রাণ পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই? সেই জন্যই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে, ধৈর্য্যে দীক্ষিত করে নাই। আমাদের পরে এই জন্যই কন্‌গ্রেসের দাবী অত্যন্ত দুর্ব্বল—ইহা অতি অল্পও যেটুকু ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে চায় তাহাও পুরামাত্রায় পায় না। আমাদের অর্থসামর্থ্য অবসরের উদ্বৃত্ত হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই এই কন্‌গ্রেসের জন্য রাখিয়া থাকি এবং যাঁহারা রাখেন সেই কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে অতি যৎসামান্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, কন্‌গ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কন্‌গ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কন্‌গ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কন্‌গ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পক্ষের হউক। তাহাকে এ বৎসর বা ও বৎসর কোনো রকমে দখল করিয়া বসিব এ চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।

আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমান বশত জগতে যে যুগে এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছে সেইকালে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ম্ম পণ্ড হইয়াছে তাহা নহে মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে। ক্ষমতাশালীর জিদ সত্যকে ক্ষণকালের জন্য নির্জ্জীব করিয়া ফেলিতেও পারে কিন্তু রুদ্রকে কখনই ঠেকাইতে পারে না—একথা ইংরেজ ভুলিয়াছে বলিয়া আমরা অভিযোগ আনিয়াছি কিন্তু আমরা নিজেও যদি ভুলি—বল ও কলকৌশলকেই অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি তবে প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে ধৈর্য্য, শান্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে, তবে বিলম্বে অসহিষ্ণু, পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশ্বাস হইব না, বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকে সহ্য করিব এবং স্বাধীনতা বা স্বরাজের যথার্থই অধিকার লাভ করিতে পারিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

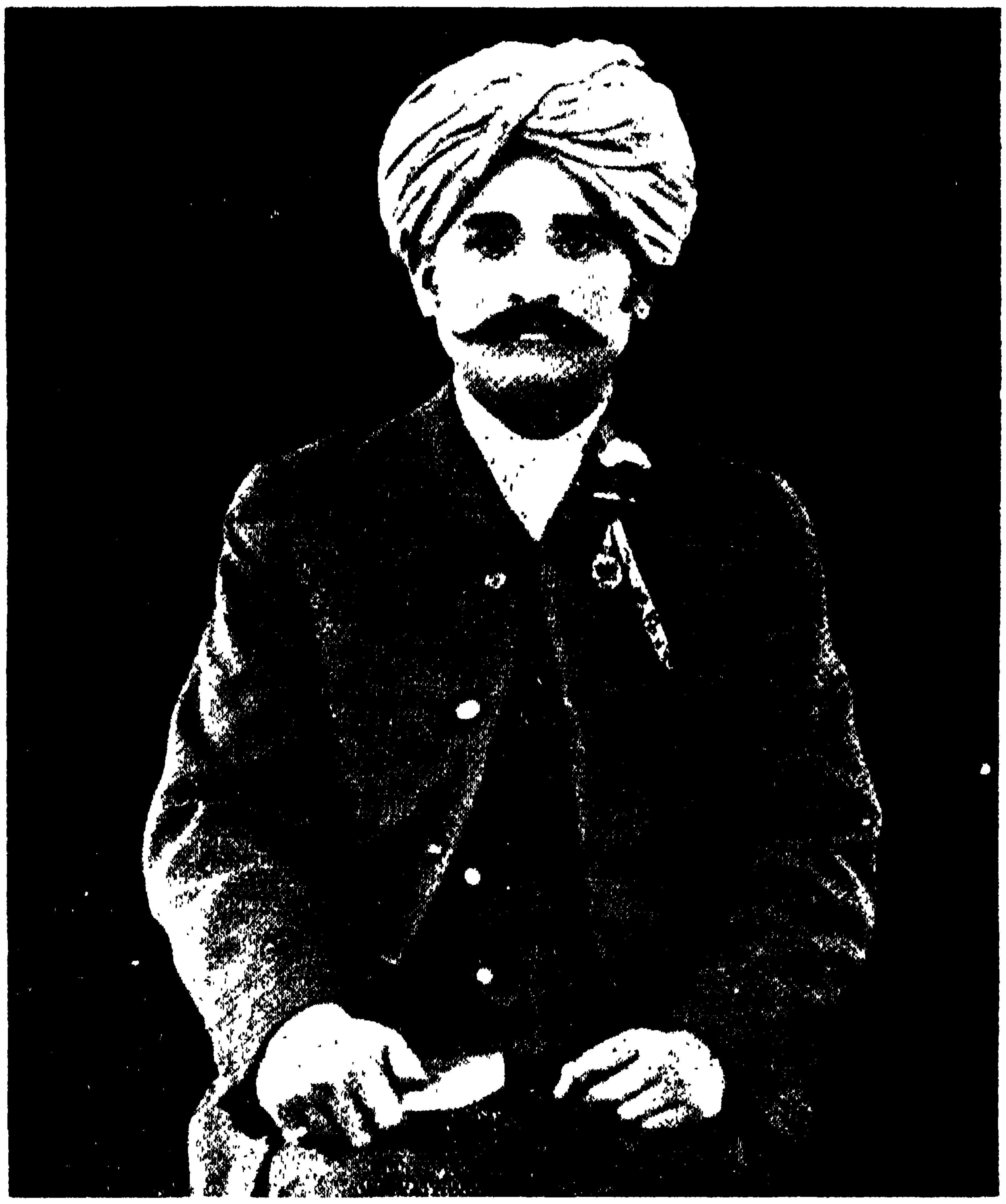

পণ্ডিত রামসুন্দর।

সীতা।*

বাল্মীকির সীতার উপর আর কলম ধরা চলে না, সীতা-চরিত্রের আর উন্নতি সম্ভব নয় বলিলে আর কিছু হোক আর না হোক, "কালোহ্যং নিরবধিঃ বিপুলাচ পৃথ্বী" কথাটী অস্বীকার করা হয় এবং পৃথিবী ক্রমবিকাশশীল ও চির-উন্নতিশীল বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই সাক্ষ্যে একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। ইহাতে কবির গৌরবের উচ্চতা সাধিত হউক আর নাই হউক, ভগবানের সৃষ্টিশক্তির সীমানির্দ্দেশ করা হয়, নিশ্চিত। অন্যথা, যে মহর্ষি বাল্মীকির মুকুট খর্ব্ব হয় এ ধারণা আমাদের নাই। আজ যদি কেম্ব্রিজের একজন গ্রাজুয়েট Principiaতে দুটী সংলগ্ন কথা বসাইতে পারিয়া থাকে, তাহাতে নিউটনের গৌরবমুকুট খুব খানিকটা খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। তবে গ্রাজুয়েটের প্রশংসার কারণ যথেষ্টই আছে।

বাল্মীকি ও সীতা উভয়েই হিন্দুর হৃদয়রাজ্যের দেবতা, তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করাটাই সুবিধা-জনক নয়। কেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলে, গাত্র যতই কোমল হউক না কেন, অস্ত্রাঘাত লাগিবেই। বিশেষতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা সব সময়ে পিতামহ ভীষ্ম বা ধনুর্ব্বেদাচার্য্য দ্রোণের উপরোধ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ নহেন। আশা করি কথাটা মনে রাখিয়া পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

সীতা কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের প্রতি তিরস্কারজনিত দোষের গুরুত্ব কমাইবার জন্য জিতেন্দ্রবাবুর প্রধান যুক্তি এই তৎ-কালীন অবস্থা স্মরণ করিলে বুঝা যাইবে যে সীতা শ্রীরামের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া এমন বিমোহিতচেতনা হইয়াছিলেন যে তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ লোপ পাইয়াছিল, সুতরাং ভাবিয়া চিন্তিয়া তিরস্কার করিবার অবসর তাঁহার কোথায়? ঠিক, নষ্টচেতন হইলে ভাবিবার অবসর থাকে না তাহা সত্য, কিন্তু নষ্টচেতন হওয়াটাই কি দোষের হয় নাই? জিতেন্দ্রবাবু বলিবেন অবস্থাটা গুরুতর! অবস্থাকে জয় করাই কি মহত্ত্বের অন্যতম লক্ষণ নয়? সাধারণের ও অসাধারণের ইহাই পার্থক্য। সীতা অসামান্যা নারী বলিয়াই তাঁহার নিকট আমাদের এই দাবী। রাবণগৃহে বন্দিনী সীতা যে অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, সে অবস্থায় একজন সাধারণ নারী আত্মরক্ষা করিতে পারে না, না পারিলে অবস্থা দৃষ্টে লৌকিক শাস্তির পরিমাণ লঘু হয়। সীতা পারিয়াছিলেন বলিয়াই, অবস্থার উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ সীতা। সুতরাং লক্ষ্মণকে তিরস্কারকারিণী সীতার কাছে এই অবস্থায় জয় আকাঙ্ক্ষা করাটা কেন জিতেন্দ্র-বাবুর কাছে অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। জিতেন্দ্রবাবু মেঘনাদ বধের সীতাকে রামের মঙ্গলের জন্য দেবতাদিগের নিকটেও প্রার্থনা করিতে দিতে প্রস্তুত নন। কেন না, "আর্ষ রামায়ণের সীতা শ্রীরাম-চন্দ্রের বীরত্বের প্রতি সন্দেহশালিনী ছিলেন না"। অথচ যে সীতা শ্রীরামকে বিকট বিরাধ রাক্ষস কিম্বা সার্দ্ধ এক মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসপরিবেষ্টিত খরদূষণকে বধ করিতে দেখিয়াছেন, মৃগয়ার্থ বহির্গত ধনুষ্পাণি সেই রামকে হঠাৎ বুঝি রাক্ষসেরা ধরিয়া খাইয়া ফেলিল ভাবিয়া যে হতচেতনা হইলেন, ইহার মধ্যে জিতেন্দ্রবাবু কিছুই অস্বাভাবিক দেখিতে পান নাই, অথচ পাশে থাকিয়া লক্ষ্মণ সে কথাটা স্মরণ করা-ইয়াও দিলেন। তিনি হয় তো বলিবেন, "স্নেহ পাপ শঙ্কী"। দুঃখের বিষয় মেঘনাদ বধের সীতার প্রতি এই অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে তিনি কৃপণতা করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অবস্থায় সীতাদেবীকে ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া আমরা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে দেখিয়াছি।

সীতাদেবী রাবণগৃহে আবদ্ধা। রাবণ ও রাক্ষসীগণের উৎপীড়নে তিনি স্বীয় অবস্থাকে নিতান্ত অসহনীয় বোধ করিতেছেন। রাবণ যে দুমাস সময় দিয়াছিল তাহাও গতপ্রায়। সুতরাং আর উপায় না দেখিয়া তিনি বেণীবন্ধের দ্বারা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিবার জন্য শিংশপা বৃক্ষের ডাল ধরিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। অবস্থাটা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ সময়ে হনুমান আত্মপ্রকাশ করতঃ সীতাদেবীকে স্কন্ধে করিয়া শ্রীরামসন্নিধানে লইয়া যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। উদ্ধারের আর উপায় নাই ভাবিয়া যিনি এইমাত্র আত্মহত্যা করিতেছিলেন, তাঁহারই

* বিগত পৌষ সংখ্যার প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বসু, এম্. এ, বি, এল্. মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতের সীতা অংশের সমালোচনা করিয়াছেন। এ প্রবন্ধ উক্ত সমালোচনা পাঠে লিখিত।

কাছে হঠাৎ এই স্থযোগ উপস্থিত! কিন্তু সীতাদেবী বিচলিতা হইলেন না, তিনি হিতাহিত বিচারশক্তির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন না। তিনি সে সময়ে যে সমস্ত অর্থযুক্ত কথা বলিয়া হনুমানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায় যে অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াই তিনি সীতা। হনুমানও তাঁহার কথায় চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন :—

> এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
> কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূয়াদ্বচনমীদৃশম্॥ সু, ৩৮।৫

আমরা তো লক্ষ্মণের তিরস্কারের মধ্যে শ্রীরামের পত্নী সীতাদেবীকে না পাইয়াই আক্ষেপ করিতেছি। অবস্থা যদি দোষস্খালনের ওজুহাত হয়, তবে সীতা অ-সীতায় কোনও পার্থক্য থাকে না। স্থতরাং লক্ষ্মণের প্রতি ওরূপ তিরস্কারে সীতাত্বের যে একটু খর্ব্বতা আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দ্বিতীয় কথা তিরস্কারের বিষয় সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে ভয় হয়, কেন না জিতেন্দ্র বাবু স্থরুচি বলিয়া গালি দিয়াই হয় তো কেল্লা ফতে করিবেন। কিন্তু কথাটা হঠাৎ ছাড়িয়াও দিতে পারিতেছি না। তাঁহার মতে সীতার তৎকালীন অবস্থায় লক্ষ্মণকে ওরূপ গালি না দেওয়াটাই অস্বাভাবিক হইত এবং সীতাদেবীর পতিপ্রেমের তীব্রতা ও প্রখরতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইত না! দুঃখের বিষয় শ্রীরামের অমঙ্গল আশঙ্কায় লক্ষ্মণের প্রতি প্রযুক্ত গালাগালিতে রামায়ণের সীতার মধ্যে পতিপ্রেমের তীব্রতা ছাড়া জিতেন্দ্রবাবু আর কিছুই দেখিলেন না, অথচ সেই রামেরই অমঙ্গল আশঙ্কায় 'অজ্ঞান' হইলেন বলিয়া মেঘনাদবধের সীতা কেবল "বাঙ্গালীর গৃহবধূ" হওয়ার অপবাদ লাভ করিলেন! হায় রে কপাল! হায় রে স্বমত সমর্থনের গরজ!! এখন যদি তাঁহারই অনুকরণে কেহ সীতাদেবীকে মেছুনীর সঙ্গে তুলনা করে তবে জিতেন্দ্রবাবুর শ্লাঘা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেন না, উপযুক্ত শিষ্য মিলিলে,—"তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাই তোমারে"। কথাটা এই অবিচার সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচার। পতিপ্রেমের খাতিরেও অন্যের প্রতি অবিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই। নারীর পক্ষে পতিচিন্তায় আত্মহারা হইয়াও যে জীবনের অন্যান্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া অন্যায় তাহা আর্য্যকবিই দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রতি অভিশাপের ফল ফলাইয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সীতার পতিপ্রেম অতুলনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি সেই পতিপ্রেমের অনুরোধে অন্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন তবে তাহা অন্যায় বলিয়া ধরা হইবে না, এই যুক্তির সারবত্তা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। জিতেন্দ্রবাবু কিন্তু তাহাই বুঝাইতে চান।

লক্ষ্মণের প্রতি সীতাদেবীর তিরস্কার অন্যায় হইয়াছে দুই কারণে। প্রথমতঃ উহা অস্বাভাবিক। লক্ষ্মণের আচরণে ও সীতাদেবীর পূর্ব্বাপর কথা বার্ত্তায় এই সন্দেহের কোনই হেতু (justification) বিদ্যমান নাই। আমরাও যোগীন্দ্রবাবুর সঙ্গেই বলি যে অন্ততঃ ত্রয়োদশবর্ষকাল তিল তিল জীবনপাত করিয়া, কেবল চরণপ্রান্তে নয়নদ্বয় সন্নদ্ধ রাখিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিকার্য্যে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া যে বিশ্বাস উৎপন্ন করা হইয়াছে তাহা "অকস্মাৎ এরূপ সন্দেহে পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক নহে"। অন্যদিকে, যে ভাই পিতৃদত্ত রাজ্য ফিরাইয়া দিবার জন্য স্বরাজ্য অযোধ্যা হইতে চিত্রকুটে আসিয়াছিলেন সেই ভরতকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনা কি অস্বাভাবিক নহে? জিতেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে আজীবনের বিশ্বাস সংসারে এমন এক দিনে নষ্ট হইয়া যায়! সংসারে সামান্য মানুষের মধ্যে যাহা হয় সীতা ও লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও তাহাই কি? সংসারে ঘটিতেছে তাহাতে কি? (সংসারে তো মন্দোদরী বিভীষণকে বরণ করেন, তারা স্থগ্রীবকে গ্রহণ করেন?) সীতা ও লক্ষ্মণের সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তাহা ঘটিবার স্বাভাবিকতা দেখান চাই, নইলে চলিবে না। জিতেন্দ্রবাবু সাহিত্যজগতে ওথেলোর কথা বলিয়াছেন। সাক্ষী কিন্তু উল্টা সাক্ষ্য দিতেছে। ওথেলোর বিশ্বাস কি একদিনের সামান্য ঘটনায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল? তাঁহার হৃদয়ে দেশ্‌দেমিনোর প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন করিবার জন্য দুরাচার ইয়াগো দিনের পর দিন কত ঘটনার মধ্য দিয়া কত চাতুরী অবলম্বন করিয়াছিল তাহা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। কিরূপে ধীরে ধীরে দৃঢ় বিশ্বাস তীব্র সন্দেহে পরিণত হয় মানবহৃদয় তত্ত্ব কবি ওথেলোতে তাহার psychology প্রদর্শন করিয়াছেন, ওথেলোর সন্দেহের পশ্চাতে দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে। সীতা ও লক্ষ্মণের সম্বন্ধের মধ্যে তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। যাহা আছে তাহাতে

বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। জিতেন্দ্রবাবুর মতে সমর্থনের উপাদান তাহাতে নাই।

স্বাভাবিক হউক অস্বাভাবিক হউক জিতেন্দ্রবাবুর একটা যুক্তি আছে যে তাহা না হইলে রামায়ণ রচনা হইতে পারিত না। যেরূপেই হউক লক্ষ্মণকে কুটীর ছাড়া করিতেই হইবে। আমরা এরূপ যুক্তির কি উত্তর দিব জানি না। বাল্মীকি যদি তাঁহার আদর্শ চরিত্রকে ঈষৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ না করিয়া কাব্য রচনা করিতে না পারিতেন, তবে রামায়ণ হইত না, লোকে তাঁহার যশোগান করিত না! ইহার অর্থ এই, যে এরূপ একটা অস্বাভাবিক ঘটনার আশ্রয় না লইলে আদি কবি রামায়ণ রচনা করিতে পারিতেন না! মহর্ষি বাল্মীকির মুকুট কে খর্ব্ব করিয়াছেন—যোগীন্দ্রবাবু না জিতেন্দ্রবাবু—সে কথা বুঝাইতে যাইয়া আমরা পাঠকের বুদ্ধির অবমাননা করিতে চাই না।

দ্বিতীয় যুক্তি এই, এরূপ না হইলে, অন্য তিরস্কারে যদি লক্ষ্মণ সীতাকে ছাড়িয়া যাইতেন তবে তাহা তাঁহার চরিত্রানুযায়ী হইত না। এ কার্য্যে লক্ষ্মণের যাহা দোষ হইয়াছে, তাহা কোন যুক্তিতেই স্খালিত হইবে না। তিনি যখন জানিতেন শ্রীরামের কোন বিপদ হয় নাই এবং উহা রাক্ষসদেরই চক্রান্ত তখন সীতাকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যাওয়ার দোষ রহিলই, তাহা যে কারণেই হউক। সীতার তিরস্কারের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেও শ্রীরাম লক্ষ্মণের কার্য্যে অনুমোদন করেন নাই—

ন হি তে পরিতুষ্যামি ত্যক্ত্বা যদসি মৈথিলীম্। আ, ৫৯।২৩

এ সম্বন্ধে জিতেন্দ্র বাবুর তৃতীয় যুক্তি এই, "যদি সীতাদেবী লক্ষ্মণকে কাপুরুষ বলিয়া জানিতেন তাহা হইলেও বা ভয়ের জন্য তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন না এমন সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হইতে পারিত।" কিন্তু সমর্থ হইয়াও যখন যাইতেছেন না, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার মনে কোনও দুরভিসন্ধি আছে, এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই, জিতেন্দ্রবাবু সীতাদেবীকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সে সময়ে তাঁহার এতটুকুও বিচারশক্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদি বিচারশক্তিই থাকিত তবে লক্ষ্মণের ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী সাধনার কথাটাই আগে মনে আসিত দ্বিতীয় কথা এই, কাপুরুষ বলিয়া না জানুন কিন্তু যে রাক্ষসের হাতে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন বিপদাপন্ন হইয়াছে সেই রাক্ষসের সম্মুখীন হইতে লক্ষ্মণের ভয় হইবে না ইহার প্রমাণ সীতাদেবী কোথায় পাইলেন? শ্রীরাম যখন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসহায় খরদূষণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন লক্ষ্মণ তো ভাল মানুষটীর মত সীতাকে লইয়া নিরাপদ স্থানে বাস করিতেছিলেন, রামের দোসর হইবার জন্য লক্ষ্মণ তো কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন নাই। যে অবস্থায় লক্ষ্মণের ত্রয়োদশ বর্ষোপার্জ্জিত শতঘটনায় পরীক্ষিত ব্রাহ্মণত্বটুকু সীতাদেবী ভুলিয়া গেলেন, সেই অবস্থায় অপরীক্ষিত অপ্রমাণিত ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাস করা কি স্বাভাবিক হইল? সীতা হরণের পূর্ব্বে লক্ষ্মণ এমন কিছুই করেন নাই যাহাতে তিনি ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মোণোচিত গুণের অভাব ছিল না। সীতার পক্ষে লক্ষ্মণের উপর সে সময়ে 'ভীরুতা দোষ আরোপ করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। জিতেন্দ্রবাবু বলিবেন, তাহাতে কাজ হাসিল হইত না। "মাইকেল যে তিরস্কার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ তো হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।" "রে ভীরু রে বীরকুলগ্লানি" না হয় হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু "যাব আমি দেখিব কাতরস্বরে কে স্মরে আমারে" বলিয়া যখন তীরধনুক লইয়া সীতাদেবী শব্দানুযায়ী দণ্ডকারণ্যের পথে বাহির হইয়া পড়িতেন, তখন বোধ হয় এক পাও না নড়িয়া কুটীরে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া সময় কাটাইয়া দেওয়া 'সুবুদ্ধি' লক্ষ্মণের পক্ষে সম্ভব হইত না তখন বিনা গালিতেই কার্য্য হাসিল হইত না কি? সুতরাং লক্ষ্মণচরিত্রের গুরুত্বও বজায় থাকিত, রামায়ণ রচনারও ব্যাঘাত হইত না এবং লক্ষণের তিরস্কার লইয়া এত কথাও উঠিতে পারিত না।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই "রে ভীরু রে বীরকুলগ্লানি" গালিটা কি হাসিয়াই উড়াইয়া দিবার কথা? বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষ বলিলে সে না হয় হাসিতে পারে, ক্ষত্রিয় হাসিতে পারে না। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালীও নাকি আর হাসিতেছে না। সংবাদ পত্রে প্রকাশ বাঙ্গালীও ভীরুতাপবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ইট পাটকেল্ ছুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের মর্ম্মস্থান কোথায় বাঙ্গালী বুঝিতে না পারিলেও ক্ষত্রিয় বুঝিতে পারে। লক্ষ্মণের মর্ম্মস্থান কোথায় শ্রীরামচন্দ্র

তাহা বুঝিতেন। তাই খরদূষণের আক্রমণে সীতাদেবীকে লইয়া জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতগহ্বরের নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিয়া ভাবিলেন যে ইহাতে হয় তো লক্ষ্মণের ক্ষত্রিয়াভিমান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, লক্ষ্মণ হয় তো মনে করিতে পারেন যে আমি তাহাকে যুদ্ধে অসমর্থ মনে করিয়া কৌশলে যুদ্ধস্থান হইতে সরাইতেছি, কোথায় আঘাত লাগিলে ক্ষত্রিয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মর্ম্মঘাতী বেদনা উপস্থিত হয় তাহা জানিয়াই বলিলেন—

ত্বং হি শূরশ্চ বলবান্ হন্যা এতান্ ন সংশয়ঃ।

ক্ষত্রিয়কে ভীরু বলিলে যে তাহার তীব্র যাতনা হয়, তাহার হৃদ্‌পিণ্ড বিদারিত হয়, তাহার হিতাহিত বিবেচনা-শক্তি লোপ পায়, ইহার দৃষ্টান্ত আছে। লক্ষ্মণেরই মত আর একজন জিতেন্দ্রিয় আত্মজয়ী ক্ষত্রকুলধুরন্ধর যিনি আত্ম-সংযমের মহাপরাধে নপুংসকত্বের অপবাদ লাভ করিয়াছিলেন, স্বীয় চরিত্রে ভীরুতার অপবাদ আরোপ করিতে না করিতেই সেই দেবোপম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই মস্তক ছেদনের জন্য খড়্গোত্তলন করিলেন, একদিন যাঁহাকে রেখামাত্র অতিক্রম করাকে মহাপাপ মনে করিয়া পরাক্রম সত্ত্বেও দ্বাদশ বৎসর দীনভাবে শত্রুর সকল উৎপীড়ন ও উপহাস সহ্য করিয়া বনে বনে ভ্রমণ এবং বৎসরেক কাল ক্লীববেশে বিরাটের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন। ভীরুতার গালি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কি মর্ম্মঘাতী তাহা অন্যে বুঝিবে কিরূপে? এখানে আরও একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। লক্ষ্মণ হয় তো রামায়ণী তিরস্কারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও দিতে পারিতেন, কেন না, অসম্ভব! যিনি কোন বিশেষ বিষয়ে জীবনব্যাপী পরীক্ষার দ্বারা উত্তীর্ণ জগজ্জনের নিকট প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, সেই বিষয়ে মোহে পড়িয়া কেহ তিরস্কার করিলে তিনি হাসিয়া উড়াইতে পারেন না কি? তাহা অন্যায্য হয় না, শোভনীয়ই হয়। ইন্দ্রজিৎজয়ী লক্ষ্মণকে কেহ ভীরু বলিলে, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" এই ন্যায় অনুসারে তিনি হাসিয়া উড়াইতে পারিতেন, কিন্তু যাঁহার ভিতরে ইন্দ্রজিৎবিজয়ের বীর্য্য রহিয়াছে অথচ জগতের কাছে প্রকাশ করিবার সুযোগ হয় নাই তাঁহাকে যখন অবস্থার ফেরে পড়িয়া ভীরু বলিয়া যাইতে হয়, তখন তাহার যে কি গভীর মর্ম্ম যাতনা উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝিবে? সীতাদেবীর কাছে লক্ষ্মণের এই দুর্দ্দশাই হইয়াছিল। লক্ষ্মণ তো তাঁহাকে বুঝাইতে পারিতেছিলেন না যে তিনি রাক্ষসের সম্মুখীন হইতে ভীত নহেন। যুক্তিও গ্রাহ্য হইল না, দৃষ্টান্তও নাই। সুতরাং সীতার মুখে "রে ভীরু রে বীরকুলগ্লানি" শুনিয়া লক্ষ্মণের যে কি মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সীতাদেবী অপূর্ব্ব তেজোময়ী ক্ষত্রিয়ললনা, তিনি সিংহিনী।" সীতা লক্ষ্মণের কাছে কেবল রমণী বা ভ্রাতৃবধূ নহেন, আরও কিছু—"দৈবতং ভবতী মম।" এই "আরও কিছু"র সম্বন্ধ যাঁহাদের সঙ্গে আছে তাঁহারা ভুল বুঝিয়া তিরস্কার করিলে যে হৃদয়ে শতগুণ বেশী শেল বিদ্ধ হয় তাহা কাহার না জানা আছে? সিংহ হইয়াও এই সিংহিনীর কাছে লক্ষ্মণ যখন শৃগাল বলিয়া গেলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে কি যাতনা না আসিবার কথা! এই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া লক্ষ্মণ যদি বাহির হইয়া পড়েন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবারই বা কি আছে। এই বেদনায় অধীর হইয়াই না ক্ষত্রিয়বীর বভ্রুবাহন একদিন জানিয়া শুনিয়াই পিতৃমস্তক ছেদন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই, মাইকেল যে তিরস্কার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎকালীন অবস্থায় লক্ষ্মণের পক্ষে উহাই অধিকতর হৃদয়বেধকারী। রামায়ণী তিরস্কারের অন্যায্যত্বের ইহাই দ্বিতীয় কারণ। একদিকে যেমন মাইকেল সুকৌশলে তিরস্কারের আড়ম্বর ছাড়াইয়া কার্য্য হাসিল করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষেপে তেজোময়ী ক্ষত্রিয়ললনার এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। জিতেন্দ্রবাবু যত সহজে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, মধুসূদনের কবিত্ব তত সহজে ভাসিয়া যাইবার নহে। আমরা বিংশ শতাব্দীর রুচিরূপ ক্ষুদ্র মাপকাঠি দ্বারা পরিমাণ করিতেছি না কিন্তু প্রাচীন গরিমাময় ক্ষত্রিয়ত্বের বিশাল মানদণ্ডের দ্বারাই বিচার করিতেছি। এই মানদণ্ড হারাইয়াই না ভারত আজ এত গরীব।

তারপর অত্যাচারী রক্ষোবংশের প্রতি সীতাদেবীর অনুকম্পার কথা। এ বিষয়টী জিতেন্দ্রবাবু এক কথায় শেষ করিয়া দিয়াছেন,—রক্ষোবংশের বিনাশে তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের উদয় অস্বাভাবিক। তাঁহার ঐকান্তিক কামনা পতি-সমাগম। যাহা পতিসমাগমের বিরোধী তাহার তিরোধানে আনন্দই হইবে, দুঃখ হইবে কেন? তিনি তো সর্ব্বদা রাক্ষস-

লের ধ্বংসই কামনা করিতেছিলেন, তবে তাহাদের বিনাশে দাকাটা করিতেন কেন? এই 'কেন'র উত্তর মানবহৃদয়ের দুরবগাহতা। যাহা সাধারণের কাছে অসম্ভব, অসাধরণ লোকোত্তরচরিত্রের কাছে তাহা সম্ভব। তাহা না হইলে তো যীশুখ্রীষ্টের আততায়িগণের জন্য "Father, forgive them, they know not what they do", অথবা যে পুরোহিতগণ প্রহ্লাদবধের জন্য ঘাতক উৎপন্ন করিয়াছিল, ঘাতকগণ যখন প্রহ্লাদকে ছাড়িয়া সেই পুরোহিতগণকে হত্যা করিতে লাগিল, তখন প্রহ্লাদের পক্ষে ভগবানের কাছে ব্যাকুলভাবে পুরোহিতগণের জীবনভিক্ষা অসম্ভব হয়! সীতার আন্তরিক ইচ্ছা পতিসমাগম। তাই বলিয়া তিনি আর সকল ভুলিয়া যান নাই, যে কোন উপায়ে উদ্দেশ্য সাধিত হউক, ইহাতে তাঁহার সম্মতি ছিল না, নইলে তো হনুমানের সঙ্গেই যাইতেন। তাহা যে শ্রীরামপত্নীর উপযুক্ত হয় না, তাহাতে শ্রীরামের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে না। সীতাদেবী রক্ষোবংশের ধ্বংস উদ্দেশ্যরূপে চিন্তা করেন নাই, পতিসমাগমের উপায়রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। রাবণ যদি স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া শ্রীরামের শরণাপন্ন হইত ও সীতা প্রত্যর্পণ করিত তবে রামায়ণ হইত না বটে কিন্তু সীতাদেবী কি বলিতেন, "না, আমি যাব না, শ্রীরাম রক্ষোবংশ ধ্বংস করিয়া আমাদের উদ্ধার করুন"। তাহা কখনই সম্ভব নয়। রক্ষোবংশ ধ্বংস অন্যতর উপায় মাত্র, রাবণবংশ বিনাশ ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না তাই এ কামনা। উদ্দেশ্য সাধনের উত্তেজনা যখন মনের উপর কার্য্য করিতে থাকে তখন উপায়ের কঠোরতার দিকে দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইবার পর তজ্জনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই উপায়োদ্ভূত নিরানন্দ অনেক সময়েই হৃদয়ে স্থান পায়, মনের উপরে একটা প্রতিক্রিয়া হয়—আহা, এরূপটা না হইয়াও যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত! এই যে মানবহৃদয়ে আনন্দ ও নিরানন্দের একত্র সমাবেশ, ইহা মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ—স্বীকার করেন। রামায়ণ পড়িতে পড়িতে কাহার হৃদয়ে না তীব্র আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় যে রাক্ষসবংশ ধ্বংস হউক, সীতার উদ্ধার হউক। কিন্তু এমন হৃদয়ই বা কয়টি আছে যে মন্দোদরীর বিলাপ শুনিতে শুনিতে রক্ষোবংশের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করিবে না। যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক জিতেন্দ্রবাবু তাহাই অস্বাভাবিক বলিয়াছেন। সুগ্রীবের একান্ত কামনা কি ছিল? ধর্ম্মপত্নী কাড়িয়া লইয়া উত্তরীয়খণ্ড পর্য্যন্ত না দিয়া যে বালী তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার ভয়ে দুদিন এক স্থানে সুস্থির হইয়া বাস করিতে পারিতেন না, সেই বালীর বিনাশই কি সুগ্রীবের শয়নস্বপনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল না! সে জন্য তিনি শ্রীরামকে কত ভাবেই না প্ররোচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বালী নিহত হইলেন, তখন সুগ্রীব কাঁদিয়া দেশ ভাসাইয়া দিলেন, নিজেকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রবাবু কি বলিতে চান, সম্ভব নয়! রামায়ণের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন সীতাদেবী রামসমাগমের জন্য যতটা ব্যাকুল হইয়াছিলেন রামচন্দ্র সীতাসমাগমের জন্য তাহা অপেক্ষা কম অধীর হন নাই। বালীবধে তো সেই পথই উন্মুক্ত হইল, তবুও তারার বিলাপে শ্রীরাম কাঁদিয়া আকুল হইলেন কেন?—

সমান-শোকঃ কাকুৎস্থঃ সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ। কি, ২৫।১

জিতেন্দ্রবাবু কি বলিবেন স্বাভাবিক হয় নাই! শ্রীরাম ক্ষত্রিয় পুরুষসিংহ হইয়াও যে কাঁদাকাটা করিলেন এবং মহর্ষি বাল্মীকি তাহাতে দোষ দেখিলেন না রমণী সীতার সেই নারীজনসুলভ কাঁদাকাটা দেখিয়া জিতেন্দ্রবাবু মাইকেলের প্রতি তুষানল ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির থাকিলে বলিতেন "কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্।" মধুসূদনও জানিতেন সীতা তেজোময়ী ক্ষত্রিয়ললনা, তিনি সিংহিনী "যাব আমি, দেখিব কাতরস্বরে কে স্মরে আমারে" এই দুটী কথাতেই সে প্রকৃতি অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার সঙ্গে বাঙ্গালী কুলবধূর কাঁদাকাটাটা যোগ করিয়া দিয়া সোনায় সোহাগা করিয়াছেন, কঠোরে কোমলের সমাবেশে লোকোত্তরচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বেদিতুমর্হতি॥" উত্তরচরিত।

শত্রুর প্রতি অনুকম্পায় মানবে দেবভাবের আবির্ভাব। এই দেবভাবে যে মাইকেলী সীতা রামায়ণী সীতাকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আমাদিগকে স্বীকারই করিতে হইবে।

এখানে কয়েকটী অবান্তর কথা উপস্থিত হইয়াছে।

সীতা কেন নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিলেন? ইন্দ্রজিৎবধে তাহার দোষ কি? তাঁহার কোনই দোষ নাই। ইন্দ্রজিৎ-বধে তাহার কারামুক্তির সুযোগ হইল সে জন্য তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ কেন না দিবেন? কিন্তু এই হর্ষের সঙ্গে একটু বিষাদের যোগ হওয়ায় দোষ কি? বিধাতা কেন তাঁহার কারামুক্তির এমন উপায় বিধান করিলেন যাঁহাতে "মরিল দানববাল অতুলা এ ভবে।" নারীই নারীর দুঃখ বুঝে। পতি বিরহ কি তাহা তো জানকী জানিতেন, সুতরাং রক্ষোবধূগণের প্রতি সহানুভূতিতে অস্বাভাবিকতা কোথায়? তাঁহারই কারামুক্তির জন্যই তো তাদের এ দুর্দ্দশা? তিনি কেন কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই শোকপুরীতে রমণীসুলভ সমবেদনার আবেগে যদি ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া থাকেন তবে তাহাতে সীতা-দেবীর মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে। আর মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা, মৃত্যুর পর সাধু ব্যক্তি শত্রুভাব রাখেন না। শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সম্বন্ধেও তাহা করেন নাই। তিনি মৃত রাবণ সম্বন্ধে বিভীষণকে আদেশ করিয়াছিলেন—

> মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
> ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষঃ যথা তব॥ ল, ১১১।২৫।

নিজের উপর দোষারোপ করা সাধুতার একটী লক্ষণ। আর্য রামায়ণেও সীতার এ সাধুতা আমরা দেখিতে পাই, সীতাদেবী নিজের দুঃখকষ্টের জন্য স্বীয় কর্ম্মফলকেই দায়ী করিতেছেন—

> কীদৃশন্তু মহাপাপং ময়া দেহান্তরে কৃতম্।
> যেনেদং প্রাপ্যতে ঘোরং মহদ্ দুঃখং সুদারুণম্॥ সু, ২৫।১৮।

রাম লক্ষ্মণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ভাবিয়া সীতাদেবী একদিন নিজেকেই ধিক্কার দিতেছেন—

> অহো ধিঙ্মন্নিমিত্তোহয়ং বিনাশো রাজপুত্রয়োঃ। ল, ৯৩।৫০।

ইন্দ্রজিৎ অপরাধী না নিরপরাধ। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে বিচার করিলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। ইন্দ্রজিৎ 'দেশবৈরী'র সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছেন। কেন যুদ্ধ ঘটিয়াছে তাহার বিচার তিনি করেন নাই, পিতার আদেশ পালন করিয়াছেন। এমন পিতার আদেশ পালন করিলেন কেন? পিতার আদেশ, তা লইয়া আর বিচার কেন। দশরথের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় অযোধ্যার অনর্থ, রাবণের পরস্ত্রীপিপাসায় লঙ্কার বিনাশ। শ্রীরাম পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছেন, মেঘনাদও পিতার আদেশেই প্রাণ দিয়াছেন।"

শেষে জিতেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন যে মাইকেল সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা দূরে থাকুক সে চরিত্রের আত্যন্তিকী অবনতি ঘটাইয়াছেন। কেন না, আর্ষ রামায়ণের সীতা "তেজোময়ী ক্ষত্রিয়ললনা," "সিংহিনী," "যুদ্ধের নামে ও যুদ্ধ দর্শনে তাঁহার অপার উৎসাহ ও আনন্দ," "তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বের প্রতি সন্দেহশালিনী ছিলেন না রামের জন্য তাঁহাকে ঠাকুর দেবতাকে মানত করিতে হইত না" কিন্তু "মেঘনাদ বধের সীতা কোদণ্ডটঙ্কারে মূর্চ্ছা যান যুদ্ধ হইতে শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হন, তিনি বাঙ্গালী রমণীর ন্যায় সিন্নি দিতে বিশেষ পটু, সুতরাং মাইকেলের এই ক্রন্দনপটু কথায় কথায় নষ্টচেতনা সীতা আদৌ ক্ষত্রিয়রমণী নহেন, বাঙ্গালীর গৃহবধূ।" সত্য কথা! কিন্তু সমালোচনার প্রথম অংশে সীতার কার্য্যবিশেষের সমর্থনের জন্য জিতেন্দ্র বাবুকে যে এই মাইকেলী সীতারই শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল, মত সমর্থনের আবেগে তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে জিতেন্দ্র বাবুর আর্ষ সীতাও "ভয়বিক্লবা শোকবশীভূতা বিমোহিতচেতনা জানকী"। মাইকেলের সীতার মধ্যে জিতেন্দ্র বাবু এতদতিরিক্ত আর কি পাইয়াছেন? উক্ত ঘটনায় তো ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে সীতাদেবী অন্ততঃ একদিনের জন্যও শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বের প্রতি সন্দেহবতী হইয়াছিলেন। সুতরাং পতির অমঙ্গল আশঙ্কা করা কেবল মাইকেলী সীতারই বিশেষত্ব নহে। জিতেন্দ্র বাবুর সমালোচনা পাঠ করিয়া মনে হয় যে তিনি এক অংশ লিখিতে যাইয়া অন্য অংশের কথা ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন। তাই এই দুর্দ্দৈব!

সীতা যে বীর্য্যবতী আর্য্যরমণী তা মাইকেল ভুলেন নাই, সে ভাবেও তিনি সীতাকে চিত্রিত করিয়াছেন। বীর্য্যবতী ক্ষত্রিয়ললনা কাহাকে বলে "প্রমীলা"র চিত্রকরকে তাহা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবে সীতার কাঁদা-কাটা কি আর্ষ রামায়ণে নাই? সীতাপতির বীর্য্যে বিশ্বাস-বতী ছিলেন, রাবণের প্রতি ভর্ৎসনায় আমরা তাহার পরিচয় পাই। তাই বলিয়া কি সে বিশ্বাস কখনও সন্দেহাচ্ছন্ন হইত না? হইত, তাহার প্রমাণ রামায়ণেই আছে। রাবণ-

আবদ্ধা সীতা রামলক্ষ্মণের কোন সম্বাদ না পাইয়া বতেছেন—

মনো ধারয়ন্তা মৃগস্য, সত্বেন রূপং মনুজেন্দ্রপুত্রৌ।
বিশস্তৌ মম কারণাৎ তৌ সিংহর্ষভৌ দ্বাবিব বৈদ্যুতেন॥ সু, ২৮।৯।

মৃগ কর্তৃক শ্রীরামের জীবন বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা নও সীতার মন হইতে যায় নাই, রাবণকে যতই ভৎসনা ন না কেন? সীতা একদিন রাক্ষসগণের জয়নাদ শুনিয়া-লেন, সে জন্যও তাঁহার মনে রামলক্ষ্মণের জীবনাশঙ্কা য় হইয়াছিল-

অথবা তৌ নরব্যাঘ্রৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
মন্নিমিত্তমনার্যেণ সমরেঽদ্য নিপাতিতৌ॥
ভৈরবো হি মহান্নাদো রাক্ষসানাং শ্রুতো ময়া।
বহুনামিহ হৃষ্টানাং তথা বিক্রোশতাং প্রিয়ম্॥ ল, ৯১।৪৯।

ংহনাদ শুনিয়া আর্ষ সীতার মনে যে আশঙ্কা হইল সেই শঙ্কায় মাইকেলী সীতা যদি পতির মঙ্গলকামনায় দেবতাদের কিয়া থাকেন তবে একটা কি মহাপরাধ হইয়া গেল? বে সিন্নিমানার কথাটা বিচার্য্য বটে! শিংশপাবৃক্ষের ন্তরালে হনুমানকে দেখিয়া "এখানে কোথা হইতে বানর াসিবে, আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখিতেছি, স্বপ্নে বানর দেখা মঙ্গল" এই ভাবিয়া সীতাদেবী রামলক্ষ্মণ ও জনকাদির ল প্রার্থনা করিলেন—

স্বপ্নো ময়ায়ং বিকৃতোঽদ্যদৃষ্টঃ শাখামৃগঃ শাস্ত্রগণৈর্নিষিদ্ধঃ।
স্বস্ত্যস্তু রামায় সলক্ষ্মণায় তথা পিতুর্মে জনকস্য রাজ্ঞঃ॥ সু, ৩২।৯।

তেন্দ্র বাবু কি বলেন? ঠাকুরদেবতাকে মানত করা কি? কথাটা এই বাল্মীকি বা মাইকেল কেহই সীতা-বীকে মানবত্ববিহীন করেন নাই। মানবীয় দুর্ব্বলতা ছেই। মানব আদর্শে যতটা ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থার গুণ্যে ততটা রক্ষা করিতে পারে না। সীতা হনুমানের স্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া একটা মস্ত উজ্জ্বল আদর্শ আমা-গকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রশোকপীড়িত রাবণের হার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া কাঁদিলেন -হনুমানের ঙ্গ না যাইয়া কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি—

হনুমতস্তু তদবাক্যং ন কৃতং ক্ষুদ্রয়া ময়া।
যদ্যহং তস্য পৃষ্ঠেন তদায়ায়মনির্জ্জিতা
নাদ্যৈব মনুশোচেয়ং ভর্ত্তুরঙ্কগতা সতী॥ ল, ৯৩।৫২।

তা তেজঃসম্পন্না আর্য্যনারী, সীতাদেবীতে ক্ষত্রিয়রমণীর ভীকতা থাকিলেও তিনিও যে সময়ে সময়ে ভয় পাইতেন হা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? রাবণাপহৃতা সীতা সতীত্ববলে বলবতী হইয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক তিরস্কার করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি তিনি কাঁদেন নাই?—

বৈদেহী রাবণাঙ্কগা।
ভয়শোক-সমাবিষ্টা করুণং বিললাপ হ॥ আ, ৫৩।২৫

জটায়ু দর্শনে—

সমাক্রন্দন্তয়পরা দুঃখোপহতয়া গিরা। আ, ৪৯।৩৭

জটায়ুর মৃত্যুদর্শনে—

রুরোদ সীতা জনকাত্মজা তদা। আ, ৫১।৪৬

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

তারপর জিতেন্দ্র বাবু উল্লিখিত সীতার যুদ্ধবিষয়ক আনন্দ ও উৎসাহ! আমরা মাইকেলী সীতাতেই একবার সীতাদেবীর যুদ্ধোত্তম দেখিয়াছি, আর্ষ রামায়ণে তো দেখি নাই। সীতা যে যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন সে কেবল যুদ্ধ ছাড়া উদ্ধারের উপায় ছিল না। এমন কি হনুমানের সঙ্গে না যাওয়ার একটা কারণ ছিল, যে যখন রাক্ষসেরা দেখিবে, হনুমান সীতাকে লইয়া যাইতেছেন তখন তাহারা হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, তাহা হইলে তো ভয় পাইয়া সীতাদেবী তাহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া যাইবেন।—

যুধ্যমানস্য রক্ষোভিস্তবতৈস্তৈঃ ক্রুরকর্ম্মভিঃ।
প্রপতেয়ং হি তে পৃষ্ঠাৎ ভয়ার্ত্তা কপিসত্তম॥ সু, ৩৭।৫২

জিতেন্দ্র বাবুকে এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহা যুদ্ধের নামে আনন্দ না উৎসাহ না মূর্চ্ছা! সীতাদেবী যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন বিরাধের সঙ্গে। আর্ষ রামায়ণ অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিব সীতার যুদ্ধদর্শনে কেমন আনন্দ ও উৎসাহ! বিরাধ রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কিঞ্চিৎ ভৎসনা করিয়াছিল, তাহাতেই—

শ্রুত্বা সগর্ব্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা।
সীতা প্রাবেপতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা॥ আ, ২।১৫

ইহা যুদ্ধদর্শনে আনন্দই বটে! তবে এইখানেই শেষ নয়, যখন বিরাধ সীতাকে ছাড়িয়া রামলক্ষ্মণকে লইয়া জঙ্গলা-ভিমুখে যাইতে লাগিল, তখন সীতাদেবী ঠিক বঙ্গকুললক্ষ্মীরই মত কাঁদিয়া ফেলিলেন—"ওগো, তোমরা আমাকে ফেলে কোথায় চল্লে গো, আমাকে যে এখুনি বাঘ ভালুকে খেয়ে ফেলবে; ওগো রাক্ষস, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, ওঁদের ছেড়ে দিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যাও"।—

মাং বৃকা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দ্দূলদ্বীপিনস্তথা।
মাং হরোৎসৃজ্য কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম॥ আ, ৪।৩

বাল্মীকি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন, নইলে "বাঙ্গালীর গৃহবধূ"র এমন সুন্দর চিত্র তিনি কোথায় পাইলেন ? বিরাধ সংঘর্ষে সীতার এই দশা দেখিয়াই খরদূষণসমরে সীতাকে লইয়া শ্রীরামকে একটু বিব্রত হইতে হইল। কেন না, "অনাগত বিধানন্তু কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।" তাই সীতাকে লইয়া জঙ্গলাবৃত দুর্গম গিরিগুহায় লুক্কায়িত হইবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ করিলেন—

গুহামাশ্রয় শৈলস্য দুর্গাং পাদপ-শঙ্কুলাম্। আ, ২৪।১২

ইহার সঙ্গে মাইকেলের "সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে"র বিভিন্নতা কোথায় ? উভয়েরই যুদ্ধ দর্শনে অপার উৎসাহ ও আনন্দ! আরও একটী কথা আছে; যিনি বিরাধের সগর্ব্বিত বাক্য শুনিয়াই ভয়ে বাতাহত কদলীর ন্যায় কাঁপিয়াছিলেন, তিনি যদি ত্রিভুবনবিজয়ী দশাননের গভীর হুঙ্কারে মূর্চ্ছিতা হইয়া থাকেন তবে সে জন্য মধুসূদনকে আণ্ডামানে পাঠাইয়া দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে ? এ কথাটা আমরা জিতেন্দ্রবাবুকে পুনর্ব্বিচার করিয়া দেখিতে বলি। আর, সীতাদেবী কি অচেতন হইতেন না ? তিনি যে বীর্য্যবান্ হনুমানকে দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন!—

অহো ভীমমিদং সত্ত্বং বানরস্য দুরাসদম।
দুর্নিরীক্ষ্যমিদং মত্বা পুনরেব মুমোহ সা॥ সু, ৩২।৪

"পুনরেব মুমোহ সা" ও 'অচেতন হৈনু পুনঃ" এ দুয়ে কি কোন পার্থক্য আছে ? তবে জিতেন্দ্রবাবুর কথার সার্থকতা কোথায় ? জিতেন্দ্রবাবু সীতাদেবীর মধ্যে যতটুকু বাঙ্গালীর গৃহবধূত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা মধুসূদনের নিজস্ব নহে, আর্ষ রামায়ণ হইতে ধার করা, সুতরাং তজ্জনিত দোষ বা গুণের জন্য মহা কবি বাল্মীকিই প্রধানতঃ দায়ী, মধুসূদন নকল নবীশ মাত্র। আমরা কাচ ও বৈদূর্য্য মণিতে কোন পার্থক্য দেখিতেছি না। অথবা, জিতেন্দ্রবাবু, কাচকে বৈদূর্য্যমণি ভাবিয়াছেন না বৈদূর্য্যমণিকে কাচ ঠাওরাইয়াছেন—পাঠকবর্গের হস্তে সে মীমাংসার ভার দিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ। দিল্লী।

চিত্র-পরিচয়।

১। ধ্যানিবুদ্ধ (জাভা অর্থাৎ যবদ্বীপে একটী প্রস্তরমূর্ত্তি হইতে)।

২। দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সাকারলাল দেশাই এম, এ, এল, এল, বি।—ইনি সুরাটে শিল্প আলোচনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত ব্যক্তি, বরোদা-রাজ্যে জজ ছিলেন। ইনি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে খুব ভাল বুঝেন। ইঁহার নিজের দুইটী কাপড়ের কল আছে।

৩। রায় বাহাদুর লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্কর।—ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্মলকজ্ কোর্টের জজ। প্রার্থনা সমাজের সভ্য এবং সমাজ-সংস্কার-কার্য্যে পরম উৎসাহী। ইনি সুরাট সমাজ-সংস্কার-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

৪। পণ্ডিত রামসুন্দর।—ইনি কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের হিন্দুগণের পৌরোহিত্য করিবার জন্য সেখানে বসবাস করিতেছেন। তথাকার গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদিগকে দাগী বদমাইসের মত আঙ্গুলের ছাপ দিয়া প্রত্যেককে রেজেষ্টরী করিতে হইবে এইরূপ হুকুম করায় তথাকার ভারতবাসীরা এই আইনের বিরোধী হন এবং এই হুকুম অমান্য করেন। পণ্ডিত রামসুন্দর এইজন্য প্রথমেই জেলে গিয়া থাকেন। পণ্ডিত রামসুন্দর ধন্য। ভারতবর্ষে এইরূপ লক্ষ লক্ষ রামসুন্দরের আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন।

ভ্রমসংশোধন।

"গতবারে প্রকাশিত দেবদূত নাট্য কাব্যের প্রথম দৃশ্যে 'কাল—অপরাহ্ন' ভ্রম ক্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা 'কাল—রাত্রি' হইবে।"

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দময়ন্তী ও হংস।

[illegible]

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। | ফাল্গুন, ১৩১৪। | ১১শ সংখ্যা।

বৈদিক অধ্যাত্ম-বাদ।

জগৎ, আত্মা ও ব্রহ্ম এই তিনটী বস্তু লইয়াই দর্শন শাস্ত্র। কিন্তু সমুদয় দর্শন শাস্ত্রেরই যে ভিত্তি এক তাহা নহে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যাঁহারা বলেন "জড়ই মূল বস্তু, এই জড় হইতেই আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে—জড়াতিরিক্ত কোন বস্তু নাই"। হেকেল (Haekel), বুক্‌নার (Buchner) বগ্‌ট (Vogt) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই দলের নেতা। ভারতবর্ষেও এ প্রকার মতের অভাব নাই। লোকায়তিকগণের মত এই যে "চৈতন্যং ভূতধর্ম্ম"—চৈতন্য জড়েরই গুণ। বার্ক্‌লি প্রমুখ আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন—তাঁহারা ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে জড় বলিয়া 'স্ব-তন্ত্র' কোন বস্তু নাই—জগৎ মানবাত্মার জ্ঞানবিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবাত্মাকে অবলম্বন করিয়াই ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে—মানবাত্মা ছাড়া ইহার অস্তিত্ব নাই। আর এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা বলেন। পিতামহ ক্যাণ্ট (Kant) হইতেই এই মতের উৎপত্তি। ক্যাণ্টের মতে মানবাত্মার দেশ ও কাল নামক দুইটী যবনিকা আছে। এই দুইটী যবনিকাতে কতকগুলি উপাদান আসিয়া পতিত হয়, কিন্তু কোথা হইতে এই উপাদান আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা আমরা জানিতে পারি না। তবে এই উপাদানের কারণ যে দেশ ও কালের অতীত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সমুদয় উপাদান গ্রহণ করিয়া আমরা এই জগৎ রচনা করি, কিন্তু উপাদান সমূহ আমাদিগের সৃষ্টি নহে। ফিক্টে (Fichte) ইঁহারই শিষ্য। শিষ্য গুরু অপেক্ষাও অগ্রসর। ইঁহার মতে এই সমুদয় উপাদানও মানবাত্মার সৃষ্টি; মানবাত্মা নিজেই উপাদান সৃষ্টি করে এবং নিজেই এই সমুদয় সজ্জিত করিয়া এই জগৎ রচনা করে। The science of knowledge নামক গ্রন্থে ফিক্টে এই মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। The Ego is the absolute totality of Reality (পৃঃ ১০৬); অর্থাৎ—আত্মা সমুদয় সত্তার একমাত্র আধার, ইহার বহির্ভাগে কোন সত্তা নাই।—The Non-Ego is itself a product of the Ego 'অনাত্ম বস্তু আত্মা হইতেই উৎপন্ন'। এই মতের নাম অধ্যাত্মবাদ (Subjective Idealism).

ভাষার আবরণ ভেদ করিলে কথাটা দাঁড়ায় এই :—মানব নিজ চৈতন্য হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ মানবাত্মাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, মানবাত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এতটা বলিবার সাহস পান নাই। তাঁহারা ভাষার কঠিন আবরণে সত্যটাকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণের কথা স্বতন্ত্র; ইঁহাদের কোন ভয় ভাবনা

ছিল না—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন সোজাসুজি তাহাই বলিয়া ফেলিতেন। ইঁহাদের মতবিষয়ে কাহাকেও কখনই অন্ধকারে থাকিতে হয় না। এই সাহস ও সত্যনিষ্ঠার জন্যই ঋষিগণকে এত সম্মান করিয়া থাকি।

বার্ক্লি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক, ফিক্টে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিজ দর্শন প্রচার করেন, কিন্তু তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এই অধ্যাত্ম-বাদ প্রচারিত হইয়াছিল। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কৌষীতকি, ঐতরেয় ইত্যাদি প্রাচীন উপনিষদে এই মত অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা অদ্য কৌষীতকি উপনিষদের অধ্যাত্ম-বাদ ব্যাখ্যা করিব।

আত্মা ও ব্রহ্ম।

'আত্মা' কাহাকে বলে, এবং 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ কি—ইহা সর্ব্বপ্রথমেই বলা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ আর নাই। সুতরাং দেখা যাউক এই গ্রন্থে 'আত্মা' শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দের মৌলিক অর্থ প্রাণবায়ু। 'আত্মানম্ বাতম্ অভিঅর্চত' ১০।৯২।১৩। অর্থাৎ আত্মাবায়ুকে অর্চনা কর। এখানে আত্মাকে বায়ু কিম্বা বায়ুকেই আত্মা বলা হইল। এই 'বায়ু দেবগণের আত্মা'—আত্মা-দেবানাম্ ১০।১৬৮।৪। একস্থলে বরুণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে 'আত্মা তে বাত' ৭।৮৭।২ অর্থাৎ বায়ু তোমার আত্মা। অথর্ব্ববেদে মৃতব্যক্তি কিম্বা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে "বাতাৎ তে প্রাণম্ অবিদম্, সূর্য্যাৎ চক্ষুঃ অহম্ তব" আমি বায়ু হইতে তোমার প্রাণ এবং সূর্য্য হইতে তোমার চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছি ৮।২।৩। সূর্য্য হইতে যেমন চক্ষু এবং বায়ু হইতে প্রাণ আগমন করে তেমনি মৃত্যুর সময়ে চক্ষু সূর্য্যে এবং প্রাণ বায়ুতে প্রতিগমন করে। দেহ ভস্মীভূত করিবার সময় মৃতব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে :-

'সূর্য্যম্ চক্ষুঃ গচ্ছতু বাতম্ আত্মা, (ঋঃ ১০।১৬।৩) অর্থাৎ তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক এবং আত্মা বায়ুতে গমন করুক। আলোক ভিন্ন দর্শন কার্য্য অসম্ভব এই জন্যই ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন সূর্য্য হইতে চক্ষু (অর্থাৎ দৃষ্টি শক্তি) আগমন করে এবং মৃত্যুকালে সূর্য্যেই প্রতিগমন করে এবং এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও বায়ু একই বস্তু এই জন্য বলা হইয়াছে প্রাণ বায়ু হইতে আগমন করে এবং বায়ুতেই প্রতিগমন করিয়া থাকে। একস্থলে আকাশকে আত্মাযুক্ত বলা হইয়াছে 'আত্মন্বৎ নভঃ' ৯।৭৪।৪। বায়ু আকাশকে পূর্ণ করিয়া থাকে এই জন্যই আকাশ আত্মাবান্। ঋগ্বেদে লিখিত আছে ভুজ্যু নামক একজন রাজর্ষি জলমগ্ন হইয়াছিলেন কিন্তু অশ্বিদ্বয় নৌকার সাহায্যে ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই নৌকাকে একস্থলে (১।১১৬।৩) আত্মাযুক্ত (আত্মন্বতীভিঃ নৌভিঃ) অপর এক স্থলে পক্ষযুক্ত ও আত্মাযুক্ত (প্লবং আত্মন্ বন্তং পক্ষিণং ১।১৮২।৫) বলা হইয়াছে। 'পক্ষিণং' শব্দের অর্থ পক্ষযুক্ত অর্থাৎ পা'লযুক্ত। পা'লের সাহায্যে বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া নৌকা তীরে উপস্থিত হইয়াছিল এই জন্যই নৌকাকে পক্ষযুক্ত এবং আত্মাযুক্ত (অর্থাৎ বায়ুযুক্ত) বলা হইয়াছে। 'আত্মা' অর্থ যে প্রাণবায়ু উপনিষদেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অদ্যকার প্রবন্ধেই তাহার পরিচয় পাইব। কেবল ভারতে কেন অপরাপর দেশেও আত্মা শব্দের এই একই ইতিহাস। 'spirare' ধাতুর অর্থ নিশ্বাস গ্রহণ করা। এই ধাতু হইতেই spirit কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে। লাটিন ভাষায় 'spiritus' শব্দের অর্থ নিঃশ্বাস। ইংরাজী ভাষাতেও spirit শব্দের প্রাচীন অর্থ 'নিঃশ্বাস' কিন্তু ইহার বর্ত্তমান অর্থ আত্মা। প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থে মানবসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে :-The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul.

এখানে নিঃশ্বাসকেই জীবন্ত আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা বলা হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মা শব্দের প্রাচীন অর্থ প্রাণবায়ু। ঋগ্বেদেই এই শব্দের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই দেখা যায়। কোন কোন স্থলে আত্মা শব্দের অর্থ শরীর। "সর্বস্মাৎ আত্মনঃ তম্ ইদম্ বিবৃহামি তে" (১০।১৬৩।৫,৬) অর্থাৎ তোমার সমুদয় অঙ্গ হইতে ইহা (অর্থাৎ এই যক্ষ্মা রোগ) দূর করিতেছি। আরও অনেক স্থলে (১।১৬৩।৬, ১০।৯৭।৪,৮ ইত্যাদি) 'শরীর' অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহের সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুতরাং এক অপরের অর্থে ব্যবহৃত হইতে

পারে। শরীরের মধ্যে যদি কোন বস্তুর বিশেষত্ব থাকে তবে তাহা প্রাণবায়ু। যতক্ষণ মানব জীবিত থাকে ততক্ষণই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং এই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অভাবেই মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সুতরাং প্রাণই যে জীবনী শক্তি এ বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ঋগ্বেদে জীবনী শক্তি অর্থেও আত্মা (অর্থাৎ প্রাণ) শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। একস্থলে আছে 'রোগীর বল বিধান করিবার জন্য আমি ওষধি হস্তে ধারণ করিলাম। হিংস্র প্রাণী যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি রোগের আত্মা (যক্ষ্মস্য আত্মা) বিনষ্ট হউক ১০।৯৭।১১। বর্ত্তমান যুগেও আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রাণ শব্দের মৌলিক অর্থ বায়ু। মানব প্রথমে জড়ীয় ভাষা ও ভাব লইয়াই ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়ীয় ভাষার জড়ীয় ভাব অল্পে অল্পে বিদূরিত হইতে থাকে। কালে ভাব এতই উন্নত হয় যে মানুষ আর তখন বুঝিতে পারে না যে উচ্চভাবপ্রকাশক ভাষা এক সময়ে জড়ীয় ভাব প্রকাশ করিত। আত্মা সম্বন্ধেও ইহাই ঘটিয়াছে। এক সময়ে আত্মার অর্থ ছিল বায়ু, প্রাণ-বায়ু; এখন ইহার অর্থ চৈতন্য। আত্মা শব্দের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে ইহা কেবল মানবেই প্রযুজ্য হইতে পারে। যিনি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করেন তাঁহারই আত্মা, কিম্বা তিনিই আত্মা অর্থাৎ

আত্মা—জীবাত্মা।

ঋগ্বেদে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ মন্ত্র অথবা স্তুতি। ব্রহ্ম শব্দের বহুবচনও (ব্রহ্মাণি ব্রহ্মভিঃ ব্রহ্মভ্যঃ ইত্যাদি) বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যাঁহারা মন্ত্র রচনা করেন তাঁহাদের নাম 'ব্রহ্ম-কৃৎ'। বেদের যে অংশে মন্ত্রতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে সে অংশের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং যাঁহারা মন্ত্র রচনা বা উচ্চারণ করেন তাঁহাদিগকেও 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়। ঋষিগণ হৃদয়ের আবেগে দেবগণকে আহ্বান করিতেন অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। ইহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে এই প্রার্থনা শুনিয়া দেবগণ তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কালক্রমে এই বিশ্বাস প্রবল হইতে লাগিল যে মন্ত্রের অসাধারণ ক্ষমতা। মন্ত্রের ক্ষমতায় দেবগণও বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন (৩।১৮,৩।৫।২ ইত্যাদি)। দেবগণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাঁহাদিগকে উপাসকের নিকট উপস্থিত হইতেই হইবে। মীমাংসকগণ ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে দেব দেবীর কোন অস্তিত্ব নাই। তবে যে যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ মন্ত্রের ক্ষমতা,—মন্ত্রবলে অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বৈদিক শব্দ প্রভাবেই দেবতাদি সৃষ্ট হয় (বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবাদিকম্ জগৎ প্রভবতি ১।৩।২৮)। পূর্ব্বে বিশ্বাস করা হইত দেবগণই জগতের স্রষ্টা। কালক্রমে এই বিশ্বাস হইল যে মন্ত্রই দেব-গণকে সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা অর্থাৎ মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর কি হইতে পারে? এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি কি প্রকারে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা হইল।

এখন প্রশ্ন এই সৃষ্টিকর্ত্তা কে? যদি বল ব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা হইলে কোন উত্তরই দেওয়া হইল না। কারণ 'ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা' বলাও যাহা 'সৃষ্টিকর্ত্তাই সৃষ্টিকর্ত্তা' বলাও ঠিক তাহাই। ক=ক, খ=খ, রাম=রাম ইত্যাদি বাক্যে নূতন কোন কথাই বলা হয় না। এখন যেমন অনেক লোকে জিজ্ঞাসা করে "ব্রহ্ম কি আমাকে কি তাহা দেখাইয়া দিতে পার?"—প্রাচীন কালেও তেমনি অনেক লোক এই প্রকার প্রশ্ন করিত। অনেক ঋষির মনেও এই ধারণা ছিল যে ব্রহ্ম বহু বস্তুর মধ্যে একটী বস্তু; এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে একটী বিশেষ বস্তু এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। উপ-নিষদের যুগে আকাশ, বায়ু চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন মীমাংসাই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অবশেষে যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক, অজাতশত্রু ইত্যাদি মহাপুরুষের মতই বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাঁদিগের সিদ্ধান্ত এই 'আত্মাই ব্রহ্ম' অর্থাৎ আত্মাই জগতের মূলাধার, আত্মাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে আত্মা এবং মানবাত্মা একই বস্তু। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই,—মানবাত্মাই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি উপনিষদ।

কৌষীতকি ঋষি বলেন—"প্রাণই ব্রহ্ম"। মন এই প্রাণ-

রূপ ব্রহ্মের দূত, বাগিন্দ্রিয় ইহার পরিবেশনকর্ত্রী, চক্ষু ইহার রক্ষক, শ্রোত্র ইহার প্রতিহারী। এই প্রাণরূপ ব্রহ্মের উদ্দেশে ইন্দ্রিয়সমূহ অযাচিত ভাবে বলি প্রদান করিয়া থাকে। (কৌঃ উঃ ২।১)।

নিজমত সমর্থন করিবার জন্য ঋষি অপর এক ঋষির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। "প্রাণ ব্রহ্ম ইতি হ স্মাহ পৈঙ্গঃ" অর্থাৎ পৈঙ্গ ঋষি বলেন প্রাণই ব্রহ্ম।

ঋষি কাহাকে প্রাণ বলিতেছেন তাহা উক্ত অধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে :

"সমুদয় ইন্দ্রিয় নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য বিবাদপরায়ণ হইয়া এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করিল। তখন এই শরীর দারুবৎ শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর বাক্ এই শরীরে প্রবেশ করিল কিন্তু ইহা বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যোচ্চারণ সমর্থ হইয়াও পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিল। তৎপর চক্ষু এই শরীরে প্রবেশ করিল কিন্তু বাক্‌দ্বারা উচ্চারণ সমর্থ ও চক্ষুদ্বারা দর্শন সমর্থ হইয়াও পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিল। অনন্তর শ্রোত্র এই শরীরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ইহা বাক্‌দ্বারা উচ্চারণ সমর্থ, চক্ষুদ্বারা দর্শন সমর্থ এবং শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ সমর্থ হইয়াও পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিল। তদনন্তর মন এই শরীরে প্রবেশ করিল, কিন্তু ইহা বাক্‌দ্বারা উচ্চারণ সমর্থ, চক্ষুদ্বারা দর্শন সমর্থ শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ সমর্থ এবং মনদ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াও পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়া রহিল। তৎপরে প্রাণ এই শরীরে প্রবেশ করিল তখন এই শরীর উত্থিত হইল। তখনে ইন্দ্রিয় সমূহ প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইলেন এবং প্রাণকেই প্রজ্ঞাত্মা বলিয়া সম্যক অনুভব করিয়া সকলের সহিত ইহলোক হইতে উৎক্রমণ করিল" ২।৯।

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে বড় এই লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও প্রাণ এই পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে প্রাণও একটী ইন্দ্রিয়। সুতরাং 'প্রাণ' অর্থ 'প্রাণবায়ু'। ঋষির মতে এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা এবং প্রাণই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই মত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদ এপর্য্যন্ত বাহির হয় নাই যে একখানা অনুবাদ আছে দার্শনিক আলোচনার পক্ষে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য আমাদিগকে এই দুইটী অধ্যায়ই অনুবাদ করিতে হইতেছে। অদ্য তৃতীয় অধ্যায় অনূদিত হইল।

ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন সংবাদ।

"দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পৌরুষ দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয়ধামে গমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন "প্রতর্দ্দন! আমি তোমাকে বর প্রদান করিব"। প্রতর্দ্দন বলিলেন "মনুষ্যের পক্ষে তুমি যে বর হিততম বলিয়া মনে কর, তাহাই আমার জন্য মনোনয়ন কর"। ইন্দ্র বলিলেন "অপরের জন্য কেহ বর মনোনয়ন করে না—তুমিই মনোনয়ন কর"। প্রতর্দ্দন বলিলেন "এরূপ হইলে সে বর আমার পক্ষে অ-বর হইবে (কিম্বা অশ্রেষ্ঠ হইবে)।" তখন ইন্দ্র সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, কারণ ইন্দ্র সত্যস্বরূপ। তিনি বলিলেন "আমাকেই অবগত হও; আমি ইহাই মানবের পক্ষে হিততম বলিয়া মনে করি যে মানব আমাকে অবগত হইবে। আমি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে বধ করিয়াছি। অরুন্মুখ যতিদিগকে সালাবৃক নামক জন্তুর মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি। বহুবার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া স্বর্গে প্রহ্লাদপক্ষীয় লোকদিগকে, অন্তরীক্ষে পৌলোমগণকে এবং পৃথিবীতে কালখঞ্জদিগকে বিনাশ করিয়াছি। এই সমুদয় কালে আমার একটী লোমেরও উচ্ছেদ হয় নাই। যে আমাকে জানে সে হিংসিত হয় না। কি পিতৃহত্যা, কি মাতৃহত্যা, কি চৌর্য্য, কি ভ্রূণহত্যা কিছুই তাহাকে হিংসা করিতে পারে না। সে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার মুখের কান্তি বিলুপ্ত হয় না"। ১।

ইন্দ্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

প্রাণ = আয়ু = প্রজ্ঞাত্মা।

"ইন্দ্র বলিলেন আমি প্রাণ আমি প্রজ্ঞাত্মা আমাকে আয়ু ও অমৃত রূপে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ এবং প্রাণই আয়ু। প্রাণই অমৃত। যতক্ষণ শরীরে প্রাণ থাকে ততক্ষণই আয়ু; প্রাণদ্বারাই পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করা যায়। প্রজ্ঞাদ্বারা সত্য সঙ্কল্প লাভ হয়। যে আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা করে, সে ইহলোকে পূর্ণায়ু এবং স্বর্গলোকে অমৃতত্ব ও অক্ষয়ত্ব লাভ করে"।

প্রাণ কাহাকে বলে ঋষি এখানে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিলেন। প্রাণ এবং আয়ু একই বস্তু। এই প্রাণ বা আয়ুর নামই আত্মা। এ প্রাণ জ্ঞানবিহীন নহে, ইনি প্রজ্ঞ; এই জন্য প্রাণের নাম প্রজ্ঞাত্মা। এখানে প্রাণে চৈতন্য আরোপ করা হইল।

ইন্দ্রিয় সমূহের একীভাব।

"এ বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন প্রাণসমূহ (= ইন্দ্রিয়সমূহ) একীভূত হইয়া থাকে, কারণ কেহ একই সময়ে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নাম (বাক্য) উচ্চারণ করিতে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিতে এবং মনদ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং প্রাণসমূহ একীভূত হইয়া এই সমুদয় কার্য্য একে একে সম্পন্ন করিয়া থাকে (অর্থাৎ প্রাণসমূহ একীভূত হইলে কেবলমাত্র একটী ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, অপরাপর ইন্দ্রিয় নিজেদের কার্য্য না করিয়া ঐ ইন্দ্রিয়েরই অনুগমন করে এবং উহারই কার্য্য করিয়া থাকে)। এইরূপে যখন যে ইন্দ্রিয়ের নেতৃত্ব, তখন কেবল সেই ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হইয়া থাকে। যখন বাগিন্দ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া উচ্চারণ করে। যখন চক্ষু দর্শন করে তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া দর্শন করে। যখন শ্রোত্র শ্রবণ করে তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রবণ করে। যখন মন চিন্তাকরে, তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া চিন্তা করে। যখন প্রাণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্যকরে তখন অপরাপর ইন্দ্রিয় ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্য করে। ইন্দ্র বলিলেন ইহা সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয় সমূহের মধ্যে (মুখ্য) প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বও রহিয়াছে"।২।

প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাণ＝প্রজ্ঞা।

"বাক্শক্তিরহিত ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, মূক ইহার দৃষ্টান্ত। চক্ষুবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, অন্ধ ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রোত্রবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, বধির ইহার দৃষ্টান্ত। চিন্তাশক্তিবিহীন ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, বালক ইহার দৃষ্টান্ত। ছিন্নবাহু এবং ছিন্নোরু ব্যক্তিও জীবন ধারণ করে, কারণ এরূপ ব্যক্তি আমরা দেখিয়া থাকি। এই প্রাণরূপী প্রজ্ঞাত্মাই শরীর পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে চালিত করে। সুতরাং ইহাকে উক্থ রূপে উপাসনা করিবে। "যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ"। এতদুভয়ে একত্রে এই শরীরে বাস করে এবং একত্রেই উৎক্রমণ করে। এ বিষয়ে ইহাই দৃষ্টান্ত এবং ইহাই বিজ্ঞান। যখন সুপ্ত পুরুষ স্বপ্ন দর্শন করেন না তখন তিনি প্রাণের সহিত একীভূত হয়েন। তখন বাগিন্দ্রিয় সমুদয় নামের সহিত, চক্ষু সমুদয় রূপের সহিত, শ্রোত্র সমুদয় শব্দের সহিত, মন সমুদয় চিন্তার সহিত একীভূত হয়"।

এখানে বলা হইতেছে যে (১) চক্ষু, কর্ণ, মন, হস্ত, পদ, না থাকিলেও মানব জীবিত থাকিতে পারে সুতরাং প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু নাই। (২) প্রজ্ঞা ও প্রাণ দুইটি পৃথক বস্তু শরীরে একত্র বাস করিতেছে (৩) এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা পৃথক হইলেও ইহারা একই। কেন ইহাদিগের সমীকরণ করা হইল তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে।

মানবাত্মাই জগৎস্রষ্টা।

"অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ যেমন চতুর্দ্দিকে বিসৃত হয়, তেমনি পুরুষ জাগ্রত হইলে এই আত্মা হইতে প্রাণ সমূহ। প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয় হইতে লোক সমূহ (বিশ্বজগৎ) যথা স্থানে প্রেরিত হয়। ইহাই এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এবং ইহাই বিজ্ঞান। যখন পুরুষ পীড়িত অবস্থায় মুমূর্ষু হইয়া আবলা ও মোহ প্রাপ্ত হয় তখন লোকে বলিয়া থাকে 'ইহার চিত্ত উৎক্রমণ করিয়াছে, এ ব্যক্তি শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, কথা বলে না, চিন্তা করে না'। এই সময় পুরুষ প্রাণের সহিত একীভূত হয়। তখন বাগিন্দ্রিয় নামের সহিত, মন সমুদয় চিন্তার সহিত, ইহাতে মিলিত হয়। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ সমূহ চতুর্দ্দিকে বিসৃত হয়, তেমনি পুরুষ জাগ্রত হইলে আত্মা হইতে প্রাণ সমূহ, প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সমূহ এবং ইন্দ্রিয় হইতে লোক সমূহ যথা স্থানে প্রেরিত হয়।" ৩॥

এখানে কয়েকটী বিষয় ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। (১) কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে ঋষির মতে যখন প্রাণও একটী ইন্দ্রিয় তখন প্রাণ হইতে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের কি প্রকারে উৎপত্তি সম্ভব? ঋষি পূর্ব্বেই ইহার উত্তর দিয়াছেন। মুমূর্ষু অবস্থায় এবং নিদ্রিতাবস্থাতেও বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রাণেই বিলীন হয় এবং পুরুষ জাগ্রত হইলে ইন্দ্রিয়সমূহ আবার প্রাণ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণই ইন্দ্রিয়সমূহের আধার। প্রাণ স্রষ্টা এবং সৃষ্ট উভয়ই। মুখ্য প্রাণরূপে ইনি স্রষ্টা, ইন্দ্রিয়রূপে সৃষ্ট। মুখ্য প্রাণেই প্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ প্রতিষ্ঠিত। (২) ঋষির মতে প্রাণই প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই প্রাণ। এরূপ বলিবার একটী বিশেষ কারণ আছে। প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে প্রাণেরই প্রাধান্য দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাণ বলিলেই যে জ্ঞান বা চৈতন্য বুঝাইবে এমন নহে। অথচ প্রজ্ঞাহীন প্রাণের কোন মূল্য নাই। এই জন্যই প্রাণকে প্রজ্ঞা বলা আবশ্যক হইয়াছে। আবার প্রজ্ঞা বলিলে প্রাণ না বুঝাইতে পারে এইজন্য প্রজ্ঞাকেও প্রাণ বলা হইয়াছে। ঋষি প্রাণ ও প্রজ্ঞার পার্থক্যও স্বীকার করিয়াছেন নতুবা বলিবেন কেন "এতদুভয় এই শরীরে একসঙ্গে বাস করে এবং একত্রই উৎক্রমণ করে"। প্রাণের কার্য্য এক এবং প্রজ্ঞার কার্য্য অন্য এই জন্যই এতদুভয়কে পৃথক বস্তু বলা হইয়াছে। এখানে একটী গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। প্রজ্ঞাই মানবের বিশেষত্ব, এই প্রজ্ঞা না থাকিলে মানবের বিশেষত্ব চলিয়া যায় এবং প্রাণ না থাকিলে মানব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মানবের পক্ষে এতদুভয়েরই সমান আবশ্যকতা রহিয়াছে। এখন কথা এই আমরা যাহাকে মানবাত্মা বলি তাহা একটী বস্তু কিন্তু দেখা যাইতেছে যে ইহা প্রাণ ও প্রজ্ঞা এই দুইটা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কি অসঙ্গত নহে? এই অসঙ্গতি দোষ দূর করিবার জন্যই ঋষিকে বলিতে হইতেছে যে 'যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ'।

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ব্যাপার প্রাণেরই অনুগমন করে।

"পুরুষ যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে তখন এই সমুদয়ের সহিতই উৎক্রান্ত হইয়া থাকে। বাক্য ইহা হইতে সমুদয় নাম লইয়া যায়, কারণ বাক্য দ্বারাই সমুদয় নাম গৃহীত হয়। নিশ্বাস ইহা হইতে সমুদয় গন্ধ লইয়া যায় কারণ নিশ্বাস দ্বারাই সমুদয় গন্ধ গৃহীত হয়। চক্ষু ইহা হইতে সমুদয় রূপ লইয়া যায় কারণ চক্ষু দ্বারাই সমুদয় রূপ গৃহীত হয়। শ্রোত্র ইহা হইতে সমুদয় শব্দ লইয়া যায় কারণ শ্রোত্র দ্বারাই সমুদয় শব্দ গৃহীত হয়। মন ইহা হইতে সমুদয় চিন্তা লইয়া যায় কারণ মন দ্বারাই সমুদয় চিন্তা গৃহীত হয়। প্রাণেই সকলের গতি হয়। যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। এতদুভয় একত্রে এই শরীরে বাস করে এবং একত্রই উৎক্রমণ করে। অনন্তর এই প্রজ্ঞাতে কিরূপে ভূতসমূহ একীভূত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিব"। ৪॥

এখানেও ঋষি প্রাণ ও প্রজ্ঞার পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন এবং এতদুভয়ের সমীকরণও করা হইয়াছে।

ভূতমাত্রার উৎপত্তি।

"বাক্ ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'নাম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাণ (=নিশ্বাসপ্রশ্বাস) ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'গন্ধ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। চক্ষু ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'রূপ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। শ্রোত্র ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'শব্দ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। জিহ্বা ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'অন্নরস' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। হস্ত ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'কর্ম্ম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। শরীর ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'সুখদুঃখ' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। ... ... পাদদ্বয় ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'গতি' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে এবং ইহার ভূতমাত্রা 'জ্ঞান, জ্ঞেয় ও কাম' বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে"। ৫ ॥

Fichte যাহাকে 'Externalisation of the Ego' বলিয়াছেন এখানেও ঠিক তাহাই বলা হইয়াছে। ঋষির মতে নাম, গন্ধ, রূপ, শব্দ, অন্নরস, কর্ম্ম, 'সুখ ও দুঃখ', 'আনন্দরতি ও প্রজাতি', গতি এবং 'জ্ঞানজ্ঞেয় ও কাম' এই দশটী ভূতমাত্রা। এই দশটী ভূতমাত্রা লইয়াই জগৎ; বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাকে (অর্থাৎ প্রাণকে) দোহন করিয়া এই সমুদয় ভূতমাত্রা উৎপন্ন করিয়াছে। এবং এই সমুদয় ভূতমাত্রা আত্মার বাহিরে স্থাপিত হইয়াছে। পাঠকগণ এই মতের সহিত Fichte (ফিক্‌টে)এর মতের তুলনা করিতে পারেন। The Ego goes beyond itself and posits something as external to itself... something, as it were, loosens itself from the Ego, which will probably change gradually by further determination into an external universe (The Science of Knowledge পৃঃ ১৯৬, ১৯৭) অর্থাৎ "আত্মা নিজেই নিজের বহির্ভাগে কিছু স্থাপিত করেন। আত্মা হইতে যেন কিয়দংশ খসিয়া পড়ে—এবং ইহাই নানাপ্রকার প্রক্রিয়াতে জড়জগৎ রূপে পরিণত হয়"। দেখা যাইতেছে ঋষির মতে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাণকে দোহন করিয়া ভূতমাত্রা উৎপন্ন করিয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহও আবার প্রাণ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এ জগৎ প্রাণেরই বিকার অর্থাৎ মানবাত্মারই বিকার।

এ জগৎ প্রজ্ঞামূলক।

"প্রজ্ঞা দ্বারা বাগিন্দ্রিয় আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) বাক্য দ্বারা সমুদয় নাম প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা প্রাণ আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) প্রাণ দ্বারা (=নাসিকা দ্বারা) সমুদয় গন্ধ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা চক্ষু আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) চক্ষু দ্বারা সমুদয় রূপ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা শ্রোত্র আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) শ্রোত্র দ্বারা সমুদয় শব্দ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা জিহ্বা আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) জিহ্বা দ্বারা সমুদয় অন্নরস প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা হস্ত আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) হস্ত দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা শরীর আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) শরীর দ্বারা সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা (পুরুষ) আনন্দ রতি ও প্রজাতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা পাদদ্বয় আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) পাদদ্বয় দ্বারা গতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা ধী আশ্রয় পূর্ব্বক (পুরুষ) প্রজ্ঞা দ্বারা ধী জ্ঞেয় ও কাম প্রাপ্ত হয়।" ৬ ॥

প্রজ্ঞা ভিন্ন জ্ঞান অসম্ভব।

"প্রজ্ঞাবিরহিত বাগিন্দ্রিয় নাম বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। লোকে বলে 'আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এ নাম অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত প্রাণ (=নাসিকা) কোন গন্ধ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। লোকে বলে, 'আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এ গন্ধ অবগত হই নাই।' প্রজ্ঞাবিরহিত চক্ষু কোন রূপ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এ রূপ অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত শ্রোত্র শব্দ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এ শব্দ অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত জিহ্বা অন্নরস বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এ অন্নরস অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত হস্ত কোন কর্ম্ম বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এ কর্ম্ম অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত শরীর সুখ দুঃখ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এ সুখ দুঃখ অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত ইন্দ্রিয় আনন্দ রতি ও প্রজাতি বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না, লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল আমি এ আনন্দ রতি ও প্রজাতি অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত পাদদ্বয় গতি বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না লোকে বলে আমার মন অন্যত্র ছিল, আমি এ গতি অবগত হই নাই। প্রজ্ঞাবিরহিত হইলে ধী সম্ভব হয় না, জ্ঞাতব্য বিষয়ও জানা যায় না।" ৭ ॥

প্রাণ এবং প্রজ্ঞার একত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই এত কথা বলা হইল। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে প্রাণ হইতেই ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয় হইতে জগতের উৎপত্তি। এখানে বলা হইতেছে প্রজ্ঞার সাহায্য ভিন্ন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাত্মক জগৎ বিজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ যে কেবল প্রাণের উপরই নির্ভর করিতেছে তাহা নহে প্রজ্ঞার উপরেও ইহাদিগকে নির্ভর করিতে হইতেছে। এইজন্য ঋষি বলিতেছেন প্রাণ ও প্রজ্ঞা বিরোধী বস্তু নহে—ইহাদিগের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে এবং ইহারা একই বস্তু।

প্রজ্ঞাত্মাকেই জানিতে হইবে।

"বাক্‌কে জানিতে ইচ্ছা করিবে না,—বক্তাকেই জানিতে হইবে। গন্ধকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—ঘ্রাণকর্ত্তাকেই জানিতে হইবে।

রূপকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—রূপবিদ্‌ কে জানিতে হইবে। শব্দকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—শ্রোতাকেই জানিতে হইবে। অন্নরসকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—অন্নরসের বিজ্ঞাতাকেই জানিতে হইবে। কর্ম্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—কর্ত্তাকেই জানিতে হইবে। সুখ দুঃখকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—সুখদুঃখের বিজ্ঞাতাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। আনন্দরতি ও প্রজাতিকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না—আনন্দরতি ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিতে হইবে। গতিকে জানিতে হইবে না কিন্তু গন্তাকেই জানিতে হইবে। মনকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না কিন্তু মনন কর্ত্তাকেই জানিতে হইবে"।

প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা।

"এই দশটী ভূতমাত্রা (=রূপরসাদি বিষয়) প্রজ্ঞাশ্রিত এবং দশটী প্রজ্ঞামাত্রা (=বাগাদি ইন্দ্রিয়) ভূতাশ্রিত। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না এবং প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলেও ভূতমাত্রা থাকিত না। এতদুভয়ের মধ্যে (কেবলমাত্র) একটী হইতে কোন বিষয়ই সম্ভব হয় না; (কিন্তু আবার) ইহা নানা নহে (অর্থাৎ প্রজ্ঞামাত্রা ও ভূতমাত্রা পৃথক বস্তু নহে)। যেমন রথের অর সমূহে নেমি এবং নাভিতে অর সমূহ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা ভূতমাত্রাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে"।

ঋষির বলিবার অভিপ্রায় এই যে প্রাণই মুখ্য বস্তু, ইহারই অপর নাম প্রজ্ঞাত্মা। ইনি কেবল ইন্দ্রিয় নহেন—ইনি প্রজ্ঞাত্মাও বটেন। আত্মা হইতেই ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সমূহই আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। এ জগৎ ইন্দ্রিয়ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই মতের অনুসরণ করিয়াই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "সর্ব্বং হি অন্তঃকরণবিকারমেব জগৎ"—(মণ্ডুকভাষ্য ২।১।৪)। অর্থাৎ এই বিশ্বজগৎ অন্তঃকরণেরই বিকার। রূপরসাদি বিষয় প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে এবং প্রজ্ঞামাত্রাও জগৎকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। Fichte (ফিকটে)এর ভাষায় No Subject without an Object and no Object without a Subject. অর্থাৎ বিষয় ভিন্ন বিষয়ী থাকিতে পারে না এবং বিষয়ী ভিন্নও বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। যেখানে ইন্দ্রিয় সেইখানেই ইন্দ্রিয়ব্যাপার এবং যেখানে ইন্দ্রিয়ব্যাপার সেইখানেই ইন্দ্রিয়। যেখানে ইন্দ্রিয় নাই, সেখানে ইন্দ্রিয়ব্যাপারও নাই এবং যেখানে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার নাই, বুঝিতে হইবে সেখানে ইন্দ্রিয়ও নাই। যদি বিষয় ছাড়া বিষয়ী না থাকিতে পারে তাহা হইলে আত্মার স্বাধীনতা রহিল কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেন, যিনি জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়। ফিকটের ভাষায় "The Ego is not to be regarded as subject merely but at once subject and object" অর্থাৎ আত্মা কেবল বিষয়ী নহেন তিনি বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই অর্থাৎ তিনি "বিষয়-বিষয়ী"। ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন "ন উ এতৎ নানা"—ইহার মধ্যে নানাত্ব নাই—এতদুভয় একই।

আত্মাই ব্রহ্ম।

"এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ অজর ও অমৃত। ইহা সাধু কর্ম্ম দ্বারা বর্দ্ধিত হয় না এবং অসাধু কর্ম্ম দ্বারাও হীন হয় না। ইহা যাহাকে উর্দ্ধে লইতে চাহে তাহাকে সাধু কার্য্য করাইয়া থাকে আর যাহাকে নিম্নে লইতে চাহে তাহাকে অসাধু কার্য্য করাইয়া থাকে। ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনি সর্ব্বেশ্বর। ইনিই আমার আত্মা, এই রূপ জানিবে।" ৮॥

এই অধ্যায়ের উপসংহারে প্রাণকে আবার প্রজ্ঞাত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইল। ইনিই আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ও অজর। এই প্রাণ 'পরিপূর্ণ',—এই প্রাণ 'পূর্ণাত্মা', এই উপদেশ দিবার জন্যই বলা হইল যে সাধু বা অসাধুকর্ম্ম দ্বারা ইহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এখন প্রশ্ন, পাপপুণ্য করে কে? ইহার উত্তর এই:—প্রাণ ইন্দ্রিয়সমূহের অন্তর্ভূত হইলেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। এই প্রাণ হইতেই ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাণই ইন্দ্রিয়-সমূহের কর্ত্তা—ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের কর্ত্তা। ইনিই ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবকে নিয়মিত করিতেছেন এবং ইনি বিশ্বজগৎকে নিয়মিত করিতেছেন। বিশ্বজগৎ প্রাণ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণেই অধিষ্ঠিত। এইজন্যই বলা হইয়াছে ইনি লোকপাল, লোকাধিপতি ও সর্ব্বেশ্বর। ইহাই অধ্যাত্মবাদের চরমসীমা। সংক্ষেপে

আত্মা ব্রহ্ম।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

বিলাতীভাব ও বিলাতীশিক্ষা।

২

(পিরিউর ফরাসী হইতে)

মেকলে যে মৎলব আঁটিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হুকুম জারী করিলেন যে, শিক্ষার জন্য যে টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে, এখন হইতে তাহা ইংরাজি শিক্ষায় ব্যয়িত হইবে। এই হুকুম জারী হইবার

পূর্ব্বে সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য ও সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের বৃত্তির জন্য যে টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা আপাততঃ বাহাল রহিল। অধ্যাপকের পদ খালি হইলে, কিংবা ছাত্রবৃত্তির টাকা নিঃশেষ হইলে, সরকারী সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইবে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু, যাহা কেহ ক্রয় করে না, পাঠ করে না, শুধু একস্থানে গাদা করিয়া রাখে সেই সব সংস্কৃত, পার্সি ও আরবী পুঁথি ছাপাইবার জন্য যে টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার এক কপর্দ্দকও ছাঁটা যাইবে না, সেই পরোয়ানায়, বাহ্যতঃ এইরূপ একটা নিষেধ বাক্যও ছিল। পণ্ডিতেরা কত ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে এই পুঁথি সকল প্রকাশ করিতেছিলেন, শুধু এই আশায় যে তাহার মধ্য হইতে মানব-ইতিহাসের কোন একটি অমূল্য অংশ পুনর্লব্ধ হইতে পারে- এ কথা মেকলে আদৌ বুঝিতে পারেন নাই।

এক্ষণে, এই শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত খুটিনাটিগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাক। মেকলে যে ভাবে ইংরাজি শিক্ষার প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার কথা অগত্যা বর্জ্জিত হইয়াছিল। এই শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যেরূপ কার্পণ্য সহকারে অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা আদৌ যথেষ্ট নহে; শুধু তাহাই নহে, যদি ২০ কোটি লোককে ইংরাজি শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে অনেক শিক্ষক ও অধ্যাপকের প্রয়োজন—এত শিক্ষক ও অধ্যাপক কোথায় পাওয়া যাইবে? মেকলে একথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন:— "হিন্দুদের মধ্য হইতে এমন একটা শ্রেণী আমাদের গঠন করিতে হইবে, যাহারা— সরকার ও কোটি কোটি প্রজা এই উভয়ের মধ্যে দোভাষীরূপে কাজ করিতে পারিবে, যাহারা জন্ম ও রঙে হিন্দু, কিন্তু রুচিতে, মতামতে, আচরণে ইংরাজ হইবে।" অতএব দেখা যাইতেছে, তিনি যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে ধনাঢ্য ও ভদ্র শ্রেণীর লোকদিগেরই লাভ হইবার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে সেক্‌স্পীয়ার অধ্যয়ন যেমন অপরিহার্য্য, একটু লিখিতে পড়িতে পারা, একটু অঙ্ক ও ভূগোল জানা জনসাধারণের পক্ষে তেমনি আবশ্যক। কিন্তু উচ্চশিক্ষা এমনি প্রবল বেগে চলিতে লাগিল, অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের শাসনকার্য্যে এরূপ একটা জড়তার ভাব ছিল যে, ব্যক্তিবিশেষের উদ্যম চেষ্টা সত্ত্বেও, এই কথা বহু বিলম্বে কিংবা কখন কখন চকিতের ন্যায় কর্ত্তৃপক্ষের মাথায় প্রবেশলাভ করে। যত কিছু অর্থসাহায্য কালেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় সকলই লাভ করিতে লাগিল। প্রাথমিক শিক্ষা বহুকাল বিস্মৃত ও বরাবর উপেক্ষিত হইয়া ছিল,—এখন দেখা যাক্‌, ইহার পরিণাম কি দাড়াইয়াছে।

মেকলে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অধ্যাপক, পুস্তক ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি চাহিলেন।

উচ্চশিক্ষার উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা, ১১ হইতে ৪০-এ এবং উহার ছাত্র সংখ্যা ৩৪০০ হইতে ৬০০০-এ উঠিল। হিন্দুরা আগ্রহসহকারে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। বিদ্যালয়ে, বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোককেই গ্রহণ করা হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন ভেদ বিচার ছিল না। পক্ষান্তরে বারাণসী ও কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যশ্রেণীর জন্যই উদ্‌ঘাটিত হইল। অন্য বর্ণের সহিত মেশামিশির ভয়ে, ভদ্রশ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে বিরত হইল না। যখন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, সরকারী কাজকর্ম্মে পারস্যভাষার ব্যবহার রহিত হইল, বিশেষতঃ যখন হার্ডিঞ্জের এই মন্তব্য-লিপি প্রচারিত হইল যে, ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে যে সব ভাল ভাল ছাত্র বাহির হইবে, তাহাদিগকে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে, তখন এই ভদ্র শ্রেণীরই বিশেষ লাভ হইল। প্রতিযোগিতার পরীক্ষাপ্রণালী স্থাপিত হইল। নিকৃষ্ট বর্ণের লোকেরা ইহাতে আকৃষ্ট হইল না—এইরূপ শিক্ষা তাহাদের ক্ষমতাতীত। ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা এই শিক্ষাকে অবজ্ঞা করিল। সহরের ব্রাহ্মণ ছাত্রই অধিকাংশ এই সব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল—সেই ব্রাহ্মণ-জাতি যাহাদের মধ্যে বহুশতাব্দি হইতে বিদ্যাশিক্ষা এক-চেটিয়া হইয়া ছিল।

অবশেষে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যকতা কর্ত্তৃপক্ষের মনে প্রতিভাত হইল। মেকলের আমল হইতে তখন ২০ বৎসর অতীত হইয়াছে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স্‌ একটা খুব জমকাল ধরণের মৎলব আঁটিলেন। ভারতকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়া হইবে—এই শিক্ষাপদ্ধতি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজন অনুসারে ধাপে-ধাপে উঠিবে; সর্ব্বোচ্চ

শিক্ষা, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা, নিম্নতর প্রাথমিক শিক্ষা—সকল প্রকার শিক্ষাই এই প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত ;—কিছুরই অভাব নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে:—উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, কালেজ, মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয় —ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। এ পর্য্যন্ত, সমস্তই মেকলেরই প্রণালী—তবে একটু বর্দ্ধিত আকারে গঠিত এই মাত্র। নূতনত্ব এইখানে:—প্রাথমিক পাঠশালা-সকল স্থাপিত হইবে। তখন হইতেই শিক্ষার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। চাষাদিগকে ইংরাজি-শিক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা, এই কারণেই প্রাথমিক পাঠশালায়, স্থানীয় দেশ-ভাষায়, একটু লিখিতে পড়িতে শেখান হইবে—একটু অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইবে। এ বেশ কথা! কিন্তু এইরূপ আরম্ভ করিয়া তাহার পর ইহার কার্য্য-পরিসর একটু বাড়াইয়া মাধ্যমিক পাঠশালা সকল কি স্থাপন করা যাইতে পারিত না—যেখানে ইংরাজি শিক্ষা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন হইবে? কিন্তু আমার মনে হয়, আশু-উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় কর্ত্তৃপক্ষের বিকৃত দৃষ্টি এই শিক্ষাসমস্যাটাকে উল্টাভাবে দেখিতে লাগিল। তাঁহারা জাপানীদের ন্যায়, গৃহের বনিয়াদ ও দেয়াল না বানাইয়া আগেই গৃহের ছাদ প্রস্তুত করিলেন। কলিকাতার একজন মুসলমান জজ আমাকে এইরূপ বলিয়া ছিলেন:—

"ইংরাজেরা ভারতবর্ষের কিছুই বুঝে নাই; তাঁহারা ভারতের জন্য এমন কতকগুলি অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ভারতকে এমন একটি ভাষা দিয়াছেন, যাহা ভারতের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। হিন্দী ভাষাকে কেন তাঁহারা ভারতের সাধারণ ভাষা করিয়া রাখিলেন না? তোমরা ফরাসী, তোমরা আলজিরিয়াকে ইংরাজের অপেক্ষা ভাল বুঝিয়াছ।" এইরূপ প্রশংসালাভে আমরা এতই অনভ্যস্ত যে, আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। একথা ঠিক, ইংরাজসরকার বনিয়াদ না করিয়াই, একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ তুলিয়াছিলেন। এখন দেখ, সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! কাহাকে বিদেশী ভাষায় ললিত-চারু সৌখীন ধরণের শিক্ষা দিলেই কি যথেষ্ট হয়?—কখনই না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কেজো ধরণের জ্ঞান, অধিক সংখ্যক লোকের হাতের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

তাঁহাদের এই সুন্দর কার্য্যতালিকার শেষ ফল কি হইল?—গর্ভপাত! অবশ্য কতকটা প্রশংসনীয় চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু যেরূপ লোকসংখ্যা তাহাতে উহা কার্য্যে পরিণত হওয়া দুরূহ। তবু ত অনেক স্থানে নূতন করিয়া কিছুই স্থাপন করিতে হয় নাই। কোন কোন প্রদেশের বড় বড় গ্রামে দেশীয় পাঠশালা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। যেমন মনে কর বাংলা ও মাদ্রাজে। এই সব স্থানে নূতন কোন পাঠশালা খুলিবার প্রয়োজন হয় নাই, বর্ত্তমান পাঠশালা-গুলিকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা স্থায়ী করিয়াই সরকারের কার্য্য সিদ্ধ হইল। বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে প্রাথমিক পাঠশালা সকল পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত ছিল, এবং স্থানীয় ম্যুনিসিপ্যালিটি হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। প্রত্যেক গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করা দুঃসাধ্য তাই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে মণ্ডল-বিভাগের (circle) পদ্ধতি অনুসৃত হইল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান স্থানে একএকটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপিত হইল—এবং সেই সকল পাঠশালাই সরকার হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইল। সেই পাঠশালার অধ্যক্ষ, সেই এলাকার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করিতেন। অবশেষে, গত ত্রিশ বৎসর মধ্যে, এই প্রাথমিক পাঠশালার সহিত আর কতক-গুলি মাধ্যমিক পাঠশালাও সংযোজিত হইল—এই মাধ্যমিক পাঠশালায় স্থানীয় দেশ ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়—কিন্তু ইহার পাঠ্যতালিকা আরও একটু বিস্তৃত; বীজগণিত, ভৌতিক বিজ্ঞান, ও অল্পস্বল্প রসায়ণ এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এই ত গেল শিক্ষার বন্দোবস্ত, কিন্তু এই বন্দোবস্তের ফল কি হইল?—ভারতের অধিকাংশ লোকেই অনক্ষর হইয়া রহিল। এ একটা ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভারতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা বিদেশী ভাষায় লিখিতে পারে কিন্তু নিজের ভাষা পড়িতে পারে না। এখানে প্রাথমিক পাঠশালা অপেক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অধিক! ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ এখন আমার হাতে নাই। কিন্তু ১৮৯১-র আদম-সুমারীর বিবরণ অনুসারে,—যে সকল হিন্দু পড়িতে পারে তাহার আনুপাতিক সংখ্যা—শত করা ৬। কি জন্য এই ভয়ঙ্কর ন্যূনতা? একটা কারণ, দেশীয় লোকের ততটা আগ্রহ নাই—আবার এই আগ্রহ না

থাকিবারও কারণ,—যথেষ্ট পাঠশালা নাই। সরকার হইতে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়, তাহা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু। অর্থের অভাবেই,—শিক্ষকের অভাব, পুস্তকের অভাব, ছাত্রের অভাব। ফলতঃ, সরকারের মন্তব্যলিপি সত্ত্বেও, অনুসন্ধান-সমিতি প্রভৃতির ইচ্ছা সত্ত্বেও,—প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় ও কালেজগুলাই পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বিজ্ঞাপিত কার্য্য-তালিকা অনুসারে,—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে,—কলিকাতা, মাদ্রাজ, ও বোম্বাই এই তিন প্রধান নগরে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লাহোরে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এবং এক্ষণে আলীগড়ের মুসলমান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীতে উন্নীত হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। এই লাহোরের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া, অবশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ধরণে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেবল পরীক্ষা করা, ও পদবী বিতরণ করাই উহাদের কার্য্য। লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে উহারা গঠিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত কালেজ-সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি কালেজ সরকারের স্থাপিত; কতকগুলি কালেজ হিন্দুদের, কতকগুলি মুসলমানদের, আর কতকগুলি প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক খৃষ্টান মিশানারিদের স্থাপিত। কিন্তু এই সকল কালেজে সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সরকার নিজের কালেজে ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, এবং সরকারের আশ্রিত ও সাহায্য প্রদত্ত কালেজ সমূহেও এই নিয়ম প্রতিপালিত হয়। ইহার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য এই দেখা যায়;—বোম্বাই ও কলিকাতায় জেসুইট্-পাদ্রিরা তাহাদের বিদ্যালয়ের জন্য, সরকার হইতে অর্থসাহায্য ও সেই সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের নিয়মটিও গ্রহণ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান কালেজ, ইহার কোনটাই গ্রহণ করে নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর, হিন্দু ছাত্রদিগের সম্মুখে কালেজের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। দুইটা ভাষা জানা চাইই-চাই—প্রথম মুখ্য ভাষা ইংরাজি—এবং দ্বিতীয় গৌণ ভাষা, সংস্কৃত, পার্সি, ল্যাটিন্, গ্রীক্ কিম্বা ফরাসী। এই সকল ভাষা, শিক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। তাছাড়া, য়ুরোপের ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এবং বোম্বাই প্রদেশে ভৌতিক বিজ্ঞানও কতকটা শিখিতে হয়। ল্যাটিন্, গ্রীক, ফরাসী—সংস্কৃতের সহিত এক শ্রেণী ভুক্ত!—এ ব্যবস্থাটা কেমন বল দেখি! দুই বৎসরের শেষে, শিক্ষার্থীকে আর একটা পরীক্ষা দিতে হয়, এবং আরও দুই বৎসর পরে বি-এ পরীক্ষা দিতে হয়—(ইহা আমাদের Baccalauréat—পরীক্ষার মতো। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, আইন, চিকিৎসা, এঞ্জিনিয়ারিং এই সমস্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত উপাধি বিতরিত হয়। Master of Arts—এই উচ্চ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার ধৈর্য্য ও সাহস অতি অল্প লোকেরই থাকে।

Baines তাঁহার ১৮৯১এর আদমসুমারি বিবরণে বলেন যে, ১৮৮৬—৯১ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ৪৮৮৫ বি-এ উপাধি এবং ৩৪৭ এম-এ উপাধি বিতরিত হইয়াছে। তিনি বলেন, লোকসংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা বিন্দুবৎ নগণ্য। তাহার পর যদি দেখা যায়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে ইহাই কি প্রতিপন্ন হয় না যে বিলাতী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে? বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বেকার মতোই বর্ণ বিশেষেরই একচেটিয়া হইয়া রহিল। অধিকাংশ হিন্দুই সভ্যতাদায়িনী শিক্ষার শুভ ফল ভোগ করিতে পারিল না। প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় মাধ্যমিক শিক্ষাও সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়াছে। তাহার কারণ আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রথমেই এমন একটা ভাষা শিখিতে হয় যাহা শিক্ষার্থীর নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, যাহা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, যাহা আয়ত্ত করিবার জন্য, আর সমস্ত বিষয় অপেক্ষা অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ইংরাজি শিক্ষা হইতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরাই উপকৃত হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, হিন্দুজাতির বাহিরে যে সকল জাতি আছে—যাহারা সংখ্যায় বড় কম নহে, সেই মুসলমান জাতি,—যাহারা বুদ্ধিতে বড় কম নহে। সেই পার্সিজাতি—ইহারাও ইংরাজিশিক্ষা হইতে লাভবান্ হইয়াছে, বোম্বাই নগর যাহাদের উপনিবেশ—যাহারা খুব ধনী ও জ্ঞানী, সেই পার্সিজাতির এই একটা অভিমান আছে যে তাহাদের মধ্যে একজনও অনক্ষর নাই—দরিদ্রও নাই। বোম্বায়ের কলেজগুলির যে এরূপ

উন্নত অবস্থা, তজ্জন্য সেই সব কলেজ, পার্সি ধনকুবের-দিগের নিকট ঋণী। সংখ্যায় যাহারা ছয় কোটি, এবং ভারতের অদৃষ্টের উপর যাহাদের প্রভাব বড় কম নহে—সেই মুসলমানেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইংরাজি ইস্কুলের প্রতি বিমুখ ছিল। ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রভুরা, ভারতের বর্ত্তমান প্রভুদের নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইল। এই অরুচিজনক বিদেশীশিক্ষা, তাহাদের গর্ব্ব ও বিদ্বেষ বুদ্ধিকে আরও দৃঢ়ীকৃত করিল। ইংরাজেরা হিন্দীভাষাকে ভারতের সাধারণ ভাষা করেন নাই বলিয়া, যে জজ্ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি একজন মুসলমান। এখন মুসলমানেরা বুঝিয়াছে, এই শিক্ষা হইতে বিরত থাকিয়া তাহারা একটা ভারি ভুল করিয়াছে; এখন তাহারা মনে-মনে বুঝিতেছে, এই জন্যই হিন্দু ও পার্সিরা তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের উপরে উঠিয়াছে। একজন সৈয়দ্ যখন উত্তর-ভারতে আলীগড়ের মুসলমান কালেজ স্থাপন করিলেন, তখন হইতেই, ইংরাজিশিক্ষা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হইল। যে সময়ে হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস-সভা বসে, সেই একই সময়ে মুসলমানদেরও বার্ষিক শিক্ষা-কংগ্রেসেরও অধিবেশন হয়।

ভারতবাসীগণ আমাদের ফরাসীভাষা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শিক্ষা করে। ইহাতে আমাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভাষা শিক্ষার জন্য তাহারা আমাদের নিকট ঋণী নহে। যে ব্যক্তি বোম্বায়ে ফরাসীভাষাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি একজন স্পেনদেশীয় লোক। কতকগুলি পার্সি বালিকা তাঁহার ছাত্র ছিল, তাহাদেরই যত্ন ও চেষ্টায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফরাসী শিখাইবার অধিকার-পত্র প্রাপ্ত হন। প্রথমে এই বিষয় লইয়া একদল লোকের সহিত বালিকাদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; তাহারা কখনও ভাবে নাই যে জেসুইট্ পাদ্রিরা এই কাজে তাহাদিগকে বাধা দিবে। কিন্তু শেষে বালিকাদিগেরই জিদ্ বজায় রহিল। তাহারাই জয়লাভ করিল। সেই অবধি ফরাসীভাষা—সংস্কৃত পার্সি, ল্যাটিন ও গ্রীকের সহিত সমান আসন প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ, যাহা অবশ্যশিক্ষনীয় সেই ইংরাজির পরেই বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইল। ফরাসী ভাষার ধরণ-ধারণ ও সৌন্দর্য্যে তাহারা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, পুরাতন জাতীয়ভাষা সমূহের সহিত ফরাসীভাষার শোচনীয় প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। যাহারা সোনার চস্‌মার আড়ালে সুন্দর নেত্রযুগল ঢাকিয়া রাখে, সেই বোম্বাই নগরস্থ অ্যালেকজান্দ্রা স্কুলের বালিকারা, ফার্সি অপেক্ষা আমাদের ভাষাকে বেশী পছন্দ করে। ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা সংস্কৃত পরিত্যাগ করিয়া ফরাসী পড়ে। এই উদ্যোগ অনুষ্ঠান যদি আরও কিছু দিন সমানভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে পুরাতন ভারতের প্রাচীন-ভাষার অনুরাগী ভক্তলোক নিতান্ত বিরল হইয়া পড়িবে; ভক্তের মধ্যে থাকিবে শুধু কতকগুলি পণ্ডিত; তাঁহারাই "ফ্রান্স-কালেজের" ন্যায় মুষ্টিমেয় শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। হিন্দুরা ফরাসী শিখিতেছে—এ ত খুবই ভাল কথা; কিন্তু শেষে যদি বাধ্য হইয়া, সংস্কৃত শিখিবার জন্য তাহাদিগকে ফ্রান্সে আসিতে হয়, সেটাও ত উচিত হয় না।

বিশেষতঃ বোম্বাই নগরেই ফরাসী ভাষার শিক্ষা, বিস্তার লাভ করিয়াছিল; কেন না প্রথমে ঐখানেই উহার অঙ্কুর গজাইয়া উঠে। আমি 'এলফিন্‌ষ্টোন কালেজ' 'নিউ-হাই-স্কুল' 'এলফিন্‌ষ্টোন হাইস্কুল,' জেসুইট্ পাদ্রিদের পরিচালিত 'সেণ্ট-জেভিয়ার কালেজ,' 'অ্যালেক্‌জান্দ্রা স্কুল' দেখিতে গিয়াছিলাম। এলফিন্‌ষ্টোন্-কালেজ, এলফিন্‌ষ্টোন্ হাইস্কুল—এই দুইটী সরকারী বিদ্যালয় পার্সিদের অর্থে স্থাপিত। অপরগুলি পার্সিদিগের একেবারেই নিজস্ব। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালক ও অধ্যাপকগণ আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। টুপি মাথা হইতে না খুলিয়া তাঁহারা আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। টুপি মাথায় রাখা, পার্সিদের মধ্যে সম্মান দেখাইবার চিহ্ন। অধ্যাপক পেদ্রোজার প্রার্থনা অনুসারে আমি নিউ হাইস্কুলে, ৮০ জন ছাত্রের সমক্ষে ফরাসীভাষায় একটু সম্ভাষণ করিলাম। পাঁচ ছয় জন মুসলমান, কতকগুলি হিন্দু ও কতকগুলি পার্সি আমার শ্রোতা; তাহারা মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল এবং আমার কথা বোধ হয় বুঝিতেও পারিতেছিল। ছাত্রেরা পুস্তক হইতে যে সকল লেখা 'কাপি' করিয়াছিল, পেদ্রোজা তাহাদের সেই কাপিগুলা

আমাকে দিলেন। কতকগুলা কাপি শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কিসে আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম শুনিবে!—মূলের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে শুনিলাম। হিন্দু ও পার্সিরা কোন্ গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছিল?—গিজো-প্রণীত গ্রন্থের। সেও কতকটা সম্ভব। তাহার পর, হেক্টর-ম্যালোর-প্রণীত গ্রন্থের; এটা একটু হাস্যজনক। আর কোন্ গ্রন্থের? 'সেণ্ট অ্যালেক্সিসের জীবনী,' 'রোলাঁর গান'—এই দুই গ্রন্থের। এইরূপ শিক্ষায় হিন্দু ও পার্সিরা ফরাসীভাষার ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কি সত্য নহে যে, "রোলাঁর গান"-এর অর্থ ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা, মহাভারতের অর্থ ব্যাখ্যা করা তাহাদের পক্ষে আরও হিতকর?

কতগুলি ছাত্র ফরাসীভাষা শিক্ষা করিতেছে? পেদ্রাজার গণনা-অনুসারে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১০০০ জন ছাত্র শিক্ষা করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ২৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হয়।

সত্য বলিতে কি, যখন বিদ্যালয়ের এই পাঠ্যতালিকা ও যে নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় সেই নিয়মের কথা আলোচনা করা যায়, তখন বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস রসনা হইতে স্বতই বাহির হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কতটা শেখান হয়? এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা কেবল নাম মাত্র, ইহা নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক; ভৌতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের দ্বারদেশেই থাকিয়া যায়, কিংবা ক্ষুদ্র পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে···আশ্চর্যের বিষয় এই, যাঁহারা চাহিবার আগেই ভারতকে য়ুরোপীয় শিক্ষারূপ এমন একটা মহৎ সামগ্রী দান করিয়াছেন, তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এই য়ুরোপীয় শিক্ষার বিশেষত্বটি কোথায়।

আমার মনে হয়, ভারতকে দুই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত; ইতিহাস ও পর্যাবেক্ষণ। এখনও ভারত সে অবস্থায় আসে নাই যে অবস্থায় উপনীত হইলে, মন আপনার প্রতি ও চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থসমূহের প্রতি স্থিরভাবে বহির্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে। এখনও ভারত স্বকীয় মনোভাব, স্বকীয় স্বপ্ন, স্বকীয় কল্পনা হইতে বাস্তব জগতের প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারে না, এবং ভারতের ইতিহাস যেমন মহাকাব্য হইতে,—সেইরূপ ভারতের বিজ্ঞানও দর্শন হইতে এখনও বিনির্ম্মুক্ত হয় নাই। আত্মসম্বলের উপর নির্ভর করিতে হইলে, ভারত ইহার প্রতীকারের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইবে না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বন্দোবস্ত ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিতে হইলে, প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ কোথা হইতে আসিবে? ইংলণ্ডের যুবরাজকে হিরক উপহার দিবার জন্য রাজারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপকের আসন স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা একবারও তাহাদের মনে আইসে না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করিও, এবিষয়ে আমরাও হিন্দুর মতন; আমরা ধর্ম্ম মঠাদি স্থাপনের জন্য অর্থ দান করি, 'উইল' করি; আর শ্রমশিল্পের ধনীগণ—সেই 'লৌহ-ইস্পাতের রাজারা,' পুস্তকালয় স্থাপন করিতেছে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিতেছে, অধ্যাপকের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেছে···অতএব যে ইংরাজ সরকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা বলিয়া অহংকার করেন,—এই সকল অভাব পুরণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত, মধ্যম বিদ্যালয়ে, উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসৃষ্ট কালেজাদিতে—যাহাকে প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষা বলে, সেরূপ বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া হয় না। সম্প্রতি কি হইয়াছে? বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষারই অভাব। পাঠ্য তালিকাকে ফাঁপাইয়া তোলা হইয়াছে—(নিছক্ একটা চোখ-ভোলানো জিনিস্) অথচ কালেজের ছাত্রেরা—অধ্যাপকের জন্য, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের জন্য, পরীক্ষা-আয়োজনকারার জন্য ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া থাকে। কেবল প্রেসিডেন্সি কালেজেই একটি উৎকৃষ্ট পরীক্ষাগার আছে। কেবল ঐ কালেজেই দশবৎসরাবধি ভূতত্ত্ববিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা অতীব অসম্পূর্ণ ও সেকেলে ধরণের। হিন্দুরা উত্তম চিকিৎসক হইতে পারে। যদি কোন বিদ্যা-শিক্ষায় দৈনন্দিন উন্নতির অনুসরণ করা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়—সে নিশ্চয়ই চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষায়। স্বাধীনরাজ্য জাপানের সহিত ভারতের একবার তুলনা করিয়া দেখ; যে জিনিসে আমাদের শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদিত, সেই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, জাপান

বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক য়ুরোপের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে; জাপানে, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষা, ও পরীক্ষাগার সম্বন্ধে তাহাদের উদ্যম যারপর নাই প্রশংসনীয়।

ইংরাজ সরকার, কতকগুলি বিশেষ শিল্প ও বিশেষ ব্যবসায়ের জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন—ইহাদের নাম "এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল্স"। কলিকাতায় বিদ্যালয়টি আমি দেখিয়াছি। যে অধ্যাপক আমাকে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন, তিনি ছাত্রদিগের খুবই প্রশংসা করিলেন; উহারা খুব নিপুণ; "এই দেখ, এই কুঁদিবার যন্ত্রাদি উহারা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছে।" তিনি আরও বলিলেন;—"উহাদের মস্তিষ্ক খুব ভাল।" কিন্তু যখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কি ভরসায় এইসব কাজ শিখিতেছে, উহাদের ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনা কিরূপ, তখন তিনি নিরুৎসাহব্যঞ্জক একটা অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাকে বলিলেন;—"উহাদের লাভ খুবই কম"। উহাদিগকে মাসিক ৩০।৪০ টাকা বেতনের ছোটখাট কাজ দেওয়া হয়। আমি জানি, ইংরাজেরা এই ছুতো করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, যেহেতু হাতের কাজে "নেটিভ"দের দুরতিক্রমণীয় বিতৃষ্ণা। একথা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সরকারী পূর্ত্তবিভাগে মোটামোটা বেতনের সমস্ত কর্ম্ম ইংরাজদিগের জন্য সযত্নে রক্ষিত: তাঁহারা মনে করেন, এই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রগণ ভবিষ্যতে তাঁহাদের প্রতিযোগী হইলেও হইতে পারে, সেই জন্য উহাদিগকে নিরুৎসাহিত করেন, উহাদিগকে সরাইয়া রাখেন। এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, উহাদের মধ্য হইতে, শুধু কতকগুলি নিকৃষ্ট পদবীর মিস্ত্রি ও চলনসই ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন ব্যবসায়িক শিল্প-শিক্ষার অনুকূলে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে আমি ভারতে উপস্থিত ছিলাম। তখন এই সমস্যাটি সম্বন্ধে প্রতি দিন সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল, কংগ্রেসের ইহা একটী আলোচ্য বিষয় হইল, ম্যুনিসিপ্যাল-সভা হইতে যে অভিনন্দন পত্রাদি পঠিত হইত তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ থাকিত, প্রত্যুত্তরে কর্ত্তৃপক্ষের লোকেরাও এই সম্বন্ধে কিছু বলিতেন। কিন্তু এই উপলক্ষে, সংবাদপত্র-সম্পাদক ও প্রকাশ্য-বক্তাদিগের সহিত বড়লাটের একটু মন-কষাকষি হয়। বড়লাট, মাদ্রাজ-ম্যুনিসিপালিটির সম্মান সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে, ব্যবসায়িকী শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "হিন্দু-রসনার উপর উহার একটা অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে" ... উপমার কথাটা ছাড়িয়া দেও; সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, সরকার "গুরু গম্ভীর ভাবে" এই বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। এই 'গুরু গম্ভীর ভাবের' মনোযোগ, কিংবা 'গুরুতর গম্ভীর ভাবের' মনোযোগ, কিংবা যারপরনাই 'গুরুতম গম্ভীর ভাবের মনোযোগের' অর্থটা কি?—অর্থ এই যে এই সমস্যাটিকে দস্তুরমত একটা অনুসন্ধান-সমিতির হস্তে সমর্পণ করা হইবে। লর্ড কর্জ্জন একজন সাম্রাজ্যনৈতিক। তাঁহার উপরেও একটা জিনিসের "মোহিনী শক্তি" আছে;—উহা তিব্বৎ অধিকারের!

ইঙ্গভারতীয় শিক্ষা যে শুধু পাণ্ডিতিক শিক্ষা, ফাঁকা শিক্ষা, তাহার প্রমাণ, এখানে কোন ব্যবসায়িক বিদ্যালয় কিংবা শ্রমশিল্পের বিদ্যালয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রীতিমত বিজ্ঞান-শিক্ষা এখানে আদৌ হয় না। ভারতে একটি মাত্র ব্যবসায়িক-শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়—সে শুধু বোম্বায়ে।

যে 'আর্ট-স্কুলে' অর্থাৎ ললিতকলার বিদ্যালয়ে ইংরাজেরা দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেন, তাহাকে আমি এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করি না। আর্ট-স্কুলে, ছাত্রদিগকে বিলাতী আদর্শ-সমূহের নকল করিতে শেখান হয় মাত্র। ডাক্তার উকিল ও কেরাণী তৈয়ারী করিবার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেণিয়া ও কারিগরের সন্তানদিগকে গ্রহণ করা হয়। ডাক্তার উকীল প্রভৃতির দ্বারা, স্বাধীন জীবিকার পথ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। একথা সত্য ধ্যানপরায়ণ হিন্দু, আস্তিন গুটাইয়া হাতের কাজে হাত লাগাইতে তেমন রাজি নহে; আবার বিশ্ববিদ্যালয়ও উৎসাহ দিয়া হিন্দুর এই সব কুসংস্কারকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে এই সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, হাতের কাজ ও অজ্ঞতা এই দুইটা জিনিস একসঙ্গে যায়; নিজ অধিকার-সূত্রেই ব্রাহ্মণ জ্ঞানের অধিকারী ও কারিগর অজ্ঞানের অধিকারী।

আসল কথা, এই প্রকার প্রভেদ রক্ষা করা সভ্যতা-প্রচারক ইংলণ্ডের উচিত কাজ হয় নাই। মাথার উপর মুষ্টিমেয় রাজপুরুষ, এবং পদতলে অজ্ঞ জনসাধারণের ঘন সংহতি — ইহাই ইংরাজের কীর্ত্তি। কেবল শিক্ষিত ভারতবাসীরাই শিক্ষালাভ করে— সে শিক্ষাও মধ্যযুগের ইংরাজেরই সম্পূর্ণ উপযোগী। কারিগর লোকদিগকে তাঁহারা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন; অথচ তাহাদের নৈপুণ্যসম্বন্ধে কিংবা তাহাদের উৎকর্ষ লাভের সামর্থ্য সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ করে না। তবে কি না, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য এখনকার কালোপযোগী নহে। কেননা, পাশ্চাত্যের বিরাট শিল্পোদ্যম, তাহাদের ছোট ছোট শিল্পব্যবসায়কে বিনষ্ট করিয়াছে। এখন তাহাদের বেকার অবস্থা।

দূরদর্শী ও উদার-চেতা রাজসরকারের কিরূপ করা উচিত ছিল? যাহাতে কারিগরগণ পাশ্চাত্যদিগের সহিত কতকটা যুঝাযুঝি করিতে সমর্থ হয় এই জন্য তাহাদের হস্তে যন্ত্রাদি উপকরণ অর্পণ করা ও যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদিগকে কতকটা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। আধুনা, ভারতের অপরিমেয় শিল্প-সম্বল বিদেশীয়দের হস্তগত; তাহারাই ভারতের সমস্ত ধন শোষণ করিতেছে। বৈদেশিকেরই মূলধন যোগাইতেছে, কর্ম্মপরিচালক লোক যোগাইতেছে, কর্ত্তা-মিস্ত্রী যোগাইতেছে, কর্ত্তা-কারিগর যোগাইতেছে; দেশীয় লোক—যাহাদিগকে সযত্নে অজ্ঞ করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহারা শুধু কুলিমজুরের কাজ করে। তাহারা প্রতি দিন ৵০ আনা করিয়া মজুরি পায়। বোম্বায়ের তুলার কলকারখানা এই নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল; এখানে দেশীয় লোকেরা সফল হইয়াছে, কেন না এই বিষয়ে শিক্ষা উপদেশের ততটা আবশ্যক নাই—আবশ্যক শুধু মূলধনের ও যন্ত্রাদির। তা ছাড়া, ভারত, বহুল উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে চালান করে, এবং সেখানে হইতে দ্রব্যান্তরে পরিণত হইয়া আসিলে তাহাই আবার পুনর্ব্বার ক্রয় করে। শুধু জ্ঞানের অভাবে ও শিল্পবিশেষের ব্যবহারিক দক্ষতার অভাবেই দেশীয় লোক সেই সব সামগ্রী তৈয়ারী করিতে পারে না—সুতরাং যে অর্থ দেশীয় মিস্ত্রী ও কারিগরের হস্তে আসিবার কথা, তাহাই বিদেশীর ধন-কোষ পূর্ণ করিতেছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারত মার্কিণ দেশ নহে। মুক্তহস্ত দাতৃগণের উপর বিশ্ববিদ্যালয় বড় একটা নির্ভর করিতে পারে না। তবে ভারতেরও কার্নেজি (Carnegie) আছে। শ্রীযুক্ত তাতা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালয় স্থাপনার্থ ৫ পাঁচ ক্রোড় টাকা দান করিয়াছেন। শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা, পরীক্ষাগারের গবেষণার দিকেই তাঁহার বেশী লক্ষ্য ছিল। আমার বিশ্বাস তাঁহার এই কল্পনাটি সরকার-মহলে তেমন সানুকূলে গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা বলিলেন, ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইবে জানিলে অধ্যাপকেরও স্বকার্য্যে একটা উদ্দীপনা হয়। "মনে কর, প্যাষ্টর যদি উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়ে একপ্রস্থ ধারাবাহিক উপদেশ না দিতেন, কিংবা সুরা-শোধন রূপ একটা কেজো বিষয়ের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত না থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই জীবাণু-তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন না।"—কলিকাতার সরকারী-শিক্ষার প্রধান অধ্যক্ষ এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। যাই হোক, এ স্থলে বোধ হয় ইঙ্গভারতীয় কর্তৃপক্ষের কথাই ঠিক। গবেষণাকারী অপেক্ষা, ভারতের এক্ষণে শিক্ষকেরই অধিক প্রয়োজন—আবিষ্কার-কার্য্যে বড় হইবার পূর্ব্বে, ভারতের আরও অনেক কাজ করিতে বাকী আছে··· অনেক শিখিবার আছে।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিলাম না। তাহার প্রকৃষ্ট হেতু এই স্ত্রীশিক্ষা বলিয়া একটা জিনিষই নাই। — অবশ্য এখানে ওখানে দুই একটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে, এবং খুব সম্প্রতি এই বিষয়ে যে অল্পস্বল্প চেষ্টা-উদ্যোগ চলিতেছে তাহাতে বুঝা যায়, নারীজাতির উন্নতি—সাধারণ উন্নতিরই অংশ, এই কথাটির মর্ম্ম আজকাল এখানে অনুভূত হইতে সবে আরম্ভ হইয়াছে।

*　*　*　*

যাহা উপরে লিখিত হইল, তাহাতে মনে হইতে পারে আমি খ্যাতনামা মেকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছি। আমাকে যেন কেহ ভুল না বুঝেন। মেকলের উদ্দেশ্য যে উদার ও মহৎ ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেকলে এক প্রকার প্রচারক ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, য়ুরোপের সভ্যতা, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সভ্যতা; যাহাদের সভ্যতা অতটা উন্নত নহে, সেই সব নিকৃষ্ট জাতি যাহাতে ঐ য়ুরোপীয় সভ্যতার শুভ ফল সম্ভোগ করিতে পারে, এই জন্য

এই সব জাতির মধ্যে সেই সভ্যতা বিস্তার করা য়ুরোপের কর্ত্তব্য। তাঁহার ও উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের যে নৈতিক আদর্শ ছিল, তাহা অতিলোলুপ সাম্রাজ্যনৈতিকদিগের আদর্শ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার যদি কিছু ভ্রম হইয়া থাকে—সে ভ্রমটিও সুন্দর ভ্রম। হয়ত এক দিন তাঁহার কথাই ঠিক্ হইবে। যদি কখন ভারত, নিজ গাত্র হইতে শত শত বৎসরের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে, অতীতের গুরুভার শৃঙ্খলটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, সেই দিন, ভারতের দীর্ঘ অবতার-পর্য্যায়ের মধ্যে মেকলেরও একটা স্থান হইবে। এমন কি ভারতের রমণীরাও—অজ্ঞান-মুক্ত রমণীরাও, তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। মেকলের বিশ্বাস ছিল, ভারত শীঘ্রই ও সহজেই য়ুরোপীয় সভ্যতা আত্মসাৎ করিতে পারিবে;—ইহাই তাঁহার ভুল। এবং তাঁহার পরে, পরবর্ত্তী রাজপুরুষেরাও তাঁহার উদ্‌ঘাটিত পথ অনুসরণ করিতে লাগিল—ইহাই তাঁহার দুর্ভাগ্য। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, আপনা হইতেই জ্ঞানের জয় হইবে, এবং জ্ঞানের দীপ্ত আলোকচ্ছটায় কুসংস্কারের অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়া, আমাদের সভ্যতা বিনাযুদ্ধেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে। তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ত্তৃপক্ষগণ কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া এই মতের অনুসরণ করিতে লাগিল। মেকলেকর্ত্তৃক শিক্ষা-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর,—যে শিক্ষা হিন্দুর রক্ত-মাংসের সহিত মিশিবার নহে, যে শিক্ষা অকাল-কুষ্মাণ্ডের ন্যায় কাল-বিরুদ্ধ, সেই বিদেশী শিক্ষা এই ৭৫ বৎসরকাল অত্রত্য কালেজ সমূহে প্রদত্ত হইতেছে। এই শিক্ষার মধ্যে হিন্দুর জন্য কিছুই নাই, আধুনিক লোকদিগের জন্যও কিছুই নাই। এ কথার সত্যতা যদি পরীক্ষা করিতে চাও ত জাপানের ইতিহাস একবার আলোচনা করিয়া দেখ। যাহা সকলেরই পক্ষে প্রয়োজনীয় জাপানীরা ন্যায্যরূপে সেই প্রাথমিক শিক্ষাকেই পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তা ছাড়া, উহারা আরও কিছু বেশী করিয়াছে। উহারা আমাদের নিকট হইতে বিজ্ঞান লইয়া, আপনাদের কাজে খাটাইতেছে। অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ে আমরাই উহাদের শিক্ষক এবং সকল আসিয়িক জাতির ন্যায় জাপানেরও ইহাতে লাভ হইবারই কথা।

রক্ষণশীল ইংরাজেরা, আর এক বিষয়ের জন্য মেকলের প্রতি দোষারোপ করে। তাঁহারা বলেন, তিনি প্রকারান্তরে বিদ্রোহীর দল গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইংলণ্ড ও য়ুরোপের ইতিহাস,—প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে, স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে, দীর্ঘকালব্যাপী যুঝাযুঝির ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুর পক্ষে, ইতিহাস জিনিসটা অতীব কৌতূহলজনক, ও বহু-ফলপ্রসূ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, স্বাধীনতার সম্বন্ধে বর্ক ও ফক্‌সের জ্বালাময়ী বক্তৃতা মুখস্থ করিতেছে—মনে করিয়া দেখ ইহার ফল কি হইতে পারে! অতঃপর মহামহিম ভারত-সম্রাটের লৌহময় শাসন-শৃঙ্খল যদি উহারা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন ইংরাজের হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙ্গিবে—মহা বিপদ উপস্থিত হইবে!

পাছে কেহ মেকলের বিরুদ্ধে এইরূপ দোষারোপ করে, এই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইহার উত্তর দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হইক, য়ুরোপীয় ভাবে দীক্ষিত ভারত এক সময়ে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র-শাসনের দাবী করিবে; তিনি এই কথাটি বুঝিয়াছিলেন এবং মানিয়াও লইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ইংরাজদিগের সম্বন্ধে আমি এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নিতান্তই অসঙ্গত। শুধু অসঙ্গত নহে—উহা ভয়াবহ। একবার ভাবিয়া দেখদিকি,—তাঁহারা ব্রাহ্মণ যুবকদিগকে লক্, বেন্‌থাম্ মিল্ পড়াইতে লাগিলেন; তাঁহারা স্বাধীনতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া উহাদিগকে বলিলেন—তোমরা কিন্তু স্বাধীন হইতে পাইবে না। এই সব অদূরদর্শী লোকেরাই মনে করে,—বীজ বোনা হইবে, অথচ উহা হইতে গাছ গজাইয়া উঠিবে না। ইহার অদ্ভুত ফল ফলিয়াছে। একদিকে, ভারতের প্রভুরা নিজ গৃহে স্বৈরতন্ত্রের শিক্ষা পাইতেছেন, এবং এই শিক্ষার ফলে উদারনীতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; পক্ষান্তরে নব্যভারত দৃঢ়ভাবে উদারনৈতিক হইয়া উঠিতেছে; নিজ প্রভুদের নিকট হইতেই নব্যভারত ঢাল-খাঁড়া লাভ করিয়াছে, এবং সেই ঢাল-খাঁড়া লইয়া এক সময়ে উহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিবে—স্বাধীনতা লাভ করিবে!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেব-দূত।

(নাট্য-কাব্য)

চরিত্র-পরিচয়।

অরবিন্দ— পাশ্চাত্য শিক্ষিত ধনবান যুবক।
অজয় —অরবিন্দের আবাল্য সুহৃৎ।
জীবনরাম ঐ ভৃত্য।
চিকিৎসক।
অন্নপূর্ণা অরবিন্দের জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী।
মাধবী —অরবিন্দের স্ত্রী।

তৃতীয় দৃশ্য।

কাল—প্রভাত।
স্থান —অরবিন্দের অন্তঃপুরস্থ উদ্যান।
অন্নপূর্ণা ও অজয়।

অন্নপূর্ণা। এমনি কি যা'বে চিরদিন?
নিত্য পূর্ণশশী বিমলিন
হেরিতেছি! বৃথা, অকারণে
ক্ষুদ্র শিশু সহিবে কেমনে
হেন অযতন? বাছা, তা'রে
বুঝাইয়া বল্—ছারে খারে
গেল এ সংসার। কোন্ পাপে,
অদৃষ্টের তীব্র অভিশাপে
সহি এ দারুণ বিড়ম্বনা,
নাহি জানি! —এ বেদনা
সহিবার নহে। কি লাগিয়া,
এ যন্ত্রণা নিয়ত সহিয়া,
কা'র তরে এ শ্মশান মাঝে
র'য়েছিরে, বাছা?—
বিধবা যে,
তা'র এত কামনা না সাজে।
অজয়। ও হৃদয়ে কভু না বিরাজে
স্বার্থ-চিন্তা—কামনা-বাসনা।
চিরদিন বিস্মরি' আপনা,
আপনারে দিয়াছ ডুবা'য়ে
অন্তহীন পরার্থ-চিন্তায়।
একেরে হারা'য়ে, একেবারে
ব্যাপ্ত করি' দিলে আপনারে
অনন্ত ধরিত্রী মাঝে; নিলে
চিত্ত ভরি' এ বিশ্ব নিখিলে।
ক্ষুদ্র এক আপনারে নাশি,
অসীম, বিরাটরূপে আসি'
তব মাঝে উঠিছে বিকশি'
হে জননি। ওপদ্ম পরশি'
পাপ-তাপ-জরা- ব্যাধি ভরা
ধন্য আজি এ মলিন ধরা!
শ্রীচরণে করি প্রণিপাত;
কর আজ্ঞা,—দেহ আশীর্ব্বাদ,
সাধিব তোমার ইচ্ছা।
অন্নপূর্ণা। ওরে,
বৃথা শূন্য স্তুতি-বাক্যে মোরে,
করিস্‌নে প্রতারিত। আমি
কি যে তাহা জানে অন্তর্যামী।
তাই, মোর শ্রেষ্ঠরত্ন হরি,'
নিরাশ্রয়া ভিখারিণী করি'
রেখে'ছেন এই ধরাতলে,—
নীরবে তিতিতে অশ্রুজলে
নিরালায়। সম বিধবার
নাহি পাপী জগত মাঝার;
তাই, হেন প্রায়শ্চিত্ত তা'র
হইতেছে সদা।
অজয়। —বিধাতার
লীলা কভু পারি না বুঝিতে।
শুধু হেরি—পঙ্কিল মহীতে,
এই ঘন অন্ধকার মাঝে,
স্থির-দীপ্তি পুণ্যালোক রাজে
একমাত্র বিধবার করে
নিরন্তর। নিষ্কাম অন্তরে
নিজ সর্ব্ব সুখ বিসর্জ্জিয়া,
পরহিত একান্তে সাধিয়া
আপনারে করে'ছ বিস্তার
এ জগতে;—এ দৃশ্যের আর
তুলনা না মিলে!
অন্নপূর্ণা। পৃথ্বী মাঝে
বল বৎস, মোর কিবা আছে!
নিশিদিন তীব্র তুষানলে
জ্বলি'ছে অন্তর। জলে, স্থলে—
অবিরাম মোর পানে চাহি'
কহি'ছে প্রকৃতি—'তোর নাহি—
নাহি স্থান এ ধরণী ক্রোড়ে,
ঘৃণিত পাপার্ত্ত প্রাণী ওরে!'
কি দুষ্কৃতি তরে নাহি জানি—
আমি চির-উপেক্ষিত প্রাণী!
এত ঘৃণা, এত তাপ-ক্লেশ—
সকলি ছিলাম ভুলি'; শেষ,

অকলঙ্ক অরুর জীবনে
আকস্মিক এ পরিবর্ত্তনে
ভাঙিয়া গিয়াছে এ হৃদয়
চিরতরে।—আর নাহি সয়
এ যন্ত্রণা!
আহা—সে বালিকা
সদ্যোবৃন্ত-চ্যুত শেফালিকা
সযতনে কুড়া'য়ে অঞ্চলে,
গাঁথি' মালা তপ্ত নেত্র-জলে,
যবে ধীরে স্বীয় কক্ষে পশি,'
নিরালায় নিজ মনে বসি'
স্বামীর সে চিত্র-পাদ-মূলে
দেয় গো জড়া'য়ে; মুখ তুলে'
যবে চুম্বে শ্রীচরণ তা'র
ব্যাকুল আগ্রহে শতবার;—
সে দৃশ্য হেরিলে পোড়া প্রাণ
বেদনায় হয় কম্পমান!

অজয়। তবে দেবি, প্রকৃত তা' নহে
শুনেছি যে কথা?

অন্নপূর্ণা। কেবা কহে
সত্য নহে তাহা?—সাধ্বী সতী
আজি সে যে অন্তঃ-সত্ত্ববতী।
তবু—তবু হা বিধাতঃ, তা'র
কেহ নাহি মরম-ব্যথার
মুছাইতে তপ্ত অশ্রুবারি!
ওরে বৎস, আর নাহি পারি
হেরিতে এ অবিচার।

অজয়। নিত্য
আজীবন অগাধ পাণ্ডিত্য
উপার্জ্জিয়া, পরিশেষে এই
হ'ল পরিণাম! এই সেই
অরবিন্দ! ছিল যা'র প্রাণ
আকাশের সম সুমহান্,
শিরীষ-কুসুম-সুকোমল?—
বিশ্বাস না হয়!

অন্নপূর্ণা। —তুই বল্
তা'রে বুঝাইয়া। আজো তা'র
মনে—দৃঢ় বিশ্বাস আমার—
একমাত্র তুই (ই) শান্তি-ধারা
পারিবি সিঞ্চিতে; তুই ছাড়া
অন্য আশা নাহি মম। ওই
আসে অরু; আমি যাই।

[প্রস্থান।]

(ভিন্ন দিক দিয়া অরবিন্দের প্রবেশ।)

অরবিন্দ। কই—
কোথা শান্তি, বিস্মৃতি কোথায়?
কোন্ মূঢ় এ পাপ-ধরায়
বাঁচিবারে চাহে?
হেথা গাহে
প্রভাতের অনিল-প্রবাহে
মুক্তকণ্ঠে বিহঙ্গ-নিচয়,
শুনি' সেই ধ্বনি মনে হয়—
সে অমৃতমাখা কণ্ঠস্বর।
মধু-গন্ধি পুষ্প মনোহর
ফুটে হেথা যবে, পড়ে মনে—
তা'র সেই অতুল আননে
সরল, সপ্রেম সুধা-হাসি।
প্রাণ ঢালি' ওরে সর্ব্বনাশি,
ভালো তোরে বাসিলাম কেন?
বাসিলাম যদি, তবে হেন
কেন হ'ল পরিণাম! তোরে
অহর্নিশি এ বক্ষ উপরে
বাঁধি' এই ভুজ-ডোরে যদি
রাখিবারে পারিতাম, ক্ষতি
তাহে হ'ত কা'র ধরাতলে?
হে বিধাতঃ, মোর অশ্রুজলে
এমনি কি ছিল প্রয়োজন?—
হ'য়েছিল বিশুষ্ক এমন
তোমার এ সৃষ্টি,—যা'র লাগি',
করি' মোরে চির দুঃখভাগী,
বিন্দু বিন্দু অশ্রুসেকে—তা'রে
চাহো সঞ্জীবিত রাখিবারে?
অথবা, এ বুঝিগো বিশ্বের
চিরন্তন রীতি—দুর্ব্বলের
প্রতি সবলের অপমান—
অত্যাচার; সর্ব্বশক্তিমান্
তুমি—বুঝি এ তাহারি
পরিচয়! অখিল-কাণ্ডারি,
অকারণে অজ্ঞানীর সাজা,
হে বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
ইহাই কি তোমার বিধান?
এরি তরে কহে—ন্যায়বান্
তোমারে এ মূঢ় বিশ্ব-জনে!
কোথা তুমি? যবে প্রতিক্ষণে
অধর্ম্মের অদম্য প্রতাপে
এ পৃথিবী 'থর-থর' কাঁপে;

কপটতা, তীব্র ছলনায়,
মিথ্যাচার, বিদ্বেষ-হিংসায়
ভরি' ওঠে যবে এ সংসার ;
তখনো কি চেতনা তোমার
নাহি জাগে ? কোথা তুমি ?—কোথা !
ধরণীর মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
আর্ত্তনাদ-ধ্বনি সকাতর
পশে না কি শ্রবণ ভিতর
তব ?—তুমি 'দয়াময়' !
নামি'
এস—এস ওহে অন্তর্যামি,
সর্ব্বদর্শী, বিধাতা মহান্,
বিশ্ব-সিংহাসন হ'তে।—স্থান
নাহি তব সে আসনে !

অজয়। অরু,—

অরবিন্দ। (অজয়ের দিকে ফিরিয়া)
চিন্তা-তপ্ত এ জীবন-মরু
স্নিগ্ধ করি' প্রিয় কণ্ঠ-স্বরে
আসিলে কি এত দিন পরে
বন্ধুবর ? পড়িল কি মনে
এত দিনে !

অজয়। এস আলিঙ্গনে প্রিয়তম।

অরবিন্দ। নহি যোগ্য আজ
তব প্রণয়ের। হৃদিমাঝ
জ্বলে'ছে যে বহ্নি অনিবার,—
অতীতের অস্তিত্ব আমার
তাহে পুড়ে' হ'য়ে গেছে ছাই !
আজি তব অরবিন্দ নাই,—
আমি শুদ্ধ প্রেত-মূর্ত্তি তা'র !

অজয়। নিয়ত করি'ছ হাহাকার
কল্পনাতে বাড়াইয়া দুখ
বন্ধু তুমি। হোয়ো না উন্মুখ—
আপনারে ধিক্কারিতে হেন।
এ সংসারে সখা, স্থির জেনো—
বাড়ায় মানব দুঃখ যত
নিজে ইচ্ছা করি' ;—অনিবার
যা'রে ধ্যান কর, মনে তা'র
পড়িবেই ছায়া।
ধরা মাঝে
সুখ-দুঃখ সমভাবে আছে—
নিজেদের প্রভাব বিস্তারি'।

অরবিন্দ। তাই বুঝি—বিশ্ব-নরনারী
নিয়ত ফেলি'ছে দীর্ঘশ্বাস—
পূর্ণ করি' প্রসন্ন আকাশ
বাষ্প-ধূমে ! তাই, বুঝি ঝরে
এ বিশ্বের বক্ষের উপরে
নিশিদিন অগণ্য প্রবাহ
নয়ন-বারির !
বন্ধু, চাহো—
চাহো এই অবনীর পানে।
শোনো—এই বিরাট্ শ্মশানে,
কোটি কণ্ঠে উঠে অনিবার
মর্ম্মভেদী, তীব্র হাহাকার !
রোগে, শোকে, নৈরাশ্য-পীড়নে,
অপমানে,—শত নির্য্যাতনে
নিরন্তর ক্লিষ্ট হ'য়ে, হায়—
জীব সবে যবে উর্দ্ধে চায়
সজল নয়ন মেলি,' ডাকে
ব্যাকুল আগ্রহে বিশ্ব-মাঝে
"কোথা মাগো দয়াময়ি," বলে' ;
তখনো তো কই—মা'র কোলে
নাহি হয় দুঃখ অবসান ;
তখনো তো জুড়াবার স্থান
নাহি পায় অসহায় সবে !
তবু কিগো বলিতেই হ'বে—
আছে ধর্ম্ম, আছে সুবিচার,
আছে গো সন্তোষ, করুণার
ঝরে সদা প্রবাহ ধরায় ?

অজয়। জীব সবে দহে যে জ্বালায়
হে প্রিয়, নহে তা' বিধাতার
ইচ্ছা কভু। জীব আপনার
কর্ম্ম-ফল নিত্য করে ভোগ ;
তা'র লাগি বৃথা অনুযোগ
যেই জন করে ন্যায়বান্
ভগবানে,—সে শুধু অজ্ঞান
নহে,—সে যে পাপী !

অরবিন্দ। অভিনব
শুনিলাম কথা ! যে মানব
অজ্ঞাত পাপের লাগি' সহে
অসহ্য যন্ত্রণা,—নিত্য দহে
প্রচণ্ড সন্তাপে, প্রাণপণে
বুক-ফাটা দারুণ ক্রন্দনে
বিশ্বেশ্বর-চরণ-ছায়ায়
শরণ লইয়া, তবু হায়—
নাহি লভে কোন প্রতিকার,
সে জন হইল পাপী ; আর,

নির্ম্মম পাষাণ-সম প্রাণ,
নির্য্যাতন যাঁহার বিধান,
কোন্ ত্রুটি নাহিক তাঁহার ;—
তিনি ধাতা, সর্ব্বগুণাধার,
তিনি পূর্ণ, তিনি সর্ব্বেশ্বর !

অজয়। কোটি সূর্য্য-গ্রহ-শশধর
যাঁর মহাবিধানের বলে
নিত্য চলিতেছে ; জলে, স্থলে,
অন্তরীক্ষ মাঝে—সদা যাঁ'র
এক (ই) মহাশক্তির সঞ্চার ;
যাঁ'র এ অনন্ত সৃষ্টি মাঝে
অচ্যুত শৃঙ্খলা নিত্য রাজে ;—
তাঁর বিধানের ধরে ভুল
ক্ষুদ্র-বুদ্ধি নর ! এক চুল
সে বিধানে ত্রুটি যদি হয়,
জেনো বন্ধু,—তখনি প্রলয়
ঘটিবে এ বিশ্ব-চরাচরে !
সে বিধান-তত্ত্ব ভ্রান্ত নরে
কেমনে বুঝিতে চাহে ! তবু,
দম্ভে নর কহে—বিশ্ব-প্রভু
ঘোর অত্যাচারী ;—এ বিভ্রম,
স্পর্দ্ধা,— পাপ নহে ? এ নিয়ম,
এ বিধান শুধুই তো নহে
মানবের লাগি ! হের—বহে
এ বিধান-কল্যাণ-ধারায়
থল সংসার !
ক্ষিপ্ত প্রায়
সুখ-লোভে হোয়ো না বিমুখ
বিধাতার প্রতি মিত্র। সুখ
আশে যেই জন হাহাকার
করে, দুঃখ সহচর তা'র !
সর্ব্ব সুখ-দুঃখ যেই জন
অকাতরে করে সমর্পণ
সে চরণে, জীবন তাহার
সন্তোষ-অমৃত-সুধা-ধার
লভে নিরন্তর।
হও স্থির ;
ধ্রুববাক্যে হোয়ো না বধির
আত্মহারা অজ্ঞানী সমান।
জ্ঞানী তুমি ; সাধহ কল্যাণ
আপনার।

অরবিন্দ। (কেশ মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে,স্বগত)
হ'তে পারে ইহা—
ক্ষুদ্র মানবের স্বার্থ নিয়া
এ বিশ্ব রচনা নহে ; তাই,
অহর্নিশি যত ব্যথা পাই,—
হয়ত বা আছে গো ইহার
গূঢ় অর্থ কোন ; বিধাতার
হয় বা এ বিধি জগতের
শুভ তরে! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া)
ক্ষুদ্র মানবের
বুদ্ধি—ঠিক!—পারিবে কেমনে
অনন্ত এ বিধি-বিশ্লেষণে।
কিন্তু, তবে কহে কেন সবে
তাঁ'রে দয়াময় ? কাঁদে যবে
আর্ত্তনর করুণার তরে,
কই—প্রভু তা'রে কৃপা করে ?—
এ এক সমস্যা !
(প্রকাশ্যে) তবে, কয়
কেন সবে তাঁ'রে দয়াময় ?

অজয়। ভ্রান্তি ইহা। আপন বিধানে
চির-বদ্ধ তিনি। তাঁর প্রাণে
নাহি জাগে ক্ষুদ্র চিন্তারাশি।
বিরাট্ চিন্তায় অবিনাশী,
চিরন্তন বিশ্বের কল্যাণ
জাগিতেছে। তিনি ন্যায়বান্,
শিবময়, মঙ্গল-নিদান।
দয়াময় নন তিনি।

অরবিন্দ। (নিকটে আসিয়া, বন্ধুর কর-ধারণ করিয়া)
ভাই,
এ কথাতো পূর্ব্বে ভাবি নাই !
সত্য তুমি কহিতেছ যেন,—
আজি মনে লইতেছে হেন
বিশ্বাস আমার। প্রিয়তম,
তুমি জ্ঞানী, সুখী তুমি ; ভ্রম
ঘুচাইয়া দেহ মোর। আর
ছাড়িব না আশ্রয় তোমার।
তুমি মোরে বুকে লহ টানি'
প্রীতি ভরে।

অজয়। এ পরাণ খানি
সম-প্রাণ, তোরি চিরদিন !

অরবিন্দ। কিন্তু, ভাই, কলঙ্ক-মলিন
আজি আমি।

অজয়। আয়—বুকে আয় !
(বন্ধুদ্বয় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইলেন।)

অরবিন্দ। এত সুখ সংসারে কোথায় !

(অন্নপূর্ণা প্রবেশ করিয়াই প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।)
কোথা যাও ? শোন—শোন দিদি,
বহুদিন পরে আজি বিধি
বড় সুখ দিয়াছেন মোরে।
(অন্নপূর্ণা স্নেহনেত্রে অজয়ের প্রতি চাহিলেন।)
অজয়। (লাজ-কুণ্ঠিত ভাবে, অরবিন্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া,)
পাগলামি আজীবন ধরে'
ঘুচিল না !
অরবিন্দ। দিদি, ওর কাছে
শান্তি ও অমৃত-খানি আছে !—
ওরি কাছে—আমি রব পড়ে'
চিরদিন অসীম নির্ভরে।
সস্নেহে করহ অনুমতি !
অন্নপূর্ণা। (মৃদু হাস্যে)
সে তো বেশ,—তাহে কিবা ক্ষতি।
তোরা তো দু'ভাই মোর।
অরবিন্দ। তবে,
তাই স্থির। অজয় তো রবে
মোর কাছে ?
অজয়। (অরবিন্দের প্রতি) দিদিরে কহিয়া,
চল মোরা যাই বাহিরিয়া
বিদেশ-ভ্রমণে।
অরবিন্দ। তবে, তাই।
যাব মোরা দিদি ?
অন্নপূর্ণা। কিছু নাই
আপত্তি আমার—সঙ্গে যবে
অজয় যে'তেছে তোর। কবে
ফিরিবি তা'হ'লে ?
অজয়। অনধিক
বর্ষ পরে।
অন্নপূর্ণা। (অজয়ের প্রতি) শোন্ প্রাণাধিক,—
তোরি হাতে দিলাম সঁপিয়া,
—আশীর্ব্বাদ-বর্ম্মে আবরিয়া—
বিধবার সংসার-বন্ধন,
সতীর সে সর্ব্বস্ব-রতন !
[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।
অজয়। করহ যাত্রার আয়োজন।
মিষ্টবাক্যে বিদায় গ্রহণ
করহ সবার কাছে। এবে
আসি আমি।
(প্রস্থানোদ্যত হইয়া, সহসা ফিরিয়া আসিয়া,
অরবিন্দের হাত ধরিয়া,)
আজো নাহি নেবে
সে দুঃখিনী অনাথারে ডাকি'
বক্ষোমাঝে—কহিবারে ধীরে
দু'টী মিষ্ট কথা,—আঁখি-নীরে
বারেক মুছায়ে দিতে ? হায়—
নিয়ত যে তোমার চিন্তায়
মগ্ন হ'য়ে আছে, রক্ত দিয়ে
তোমার আত্মজে জিয়াইয়ে
রেখে'ছে একান্ত সঙ্গোপনে
আপনার দেহ-আবরণে,
কোরো না তাহারে অনাদর ;—
সকাতর এ মিনতি মোর
মনে রেখো।
[প্রস্থান।
অরবিন্দ। গর্ভিণী মাধবী !
হা—দগ্ধ অদৃষ্ট ! (চিন্তামগ্ন।)
এ যে—সবি
অদৃষ্টের নিগূঢ় বিধান !
আমি কি করিব ? ভাসমান
তুচ্ছ তৃণ-খণ্ড যদি চাহে
নির্ঝরের প্রখর প্রবাহে
প্রতিকূল-গামী হ'তে,—সে কি
পারে কভু তাহা ?
আরো দেখি—
কত আছে ভালে ! হে অন্তর,
হও দৃঢ় ; তব অবসর
নাহি আর বিন্দু বিরামের।
সম্মুখে হের হে—সংসারের
কর্ম্ম-ক্ষেত্র হ'ল প্রসারিত।
ইচ্ছানিচ্ছা করিয়া দলিত
মনোমাঝে, হইবে সাধিতে
কর্ত্তব্য আপন। হ'বে দিতে
আপন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন !
(মাধবীকে আসিতে দেখিয়া)
সুকোমল দু'খানি চরণ
রাখি' শ্যাম তৃণ-শয্যা'পরে
আসিতেছে—ধীরে, লাজ ভরে,
সসঙ্কোচ জড়িত চরণে
নতমুখী !
(মাধবীর প্রবেশ।)
আজি এই ক্ষণে
তোমারেই ভাবিতেছি মনে।
(মাধবী নীরবে কর-নখাগ্রে দৃষ্টি বদ্ধ করিলেন।)
যাব মোরা দেশ-পর্য্যটনে।

স্বপ্রসন্ন মুখে তুমি মোরে
দেও হে বিদায়।

মাধবী। (নত মুখে) সঙ্গে করে'
নেবে মোরে ?—আমি বড় একা !

অরবিন্দ। ফিরে' আসি, পুনঃ হ'বে দেখা।
গৃহে মোর মূর্ত্তীমতী দেবী
দিদি তো আছেন ; সদা সেবি'
তাঁ'র পদ, দিও গো কাটা'য়ে
জীবন তোমার।

মাধবী। পড়ি' পায়ে,—
ফেলিয়া যেওনা মোরে। প্রভু,
আমি (অঞ্চলাগ্রে চক্ষু আবৃত করিলেন।)

অরবিন্দ। (স্বগত) এত অবহেলা, তবু—
তবুও কি চাহে মোরে ! হেন
অযাচিত ব্যাকুলতা !—কেন ?
(প্রকাশ্যে) মাধবী, যাইব বহুদূর
দেশান্তরে মোরা। অন্তঃপুর-
নিবাসিনী তুমি, সেই শ্রম
সহিবে না তব।
মনোরম
তোমার এ উদ্যান-মাঝারে
স্বরোপিত তরু—বারিধারে
করিও নিষিক্ত নিত্য ভোরে,
বিহগের কল-গীতে।

মাধবী। (পদ-মূলে পড়িয়া) মোরে
ভালো নাহি লাগে বুঝি নাথ ?
বল—বল—কোন্ অপরাধ
করিয়াছে দাসী !

অরবিন্দ। (বক্ষে হাত দিয়া)—ভগবান !

মাধবী। ক্ষমা কর !

অরবিন্দ। আমি যে পাষাণ !
কি বুঝিব—আমি রে কল্যাণি,
ও হৃদয় তব ! নাহি জানি—
মহত্ত্বের শীর্ষ দেশে কোথা
বসে' আছ তুমি ! পঙ্কিলতা-
পূর্ণ, ঘৃণ্য আমি,—নাহি পারি
চিনিতে তোমারে। ওরে নারি,
ওরে প্রেমময়ি, আজি মোর
তব তরে কই—এ অন্তর
এখনো তো বিদীর্ণ হ'ল না !
হে সুন্দরি, দিব কি সান্ত্বনা
আমি আর ! আত্ম-বিস্মরিয়ে
আর তুমি ফেলিও না প্রিয়ে,
হেন ভাবে প্রণয়াশ্রুরাশি
অবিরাম।

মাধবী। পদাশ্রিতা দাসী ;—
ঠেলিও না তা'রে প্রভু !

অরবিন্দ। আমি
নিতান্ত অযোগ্য তব।

মাধবী। (বাষ্পাকুল কণ্ঠে) —স্বামি !

অরবিন্দ। (স্বগত) একি—একি—কেনরে এমন
উঠিছেরে ভরিয়া নয়ন !
এত প্রেমো এ জগতে আছে !
এই স্বার্থভরা বিশ্বমাঝে
এ দৃশ্যও লুকায়ে ছিলরে !—
এ তো ভাবি নাই কভু ! ওরে
নারি, এই জগতী-ভিতরে
কি সুন্দর—ওরে কি সুন্দর
তুই !
কিন্তু, একি দুর্ব্বলতা
হৃদয়ে আমার ! আজি কোথা—
কোথা সেই সঙ্কল্প কঠোর !
কই ?—আর কেবা আছে মোর
প্রণয়িনী ?—অমিয়া, অমিয়া,
ত'ব তরে দহিয়া দহিয়া
মরিতেছি পলে পলে। হায়—
কতকাল আর এ ধরায়
বাঁচিতে হইবে নাহি জানি !
(প্রকাশ্যে) হে মাধবী, অনুরোধ-বাণী—
শোন মোর—এ হৃদয়জ্বালা
ভুলিবারে যে'তে চাহি, বালা,
দূর-দেশে কিছুকাল তরে।
প্রসন্ন বদনে দেহ মোরে
বিদায় কল্যাণি। পুনঃ ফিরে'
আসিব তো তব এ কুটীরে
হে সরলে।

মাধবী। (কম্পিত স্বরে) তব এ দাসীরে
রেখো মনে। প্রণমি হে নাথ,
রাজীব চরণে। (পদ-প্রান্তে প্রণত হইলেন।)

অরবিন্দ। আশীর্ব্বাদ
করি, হও সুখী, হও দেবী-সমা,—
পুণ্যে প্রেমে চির-মনোরমা।

[ক্রমশঃ

১৭

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"তুমি কি সুচরিতার বিয়ে দেবে না না কি?"

পরেশ বাবু তাঁহার স্বাভাবিক শান্ত গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ পাকা দাড়িতে হাত বুলাইলেন—তার পরে মৃদুস্বরে কহিলেন—"পাত্র কোথায়?"

বরদাসুন্দরী কহিলেন, "কেন, পানুবাবুর সঙ্গে ওর বিবাহের কথা ত ঠিক হয়েই আছে—অন্তত আমরা ত মনে মনে তাই জানি—সুচরিতাও জানে।"

পরেশ কহিলেন—"পানু বাবুকে রাধারাণীর ঠিক পছন্দ হয় বলে আমার মনে হচ্চে না।"

বরদাসুন্দরী। দেখ, ঐ গুলো আমার ভালো লাগে না। সুচরিতাকে আমার আপন মেয়েদের থেকে কোনো দিন তফাৎ করে দেখিনে কিন্তু তাই বলে একথাও ত বলতে হয় উনিই বা কি এমন অসামান্য! পানু বাবুর মত বিদ্বান ধার্ম্মিক লোক যদি ওকে পছন্দ করে থাকে সেটা কি উড়িয়ে দেবার জিনিষ? তুমি যাই বল আমার লাবণ্যকে ত দেখ্‌তে ওর চেয়ে অনেক ভাল কিন্তু আমি তোমাকে বলে দিচ্চি আমরা যাকে পছন্দ করে দেব ও তাকেই বিয়ে করবে, কখনো "না" বল্‌বে না। তোমরা যদি সুচরিতার দেমাক্ বাড়িয়ে তোল তা হলে ওর পাত্র মেলাই ভার হবে।

পরেশ ইহার পরে আর কোনো কথাই বলিলেন না। বরদাসুন্দরীর সঙ্গে তিনি কোনো দিন তর্ক করিতেন না বিশেষত সুচরিতার সম্বন্ধে।

সতীশকে জন্মদিয়া যখন সুচরিতার মার মৃত্যু হয় তখন সুচরিতার বয়স সাত। তাহার পিতা রামশরণ হালদার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং পাড়ার লোকের অত্যাচারে গাম ছাড়িয়া ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় লন। সেখানে পোষ্ট আপিসের কাজে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন পরেশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। সুচরিতা তখন হইতেই পরেশকে ঠিক নিজের পিতার মতই জানিত।

রামশরণের মৃত্যু হঠাৎ ঘটিয়াছিল। তাঁহার টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল তাহা তাঁহার ছেলে ও মেয়ের নামে দুই ভাগে দান করিয়া তিনি উইলপত্রে পরেশ বাবুকে ব্যবস্থা করিবার ভার দিয়াছিলেন। তখন হইতেই সতীশ ও সুচরিতা পরেশের পরিবার ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল।

ঘরের বা বাহিরের লোকে সুচরিতার প্রতি বিশেষ স্নেহ বা মনোযোগ করিলে বরদাসুন্দরীর মনে ভাল লাগিত না। অথচ যে কারণেই হউক সুচরিতা সকলের কাছ হইতেই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। বরদাসুন্দরীর মেয়েরা তাহার ভালবাসা লইয়া পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করিত। বিশেষত মেঝমেয়ে ললিতা তাহার ঈর্ষাপরায়ণ প্রণয়ের দ্বারা সুচরিতাকে দিনরাত্রি যেন আঁকড়িয়া থাকিতে চাহিত।

পড়াশুনার খ্যাতিতে তাঁহার মেয়েরা তখনকার কালের সকল বিদুষীকেই ছাড়াইয়া যাইবে বরদাসুন্দরীর মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুচরিতা তাঁহার মেয়েদের সঙ্গে এক সঙ্গে মানুষ হইয়া এ সম্বন্ধে তাহাদের সমান ফললাভ করিবে ইহা তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না। সেই জন্য ইস্কুলে যাইবার সময় সুচরিতার নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিতে থাকিত।

সেই সকল বিঘ্নের কারণ অনুমান করিয়া পরেশ সুচরিতার ইস্কুল বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে নিজেই পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শুধু তাই নয়, সুচরিতা বিশেষভাবে তাঁহারই যেন সঙ্গিনীর মত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন, যেখানে যাইতেন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, যখন দূরে থাকিতে বাধ্য হইতেন তখন চিঠিতে বহুতর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিতেন। এমনি করিয়া সুচরিতার মন তাহার বয়স ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া অনেকটা পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখশ্রীতে ও আচরণে যে একটি গাম্ভীর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল তাহাতে কেহ তাহাকে বালিকা বলিয়া গণ্য করিতে পারিত না; এবং লাবণ্য যদিচ বয়সে প্রায় তাহার সমান ছিল তবু সকল বিষয়ে সুচরিতাকে সে আপনার চেয়ে বড় বলিয়াই মনে করিত—এমন কি, বরদাসুন্দরীও তাহাকে ইচ্ছা করিলেও কোন মতেই তুচ্ছ করিতে পারিতেন না।

পাঠকেরা পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছেন হারাণ বাবু অত্যন্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মসমাজের সকল কাজেই তাঁহার হাত ছিল;—তিনি নৈশ স্কুলের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রীবিদ্যালয়ের

সেক্রেটারি—কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তি ছিল না। এই যুবকটিই যে একদিন ব্রাহ্মসমাজে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবে সকলেরই মনে এই আশা ছিল। বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় তাঁহার অধিকার ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে খ্যাতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যোগে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

এই সকল নানা কারণে অন্যান্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় সুচরিতাও হারাণ বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় হারাণ বাবুর সহিত পরিচয়ের জন্য তাহার মনের মধ্যে বিশেষ ঔৎসুক্যও জন্মিয়াছিল।

অবশেষে বিখ্যাত হারাণ বাবুর সঙ্গে শুধু যে পরিচয় হইল তাহা নহে অল্প দিনের মধ্যেই সুচরিতার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের আকৃষ্টভাব প্রকাশ করিতে হারাণ বাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। স্পষ্ট করিয়া তিনি যে সুচরিতার নিকট তাঁহার প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে—কিন্তু সুচরিতার সর্ব্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা পূরণ, তাহার ত্রুটি সংশোধন, তাহার উৎসাহ বর্দ্ধন, তাহার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি এমনি মনোযোগী হইয়া উঠিলেন যে এই কন্যাকে যে তিনি বিশেষভাবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা সকলের কাছেই সুগোচর হইয়া উঠিল।

এই ঘটনায় হারাণ বাবুর প্রতি বরদাসুন্দরীর পূর্ব্বতন শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গেল এবং ইহাকে তিনি সামান্য ইস্কুল মাষ্টার মাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চেষ্টা করিলেন।

সুচরিতাও যখন বুঝিতে পারিল যে সে বিখ্যাত হারাণ বাবুর চিত্ত জয় করিয়াছে তখন মনের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত গর্ব্ব অনুভব করিল।

প্রধান পক্ষের নিকট হইতে কোনো প্রস্তাব উপস্থিত না হইলেও হারাণ বাবুর সঙ্গেই সুচরিতার বিবাহ নিশ্চয় বলিয়া সকলে যখন স্থির করিয়াছিল তখন সুচরিতাও মনে মনে তাহাতে সায় দিয়াছিল এবং হারাণ বাবু ব্রাহ্মসমাজের যে সকল হিতসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন কিরূপ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা সেও তাহার উপযুক্ত হইবে এই তাহার এক বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে যে কোন মানুষকে বিবাহ করিতে যাইতেছে তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারে নাই—সে যেন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সুমহৎ মঙ্গলকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে—সেই মঙ্গল প্রচুর গ্রন্থপাঠ দ্বারা অত্যুচ্চ বিদ্বান, এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিরতিশয় গম্ভীর। এই বিবাহের কল্পনা তাহার কাছে ভয়, সম্ভ্রম ও দুঃসাধ্য দায়িত্ববোধের দ্বারা রচিত একটা পাথরের কেল্লার মত বোধ হইতে লাগিল—তাহা যে কেবল সুখে বাস করিবার তাহা নহে তাহা লড়াই করিবার—তাহা পারিবারিক নহে তাহা ঐতিহাসিক।

এই অবস্থাতেই যদি বিবাহ হইয়া যাইত তবে অন্তত কন্যাপক্ষের সকলেই এই বিবাহকে বিশেষ একটা সৌভাগ্য বলিয়াই জ্ঞান করিত। কিন্তু হারাণ বাবু নিজের উৎকৃষ্ট মহৎ জীবনের দায়িত্বকে এতই বড় করিয়া দেখিতেন যে কেবল মাত্র ভাল লাগার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করাকে তিনি নিজের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। এই বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কি পরিমাণে লাভবান হইবে তাহা সম্পূর্ণ বিচার না করিয়া তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। এই কারণে তিনি সেই দিক্ হইতে সুচরিতাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে পরীক্ষা দিতেও হয়। হারাণ বাবু পরেশ বাবুর ঘরে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে তাঁহার বাড়ির লোকে যে পানু বলিয়া ডাকিত এ পরিবারেও তাঁহার সেই পানু বাবু নাম প্রচার হইল। এখন তাঁহাকে কেবল মাত্র ইংরেজি বিদ্যার ভাণ্ডার, তত্ত্বজ্ঞানের আধার ও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের অবতাররূপে দেখা সম্ভবপর হইল না—তিনি যে মানুষ এই পরিচয়টাই সকলের চেয়ে নিকট হইয়া উঠিল। তখন তিনি কেবল মাত্র শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের অধিকারী না হইয়া ভাললাগা মন্দলাগার আয়ত্তাধীন হইয়া আসিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হারাণ বাবুর যে ভাবটা পূর্ব্বে দূর হইতে সুচরিতার ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই ভাবটাই নিকটে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর আছে হারাণ বাবু তাহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া তাহার রক্ষকতার ভার লওয়াতে তাঁহাকে অত্যন্ত অসঙ্গতরূপে ছোট দেখিতে হইল। সত্যের সঙ্গে মানুষের যথার্থ সম্বন্ধ ভক্তির সম্বন্ধ—তাহাতে মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী

করিয়া তোলে। তাহা না করিয়া যেখানে মানুষকে উদ্ধত ও অহঙ্কৃত করে সেখানে মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতাকে সেই সত্যের তুলনাতেই অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে। এইখানে পরেশ বাবুর সঙ্গে হারাণের প্রভেদ সুচরিতা মনে মনে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরেশ বাবু ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন তাহার সম্মুখে তাঁহার মাথা যেন সর্ব্বদা নত হইয়া আছে—সে সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র প্রগল্‌ভতা নাই—তাহার গভীরতার মধ্যে তিনি নিজের জীবনকে তলাইয়া দিয়াছেন। পরেশ বাবুর শান্ত মুখচ্ছবি দেখিলে, তিনি যে সত্যকে হৃদয়ে বহন করিতেছেন তাহারই মহত্ত্ব চোখে পড়ে। কিন্তু হারাণ বাবুর সেরূপ নহে—তাঁহার ব্রাহ্মত্ব বলিয়া একটা উগ্র আত্মপ্রকাশ অন্য সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার সমস্ত কথায় ও কাজে অশোভনরূপে বাহির হইয়া থাকে। ইহাতে সম্প্রদায়ের কাছে তাঁহার আদর বাড়িয়া ছিল কিন্তু সুচরিতা পরেশের শিক্ষাগুণে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে পায় নাই বলিয়া হারাণ বাবুর একান্ত ব্রাহ্মিকতা সুচরিতার স্বাভাবিক মানবত্বকে যেন পীড়া দিত। হারাণ বাবু মনে করিতেন, ধর্ম্মসাধনার ফলে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এমন আশ্চর্য্য স্বচ্ছ হইয়াছে যে, অন্য সকল লোকেরই ভালমন্দ ও সত্যাসত্য তিনি অতি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। এই জন্য সকলকেই তিনি সর্ব্বদাই বিচার করিতে উদ্যত। বিষয়ী লোকেরাও পর-নিন্দা পরচর্চ্চা করিয়া থাকে কিন্তু যাহারা ধার্ম্মিকতার ভাষায় এই কাজ করে তাহাদের সেই নিন্দার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অহঙ্কার মিশ্রিত হইয়া সংসারে একটা অত্যন্ত সুতীব্র উপদ্রবের সৃষ্টি করে। সুচরিতা তাহা একেবারেই সহিতে পারিত না। ব্রাহ্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে সুচরিতার মনে যে কোনো গর্ব্ব ছিল না তাহা নহে তথাপি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা বড় লোক তাঁহারা যে ব্রাহ্ম হওয়ারই দরুণ বিশেষ একটা শক্তিলাভ করিয়া বড় হইয়াছেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজের বাহিরে যাহারা চরিত্রভ্রষ্ট তাহারা যে ব্রাহ্ম না হওয়ারই কারণে বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া নষ্ট হইয়াছে এ কথা লইয়া হারাণ বাবুর সঙ্গে সুচরিতার অনেকবার তর্ক হইয়া গিয়াছে।

হারাণ বাবু ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন বিচারে পরেশ বাবুকেও অপরাধী করিতে ছাড়িতেন না তখনই সুচরিতা যেন আহত ফণিনীর মত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। সে সময়ে বাংলাদেশে ইংরাজিশিক্ষিত-দলের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু পরেশ বাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন—কালিসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্তটা সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারাণ বাবুর কাছে তাহা ভাল লাগে নাই। এ সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্মপরিবার হইতে নির্ব্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এগুলি পড়েন নাই। রামায়ণ মহাভারত ভগবদ্গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যে বাইব্‌ল্‌ই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। পরেশ বাবু যে তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ছোটখাটো নানা বিষয়ে ব্রাহ্ম অব্রাহ্মের সীমা রক্ষা করিয়া চলিতেন না তাহাতে হারাণের গায়ে যেন কাঁটা বিঁধিত। পরেশের আচরণে প্রকাশ্যে বা মনে মনে কেহ কোনো প্রকার দোষারোপ করিবে এমন স্পর্দ্ধা সুচরিতা কখনই সহিতে পারে না। এবং এইরূপ স্পর্দ্ধা প্রকাশ হইয়া পড়াতেই হারাণ সুচরিতার কাছে খাটো হইয়া গেছেন।

এইরূপ নানা কারণে হারাণবাবু পরেশবাবুর ঘরে দিনে দিনে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছেন। বরদাসুন্দরীও যদিচ ব্রাহ্ম অব্রাহ্মের ভেদ রক্ষায় হারাণবাবুর অপেক্ষা কোনো অংশে কম উৎসাহী নহেন এবং তিনিও তাঁহার স্বামীর আচরণে অনেক সময়ে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন তথাপি হারাণ-বাবুকে তিনি আদর্শ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। হারাণবাবুর সহস্র দোষ তাঁহার চোখে পড়িত। তাহার প্রধান ও প্রথম কারণটা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি।

হারাণবাবুর সাম্প্রদায়িক উৎসাহের অত্যাচারে এবং সঙ্কীর্ণ নীরসতায় যদিও সুচরিতার মন ভিতরে ভিতরে প্রতিদিন তাঁহার উপর হইতে বিমুখ হইতেছিল তথাপি হারাণবাবুর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হইবে এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষের মনে কোনো তর্ক বা সন্দেহ ছিল না। ধর্ম্মসামাজিক দোকানে যে ব্যক্তি নিজের উপরে খুব

বড় অক্ষরে উচ্চ মূল্যের টিকিট মারিয়া রাখে অন্য লোকেও ক্রমে ক্রমে তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লয় এইজন্য হারাণবাবু তাঁহার মহৎ সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তী হইয়া যথোচিত পরীক্ষা দ্বারা সুচরিতাকে পছন্দ করিয়া লইলেই যে সকলেই তাহা মাথা পাতিয়া লইবে এসম্বন্ধে হারাণবাবুর এবং অন্য কাহারো মনে কোনো দ্বিধা ছিলনা। এমন কি, পরেশবাবুও হারাণবাবুর দাবী মনে মনে অগ্রাহ্য করেন নাই। সকলেই হারাণবাবুকে ব্রাহ্মসমাজের ভাবী অবলম্বনস্বরূপ জ্ঞান করিত, তিনিও বিরুদ্ধ বিচার না করিয়া তাহাতে সায় দিতেন এজন্য হারাণবাবুর মত লোকের পক্ষে সুচরিতা যথেষ্ট হইবে কিনা ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল সুচরিতার পক্ষে হারাণবাবু কি পর্য্যন্ত উপাদেয় হইবে তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই।

এই বিবাহ প্রস্তাবে কেহই যেমন সুচরিতার কথাটা ভাবা আবশ্যক বোধ করে নাই সুচরিতাও তেমনি নিজের কথা ভাবে নাই। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকেরই মত সেও ধরিয়া লইয়াছিল যে হারাণবাবু যেদিন বলিবেন আমি এই কন্যাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি সেই দিনই সে এই বিবাহরূপ তাহার মহৎকর্ত্তব্য স্বীকার করিয়া লইবে।

এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে সেদিন, গোরাকে উপলক্ষ্য করিয়া, হারাণবাবুর সঙ্গে সুচরিতার যে দুই চারিটি উষ্ণ বাক্যের আদান প্রদান হইয়া গেল তাহার সুর শুনিয়াই পরেশের মনে সংশয় উপস্থিত হইল যে সুচরিতা হারাণবাবুকে হয় ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে না—হয় ত উভয়ের স্বভাবের মধ্যে মিল না হইবার কারণ আছে। এই জন্যই বরদাসুন্দরী যখন বিবাহের জন্য তাগিদ দিতেছিলেন তখন পরেশ তাহাতে পূর্ব্বের মত সায় দিতে পারিলেন না। সেই দিনই বরদাসুন্দরী সুচরিতাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন—"তুমি যে তোমার বাবাকে ভাবিয়ে তুলেছ।"

শুনিয়া সুচরিতা চমকিয়া উঠিল—সে যে ভুলিয়াও পরেশবাবুর উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিবে ইহা অপেক্ষা কষ্টের বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই হইতে পারে না। সে মুখ বিবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, আমি কি করেছি?"

বরদাসুন্দরী। কি জানি বাছা! তাঁর মনে হয়েছে যে তুমি পানুবাবুকে পছন্দ কর না। ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকেই জানে পানুবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ এক রকম স্থির—এ অবস্থায় যদি তুমি—

সুচরিতা। কই, মা, আমি ত এসম্বন্ধে কোনো কথাই কাউকে বলিনি।

সুচরিতার আশ্চর্য্য হইবার কারণ ছিল। সে হারাণবাবুর ব্যবহারে বারবার বিরক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বিবাহ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সে কোনোদিন মনেও কোনো চিন্তা করে নাই। এই বিবাহে সে সুখী হইবে কি না হইবে সে তর্কও তাহার মনে কোনোদিন উদিত হয় নাই, কারণ, ঐ বিবাহ যে সুখ দুঃখের দিক দিয়া বিচার্য্য নহে ইহাই সে জানিত।

তখন তাহার মনে পড়িল সেদিন পরেশবাবুর সামনেই পানুবাবুর প্রতি সে স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাতেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। এমন অসংযম ত সে পূর্ব্বে কোনোদিন প্রকাশ করে নাই, পরেও কখনো করিবেনা বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

এদিকে হারাণবাবুও সেই দিনই অনতিকাল পরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এতদিন তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সুচরিতা তাঁহাকে মনে মনে পূজা করে; এই পূজার অর্ঘ্য তাঁহার ভাগে আরো সম্পূর্ণতর হইত যদি বৃদ্ধ পরেশবাবুর প্রতি সুচরিতার অন্ধসংস্কার বশত একটা অসঙ্গত ভক্তি না থাকিত। পরেশবাবুর জীবনের নানা অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া দিলেও তাঁহাকে সুচরিতা যেন দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিত। ইহাতে হারাণবাবু মনে মনে হাস্যও করিয়াছেন ক্ষুব্ধও হইয়াছেন তথাপি তাহার আশা ছিল কালক্রমে উপযুক্ত অবসরে এই অযথা ভক্তিকে যথাপথে একাগ্রধারায় প্রবাহিত করিতে পারিবেন।

যাহা হউক হারাণবাবু যতদিন নিজেকে সুচরিতার ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন ততদিন তাহার ছোটখাট কাজ ও আচরণ লইয়া কেবল সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাহাকে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া গড়িয়া তুলিতেই প্রবৃত্ত ছিলেন—বিবাহ সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া উত্থাপন করেন নাই। সেদিন সুচরিতার দুই একটা কথা শুনিয়া যখন হঠাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন সেও তাঁহাকে বিচার করিতে আরম্ভ

করিয়াছে তখন হইতে অবিচলিত গাম্ভীর্য্য ও স্থৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে যে দুই একবার সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে পূর্ব্বের ন্যায় নিজের গৌরব তিনি অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সুচরিতার সঙ্গে তাঁহার কথায় ও আচরণে একটা কলহের ভাব দেখা দিয়াছে। তাহাকে লইয়া অকারণে বা ছোট ছোট উপলক্ষ্য ধরিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও সুচরিতার অবিচলিত ঔদাসীন্যে তাঁহাকে মনে মনে হার মানিতে হইয়াছে এবং নিজের মর্য্যাদা-হানিতে বাড়িতে আসিয়া পরিতাপ করিয়াছেন।

যাহা হউক সুচরিতার শ্রদ্ধাহীনতার দুই একটা লক্ষণ দেখিয়া হারাণ বাবুর পক্ষে তাঁহার পরীক্ষকের উচ্চ আসনে দীর্ঘকাল স্থির হইয়া বসিয়া থাকা শক্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে এত ঘন ঘন পরেশ বাবুর বাড়িতে যাতায়াত করিতেন না— সুচরিতার প্রেমে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন পাছে তাঁহাকে এরূপ কেহ সন্দেহ করে এই আশঙ্কায় তিনি সপ্তাহে কেবল একবার করিয়া আসিতেন এবং সুচরিতা যেন তাঁহার ছাত্রী এমনি ভাবে নিজের ওজন রাখিয়া চলিতেন কিন্তু এই কয়দিন হঠাৎ কি হইয়াছে হারাণ বাবু তুচ্ছ একটা ছুতা লইয়া দিনে একাধিকবারও আসিয়াছেন এবং ততোধিক তুচ্ছ ছুতা ধরিয়া সুচরিতার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরেশ বাবুও এই উপলক্ষ্যে উভয়কে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন এবং তাঁহার সন্দেহও ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।

আজ হারাণ বাবু আসিতেই বরদাসুন্দরী তাঁহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন—"আচ্ছা, পানুবাবু, আপনি আমাদের সুচরিতাকে বিবাহ করবেন এই কথা সকলেই বলে কিন্তু আপনার মুখ থেকে ত কোনো দিন কোন কথা শুনতে পাইনে। যদি সত্যই আপনার এ রকম অভিপ্রায় থাকে তাহলে স্পষ্ট করে বলেন না কেন?"

হারাণ বাবু আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। এখন সুচরিতাকে তিনি কোনো মতে বন্দী করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন—তাঁহার প্রতি ভক্তি ও ব্রাহ্মসমাজের হিতকল্পে যোগ্যতার পরীক্ষা পরে করিলেও চলিবে। হারাণ বাবু বরদাসুন্দরীকে কহিলেন—"এ কথা বলা বাহুল্য বলেই বলিনি। সুচরিতার ষোলো বছর বয়সের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেম।"

বরদাসুন্দরী কহিলেন—"আপনার আবার একটু বাড়াবাড়ি আছে। আমরাত চৌদ্দ বছর হলেই যথেষ্ট মনে করি।"

সে দিন চা খাইবার টেবিলে পরেশ বাবু সুচরিতার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সুচরিতা হারাণ বাবুকে এত যত্ন অভ্যর্থনা অনেক দিন করে নাই। এমন কি হারাণ বাবু যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন তখন তাহাকে লাবণ্যের নূতন একটা শিল্পকলার পরিচয় দিবার উপলক্ষ্যে আরো একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

পরেশ বাবুর মন নিশ্চিন্ত হইল। তিনি ভাবিলেন তিনি ভুল করিয়াছেন। এমন কি, তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন এই দুই জনের মধ্যে হয়ত নিগূঢ় একটা প্রণয় কলহ ঘটিয়াছিল, আবার সেটা মিটমাট হইয়া গেছে।

সেই দিন বিদায় হইবার সময় হারাণ পরেশ বাবুর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাড়িলেন। জানাইলেন এ সম্বন্ধে বিলম্ব করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

পরেশ বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কিন্তু আপনি যে ষোলো বছরের কমে মেয়েদের বিয়ে হওয়া অন্যায় বলেন। এমন কি, আপনি কাগজেও সে কথা লিখেছেন।"

হারাণ বাবু কহিলেন—"সুচরিতার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কারণ ওঁর মনের যে রকম পরিণতি হয়েছে অনেক বড় বয়সের মেয়েরও এমন দেখা যায় না।"

পরেশ বাবু প্রশান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কহিলেন—"তা হোক্ পানু বাবু। যখন বিশেষ কোনো অহিত দেখা যাচ্চে না তখন আপনার মত অনুসারে রাধারাণীর ষোলো পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।"

হারাণ বাবু নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ হওয়ায় লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। কেবল আমার ইচ্ছা এই যে এক দিন সকলকে ডেকে ঈশ্বরের নাম করে সম্বন্ধটা পাকা করা হোক্।"

পরেশ বাবু কহিলেন—"সে অতি উত্তম প্রস্তাব।"

ঘণ্টা দুই তিন নিদ্রার পর যখন গোরা ঘুম ভাঙিয়া পাশে চাহিয়া দেখিল বিনয় ঘুমাইতেছে তখন তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। স্বপ্নে একটা প্রিয় জিনিষ হারাইয়া জাগিয়া উঠিয়া যখন দেখা যায় তাহা হারায় নাই তখন যেমন আরাম বোধ হয় গোরার সেইরূপ হইল। বিনয়কে ত্যাগ করিলে গোরার জীবন যে কতখানি পঙ্গু হইয়া পড়ে আজ নিদ্রাভঙ্গে বিনয়কে পাশে দেখিয়া তাহা সে অনুভব করিতে পারিল। এই আনন্দের আঘাতে চঞ্চল হইয়া গোরা ঠেলাঠেলি করিয়া বিনয়কে জাগাইয়া দিল এবং কহিল, "চল, একটা কাজ আছে।"

গোরার প্রত্যহ সকালবেলায় একটা নিয়মিত কাজ ছিল। সে পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে—নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত। শিক্ষিত দলের মধ্যে তাহার এরূপ যাতায়াতের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। গোরাকে ইহারা দাদাঠাকুর বলিত এবং কড়িবাঁধা হুঁকা দিয়া অভ্যর্থনা করিত। কেবলমাত্র ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্যই গোরা জোর করিয়া তামাক খাওয়া ধরিয়াছিল।

এই দলের মধ্যে নন্দ গোরার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত ছিল। নন্দ ছুতারের ছেলে। বয়স বাইশ। সে তাহার বাপের দোকানে কাঠের বাক্স তৈয়ারি করিত। ধাপার মাঠে শিকারীর দলে নন্দর মত অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য কাহারো ছিল না। ক্রিকেট খেলায় গোলা ছুঁড়িতেও সে অদ্বিতীয় ছিল।

গোরা তাহার শিকার ও ক্রিকেটের দলে ভদ্র ছাত্রদের সঙ্গে এই সকল ছুতার কামারের ছেলেদের একসঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছিল। এই মিশ্রিত দলের মধ্যে নন্দ সকল প্রকার খেলায় ও ব্যায়ামে সকলের সেরা ছিল। ভদ্র ছাত্ররা কেহ কেহ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল কিন্তু গোরার শাসনে সকলেরই তাহাকে দলপতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

এই নন্দর পায়ে কয়েকদিন হইল একটা বাটালি পড়িয়া গিয়া ক্ষত হওয়ায় সে খেলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। বিনয়কে লইয়া এই কয়দিন গোরার মন বিকল ছিল সে তাহাদের বাড়িতে যাইতে পারে নাই। আজ প্রভাতেই বিনয়কে সঙ্গে করিয়া সে ছুতার পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

নন্দদের দোতলা খোলার ঘরের দ্বারের কাছে আসিতেই ভিতর হইতে মেয়েদের কান্নার শব্দ শোনা গেল। নন্দর বাপ বা অন্য পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে নাই। পাশে একটি তামাকের দোকান ছিল তাহার কর্ত্তা আসিয়া কহিল—নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা পড়িয়াছে তাহাকে দাহ করিতে লইয়া গেছে।

নন্দ মারা গিয়াছে! এমন স্বাস্থ্য, এমন শক্তি, এমন তেজ, এমন হৃদয়, এত অল্প বয়স—সেই নন্দ আজ ভোরবেলায় মারা গিয়াছে। সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া গোরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দ একজন সামান্য ছুতারের ছেলে—তাহার অভাবে ক্ষণকালের জন্য সংসারে যেটুকু ফাঁক পড়িল তাহা অতি অল্প লোকেরই চোখে পড়িবে কিন্তু আজ গোরার কাছে নন্দর মৃত্যু নিদারুণরূপে অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া ঠেকিল। গোরা যে দেখিয়াছে তাহার প্রাণ ছিল—এত লোক ত বাঁচিয়া আছে কিন্তু তাহার মত এত প্রচুর প্রাণ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়!

কি করিয়া তাহার মৃত্যু হইল খবর লইতে গিয়া শোনা গেল যে তাহার ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছিল। নন্দর বাপ ডাক্তার আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু নন্দর মা জোর করিয়া বলিল তাহার ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। ভূতের ওঝা কাল সমস্ত রাত তাহার গায়ে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে। ব্যামোর আরম্ভে গোরাকে খবর দিবার জন্য নন্দ একবার অনুরোধ করিয়াছিল—কিন্তু পাছে গোরা আসিয়া ডাক্তারী মতে চিকিৎসা করিবার জন্য জেদ করে এই ভয়ে নন্দর মা কিছুতেই গোরাকে খবর পাঠাইতে দেয় নাই।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বিনয় কহিল—"কি মূঢ়তা, আর তার কি ভয়ানক শাস্তি!"

গোরা কহিল—"এই মূঢ়তাকে একপাশে সরিয়ে রেখে তুমি নিজে এর বাইরে আছ মনে করে সান্ত্বনালাভ কোরো না বিনয়! এই মূঢ়তা যে কত বড় আর এর শাস্তি যে

কতখানি তা যদি স্পষ্ট করে দেখতে পেতে তা হলে ঐ একটা আক্ষেপোক্তি মাত্র প্রকাশ করে ব্যাপারটাকে নিজের কাছ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে না।"

মনের উত্তেজনার সঙ্গে গোরার পদক্ষেপ ক্রমশই দ্রুত হইতে লাগিল। বিনয় তাহার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে সমান পা রাখিয়া চলিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

গোরা বলিতে লাগিল—"সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই—জগতে সত্যের সঙ্গে কি রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কি করে? আর তুমি আমি মনে করচি যে আমরা যখন দুপাতা বিজ্ঞান পড়েচি তখন আমরা আর এদের দলে নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনো চারদিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অল্প লোক কখনই নিজেকে বইপড়া বিদ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এরা যতদিন পর্য্যন্ত জগদ্ব্যাপারের মধ্যে নিয়মের আধিপত্যকে বিশ্বাস না করবে যতদিন পর্য্যন্ত মিথ্যা ভয়ের দ্বারা জড়িত হয়ে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকেরাও এর প্রভাব ছাড়াতে পারবে না।"

বিনয় কহিল—"শিক্ষিত লোকেরা ছাড়াতে পারলেই বা তাতে কি! ক'জনই বা শিক্ষিত লোক! শিক্ষিত লোকদের উন্নত করবার জন্যেই যে অন্য লোকদের উন্নত হতে হবে তা নয়—বরঞ্চ অন্য লোকদের বড় করবার জন্যেই শিক্ষিত লোকদের শিক্ষার গৌরব।"

গোরা বিনয়ের হাত ধরিয়া কহিল—"আমি ত ঠিক ঐ কথাই বলতে চাই। কিন্তু তোমরা নিজেদের ভদ্রতা ও শিক্ষার অভিমানে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত হতে পার এটা আমি বারম্বার দেখেছি বলেই তোমাদের আমি সাবধান করে দিতে চাই যে নীচের লোকদের নিষ্কৃতি না দিলে কখনই তোমাদের যথার্থ নিষ্কৃতি নেই। নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তুল কখনই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না, তা তিনি যতই উচ্চে থাকুন না কেন।"

বিনয় নিরুত্তরে গোরার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

গোরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"না বিনয়, এ আমি কিছুতেই সহজে সহ্য করতে পারব না। ঐযে ভূতের ওঝা এসে আমার নন্দকে মেরে গেছে তার মার আমাকে লাগচে, আমার সমস্ত দেশকে লাগচে। আমি এই সব ব্যাপারকে এক একটা ছোট এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে কোন মতেই দেখতে পারিনে।"

তথাপি বিনয়কে নিরুত্তর দেখিয়া গোরা গর্জ্জিয়া উঠিল—"বিনয়, আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি মনে মনে কি ভাবচ! তুমি ভাবচ এর প্রতিকার নেই কিম্বা প্রতিকারের সময় উপস্থিত হতে অনেক বিলম্ব আছে। তুমি ভাবচ এই যে সমস্ত ভয় এবং মিথ্যা সমস্ত ভারতবর্ষকে চেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভারতবর্ষের এ বোঝা হিমালয়ের মত বোঝা, একে ঠেলে টলাতে পারবে কে? কিন্তু আমি এরকম করে ভাবতে পারিনে যদি ভাবতুম তা হলে বাঁচতে পারতুম না। যা কিছু আমার দেশকে আঘাত করচে তার প্রতিকার আছেই তা সে যতবড় প্রবল হোক—এবং একমাত্র আমাদের হাতেই তার প্রতিকার আছে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে বলেই আমি চারিদিকের এত দুঃখ দুর্গতি অপমান সহ্য করিতে পারচি।"

বিনয় কহিল—"এত বড় দেশজোড়া প্রকাণ্ড দুর্গতির সামনে বিশ্বাসকে খাড়া করে রাখতে আমার সাহসই হয় না।"

গোরা কহিল—"অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপের শিখা ছোট। সেই এতবড় অন্ধকারের চেয়ে এতটুকু শিখার উপরে আমি বেশি আস্থা রাখি। দুর্গতি চিরস্থায়ী হতে পারে একথা আমি কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারিনে—সমস্ত বিশ্বের জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি তাকে ভিতরে বাহিরে কেবলি আঘাত করচে, আমরা যে যত যতই ছোট হই সেই জ্ঞানের দলে প্রাণের দলে দাঁড়াব, দাঁড়িয়ে যদি মরি তবু একথা নিশ্চয় মনে রেখে মরব যে আমাদেরই দলের জিত হবে—দেশের জড়তাকেই সকলের চেয়ে বড় এবং প্রবল মনে করে তারই উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকব না। আমিত বলি জগতে সয়তানের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা আর ভূতের ভয় করা ঠিক একই কথা, ওতে ফল হয় এই যে রোগের সত্যকার চিকিৎসায় প্রবৃত্তিই হয় না। যেমন মিথ্যা ভয়, তেমনি মিথ্যা ওঝা—দুইয়ে মিলেই আমাদের মারতে থাকে। বিনয়, আমি তোমাকে বারবার বলচি একথা এক মুহূর্তের জন্য

স্বপ্নেও অসম্ভব বলে মনে করো না যে আমাদের এই দেশ মুক্ত হবেই, অজ্ঞানতাকে চিরদিন জড়িয়ে থাক্‌বে না এবং ইংরেজ তাকে আপনার বাণিজ্যতরীর পিছনে চিরকাল শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে পারবে না। এই কথা মনে দৃঢ় রেখে প্রতিদিনই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, এক মুহূর্ত্ত অলস থাকলে চলবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার জন্য ভবিষ্যতের কোন্ এক তারিখে লড়াই আরম্ভ হবে তোমরা তারই উপর বরাৎ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ। আমি বল্‌চি লড়াই আরম্ভ হয়েছে প্রতি মুহূর্ত্তে লড়াই চলবে এ সময়ে যদি তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পার তাহলে তার চেয়ে কাপুরুষতা তোমাদের কিছুই হতে পারে না।

বিনয় কহিল—"দেখ গোরা, তোমার সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ আমি এই দেখতে পাই যে, পথে ঘাটে আমাদের দেশে প্রতিদিন যা ঘট্‌চে এবং অনেকদিন ধরেই যা ঘটে আস্‌চে তুমি প্রত্যহই তাকে যেন নতুন চোখে দেখতে পাও। নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসকে আমরা যেমন ভুলে থাকি এগুলোও আমাদের কাছে তেমনি—এতে আমাদের আশাও দেয় না, হতাশও করে না, এতে আমাদের আনন্দও নেই দুঃখও নেই—দিনের পর দিন অত্যন্ত শূন্য ভাবে চলে যাচ্ছে, চারিদিকের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের দেশকে অনুভবমাত্র করচিনে।"

হঠাৎ গোরার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া তাহার কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিল—সে দুই হাত মুঠা করিয়া রাস্তার মাঝখানে এক জুড়ি গাড়ির পিছনে ছুটিতে লাগিল—এবং বজ্রগর্জ্জনে সমস্ত রাস্তার লোককে চকিত করিয়া চীৎকার করিল—"থামাও গাড়ি!" একটী মোটা ঘড়ির চেন পরা বাবু গাড়ি হাঁকাইতেছিল সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া দুই তেজস্বী ঘোড়াকে চাবুক কসাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একজন বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক ঝাকা ফল, সবজি, আণ্ডা রুটি মাখন প্রভৃতি আহার্য্য সামগ্রী লইয়া কোনো ইংরেজ প্রভুর পাকশালার অভিমুখে চলিতেছিল। চেনপরা বাবুটী তাহাকে গাড়ির সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য হাঁকিয়াছিল বৃদ্ধ শুনিতে না পাওয়াতে গাড়ি প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। কোনমতে তাহার প্রাণ বাঁচিল কিন্তু ঝাকাসমেত জিনিষগুলা রাস্তায় গড়াগড়ি গেল এবং ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স হইতে ফিরিয়া তাহাকে ড্যাম শুয়ার বলিয়া গালি দিয়া তাহার মুখের উপর সপাং করিয়া চাবুক বসাইয়া দিতে তাহার কপালে রক্তের রেখা দেখা দিল। বৃদ্ধ "আল্লা" বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে জিনিষগুলা নষ্ট হয় নাই তাহাই বাছিয়া ঝাঁকায় তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। গোরা ফিরিয়া আসিয়া বিকীর্ণ জিনিষগুলা নিজে কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইতে লাগিল। মুসলমান মুটে ভদ্রলোক পথিকের এই ব্যবহারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—"আপনি কেন কষ্ট করচেন বাবু, এ আর কোন্মো কাজে লাগবে না।" গোরা এ কাজের অনাবশ্যকতা জানিত এবং সে ইহাও জানিত যাহার সাহায্য করা হইতেছে সে লজ্জা অনুভব করিতেছে—বস্তুত সাহায্য হিসাবে এরূপ কাজের বিশেষ মূল্য নাই—কিন্তু এক ভদ্রলোক যাহাকে অন্যায় অপমান করিয়াছে আর এক ভদ্র লোক সেই অপমানিতের সঙ্গে নিজেকে সমান করিয়া ধর্ম্মের ক্ষুব্ধ ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য আনিতে চেষ্টা করিতেছে একথা রাস্তার লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। ঝাঁকা ভর্ত্তি হইলে গোরা তাহাকে বলিল, "যা লোকসান গেছে সে ত তোমার সইবে না। চল আমাদের বাড়ি চল, আমি সমস্ত পুরো দাম দিয়ে কিনে নেব। কিন্তু বাবা একটা কথা তোমাকে বলি তুমি কথাটি না বলে যে অপমান সহ্য করলে আল্লা তোমাকে এজন্যে মাপ করবেন না!"

মুসলমান কহিল—"যে দোষী, আল্লা তাকেই শাস্তি দেবেন আমাকে কেন দেবেন?"

গোরা কহিল—"যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী, কেন না সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না কিন্তু তবু মনে রেখো ভালমানুষী ধর্ম্ম নয় তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়ীয়ে তোলে তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন তাই তিনি ভালমানুষ সেজে ধর্ম্মপ্রচার করেন নি।"

সেখান হইতে গোরাদের বাড়ি নিকট নয় বলিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিনয়ের বাসায় লইয়া গেল। বিনয়ের দেরাজের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বিনয়কে কহিল—"টাকা বের কর।"

বিনয় কহিল—"তুমি ব্যস্ত হচ্চ কেন, বোসগে-না, আমি দিচ্চি।" বলিয়া হঠাৎ চাবি খুঁজিয়া পাইল না। অধীর

গোরা এক টান দিতেই দুর্ব্বল দেরাজ বন্ধ চাবির বাধা না মানিয়া খুলিয়া গেল।

দেরাজ খুলিতেই পরেশবাবুর পরিবারের সকলের একত্রে তোলা একটা বড় ফোটোগ্রাফ সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল। এটি বিনয় তাহার বালক বন্ধু সতীশের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল।

টাকা সংগ্রহ করিয়া গোরা সেই মুসলমানকে বিদায় করিল কিন্তু ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিল না। গোরাকে এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিনয়ও কোনো কথা তুলিতে পারিল না—অথচ দুই চারিটা কথা হইয়া গেলে বিনয়ের মন সুস্থ হইত।

গোরা হঠাৎ বলিল—"চল্লুম।"

বিনয় বলিল—"বাঃ, তুমি একলা যাবে কি! মা যে আমাকে তোমাদের ওখানে খেতে বলেছেন। অতএব আমিও চল্লুম।"

দুইজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বাকি পথ গোরা আর কোনো কথাকহিল না। ডেস্কের মধ্যে ঐ ছবিখানি দেখিয়া গোরাকে আবার সহসা স্মরণ করাইয়া দিল যে বিনয়ের চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে, যে পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোনো সম্পর্ক নাই। ক্রমে বন্ধুত্বের আদি গঙ্গা নির্জ্জীব হইয়া ঐ দিকেই মূল ধারাটা বহিতে পারে এ আশঙ্কা অব্যক্ত ভাবে গোরার হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে একটা অনির্দ্দেশ্য ভারের মত চাপিয়া পড়িল। সমস্ত চিন্তায় ও কর্ম্মে এতদিন দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ ছিল না—এখন আর তাহা রক্ষা করা কঠিন হইতেছে—বিনয় একজায়গায় স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে।

গোরা যে কেন চুপ করিয়া গেল বিনয় তাহা বুঝিল। কিন্তু এই নীরবতার বেড়া গায়ে পড়িয়া ঠেলিয়া ভাঙিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। গোরার মনটা যে জায়গায় আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে একটা সত্যকার ব্যবধান আছে ইহা বিনয় নিজেও অনুভব করে।

বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিতেই দেখা গেল মহিম পথের দিকে চাহিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই বন্ধুকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—"ব্যাপারখানা কি! কাল ত তোমাদের সমস্ত রাত না ঘুমিয়েই কেটেছে—আমি ভাবছিলুম দুজনে বুঝিবা ফুট পাথের উপরে কোথায় আরামে ঘুমিয়ে পড়েছ! বেলা ত কম হয় নি। যাও বিনয় নাইতে যাও।"

বিনয়কে তাগিদ করিয়া নাহিতে পাঠাইয়া মহিম গোরাকে লইয়া পড়িলেন—কহিলেন, "দেখ গোরা, তোমাকে যে কথাটা বলেছিলুম সেটা একটু বিবেচনা করে দেখো। বিনয়কে যদি তোমার অনাচারী বলে সন্দেহ হয় তাহলে আজকালকার বাজারে হিন্দু পাত্র পাব কোথায়? শুধু হিঁদুয়ানি হলেও ত চল্‌বে না—লেখা পড়াও ত চাই! ঐ লেখাপড়াতে হিঁদুয়ানিতে মিল্‌লে যে পদার্থটা হয় সেটা আমাদের হিন্দুমতে ঠিক শাস্ত্রীয় জিনিষ নয় বটে কিন্তু মন্দ জিনিষও নয়। যদি তোমার মেয়ে থাক্‌ত তা হলে এবিষয়ে আমার সঙ্গে তোমার মতের ঠিক মিল হয়ে যেত।"

গোরা কহিল—"তা বেশ ত—বিনয় বোধ হয় আপত্তি করবে না।"

মহিম কহিল—"শোন একবার! বিনয়ের আপত্তির জন্যে কে ভাব্‌চে! তোমার আপত্তিকেই ত ডরাই! তুমি নিজের মুখে একবার বিনয়কে অনুরোধ কর আমি আর কিছু চাইনে—তাতে যদি ফল না হয় ত না হবে।"

গোরা কহিল "আচ্ছা।"

মহিম মনে মনে কহিল—"এইবার ময়রার দোকানে সন্দেশ এবং গয়লার দোকানে দই ক্ষীর ফরমাস দিতে পারি!"

গোরা অবসর ক্রমে বিনয়কে কহিল—"শশিমুখীর সঙ্গে তোমার বিবাহের জন্য দাদা ভারি পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে-চেন। এখন তুমি কি বল?"

বিনয়। আগে তোমার কি ইচ্ছা সেইটে বল।

গোরা। আমি ত বলি মন্দ কি!

বিনয়। আগে ত তুমি মন্দই বল্‌তে! আমরা দুজনের কেউ বিয়ে করব না এত একরকম ঠিক হয়েই ছিল।

গোরা। এখন ঠিক করা গেল তুমি বিয়ে করবে আর আমি করব না।

বিনয়। কেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন?

গোরা। পৃথক ফল হবার ভয়েই এই ব্যবস্থা করা যাচ্চে। বিধাতা কোনো কোনো মানুষকে সহজেই বেশি ভারগ্রস্ত করে গড়ে থাকেন, কেউবা সহজেই দিব্য

ভারহীন—এই উভয় জীবকে একত্রে জুড়ে চালাতে গেলে এদের একটির উপর বাইরে থেকে বোঝা চাপিয়ে দুজনের ওজন সমান করে নিতে হয়। তুমি বিবাহ করে একটু দায়গ্রস্ত হলে পর তোমাতে আমাতে সমান চালে চল্‌তে পারব।

বিনয় একটু হাসিল এবং কহিল,—"যদি সেই মৎলব হয় তবে এই দিকেই বাট্‌খারাটা চাপাও!"

গোরা। বাট্‌খারাটি সম্বন্ধে আপত্তি নেই ত?

বিনয়। ওজন সমান করবার জন্যে যা হাতের কাছে আসে তাতেই কাজ চালানো যেতে পারে। ও পাথর হলেও হয়, ঢ্যালা হলেও হয়, যা খুসি।

গোরা যে বিবাহ প্রস্তাবে কেন উৎসাহ প্রকাশ করিল তাহা বিনয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না। পাছে বিনয় পরেশ বাবুর পরিবারের মধ্যে বিবাহ করিয়া বসে গোরার মনে এই সন্দেহ হইয়াছে অনুমান করিয়া বিনয় মনে মনে হাসিল। এরূপ বিবাহের সঙ্কল্প ও সম্ভাবনা তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদিত হয় নাই। এযে হইতেই পারে না। যাই হোক্ শশিমুখীকে বিবাহ করিলে এরূপ অদ্ভুত আশঙ্কার একেবারে মূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই উভয়ের বন্ধুত্ব সম্বন্ধ পুনরায় সুস্থ ও শান্ত হইবে ও পরেশ বাবুদের সঙ্গে মিলামেশা করিতেও তাহার কোনো দিক্ হইতে কোনো সঙ্কোচের কারণ থাকিবে না এই কথা চিন্তা করিয়া সে শশিমুখীর সহিত বিবাহে সহজেই সম্মতি দিল। মধ্যাহ্নে আহারান্তে রাত্রের নিদ্রার ঋণশোধ করিতে দিন কাটিয়া গেল। সেদিন দুই বন্ধুর মধ্যে আর কোনো কথা হইল না কেবল জগতের উপর সন্ধ্যার অন্ধকারের পর্দ্দা পড়িলে প্রণয়ীদের মধ্যে যখন মনের পর্দ্দা উঠিয়া যায় সেই সময় বিনয় ছাতের উপর বসিয়া সিধা আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—"দেখ, গোরা, একটা কথা আমি তোমাকে বল্‌তে চাই। আমার মনে হয় আমাদের স্বদেশ প্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা করে দেখি।"

গোরা। কেন বল দেখি?

বিনয়। আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখিনে।

গোরা। তুমি ইংরেজদের মত মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্থলে শূন্যে, আহারে আমোদে কর্ম্মে সর্ব্বত্রই দেখ্‌তে চাও—তাতে ফল হবে এই যে পুরুষের চেয়ে মেয়েকেই বেশি করে দেখ্‌তে থাক্‌বে—তাতেও দৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট হবে।

বিনয়। না, না, তুমি আমার কথাটাকে ও রকম করে উড়িয়ে দিলে চল্‌বে না। ইংরেজের মত করে দেখ্‌ব কি না দেখ্‌ব সে কথা কেন তুলচ! আমি বল্‌চি এটা সত্য যে স্বদেশের মধ্যে মেয়েদের অংশকে আমাদের চিন্তার মধ্যে আমরা যথা পরিমাণে আনিনে। তোমার কথাই আমি বল্‌তে পারি তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে এক মুহূর্ত্তও ভাব না—দেশকে তুমি যেন নারীহীন করে জান—সে রকম জানা কখনই সত্য জানা নয়।

গোরা। আমি যখন আমার মাকে দেখেছি, মাকে জেনেছি তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখেছি এবং জেনেছি।

বিনয়। ওটা তুমি নিজেকে ভোলাবার জন্যে একটা সাজিয়ে কথা বল্লে মাত্র। আমি জানি তুমি আমার কথাটা কি ভাবে নেবে তবু আমি বল্‌চি, ঘরের কাজের মধ্যে ঘরের লোকে ঘরের মেয়েদের অতিপরিচিত ভাবে দেখ্‌লে তাতে যথার্থ দেখাই হয় না। নিজেদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের বাইরে আমরা দেশের মেয়েদের যদি দেখ্‌তে পেতুম তাহলে আমাদের স্বদেশের সৌন্দর্য্য এবং সম্পূর্ণতাকে আমরা দেখ্‌তুম দেশের এমন একটি মূর্ত্তি দেখা যেত যার জন্যে প্রাণ দেওয়া সহজ হত—অন্তত, তাহলে দেশের মেয়েরা যেন কোথাও নেই এরকম ভুল আমাদের কখনই ঘট্‌তে পারত না। আমি জানি ইংরেজের সমাজের কোনো রকম তুলনা করতে গেলেই তুমি আগুন হয়ে উঠ্‌বে—আমি তা করতে চাইনে—আমি জানিনে ঠিক কতটা পরিমাণে এবং কি রকম ভাবে আমাদের মেয়েরা সমাজে প্রকাশ পেলে তাদের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না হয় কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্দ্ধ-সত্য হয়ে আছে—আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারচে না।

গোরা। তুমি একথাটা সম্প্রতি হঠাৎ আবিষ্কার করলে কি করে?

বিনয়। হাঁ, সম্প্রতিই অবিষ্কার করেছি এবং হঠাৎ আবিষ্কারই করেছি। এতবড় সত্য আমি এতদিন জানতুম না। জানতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করচি। আমরা যেমন চাষাকে কেবল মাত্র তার চাষ বাস, তাঁতিকে তা'র কাপড় তৈরির মধ্যে দেখি বলে তাদের ছোট লোক বলে অবজ্ঞা করি, তারা সম্পূর্ণভাবে আমাদের চোখে পড়ে না এবং ছোট লোক ভদ্রলোকের সেই বিচ্ছেদের দ্বারাই দেশ দুর্ব্বল হয়েছে, ঠিক সেই রকম কারণেই দেশের মেয়েদের কেবল তাদের রান্নাবান্না বাটনা বাঁটার মধ্যে আবদ্ধ করে দেখচি বলেই মেয়েদের মেয়ে মানুষ বলে অত্যন্ত খাটো করে দেখি—এতে করে আমাদের সমস্ত দেশই খাটো হয়ে গেছে।

গোরা। দিন আর রাত্রি—সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ—পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত। আমাদের কর্ম্মের হিসাব থেকে আমরা রাতকে বাদ দিই। কিন্তু বাদ দিই বলে তার যে গভীর কর্ম্ম তার কিছুই বাদ পড়ে না! সে গোপন বিশ্রামের অন্তরালে আমাদের ক্ষতি পূরণ করে আমাদের পোষণের সহায়তা করে। যে খানে সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা সেখানে রাতকে জোর করে দিন করে তোলে—সেখানে গ্যাস জ্বালিয়ে কল চালানো হয়, বাতি জ্বালিয়ে সমস্ত রাত নাচ গান হয়—তাতে ফল কি হয়! ফল এই হয় যে, রাত্রির যে স্বাভাবিক নিভৃত কাজ তা নষ্ট হয়ে যায়, ক্লান্তি বাড়তে থাকে, ক্ষতিপূরণ হয় না, মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মেয়েদেরও যদি তেমনি আমরা প্রকাশ্য কর্ম্ম ক্ষেত্রে টেনে আনি তাহলে তাদের নিগূঢ় কর্ম্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায় তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তিভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে। সেই মত্ততাকে হঠাৎ শক্তি বলে ভ্রম হয়, কিন্তু সে শক্তি বিনাশ করবারই শক্তি। শক্তির দুটো অংশ আছে, এক অংশ ব্যক্ত আর এক অংশ অব্যক্ত, এক অংশ উদ্যোগ আর এক অংশ বিশ্রাম, এক অংশ প্রয়োগ আর এক অংশ সম্বরণ—শক্তির এই সামঞ্জস্য যদি নষ্ট কর তা হলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কিন্তু সে ক্ষোভ মঙ্গলকর নয়। নরনারীও সমাজ-শক্তির দুই দিক;—পুরুষই ব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয়—নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলি ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে সমস্ত মূলধন খরচ করে ফেলে সমাজকে দ্রুতবেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই জন্যে বলচি আমরা পুরুষরা যদি থাকি যজ্ঞের ক্ষেত্রে আর মেয়েরা যদি থাকেন ভাঁড়ার আগ্‌লে তাহলেই মেয়েরা অদৃশ্য থাক্‌লেও যজ্ঞ সুসম্পন্ন হবে। সব শক্তিকেই একই দিকে একই জায়গায় একই রকমে খরচ করতে চায় যারা তারা উন্মত্ত।

বিনয়। গোরা, তুমি যা বল্লে আমি তার প্রতিবাদ করতে চাইনে কিন্তু আমি যা বল্‌ছিলুম তুমিও তার প্রতিবাদ করনি। আসল কথা—

গোরা। দেখ বিনয় এর পরে একথাটা নিয়ে আর অধিক যদি বকাবকি করা যায় তাহলে সেটা নিতান্ত তর্ক হয়ে দাঁড়াবে। আমি স্বীকার করচি তুমি সম্প্রতি মেয়েদের সম্বন্ধে যতটা সচেতন হয়ে উঠেছ আমি ততটা হইনি—সুতরাং তুমি যা অনুভব করচ আমাকেও তাই অনুভব করাবার চেষ্টা করা কখনো সফল হবে না। অতএব এ সম্বন্ধে আপাতত আমাদের মতভেদ রইল বলেই মেনে নেওয়া যাক্‌না।

গোরা কথাটাকে উড়াইয়া দিল। কিন্তু বীজকে উড়াইয়া দিলেও সে মাটিতে পড়ে এবং মাটিতে পড়িলে সুযোগমত অঙ্কুরিত হইতে বাধা থাকেনা। এ পর্য্যন্ত জীবনের ক্ষেত্র হইতে গোরা স্ত্রীলোককে একেবারেই সরাইয়া রাখিয়াছিল—সেটাকে একটা অভাব বা ক্ষতি বলিয়া সে কখনো স্বপ্নেও অনুভব করে নাই। আজ বিনয়ের অবস্থান্তর দেখিয়া সংসারে স্ত্রীজাতির বিশেষ সত্তা ও প্রভাব তাহার কাছে গোচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার স্থান কোথায়, ইহার প্রয়োজন কি, তাহা সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই, এই জন্য বিনয়ের সঙ্গে একথা লইয়া তর্ক করিতে তাহার ভাল লাগে না। বিষয়টাকে সে অস্বীকার করিতেও পারে না আয়ত্ত করিতেও পারিতেছেনা এই জন্য ইহাকে আলোচনার বাহিরে রাখিতে চায়।

রাত্রে বিনয় যখন বাসায় ফিরিতেছিল, তখন আনন্দময়ী তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—"শশিমুখীর সঙ্গে বিনয় তোর বিবাহ নাকি ঠিক হয়ে গেছে।"

বিনয় সলজ্জ হাস্যের সহিত কহিল—"হাঁ, মা,—গোরা এই শুভকর্ম্মের ঘটক।"

আনন্দময়ী কহিল "শশিমুখী মেয়েটি ভাল কিন্তু বাছা ছেলে মানুষি কোরোনা। আমি তোমার মন জানি বিনয়—তুমি একটু দো-মনা হয়েছ বলেই তাড়াতাড়ি এ কাজ করে ফেলচ। এখনো বিবেচনা করে দেখবার সময় আছে;—তোমার বয়স হয়েছে বাবা—এত বড় একটা কাজ অশ্রদ্ধা করে কোরো না।" বলিয়া বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। বিনয় কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

মাতৃভূমির সেবারূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজ নামে এক স্বাধীন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের আদর্শ ঘোষণা করিয়া এবং সেই স্বরাজ স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তদ্‌বিরোধিনী আসুরী শক্তিসমূহের সঙ্গে কিরূপ তেজ ও নির্ভীকতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে স্বীয় জীবনে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তিনি ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। শোকার্ত্ত হৃদয়ে ও সাশ্রু নয়নে তাঁহার স্বদেশীয়গণ মায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মাতৃযজ্ঞের পবিত্র অগ্নিতে তাঁহার দেহ আহুতি দিয়া আসিয়াছেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের অপূর্ব্ব ঘটনাবলীসম্বলিত জীবনলীলার অবসান হইয়াছে। তিনি আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তদীয় মহচ্চরিত্রের আলোচনা ও গুণকীর্ত্তন এবং তদীয় জীবনের মহান্ দৃষ্টান্তের অনুসরণ ব্যতীত অন্য আর কি উপায়ে এখন আমরা তাঁহার প্রতি আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি?

উপাধ্যায়ের চরিত্রের বিষয় চিন্তা করিলে সর্ব্বোপরি তাঁহার তীব্র ব্যক্তিত্বের কথাই প্রথমে মনে উদয় হয়। শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহার সেই তীব্র ব্যক্তিত্বের শক্তি অনুভব করিয়াছেন। বহু উপাদানের একত্র সমাবেশে সেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়াছিল। তৎসমুদায়ের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের ভাবসমূহের তীব্রতা ও গভীরতা; লক্ষ্য বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা, অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যশীলতা, সরলতা, স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। উপাধ্যায় হৃদয়ে যাহাই অনুভব করিতেন তাহাই অতি গভীর ও তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। ভাববিশেষের দ্বারা তাঁহার হৃদয় একবার অধিকৃত হইলে তিনি সেই ভাবের উচ্ছ্বাসে ও আবেগে একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন; এজন্য তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ ও বিরাগ উভয়ই অতি প্রবল ও তীব্র আকার ধারণ করিত। এই জন্যই তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে যেমন স্নেহরসে আপ্লুত করিতেন বিরোধীদিগকেও তেমনি সুতীক্ষ্ণ বাণে ক্ষত বিক্ষত করিতেন। *কিন্তু বিরোধীদিগের* প্রতি তাঁহার যে বিরাগ, তাহা অজ্ঞানীর বিরাগের ন্যায় দ্বেষহিংসাজড়িত মলিন বিরাগ ছিল না; তাঁহার বিরাগ জ্ঞানীর বিরাগ, সুতরাং তাহারও পশ্চাতে উদারতা ও উপেক্ষার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ যাহাদের প্রতি তাঁহার ঘোর বিরাগ ছিল তাহাদের প্রতি তাঁহার লেশমাত্রও বৈরভাব ছিল না। তবে সম্পূর্ণ সরল ও নির্ভীকচরিত্র ছিলেন বলিয়া হৃদয়ের অনুরাগ ও বিরাগ উভয়ই তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেন। ভণ্ড দেশপ্রেমিকগণের ন্যায় তিনি মনে এক ও মুখে আর এক ছিলেন না। কি শত্রু কি মিত্র তিনি কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না। বিশেষতঃ স্বীয় জীবনের যাহা লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার একান্ত অভিনিবেশ ও একাগ্রতা ছিল; সুতরাং যাহা সেই লক্ষ্যের অনুকূল তিনি যেমন অকুতোভয়ে তাহা ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তদ্রূপ যাহা সেই লক্ষ্যের প্রতিকূল তাহার মূলেও শাণিত কুঠারাঘাত না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। এজন্যই তিনি নরমদলের লোক না হইয়া গরমদলের লোক হইয়াছিলেন; এজন্যই আবার তিনি স্বদেশীর আনন্দ এবং দেশবৈরী ইংরাজ ও ভণ্ড দেশপ্রেমিকগণের আতঙ্ক স্বরূপ হইয়াছিলেন। যাহা অন্যায়, যাহা অধর্ম্ম, যাহা অসত্য ও ভণ্ড, শত্রুমিত্র নিরপেক্ষ হইয়া তিনি তাহা পদদলিত করিতেন। এই ভণ্ড ও দুষ্টদলন-কার্য্যেই তাঁহার সরলতা, নির্ভীকতা ও অকৃত্রিম দেশহিতৈষণা অত্যুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অতি দুরূহ কার্য্যে তিনি যে কখনও কোনও ভুল-ভ্রান্তি করেন নাই এমন কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু কোন অজ্ঞানী ও অশিক্ষিত

লোক এই কার্য্য হস্তে লইলে যে স্থলে সে শত শত ভ্রান্তিতে পতিত হইত, সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত লোক ছিলেন বলিয়া উপাধ্যায় হয়ত সে স্থলে দুই চারিটী মাত্র ভুল করিয়াছেন।

আমরা এতক্ষণ উপাধ্যায়ের সুতীব্র ব্যক্তিত্বেরই আলোচনা করিয়াছি। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সকল ঘটনাতেই এই ব্যক্তিত্বের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম যৌবনে তিনি অপরাপর যুবকবৃন্দের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নামাঙ্কিত পত্ররাশিলাভ এবং তৎপরে গোলামী-পদান্বেষণকেই স্বীয় জীবনের চরম লক্ষ্য করেন নাই; কিন্তু স্বদেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রশ্নসমূহের মীমাংসায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা স্বরূপ বর্ত্তমান সময়ের অপরাপর অনেক গণনীয় ব্যক্তির ন্যায় তিনিও প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের উদার মুক্ত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মত সকল গ্রহণ করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্রের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মা যিশুখ্রীষ্টের প্রতি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থের প্রতি উপাধ্যায়ের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল; এজন্যই বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টভক্ত কেশবচন্দ্রের পরিচালিত শাখায় যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে যোগদান কালেও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি উপাধ্যায়ের নির্ম্মম ধ্বংসকারীর ভাব ছিল না; হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসমাজে যে কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুসঙ্গত বস্তু আছে তৎসমুদায়ের সংরক্ষণের দিকে তাঁহার একটী স্বাভাবিক ও প্রবল ঝোঁক ছিল। যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পর তিনি কঙ্কর্ড ক্লাব নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়া এবং কঙ্কর্ড নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া স্বদেশীয় যুবকবৃন্দের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় পিতৃব্য পরলোকগত মহাত্মা কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নামে কঙ্কর্ড পত্রের সম্পাদক থাকিলেও উপাধ্যায় মহাশয় নিজেই ঐ পত্র সম্পাদন করিতেন। এইরূপে কিছুকাল বঙ্গীয় যুবকগণের কল্যাণসাধন চেষ্টার পর জনৈক বন্ধুর সহিত উপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে সিন্ধুদেশে গমন করেন। যিশুখৃষ্ট ও বাইবেল গ্রন্থের প্রতি তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহার বন্ধুরা অনেক সময় উপহাস করিয়া বলিতেন যে, উপাধ্যায় কালে খৃষ্টান হইয়া যাইবেন। বন্ধুরা যে বাক্য উপহাস করিয়া বলিতেন এখন সেই বাক্যই সত্য হইল; সিন্ধুদেশে বাসকালে উপাধ্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন। সাধারণ মনুষ্য হইলে অপরাপর শত শত ভদ্রবংশীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় উপাধ্যায়ও এখন একটী উচ্চ বেতনের পাদ্রীপদ গ্রহণ করিয়া সুখে ও সম্ভ্রমে জীবন কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু উপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুর লোক ছিলেন; সুতরাং সুখসম্ভ্রম প্রভৃতি বাহ্য সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাধ্যায় প্রথমে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের জনৈক পাদ্রী দ্বারাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দু সন্তান, সুতরাং উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-ভক্তি-চর্চ্চায় তাঁহার স্বাভাবিক অভিনিবেশ ও প্রতিভা ছিল। কিন্তু দেশ প্রচলিত প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উচ্চাঙ্গের ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ কোন উপকরণ তিনি দেখিতে পাইলেন না; এজন্য অচিরে তিনি স্বভাবতঃই রোমান কাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ে যোগদানের পর তিনি একটী অতি মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। সেই কার্য্যটি সাধন করিতে পারিলেও তিনি ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিতেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, সাধু যোহন, সাধু পৌল এবং তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী পরবর্ত্তী রোমান কাথলিক খৃষ্টীয় সমাজের আচার্য্যগণ (The fathers of the Cristian Church) গ্রীক দর্শনের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইউরোপ-খণ্ডে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অত সহজে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ দেশ-প্রচলিত উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-ভক্তির সহিত বিচ্ছেদ বা বিরোধ থাকিলে কোনও ধর্ম্মই তদ্দেশে বদ্ধমূল হইতে পারে না। এই মহাসত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়েরই প্রতি যুগপৎ শ্রদ্ধা বশতঃ উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হিন্দু জ্ঞানের শিরো-ভাগ বেদান্ত-দর্শনের সহিত ও হিন্দু সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারের একটি উন্নত জ্ঞান-সম্মত পন্থা উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের এই অভিনব ও উন্নত পন্থা সিন্ধুদেশ-বাসকালে সোফিয়া নামক সাময়িক পত্রে এবং পরে

কলিকাতা বাসকালে টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরী নামক মাসিক পত্রে উপাধ্যায় বিশেষভাবে প্রচার করেন। এই সময়ই উপাধ্যায় গৃহস্থাশ্রমপ্রচলিত তদীয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম পরিত্যাগ করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নাম ও তৎসঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করেন; এবং ইউরোপখণ্ডে নানা রোমান কাথলিক সন্ন্যাসীগণ যেমন নানা খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় (Orders of monks) প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তিনিও তদ্রূপ ভারতবর্ষে ঈশাপন্থী নামে নূতন একটি খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ রোমান কাথলিক খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রথমাবস্থায় তৎসমাজের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ ইউরোপখণ্ডে যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে ভারত-বর্ষে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও ঠিক সেই কার্য্যেরই সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, পরধর্ম্মদ্বেষী, দাম্ভিক রোমান কাথলিক পুরোহিতগণ উপাধ্যায়ের এই মহৎ কার্য্যের ঠিক মূল্য বুঝিয়া তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং রোমান কাথলিক খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে এক হুকুমনামা (Encyclical) বাহির করিয়া খ্রীষ্টানদিগকে উপাধ্যায়ের প্রকাশিত সোফিয়াপত্র পাঠ করিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উপাধ্যায় প্রস্তাবিত ঈশাপন্থী নামক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। কিন্তু উপাধ্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহেন; সুতরাং তিনি শীঘ্রই নূতন আর একটী বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা করিলেন। বেদান্ত-দর্শনের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া বেদান্ত-দর্শনের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া উপাধ্যায় উহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং স্বদেশে ও বিদেশে বেদান্ত-শাস্ত্র প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এক্ষণে তিনি টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরীতে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ এবং পৃথক ভাবে পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থের একটী ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, বিদেশে বেদান্ততত্ত্ব-প্রচারার্থে তিনি ইংলণ্ড-দেশে গমন করিয়া তথাকার সুপ্রসিদ্ধ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতাও প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতা কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, তাঁহারা প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ঐ সকল বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ছয় সাত জন অধ্যাপক মিলিয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শনের নূতন একটি অধ্যাপক-পদসৃষ্টির জন্য একটি কমিটী গঠন করেন। ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান একটী বিদ্যাকেন্দ্রে হিন্দুদর্শনের রীতিমত চর্চ্চা আরম্ভ হইবে, এই আশা ও আনন্দে উপাধ্যায়ের বুক ফুলিয়া উঠিল; এবং এই বৃহৎ ব্যাপারের জন্য অর্থ-সংগ্রহার্থে উপাধ্যায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু নানা কারণে উপাধ্যায়ের আশা ফলবতী হইল না; কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শনের অধ্যাপকের পদসৃষ্টি কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইল। এইরূপে উপাধ্যায় দুইটি অতি মহৎ কার্য্যের সূচনা করিয়া দুইটিতেই বিফল মনোরথ হইলেন। কিন্তু বিফলতার অন্ধকারের মধ্য দিয়াই লোকের নিকট সফলতার পথ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। উপাধ্যায়েরও ঠিক তাহাই হইল—অতীত জীবনের সমস্ত বাধাবিঘ্ন, বিফলতা ও নৈরাশ্য তাঁহার সম্মুখে জীবনের সেই অঙ্ক খুলিয়া দিল, যে অঙ্কে তিনি বিজয়ী ও কীর্ত্তিমান্ পুরুষরূপে প্রকাশ পাইলেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি যখন বেদান্ত-দর্শনে একান্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন, তখনই সেই দর্শনের আলোকে তিনি হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূল তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই আলোচনার ফলস্বরূপ তিনি এক্ষণে এই সত্যটি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন যে, হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্ম্মের অর্থাৎ হিন্দুসমাজ-তত্ত্বের মূলও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নানা বর্ণভেদ এবং ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি নানা আশ্রম ভেদ থাকিলেও এ সকল ভেদ ব্যবহারিক ভেদ মাত্র, পারমার্থিক দৃষ্টিতে বর্ণে বর্ণে আশ্রমে আশ্রমে কোনও ভেদ নাই; যেহেতু সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমই সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পুরুষে প্রতিষ্ঠিত—তিনিই সকলের মূলাধার, তিনিই সকলের পরম গতি। এমন উচ্চ কেহ নাই যে তাঁহার আশ্রিত নহে, আবার এমন হীন কেহ নাই যে তাঁহা হইতে ভ্রষ্ট। সুতরাং হিন্দু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের, হিন্দু-সমাজবিধির সমস্ত বৈষম্যের মূলে এক মহাসাম্য বিদ্যমান। এইরূপে উপাধ্যায় হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসমাজতত্ত্বের মধ্যে যতই প্রবেশ লাভ করিতে লাগিলেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তাঁহার

এক একটি মত ও বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পত্রের ন্যায় তাঁহা হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। সর্ব্বশেষে তিনি খৃষ্টীয় ভজনালয়ে গিয়া উপাসনাদি করিতেও বিরত হইলেন। জীবনে সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে হিন্দুসমাজকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেও উপাধ্যায় পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন এ কথা বলা যায় না। কিন্তু উপাধ্যায় এক্ষণে খাঁটি হিন্দু হইলেন; অজ্ঞানী হিন্দু নহেন; কিন্তু জ্ঞানী হিন্দু হইলেন। হিন্দু-দর্শন, হিন্দুবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, হিন্দুসাধনা, হিন্দুশিক্ষা, হিন্দুদীক্ষা, এক কথায় সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা এখন তাঁহার পরমপূজ্য হইয়া দাঁড়াইল। অতীত কালে ভারত জগতের শিরোভূষণ এবং ভারতীয় সভ্যতা জগতের পরম আদরের বস্তু ছিল; আবার কি ভারত জাগিবে না? আবার কি ভারতীয় সভ্যতা জগতে আদরণীয় হইবে না? উপাধ্যায়ের প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে এই প্রশ্নের জবাব উঠিল "ভারত নিশ্চয়ই জাগিবে, ভারতীয় সভ্যতা আবার জগতে পূজিত হইবে।" কিন্তু ভারতবাসিগণ আপনাদিগকে যে নিতান্ত হীন ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া ভিক্ষালব্ধ ধনে ধনী হইবার আশায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছে; আর সেই পর তাহাদের প্রার্থিত ধনদানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে যখন পদাঘাত করিতেছে, তখনও তাহারা যে সেই পরপদই লেহন করিতেছে! কি যাদুমন্ত্রে ইহারা এইরূপ মুগ্ধ ও হতচেতন হইল? ইহারা আপনাদিগকে যতদূর অসার ও অকর্ম্মণ্য ভাবিতেছে, বাস্তবিকই কি ইহারা ততদূর অসার ও অকর্ম্মণ্য? যে যাদুমন্ত্রে ইহারা হতচেতন হইয়া আছে, সেই যাদুমন্ত্র কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না? ইহাদের অন্তরে কি আত্মমর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব উদ্বোধিত করা যায় না? উপাধ্যায় অন্তর হইতে এই প্রশ্নেরও উত্তর পাইলেন---"নিশ্চয়ই যায়।" সুতরাং উপাধ্যায় এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ইংরাজের যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতবাসীর অন্তরে আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব জাগাইয়া দিলে ভারতবাসী আবার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে এবং ভারতীয় সভ্যতাকে আবার জগতে মহিয়সী করিতে পারিবে। যাই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, অমনি তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা, ইহাই উপাধ্যায়ের চিরস্বভাব; সুতরাং উপাধ্যায় অবিলম্বে এই নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যা-পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার স্তম্ভে একদিকে যেমন তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন; অন্যদিকে তেমনি আবার ন্যায় ও ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া ইংরাজ কিরূপে এদেশে কেবল যাদুমন্ত্রের সাহায্যে পূর্ব্বাপর তাহার কুটিল নীতি চালাইয়া আসিয়াছে, স্বদেশীয়দিগকে তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু জাতীয় জীবনের যে নব আদর্শ এবং জাতীয় জীবন সম্বন্ধে যে নব আশা উপাধ্যায়ের হৃদয়কে উন্মাদিত করিতেছিল, বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যিক দলের অধিনায়ক কবিবর রবীন্দ্রনাথ তদীয় অপূর্ব্ব কাব্যরসময়ী বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা এবং বঙ্গের আধুনিক রাজনৈতিক দলের অধিনায়ক বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র নিউ-ইণ্ডিয়াপত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং সভা-সমিতিতে ওজস্বিনী বক্তৃতাদি দ্বারা কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই সেই আদর্শ ও আশা ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং ধর্ম্ম ও সমাজাদি বিষয়ে ইহাঁদের সহিত গুরুতর মতভেদ থাকা সত্ত্বেও এই দুই অধিনায়কের সহিত উপাধ্যায়ের মিলন এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী ছিল। বস্তুতঃ সমভাবের আকর্ষণ-প্রভাবে উপাধ্যায় বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বেই রবীন্দ্র-নাথের সহিত মিলিত হইয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পরেও তিনি কিছুকাল রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচররূপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারাদি কার্য্য করেন। অবশেষে যখন কুটিলনীতি লাট কর্জ্জনের রাজবিধিরূপ ছুরিকাঘাতে বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইল, অত্যাচারীর নির্ম্মম শাণিত অস্ত্রাঘাতে জাতীয় জীবনরূপী সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিল এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে 'স্বদেশী-গ্রহণ ও বিদেশী-বর্জ্জন" ঘোষণা করিল; কেবল তাহাই নহে, পরে যখন ক্রমে ক্রমে স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষার, স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় জীবনের জয়পতাকা আকাশে উড্ডীন হইল, আর কবিবর রবীন্দ্রনাথ তদীয় কবিকুঞ্জের সুশীতল ছায়া ও সাত্ত্বিকী শান্তি ছাড়িয়া রাজ-নৈতিক জগতের কোলাহল ও আবিলতার মধ্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না, তখন উপাধ্যায় বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র ও দেশগৌরব অরবিন্দ ও মনোরঞ্জন প্রভৃতির সহিতই বিশেষভাবে যোগ দিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করি-লেন। কিন্তু উপাধ্যায় দেখিলেন যে, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ,

মনোরঞ্জন প্রভৃতি যে সকল মহারথী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত জনের ভাষায় সুশিক্ষিত জনগণকেই মাতাইতেছেন। যাহারা স্বল্পশিক্ষিত বা একেবারেই অশিক্ষিত তাহারাই তো জাতির সর্ব্বপ্রধান ভাগ; তাহাদিগকে জাগাইবার উপায় কি? তাহাদের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগকে না ডাকিলে তাহারা সাড়া দিবে কেন? এজন্য উপাধ্যায় শিক্ষিতজনগণকে জাগাইবার ভার বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, মনোরঞ্জন প্রভৃতির হস্তে রাখিয়া আপামর সাধারণের নিকট হইতে সাড়া পাইবার চেষ্টায় স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলেন। এই সাধারণ জনগণের হৃদয়কর্ষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উপাধ্যায় এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন যাহা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়। স্বদেশীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের সহিত দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা-স্থলে যিনি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না; দার্শনিক বক্তৃতা দ্বারা যিনি ইউরোপের প্রধান একটি বিদ্যাকেন্দ্রের পণ্ডিতদিগকেও মুগ্ধ করিয়াছিলেন; সেই স্বদেশীয় বিদেশীয় দার্শনিক জ্ঞান-সম্পন্ন পণ্ডিত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রাম্যভাষা, হেঁয়ালী, রূপকথা ও অপভাষা (slang) প্রভৃতির একত্র সমাবেশে এক্ষণে এমন এক সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন যাহা সাধারণ জনগণের অতি স্পৃহার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। সেই সাহিত্য পাঠ করিয়া দোকানী, পসারী, পাঠশালার গুরুমহাশয়, জমিদারের সরকার ও গোমস্তা, গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা হাসিত, কাঁদিত, আনন্দে উৎফুল্ল ও ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত; আর আমরা সুরুচি ও শিক্ষাভিমানী জনগণ যাহারা সকল সময় তাঁহার ভাষা ও রুচির প্রশংসা করিতে পারিতাম না, আমরাও সন্ধ্যাকালে তাঁহার সন্ধ্যাকে হস্তে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতাম; আর ইংরাজ, ইংরাজ তাঁহার সন্ধ্যার মর্ম্ম অবগত হইয়া কিরূপ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত তাহা সর্ব্বজন বিদিত। সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত-রুচি পুরুষ হইয়া উপাধ্যায় স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনগণের সম্যক্ উপযোগী এমন সাহিত্য কিরূপে সৃজন করিলেন, ইহা সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয়; আর বঙ্গভাষার যে এমন ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে, তাহা অবগত হওয়াও আমাদের পক্ষে অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছে। বস্তুতঃ ইংরাজের যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিবার জন্য উপাধ্যায় যেন নূতন আর এক যাদুমন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অন্য কোনও কার্য্য না করিয়া উপাধ্যায় যদি কেবল এই সাহিত্য সৃষ্টিই করিয়া যাইতেন তাহা হইলেও তিনি বঙ্গের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই অপূর্ব্ব সাহিত্যের সাহায্যে স্বদেশের সাধারণ জনমণ্ডলীকে ইংরাজের মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের অন্তরে যে তিনি প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব উদ্বোধিত করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের ইতিহাসে ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে।

সচরাচর উপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম অভিযোগ এই যে, তাঁহার মতস্থৈর্য্য ছিল না তিনি একবার ব্রাহ্ম, একবার খ্রীষ্টান, পুনরায় আবার হিন্দু হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন অকপট চিত্তে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন; যশমানের দিকে একটুও দৃষ্টি দেন নাই। সমস্ত জীবনই তিনি আপনাকে মহদনুষ্ঠানে নিয়োজিত রাখিয়াছেন; উচ্চ মতলব ভিন্ন ক্ষুদ্র মতলবকে কখনও হৃদয়ে স্থান দেন নাই; আর যখন যে মতলব ধরিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধ করিবার জন্য ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। আর এক কথা এই যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যবস্থার মত-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। বস্তুতঃ মনস্বী মহামনা পুরুষদেরই মত পরিবর্ত্তিত হয়, আর ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রচেতা লোকেরাই কূপমণ্ডুকের ন্যায় চিরকাল সঙ্কীর্ণ একটী গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জীবন কাটাইয়া দেয়। উপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি বিরাগ প্রচার করিয়া গিয়াছেন ইংরাজের গুণের উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহাদের দোষকীর্ত্তনই করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভল্টেয়ার কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় সমাজের প্রতি ঘোরতর বিরাগ প্রচার করেন নাই? তাই বলিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের দ্বারা এক সময় ইউরোপের কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহা কি ভল্টেয়ার জানিতেন না? কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজ যে ইউরোপীয়গণের কণ্ঠের লৌহশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এই জন্যই ঐ ধর্ম্ম ও ঐ সমাজের মোহপাশ হইতে ইউরোপীয়দিগকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভল্টেয়ার

ঐ ধর্ম্ম ও ঐ সমাজকে নির্ম্মম ও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ ইংরাজের কি সদ্‌গুণ ও মহত্ত্ব আছে এবং ইংরাজের দ্বারা আমাদের কতটুকু উপকার এক সময়ে সাধিত হইয়াছে উপাধ্যায়ের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কি তাহা বুঝিতেন না, না জানিতেন না? কিন্তু ইংরাজের মোহপাশই যে এখন আমাদের দুঃখদুর্দ্দশার এক প্রধান হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই জন্যই উপাধ্যায় ইংরাজকে অত নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে ভণ্ড দেশ-প্রেমিকদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহারও হেতু সেই একই। কিন্তু উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার যে বিরাগ তাহা অজ্ঞানীর বিরাগের ন্যায় দ্বেষ ও হিংসাজড়িত মলিন বিরাগ ছিল না; তাঁহার বিরাগ জ্ঞানীর বিরাগ; সুতরাং তাহারও পশ্চাতে উদারতা ও উপেক্ষার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

ইহুদী রাজর্ষি সুলেমান বলিয়াছেন, "নিন্দুকের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এমন লোক জগতে কে আছে?" সুতরাং উপাধ্যায়ও যে নিন্দুকের গুপ্ত ছুরিকাঘাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পূর্ব্বে লোকেরা তাঁহাতে প্রকৃত বা কল্পিত দোষারোপ করিয়া তাঁহার যতই নিন্দা প্রচার করিয়া থাকুক না কেন, রাজদ্রোহিতাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া উপাধ্যায় যখন উত্তোলিত-মুদ্গর-হস্ত ইংরাজ দণ্ডদাতার সম্মুখে নীত হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"I do not want to take any part in this trial, because I do not believe that in carrying out my humble share of the god-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

—"উপস্থিত মোকদ্দমার কোনও প্রকার সংস্রবে আমি থাকিতে চাহি না, কারণ আমার বিশ্বাস এই যে, স্বদেশে ঈশ্বরাদিষ্ট স্বরাজ প্রতিষ্ঠার্থে আমি যে অতি সামান্য চেষ্টা করিয়াছি, তজ্জন্য, যাহাদের স্বার্থ অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদের জাতীয় উন্নতির বিরোধী হইবেই হইবে, সেই বিদেশীয় রাজজাতির নিকট আমি কোনও প্রকারে দায়ী নহি"— উপাধ্যায় যখন বজ্রগম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন, ইংরাজ দণ্ডদাতা তখন ক্রোধ ও অভিমানে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রোষ-প্রদীপ্ত ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে দৃষ্টিপাত করিলেও, শত্রুমিত্র সকলেই তখন উচ্চৈঃস্বরে উপাধ্যায়ের জয় ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু এক অলৌকিক গৌরবচ্ছটায় মণ্ডিত করিয়া ভগবান্ যেন তাঁহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবেন, এজন্য ভগবানের অপূর্ব্ব বিধানে মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে এ সময় আলিঙ্গন করিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই উপাধ্যায় অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছিলেন। অবশেষে সন্ধ্যার মোকদ্দমার সময় দিনের পর দিন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায়। এ সময় উপাধ্যায়ের পক্ষীয় কৌঁসলী তাঁহার জন্য বসিবার আসন চাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি চোর, দস্যু বা নরহত্যাকারীরূপে এস্থলে উপস্থিত হই নাই; সুতরাং ফিরিঙ্গী যদি ভদ্রলোক হয় তাহা হইলে স্বইচ্ছাতেই সে ভদ্রলোকের সমাদর করিবে; আর ভদ্রলোক না হইলে অভদ্রজনের নিকট আসন ভিক্ষা করা বড় হীনতার কার্য্য; সুতরাং আমি তাহা করিতে চাহি না।" যাহা হউক নিরন্তর দণ্ডায়মান থাকা হেতু রোগ বৃদ্ধি হইলে উপাধ্যায় প্রথমে তাঁহার বন্ধু জনৈক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ডাক্তারের নিকট গমন করিয়া, তাঁহার কারাদণ্ড যখন সুনিশ্চিত, তখন ঐ রোগের মূলস্থান অস্ত্র করা কর্ত্তব্য কিনা, তদ্বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপ রোগগ্রস্ত কয়েদীদের জন্য কারাগারে কিরূপ বিধান আছে তাহা জানিবার জন্য উক্ত ডাক্তার মহাশয় কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হন যে, অন্ত্রবৃদ্ধি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কারারুদ্ধ হইলেই তাহার রোগস্থান অস্ত্র করা হয়, এবং এক বৎসর পরে তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইলে তাহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হয়। ডাক্তার বন্ধুর নিকট এই কথা অবগত হইয়া উপাধ্যায় ভাবিলেন যে, তাঁহার কারারুদ্ধ হওয়া এবং কারাগারে তাঁহার রোগের অস্ত্র হওয়া, এতদুভয়ই যখন সুনিশ্চিত, তখন কারাগারে অস্ত্র না হইয়া কারাপ্রবেশের পূর্ব্বেই অস্ত্র হইয়া যাওয়াই নিরাপদ। তাঁহার ডাক্তার বন্ধুও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। উপাধ্যায়ের জনৈক অন্তরঙ্গ

বন্ধু একটী পৃথক বাটী ভাড়া করিয়া তথায় অস্ত্রকার্য্য সমাধা করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু নিয়তি কে খণ্ডন করিতে পারে? উপাধ্যায়ের ডাক্তার বন্ধুগণ তাঁহাকে হাঁসপাতালে রাখিয়া অস্ত্র করিবার জন্য বিশেষ জিদ করিলেন, এবং উপাধ্যায়কে কলিকাতা কেম্বেল হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া ডাক্তার বন্ধুগণ মিলিয়া তাঁহার রোগস্থান অস্ত্র করিলেন। অস্ত্রকার্য্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল যে, উপাধ্যায় যে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিবেন, সে বিষয়ে ডাক্তার বন্ধুগণের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কিন্তু অস্ত্র করিবার দুই তিন দিন পরেই টিটেনাস্ (ধনুষ্টঙ্কার) রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং অবশেষে "ফিরিঙ্গী কখনও আমাকে কারারুদ্ধ করিতে পারিবে না; ক্লোরোফরম্ দ্বারা তোমরা আমার চেতনা নষ্ট করিও না" এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অমরাত্মা ভবধাম হইতে পলায়ন করিল।

যাঁহারা স্বদেশ বা স্বধর্ম্মের জন্য অশেষ নির্যাতন সহ্য করেন বা প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, ইংরেজী ভাষায় সেই সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষকে মার্টার (Martyr) বলে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতমাতার অনেক সুসন্তান মায়ের জন্য অর্থদণ্ড, বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড প্রভৃতি অশেষ প্রকার উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করিয়া মার্টারের গৌরবান্বিত আসন লাভ করিতেছেন; কিন্তু মায়ের জন্য সর্ব্বপ্রথমে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া স্বদেশীয় মার্টারগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবেরই যে প্রাপ্য এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংহংশসম্ভবং॥

১১ অঃ ৪১ শ্লোঃ।

"এ জগতে বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (সুন্দর), উর্জ্জিত (তেজস্বী) যে যে বস্তু আছে, সে সমস্তকেই আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জানিও।"

মায়ের তেজস্বী সন্তান ব্রহ্মবান্ধব মায়ের পবিত্র সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া লোকান্তরে গমন করিয়াছেন; কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, তাঁহাতে ভগবানের যে তেজাংশ প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কালে এমন শত শত তেজস্বী সন্তান উৎপন্ন করিবে যাঁহারা অচিরে মাতৃভূমির দুর্দ্দশা ও কলঙ্ক মোচন করিবেন।

শ্রীপ্যারীমোহন দাস গুপ্ত।

কামরূপ।

(১)

ঔৎসুক্য না থাকিলে জীবন অকিঞ্চিৎকর। কোন একটী বিষয়ে উৎসুক হইয়া জীবনের অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছেদ হইতে সাধারণ পরিচ্ছেদে অবতরণ করিতে পারা যায়। বিরক্ত ব্যক্তি সেই জন্য দেশাটনকে ঔৎসুক্যের বিষয় করিয়া লয়। জাতিতত্ত্ব-নির্ণায়ক মানচিত্রে বঙ্গদেশ মঙ্গোলিয়-দ্রাবিড়ি ও আসাম-মঙ্গোলীয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। কুমিল্লা উক্ত প্রদেশদ্বয়ের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। অত্রত্য বাঙ্গালা ভাষায় পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের সাদৃশ্য আছে। পশ্চিম মৈমনসিংহের ভাষা পূর্ব্ব হইতে পৃথক বোধ হইবে। শ্রীহট্টের বাঙ্গালা অন্যবিধ। কামরূপের পর্ব্বতশ্রেণী মৈমনসিংহে বিস্তৃত হইয়া ঐ প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উক্ত শৈলে গোয়ালপাড়া সন্নিহিত স্থানে গারো জাতি বাস করে। গারো ও টিপ্রা-দিগকে দেখিলে তাহারা অবয়বে আর্য্যজাতি হইতে যে পৃথক তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ত্রিপুরাশব্দ টিপ্রাশব্দের সংস্কৃত। ত্রিপুরানগরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে টিপ্রা-দিগকে দর্শন করিবার জন্য রজনী প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। নরনারী পৃষ্ঠে ইন্ধন বহিয়া হট্টে উপস্থিত হইল। রমণীর বক্ষঃ পরিধেয় হইতে ভিন্ন বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত, কর্ণে পুষ্পাভরণ, পুরুষের মস্তকে ব্যক্তিবিশেষের শিখা আছে। টিপ্রাকুলরত্ন যুবরাজ নবদ্বীপচন্দ্র বর্ম্মাকে ইউরোপীয় শিরস্ত্রাণ পরিহিত হইয়া শকট চালনা করিয়া যাইতে দেখিয়া আমার চৈনিক বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। সুক্ষ্মাগ্র শিবমন্দিরে কৃশভাব এদেশের নির্ম্মাণ প্রণালীর বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছে। বাস্তুভূমি পুগবৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত। বৃক্ষগাত্রে সংলগ্ন কর্ত্তিত বংশসজ্জা প্রাচীরের কার্য্য করিয়াছে। রাজকীয় পুস্তকালয় বিচারালয় বহুদূরব্যাপী পণ্যশালা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বাসস্থানে আগমন করত মঞ্চে শয়ন করিলাম। ভূমির

আর্দ্রতা বশতঃ গৃহে চাঙ বা মঞ্চ শয়নের জন্য বিহিত হয়। টিপ্রাদের গৃহকে চাঙ কহে। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র আহোমিয়া অপর পার্ব্বতীয় জাতির কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় জুম্ নামে খ্যাত। যোগীজাতির মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাঁহারা নাথের ব্রাহ্মণ ও অপরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহা খ্যাপন করা ভোজনালয়ের গাত্রে উৎকীর্ণ দেখিলাম। ভারবহনের জন্য একখানি কাষ্ঠের একদিকের অগ্রভাগ প্রশস্ত করিয়া খোদিত হইয়াছে অপর দিক বাহক স্কন্ধে করিয়া কৃষিজাত বিক্রয় করিয়া ফিরিতেছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার জাতি কি? তদুত্তরে সে কহিল নমঃ অর্থাৎ নমঃশূদ্র, শূদ্র হইতেও নত বা নবশূদ্র। এক ব্রাহ্মণ কহিতেছিলেন কলিকাতার লোকে নৌকাকে "নৌকো" লবণকে "নুণ" কহে। দুইটী স্ত্রীলোককে ছত্র দ্বারা মুখাবরণ করিতে দেখি, ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য আমি যত সম্মুখীন হই, আহোমিয়া প্রথানুসারে তাঁহারা তত ছত্রের অন্তরালে প্রবেশ করেন।

কুমিল্লা হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী বদরপুর সঙ্গমে প্রভাত হইলে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলাম আমরা উপত্যকা প্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছি। হরিৎ বনস্থলীতে কৃষ্ণ উপলখণ্ডের মধ্যে নীলদর্পণের মত সুরমা স্রোতস্বিনী নিস্তব্ধ ভাবে অরণ্যের মাধুরী বিস্তার করিতেছে। কয়েক জন মণিপুরী পুরুষ ও একটী নারী সন্তান লইয়া শকটে আরোহণ করিলেন। তাঁহাদের নাসাগ্রে আলম্বিত তিলক বৈষ্ণবত্ব খ্যাপন করিতেছে ও মস্তকাচ্ছাদন বস্ত্রের বন্ধন প্রণালী সহ বক্ষোবেষ্টনে মঙ্গোলিয়ত্ব প্রকাশ করিল; পুরুষের একটীকে আমার গুরখা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ক্রমে নাগলোকে প্রবেশ করিলাম, অসংখ্য সুরঙ্গের অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকটশ্রেণী শ্লেট প্রভৃতি প্রস্তরের স্তবক একপার্শ্বে ও অন্যদিকে দূরে চা-ক্ষেত্র এবং খাত রাখিয়া গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতেছে। বংশ কদলী ও বেত্র প্রভৃতি ক্ষীণবৃক্ষে ও বিবিধ গুল্ম দ্বারা শৈল সমাচ্ছন্ন, ইতস্ততঃ নাগাজাতির তৃণাচ্ছাদিত কুটীর ও শস্যক্ষেত্র পর্ব্বত-তরঙ্গে দৃষ্ট হইল। নাগাদিগের আসুরিক দেহ একস্থানে মাত্র দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। শকটাশ্রয়ে নেপালীরা দধিবিক্রয় করিতেছে। পথনির্ম্মাণে শ্রমজীবীর কার্য্য করিতে আসিয়া তাহারা এক্ষণে ব্যবসায়ী হইয়াছে। লামডিং নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিয়া সমতল ও পর্ব্বতনিকটস্থ ভূভাগে গমন কালে বারদ্বয় সূর্য্যোদয় দৃষ্ট হইল। এই দেখিলাম দিনমণি কোন শৈলশৃঙ্গের পার্শ্বে ভুবনমোহন রক্তিমাবর্ণ বিস্তার করিয়া দেখা দিলেন, চলিতে চলিতে আর দেখা গেল না, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আবার দেখি তিনি উঠিতেছেন।

বহুকাল যাবৎ আমি আসামে লৌহপথ উদ্ঘাটনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন অভীষ্টস্থানে গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র-তীরে অবস্থিতি করিতেছি। লৌহিত্যনদ শ্বেত জলরাশির উপর বাষ্পীয় তরণী ধারণ করিতেছে। সুদূরে পরপার হইতে পর্ব্বতমালা আকাশের নীলিমায় মিশিয়া বিশ্বরঙ্গালয়ের পটপরিবর্ত্তনের মধ্যে সমুপস্থিত। প্রথমে কঞ্জগিরি তাহার পর ভোটান্ত হইতে হিমালয় "স্থিতঃ পৃথীব্যা ইব মানদণ্ড" চলিয়াছে। কামাখ্যার ভৈরব শিবানন্দ জলগর্ভস্থ শৈলে দেবায়তনে নিহিত। নগর ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত গৃহে পূর্ণ। পানবাজার বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্র। আসামী দেখিবার জন্য আমাকে উজানবাজারে যাইতে হইল, সেখানে তৃপ্ত পাইলাম না!

পরপারে উত্তর-গুয়াহাটী তটে ভূমি ত্যাগ করিয়া রথ্যাপার্শ্বে কয়েকখানি পণ্যশালা দৃষ্টিগোচর হইল। দুগ্ধবিক্রেতার কেশকর্ত্তনের উৎকলী-প্রণালী ও তদনুযায়ী ভাষা আমাকে চিন্তাকুল করিল। কিয়দ্দূরে ব্যঞ্জনের উপযোগী ফলমূল ও মৎস্য বিক্রয় হইতেছে। মৎস্যগন্ধার গৌরমুখে সিন্দুরবিহীন সীমন্তের দুইপার্শ্বে বৃহৎ কর্ণছিদ্রে প্রবিষ্ট রক্তিম অলঙ্কারসহ মেখলা ও "রিহার" উপর বিন্যস্ত বস্ত্রাচ্ছাদন হইতে দূরস্থ রিক্ত হস্ত প্রতিভাত হইল। পল্লীমধ্যে গৃহগুলি বৃক্ষবাটিকার মধ্যে অবস্থিত। ছাদের আকার ফারদপুরস্থ গৃহের ও প্রতিমার বাংলা চালের মত, সুন্দর না হইলেও তৃণ ও বংশশয্যায় হীন নহে। অঙ্গনের বহির্দ্দেশে বক্ষঃ হইতে জানু পর্য্যন্ত আস্তরণে গ্রন্থীকৃত বস্ত্রা কেচিৎ মহিলা কেরলীবৎ কেশদাম বিস্তার করিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ অন্তর্হিতা হইলেন।

নামঘরের অনুসন্ধানে এক গৃহস্থের বাটীতে উঠিলাম। কেয়টপত্নী নিদ্রিত পতিকে আহ্বান করিয়া দিল। তাহার গৃহে বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা রহিয়াছে। শঙ্করদেবের ঘোষা বা কীর্ত্তন বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত। ভাষা বাঙ্গালা হইতে অধিক

ভিন্ন নহে, উহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত। মাধবদেবের হরি নিরাকার, ইহারা প্রায় চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহাদের মতাবলম্বিগণ মহাপুরুষিয়া নামে প্রসিদ্ধ। অসময়ে কীর্ত্তন নিষিদ্ধ বলিয়া ভজনালয় মাত্র দেখিয়া নিবৃত্ত হইতে হইল। নামঘরে সায়ংকালে প্রতিবাসিগণ উপস্থিত হইলে সাধনা ব্যতীত পল্লীসমাজের অধিবেশন হয়। গৃহস্বামী পান সুপারি প্রদর্শন করিয়া আমাকে সাজিয়া খাইতে কহিলেন। অতিথিকে পান সাজিয়া দিবার নিয়ম নাই। মলওয়ারের মত তাম্বুলে খদির ব্যবহার করা হয় না। সে কালের আহোমিয়া গৃহস্থের পক্ষে কেবল রাজস্ব প্রদানের জন্য টাকার আবশ্যক হইত, সেই কারণে ধান্য বিক্রয় করিবার প্রয়োজন ছিল। বিলের মৎস্য, কদলীক্ষারে প্রস্তুত লবণ, তৈলের জন্য স্বকীয় ক্ষেত্রে সর্ষপ, মধুরতা আস্বাদনের জন্য গুড় ও পুষ্টির উপাদান ডাইল এবং গৃহপ্রাঙ্গণে তাবৎ লোকের জাতিনির্ব্বিশেষে বস্ত্র বয়নের যন্ত্র ছিল। গোধন প্রতি গৃহে বিরাজ করিয়া দধি দুগ্ধ প্রদান করিত। তুষের আগুন গৃহে সর্ব্বদা থাকিত, রাত্রিকালে প্রয়োজন হইলে উহাতে তৃণ নিক্ষেপ করিয়া ফুৎকার দিলে আলোক উৎপন্ন হইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করিত, দুগ্ধ উষ্ণ করিয়া পান করিবার পদ্ধতি অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই। এক্ষণে বাঙ্গালী বস্ত্র ও বাঙ্গালী লবণ বিলক্ষণ প্রচলিত। বিলাতি দ্রব্যজাত বাঙ্গালীদ্বারা আনিত হওয়াতে সেই সকল বস্তুকে বিলাতি না বলিয়া বাঙ্গালী বলা হয়। অধুনা বাঙ্গালীর স্থান মারওয়ারীতে অধিকার করিতেছে। হয়গ্রীব যাইতে না পারায় কামাখ্যা হইতে তাড়িতা ডাকিনীপল্লী দর্শন ঘটিল না। শ্রীক্ষেত্রের দেবদাসী বা কলিকাতার বারাঙ্গনা অপেক্ষা এখানকার মোহিনীদের বশীকরণ বিদ্যায় অধিক জ্ঞান নাই। অপরাহ্নে অশ্বক্রান্ত শৈলমূলে ব্রহ্মপুত্রতীরে অহিফেনসেবী পুরোহিত-সমাজে আবির্ভূত হইয়া কাশীদাস কৃত রামায়ণ শ্রবণ করিতে বসিলাম। উচ্চারণের পার্থক্যে উহা বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল না। চন্দ্র—সন্দ্র, সর্ব্ব—হর্ব্ব, চিড়া—সিরা ও হয় স্থলে হব পঠিত হইতেছে।

ধর্ম্মাধিকরণে গমনোদ্দেশে আগত কলিতাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আহোমিয়া ভাষায় উৎকল শব্দ আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উড়িষ্যা ও আসাম উভয় প্রদেশ বাঙ্গালার প্রান্তদেশে অবস্থিত। অতএব ভাষাভেদ ও কেশকর্ত্তন সম্বন্ধে এক প্রক্রিয়া দ্বারা কার্য্য হইয়াছে। আগন্তুকের পক্ষে এই রহস্যজনক ব্যাপার এ দেশের বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতায় দুই একটী উৎকলভাবাপন্ন শব্দ থাকিলেও সেই সূত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে বাঙ্গালার মধ্যস্থল রাজসাহী হইতে পশ্চিমসীমান্তে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া অসম্ভব। বাঙ্গালা-ভাষার লীলাক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, উত্তরে তিব্বতী পূর্ব্বে মগ দক্ষিণে সমুদ্র ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্রাবিড়ী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া প্রত্যন্তপ্রদেশে আহোমিয়া, চট্টলী, মৈথিলী, মধ্যদেশী হিন্দী ও উৎকলী অবান্তরভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যাহাকে অবান্তরভেদ বলি অন্যে তাহাকে মূল-স্বরূপ বলিতে পারে। দক্ষিণ পশ্চিমের সাদৃশ্য উত্তর পূর্ব্বে অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দর্শন করিয়া অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

উচ্চ আসামের অধিবাসীরা নিম্ন আসামের বা কামরূপ প্রদেশের ভাষাকে আহোমিয়া না বলিয়া ঢেকেরি কহে, ইহাতে বঙ্গভাষার সাদৃশ্য অধিক। যথা, আহোমিয়া—

চুটি মুটি কুমটি পেট ফটা
নগরে গরগাঁয়ে তারে হে কথা।*

ঢেকেরি, যথা—

যাকে আমি কাঁদে করি
তারে ভয়ন্তি পলাও ররি। †

গুরুকে গোঁসাই কহে। তিনি গ্রামের শাসনকর্ত্তা। তিনি উপস্থিত না থাকিলে এক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দেন। এক গ্রামে যতগুলি গুরুর শিষ্য থাকে তথায় সেই পরিমাণে প্রতিনিধি হইবে। তাহাদিগকে একমত হইয়া বিচার করিতে হয়। পূর্ব্বে প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে পুনর্বিচারের জন্য গুরুদেবের নিকট যাইবার নিয়ম ছিল। ইদানীং ইংরাজের বিচারালয়ে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে। ভূমিসংক্রান্ত

* চুটি মুটি—ছোট মোট। কুমটি—জিনিষ অর্থাৎ কৌড়ি। পেট ফটা—পেট ফাটা, গরগাঁয়ে—দুর্গসংযুক্ত গ্রামে। তারে হে কথা—তারই সে কথা।

† পলাও ররি—দৌড়িয়া পলাই। বৃষ্টিকালে জলবাহকের দ্বারা ইহা উক্ত হইয়াছে।

ও অপর সকল বিষয়ে প্রতিনিধিরা বিচার করিয়া থাকেন। প্রহারের অভিযোগে এক বা দুই টাকা দণ্ড হয়। আমার একজন হাজারিকার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রীকে হাজারিকাণী কহে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আহোমরাজের প্রদত্ত মাটী বা ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতেন। এক সহস্র শ্রমজীবী বিনা বেতনে আহোমরাজের কার্য্যে দিতে হইবে বলিয়া বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন ও তাহাতেই হাজারিকা উপাধি প্রাপ্ত হন। আসামে এখনও শ্রমজীবী পাওয়া সহজ নহে। কাহারও অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইলে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করে। পঞ্চাশ টাকা ঋণ গ্রহণ করিলে পরিবারস্থ একজনকে উত্তমর্ণের নিকট কুসীদ প্রদানের পরিবর্ত্তে ভৃত্যের কার্য্যে নিয়োগ করিবার নিয়ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বে তাহা রহিত হইয়াছে। এতদ্দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় প্রজাগণ হলচালন করিয়া দিনাতিপাত করে, তজ্জন্য পারিশ্রমিক লইয়া কার্য্য করিবার লোক অধিক মিলে না। প্রত্যহ ছয় আনার ন্যূনে শ্রমজীবীরা কার্য্য করে না; কার্য্য করিলেও অধিক পরিশ্রম করা অনাবশ্যক ভাবে। ডাঙ্গোরিয়ার বাটীতে শণসূত্র নির্ম্মাণের জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে বেতন চাহিলে তিনি কহিলেন অদ্য অর্থাভাব কল্য দিব, পরদিন বলিলেন, শণসূত্র বিক্রয় করিয়া তুমি বেতন গ্রহণ কর। ইহাতে কারুজীবী কহিল, বিক্রয়ের দ্বারা তিন আনা মূল্য মিলিবে। কর্ত্তা কহিলেন, ছয় আনা পারিশ্রমিক লইবে বলিয়া তিন আনার কার্য্য করিয়া দিলে অতএব আমি উক্ত বেতন দিতে অপারগ। পরদিন হইতে কার্য্যকারক প্রথম দিন অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কার্য্য করিতে লাগিল। বিষয়ী লোকের জন্য এই গল্পটি বিশেষ উপযোগী।

আহোমিয়া গৃহস্থের বাটীতে সূপকার্য্যে বাঙ্গালার মত বিবিধ ব্যঞ্জনের প্রচলন নাই, খামতি লাফা ও বাঙালি শাক লোভনীয় বলিয়া ব্যবহৃত। শাকের নামে জাতির পরিচয় থাকায় উহাও ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বোধ হয়। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে এখানকার প্রধান ও সার্ব্বজনিক উৎসব চৈৎবিহু কয়েকদিনের জন্য জনসমাজকে আনন্দে নিমগ্ন করে। তৎকালে নূতন বস্ত্র অবশ্য পরিধেয়, বধূ আত্মীয়গণকে উপহার দিবার জন্য বহুপূর্ব্ব হইতে বয়নকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। বাঙ্গালী ভৃত্য ভিন্ন স্বদেশী দাসকে নববস্ত্র দিতে হয়। সে সময় তাহারা অবসর পাইয়া থাকে, দ্যূত ক্রীড়া, গীতবাদ্য প্রভৃতি আমোদে ও স্বজনের গৃহে নিমন্ত্রণে গমন ইত্যাদি কার্য্যে সময় অতিবাহিত হয়। অবিবাহিত যুবকগণ ঢোল করতালি ছন্দে নৃত্য করে। পরিজনের নিকট না হইলে অশ্লীল সংগীত হইয়া থাকে। ডোমজাতীয়া নারী বাদ্যসহ নৃত্য করিতে পরাঙ্মুখী নহে। এই উৎসবের সহিত কোন প্রকার অর্চ্চনার বিধান নাই।

ভগদত্তের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুরে তাঁহার পিতা নরকাসুরের প্রতিষ্ঠিতা কামাখ্যা এখন পুরাণ স্মরণ করাইবার জন্য অবশিষ্ট আছেন। গৌহাটীতে মৃত্তিকাগর্ভে প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহের চিহ্ন বহির্গত হইতেছে। শুক্রেশ্বরের মন্দিরের নিম্নে ব্রহ্মপুত্রতীরে বৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি বৌদ্ধযুগের পরিচয় দিতে সমর্থ। প্রত্যূষে সার্দ্ধক্রোশ ব্যবহিত হিমবৎ শৃঙ্গে দৃশ্যমান ভুবনেশ্বরীর মন্দির সম্মুখীন করিয়া লৌহিত্য তীরবাহী পথ অতিক্রম করত প্রস্রবণের নিকট আমাদিগকে অশ্বযুগতাড়িত শকট ত্যাগ করিতে হইল। নিম্নভূমি হইতে উর্দ্ধে উঠিবার অগ্রে একটী পুরদ্বারের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। কোন স্থানে সোপান কোথাও বন্ধুর বা মসৃণ প্রস্তর আরোহণে ধীরভাব ধারণ করিয়া চলিলাম। অবতরণ করিতে হইলে কোন কার্য্যে চঞ্চল হইবার বাধা নাই। নানাবৃক্ষসমাচ্ছন্ন ঝিল্লিরবসমাকুল বিটপিমধ্যে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যের পরিচয় দিবার জন্য চম্পকতরু অযাচিত হইয়া পুষ্পাভরণ প্রদর্শন করিল। দ্বিতীয় পুরদ্বারের এক কক্ষে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, গলে রুদ্রাক্ষ, শ্মশ্রুধারী কিরাত সন্ন্যাসী স্তম্ভিত অবস্থায় উপবিষ্ট। অবশ্যক হইলে দেবীর তুষ্টি সাধনোদ্দেশে আত্মবলি বা তাহার নিষ্ক্রয়স্বরূপ একান্তে নরবলি দিতে ভীত হইবেন না, তাঁহার মৌনমুখমণ্ডলে এই ব্যাখ্যা আমি পাঠ করিতেছি। ছিন্নমস্তা প্রভৃতির মন্দির অতিক্রম করিয়া সৌভাগ্যসরোবর পারে পার্ব্বত্য পল্লীর সোপান পরম্পরা উঠিয়া পুরোহিতের সঙ্কীর্ণ প্রকাশ্য গৃহে স্থান পাইলাম। বায়ুসেবনের জন্য আমাকে প্রতিবেশীর অঙ্গনে যাইতে হইয়াছিল। যোগিনী তন্ত্রের নীল পর্ব্বত সমুদ্রতল হইতে এক সহস্র ফুট উচ্চ।

কামপীঠে স্নান ও প্রাতরাশান্তে কামাখ্যা দর্শনাভিলাষী

হইলাম। সৌভাগ্যসরে স্নানের সঙ্কল্প শ্রবণমাত্র করিয়া মন্দিরে অবতরণ করিতে হইল। দেশের বিশ্বাস ও ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে তজ্জেতুক দেবালয় অনেকের প্রীতির বস্তু। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারে চলন্ত দশভূজা দুর্গা দর্শন করিয়া দীপালোক সমন্বিত গর্ভগৃহতলে পুষ্পসমাকীর্ণ জলপূর্ণ কুণ্ডের নিকটস্থ হইয়া উপবিষ্ট হইলাম। কুণ্ডের মধ্যে গিরিপ্রস্রবণে হস্ত স্পৃষ্ট হইল। আহোমরাজ গৌরীনাথ নির্ম্মিত মণ্ডপে নব রাত্রিকাল হোমাদি হয়, মেষ, মহিষ, হংস, পারাবত বলির ব্যবস্থা আছে। শূকরবলি এখন নিষিদ্ধ। তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে কুচবিহারাধিপ মল্লধ্বজ শুক্লধ্বজ ভ্রাতৃদ্বয় অদ্রি-দুহিতার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মিথিলেশ জীর্ণোদ্ধার করিতে সমুৎসুক ছিলেন। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ তাহাতে সম্মত হইলেন না। বিশ্বসিংহ সংকালে সর্ব্বপ্রথম নরকাসুরের নীলশৈলে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তৎসময় একজন নীচ জাতীয় বাদ্যকর দেবীর পূজক ছিল। মা যখন নাচিতেন সে তখন ঢক্কা বাদন করিত। রাজাকে তাহা প্রদর্শন করার অপরাধে মা ঢাকির মস্তক হস্তদ্বারা ছিন্ন করাইয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত নাকি সেই মুণ্ড প্রস্তরী-ভূত হইয়া অঙ্গনে রহিয়াছে। তদবধি কোচরাজবংশীয়গণের কামাখ্যা দর্শনে দেবীর অনুমতি নাই। আমি মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র কুলকুমারিকাদের সাক্ষাৎ পাইলাম। পয়সা ভ্রমে জানিয়াও আধুলি দিয়াছিলাম। পরে শ্রুত হইয়াছি পুরোহিত মহাশয় উহা তাঁহার প্রাপ্য বোধ করিয়া প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। গোদাবরী উৎপত্তিস্থল ত্র্যম্বকের ন্যায় এখানে পুরোহিতের গৃহে যজমানের আহার সমাধা করিবার নিয়ম। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কেবল অদ্য পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভগ্নীত্রয় অতি মধুর প্রকৃতি সম্পন্না; যেন সরলতার চিত্র। বহির্দ্দেশের কৃত্য সম্পাদনের জন্য পার্ব্বত্য উদ্যানে প্রবেশলাভ করিলাম। এখানে তাম্বুলবল্লী রুক্ষ আশ্রয়ে উঠিতেছে। ব্রহ্মপুত্রতটস্থ বন হইতে কদাচিৎ হস্তী আগত হইয়া উদ্যানের অনিষ্ট করিয়া থাকে। নিম্নে গ্রামের পিপাসানিবারক উৎসসলিল ও উর্দ্ধে ভুবনেশ্বরীর সন্নিহিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইল।

এ দেশের কীর্ত্তন বাঙ্গালার মত অগ্রে একজন এক অংশ কহে পরে কয়েকজনে তাহা পুনঃ আবৃত্তি করে। দশভুজার সম্মুখে সেবার জন্য ব্রাহ্মণ মহিলাগণ যাহা গান করিলেন তাহাতে আছে—শিব মদ্যপান করিয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। এরূপ ভাব আর কোথাও শুনি না। ইহা বামাচারীর দেশেই প্রাপ্য। আসামী ব্রাহ্মণ শাক্ত। দক্ষিণাচার হইতে বামাচারে উপনীত হইতে হয়। ইহাতে অন্য জাতীয় মহাপুরুষিয়াদিগের নিকট ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা নাই, তাহারা শুদ্ধাচারের নিতান্ত পক্ষপাতী। এজন্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে না। তাঁহাদের অন্ন বা জল গ্রহণ করিবে না। ইহা হয়ত বৈষ্ণবের শৈববিদ্বেষ হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা মহাপুরুষিয়াদের প্রতি আগ্রহ বা নিগ্রহপ্রদর্শন করেন না।

তান্ত্রিক সাধকের পূর্ণাভিষেকের পর কৌল হইলে গৃহী বা অবধূত হওয়া যেমন স্বেচ্ছাধীন, বামাচারীর পক্ষে শিষ্টাচার রক্ষার্থ দ্রব্যবিশেষে অনুকল্প ব্যবহার তেমনি স্বাধ্যায়ত্ত। গৈরিকধারীদের মধ্যে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অনুষ্ঠানকারীর অপেক্ষা তন্ত্রমার্গীর ভাগ অধিক। সরস্বতী তীর্থ ও আশ্রম ভিন্ন দশনামীরা অপর সাতটী তন্ত্রমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতীর মধ্যে কেবল শৃঙ্গগিরি মঠের গোঁসাই তান্ত্রিক নহেন; এই পথে আচণ্ডাল সকলেই পরমহংস পর্য্যন্ত হইতে সক্ষম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন দণ্ডী হইতে পারে না; কিন্তু কাশীর পঞ্চক্রোশীর পথে ভিক্ষার লোভে চর্ম্মকারগণকে সাময়িকভাবে দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিতে দৃষ্ট হয়।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

একখানি নূতন গ্রন্থ।*

বঙ্গভাষায় ভাল পুস্তক নাই, একথা এখন আর বলা চলে না। বাংলা গ্রন্থের তালিকা খুঁজিলে ধর্ম্মতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও দর্শনের উৎকৃষ্ট পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। কাব্য উপন্যাসের ত কথাই নাই। আজকালকার ইংরাজি সাহিত্যের যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, ইংরাজি মাসিক পত্রাদিতে কবিতা গল্প ও

* Comparative Electro-Physiology, by Professor Jagadish Chandra Bose, M.A., D. Sc., C.I.E, published by Messrs. Longman, Green & Co., London.

উপন্যাস ইত্যাদি নামে যে সকল ছাই ভস্ম প্রকাশিত হয়, তাহার তুলনায় আমাদের মাসিক পত্রগুলিতে প্রকাশিত কবিতা ও উপন্যাস অনেক ভাল। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অনেক উপন্যাস ও কবিতা সত্যই সাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এগুলি যে কোন দেশে এবং যে কোন ভাষায় প্রকাশিত হইলে, লেখকদিগকে অমরত্ব প্রদান করিত। বিজ্ঞান সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ। বাংলা সাহিত্যের এই অঙ্গটি যে বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে একথা বলা যায় না। সমগ্র বাংলা গ্রন্থ খুঁজিলে এক আধখানি ভাল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকে বলে বর্ত্তমান যুগটা বৈজ্ঞানিক যুগ। কবি দার্শনিক রাজ-নীতিক সকলেই বিজ্ঞানের স্রোতে তাঁহাদের চিন্তার তরণী ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই স্রোতের জোরেই তাঁহারা কূলে উপস্থিত হইবেন। কথাটা সত্য, কিন্তু বাংলা দেশে নয়, ভারতেও নয়। যে হাওয়া অপর দেশের চিন্তাস্রোতকে ফিরাইয়া সোজা পথ দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে বহে নাই। বহিলে আমাদের সাহিত্য অঙ্গহীন হইয়া থাকিত না, সুবাতাসের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িত। বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লেখকের মৌলিকতা বা চিন্তাশীলতার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকাংশই বিদেশী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। অনুবাদের আবশ্যকতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মৌলিকতার আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। সে জন্য মৌলিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ কোন স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে আশার সঞ্চার হয়। তখন মনে হয় আমাদের দেশেও বুঝি সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাস্রোত সংযত হইয়া আমাদিগকে কূলে ভিড়াইতে আর বিলম্ব করিবে না। ভারতের সুসন্তান জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যে একখানি নূতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহাতেই এই আশার সঞ্চার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইলেও পুস্তকখানি ভারতেরই জিনিস, এবং বাঙালীর নিজস্ব। তাই ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থকার আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল স্বদেশে নয়, দূর বিদেশেরও শিক্ষিত সাধারণ আচার্য্য বসু মহাশয়ের সহিত পরিচিত। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর প্রথম পুস্তকখানি (Response of the Living and the Non-living) প্রকাশিত হইলে, নানা দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজে যে প্রবল আন্দোলন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় যে সকল পরিবর্ত্তন কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব বলিয়া স্থির ছিল, সেই সকল উত্তেজনা ধাতু প্রভৃতি নির্জীব পদার্থে প্রয়োগ করিয়াও আচার্য্য বসু মহাশয় অবিকল একই প্রকারের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছিলেন। জড় হইতে জীবকে পৃথক করিবার এই প্রাচীন প্রথার মূলে অবৈজ্ঞানিক দেশের একজন হিন্দু বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক কুঠারাঘাত হইতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য বসু মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন, আমরা যাহাকে প্রাণীর বেদনা অবসাদ ও মৃত্যু বলি, তাহার সকলি প্রাণিশরীরস্থ অণুরাশির বিকৃতির ফল। প্রাণীর ন্যায় ধাতু প্রভৃতি জড়পদার্থ অণুদ্বারা গঠিত, সুতরাং মাদকদ্রব্য ও বিষাদি প্রয়োগ করিলে এগুলিতেও মত্ততা অবসাদ ও মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ারই সম্ভাবনা। আচার্য্য বসু মহাশয় এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইহা হইতেই জড় ও প্রাণীর সাড়ার একতা স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছিল।

প্রাণী শরীরে আঘাত উত্তেজনা দিলে, সাধারণতঃ তাহাতে দুই প্রকারের সাড়া প্রকাশ পায়। প্রথম,—বৈদ্যুতিক সাড়া, অর্থাৎ শরীরের আহত অংশ হইতে অনাহতের দিকে, এবং কখন কখন ইহার বিপরীতে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহা দেখিয়া আঘাতের কার্য্য পরীক্ষা। দ্বিতীয়,—প্রত্যক্ষ-সাড়া, অর্থাৎ দেহের আহত অংশের প্রত্যক্ষ আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি দ্বারা আঘাতের কার্য্য বুঝিয়া লওয়া। আচার্য্য বসু মহাশয় প্রথমে বৈদ্যুতিক সাড়া দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রাণী ও জড়ের আঘাত অনুভূতির একতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকগণ দৃশ্য পদার্থকে সাধারণতঃ নির্জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী এই তিনটী প্রধানভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। উদ্ভিদজাতি প্রাণীর ন্যায় সচেতন নয়, এবং মৃত্তিকা বা

প্রস্তর প্রভৃতি নির্জ্জীব পদার্থের ন্যায় অচেতনও নয়। উদ্ভিদ যেন চেতন ও অচেতন রাজ্যের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। অচেতন জড়ে চেতনধর্ম্ম যেন ইহাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নির্জ্জীব ও প্রাণীর সাড়ার একতা দেখিয়া আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল। গাছের পাতা ডাল মূল কাণ্ডাদিতে আঘাত দেওয়ায় তাহারা প্রাণীরই মত সাড়া দিয়াছিল। লজ্জাবতী প্রভৃতি উদ্ভিদ বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়। আঘাত দিয়া বসু মহাশয় উদ্ভিদ মাত্রেই লজ্জাবতীর মত সাড়া দেখিয়াছিলেন। উত্তেজক পদার্থ ও বিষাদি প্রয়োগে প্রাণীর অবস্থা যে প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, উদ্ভিদকেও অবিকল সেই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়াছিল।

১৯০১ সালের জুন মাসে ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির কোন অধিবেশনে আচার্য্য বসু মহাশয় অজৈবপদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ার পূর্ব্বোক্ত একতার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থ বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার কথাটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ স্যাণ্ডারসন্ (Sir J. B. Sanderson) সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া কেবল লজ্জাবতী প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদেই দেখা যায় অপর বৃক্ষাদির সাড়া দেওয়া অসম্ভব! আচার্য্য বসু মহাশয় ইহার পর শত শত পরীক্ষায় উদ্ভিদ মাত্রেরই সাড়ার অস্তিত্ব যখন প্রত্যক্ষ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন উক্ত দাম্ভিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে এ সম্বন্ধে আর কোন কথাই শুনা যায় নাই।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ার একতা বৈদ্যুতিক প্রথায় প্রতিপন্ন করিয়াই বসু মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই। বাহিরের আঘাতে ইহারা শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণাদি দ্বারা যে প্রত্যক্ষ সাড়া দেয়, তাহার মধ্যেও একতা দেখাইবার জন্য তিনি গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজ দেড় বৎসর হইল এই গবেষণার ফল তাঁহার "উদ্ভিদের সাড়া" * নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্ভিদ মাত্রেই যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সাড়া দেয়, এ গ্রন্থে তাহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় অনেক স্থূল স্থূল ব্যাপারের কারণ এপর্য্যন্ত অনির্ণীত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আধুনিক উদ্ভিদবিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যান দিতেন, তাহাতে কেহই প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। এমন কি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভৃতি মোটা মোটা ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইলে, যে সকল ব্যাখ্যান পাওয়া যাইত তাহাতেও সন্তোষলাভ করা যাইত না। আচার্য্য বসু মহাশয়ের গবেষণায় সেই সকল অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে।

তাপ আলোক প্রভৃতি উত্তেজনা উদ্ভিদের উপর কি প্রকার কার্য্য করে, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকেরই মনে ছিল না। কয়েকটি অমূলক বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া, এবং নানাপ্রকার বিসম্বাদী যুক্তি তর্ক উত্থাপন করিয়া, ইহাঁরা উদ্ভিদতত্ত্বকে কোনক্রমে খাড়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। গোড়ার খবর জানিতে চাহিলে ইহাঁরা বলিতেন, কামানের ভিতরকার গুলি বারুদ যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে পুড়িয়া বৃহৎ শক্তির প্রকাশ করে, বাহিরের উত্তেজনাও ঠিক সেই প্রকারে উদ্ভিদেরই অন্তর্নিহিত শক্তির খেলা দেখায়। কিন্তু এই অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ভিদবিদ্‌গণকে নিরুত্তর থাকিতে দেখা যাইত। আচার্য্য বসু মহাশয় আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের এই গোড়ার গলদ ধরিয়া, বাহিরের উত্তেজনাকেই সকল কার্য্যের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বসু মহাশয়ের "উদ্ভিদের সাড়া" নামক গ্রন্থখানি সত্যই উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে।

নব প্রকাশিত গ্রন্থখানিকে (Comparative Electro-Physiology) পূর্ব্ব প্রকাশিত "উদ্ভিদের সাড়া" নামক পুস্তকখানির অনুবৃত্তি বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ সাড়া (Mechanical response) পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকার পূর্ব্বে উদ্ভিদের যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক সাড়া দ্বারা তাহারি অনেক ছোট বড় ব্যাপার আবিষ্কৃত

* Plant Response as a means of Physiological Investigations, 1906. Published by Messrs. Longman, Green & Co., London.

করিয়া তিনি এই নূতন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া ব্যাপারটা উদ্ভিদ হইতে ক্রমে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া—কি প্রকারে জটিল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহারো একটা সুন্দর ধারা এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়। বসু মহাশয় বলিতেছেন, বলপ্রয়োগ করিলে পদার্থের অণুগুলির যে বিকৃতি হয় তাহাই সাড়ার একমাত্র কারণ। কাজেই আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া কেবল প্রাণীরই বিশেষত্ব নয়, ইহা অণুময় পদার্থ মাত্রেরই নিজস্ব। উদ্ভিদের শারীরযন্ত্র মৃৎ-পিণ্ড অপেক্ষা জটিল হইয়া নানা কারণে সাড়া দিবার উপযোগী হইয়াছে। তাই আমরা মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা উদ্ভিদকে সসাড় দেখি। আবার প্রাণীর শারীরযন্ত্র উদ্ভিদ অপেক্ষাও জটিল হইয়া পড়ায় ইহার সাড়া দিবার শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া গেছে। এজন্য আমরা প্রাণীকে সচেতন ও উদ্ভিদকে অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।

জড়তত্ত্ব ও জীবরহস্যের এই গোড়ার খবরগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় আধুনিক বিজ্ঞান যে কতদূর লাভবান হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জড় উদ্ভিদ ও প্রাণীর কার্য্যের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা খুঁজিয়া না পাইয়া জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এপর্য্যন্ত ইহাদের প্রত্যেক কার্য্যকেই এক একটা পৃথক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি একই উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের কার্য্যগুলির মধ্যে কোন শৃঙ্খলা না পাইয়া, কার্য্যগুলিকে সেই সেই অঙ্গেরই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া ইঁহারা মানিয়া চলিতেছিলেন। বলা বাহুল্য এই সকল ব্যাখ্যানে পুঁথির অবয়ব অনাবশ্যকরূপে বাড়িয়া আসিতেছিল মাত্র, শিক্ষার্থীগণ ব্যাখ্যানের কোন মর্ম্মই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের নূতন আবিষ্কারগুলি দ্বারা সমগ্র জীবতত্ত্বে আজ এক নূতন আলোক পতিত হইয়াছে; ইহা দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদের বিচিত্র কার্য্যের সকল রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আটশত পৃষ্ঠাব্যাপী নবতথ্যপূর্ণ মহাগ্রন্থের একটা স্থূল অভিমত দেওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত আরো দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এ পর্য্যন্ত প্রাণিশরীরের পেশী (muscles) নামক অংশকে স্নায়ু বা তৈজস্-নাড়ী (nerve) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক গুণবিশিষ্ট বলিয়া মানিয়া আসিতেছিলেন। অর্থাৎ পেশী জিনিসটা চলধর্ম্মী (motile) এবং স্নায়ু সম্পূর্ণ অচলধর্ম্মী (non-motile।) আচার্য্যবসু মহাশয় কিন্তু উভয়কেই একই গুণসম্পন্ন দেখিয়াছেন। অপর বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে অচলধর্ম্মী বলিয়া গেছেন, তাহাই বসু মহাশয়ের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় চলধর্ম্মী হইয়া দেখা দিয়াছে। বাহিরের আঘাত উত্তেজনা পরিবহন করিবার শক্তি কেবল প্রাণীদেহেরই বিশেষত্ব বলিয়া স্থির ছিল। আচার্য্য বসু মহাশয় উদ্ভিদ দেহেও এই বেদনা পরিবাহন দেখাইয়াছেন, এবং ইহাদের দেহ যে প্রাণীর মতই স্নায়ুজালে আচ্ছন্ন তাহাও প্রতিপন্ন হইয়া গেছে। এতদ্ব্যতীত পরিপাক ক্রিয়া, পাকরসের নির্গমন, এবং ভুক্ত দ্রব্য দেহস্থ করা ইত্যাদি ব্যাপার যে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে ঠিক্ একই প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহাও আচার্য্য বসু মহাশয় প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা কার্য্যের মধ্যে এই একতা আবিষ্কৃত হওয়ায়, শারীরতত্ত্বের যে সকল ব্যাপার প্রাণীর শারীরযন্ত্রের জটিলতার ভিতর দিয়া অতি অস্পষ্ট ভাবে আমাদের চোখে পড়িত, উদ্ভিদের সরল শারীরযন্ত্রে অতি সহজে তাঁহাদেরি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে জীব তত্ত্বের অনেক কঠিন সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইহা কম লাভের কথা নয়।

পণ্ডিতগণ মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা সকলেই মনে মনে বুঝেন। নানা কারণে সেই গূঢ় সম্বন্ধ আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গেছে। নূতন আবিষ্কারগুলি দ্বারা আচার্য্য বসু মহাশয় মন ও জড়রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সেই রহস্যকুহেলিকাবৃত সীমান্ত প্রদেশেরও সংবাদ আনিবার উপক্রম করিয়াছেন। সুখ দুঃখ মেধা স্মৃতি প্রভৃতির উৎপত্তিতত্ত্বের আভাস এই আবিষ্কারগুলিতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যে মহাশক্তির কণামাত্র পাইয়া বায়ু সঞ্চলিত হয়, সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করে, মনোরাজ্যের বিচিত্র কার্য্য যে তাহারি অনন্তলীলার একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ, আচার্য্য বসু মহাশয়ের আবিষ্কারে আমরা

মিজু মিশ্‌মীবৃন্দ

দিগারু মিশ্‌মীদল।

পুরুষ। দিগারু মিশ্‌মী। স্ত্রী।

মিজু মিশ্‌মী পুরুষ।

আজ তাহা স্পষ্ট বুঝিতেছি। যে মূলভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃতি দেবী অনন্তব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বৈচিত্র দেখাইতেছেন, সেই ভিত্তির সন্ধান বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। আচার্য্য বসু মহাশয় সেই লক্ষ্যকে সাফল্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

মিশমী জাতি।

মিশমী নামক অসভ্য জাতি আসামের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে বাস করে। দক্ষিণে ইরাবতী নদীর শাখা নেমলাং পর্য্যন্ত ইহাদের বসতি দেখা গিয়াছে। ইহাদের বসতি দাফাভূম নামক বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গিয়া তৎপরে ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা দিয়া তিব্বতের সীমান্তে শেষ হইয়াছে। ইহাদের বসতি পশ্চিমে দিগারু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের শাখা দূ নদীর পশ্চিম দিগ্‌বাসী মিশমীগণ ইংরাজ অধিকৃত প্রদেশের সহিত বাণিজ্য করে; উক্ত শাখানদীর উত্তর-পূর্ব্বদিগ্‌বাসিগণ কেবল তিব্বতীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করে। প্রথমোক্ত মিশমীরা ধীর ও নিরীহ প্রকৃতি, কিন্তু অতিশয় চতুর ব্যবসায়ী। শেষোক্ত মিশমীগণ ইংরাজের শত্রুতাচরণ করে।

বহু ইংরাজ ও ফরাশী পর্য্যটক মিশমী বসতির ভিতর দিয়া তিব্বতে যাইবার চেষ্টা করিয়া তিব্বত-বন্ধু মিশমীদিগের হস্তে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

মিশমী অধ্যুষিত প্রদেশের ন্যায় বন্ধুর, কষ্টকর, অথচ সুন্দর প্রাকৃতিক শোভাশালী দেশ আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। এই প্রদেশে ভ্রমণ এক অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই জন্য মিশমীদিগের উরু ও জঙ্ঘার পেশী সকল সুগঠিত। সহস্র হস্ত গভীর খাদবাহিত উচ্ছ্বল নদী-স্রোতের উপর দিয়া ঝোলা সাঁকো দ্বারা গভীর খাদ সকল পার হইতে দৃঢ় অবয়ব ও স্নায়ুবল বিশেষ আবশ্যক, নতুবা পদে পদে প্রাণ সংশয়। যেখানে যেখানে নদী উভয়তীরস্থ শৈলরাজি দ্বারা অতি সংকীর্ণ গভীর খাদে আবদ্ধ, সেইখানেই এই সকল সেতু নির্ম্মিত হয়। তিন চারিটি বেত একত্র জড়াইয়া রজ্জু রচনা করিয়া উহা নদীর উভয় তীরে বৃক্ষ বা শৈলে বাঁধা হয়। রজ্জুটি যতদূর সম্ভব জোরে টানিয়া সটান করিয়া বাঁধা হয়। এই রজ্জুতে একটি চালনক্ষম বেত্রবৃত্ত ঝুলান থাকে। তিতীর্ষু ব্যক্তি ইহার মধ্যে বসিয়া উর্দ্ধমুখ হইয়া বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর দিয়া পিছলিয়া যাইতে দেয়। বৃত্তটি শীঘ্রই রজ্জুর মধ্যস্থলে উপনীত হয়। তারপর পারযাত্রীকে হাত ও পায়ের সাহায্যে বৃত্তটিকে রজ্জুর উপর সরাইয়া সরাইয়া তীরে পৌছিতে হয়। একটু অসাবধানে স্খলিত হইলেই সহস্র হস্ত নীচে পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মৃত্যু নিশ্চিত।

মিশমীদিগের পল্লীগুলিতে কয়েকটি করিয়া গৃহ থাকে, কখন কখন বা সমগ্র পল্লীতে একটি মাত্র গৃহ থাকে; কিন্তু এই গৃহগুলি এত বড় যে একটিতেই বহু পরিজনপূর্ণ পরিবার তাহাদের দাস ও অনুচর লইয়া থাকিতে পারে। একজন দলপতির গৃহ দৈর্ঘ্যে ৮৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাত, দেখা গিয়াছিল। ইহা জমিতল হইতে উচ্চে বংশনির্ম্মিত ও ১২টি কক্ষে বিভক্ত ছিল। স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু লইয়া শতাবধি লোক ইহাতে বাস করিত। কোন কোন দলপতির গৃহ ইহা অপেক্ষাও বড় ও অধিক কক্ষবিভক্ত হয়। সমুদয় কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য একটি দীর্ঘ বারান্দা থাকে; তাহার দক্ষিণে দলপতি কর্ত্তৃক নিহত মিথুন, হরিণ, ও শূকরের মাথার খুলি ও বামে গৃহস্থালীর বাসনকুশন সজ্জিত থাকে; পূর্ব্বতন দলপতি কর্ত্তৃক নিহত জন্তুকরোটি রক্ষা করাটা সম্ভ্রান্ত রীতি ব'লয়া বিবেচিত হয় না। প্রত্যেক কক্ষেই একটি করিয়া চুল্লী থাকে, তাহার উপর ধূমযোগে সংরক্ষার জন্য মাংসস্থালী ঝুলান থাকে। দলপতির গৃহই পল্লীর প্রধান আড্ডা। শস্য রাখিবার গোলাঘর দূরে নির্ম্মিত হয়।

বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য মিশমীরা প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা তাহাদের প্রতিবাসিদের মত চাষবাসে অধিক মনোযোগী নহে; কিন্তু তাহাদের অনেক পশুপাল থাকে। তাহারা প্রতি বৎসর আসামে গরু ক্রয় করে এবং তদ্ভিন্ন মিথুন নামক সুন্দর পার্ব্বত্য গরুর বৃহৎ পাল পোষণ করে। মিথুনকে উহারা 'চা' কহে। পত্নীসংখ্যার পরেই মিথুনের সংখ্যা হইতেই প্রধানতঃ উহাদের ধনশালিতার পরিচয়। কৃষি বা দুগ্ধ যোগানের জন্য মিথুন পোষা হয় না, পরন্তু পর্ব্ব ঘটা উপলক্ষে মিথুন বলি দিয়া মাংস খাওয়া হয় এবং মিথুনের বিনিময়ে বধূ

ক্রয় করা হয়। মিথুন সকল বন্য অবস্থায় জঙ্গলে যথেচ্ছ চরিয়া বেড়ায়; তাহাদের প্রভুরা প্রত্যহ ডাকিয়া লবণ খাওয়ায়, এবং ডাকিলে মিথুনদল তাহাদের মনিবের স্বর চিনিয়া নিকটে আসে।

বন্য একোনাইট মূল, মিশমীতিতা নামক তিক্তস্বাদ উদ্ভিজ্জ ঔষধ, এবং কস্তুরী মৃগনাভি বিক্রয় মিশমীদিগের ধনাগমের প্রধান উপায়। এই সমস্ত সামগ্রী এবং তিব্বত হইতে আনীত কয়েক প্রকার বাসন ও পশমী বস্ত্র লইয়া তাহারা প্রতিবেশী পার্ব্বত্য জাতি ও আসামীদিগের সহিত বাণিজ্য করে। মিশমী ব্যবসায়িগণ যাহা কিছু সঙ্গে লইয়া বেড়ায় তৎসমুদয়ই, এমন কি তাহার পরিহিত পরিচ্ছদটি পর্য্যন্ত, দরে পোষাইলে বিক্রয় করে।

বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে বহু প্রচলিত। প্রত্যেক পুরুষ যতগুলি স্ত্রী ক্রয় করিতে পারে ততগুলিই বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী ক্রয়ের পণ ১টি শূকর হইতে ২০টি বৃষ পর্য্যন্ত। কাহারো মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীগণ দায়াদ সূত্রে উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিত হয়; কেবল উত্তরাধিকারীর মাতা অন্য নিকটতম সম্পর্কীয় পুরুষের অধিকারে যায়।

জঙ্গলের নিকট এক কুঁড়ে নির্ম্মাণ করিয়া আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীলোককে রাখা হয়। প্রসবান্ত অশৌচ কাল পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিতে হয়। পুত্র জন্মিলে অশৌচ কাল ১০ দিন, কন্যা জন্মিলে ৮ দিন।

পীড়া বা বিপদের সময় ভূতের তুষ্টি সাধনেই মিশমীদের ধর্ম্মাচরণ পর্য্যবসিত। এবংবিধ ঘটনা উপলক্ষে গৃহদ্বারে একটি পল্লব রক্ষিত হয়; তাহা দেখিয়া আগন্তুকেরা বুঝিতে পারে যে আপাততঃ উক্ত গৃহে প্রবেশ ও গৃহবাসীদিগের সহিত মিলামিশা নিষিদ্ধ। দয়ালু সর্ব্বময় কর্ত্তা কোন শ্রেষ্ঠ-দেবতার জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহারা সংহার-দেবতা 'মুজিদাগ্রাঃ', জ্ঞান ও শিকারের দেবতা 'দামিপাওঁ', রোগ ও ধনের দেবতা 'তবলা', এবং অনামা আরো কত কি দেবতার পূজা করে। উহাদের পুরোহিত আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে অনেক দূর হইতে উহাদিগকে আনিতে হয়।

একজন মিশমী দলপতির স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহার বর্ণনা হইতে তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ত্রীলোকটির শব মৃত্তিকাপ্রোথিত করা হয়। ইহার তিন মাস পরে "শ্রাদ্ধ" হয়। কবর গৃহের নিকটেই ছিল; উহার উপর একটি ছাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল; ছাদের নীচে মৃতা রমণীর পরিচ্ছদ ও পানপাত্র লম্বিত ছিল। পুরোহিতের আগমনের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাজাইয়া বিষাদময় ধর্ম্ম সঙ্গীত গাহিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। অধিকন্তু একজোড়া লোহিত বর্ণের কুক্কুট কুক্কুটী প্রারম্ভিক বলিদান দিয়া তাহাদের রক্ত অন্য একটা অজ্ঞাত তরল পদার্থ পূর্ণ পাত্রে লইয়া মিশ্র রক্ত সাবধানে পরীক্ষিত হয়; কারণ মিসমীদের বিশ্বাস যে এই পরীক্ষা হইতেই ভাবী ফলের শুভাশুভত্ব জানিতে পারা যায়। অবশেষে একজন সাধারণ দলপতির মত পোষাক পরিয়া, কড়ির মাল্যধারী, শিরশ্ছদের সম্মুখে দুইটি শৃঙ্গবৎ বিশেষ চিহ্নধারী পুরোহিত আসিলেন। দুইদিন ধরিয়া পুরোহিত ও তাঁহার পুত্র তালবৃন্তব্যজন ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা কাল নিরূপণ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া গান করিলেন; তৃতীয় দিবসে পুরোহিত দলপতির বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরোহিতের বেশ ধারণ করিলেন--সে বেশ এইরূপঃ' গায়ে একটি আঁটা রঙীন কার্পাস কোট, একটা ছোট ঘাঘ্‌রা, চোগার মত পরিহিত একটি হরিণ চামড়া; দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে গাঢ় লোহিত বর্ণ রঞ্জিত ছাগলোম নির্ম্মিত উপবীত ও বামস্কন্ধ হইতে একটি চৌড়া পেটি লম্বিত; পেটির গায়ে চারি সার ব্যাঘ্র দন্ত ও চৌদ্দটি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযুক্ত ছিল। শিরোভূষণ কড়িগ্রথিত একটি বেষ্টনী ফিতা এবং ঝুঁটিসংলগ্ন বায়ুভরে ঘূর্ণ্যমান একটি পাখীর পালক।

অতঃপর পৈশাচিক তাণ্ডব। এই নৃত্যের উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব কোলাহল করিয়া ভূত তাড়ান। তৎপরে সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত করা হইল এবং সকলে অন্ধকারে রহিল; পুনর্ব্বার ছাদ হইতে শূন্য-বিলম্বিত একব্যক্তি চকমকি পাথর ঠুকিয়া নূতন আলোক জ্বালিল। এই আলোক জ্বালিবার সময় যাহাতে কোন প্রকারে সেই ব্যক্তি মৃত্তিকা স্পর্শ না করে তজ্জন্য বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়, কারণ শূন্য বিলম্বিত অবস্থায় প্রজ্জ্বালিত আলোক সাক্ষাৎ ভাবে স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

যখন কোন সম্পন্ন ব্যক্তির কবর হয়, তখন অনেক জন্তু নিহত হয়, এবং তাহাদের করোটি কবরের চারিদিকে সাজাইয়া রাখা হয়। কবরের উপর নির্ম্মিত ছাদের নীচে প্রেতাত্মার জন্য পক্ক ও আম মাংস, শস্য ও সুরা এবং জীবদ্দশায় ব্যবহৃত মৃতব্যক্তির সমুদয় পরিচ্ছদ ও অস্ত্র-শস্ত্রাদিও ঝুলাইয়া রাখা হয়। দরিদ্র লোকেরা বিশেষ কোন ঘটা বা ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়া শবদাহ করিয়া ফেলে বা নদীতে নিক্ষেপ করে।

মিশমী পুরুষেরা একখান ছোট কাপড় কোমরে জড়াইয়া কাছা কোঁচা দিয়া পরে, এবং গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একটা কোট গায়ে দেয়। একটুকরা নীল ও লাল বা কটা ডোরা দেওয়া লম্বা কাপড় ঠিক মধ্যস্থলে ভাঁজ করিয়া তাহার দুই পার্শ্বে হাত বাহির করিবার ফুটা ছাড়িয়া দুই পাশ সেলাই করিয়া থ'লের মত করা হয়। গলা প্রবেশ করাইবার জন্য কাপড় বুনিবার সময়ই মাঝখানে একটু চেরা রাখা হয়।* ঘাড়ের উপর দিয়া একটি চামড়ার পরিয়া পালকাবৃত দুইটি থলি ঝুলাইয়া রাখা হয় এবং পিঠে কবতালের মত দুইটা পিতলের থালা সংযুক্ত থাকে। ঠিক পিঠের সঙ্গে লাগিয়া থাকে এমন উপায়ে প্রস্তুত, তদ্দেশসুলভ সাগুবৃক্ষের লম্বা কালো আঁশ দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তিব্বতীয় গাভীর পুচ্ছশোভিত একটা থলি পিঠের দিকে ঝুলান থাকে। একটি লম্বা সোজা তিব্বতীয় তরবারি, কয়েকটি ছুরী ও ছোরা, এবং একটি সুন্দর হাল্কা লম্বা সরু পালিশকরা বাঁটে ভালো লোহার ফলকযুক্ত বল্লম মিশমী পুরুষের নিত্য ব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্র। তাহারা মাথায় কখনো বা পশমের টুপি, কখনো বা বংশ বা বেত্র শলাকা গ্রথিত শিরস্ত্রাণ পরিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বমান একখানা কাপড় মালগা করিয়া কোমরে জড়ায়। গায়ে যে একটি অতি ছোট আঙ্গিয়া বা কাঁচুলি পরে তাহাতে স্তনদ্বয় অবলম্বন পায় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয় না। তাহারা কাচ, চীনেমাটি বা মূল্যবান প্রস্তরের মালা প্রচুর পরিমাণে পরে। তাহারা মাথায় একটা পাতলা রূপার পাতের বেষ্টনী পরে; সেই রজত শিরোবেষ্টনী কপালের উপর খুব চৌড়া থাকে, এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া কাণের কাছে অর্দ্ধ ইঞ্চি হইয়া মস্তকের পশ্চাতে ছোট কড়ির মালা দ্বারা আবদ্ধ থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই লম্বা চুল রাখিয়া চারিদিক হইতে উঠাইয়া কপালের উপর ঝুঁটি করিয়া একটা কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। ছোট ছোট বালিকারা উলঙ্গ থাকে; কেবল কোমরের ঘুন্সি হইতে কাঠের একটি ছোট তক্তি সম্মুখের দিকে ঝুলান থাকে ঠিক যেন বিক্রয়ের জন্য তাহাদের গায়ে টিকিট ঝুলাইয়া দিয়াছে।

কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মিশমীরা পাকা তামাকখোর। তাহারা যথাসম্ভব শৈশবেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয় এবং আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্ব্বদাই তামাক খায়।

মিশমীরা খর্ব্বকায়, দৃঢ়াবয়ব, গৌরবর্ণ, কর্ম্মঠ এবং বানরের মত ক্ষিপ্রগামী। তাহাদের মুখাবয়ব মঙ্গোলিয় ও আর্য্য ছাঁদের মাঝামাঝি।

মিশমীরা বহু শাখায় বিভক্ত। আসামের সীমান্তে দিগারু ও দিবং নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে মিধি নামক জাতি বাস করে। তাহারা মিশমীদিগের অনুরূপ বলিয়া এবং সম্মুখের চুল কপালের উপর খাটো করিয়া কাটে বলিয়া আসামবাসিগণ তাহাদিগকে চুলকাটা মিশমী বলে।

ইহাদের আবাসভূমি সাদিয়ার উত্তর হইতে হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বত সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; অত্যুচ্চ বন্ধুর পর্ব্বত পরিবেষ্টিত বলিয়া দুরধিগম্য। দিবং নদীর তীরবর্ত্তী একটি খাড়া পর্ব্বতের গা বেড়িয়া একটা তাকের মত পথ আছে, একস্থানে আবার তাহাও নাই, কেবল হাত পা আটকাইবার জন্য পর্ব্বতগাত্রে গোটাকয়েক গর্ত্ত আছে—চুলকাটা মিশমীর দেশে যাইবার ইহাই একমাত্র সহজ (!) পথ।

চুলকাটা মিশমীদিগকে তাহাদের প্রতিবেশিগণ বড় ঘৃণা, অবিশ্বাস ও ভয় করে। কারণ, তাহারা সুযোগ পাইলেই অপর জাতীয় শিশু ও রমণীদিগকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়। তাহারা অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও প্রতারক। তাহারা মধ্যে মধ্যে বড় বড় ঝুড়িতে নানা পণ্য বহন করিয়া আপনা-

* খাসিয়া পর্ব্বতে আমার শ্রদ্ধাভাজন এক ধর্ম্মপ্রচারক বন্ধু আছেন। তিনি একবার আমাকে এইরূপ একটি মোটা সাদা কাপড়ের কোট উপহার দিয়াছিলেন। উহা আমি যত্নপূর্ব্বক কয়েক বৎসর গায়ে রাখিয়াছিলাম।—

প্রবাসী-সম্পাদক।

দের পার্ব্বত্য দেশ হইতে নিম্ন সমতলে দলে দলে ভারগ্রস্ত নিরীহ লোকের মত নামিয়া আসে এবং কোন অরক্ষিত গ্রামে উপস্থিত হইয়া সুবিধা বুঝিয়া বোঝা ফেলিয়া গ্রামস্থ বহুসংখ্যক শিশু ও রমণী ধরিয়া লইয়া পাহাড়ে পালায়।

ইহাদের গ্রামে ১০ হইতে ৩০টি পর্য্যন্ত গৃহ থাকে। প্রত্যেক গৃহ প্রায় ৮ হাত চৌড়া ৪০ হাত লম্বা। তাহাদের কাঠামো অতিশয় হাল্কা রকমের। গৃহের লম্বালম্বি একাংশ বারান্দার মত খোলা থাকে এবং অপরাংশ কক্ষবিভক্ত হয়। এই কক্ষগুলিতে দুই চারিটি বসিবার চৌকী থাকে; সভ্যতার এই চিহ্নটি ভারতবর্ষের অধিকাংশ কুটীরেই দুর্লভ দর্শন।

ইহাদের দলপতিগণের নাম গাম। তাহারা 'আলুন্দী', 'আলুঙ্গা' প্রভৃতি শ্রুতিমধুর নাম ভালবাসে। দলপতিত্ব পুরুষানুক্রমিক। আপন আপন দলের উপর ইহাদের বিলক্ষণ প্রভাব আছে, কিন্তু কাহারো দেহ বা সম্পত্তির উপর কোন ক্ষমতা নাই—অপরাধীকে দণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারে না। যদি এক দলের কোন লোক অপর দলের কাহারো কোনো অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দল ইহার প্রতিশোধ লওয়াটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি স্বীয় দলের কাহারো কোনো অনিষ্ট করিলে তাহার অপরাধের দণ্ড বিধান করা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরই স্বার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পত্নীর সংখ্যায় চুল কাটা মিশমীদিগেরও ধনশালিত্বের পরিচয়। কোন কোন দলপতির ষোলটি পর্য্যন্ত পত্নী থাকে। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক অনুষ্ঠান কিছুই নাই, উহা কেবল ক্রয়ের ব্যাপার। ইহাদের মধ্যে সতীত্বের আদর নাই; ক্রেতা স্বামী প্রত্যাশা করে না যে ক্রীত পত্নী সতী হইবে বা থাকিবে। যতদিন তাহারা তাহার দাসীত্বের ব্যাঘাত না ঘটায় ততদিন তাহাদের ক্ষণিক চপলতা তাহারা গ্রাহ্যই করে না। কাহারো দ্বারা তাহাদের দাসীকর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিলে স্বার্থহানি জনিত রোষ ও বৈর জন্মে কিন্তু তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছুমাত্র দুষ্য বিবেচিত হয় না।

মিধি বা চুলকাটা মিশমীরা বণিকজাতি। তাহারা বৃহৎ দলবদ্ধ হইয়া তিব্বতের সহিত বাণিজ্য করিতে যায়। পুরুষগণ নিজে যাইতে না পারিলে পত্নীদিগকে প্রেরণ করে; এবং যাত্রাপথে নরনারী কিরূপ নির্বিচারে রাত্রি যাপন করে তাহা দেখিলে চুলকাটা মিশমীরা যে নারীর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কিরূপ নির্বিকার তাহা বেশ বুঝা যায়।

মিধিদের রং কৃষ্ণাভ কপিশবর্ণ হইতে গৌর পর্য্যন্ত নানা রকমের দেখা যায়। অনেক মিধি যুবতী বেশ সুন্দরী হয়; কিন্তু সম্মুখের চুল কপালের উপর আঁচড়াইয়া নামাইয়া কাণ হইতে কাণ পর্য্যন্ত কপালের মাঝখানে থাটো করিয়া কর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদিগকে বড় কুৎসিত দেখায়। এইরূপ ধরণের চুল কাটার প্রথা প্রাচীন বঙ্গে ছিল,—তাহাকে 'থরকাটা' বলিত। কপাল থরকাটা চুলে ঢাকিয়া ছোট দেখায় এবং দৃশ্যমান অংশটুকুও প্রায় কর্দ্দমলিপ্ত থাকে। পশ্চাতের চুলে খোঁপা বাঁধিয়া হাড়ের শলাকা বা সজারুর কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। পুরুষেরা বেত্র বংশ শলাকা গ্রথিত শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। তাহাতে তাহাদের ভ্রূর উপর পর্য্যন্ত সমগ্র কপাল ঢাকা পড়ে, মাথাটা প্রকাণ্ড ও মুখ ভ্রূকুটি কুটিল দেখায়। তাহাদের মুখাবয়ব কদর্য্য মঙ্গোলীয় ছাঁচের; মুখ চেপ্টা ও চৌড়া, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও গোল এবং চক্ষু ছোট ও টেরা। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও সুশ্রী হয়।

মিশমীদিগের সকল শাখার মধ্যে চুলকাটারাই সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পনিপুণ। তাহারা কার্পাস ও পশমী বস্ত্র বুনিতে পারে; নানাবিধ পার্ব্বত্য তন্তুমান উদ্ভিদের আঁশ বাহির করিয়া কাপড় বুনে। রিয়া তন্তুর ব্যবহার ইহারাই প্রথম আবিষ্কার করে। বিছুতিজাতীয় এক প্রকার গাছ হইতে ইহারা এমন শক্ত কাপড় তৈয়ার করে যে তাহার জামা বর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারা নানাপ্রকারের কাপড় আসামে বিক্রয় করিতে আনে; প্রধানতঃ লবণের বিনিময়ে বিক্রয় করে। কোন প্রকার প্রচলিত ওজন অনুসারে ইহারা লবণ লয় না। লবণবিক্রেতার দোকানের সম্মুখে বসিয়া সতর্কতার সহিত আপনার সুরক্ষিত ঝুড়ির ভিতর হইতে বিক্রেয় জিনিষটি বাছিয়া বাহির করে এবং তাহা পায়ের আঙুলের নীচে বা হাঁটুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আপনার ময়লা হাত দুইটা সাদা চক্‌চকে নুনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয় এবং দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া লবণ উঠাইয়া আপনার ঝুড়িতে লইতে চেষ্টা করে; কিন্তু সতর্ক লবণ বিক্রেতা হাতের এক ঘা মারিয়া অর্দ্ধেক

চুলকাটা মিশ্‌মীবৃন্দ।

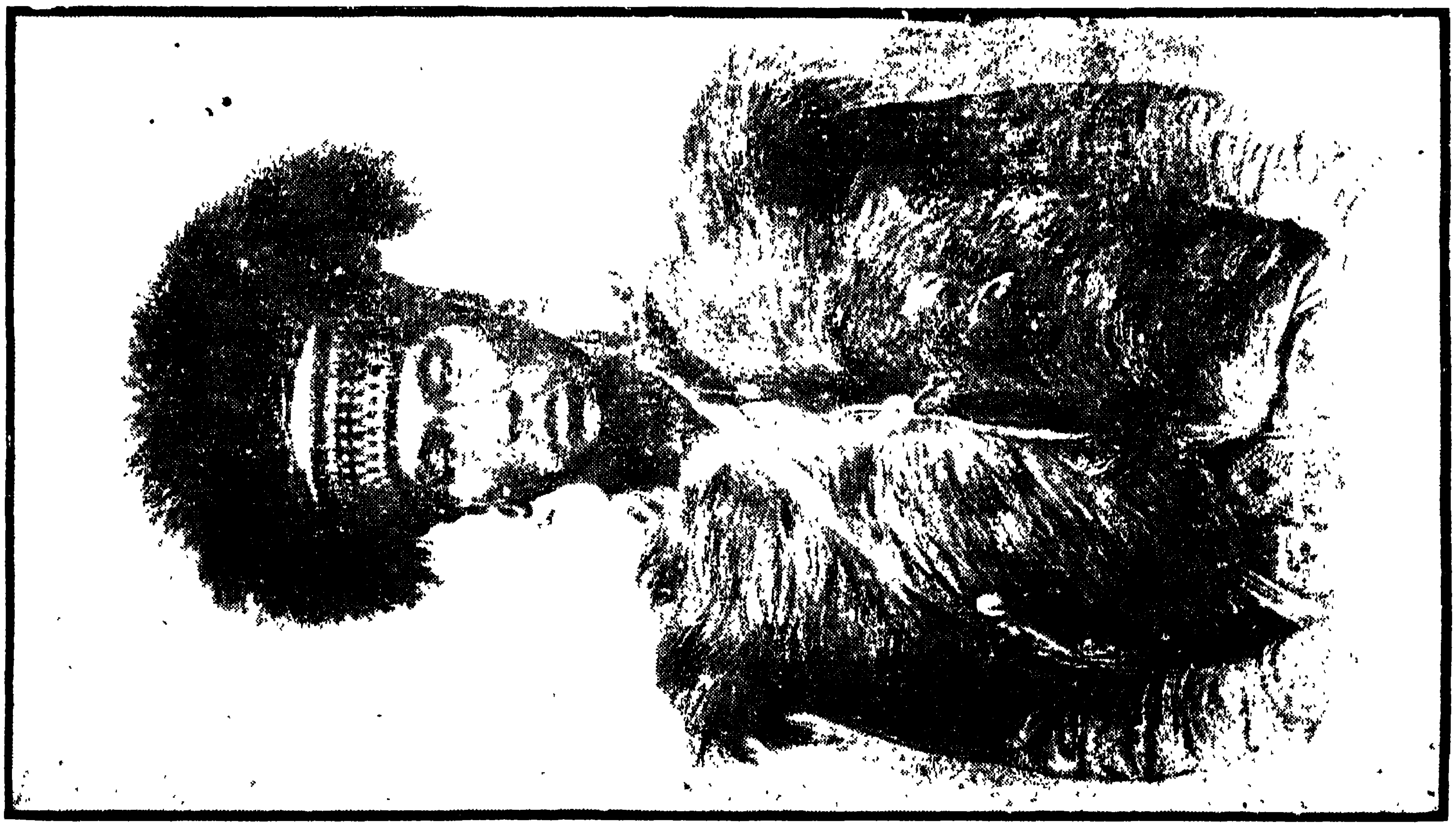

মিজু মিশ্‌মী পুরুষ।

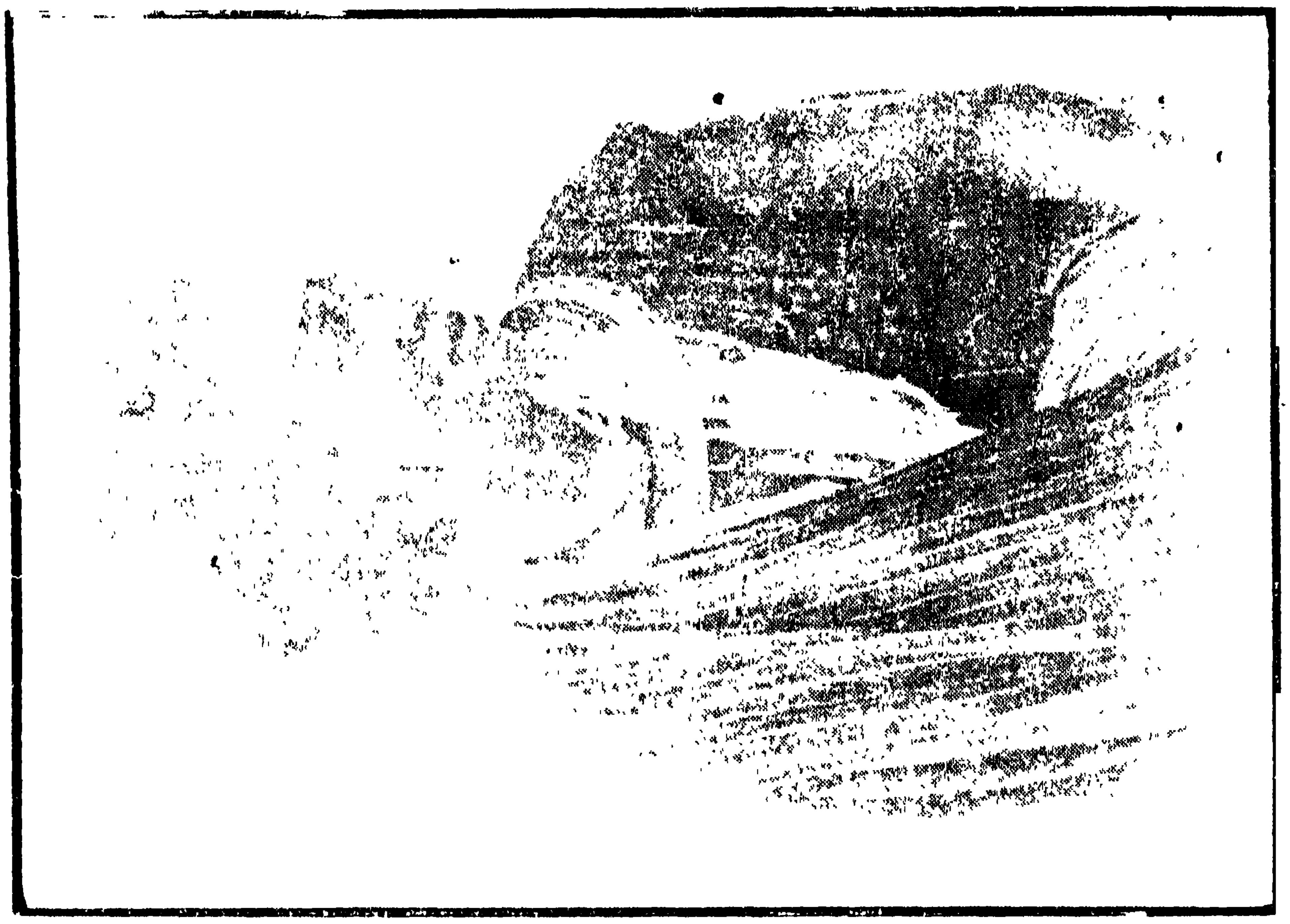

মিশ্‌মি স্ত্রীলোক।

চুলকাটা মিশ্‌মী স্ত্রীলোক।

চুলকাটা মিশ্‌মী পুরুষ।

লবণ ফেলিয়া দেয়; তখন উভয়পক্ষে ঘোরতর বচসা হয়। সাধারণতঃ লবণবিক্রেতা আর অল্প লবণ দিলেই বিবাদ মিটিয়া যায়। বস্ত্র ব্যতীত চুলকাটারা মোম, আদা ও লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসে।

শিরস্ত্রাণ ব্যতীত সকল বিষয়ে ইহাদের পরিচ্ছদ অন্যান্য মিশমীদিগের মত। কিন্তু চুলকাটা স্ত্রীগণ অন্য মিশমী স্ত্রীদিগের অপেক্ষা বৃহদায়তনের কাঁচুলি বা আঙিয়া পরে; ইহাদের আঙিয়াগুলিতে নানাবিধ সুন্দর সূচীকর্ম্ম করা থাকে। ঋজু তিব্বতীয় তরবারি, ধনুর্ব্বাণ ও ছোরা ইহাদের প্রিয় অস্ত্র। মিশমীদিগের মধ্যে কেবল ইহারাই বিষলিপ্ত বাণ ব্যবহার করে। ইহারা মহিষচর্ম্ম নির্ম্মিত লম্বা চৌকণা ঢাল বহন করে এবং ঢালের নীচে তূণপূর্ণ বিষদিগ্ধ বাণ থাকে। যোদ্ধারা অস্ত্র বিনিময় করিয়া শপথপূর্ব্বক বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং এরূপ এক বন্ধুর যুদ্ধে পতন ঘটিলে অপর ব্যক্তি বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে এবং মৃত বন্ধুর মস্তকটির পুনরুদ্ধার করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করে।

চুলকাটা মিশমীরা গ্রাম হইতে দূরে অরণ্যে মৃতব্যক্তিগণের দেহ প্রোথিত করে। জঙ্গলের মধ্যে এক স্থানের বৃক্ষাদি কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়। সেইখানে অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদিসহ শব প্রোথিত করা হয়। তৎপরে কবরের উপর নৃত্য করে।

নরনারী একত্র জোড়া জোড়া জড়াজড়ি করিয়া ইংরাজের বল নাচের মত ক্ষিপ্র লঘু গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবিধ লাস্য লীলা সহকারে নৃত্য করে। নাচিবার সময় রমণীর হাতে একটা ছোট ঢোল থাকে, প্রত্যেক বার ঘুরিবার সময় তালে তালে ঢোলের শব্দ করে। এই নৃত্যোৎসব ব্যতীত অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শিশু সন্তান চুরি করিয়া পলায়নের নাট্যাভিনয়ও চুলকাটা মিশমীদের এক প্রধান আমোদ।

ডাল্টন সাহেব বলেন যে তিনি চুলকাটা মিশমীদের মত সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাববির্জ্জিত জাতি আর দেখেন নাই। তাহারা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনায় পরলোক বা আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস প্রকাশ করে নাই। তাহারা বলে যে যেসকল ভূতের তুষ্টিসাধন করিয়া তাহারা অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে তাহারাও তাহাদেরই মত মরণশীল। তাহারা যদিও পর্ব্বত নদী প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করে, কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস তিনি এখন বাঁচিয়া নাই। তাহাদের বিশ্বাস মানুষ মরে ও শব পোকায় খাইয়া ফেলিলেই তাহার নিঃশেষে অবসান হয়। ডাল্টন সাহেব যখন তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহারা কবরের মধ্যে যে খাদ্য, অস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি প্রোথিত করে তাহা বোধ হয় প্রেতাত্মারা পাইবে এই ধারণাতেই করে; তখন তাহারা উত্তরে বলিল সেরূপ ধারণা তাহাদের আদৌ নাই; তাহারা বলিল কেবল মৃতব্যক্তির প্রতি প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ এই সকল জিনিষ কবরে দেয়; মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করিয়াছে তাহা তাহার আত্মীয়গণ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না; তাহারা জ্ঞাতির মৃত্যু দ্বারা লাভবান হইতে চাহে না।

এই প্রবন্ধটি কর্ণেল ডাল্টন সাহেবের বঙ্গের জাতিবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক (Descriptive Ethnology of Bengal) হইতে সংগৃহীত হইল।

মুদ্রারাক্ষস।

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা।*

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান দান করিয়াছেন আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য একথার উল্লেখ মাত্র করাও বাহুল্য। বস্তুতঃ এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ কিন্তু বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য কোনো সময় হইলে এতবড় দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সঙ্কটকালে যখন ডাঙায় বাঘের ভয় ও জলে কুমীর, যখন রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয় সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অদ্যকার দিনে

* সভাপতি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয় ত ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দ্দিকেই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণে বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মত ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না এবং বিশ্বজগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ" মানবসমাজের মাঝখানে জাতিহীন তিনি বিরাজমান, যিনি "বহুধা শক্তি যোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি, সমস্ত পরিণামেও যিনি—"স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু," সেই দেবতা, তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে সুমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষতঃ জানি এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটি বশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয়, তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্ব্বাসনে গেলে পর, ভরত যে ভাবে রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়ম জোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্য স্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কন্‌গ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে এখনো তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন—যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহত ভাবে চলে না যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্ম্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্ম্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে জীবন-ধর্ম্মের অতি চাঞ্চল্যে কন্‌গ্রেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবন-ধর্ম্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কন্‌গ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় শাখায় সর্ব্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে। অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কন্‌গ্রেসের আঘাত-ক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া গিয়া সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে, তখন তাহাকে লইয়া যে কাজ করিতে হইবে সে কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জ্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্ব্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনো পক্ষ হইতে কোনো মতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণ রূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্য্যে সর্ব্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রাধান্য লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কোনো দলই হারিয়াও হার মানিতে চায় না। Labour Party, Socialist প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্র সভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়। এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা সফলতাকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পালন করিয়াই তাহারা জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতি গতির লোককে একত্রে লইয়া শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কন্‌গ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবল মাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্য এই সভাকে বহন করিতেছেন—এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বললাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্ম্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টিব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রানুগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ একই নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্রসৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সঙ্কীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মত বিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রীও কন্যাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মত-সংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম্ম অগ্রসর হইবে নতুবা অনর্থপা... ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

এ পর্য্যন্ত কন্‌গ্রেসের ও কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতি[illegible] নির্ব্বাচনের জন্য আমরা যথারীতি নিয়ম স্থির করি[illegible] যতদিন পর্য্যন্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকাতে[illegible] কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের [illegible] না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো [illegible] নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠি[illegible] দেশের কর্ম্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন [illegible] নির্ব্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লই[illegible] এইরূপ শুধু নির্ব্বাচনের নহে কন্‌গ্রেস্ ও ক[illegible] কার্য্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক এক দল যদি এক একটি সাম্প্রদায়িক কন্‌গ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কন্‌গ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কন্‌গ্রেস্ সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা—বিঘ্ন ঘটিবামাত্র এই

সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবল মাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনই কি লাভ হইবে!

এ পর্য্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি আমোদের জন্য দল বাঁধিয়া যখনি অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনি ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিষটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাতমাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে? যে শর্ষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই শর্ষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কি উপায়!

বঙ্গ বিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরো বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে দুর্ব্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায়। পরে যে বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্ট মাত্র ঘটে নিজে যে বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনমতেই চলিবে না কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব বন্ধুগণ, যে ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে ক্রোধ দমন করিতেই হইবে—আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারম্বার ক্ষমা করিতে হইবে—পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে সংঘাত ঘটিয়াছে তাহাকে অবিলম্বে ভুলিতে হইবে—কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। যে আগুন লাগিয়াছে সে যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন থাক্‌না তর্ক, থাক্‌না অভিযোগ। যাহার যেমন সাধ্য জল ঢালিতে হইবে—দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিতে উষ্ণ বাক্যের বায়ুবীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয় ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জ্জন মূর্ত্তি পরিহার করিয়া এবার আত্মীয় মূর্ত্তি ধরিয়াই দেখা দেয় তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপরে ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশ-মাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্ব্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভব হইবে না; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিয়ত কয়লা যোগাইবার সাধ্য গবর্মেণ্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতে সবুর সহিবে না। হিন্দু মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি বাধিয়া প্যাক্স্ ব্রিটানিকার অভিমানবাক্য তামাসা হইয়া দাঁড়াইতেছে বলিয়া আমি এ কথা বলিতেছি তাহা নহে—আসল কথা প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক্ হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি একথা সত্য হয় যে হিন্দুদিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মুসলমানদিগকে অসঙ্গতরূপে প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত

ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না, কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা বড়ই কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির ত অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মত। আমাদের পুরাণে কলঙ্ক ভঞ্জনের যে ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেণ্ট প্রেয়সীর প্রতি প্রেম বশতই হোক্ অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হোক্ অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। অতএব একদিন মুসলমানের আশা অতি-লোলুপ হইয়া উঠিলে তাহাকে আঘাত করিবার সময় আসিবেই ;—তখন তাহাকে, যতই অসঙ্গত-পরিমাণে আশা দেওয়া হইয়াছে ততই অসঙ্গত পরিমাণে বেদনা দিতে হইবে। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

ইহার মধ্যে যেটুকু ভাল তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেণ্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনওমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের মাঝখানে একটা অস্থয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে আমাদের মধ্যে একটা সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে—এবং সেই হইলেই অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে আমাদের মধ্যে তাহা ঘুচিয়া যাইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভাগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্ম্মহানি হয় এবং ধর্ম্মহানি হইলে কখনই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হোক হিন্দু ও মুসলমানে ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ যে সহিষ্ণুতা যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে ;—এই প্রকাণ্ড কর্ম্মঋণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্ম্মের, প্রাণধর্ম্মের নিয়মে দেশে যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিরোধরূপে উঠিয়া দেশকে যেন বহুভাগে বিদীর্ণ না করিতে থাকে—তাহারা যেন একই তরু কাণ্ডের উপরে নব নব সতেজ শাখার মত উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয়চিত্তকে পরিণতি দান করিতে থকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া দেশে যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত অনধিকারী বলিয়া ভ্রম হয়। কার্য্যকারণ পরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য্য স্থান আছে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্ব প্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না তাই আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মত, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দ্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে। এই ত আমাদের নূতন দল। এত আমাদের আপনার লোক। ইহাকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করি, আবার পরক্ষণেই সুখে দুঃখে ক্রিয়া কর্ম্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, Extremist, বা চরমপন্থী, বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায় সে দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি এ দেশে সকলের

চেয়ে বড় এবং মূল Extremist, কে? চরমপন্থিত্বের ধর্ম্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। এটা আমাদের নিজের কাহারো দোষে হয় না এটা বিশ্ববিধাতার নিয়মেই ঘটে। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশে যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয় নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহারা অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃষিত চঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল—তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধির ভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ত কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে কেবলি দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব ত এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্ব্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা ত নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তি ক্রিয়া; যাহাকে ইংরেজিতে বলে reflex action। এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরো একটা দুই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে ফলের ঘরে চার দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন, কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বিদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্ব্বল স্নায়ুতেও প্রবল ভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড় কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এদিকে যখন লর্ড কার্জ্জন, মর্লি, ইবেট্‌সন; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস্ ও পুলিসরাজকতা; নির্ব্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্ব্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখাদিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই গভীর অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকার সম্মুখে একেবারে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা ও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না, যে বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনো আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনো আমাদের যায় নাই—এবং জীবন ধর্ম্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্ত্তমান এখনো আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে। জীবনধর্ম্ম কলের জিনিষ নহে, তাহার প্রতি নির্ব্বিচার ব্যবহার করিলে সে হঠাৎ অভাবনীয় রূপে অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেদের জাতীয় কলেবরের মর্ম্মস্থানে চরম আঘাত পড়িতে থাকিলে চর্ম্মপ্রান্তেও তাহার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ না হওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল একথা কোন্ মুখে বলিব?

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্ব্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্ত্তন করা সহজ কিন্তু তাহাকে সম্বরণ করা বড় কঠিন।

এই কারণেই, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্য্যন্ত যাইবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্য্যে পুলিশের সামান্য পাহারাওয়ালা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্য্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হই-

তেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেণ্ট ত একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে; শাসন যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা ত রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতামত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে সময়ে প্রবীণ সারথীর প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনো যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না; কিন্তু তখন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালেই পা ফেলে; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনি এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারাওয়ালার যষ্টি যে কোন্ ভালমানুষের কপাল ভাঙ্গিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ঙ্কর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়! চতুর্দ্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেণ্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন; তখন লজ্জা নিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জ্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে? অথচ এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সম্বরণ করাকেও ত্রুটি স্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্ব্বলতাকেও প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া মনে করেন।

অন্যপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্ব্বদা ঠিকমত সম্বরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্ব্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ স্থলে কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার তাহা স্থির করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে!

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। Extremist নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালীর দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন্ কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে প্রত্যুত সময়ের গতিক ও কর্ত্তৃজাতির মর্জ্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্ত্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে Extremist দল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে ইহা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্ম্ম জিনিষটা কেবল স্বার্থপর ধর্ম্ম-যাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্ম্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন্ ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্ম্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন Extremism বলিয়া একটা বিশেষ রাসায়নিক উৎক্ষেপক পদার্থ একদল লোক তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিষ নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

যে সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা

ঝড়ের মত আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে নানা কারণে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে, এবং কন্‌গ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্ত্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মত দেখিতে পাইতেছিলাম না—তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেই জন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এই ভাবেই আরো অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জ্জন যবনিকার উপর এমন এক প্রবল টান মারিলেন, যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী, আমরা যে এক! বাঙালী কখন্ যে বাঙালীর এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন্ বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা ত পূর্ব্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়াছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারো চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম অত্যন্ত এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা সঙ্কীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এযে শক্তি! এযে সম্পদ্! ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্ ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশীবর্জ্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষতঃ প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের ক্রোধ কখনই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না। সত্য পদার্থকে অনুভব করিবার যে আনন্দ, সেই আনন্দের জোরেই আমরা দুঃখের পর দুঃখ বহন করিয়াও হার মানিতেছি না।

পরন্তু যতই দুঃখ পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বারবার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা ত কোনো দিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখসহার দলিল হইয়া থাকিবে;—দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

সত্য জিনিষ পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। কত দিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া, চাকরি করাকেই

জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ, কথাটা সত্য বটে! অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড় চাকরি-পিপাসু বাংলা-দেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভব হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না, উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না; সত্য যখন ঘরের কোণে এতটুকু একটু শিখার মত দেখা দেন তখনি ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্ব্বে দেশের বড় প্রয়োজনের সময়েও আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্ব্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাঁহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব—সে কেবল দুটি একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড় কারখানা স্থাপন করিব বাঙালীর মন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি,—তাহা সত্ত্বেও বাঙালী একটা বড় মিল্ খুলিয়াছে, তাহা ভাল করিয়াই চালাইতেছে এবং আরো এইরূপ অনেকগুলি ছোট বড় উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা শাখায় নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য্য।

কিন্তু যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম এতবড় শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। ষ্টীম্ নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তখন বুঝিতে হইবে সে রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দ্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উদ্যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন কি, যে টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কিযে করিব তাহাই আজ পর্য্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মত আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক

যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই ; কোথায় দিব কি করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই, তখনো যদি দেশের এই উদ্যত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মিত না হয়, তখনো যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার উদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসঙ্গত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহবা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই। এমন যদি বুঝিতাম এই কথাটা লইয়া এখনি হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি হইয়া না গেলে সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহা হইলেও আপত্তি ছিল না।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেলফ্ গভর্মেণ্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে—কিন্তু নিজেদের মধ্যে সে ঝগড়া করিবার সময় যে এই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়াছে সে কথা পরিহাস করিয়া বলাও উচিত নহে। যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন ফসলভাগের মামলা কেন ?

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে সেইগুলা আগে কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্ন সকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান,—কর্ম্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংশ না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, মুক্তি কয় প্রকারের আছে, সাযুজ্য মুক্তিই ভাল না স্বাতন্ত্র্য মুক্তিই শ্রেয় শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা করিতে ক্ষতি নাই বটে কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্ব্বল, আমরা বিভক্ত, বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র—সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্য সত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে। এই কর্ম্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্ম্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারম্বার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্ত্তমান ভারত শাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিষ্টীরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত ?

যাহার হাতে বিরাট্ শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্য্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মত দুর্ব্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হোক্ আর দুর্ব্বলই হোক্ যে ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্ম্মের অন্তরায় একথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনি ভুলি ইহার সত্যতাও তখনি সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে একথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্ম্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। নিজের শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্ম্মের প্রয়োজন। কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সুযোগটি পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয়ঃ পদার্থকে পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেই জন্যই দেখিতে পাই গবর্মেণ্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে! প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস্ যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্মেণ্টের প্রসাদভোগী পঞ্চায়েৎ যখন গ্রামের গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড় উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্মেণ্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রীসভায় যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না—আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম—দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে আমাদের কর্ম্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে নিজের সাধ্যমত যদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই তবে তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসঙ্কোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে। আমরা মা কালীর কাছে মহিষ মানৎ করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবী করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি আপনিই ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লওগে। আমরাও কথার বেলায় বড় বড় করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাৎ দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে জিনিষটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য একথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশকোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে। সেই জন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেই জন্যই পনেরো বৎসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে চড়িলেই প্যুনিটিভ্ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে, মনে তাহাদের ধিক্কার বোধ হয় না; এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেই জন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালীকেই বাদ দিয়া মর্লে সেটাকে settled fact বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই ইংরাজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড় একটা শূন্য তখন ইহার পাল্টাই দিবার জন্য আমরাও উঁহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গী করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা ত সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের সুমারনবিশ ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠি-

তেছে। গায়ের জোরে ইঁহাকে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমরাও কি সেই ভুল করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা ত কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়—অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্ম্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশীবর্জ্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই দুঃখ ত আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন জেলের দারোগা তাঁহারাই লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ দেশের যে ধন লইয়া তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা ত আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,—তাহাতে আরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহূত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্ম্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব;—ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না সে জন্য অপরাজিত চিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সঙ্কোচ বশত আমি এ কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেই জন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্ব্বলকেই, হয় স্পর্দ্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্ম্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদেরও কর্ম্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিৎ গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্সের ইহাই স্বার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ম্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে

সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোৎদার ও চাষা রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট শক্তির ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্রবাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্য বশত সে সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটি মণ্ডলীর অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামী কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

সহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের মর্ম্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে দেশে বড় বড় কারখানা যদি সহরের মধ্যে আবর্ত্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রাম পল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রী পুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিষ পত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিক দিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্ম্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মহাপ্রাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্ম্মের কোনো উদ্যোগ নাই কেবলমাত্র সমালোচনা ও প্রার্থনা ও দায়িত্বহীন দুর্ব্বল কণ্ঠে পরামর্শদান সে দেশের রাজকর্ম্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে?

কিন্তু কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশ শাসনও সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কাল-

ক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোট ব্যবস্থা যখন বড় ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভাল বই মন্দ হয় না—কিন্তু তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোট হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যত বড়ই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিক মত করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনই ঠিক মত হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্ব্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্ম্মে, যাত্রায় গানে, সাহিত্যরস ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইত তাঁহারা সকলেই সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্ব্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতিকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারো অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মত নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরির তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর ঐক্যমূলক সাহস নাই; তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কি অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্ম্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মত আসে এবং কুটুম্বের মত রহিয়া যায়;—ডিপ্‌থিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড্ সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploitation নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই; আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কি! ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মত কঠিন হইয়া গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয় স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মত নবীন কালের নির্দ্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ এগুলি কি আকস্মিক? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে? সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোন ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণ ভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল,—রোগীর বাতায়ন পথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্ম্মে সর্ব্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলি দূরে চলিয়া যাইতেছি আমাদিগকে আর একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্ম্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টিকিতে পারিব কেমন করিয়া?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্ব্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল সহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশি-উদ্যোগটা ত সহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা?

জগদ্দল পাথর বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্ত্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ্ পুলিসের বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন? স্বদেশীপ্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ্ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালীর সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষ্যে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে বাংলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে একাজ কখনই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্ত্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্ব্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলি বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট্ বুকের পকেটে লইয়া বেড়ান একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়ৎদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মত কেবল দীনভাবে আদয় করিবার পথগুলিই সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেই সঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি ত লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়ৎদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গল বিধানকর্ত্তা, পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ পদলাভ করিয়া এপদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

একথা যেন মনে না করি যে দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। এক সময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারীর তত্ত্বাবধান কালে সংবাদ পাইলাম পুলিসের কোনো উচ্চ কর্ম্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন

ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড় কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্ত্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কি? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিঁকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্ব্বল লোক জিতিয়াও হারে; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারম্বার ভাবিতে হইয়াছে আর কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন "বাপু, অন্যকে দোষ দিব কি, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে!"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধুইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্ব্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্ম্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এদিকে প্রজার দুর্ব্বলতা সংশোধন আমাদের কর্ত্তৃপক্ষদের বর্ত্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস্ কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্ম্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্ম্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্ম্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্ব্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ৎদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়া রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া?

অবশেষে, বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশের যে সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সঙ্কট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন! রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমারই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝঙ্কারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারো কাছে কোনো সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানেনা তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর অমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশী সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি—যে, দেশে অর্দ্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষ্যে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর! এ কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলা দেশের প্রভিন্শ্যাল কন্ফারেন্স যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন—এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গ হইতে নানা ধমনীযোগে জীবনসঞ্চারের বলে কন্গ্রেস দেশের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডস্বরূপ মর্ম্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্য্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্য্যই যে লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে কয়টি এই :—

প্রথম, বর্ত্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। বর্ত্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, Organization। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিঁকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্ব্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিত সমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিত সমাজগণ সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্ম্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্ব্বত্র অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্ব্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্ম্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিত সমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্ক সভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনি একই কর্ম্মের দুর্গমপথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ঐ সাংঘাতিক দশার যেটি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে সমস্ত বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব;—যে সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম্ম যথার্থ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে

আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয় ত উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব—কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা, মান অভিমান, তর্ক বিতর্ক, বিরোধ,—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘ বিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ কর যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ সমস্তই আমাদের, এ সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্ব্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্ম্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, বীর্য্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্ত্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।

দলিত কুসুম।

২

আইল বসন্ত পুনঃ, ক্ষীণ কায়া সেই
তটিনীর সোনাজলে, ভাসিছে তরণী
এক লয়ে নরনারী। নির্ব্বাসন কালে
রাজার তরণী গেছে অতলে ডুবিয়া,
ক্ষুদ্র এই তরীপরে সকলে মিলিয়া
হইতেছে অগ্রসর। সকলে তাহারা
শুনেছে সে পল্লীবাসী আছে অদূরেতে
কোন দেশ এক, তাই হইতেছে আজি
অগ্রসর, আশা আলো ভাসিছে আননে।
আবার হয়েছে আশা সকলে মিলিয়া
দেখা হলে রবে সেথা পূর্ব্বেকার মত।
তারি সাথে পুরোহিত নলিনীরে লয়ে
চলেছেন অন্বেষণে। প্রতিদিন যায়
ক্ষুদ্র তরী মৃদু সেই তরঙ্গের ভরে
হইতেছে অগ্রসর। বন শৈলশ্রেণী
কত পড়ে থাকে পাছে। রজনী হইলে
নদীকূলে তরী বাঁধি শিবির করিয়া
নিশাকালে সেই খানে একত্র সকলে
কাষ্ঠখণ্ড জ্বালি করে প্রদীপ তাহার।
আহারের আয়োজন করে সেইখানে।
শিমূলের বৃক্ষ হতে শুভ্র তুলারাশী
উড়িয়া ছড়ায়ে পড়ে তরঙ্গের 'পরে।
মৃদু মর মর ধ্বনি করে স্রোতস্বিনী।
দেখা যায় দূরে ওই উদ্যান ভিতরে
অতি ক্ষুদ্র গৃহ গুলি, বসন্তের শোভা
পড়েছে ছড়ায়ে যেন সে উদ্যানে শুধু।
সেইখানে স্রোতস্বিনী যেতেছে বাঁকিয়া
সেই স্বর্ণ তীরে তার নেবুর সুবাস
দূর হতে ভেসে যায়। সেইখান দিয়া
নদী যেন ক্ষীণ কায়া হইল সহসা,
দুধারে গাছের সারি। দুলিছে পল্লব
উচ্চ দেবালয়ে যেন দুলিছে পতাকা।
ক্রমেতে রজনী হলে তীরে তরী বাঁধি
আহার করিত সবে। চাঁদের কিরণ
কেমন ছড়ায়ে পড়ে তটিনীর বুকে।
কখনো পেচক তার কর্কশ গলায়
উপহাস করে যায় রজত কিরণে।
উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে সব পড়িয়াছে ছায়া
দূর হতে দেখাইছে তারা যেন সব
পল্লীপথে অযতনে সমাধি মন্দির।
সেই শব্দহীন স্থান সকলি কেমন
ঘুমে ভরা স্বপ্ন সম ছেয়ে চারিদিক।
অদ্ভুদ কল্পনা-জাল দিয়াছে ঘিরিয়া
সকল মানব আঁখি, সকলেই ভোর
আপন মনের ভাবে। নলিনীর মনে
ছায়াসম মূর্ত্তি কার ভাসিয়া বেড়ায়।
সেই দূর বনপথে শৈলের উপরে
বিমল তাহার যেন। প্রতি তরঙ্গের
ক্ষেপে, সে যেন আসিছে আরো কাছে তাহার।
সহসা গভীর রাতে নাবিকের দল
যাত্রার সময় বলে সঙ্কেতের ধ্বনি
করিল, সহসা তরী চলিল ভাসিয়া,

নিস্তব্ধ রজনী কালে শান্ত নদী বেয়ে।
সে সঙ্কেত ধ্বনি শুনে রজনীর সেই
নীরবতা ধীরে যেন উঠিল কাঁদিয়া
কাননেতে ভেসে গেল। শৈবালের দল
নদী কূলে ধীরে ধীরে উঠিল কাঁপিয়া।
বুঝি সে সঙ্গীত শুনি, শত প্রতিধ্বনি
অতি ধীরে মিলাইল নদীর উপরে
সেই বৃক্ষ শাখা'পরে হইয়া ধ্বনিত।
প্রতিধ্বনি থেমে গেল, যাতনার রেখা
যেন এক। তারপর ঘুমাল নলিনী।
সারারাত তরী বাহি নাবিকের দল
গায় গান, তাহাদের পুরাণ সঙ্গীত
গাহিত যেমন তারা সুখের আলয়ে,
নিজদেশে, ভ্রমিয়া সে নির্ম্মল সলিলা
তটিনী উপরে, অতি দূরে ভেসে যায়
তাহাদের সুমধুর সেই কণ্ঠধ্বনি.
নদীর তরঙ্গে মিশে মিলি বায়ু সনে
দূর হতে শুনা যায় অদ্ভুত সঙ্গীত
এইরূপে মধ্যাহ্নেতে আবার তাহারা
উপকূল তীরে ধীরে আসিল বহিয়া।
রাঙ্গারবি জ্বলিতেছে সোনার মতন,
জলে পদ্ম ফুটে আছে দুধারে কেমন
ক্ষেপণীর সাথে সাথে যেতেছে জড়ায়ে।
দূরে দূরে দেখা যায় লাল মুখ তুলি
কোনো ফুল ফুটে আছে, জলের হিল্লোলে
মৃদু সমীরের সেই সুরভি নিঃশ্বাসে
আসিছে সুবাস বহি। আসিয়া কূলেতে
নিদ্রায় অবশ সবে রাত্রি জাগরণে
শ্যাম দূর্ব্বাদল 'পরে পাতি আস্তরণ
পাদপের তলে এক করিল শয়ন
দূরে ঝোপে দেখা যায় বনের গোলাপ
কেমন ফুটিয়া আছে। বৃহৎ পাদপ
দুলাইয়া শাখা তার বর্ষিছে কুসুম।
ক্ষুদ্র বিহঙ্গের দল মধুর কূজনি
ফুল হতে অন্য ফুলে যেতেছে উড়িয়া।
নলিনী ইহারি তলে ঘুমায়ে দেখিছে
বিচিত্র স্বপন এক। হৃদয় তাহার
প্রেম পূর্ণ, আঁখি আগে জাগিছে কেমন
স্বরগের ঊষা আলো, সে আলোক পেয়ে
আত্মা তার আলোকিত ঈশ্বরের প্রেমে।
নিকটেই কোন এক দ্বীপ হতে এসে,
ক্ষুদ্র তরী এক গেল বহিয়া সহসা।
শিকারীর দল তারা যেতেছে সকলে
উত্তরাভিমুখ পানে অন্বেষি শিকারে।
সেই খানে হাল ধরি মলিন বদনে
বসিয়া রয়েছে যুবা। কালো কেশগুচ্ছ
অযত্নে ললাট তলে পড়েছে ছড়ায়ে।
মধ্যাহ্ন যৌবন তবু আননে তাহার
ভাসিছে দুঃখের ছায়া অন্ধকার কালো।
এতকাল সয়েছিল নিরাশ যাতনা
দেখার আশায় শুধু, হলনাক দেখা
তাই আজ অন্বেষণে যেতেছে চলিয়া।
হায়রে বারেক যদি দেখিত তাহারা
পরপারে ঘন এক গাছের ছায়ায়
রয়েছে তরণী বাঁধা, তরণীর লোক
শুনিছে ক্ষেপণী শব্দ নিদ্রায় আকুল।
স্বরগের পরি সেথা ছিলনা ত কেহ
নিদ্রিত বালার সেই ভাঙ্গাবারে ঘুম।
তরীটী চলিয়া গেল আকাশের মাঝে।
ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড সম সহসা ভাসিয়া।
সহসা নিদ্রিত সবে উঠিল জাগিয়া,
নলিনী জাগিয়া উঠি আশাভরা প্রাণে
পুরোহিতে কহে গিয়া "শুন পিতা শুন
কে যেন বলিছে মোরে নিকটে আমার
বিমল ঘুরিছে শুধু। ইহা কি স্বপন
অথবা শুধু কি ছায়া ? কিম্বা মিথ্যা দেব
কিম্বা কোন পরি এসে পরাণে আমার
জানাইল সত্য কথা ?" আরক্ত আননে
কহে বালা পুনঃ ধীরে "এই সব কথা
কি হইবে কয়ে তোমা, তোমার নিকটে
হবে তাহা অর্থহীন।" কিন্তু পুরোহিত
দয়ার আধার তিনি, হাসি বলিলেন,
"তোমার সরল কথা, শুন বৎসে তবে
নহে মিথ্যা অর্থহীন নিকটে আমার।
তোমার মনের ভাব নীরব গম্ভীর
উপরের মনোভাব জানায় আনিয়া,
কোথায় রয়েছে সেই অন্তরের মূল
সেই হেতু করে রাখ বিশ্বাস আপন.
এ নহে কল্পনা কিম্বা নহে ইহা ছায়া,
বিমল নিকটে আছে। কিছু দূর আর
দক্ষিণেতে গ্রামে এক তটিনীর তীরে,
তোমারি আশায় পথ চাহিয়া তৃষিত
রয়েছে বিমল। শুনেছি সুমস্ত সেথা
আছে শান্তি সুখে, তার উদ্যান সুন্দর,
কুসুমিত তরুলতা, সুনীল আকাশ
করে আলো ছায়া দান। সেই সে কান

স্বর্গমুখী সম তারা রয়েছে দু'জনে।
এই আশাভরা বাণী শুনিয়া তাহার
হল হিয়া পুলকিত। আবার আনন্দে
হল সবে অগ্রসর ক্ষুদ্র তরী বাহি।
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে অস্ত গেল রবি,
যেন কোনো যাদুকর মায়াদণ্ড দিয়া
করে দিল নীলাকাশ সুবর্ণে রঞ্জিত।
উঠিছে কুয়াসা ধীরে। আকাশ-তটিনী
আর সেই বনতল রঞ্জিত কেমন।
রাঙা আভা লভি রাঙা হয়েছে সকল।
সেই শান্ত তটিনীতে ক্ষুদ্র তরীখানি
মেঘখণ্ড সম যেন যেতেছে ভাসিয়া।
নলিনীর হৃদয়েতে আশার আনন্দ
প্রেমমন্ত্র বলে যেন হল প্রভাসিত।
হৃদয়ের উৎস মাঝে উঠিল জ্বলিয়া
প্রেমের মধুর আলো। আকাশেতে আর
তটিনীর মাঝে যথা হয়েছে বিকাশ।
সহসা নিকটে কোন পুষ্প বৃক্ষ হতে
মধু কণ্ঠে গাহে পাখী, তার সুধা ধারা
উন্মত্ত অধীর করে মানব হৃদয়।
সে গীত মধুর যত, ততই বিষাদে
পূর্ণ হয় হিয়া শুনি সে মধু-ঝঙ্কার।
প্রথমে করুণ শেষে উন্মাদ রাগিণী
সুপ্ত হৃদয়ের ভাব উঠাল জাগায়ে।
যেমন ঝটিকা শেষে সহসা আবার
বহিয়া সমীর বেগে, দেয় কাঁপাইয়া
সিক্ত বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে ঝরে বারিকণা।
তেমনি সে কণ্ঠে হৃদি হয় বিকম্পিত।
ক্রমে উপনীত তরী শ্যাম নদীকূলে,
মধুর বহিছে বায়ু, শ্যাম বনভূমি
যায় দেখা। ধূমশিখা আসিতেছে ভেসে।
জানাইছে অদূরেতে আছে বাসস্থান।
সহসা শুনিল সবে দূরে শৃঙ্গনাদ
পশুপাল ছুটিতেছে, আসে কণ্ঠস্বর।

[ক্রমশঃ।

মেবার পাহাড়!

(গাথা)

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ-বীর
বিরাট দুঃখে দৈন্যে, তাহার
শৃঙ্গের সম অটল, স্থির!

জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি
সে রূপ-বহ্নি পদ্মিনীর
ঝাঁপিয়া পড়িল সে ঘোর আহবে
যবন-সৈন্য, ক্ষত্র-বীর।
মেবার পাহাড়; উড়িছে যাহার
রক্ত-পতাকা উচ্চ-শির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ-দর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর!

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!—
রঞ্জিত করি' কাগার-তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে
ম্লেচ্ছ রাজায় গজ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার
বিজয় গর্ব্বে বাপ্পা বীর!
(মেবার পাহাড় ইত্যাদি।)

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!—
গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর!
সবার—সবার হইতে মধুর
যাহার শস্য, যাহার নীর!
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে
গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে
সুরভি, স্নিগ্ধ পবন ধীর!
(মেবার পাহাড় ইত্যাদি।)

মেবার পাহাড়! মেবার পাহাড়!
ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির!
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া
ভাসায় যাহার কানন-তীর।
মাধুরী বন্য-কুসুমে জাগিয়া
ঘুমায় অঙ্গে রমণী-শ্রীর;

শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্র চরিতে
কে সম মেবার সুন্দরীর!
(মেবার পাহাড় ইত্যাদি।)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

চিত্র পরিচয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্স্‌ভাল প্রবাসী ভারতসন্তানগণ নানা ভাবে উৎপীড়িত হইতেছেন। তাঁহাদের নেতা শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি মহাশয় অতিশয় ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও সাহসের সহিত এই লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন নিবারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। অত্যন্ত অপমানজনক ট্রান্স্‌ভালের এক নিয়ম সমুদয় প্রবাসী ভারতসন্তান অমান্য করায় গান্ধি এবং আরও বহুসংখ্যক বীর কারারুদ্ধ হন। এক্ষণে তাঁহারা কারামুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের জিদ্‌ও কিয়ৎ পরিমাণে বাজায় থাকিয়াছে। সহস্র আবেদন, প্রতিবাদ, ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি দ্বারা যাহা হয় নাই, "বরং জেলে যাইব, তবু অপমানকর আইন মানিব না," এই প্রতিজ্ঞাপালনে তাহাই হইয়াছে, স্বাধীন জাতির অধিকার লাভ করিতে হইলে আমাদিগকেও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন করিতে হইবে। ইহার সূত্রপাত গতবৎসর পঞ্জাবে হইয়া গিয়াছে। তথাকার খাল-ঔপনিবেশিকগণ খালের জল লইতে বা তাহার জন্য কর দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ক আইন বন্ধ করিতে বাধ্য হন। আমাদের মত এত বড় জাতির এক মত, এক পণ হইতে সময় লাগিবে। কিন্তু আমরা যে কালক্রমে নিশ্চয়ই এক পণ হইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা শ্রীযুক্ত গান্ধির ছবি দিলাম।

দময়ন্তী হংসের মুখে প্রেমাস্পদ নলের বার্ত্তা শুনিতেছেন, রামবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের ইহাই বিষয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মঞ্জরী—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। ১০৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। একখানি কবিতা পুস্তক; অনেক গুলি গীতি-কবিতা ও দুইটি নাট্য-কাব্যের সমষ্টি। প্রায় সকল কবিতাগুলিই রবি বাবুর কোন না কোন কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত। কিন্তু তথাপি কবির সরস ছন্দমাধুরী ও সহজ ভাষাপ্রবাহ কবিতাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। কবিতাগুলি মধুর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। নাট্যকাব্য দুটি বাক্যপ্রবাহ ও ওজস্বিতা গুণে অতি চমৎকার হইয়াছে। পুস্তকের বাহ্য সৌষ্ঠবও সুন্দর হইয়াছে।

অমর—(প্রথম স্তর) শ্রীজগচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, বি, এ, প্রণীত। ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য বার আনা। এখানিও কাব্য। কীর্ত্তিযশে চিরজীবী ভারতের কতিপয় কবি ও মনস্বীর প্রতি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি। কবির ভাষা গম্ভীর-মধুর; ছন্দে অবাধপ্রবাহ আছে; ভাবে কবিত্ব আছে। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের স্থর কাণে বাজে। প্রত্যেক কবির কবিত্ব বা মনস্বীর বিশেষত্ব বা প্রতিভার সুন্দর সঙ্কেত কাব্যের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, অথচ কবি তাহা বক্তৃতার আকারে লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীত ও তৃপ্ত হইয়াছি। অমরের দ্বিতীয় স্তরে কবির ক্ষমতা আরো পরিস্ফুট হইবে আশা করি।

কোহিনুর—শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা। এখানি উপন্যাস। ঔরঙ্গজেবের সহিত রাঠোরবীর দুর্গাদাসের সংগ্রামকালের ঘটনা লইয়া লিখিত হইলেও সেই ঘটনাই ইহার কেন্দ্র নহে; মিবার রাজতনয়ের সহিত অম্বর রাজকুমারীর প্রণয় ব্যাপারই ইহার কেন্দ্র। উভয়ের প্রথম সাক্ষাতেই প্রেমসঞ্চার হয়; কিন্তু কেহই কাহারো পরিচয় না জানাতে বহু ক্লেশ সহ্য করার পর উভয়ের মিলন হয়। প্রণয়-উদ্ভ্রান্ত রাজকুমারকে শান্ত করিবার জন্য বিলাসকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়; স্বামীর প্রার্থিতসম্মিলনে সাহায্যকর্ত্রী, স্বামীসোহাগবঞ্চিতা, নিঃস্বার্থপরা বিলাসকুমারী এই আখ্যায়িকার চক্রনেমি। এবং অন্যান্য ঘটনা অরদণ্ডের মত চক্রনাভি ও চক্রনেমিকে সংযুক্ত করিয়া আছে মাত্র। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে এবং ইহা ভারতের অপর ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, অতএব ইহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক তাঁহার সুপরিচিত সংবাদপত্রে কোহিনুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন 'গ্রন্থকার উপন্যাস রচনায় সুপরিচিত। ইঁহার ভাষার ঝঙ্কারে কোকিলের কুহুরব। আলাপে পঞ্চম। কোকিলের আলাপ আছে, ঝঙ্কার আছে, কিন্তু গান নাই। থাকিলেও আমরা বুঝি না। কোহিনুর অনেকটা সেইরূপ। যেমন ভাষা চরিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব সর্ব্বত্র তেমন দেখিলাম না। চরিত্র যেখানে প্রস্ফুট সেখানে মহীয়ান, যেখানে ফুটে নাই, সেখানে কেবল যেন গানহীন কোকিলকুহর"। গ্রন্থকার তৃতীয় সংস্করণে সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোহিনুরের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় সে ত্রুটি সংশোধিত হয় নাই। পুস্তকের ভাষা অতি সুন্দর, কেবল চরিত্রগুলি কেমন খাপছাড়া অসম্পূর্ণ হইয়াছে। ভাষা পাকা ওস্তাদের, কিন্তু আখ্যায়িকাচিত্রণ

নেহাত কাঁচা হাতের মত হইয়াছে, পড়িয়া প্রাণ ভরে না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না, অসম্পূর্ণতার অতৃপ্তি জাগিয়া থাকে। ভাষার মাধুর্য্য ও আখ্যায়িকার পূর্ণতায় যে জমাটভাব আসে তাহা এ পুস্তকে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অস্ফুট বিজয় পাল বা কালাপাহাড়ের চরিত্র এই পুস্তকের বহুস্থানে রসভঙ্গ করিয়াছে।

নানকপ্রকাশ—অর্থাৎ গুরু নানকের জীবনচরিত ও শিখধর্ম্মের ইতিবৃত্তসার। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (নববিধান) প্রচার বিভাগ। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮০ আনা। এখানি পুরাতন পুস্তক। আমরা নূতন করিয়া সমালোচনার জন্য ইহা পাইয়াছি। প্রাচীন ভারতে বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতির উপদিষ্ট ধর্ম্ম যখন পৌরাণিক ক্রিয়াকাণ্ডের তামস আবরণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল তখন বুদ্ধদেব পুনরায় স্বাধীন চিন্তা ও বিবেক অনুসারী ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। সেই বৌদ্ধধর্ম্ম কালক্রমে নিরীশ্বরবাদে পরিণত হইলে শঙ্করাচার্য্য পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে বিতাড়িত করেন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ক্রমশ মলিন হইয়া আসিলে রামানুজ স্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তখন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক তামসিকতা দেশকে এমন ভাবে অধিকার করিয়াছিল যে এই সকল মনস্বীর একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। যখন সমগ্র ভারত বাহিরের সহিত সকল সংযোগ রুদ্ধ করিয়া স্বরচিত অন্ধকারের মধ্যে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, তখন পরম পবিত্র ইসলামধর্ম্ম আসিয়া প্রবলবেগে ভারতের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিল। সে আঘাতে প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। তখন উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপনের জন্য রামানন্দ, গোরখনাথ, কবীর, তুকা, চৈতন্য, বল্লভাচার্য্য, নানক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া একেশ্বরবাদ এবং জাতিনির্ব্বিশেষে তুল্য ধর্ম্মাধিকার প্রচার করিয়া গীতোক্ত

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

বাক্যের সমর্থন করেন। এই গ্রন্থে সেই সকল মহাপুরুষের অন্যতম গুরু নানকের অসাধারণ জীবনচরিত অতি বিশদ ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রামাণ্য শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা ইংরাজি অনুবাদের বেমালুম অনুবাদ নহে। পরিশিষ্ট ভাগে অপরাপর শিখগুরুদিগেরও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, আড়ম্বরশূন্য অথচ ওজস্বী। ইহা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই নিজস্ব সামগ্রী হইয়াছে। যিনি পড়িবেন তিনিই উপকৃত হইবেন। আমাদের সকল পাঠক পাঠিকাগণকে ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মুদ্রারাক্ষস।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লঙ্কায় বন্দিনী সীতা।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল তৈলচিত্র হইতে, চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত আনন্দ কে.
কুমার স্বামীর অনুমত্যনুসারে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

৭ম ভাগ। | চৈত্র, ১৩১৪। | ১২শ সংখ্যা।

ভুত নামানো।

পাঠক মহাশয়, আপনি কখনও ভুত নামাইয়াছেন? সে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি কিরূপে প্রথমে ভুত নামাইয়াছিলাম সে ইতিহাস বলি শুনুন।

সে আজ সতেরো বৎসরের কথা। কলেজে পড়িতাম, পরীক্ষার পর গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী গিয়াছিলাম। আমরা পশ্চিমেই থাকিতাম, সুতরাং গ্রামে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত।

গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকগণের সহিত শীঘ্রই আলাপ পরিচয় হইল। তাহাদের নিকট শুনিলাম, সম্প্রতি তাহারা ভুত নামাইতে সুরু করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

তাহারা বলিল—"একটা ত্রিপাদ টেবিলে, হাতে হাত মিলাইয়া সকলে বসিতে হয়, কিছুক্ষণ পরে তাহাতে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। প্রশ্ন করিলে, টেবিলের পায়া ঠক ঠক করিয়া উত্তর দেয়।"

টেবিলে হাত রাখিয়া ভুত নামাইবার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, যদিও স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। একটু কৌতূহল হইল। বলিলাম—"দেখাইতে পার?"

"নিশ্চয়।"

একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর ভুত নামাইতে যাওয়া গেল। গ্রামে একটি মাইনর ইস্কুল ছিল,—গ্রীষ্মের ছুটিতে তখন বন্ধ। সেই ইস্কুল ঘরেই বন্দোবস্ত হইল। একটি ক্ষুদ্র টেবিল আনা হইল তাহার উপরি ভাগটি গোল, (চতুষ্কোণ হইলেও ক্ষতি নাই) চৌড়ায় এক হাতের অধিক হইবে না। টেবিল খানির মধ্যদেশ হইতে একটিমাত্র মোটা পায়া নামিয়াছে। সেই পায়াটি ভূমিতে পৌছিবার আধহাত পূর্ব্বে, তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া নামিয়াছে। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী ল্যাম্প অথবা ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য যে তে-পায়া টেবিল দেখা যায়, তাহাই।

টেবিল আসিলে, ঘরের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, আমরা তিন চারিজন টেবিল খানিকে ঘিরিয়া চেয়ারে বা টুলে বসিলাম। বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি আড়ভাবে (crosswise) স্থাপন করিয়া, সকলে টেবিলে হাত রাখিলাম। যিনি আমার বামে তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি আমার বামহস্তের উপর; যিনি আমার দক্ষিণে, আমার দক্ষিণ হস্ত তাঁহার বাম হস্তের উপর;—এইরূপ ভাবে সকলেরই হস্ত স্থাপিত। কেবল করতল মাত্র টেবিলে সংলগ্ন, কব্জী হইতে হস্তের ঊর্দ্ধভাগ উঠানো রহিল।

বসা হইলে, আমরা চক্ষু মুদিত করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট, বিষয় একমনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এইরূপে দশ পনেরো মিনিট কাটিলে, আমাদের মধ্যে যিনি পাণ্ডা ছিলেন তিনি বলিলেন—

"আমাদের এ চক্রের মধ্যে যদি কোনও প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তবে তিনি টেবিলের একটি পায়া তুলিয়া শব্দ করুন।"

কিন্তু টেবিলের পায়া উঠিল না। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি বসিয়া রহিলাম। পাঁচ সাত মিনিট পরে আবার ঐ প্রশ্ন পুনরুক্ত হইল। তথাপি টেবিল নড়ে না। যখন এইরূপে কুড়ি কি পঁচিশ মিনিট অতীত হইয়াছে, তখন আবার উক্ত প্রকার প্রশ্ন হইল; হইবা মাত্র টেবিলের একটি পায়া উঠিয়া ঠক করিয়া শব্দ করিল।

তখন সকলে বলিল—"ভূত এসেছে। চোখ খোল।" আমরা চক্ষু খুলিলাম। সেই ঘরে এমন দুই একজন ছিল যাহারা চক্রের মধ্যে বসে নাই, তাহারা উঠিয়া দুয়ার জানালা খুলিয়া দিল। ঘরে আলো আসিল।

তখন আমার সঙ্গীগণ ভূতকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আরম্ভ করিল। প্রশ্নগুলি এরূপ ভাবে করিতে হয়, যাহাতে টেবিলের পা ঠোকার সংখ্যার দ্বারা উত্তর বুঝা যাইতে পারে। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দিলাম।

প্রশ্ন। কত বৎসর পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু হইয়াছিল তত বার শব্দ কর। মৃত্যু সময়ে তোমার বয়স কত ছিল তত বার শব্দ কর। তুমি স্ত্রীলোক না পুরুষ, স্ত্রীলোক হইলে একবার, পুরুষ হইলে দুইবার শব্দ কর। তুমি ব্রাহ্মণ না শূদ্র, ব্রাহ্মণ হইলে একবার শূদ্র হইলে দুইবার শব্দ কর। তোমার কয়টি সন্তান জীবিত আছে ততবার শব্দ কর। তুমি এই গ্রামের লোক ছিলে, না ভিন্ন গ্রামের—এই গ্রামের হইলে একবার ভিন্ন গ্রামের হইলে দুইবার শব্দ কর। পরলোকে তুমি সুখে আছ না দুঃখে আছ, সুখে থাকিলে একবার, দুঃখে থাকিলে দুইবার শব্দ কর। আমার কত বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে ততবার শব্দ কর। অমুক চাকরিতে কয়টাকা মাহিনা পায় ততবার শব্দ কর। কত বৎসর পরে তাহার মাহিনা বাড়িবে, কয়টাকা মাহিনা বাড়িবে ইত্যাদি।

এইরূপে নানা প্রশ্ন ও ঠকাঠক উত্তর হইতে লাগিল। আমার সঙ্গীরাই প্রশ্ন করিতেছিল, আমি বসিয়া তামাসা দেখিতেছিলাম মাত্র। আমি ভাবিতেছিলাম, ইহা জুয়াচুরী বই আর কিছুই নয়। ইহারাই একজন কেহ পায়া ঠুকিয়া দিতেছে।

ক্রমে আমিও দুই একটা প্রশ্ন করিলাম। যথার্থ উত্তরই পাইলাম। ভাবিলাম এগুলির উত্তর আমার সঙ্গীদের জানা ছিল, সুতরাং তাহারা ঠিক ঠিক শব্দ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

তখন স্থির করিলাম, এবার এমন একটি প্রশ্ন করিব, যাহার উত্তর জানিবার ইহাদের সম্ভাবনা নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবি বায়রণ কত বৎসর বয়সে মরিয়াছিলেন?"—বিস্মিত হইয়া গণনা করিলাম, ঠিক ৩৬ বার শব্দ হইল। এখন, আমার সঙ্গীরা যৎসামান্য লেখাপড়া জানিত। বায়রণের নামও কখনও শ্রুত হইয়াছে এমন বোধ হয় না। তাই মনে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল। তবে এটা কি ইহাদের জুয়াচুরি নহে? বাস্তবিকই আপনা আপনি শব্দ হইতেছে? এই সংশয়ে পড়িয়া, এমন একটা সংখ্যা ঘটিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম যাহার উত্তর আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিত না সে সম্বন্ধে আমি একেবারেই সুনিশ্চিত ছিলাম। সে প্রশ্নেরও যথার্থ উত্তর পাইয়া আমার সকল সন্দেহ দূরে গেল;—ভূতই হউক আর যেই হউক, কোনও একটা অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা যে একার্য্য সম্পন্ন হইতেছে—ইহা যে আমার সঙ্গীগণের জুয়াচুরি নহে,—সে বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য হইলাম।

ইহাই আমার প্রথম দিনের ভূত নামানোর ইতিহাস।

তাহার পর হইতে এই সতেরো বৎসরে বহুস্থানে বহুবার ভূত নামাইয়াছি। সে সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যাহারা কখনও ভূত নামায় নাই, তাহারা বসিলে ভূত নামিতে প্রথম দিন অনেক বিলম্ব হয়। কুড়ি, পঁচিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টাও লাগিতে পারে। প্রথম দিন ভূত নামাইয়া, সেই সকল ব্যক্তি যদি আবার দ্বিতীয় দিন বসে, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই নামিবে। এইরূপে ক্রমে তাহারা যত অভ্যস্ত হইবে, সময় ততই সংক্ষেপ হইয়া আসিবে। এক সময় আমরা একটি দল জুটিয়াছিলাম, দিনে

দুই তিনবার ভূত নামানো আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমরা চক্র করিয়া বসিতে না বসিতেই ভূত নামিত।

চক্রে দুই, তিন, চারি, পাঁচ বা আরও অধিক লোক বসা যাইতে পারে।

চক্রের মধ্যস্থ একজন কেহ যদি উঠিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার বামের ও দক্ষিণের লোক দুইজন পরস্পর হস্ত সংযোগ করিবার পর তিনি উঠিতে পারেন। হস্ত সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলে ভূত অন্তর্দ্ধান করিবে। চক্রটি অক্ষুণ্ণ থাকা চাই।

চক্রস্থ যে কেহ ভূতকে প্রশ্ন করিলে উত্তর পাইবেন। চক্রের বাহিরের কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে না।

যিনি চক্রের বাহিরে আছেন, তিনি যদি চক্রস্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে হস্তসংযোগ অভগ্ন রাখিয়া তাঁহাকে চক্র মধ্যস্থ করা যাইতে পারে।

অনেক সময় ভূত অতি ক্ষীণভাবে পায়া ঠুকিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় আমরা ভূতকে জিজ্ঞাসা করি, কত বয়সে তোমার মৃত্যু হইয়াছিল। উত্তর পাই, ভূত অতি শিশু। তখন তাহাকে বলি—"তুমি যাও, একজন বলবান পুরুষ ভূতকে পাঠাইয়া দাও। সে যেন আসিয়াই খুব জোরে একটা শব্দ করিয়া জানায়।"—তাহাই হইয়া থাকে।

অনেক সময় ভূত ভাল করিয়া উত্তর দেয় না, দুষ্টামি করে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ?" সে বলে "হইয়াছি।" তখন তাহাকে বলি—"তুমি যাও, একজন শান্তপ্রকৃতি ভূতকে পাঠাইয়া দাও।"—তাহাই হয়।

কোনও নির্দ্দিষ্টনামা ভূতকে পাঠাইয়া দিতে বলিলে, সে ভূতও আসিয়া থাকে।

আমরা অনেক সময় বলিয়াছি—"টেবিলটা আমার দিকে একটু সরাইয়া দাও।" ভূত তখন আমার দিকের পায়াটি মাটিতে রাখিয়া, অপর দুইটা পায়া শূন্যে তুলিয়া ফেলে। পরে ভূমিস্থ পায়াকে কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া, ধীরে ধীরে টেবিল ঘুরাইয়া, অন্য পায়া আমার দিকে আনিতে চেষ্টা করে। অনেক সময় টেবিল এরূপ ঘুরে যে চক্র ভাঙ্গিবার ভয়ে টেবিলস্থ অন্যান্য ব্যক্তিকে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টেবিলের অনুসরণ করিতে হয়।

অনেক সময় ভূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"আমি যদি আমার দিকে টেবিলটা চাপিয়া ধরিয়া থাকি, তবে তুমি সে দিকের পায়াটা আমার বলের বিরুদ্ধে উঠাইতে পারে?"

ভূত বলিয়াছে—"পারি।" তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া যথা-সাধ্য টেবিল চাপিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু ভূত আমার দিকের পায়া উঠাইয়া ফেলিয়াছে।

একবার আমরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একটি রেলওয়ে ষ্টেশনে এই খেলা খেলিতেছিলাম। অনেক লোক আমা-দিগকে ঘিরিয়া দর্শকস্বরূপ উপস্থিত ছিল। ভূতের সঙ্গে আমাদের বলপরীক্ষা চলিতেছিল। একজন ভীমকায় পঞ্জাবী কনেষ্টবল বলিল—"বাবু, ভূতকো পছিয়ে কি হাম অগর দাবেঁ তো উঠা শক্তা?" ভূতকে জিজ্ঞাসা করা গেল। ভূত বলিল "পারিব"। তখন সেই কনেষ্টবল আমাদের কাছে আসিয়া, তাহার সমস্ত বলের সহিত, টেবিল দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। অল্পে অল্পে ভূত পায়াটি তুলিয়া ফেলিল। টেবিল মড়মড় করিতে লাগিল, ভাঙ্গে আর কি।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—যে বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহারই উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু ভূত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে যে প্রশ্নের উত্তর চক্রস্থ কাহারো জানা আছে, সেই উত্তরটিই ঠিক ঠিক পাওয়া যায়। অন্য উত্তর ভুল হয়। একবার আমরা ভূত নামাইয়াছিলাম, একজন অবি-শ্বাসী ব্যক্তি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "তোমরাই ঠক ঠক করিতেছ। আচ্ছা ভূতকে জিজ্ঞাসা কর দেখি আমার পকেটে কয়টা টাকা আছে?"—জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু ভূতের উত্তর ঠিক হইল না। তখন সে ব্যক্তিকে বলিলাম, "আচ্ছা তুমি বাহিরে গিয়া, একজনের নিকট গোটাকত পয়সা গণিয়া লইয়া পকেটে করিয়া এস। তাহার পর, চক্রমধ্যস্থ হইয়া নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর।" তিনি তাহাই করিলেন ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পকেটে কটা পয়সা আছে বল দেখি।" ভূত ঠিক উত্তর দিল।

একবার একটা মজা হইয়াছিল। একব্যক্তি নিজের বয়স লুকাইতেন আমরা সকলেই সন্দেহ করিতাম তাঁহার বয়স অধিক। একদিন আমরা ভূত নামাইতেছিলাম, তিনিও চক্রমধ্যস্থ ছিলেন। ভূতকে আমাদের সকলেরই

বয়স একে একে জিজ্ঞাসা করা গেল, ঠিক উত্তর মিলিল। অবশেষে সেই ভদ্রলোকটির বয়স জিজ্ঞাসা করা গেল। ভূত ঠকাঠক বাজাইয়া দিল,—বাবুটি যত বয়স বলিতেন, তাহার অধিক কয়েক ঘা বাজাইয়া দিল। বাবুটি আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

ভবিষ্যতের কথা অথবা বর্ত্তমানের যে কথা জানা নাই—তাহার উত্তর সময়ে সময়ে ঠিক হয়, সময়ে সময়ে হয়ও না। গত বড়দিনের ছুটিতে, আমরা ভূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"দুই দিন ত কনগ্রেসের অধিবেশন ভাঙ্গিয়াছে। তৃতীয় দিনে কোনও কার্য্য হইয়াছে না সেদিনও ভাঙ্গিয়াছে?" ভূত বলিল তৃতীয় দিনে কার্য্য হইয়াছে। দুই একদিন পরে সংবাদপত্রে দেখিলাম ভূত সত্য বলিয়াছিল। আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "অ্যালেন সাহেব যে গুলিতে আহত হইয়াছেন, তিনি আরোগ্য হইবেন কি না?"—ভূত বলিয়া ছিল—"আরোগ্য হইবেন!"

আর একটা আশ্চর্য্য কথার উল্লেখ করি। আমরা যেমন মনোভাবের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কথা কহিয়া থাকি, ভূতও ঠিক সেইরূপ উত্তর দানে আপনার মনোভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। গত বড়দিনের ঘটনা। ভূত আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইংরাজিতে তোমার নামের প্রথম অক্ষর কি, A এক B দুই এইরূপ শব্দের দ্বারা জানাও। এইরূপ, প্রথম অক্ষর, দ্বিতীয় অক্ষর, ইত্যাদি ক্রমে উত্তর পাইলাম NORI; তখন আমরা বলিলাম নরী? তবে কি স্ত্রীলোক না কি? জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিল—স্ত্রীলোকই বটে।

তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার পুত্র কন্যা কয়টি আছে? বলিল দুইটি। জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার স্বামী জীবিত না মৃত?" নিরুত্তর। দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—টেবিল নিশ্চল। তখন একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বিবাহ হইয়াছিল?" উত্তর—"না"।—"তুমি কি গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ছিলে না?"—উত্তর—"না"।—শেষ দুইটি উত্তর অতি ধীরে, অতি ক্ষীণ ভাবে,—যেন সে কত লজ্জিত। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরলোকে তুমি সুখে আছ না দুঃখে আছ?" বলিল—"দুঃখে আছি।"

একটি মাত্র উদাহরণ দিলাম। আমরা যেরূপ স্থলে বলি—"নিশ্চয়ই"—কিম্বা "অবশ্যই না"—সেরূপ স্থলে ভূতেরা অপেক্ষাকৃত জোরে শব্দ করিয়া থাকে।

আমরা অনেক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি "কোন ধর্ম্ম সত্য?"—হিন্দু ভূত বলে হিন্দুধর্ম্ম সত্য, মুসলমান ভূত বলে মুসলমান ধর্ম্ম সত্য ইত্যাদি। যীশুখৃষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর কি না জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দু ও মুসলমান ভূত বলে—"না," খৃষ্টান ভূত বলে—"হাঁ।"

একবার এক ভূত বলিয়াছিল—"আমাদের রক্ত নাই, মাংস নাই, কেবল অস্থি আছে। সুখ দুঃখ আছে। আমাদের প্রিয় পরিজন যেখানে বাস করে, সেই খানেই আমরা অদৃশ্যভাবে বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াই। তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হই—কিন্তু তাহাদের কোনও উপকার করিবার সাধ্য নাই। আমরা কাহারও অপকার করিতেও সক্ষম নহি।"

একবার এক ভূত বলিয়াছিল—রাত্রি বারোটার সময় গ্রাম প্রান্তের পুরাতন বট গাছের কাছে গেলে সে আমাদের দেখা দিতে পারে।—কিন্তু চক্রমধ্যস্থ কেহই ভূতের এ সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই।

যে টেবিল নাড়ে সে ভূত হউক আর নাই হউক, একটা আশ্চর্য্য অজ্ঞাত শক্তির যে ইহা ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। সব উত্তর সত্য হয় না, না হউক, সেটা তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু এই যে কার্য্য, তাহার প্রকৃত কারণ কি? কেহ কেহ বলেন, মনুষ্যদেহে যে জান্তব চৌম্বক শক্তি আছে, তাহাই পুঞ্জীভূত হইয়া ঐ প্রকার ক্রিয়াশীল হয়।—প্লাঞ্চেটের কার্য্যও সম্ভবতঃ এই কারণপ্রসূত। এ সম্বন্ধে পাঠক সাধারণ ও পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফল "প্রবাসী"তে লিখিয়া পাঠাইলে সত্যাবিষ্কারের সহায়তা হইতে পারে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চীনে ধর্ম্মচর্চ্চা।

চীন দেশে প্রধানতঃ তিনটী ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, তাও ধর্ম্ম এবং প্রকৃতিপূজা ধর্ম্ম। অবশ্য মুসলমান ধর্ম্ম ও আধুনিক খৃষ্টান ধর্ম্মকে এদেশের ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য

করা যাইতে পারে না। প্রকৃতিদেবীর পূজার এদেশে বিলক্ষণ চলন দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই পূজাকেই অতি পবিত্র পূজা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। পেকিংএ এক প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে এই প্রকৃতি দেবীর মন্দির আছে। তাহাকে Temple of Heaven অর্থাৎ স্বর্গের মন্দির বলিয়া থাকে। এই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। ইহা ত্রিতল-বিশিষ্ট গুম্বজাকৃতি। ইহা দেখিতে অতি মনোহর। এই মন্দিরের চূড়া যেন নীলাকাশ ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে "বসুধা (ধরিত্রী) মন্দির" (Temple of Earth) সূর্য্য-মন্দির, চন্দ্র-মন্দির, কৃষি-মন্দির এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও ভিন্ন ধরণের মন্দির অদৃশ্য দেবের মন্দির (Temple of the invisible deity) সকল দৃষ্ট হয়। এই স্বভাব দেবীর মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবী, চতুর্দ্দিকের অসীম বায়ু মণ্ডল তাহার প্রাচীর, এবং বিশ্বাকাশ তাহার ছাদ। এই মন্দিরের উপর মুক্ত স্থানে একটী প্রকাণ্ড বেদী আছে। সেই স্বর্গীয় পবিত্র বেদীর উপর প্রকৃতি দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

পরিষ্কার শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের ভিত্তির উপর এই বেদী নির্ম্মিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পবিত্র বৃক্ষরাজিতে স্বভাবের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বভাবের ত্রিত্ব প্রকাশক শ্বেত প্রস্তরময় তিনটী বৃত্ত উপর্য্যুপরি ভাবে নির্ম্মিত। একটী হইতে অপরটী উঠিতে নামিতে নয়টী করিয়া ধাপ আছে। একটী বৃত্ত প্রস্তরময় খোদিত স্তম্ভের বেষ্টনী সকল দ্বারা নির্ম্মিত। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে এই সকল বৃত্তাকার স্থানে উঠিতে পারা যায়। সর্ব্বোচ্চ বৃত্তের কেন্দ্র-স্থলকে এই বিশ্বের কেন্দ্ররূপে মনে করা হইয়া থাকে। এই ত্রিত্বময় বেদীত্রয়, অনন্ত বায়ুরাশি যাহার প্রাচীর এবং শূন্যা কাশ যাহার ছাদ, তাহার অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি দেবীকে "স্বর্গের মণ্ডল" চীন সম্রাট স্বয়ং পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্র চীন সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে স্বয়ং সম্রাট তাঁহার প্রজাবর্গের মঙ্গল ও সুখ সমৃদ্ধি কামনায় এই পূজা করিয়া থাকেন। সম্রাট স্বয়ং "স্বর্গীয় সন্তান" তাই তিনি এই প্রকৃতি দেবীকে পূজা করিবার একমাত্র উপযুক্ত পুরোহিত। সম্রাট-ভিন্ন অন্য কাহারো এ পূজায় অধিকার নাই। বৎসরে দুইবার অর্থাৎ শীতকালে এবং গ্রীষ্মকালে এই মন্দিরে পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দিরে পূজা দিবার কালে সম্রাটকে তিন দিন নিরামিষভোজী হইয়া সংযম করিতে হয় এবং তিনি দিবসের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পূজা করিয়া থাকেন এবং রাত্রিকাল এই স্থানেই যাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার অবস্থানের জন্য এক সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত আছে। সম্রাট স্বয়ং যে কেবল ইহার মাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত তাহা নহে, তিনি দেবকুমাররূপে অভিহিত। সুতরাং এই "অদৃশ্য দেবীর" পূজা করিতে যে যে দেবগুণ থাকা প্রয়োজন তাহা তাঁহার পবিত্র দেহে আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের বিধি ব্যবস্থানুসারে সম্রাট এই মন্দিরে ও অন্যান্য মন্দিরে পূজা করিয়া থাকেন। যখন রাজ্যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, যথা দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইয়া রাজ্যমধ্যে হাহাকার উপস্থিত হয়, তখন সম্রাট প্রজামণ্ডলীর আপদ বিপদ দূরীকরণ মানসে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করেন। কারণ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র বলিয়া এই সকল বিপদের জন্য প্রজামণ্ডলীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তাঁহার প্রার্থনাবাক্যের সার মর্ম্ম এই যে "আমি পুণ্য কার্য্য দ্বারা নিজ দেহকে পবিত্র রাখিব, আমার রাজ্য হইতে এই বিপদ দূরীভূত হউক। ভগবান্! আমি স্বয়ং এই রাজ্যের অমঙ্গলের জন্য দায়ী। আমার প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক।" এই প্রকৃতির পূজা সম্রাটের রাজকার্য্যের এক অঙ্গ বিশেষ। এই পূজা করা সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্রিয়া নহে। রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে তিনি এই কার্য্য করিয়া থাকেন।

সম্রাট যে কেবল এই ত্রিত্বময়ী প্রকৃতি দেবীর মন্দিরে পূজার জন্যই দায়ী তাহা নহে, রাজ্যমধ্যে যত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মমন্দির আছে তিনি তাহাদের রক্ষক, এবং সর্ব্বাগ্রগণনীয় বুদ্ধধর্ম্ম ও তাও ধর্ম্মাদিরও তিনি পৃষ্ঠপোষক এবং তাহাতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। তবে ঐ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থের বিধি অনুসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ পূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু সম্রাটের পদ সেই সেই পুরোহিতগণের উপর অর্থাৎ তিনি সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ পুরোহিত (High Priest) রূপে গণ্য। পেকিং রাজপুরীতে এই তিন প্রকারের ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকগণের মতে চীনারা ধর্ম্মজীবন যাপন করে না, কিন্তু তাহারা নৈতিকজীবন যাপন করিয়া থাকে। তাঁহারা বলেন চীনারা ধর্ম্মাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রের পক্ষপাতী। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে "Buddhism is not a religion, but it is the following of philosophy" অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, তাহা মাত্র দর্শনশাস্ত্রের মতানুসারে চালিত। তাঁহারা আরো বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও তাও ধর্ম্ম ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া খোসাবৎ হইতেছে। এই সকল ধর্ম্মমতের উপাসনা পূর্ব্বে আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিল কিন্তু এখন ইহা কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডে পরিণত হইতেছে। চীনাগণ প্রকৃত পক্ষে কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতাবলম্বী। পাদ্রীগণ বলেন যে "Confuceanism is a system of ethics, a philosophy rather than a religion."

বৌদ্ধধর্ম্মই হউক বা তাও ধর্ম্মই হউক সকল চীনারাই কনফুসিয়াসের মতের অনুবর্ত্তী। চীনারা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক বাহ্যিক আড়ম্বর খুব করিয়া থাকে কিন্তু আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রায়ই নাই। তাহারা কনফুসিয়াসের বিধি অনুসারে চলে এবং স্বভাবকে পূজা করে। পেকিনের সম্রাটের এই প্রকার স্বভাবের উপাসনাতে তাহাই প্রতীতি হয়। চীন দেশে যত ধর্ম্মোৎসব হইয়া থাকে তাহার কোন না কোনটীই প্রকৃতির কোন না কোন দৃশ্য হইতে কল্পিত হইয়া থাকিবে। যথা, বসন্তোৎসব, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পূজা, নববর্ষের উৎসব ইত্যাদি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাহাদের যত জটিল নীতি ও ধর্ম্মমত তাহার সকলের মূলে প্রকৃতির নীতি নিহিত। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের সহিত ও এবিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বৈশাখে গরমের দিনে শীতলা, পিতৃলোকের পার্ব্বন শ্রাদ্ধ, শারদীয় পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিক পূজা ও হল-চালন, নবান্ন, বাস্তু পূজা, শ্রীপঞ্চমী, বাসন্তী পূজা, ঝড় বৃষ্টি হইলে সূর্য্য পূজা ইন্দ্রের দই খই দেওয়া, আগুনের ভয় হইলে ব্রহ্মা পূজা, ইত্যাদিও প্রকৃতিপূজার পরিচায়ক।

ইউরোপীয়গণ বলেন যে চীন জাতির এই প্রকৃতির জন্যই তাহারা সহস্র সহস্র বৎসর কাল হইতে আপন ধর্ম্ম প্রায় একই ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা তাতার মংগল মাঞ্চুতাতার প্রভৃতি জাতিগণ কর্ত্তৃক বহু শতাব্দী যাবত পরাভূত হইয়া এবং পরাধীন থাকিলেও তাহাদের ধর্ম্মমতের বিপর্য্যয় ঘটে নাই। কোন বিজেতা জাতিই তাহাদের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন নাই, বরং বিজেতাগণই ক্রমে তাহাদের ধর্ম্মের মত গ্রহণ করিয়া তাহাতেই ডুবিয়া রহিয়াছেন। মংগল তাতার ও মাঞ্চু তাতারগণ সকলেই ধীরে ধীরে চীনাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া খাস চীনাদের মত হইয়া গিয়াছেন এবং এই সকল বিজয়ী জাতিগণ কালে চীনদেশের শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার কারণ মংগল ও তাতারগণ সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষজাতি হইলেও তাঁহাদের সাহিত্য দর্শনশাস্ত্রাদি বিশেষ উন্নতভাবাপন্ন ছিল না। বর্ত্তমান মাঞ্চুগণ যখন ১৬৪৬ খৃঃ পেকিন অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সন্ধিপ্রিয় এক অসভ্য জাতি বিশেষ ছিলেন। তাঁহারাও অন্যান্য বিজেতাগণের ন্যায় চীনদিগকে নানা প্রকার অধিকার দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং চীনদেশ শাসন চীনদেশের আইনানুসারে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক বাহুবল ব্যতীত আর সকল বিষয়েই তাঁহাদিগকে চীনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মাঞ্চুগণের আচার ব্যবহার পরণ পরিচ্ছদ চীনাদিগের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে অনেক সময়ে কে চীনা কে মাঞ্চু তাহা বাছিয়া বাহির করা যায় না। সম্রাট স্বয়ং মাঞ্চু হইলেও চীনাদিগের মত মাথায় বেণী রাখেন এবং চীনা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন।

মাঞ্চুগণ শান্তিপ্রিয় চীনাদিগের সঙ্গে বাস করিয়া তাহারাও শান্তপ্রকৃতি হইয়াছে। তাহাদের সেই সমরপ্রিয়তা ও দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি তাদৃশ এখন আর নাই। মাঞ্চুগণ কন্‌ফুসিয়াসের ধর্ম্মমতাবলম্বী হইয়াছে। কিন্তু পরণ পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুই জাতির মধ্যে পরস্পরের মনের মিল তাদৃশ আছে বলিয়া বোধ হয় না। মাঞ্চুগণ চীন-রমণীগণের বাঁধা বিকৃত পদ ভাল বাসে না, সেই জন্য তাহারা চীনা রমণী পাণিগ্রহণ করিতে নারাজ। আবার চীনাগণও মাঞ্চুরমণীগণের দীর্ঘ পদ পছন্দ করে না

বলিয়া মাঞ্চুরমণীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। কারণ স্ত্রীলোকের বড় পা থাকা বাঁদীর চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ পায়। চীন জাতিকে যুদ্ধে সহজেই জয় করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম আচার ব্যবহারকে কেহ এ যাবত জয় করিতে পারেন নাই। হিন্দুগণ এ বিষয়ে কতকটা গৌরব করিতে পারেন বটে। তবে জাতিভেদের অন্তরায় থাকায় হিন্দুধর্ম্ম দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। চীনারা বিশ্বাস করে যে জীবনপ্রদায়িনী প্রকৃতিদেবী শীতকালে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তখন এক উৎসব হইয়া থাকে।

জীবনপ্রদায়িনী প্রকৃতি দেবী সুষুপ্ত অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলে চীন দেশে বসন্তোৎসব হইয়া থাকে। পেকিন রাজপুরী মধ্যে এই উৎসব সামান্য ধরণে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু প্রতি সহরে ও নগরে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অতি জাঁক জমকের সহিত এই উৎসব প্রতি বৎসর সম্পন্ন হয়। * এই উৎসবের দিনে রাজকীয় উদ্যান হইতে কিছু মূলা স্যালড (Lettuce) রৌপ্যাধারে স্থাপিত হইয়া বৃদ্ধ মহারাণীর টেবলোপরি রক্ষিত হয়। রাণী তাহার কিঞ্চিৎ স্বয়ং ভক্ষণ করেন এবং নবীন সম্রাজ্ঞী ও অপরাপর মহিলাগণকে প্রদান করেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করা হইয়া থাকে। সিংহাসন কক্ষে জাতীয় মঙ্গলসূচক ধ্বনি উত্থিত হইলে অপরাপর কক্ষ হইতে খোজাগণ তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠে। ক্রমে সেই ধ্বনির পুনর্ধ্বনি হইতে হইতে রাজপুরীর শেষ দ্বার বা সদর দরজায় গিয়া উপস্থিত হয়। তখন বৃদ্ধা মহারাণী ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে "এই জীবন-প্রদায়িনী প্রকৃতিদেবীর অনুগ্রহে সাম্রাজ্য শস্যশালী হউক এবং প্রজামণ্ডলীর মঙ্গল হউক।"

এই সময়ে সম্রাট স্বয়ং একদিন হলচালনা করিয়া বৎসরের প্রথম বীজ বপন করিয়া থাকেন এবং সম্রাজ্ঞী স্বয়ং নিজ হস্তে তুঁতের গাছ রোপণ করিয়া থাকেন। সম্রাট যেমন অন্নের জন্য চাষ ও বীজ বপন করেন সম্রাজ্ঞী বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য তুঁত বৃক্ষ রোপণ করেন। রাজপুরীতে রেশমের শিল্প কারখানা আছে এবং তুঁতের চাষ হইয়া থাকে। রাজপুরীস্থ অন্দর মহলে যে সকল তুঁত বৃক্ষ আছে সেই সকল তুঁত বৃক্ষের রক্ষণের ভার কোন মহিলার উপর ন্যস্ত থাকে। এই কার্য্যকে সম্মানীয় কার্য্য বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। তুঁত পোকার মঙ্গলের জন্যও প্রকৃতি দেবীর আরাধনা করা হইয়া থাকে।

শ্রীরামলাল সরকার।

* ইহার বিস্তৃত বিবরণ ১৩১১ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দ্রষ্টব্য।

জাপানে কৃষি।

গত বৎসর (১৯০৬) অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান নিকলসন সাহেব মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক জাপানে প্রেরিত হন। তিনি প্রধানতঃ জাপানের মৎস্য ধৃতকরণ প্রথা ও তাহার ব্যবসায় প্রণালী অধ্যয়ন করিতেই গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তিনি জাপানের কৃষিকার্য্য প্রণালী ও কৃষির অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন ও তৎসম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একখানি শিক্ষাপ্রদ সুন্দর পুস্তক * প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় এই গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের শ্রী ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

দেখা যাইতেছে রুষজাপ যুদ্ধের পর হইতে জগতের উন্নতিশীল জাত সকলের বিস্ময়দৃষ্টি এই প্রশান্তসাগরশোভী ক্ষুদ্রদ্বীপের অধিবাসিগণের প্রতি পতিত হইয়াছে। জাপানের কাহিনী সংগ্রহ জাপচরিত্র অধ্যয়ন এবং জাপানের কৃত-কার্য্যতার মূলমন্ত্র আবিষ্কার করিতে আজি সকলেই ব্যস্ত। জাপানের রক্ষণশীলতা চীন হইতে কোন অংশেই কম ছিল না। প্রতিবেশী কোরিয়ার সহিত যাহার নাম মাত্র সংস্রব ছিল, বহির্জ্জগতের সহিত সে জাপানের যে আদৌ কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সময়ের গতি লক্ষ্য করিয়া জাপান সত্যানুসন্ধায়ী বৈজ্ঞানিকের মত এবং দূরদর্শী দার্শনিকের মত কূপমণ্ডূকপ্রসূ রক্ষণশীলতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অতি অল্পদিন হইতে স্বীয় সন্তান গণকে গৃহের বাহিরে পাঠাইতে শিখিয়াছেন। জাপ সন্তান-গণ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল অনুসন্ধান করিয়া যে খানে যে উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই লাভ করিতে, যে দেশের রীতি, নীতি, ভাব, সংস্কার স্বদেশের হিতকর বুঝিয়াছেন,

* Note on Agriculture in Japan by Sir F. A. Nicholson, K.C.I.E., I.C.S. (retired) on deputation, Madras Fisheries Investigation—Printed by the Superintendent Government Press, Madras. 1907, Price 1 rupee.

যে জাতির যে যে গুণ স্বজাতির উন্নতিসাধক বলিয়া জানিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিতে দেহ মন পাত করিয়াছেন। ফলে কি হইয়াছে ? এখনও অর্দ্ধ শতাব্দী যায় নাই, ইহারই মধ্যে যাঁহাদের অনুকরণ করিয়া জাপান স্বদেশের বহুবিধ সংস্কার সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই আজি জাপানের পথানুবর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলণ্ড ও জার্ম্মণী প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। রক্ষণশীল ভারতের কোটি কোটি প্রজার চক্ষু খুলিবে না !

ইতিপূর্ব্বে বিদেশের কুটাটি পর্য্যন্ত জাপানের ত্রিসীমার মধ্যে আসিত না। জাপান আপন পণ্যদ্রব্য বিদেশের বিপণিতে পাঠাইত না। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে খাস জাপানের (ফরমোজা ছাড়িয়া) লোক সংখ্যা ছিল ৩, ৩১, ১০, ৭৯৩ এবং খাসজাপানের পরিসর ছিল ৯, ৪৪, ৪০,৩০০,* একর মাত্র। গত ১৯০৫ অব্দের গণনায় জানা গিয়াছে লোক সংখ্যা ৪, ৭৮, ১২, ৭০২ হইয়াছে, এবং গত দশবৎসরে শতকরা ১৩·১জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩৩ বৎসরে জাপানে এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ এক হাজার নয়শত নয় জন প্রজা বাড়িয়াছে। কিন্তু লোক সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ভূ-ভাগ ত আর বাড়িতেছে না ? ইহার অধিকাংশই পার্ব্বত্য এবং উত্তরাংশে শীত দীর্ঘস্থায়ী। চাষ করিবার উপযুক্ত জমি জাপানে অতি অল্প। নিকলসন সাহেব অনুসন্ধানে জানিয়াছেন যে জাপগণ সহস্র সহস্র বৎসরের অনন্যসাধারণ ধৈর্য্য ও অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে ১৯০৫ অব্দ পর্য্যন্ত দেশের শতকরা ১৩·৫৩ অংশ ভূমি চাষোপযোগী করিতে পারিয়াছে। কর্ষণযোগ্য ভূমির ছগুণেরও বেশী এখনও কর্ষণ অসাধ্য বলিয়া পতিত রহিয়াছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যদি ভূমির পরিমাণ গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় জীবন ধারণের জন্য লোক প্রতি ০·২৬৭ একার পড়ে। সে হিসাবে জর্ম্মণীর বাহির হইতে আহার্য্যের আমদানী এবং গোচারণের মাঠ বাদে লোক প্রতি কর্ষিত ভূমির একরের কিছু উপর পড়ে ; মান্দ্রাজে লোক প্রতি এক একর পড়ে। অথচ মাংস, দুগ্ধ, মাখন এবং পনীর তাহারা খাইতে পায় না বলিলেও চলে। কারণ সমগ্র জাপানে প্রায় দশলক্ষ ঘোটক, ১৮ লক্ষ শূকর, এককোটি দশলক্ষ হাঁস মুরগী প্রভৃতি এবং গবাদি শৃঙ্গ বিশিষ্ট পশু দশলক্ষ মাত্র আছে এবং মেষ বা ছাগল নাই বলিলেও চলে। এই মুষ্টিমেয় শৃঙ্গবিশিষ্ট পশুজাত মাংস দুগ্ধ মাখন পনীর আদি দ্রব্যের অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। বাহিরের আমদানি খাদ্যের উল্লেখ না করাই ভাল, কারণ গত দশবৎসরে যে পরিমাণ খাদ্য আমদানি হইয়াছে তাহা সমগ্র দেশের পক্ষে একপক্ষ কালেরও উপযোগী নহে। জীবনসংগ্রামের দিনে জাপানের পক্ষে ইহা কি মহাশঙ্কার বিষয় নহে ? কিন্তু জাপানের বিষয়ব্যাপার সকলই স্বতন্ত্র। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও জাপসন্তানগণ কেমন উদর পুরিয়া আহার পাইতেছে এবং সাধারণত সুস্থ, সবল ও দৃঢ়কায় হইতেছে ! তাহাদের মধ্যে ভিক্ষুকের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে এবং অস্থিচর্ম্মসার একজনও নজরে পড়ে না ! চিন্তা করিয়া দেখিলে এক একবার মনে হয় জাপান সেই আরব্যোপন্যাঃ বর্ণিত কৃষ্ণোপদ্বীপের মন্ত্রপূত ভূমি নহে ত ? প্রকৃতই দুই প্রশ্ন আজি চিন্তাশীল জগতের সমস্যা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ বিদেশ হইতে আহারীয় সামগ্রীর আমদানি না করিয়া বাহিরের সকল সুযোগ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া এই পশুপক্ষীবিরল শৈলবহুল, দ্বীপের কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জ মুষ্টিমেয় এবং কষ্টকাষত ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের দ্বারা শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া কি প্রকারে সকলের উদারান্নের সংস্থান করিয়া আসিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমানের নির্দ্ধন ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রজাপুঞ্জ সেই পরিমাণ ভূমি ও সেই সকল আনুসঙ্গিক লইয়া ভবিষ্যতে কি প্রকারে উদরপূর্ণ করিয়া অন্নপুষ্ট সুস্থ সবল ও শ্রমসহিষ্ণু জাতিরূপে বজায় থাকিবে ! নিকলসন সাহেব বলিতেছেন "It is however to be noted that the population is growing faster than the arable area." অর্থাৎ কর্ষণযোগ্য ভূমি অপেক্ষা প্রজাসংখ্যা ত্বরিতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ ক্ষেত্রোৎপন্ন চাউলই তাহাদের প্রধান অন্ন। সাহেব মহোদয় দক্ষতাসহকারে এই দুইটী প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র পুস্তক হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাই যে জাপানিরা সর্ব্বযুগের যুগলক্ষণানুসারে আপনাদিগকে গঠিত করিতে এবং আপনাদিগকে সকল অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে যে জাতির জাতীয়জীবনে পরিবর্ত্তন-

* এক একর ভূমি কিঞ্চিদধিক তিন বিঘার সমান।

শীলতার অভাব আছে পরিবর্ত্তনশীল জগতে সে জাতির স্থান নাই। "যখন যেমন তখন তেমন" ইহা একটি পুরাতন প্রবচন এবং যাহার তাহার মুখে শুনা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র-নীতির ইহাই মূলমন্ত্র এবং "Survival of the fittest" (যোগ্যতমের জয়) নীতির সহিত ইহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। প্রথমটি নিদান (Cause) দ্বিতীয় পরিণাম (Effect) বা সিদ্ধি।

অবস্থার অনুযায়ী জীবনগঠনে সিদ্ধহস্ত জাপান সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে—নিধন সহায়হীন, অশিক্ষিত, গবাদিপশুবিহীন করভারাক্রান্ত (rackrented) বন্দোবস্ত-বিহীন (unorganised) জাপকৃষকগণ যে ঠিক নিয়মিত এবং প্রচুর সাময়িক ফসল উৎপাদন করিয়াও মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত দেশশুদ্ধ প্রজার অন্ন যোগাইয়া আসিয়াছে তাহার গূঢ় কারণ (secret) তাহাদের ক্ষেত্রকর্ষণ করিবার ও ক্ষেত্রে সার দিবার প্রণালীতেই নিহিত আছে। জাপান প্রতি বর্গফুট জমি কাজে আনিতে জানে এবং সেইটুকুই অতি সাবধানের সহিত অতি যত্নসহকারে এবং সম্পূর্ণরূপে কর্ষণ করে। যতটুকু জমি পাওয়া যাইতে পারে ততটুকুই উৎকৃষ্টরূপে এবং দেহ মনের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া চাষ করে। অনুচ্চ পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে সর্পাকারের চারিদিকের মাটি কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এমন কি যথায় আরোহণ করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সে সকল স্থানও আবাদ করে। গৃহস্থ স্বীয় ভদ্রাসনের আশে পাশে এমন কি গৃহদ্বার পর্য্যন্ত যতটুকু জমি আদায় করিতে পারে তাহাতেই বীজ বুনিয়া থাকে, গাছপালা রোপণ করে। ফল কথা একটু কোণ পর্য্যন্ত বাতিল যায় না। পাছে বেড়া দিলে অল্প অল্প করিয়া ক্ষেত্রের কিয়দংশ ভূমি বৃথা আটক পড়ে সে জন্য বেড়ার পরিবর্ত্তে তাহারা ক্ষেত্রের ধারে ধারে বিশেষ বিশেষ ফসল উৎপন্ন করে। গবাদি পশু বা শস্যধ্বংশকারী পক্ষীর অভাবে বেড়া না দিলেও ক্ষতি হয় না। চাষ করিলে চাষ হইতে পারে এরূপ জমি এবং পতিত জমি থাকিতে পারে ইহা জাপানে অজ্ঞাত। জমির সদ্ব্যবহার জাপানি কৃষির অন্যতম বিশেষত্ব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে তাহাদের চাষে অপরিচ্ছন্নতা বা অসাবধানতা ঘটিবার যো নাই। প্রত্যেক ফুট অতি সুন্দররূপে আবাদ করিয়া সমগ্র ক্ষেত্র যখন একটী সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত উদ্যানের মত দেখাইবে একটী তিল পরিমাণ ভূমি ব্যর্থ যাইবে না, প্রত্যেক বীজটী একটী ফলবান বৃক্ষে বিকশিত হইয়া উঠিবে তবে জাপানী কৃষক নিরস্ত এবং সন্তুষ্ট হইবে। তাহাদের মতে সুন্দর ও সম্পূর্ণভাবে কর্ষিত একমুঠা জমিও ভাল তথাপি যেমন-তেমন চষা ময়দানও ভাল নয়। তাই জাপানের মাটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা, কোন ঋতুতেই ফসলের ভিতর একটাও আগাছা দেখা যায় না। এই জন্য উক্ত হইয়াছে জাপানের কৃষি বলিতেই উদ্যানকৃষি বুঝায়। বৈজ্ঞানিক কলের অভাবে জাপানে সামান্য কতিপয় হাতের যন্ত্র লইয়া চাষ করা হয়। সাধারণতঃ জাপানের মাটি কৃষ্ণবর্ণ পাক ও বালি মিশ্রিত। প্রথমে শাবল বা কোদাল দিয়া মাটি খোঁড়া হয়। হাতে করিয়া খোঁড়া হয় বলিয়া অনেক ভিতর পর্য্যন্ত মাটি আলগা হয়। চাষী তখন সেই মাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সূক্ষ্ম গুঁড়া করিয়া ফেলে এবং মাটি পরে পরে আলি ও সীতাকাটা করিয়া একলাইন উচ্চ মাটি মধ্যে সীতাকাটা, তাহার দুই এক হাত অন্তর পুনরায় আল তুলিয়া দেয়। এবং ফসল এমন ভাবে বুনা হয় যে আলির উপরকার ফসল (শীতের গম, যব ইত্যাদি) যখন কাটিবার সময় আসে তখন সীতাকাটার মধ্যস্থ ফসল গজাইতে থাকে সুতরাং সমগ্র ক্ষেত্র এককালে খালি পড়ে না। এবং একবার যাহা খালি থাকে ফসল কাটা হইবার পর চাষিয়া তাহা সীতা কাটায় পরিণত করা হয় এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা সীতাকাটা ছিল তাহা আলিতে পরিণত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জাপানী পাঙ্গে ভূমি (dry upland সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষভাবে রক্ষিত হয়। কোদাল দিয়া ভিতরকার মাটি উপরে তুলিয়া এবং ক্রমাগত উল্টাইয়া জমির ভিতর বায়ু ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দেওয়ায় গাছগুলি সুপুষ্ট, ফলবান হয় ও শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। ফসলের সময়েই বেশ করিয়া জমি চষা হয় মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া মাটি পিন্ড করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক গাছটির উপর দৃষ্টি রাখা হয়, এবং অল্প অল্প করিয়া তরল

'সার'* ঘন ঘন' গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। আগাছার নামমাত্র গজাইতে দেওয়া হয় না। পাথর, কাঁটা, আগাছা এ সকল কি উচ্চ শুষ্কক্ষেত্র কি ধান্যক্ষেত্র (Wet land) সর্ব্বত্রই অজ্ঞাত। জাপানিরা অতি সুন্দর-ভাবে জমির পাট করিতে জানে। জাপানে প্রায়ই প্রবল বেগে বারিপাত হয় কিন্তু তাহাদের সীতাকাটা ও আলিবন্ধের পদ্ধতির জন্য এবং নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রকর্ষণ জন্য মাটি ও সার ধুইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না। এবং মাটি সুক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করায় জল অনেকটা বসিয়া যায়। যে ক্ষেত্রের মাটি আটাল তথায় বালি ও পাঁক মাটি মিশান হয় এবং বেলে মাটির সঙ্গে উদ্ভিজ্জসার ও নরম মাটি মিশাইয়া ভূমির উৎপাদিকাশক্তির অভাব পূর্ণ করা হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জাপানে ক্ষেত্রকর্ষণোপযোগী এবং ভারবাহী পশু নাই বলিলেও চলে। সুতরাং পশু অভাবে কৃষকগণকে যেমন অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয় অপর দিকে তেমনি অতি সামান্য যন্ত্রাদির দ্বারা ক্ষেত্রকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। মাটি খুঁড়িবার ক্ষুদ্র একটী শাবল অথবা খুরপী (fork), একখানি কোদাল, একখানি শস্যছেদনের কাস্তিয়া, সার বহনের জন্য একটা কেঠো ও তাহা প্রয়োগ করিবার জন্য একটা হাতা বা উখড়ী ব্যতীত জাপকৃষকের অন্য যন্ত্রের আবশ্যক নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য এই সকল দ্রব্যের প্রতি সরকারী হিসাবে খরচ পড়ে গড়ে চারি টাকা মাত্র। এই সামান্য যন্ত্র লইয়া ইহারা অসামান্য ফল উৎপাদন করে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি সুন্দর ও নিখুঁৎভাবে বপন, রোপণ প্রভৃতি সকল কাজ করিয়া থাকে। জাপানি কৃষকের মত পরিশ্রম করিতে জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

সার দিবার গুণেই জাপানে পর্য্যায় বুননের কোন পদ্ধতি নাই এবং তাহার আবশ্যকও বড় হয় না। তথাপি 'নাইট্রোজেন' উৎপাদক শাম্বীজাতীয় ফসলের দ্বারা মৃত্তিকার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গম ও যবের ক্ষেত্রে পাশাপাশি শীম, মটর প্রভৃতি যে ভাবে বূনা হয় তাহা কতকটা পর্য্যায় বুননেরই অনুরূপ। ভারতবর্ষে মাটিকেই লোকে ফসলোৎপাদনের মূল মনে করে এবং উৎপাদিকা শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার ভাবে, জাপানে তাহারা ভাবে মাটি অবলম্বন বা আশ্রয়স্বরূপ। প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌জীবন মাটিকে মধ্যস্থ (medium) মাত্র রাখিয়া পর্য্যায়ক্রমে খাদ্য ও খাদককে পোষণ করে। তাহারা প্রকৃতি হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং জাপানিরা ক্রমাগত মাটি খোড়ে আর খুঁড়ে খুঁড়ে সার দেয়। তাহারা সার না দিয়া কোন ফসলই বুনে না এবং যতটুকু সার শস্যে পরিণত হইতে পারে তাহার কণামাত্র নষ্ট করে না। তাহারা বলে ক্রমাগত মূলধন ভাঙ্গিয়া খাওয়াও যা, সার না দিয়া ক্রমাগত জমিতে ফসল উৎপন্ন করাও তা; উভয় ভ্রমই এক প্রকার। সার দিবার প্রথা তথায় এমনই প্রবল যে পূর্ব্ব ফসলের সময়ে সার দেওয়া জমির যদি কিছু বাঁচিয়া যায় তাহাতে জাপানিরা পুনরায় সার না দিয়া নূতন ফসল বুনে না। তাহারা মনে করে মাটি সারকে শস্যে পরিণত করিবার যন্ত্র মাত্র। ইহাই তাহাদের জমির ফসলোৎপাদিকা শক্তির এবং উষর ভূমিকে উর্ব্বর করিবার গুপ্তমন্ত্র। তাহারা বন জঙ্গল হইতে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকা, ও উদ্ভিদ্, নগরের আবর্জ্জনা সমুদ্রের ঝাঁজি শৈবালাদি, নিম্নভূমির পাঁক, নর্দ্দমা, খানা ডোবার আবর্জ্জনা প্রভৃতি শুষ্ক ও আর্দ্রভূমির জন্য ব্যবহার করে, এবং প্রত্যেক খামারে রাশীকৃত মিশ্রসার জমা করিয়া রাখে। তা ছাড়া মৎস্য সার, খইল, সকল জন্তুর বিষ্ঠা বিশেষতঃ মানুষের মল মূত্রই জাপানে সারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। সার প্রস্তুত করণ ও প্রয়োগের প্রথা জাপানি কৃষির আর একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক জৈব পদার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার পরিত্যক্ত বস্তুই সারের কাজ করে। "সার" হয় তরল অথবা সুক্ষ্ম চূর্ণের আকারে প্রযুক্ত হয়। ঋতু এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে আবশ্যক মত তরল করিয়া ব্যবহার করা হয় কিন্তু মৎস্য, খইল, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, চূণ ঝিনুকাদির খোলা, ছাই, মাটি, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি একত্রে পচিতে দেওয়া হয়। পচিয়া অতি সুক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হইলে সার মাটির মত ব্যবহৃত হয়। বীজ বা চারা বুনিবার সময় সীতাকাটার দাগে দাগে তরল "সার" ঢালিয়া মাটির সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া দেওয়া

* যে যে স্থানে "সার" এই শব্দ ব্যবহৃত হইবে তথায় মানুষের মলমূত্রের সার বুঝাইবে। অন্যান্য সারের পূর্ব্বে বিশেষণপ্রযুক্ত হইবে যথা-মিশ্রসার (Compost) মৎস্যসার (Fish fertiliser) ইত্যাদি।

হয়। বপনের পূর্ব্বে, একস্তর মিশ্রসার পাতলা করিয়া বপন পংক্তির মধ্যে ছড়াইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর অল্প মাটি মিশ্রিত সার দিয়া বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ যখন গজাইতে থাকে, বিশেষতঃ উষ্ণ শুষ্ক ক্ষেত্রে গাছগুলির মধ্যবর্ত্তী জমি পুনঃ পুনঃ খনন করিয়া প্রত্যেক বারই অল্প মাত্রায় তরল সার গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। অল্প মাত্রায় অথচ ঘন ঘন সার প্রদান জাপানিদের পদ্ধতি। প্রথম সার প্রদানকে তাহারা বলে "অঙ্কুরোৎপাদক মাত্রা।" গাছগুলি যখন গজাইতে থাকে তখন তাহাদের আহার স্বরূপ আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে "সার" দেওয়া হয়। একটা ফসলের মধ্যে তিন হইতে সাতবার করিয়া কোদাল ও 'সার' দেওয়া হয়। শীস বা শুঁটি ধরিবার সময় শেষ 'সার' দেওয়া হয়। বেশী পরিমাণ 'সার' কখনই দেওয়া হয় না। প্রকৃত পক্ষে এতদ্দ্বারা মাটি অপেক্ষা প্রত্যক্ষভাবে গাছের আহার যোগান হয়। ডাক্তার নাগাই বলেন এই পদ্ধতির জন্যই জাপান আবহমান কাল হইতে একই ফসল একই জমি হইতে প্রতি বৎসর একই পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষজ্ঞগণ জাপানিদিগকে বিলক্ষণ পরিমিতব্যয়ী, হিসাবী, ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বীজবপনের পূর্ব্বে যে রাশি রাশি সার খরচ হয় সেরূপ অযথা অপব্যয় করিতে জাপানিরা জানেই না। 'সারের' উপর তাহাদের এতদূর লক্ষ্য যে তাহারা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার হিসাবে কত সার পাইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছে। শতকরা ২৫ ভাগ নানা কারণে নষ্ট হইলেও তিন কোটি ষাটলক্ষ লোকের 'সার' এক কোটী বিশলক্ষ একর ভূমির সার যোগাইয়া থাকে। ইহাতে সকল বয়সের তিনজন ব্যক্তির 'সার' কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা ভূমি প্রতি পড়ে। যাহা নষ্ট হইয়া যায় তাহাও নানা কৌশলে ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা হইতেছে। কারণ "সার" অধিক প্রাপ্তব্য, গুণে উৎকৃষ্ট, এবং মূল্যে সকল রকম সার অপেক্ষা সস্তা। জাপানের এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'সার' ভারতে অতি অল্পই ব্যবহৃত হয় ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না। অধিকন্তু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েনা। তাহারা বলে ভারতের এই উপেক্ষা, অন্যায় অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাপানে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ক্ষেত্র হইতে পাঁচ শতমণ শস্য উৎপন্ন করে এবং সপরিবারে ২॥ শত মণ আহার করে ও ২॥ শতমণ বিক্রয় করে তাহা হইলে সে প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহারা সপরিবারে যে অংশ ক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহা "সারের" আকারে ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ করিবে এবং যাহাদিগকে বিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগের নিকট বক্রী অংশ "সারের" আকারে ক্রয় করিয়া আদায় করিবে।

জাপানিরা 'সার' সংগ্রহের কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকে নিকলসন সাহেব তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যাহাতে লোকালয়গুলির পরিচ্ছন্নতা রক্ষা হয় এবং স্বাস্থ্যের হানিকর না হয় অথচ কি ধনী কি দরিদ্র প্রত্যেকের বাড়ীর "সার" এমন ভাবে পরিষ্কৃত হয় যাহাতে ময়লার চিহ্নমাত্র না থাকে, পথিপার্শ্বে বা লোকালয়ের কুত্রাপি দর্শকের দৃষ্টিপথে পতিত না হয় তাহার সুবন্দোবস্ত আছে। যতদূর সম্ভব লোকালয়ের বাহিরে সুদূর কৃষিক্ষেত্রে সুরক্ষিত বৃহৎ বৃহৎ কুণ্ড মধ্যে 'সার' সঞ্চিত করিয়া আবশ্যকমত চুণ, মাটি, খৈল প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। জর্ম্মণ ডাক্তার ম্যারণ জাপানের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বলিয়াছেন—

"In all my wanderings through the Country, even in the most remote valleys, and in the homesteads and cottages of the very poorest peasantry, I never could discover, even in the most secret and secluded corners, the least trace of human excrements. How very different with us in Germany, where it may be seen lying about in every direction, even close to privies." —Page 45.

যে সকল ক্ষেত্র নদীর ধারে ধারে, ঠিকাদারগণ নৌকা করিয়া 'সার' লইয়া গিয়া তথায় কৃষকদিগকে বিক্রয় করে এবং অন্যত্র কৃষকগণ তাহা হয় গৃহস্থের নিকট অথবা মেথরদিগের মধ্যস্থতায় ক্রয় করিয়া থাকে। এদেশে মেথরকে বেতন দিয়া অথবা সরকারকে কর দিয়া গৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয়। কিন্তু জাপানে তাহার ঠিক বিপরীত, জাপানের প্রত্যেক মলাগার গৃহস্থের বার্ষিক আয়ের সংস্থান করে। "Nor do the householders pay any thing as the cost of

removal; on the contrary, it is the farmer or scavenger who pays each householder at certain rates for the privilege." জাপানে মেথরগণ ঠিকাদারের কাজ করিয়া থাকে। টোকিও সহরে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোক প্রতি বার্ষিক ।৶০ মূল্য দিয়া কৃষক বা মেথর 'সার' লইয়া যাইত কিন্তু এক্ষণে ৸০ হইয়াছে এবং শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে "সারের" মূল্যও বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। মূল্য নগদ অথবা শাক শবজী ফলমূলের আকারেও দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে গৃহ এবং পল্লী যে অসাধারণ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? টোকিওতে লোক প্রতি ৸০ আনা লাভ হয় আর এদেশে নাইনিতালের স্বাস্থ্যনিবাসে লোক প্রতি মাসিক ।৶০ আনা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীকে করস্বরূপ দিতে হয়। অথচ সন্তোষজনকরূপে বাড়ী পরিষ্কৃত হয় না। নিকলসন সাহেব উভয় দেশের অবস্থা দর্শন করিয়াই বলিয়াছেন, "দৈবাৎ যাহা জাপান নষ্ট করে ভারত তাহা দৈবাৎ ব্যবহারে আনে।" এই "সার" এদেশের "ঘরের কড়ি" দিয়া বিদায় করে কিন্তু জাপানে ইহার সংরক্ষণ, ইহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের সার প্রস্তুত করণ ও ইহার ব্যবসায়ের প্রতি গবর্মেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইহা দেশের কৃষি পরীক্ষাসভা সমিতিতে পরীক্ষিত হয়। সারে কেহ ভেজাল দিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। এই-চি-কেন (Ai-chi-ken) কৃষি পরীক্ষাসভার রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রকাশ 'সার' হইতে নাইট্রোজেন এ্যামোনিয়ার আকারে শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া যায় তাহাতেই চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ বিকীরণ করে কিন্তু নাইট্রোজেন মাটি উৎপাদিকাশক্তির প্রধান উপকরণ। সুতরাং যাহাতে এ্যামোনিয়া নষ্ট হইতে না পায় তাহা করা আবশ্যক। সার কোন অভেদ্য পাত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে (চালার নীচে) ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তাহাতে শতকরা দুই ভাগ চুণ দিলে আরও ভাল হয় কিন্তু খড় দিলে অনিষ্ট করে। চুণের পরিবর্ত্তে (১) খড়িমাটি (Gypsum), (২) উদ্ভিদের পচা শিকড়বিশিষ্ট জলাভূমির মাটির শুষ্ক গুঁড়া (৩) গুঁড়া করা শুষ্ক আটাল মাটি, (৪) কয়লার গুঁড়া ও (৫) করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। জাপানের কোন পরীক্ষা-খানা (Experimental Station) একমাসের পরীক্ষায় দেখিয়াছেন কি উপায়ে রক্ষা করিলে সার হইতে কত পরিমাণ নাইট্রোজেন বাঁচাইতে পারা যায়।

মোটের উপর নাইট্রোজেন রক্ষার উৎকৃষ্ট ও সহজসাধ্য উপায় এই যে চালার নীচে পাত্র পুঁতিয়া তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা। তাহাতে শতকরা তিন অংশ Superphosphate মিশাইলে ভাল হয় কিন্তু খড় বা শ্বেতসারযুক্ত অর্থাৎ মণ্ডবৎ দ্রব্য কোন মতেই মিশান উচিত নহে। ভারতের এত নদনদীতে সমুদ্রজলে ও উপত্যকা ভূমিতে ও অন্যত্র "সার" ফেলিয়া দেওয়া হয় যে তাহাতে কৃষিক্ষেত্রের ক্ষতি ত হয়ই অধিকন্তু তাহাতে স্বাস্থ্যহানিও হইয়া থাকে। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের দিনে জাপানের কৃষিপদ্ধতি ও ভারতের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

মৎস্যসারও খুব নাইট্রোজেনবহুল কিন্তু ইহাতে অধিকাংশ ভাগ Phosphoric acid আছে ইহা দ্বারাও উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। মাছের মুড়া, ছাল, কাঁটা প্রভৃতি প্রকাণ্ড চৌজে স্নান করা গরম জলে ফেলিয়া খুব ঘুঁটিয়া খড়ের চাটাই ঢাকা দিয়া (জাপানিরা খুব গরম জলে স্নান করে) পচান হয়। কয়েক সপ্তাহে জল পচিয়া অসহনীয় দুর্গন্ধময় ও সবুজবর্ণ হইলে তুলিয়া লওয়া হয় এবং নূতন ভাটির জন্য পুনরায় তাহাতে পূর্ব্ববৎ মাছ ও গরমজল ছাড়া হয়। এই সারের গুণে গাছপালা অতি শীঘ্র গজাইয়া উঠে এবং পরিপুষ্ট হয়। ভারতে জলাশয়ের অভাব নাই, মৎস্যও প্রচুর। এখানে এই সার প্রস্তুত করণের বিস্তৃত আয়োজন করা উচিত। খৈলের সারও এক্ষণে জাপানে বিলক্ষণ ব্যবহৃত হইতেছে। গত দশ বৎসরে খৈলের আমদানী ১৪ গুণ এবং তাহার মূল্য ত্রিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাপাসের বীজও সারস্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। খৈল গুড়া করিয়া কাঠের ছাই, দগ্ধ খকা, আস্তাবলের ময়লা জল বা মূত্র মিশাইয়া খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। অতিরিক্ত উত্তাপ নিবারণের জন্য ঢিবি মধ্যে মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তৎপরে শুদ্ধ এই সার অথবা মিশ্র সারের (Compest সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করা হয়। মিশ্র সার জাপানি কৃষকের "কোন

কিছুরই অপচয় করিও না". (Waste nothing) নীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "সার" ব্যতীত যাহা কিছু লোকে ফেলিয়া দেয়,—সকল জীব জন্তুর মলমূত্র, আগাছা, পাতালতা, খড়-কুটা, ব্যঞ্জনের খোসা, মাছের আঁইস কাঁটা প্রভৃতি, শম্বুকাদির খোলা, হাড়ের গুঁড়া, ছাই, পাঁক, সকল স্থানের আবর্জ্জনা একস্থানে একটী চালার নীচে রাশীকৃত করা হয় এবং আস্তাবলের বা মনুষ্য মূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে কিছুদিন পরে যখন সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত হয় তখন উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়। জাপানে আস্তাবলের সার, সামুদ্রিক গাছগাছড়ার সার, চাউলের তুঁষ প্রভৃতির সার প্রস্তুত করণ প্রথাও প্রচলিত আছে।

এই সকল উপায়ে এপর্য্যন্ত জাপান কোটী কোটী সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে কিন্তু এই সনাতন প্রথা আর চলে না। নবীন যুগের নূতন আকাঙ্ক্ষা, প্রজা বৃদ্ধি, শিল্প বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনীতিসূত্রে বিদেশের সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধ এবং প্রতিযোগিতার দিনে উন্নতিপথানুবর্ত্তী দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া এবং ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা আদর্শ রাজনৈতিকের অন্তর্দৃষ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা ও সময়ের গতি লক্ষ্য করিয়া সূক্ষ্মদর্শী জাপান নূতন পথের অনুসরণ করিয়াছেন। যে কৃষি জাপানের প্রধান সম্বল তাহার উন্নতির জন্য জাপান সকল বৈধ উপায়ই অবলম্বন করিতেছেন। কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রীর অধীনে গবমেণ্টের কৃষিবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে; ইহার অধীনে অসংখ্য পরীক্ষাখানা (Experimental Stations), বিদ্যালয়, কৃষিসভা সমিতি, ভ্রমণকারী উপদেষ্টা ও শিক্ষক, কৈন্দ্রিক পরীক্ষালয়, জেলা ও পল্লাপরীক্ষাগার, কৃষি-পুস্তকাগার, কৃষি কলেজ, প্রভৃতি আছে। এই সকলের প্রতি সরকারী বার্ষিক খরচ ৮০ লক্ষ টাকা। ইহা খাস কৃষির জন্য, বনবিভাগের খরচ ইহাতে ধরা হয় নাই। বনরক্ষণ-বিদ্যা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং কৃষিকার্য্যের একটী প্রধান সহায় বনজঙ্গলগুলি রক্ষা ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিতে বনবিভাগ বা বেসরকারী মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করা হইয়াছে। গবাদি পশুপাল বৃদ্ধির এবং মৎস্যধৃতকরণ ও তাহার ব্যবসায়ের বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। ফলতঃ যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার জন্য সকল সুবন্দোবস্ত হইতেছে। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী ১৮৬৭ অব্দ হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহার দুই বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭১ অব্দে রীতিমত শিক্ষাবিভাগের সৃষ্টি হয় এবং পর বৎসর হইতে নিয়মিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসৃত হয় যাহা এক্ষণে উন্নততম দেশসমূহের পদ্ধতি হইতে অভিন্ন।

জাপানের প্রজা শিক্ষাগ্রহণে আইনবলে বাধ্য হইবার পর হইতে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এখানে ১৮৭২ অব্দে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়, পরবৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ২৮ জন ছাত্র হয়। দশ বৎসরে (১৮৮৩) ৫১ জন, পরবর্ত্তী দশ বৎসরে (১৮৯৩) ৫৯ জন এবং ১৯০৪ অব্দে অর্থাৎ আর দশ বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ৯৩.২৭ জনে পরিণত হয়। লোকসংখ্যার অনুপাতে বালকের সংখ্যা শতকরা ৯৬.৫৭ এবং বালিকার সংখ্যা ৮৯.৫৪। জাপানে ৬১টী নর্ম্যাল স্কুল আছে তথায় ১০৬৯ জন শিক্ষক, ১৯৪৬৬ জন শিক্ষক-ছাত্র ছিলেন। তন্মধ্যে ৪,০৪১ জন ছাত্রী ছিলেন। এখানে পুরুষদিগকে ৪ বৎসর ও স্ত্রীদিগকে ৩ বৎসর শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রদিগকে নিয়মিত সরলবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা এই সময় হইতে গাছপালা, জীবজন্তু, খনিজদ্রব্য, কৃষি, জলজদ্রব্য, স্থানীয় শিল্প, দেশের মাটি, সার, জলসেচন, বপন ও রোপণ বিষয়ে শিক্ষা পায়, এখানে অন্যূন ১৫৩৩টী বিদ্যালয়ে কৃষি নিয়মিত পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং ২৮টী বিদ্যালয়ে অতিরিক্তরূপে অধীত হয়। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কৃষি-স্কুল ও কৃষি-কলেজ যথা Supplementary Schools, Regular Agricultural Schools, College of Agriculture, Farm Schools, Private Agricultural Schools, প্রভৃতিতে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। অধিকাংশ স্কুলে কৃষকপরিবারের সন্তানগণ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গ্রাম্য স্কুলগুলিতে প্রত্যেক তিনটি ছাত্রের মধ্যে দুইটী অথবা তিনটিই কৃষক-সন্তান। এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্য করিতে যায় এবং এই জন্য বিদ্যালয়ের সহিত স্থানীয় কৃষিসম্প্রদায়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকে।

আইনানুসারে স্থানীয় কৃষকগণ সকলেই গ্রাম্য কৃষিসভার সভ্য। এই সকল কৃষিসভায় শিক্ষকগণ কর্তৃক শীতকালে যখন ক্ষেত্রকর্ম্ম বন্ধ থাকে, অধিবেশন ও বক্তৃতা হয়। কৃষকগণও স্ব স্ব সন্দেহভঞ্জনার্থ ও দুরূহ বিষয় সকলের মীমাংসার জন্য প্রায়ই বিদ্যালয়ে গমন করে। নিকলসন সাহেব এই শ্রেণীর একটী স্কুল স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন এই স্কুলের ছাত্রগণ মাসিক ।৯/০ আনা মাত্র বেতন দেয়। তাহাদের অনেকে বহু দূর হইতে পড়িতে আইসে, কেহ কেহ ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া আইসে। এই বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত কৃষিবিষয়ক বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম পাঠ্য পুস্তক আছে। বালকগণ তাহা হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন প্রণালী, জলের ব্যবহার, সার প্রস্তুতকরণ, তত্ত্বাবধান ও তাহার মূল্য এবং উপকারিতাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। রেশম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া রেশমবিজ্ঞানও শিখান হয়। সম্প্রতি মধুমক্ষিকার পালন এবং কৃষির শাখা স্বরূপ বলিয়া বনরক্ষণ বিদ্যাও শিখান হইতেছে। বিদ্যালয় গৃহগুলি জাঁকজমকশূন্য। পাঠগৃহ গুলি সামান্য ধরণের। ৫৩১ খণ্ড পুস্তকের এক লাইব্রেরী আছে, একটী গৃহে রাসায়নিক পরীক্ষা হয়, একটী পদার্থসংগ্রহাগার (museum) আর গুটিকত বাহিরের ঘর (out-houses) আছে। প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী ১৫ বিঘা ভূমির আর্দ্র ও শুষ্ক ক্ষেত্র আছে। বালকেরা তথায় এক বৃদ্ধ কৃষকের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বালকদের ব্যবহারের উপযোগী ছোট ছোট যন্ত্রগুলি একটী গৃহে অতি পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত আছে। এখানে সার প্রস্তুত ও আর্দ্র এবং শুষ্ক ভূমিতে তাহার ব্যবহার বিশেষ করিয়া শিখান হয়। ১৯০৬ সালে বিদ্যালয়ের আয় হইয়াছিল ৪৬৪১। তন্মধ্যে ছাত্রদিগের বেতন ৭৯২, ইম্পিরিয়াল ট্রেজারি প্রদত্ত ৯০০৲, প্রাদেশিক ট্রেজারি প্রদত্ত ৭৫০৲ এবং গ্রামবাসীদিগের নিকট সংগৃহীত ২২০০৲ টাকা। যদিও ঐ বৎসর রুষ-জাপান যুদ্ধ চলিতেছিল তথাপি কি সরকারী কি বে-সরকারী সাহায্য শিথিল হয় নাই। খরচও প্রায় ৪৬০০ টাকা হইয়াছিল। ইহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে তত্ত্বাবধায়ক সভা পূর্ব্ব বৎসরের মত সমস্ত বৎসরের বেতন স্বরূপ কেবলমাত্র ২৭৲ টাকা পাইয়াছিলেন, এবং চিকিৎসকও তদ্রূপ প্রাপ্ত হন। যে নয়টি গ্রাম ঐ বিদ্যালয় পোষণ করে তাহার লোকসংখ্যা ছিল ৩৬,৫১৩ তাহারা একর প্রতি ৫১৲ টাকা হারে ৩৩,৯০৬ একর ভূমির মালিক; সুতরাং তাহারা যে ২২০০৲ টাকা স্কুলের চাঁদা স্বরূপ দিয়াছিল তাহাতে প্রতিজনের একর প্রতি প্রায় এক আনা করিয়া পড়িয়াছিল। একতা উন্নতীচ্ছা এবং অধ্যবসায় থাকিলে অল্প ব্যয়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মহৎ কার্য্য সমাধা হয়।

জাপানে প্রাথমিক কৃষিবিদ্যার ন্যায় উচ্চকৃষিশিক্ষা এবং কৃষিবিজ্ঞান অনুশীলনের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। নিকলসন সাহেব তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় শিক্ষার প্রতি জাপানিরা অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকে এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে শিক্ষার সুবিধা হইতে পারে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পশ্চাৎপদ হয় না। বালক ও যুবকদিগকেই শিক্ষা দিয়া জাপান নিরস্ত হয় নাই, তাহাদিগের জন্য বহু সরকারী ও বেসরকারী স্কুল কলেজাদি ব্যতীত বয়স্ক লোকদিগের শিক্ষার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কৃষিবিভাগের অধীন প্রায় ৩০০ বা তাহার অধিক বক্তা ও উপদেষ্টা আছেন তাহারা অসংখ্য পরীক্ষা-ষ্টেশনের (Experimental Stations) সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বৎসরের মধ্যে জাপানের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সাময়িক স্কুল খুলিয়া কৃষি শিক্ষা ও বক্তৃতা দিয়া বেড়ান। এই ষ্টেশন বা থানা গুলি কৃষকদিগের সাহায্যের অন্যতম উপায়। জাপানিদের ধারণা বালক ও যুবকদিগের মন ও চরিত্র গঠন করিবার জন্য স্কুল ও কলেজের যেমন প্রয়োজন, বয়স্কদিগের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সাহায্যদানের বিভিন্ন উপায় ও শিক্ষার তেমনি প্রয়োজন। থানাগুলি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রধান থানায় ৪০ জন বিশেষজ্ঞ (Experts) এবং ৪৭ জন সহকারী বিশেষজ্ঞ (Assistant Experts) ও কতকগুলি কেরাণী এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ কর্ম্মচারী শাখা থানায় নিযুক্ত আছেন। থানার কার্য্য স্থানীয় চাষ আবাদের লক্ষণ অনুসন্ধান, দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নূতন প্রণালী ও নূতন উপকরণাদির পরীক্ষা দ্বারা ফল নির্ণয় করা এবং তাহা স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর

দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার ও সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করা। কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ ও রসায়নিক পরীক্ষালয় (Experimental Station) ব্যতীত জাপানে অনেকগুলি কৃষি সমাজ (Agricultural Association) সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। ফ্রান্সের কৃষিবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী (Director of Agriculture) দূরদর্শী মুঁসো টিসাস্রাণ্ড বলেন কোটী কোটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের উপর গভর্মেণ্টের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে তাহারা একদিকে এত বেশী দূরে দূরে থাকে, এত অধিক সন্দিগ্ধচিত্ত, এত অধিক মুখচোরা, নূতন ভাব নূতন পদ্ধতি গ্রহণে তাহারা এতই ভীত, এবং অপরদিকে তাহারা এত দরিদ্র, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনে দালালদিগের হাত এড়াইতে ও উচ্চহারে বা বিলক্ষণ লাভ রাখিয়া জিনিষপত্র গঞ্জে বিক্রয় করিতে এমনই অক্ষম যে এমন কোন ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যাহা গভর্মেণ্ট ও কৃষক সাধারণের মধ্যস্থ হইয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহা হইলে গবর্মেণ্টের আদেশ, উপদেশ, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, আশ্বাসবাণী, সহানুভূতি এবং অর্থ সাহায্য সমস্তই অতি শীঘ এবং সহজে প্রজার দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়। জাপানও এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। পরিণামে জাপানের সমগ্র কৃষি প্রজা নানাপ্রকার সভাসমিতি করিয়া সম্মিলিত কার্য্য করিতে শিখিয়াছে। অতি অল্প দিনেই এই সকল সভাসমিতি এরূপ প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে যে কি ফ্রান্স কি জার্ম্মণি এমন কি জগতের আর কোন দেশেই এমন হয় নাই। গভর্মেণ্টের ইচ্ছা কৃষি-বিভাগের দায়িত্ব ধীরে ধীরে প্রজার স্কন্ধে তুলিয়া দেওয়া। কারণ জাপানের ধারণা প্রজার যাহা প্রধান জীবনোপায় ও অবলম্বন তাহার সুবন্দোবিস্ত প্রজাদিগের জন্য না হইয়া প্রজাদিগের দ্বারা হইলেই প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ হয়। প্রকৃত উন্নতি তাহাই যাহা প্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতে অভিব্যক্ত ও বিকশিত হইয়া উঠে।

কৃষিসমাজগুলি ১৯০৫ অব্দের নূতন আইনে বদ্ধ হয়। তাহাতে কোন সভা পৃথগ্‌ভাবে না থাকিয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও একযোগে কার্য্য করিতে থাকে। কতকগুলি গ্রামের কৃষকগণ মিলিত হইয়া একটী গ্রাম্য কৃষি সমাজ (Village Association) গঠন করেন। কতিপয় গ্রাম্য সমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটী জেলা সমিতি (Taluk Association) গঠিত হয়। কতিপয় জেলা সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা একটী প্রাদেশিক সমিতি (Prefectural Association) গঠিত হয়। এই প্রাদেশিক সমিতিগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দ্বারা জাপানের কেন্দ্র কৃষিসভা (Central Agricultural Council) গঠিত হইয়াছে।

এই সকল সভাসমিতি প্রধানতঃ কৃষকদিগের চাঁদা দ্বারা এবং আংশিক সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হয়। ইহাদের বিস্তারিত ও শিক্ষাপ্রদ বিবরণ নিকলসন সাহেব প্রদান করিয়াছেন। আমরা মোটামুটি তাহার একটা আভাষ দিব। এই সমিতিগুলির দ্বারা দেশে কি কি কার্য্য হইতেছে তাহার কার্য্যতালিকা মাত্র দিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কেন্দ্র সভার কার্য্য প্রাদেশিক জেলা ও গ্রাম্য সমিতির সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা এবং সাধারণভাবে সাহায্য দান ও তত্ত্বাবধান করা।

কানাগাওয়ায় একটী প্রাদেশিক সমিতি আছে, উহা ১১টী জেলা সমিতির প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত। সমিতির উদ্দেশ্য :—

(১ কানাগাওয়া প্রদেশের কৃষির অবস্থা, আয় ব্যয়, কৃষিপ্রজা-সংখ্যার অনুসন্ধান করা। (২) কৃষিশিক্ষা দান। (৩) কৃষিবিষয়ক উন্নতি বিধান করা। (৪) কৃষকদিগের ক্ষেত্রকর্ম্ম ছাড়া কৃষিবিভাগীয় অন্যান্য কর্ম্মের উন্নতি বিধান করা (যথা— পুষ্করিণীর মাটী শুদ্ধ বালুকাময় ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা, সবজীবাগের কাজ করা, উত্তম মিশ্র সারের কারবার করা, কূপ বা পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়া ও পালন করা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীর পালন, বৃদ্ধি ও ব্যবসায় করা। (৫) কৃষিসভাসমিতি গঠনে উৎসাহ ও সাহায্য দান করা। (৬) জেলা সমিতিগুলিকে উৎসাহ দান ও তাহার তত্ত্বাবধান করা। (৭) কৃষিসম্বন্ধীয় কোন আবশ্যকীয় ও জরুরি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা।

কোন একটী জেলাসমিতির এক বৎসরের কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ :—

(১) ১১টী গ্রামের মধ্যে ৬০০ বর্গগজব্যাপী ক্ষেত্রে ধান্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা। পাঁচজন পরিদর্শক প্রত্যেক গ্রাম

পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফসলের জন্য প্রদেশপতির পারিতোষিক (Prefect's Prizes) বিতরিত হয়।

(২) কতকগুলি কৃষকের আবেদনে একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রেশমচাষের শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ বক্তৃতা প্রদান ব্যতীত নানা স্থানে ও বিবিধ বিষয়ে ৩৫টী বক্তৃতা দান করা হইয়াছিল।

(৩) প্রত্যেক গ্রামের উৎপাদিকা শক্তি ও কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহার অনুসন্ধান হয়। ৮ জন কমিশনর শুদ্ধ এইজন্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহারা অতি মূল্যবান রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

(৪) বক্তৃতা ও বিতরণ দ্বারা শ্রম-শিল্প-সমাজের পত্রিকার উন্নতিবিধান করা হইয়াছিল।

(৫) গ্রাম্য-সমিতির অনুরোধে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে কতকগুলি বক্তৃতা দান করা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—কৃষিতত্ত্ব ও চারিত্র্যনীতি, ব্যক্তিগত ও সাধারণের কর্ত্তব্য।

(৬) সারে ভেজাল আবিষ্কার। আবিষ্কারের সহজ প্রণালীর প্রচার ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ ও কৃষিবিভাগ দ্বারা ভেজাল দেওয়া সারের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা।

(৭) প্রত্যেক শ্রেণীর কৃষিসভার কার্য্য ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার জন্য সমিতির সম্পাদক পার্শ্ববর্ত্তী জেলায় প্রেরিত হন।

(৮) গ্রামগুলির ভিতর দুটী সাময়িক স্কুল খোলা হইয়াছিল। একটীতে ৫৩, অন্যটীতে ৫৯ ছাত্র হইয়াছিল। একটীতে ধান্যের চাষ ও শারদীয় রেশম চাষ এবং অন্য স্কুলে শাকসবজী উৎপাদন ও বৃদ্ধিকৌশল শিখান হইয়াছিল। ঐ বৎসর আরও একটী সাময়িক বিদ্যালয় ছিল।

(৯) কেন্দ্র কৃষিসভার অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(১০) শারদীয় রেশমের চাষ বিষয়ে উৎসাহদান করা হইয়াছিল। দুইটী গ্রাম্য সমিতির মধ্যে প্রতিযোগী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তথায় জেলাসভা স্বীয় বিশেষজ্ঞকে সাহায্য ও বিচারার্থে পাঠাইয়াছিলেন।

(১১) ধান্য ও যবের ফসল সম্বন্ধে গ্রাম্যসমিতি কর্ত্তৃক প্রতিযোগিতায় সাহায্যদান করা হইয়াছিল।

(১২) প্রতিযোগিতা এবং পারিতোষিক বিতরণ দ্বারা শাকসবজী উৎপাদনে উৎসাহদান করা হইয়াছিল। ঐ বৎসর বেগুন ও শকরকন্দ আলু প্রতিযোগিতার জন্য নির্ব্বাচিত হয়।

(১৩) চাষের ক্ষতিকর কীট ও অন্যান্য উৎপাত নিবারণ বিষয়ক পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছিল।

(১৪) কৃষি, রেশমবিজ্ঞান, বনরক্ষণ বিদ্যা, ফলবৃক্ষের চাষ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদিগের বহুসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হইয়াছিল।

(১৫) সভ্যদিগের জন্য অধিক কার্য্যোপযোগী ও উন্নততর যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য সভাকর্ত্তৃক সভায় বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে একজন সুনিপুণ কারিকর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

(১৬) যাঁহারা কৃষির উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে পারিতোষিক দান করা হইয়াছিল। জনৈক কৃষক বহু বৎসরের অধ্যয়ন ও পরীক্ষার ফলে স্থানীয় অবস্থার সম্পূর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধান্য উৎপাদন করায় তাঁহাকে সম্মান নিদর্শক পারিতোষিক প্রদত্ত হয়।

গ্রাম্যসমিতির কার্য্য প্রধানতঃ এই—

(১) চাষ (Cultivation) (২) প্রতিযোগী প্রদর্শনী (Competitive Exhibitions) (৩) রেশম চাষ (Sericulture) (৪) শিক্ষা (Education) যথা সাময়িক স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের জন্য বক্তৃতা দান, নৈশবিদ্যালয় ও লাইব্রেরী স্থাপন, কৃষিবিবরণী প্রকাশ ইত্যাদি।

(৫) কৃষির অন্তর্ভুক্ত গৌণবৃত্তি অবলম্বন। (Secondary occupations)—যথা মাদুর চ্যাটাই প্রভৃতির জন্য ঘাসের চাষ, চাটাই বুনা, খড়ের বুনট, ফল, চা, গৃহপালিত পশুপক্ষীর চাষ ও তাহার চাষের জন্য ডিম্বের নীড় বিতরণ।

(৬) বিবিধ (Miscellaneous.)—ইহার অন্তর্গত বহু বিষয়ের মধ্যে সভাসমিতির অধিবেশন, প্রধান প্রধান কৃষকদিগকে বিশেষ সম্মান ও পারিতোষিক দান, হাতের যন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কল ভাড়া দেওয়া ও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া অন্যতম।

গ্রাম্য সমিতিগুলিই দেশের কৃষি শিল্পের সমুন্নতির মূল ও প্রধান পরিচালক সুতরাং এগুলির ভিত্তি দৃঢ় করিবার

জন্য জাপানিরা অতীব সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করে। যাহাতে এগুলি দুর্ব্বল, অচল এবং হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য ইহার যাবতীয় বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিতে তাঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট। এজন্য তাহারা বহু অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বহু বাধাবিঘ্ন আবিষ্কার করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। নিকলসন সাহেব নিম্ন উদ্ধৃত ১৪টীর মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) কৃষিবিষয়ে শিক্ষার অভাব এবং দেশাচার বা প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব।

(২) অধিকাংশ জমিদারের উপেক্ষা।

(৩) সভাপতির অযোগ্যতা।

(৪) গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ যাহারা অন্য কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত সেই সকল সভাপতির প্রাদুর্ভাব।

(৫) অর্থের অভাব।

(৬) শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কৃষিতত্ত্বে অজ্ঞানতা।

(৭) ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে স্বার্থ লইয়া বিবাদ।

(৮) অন্যান্য অধিক লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক।

(৯) সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পরযোগে কর্ম্ম করিবার অপ্রবৃত্তি।

(১০) যুবকদিগের উচ্চাভিলাষ ও কর্ম্মান্তর গ্রহণের চেষ্টা।

(১১) সভ্যগণমধ্যে রাজনৈতিক মতান্তর।

(১২) সভাসমিতি পরিচালনে আইনকানুনে গলদ বা ত্রুটি।

(১৩) কর্ত্তৃপক্ষীয়ের উৎসাহদান বিষয়ে অবিবেচনামূলক পদ্ধতি।

(১৪) যাহা স্থানীয় অবস্থার অনুকূল নহে এরূপ উন্নতি বিধানের চেষ্টা।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য যে দেশে অনন্যসাধারণ ন্দোবস্ত আছে, তথায় যে নির্ধন কৃষকদিগকে অর্থসাহায্য রিতে বহুসংখ্যক যৌথ ঋণদান সভা ও কৃষিব্যাঙ্ক প্রভৃতি র্ত্তমান আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইসকল সভা ও াঙ্ক অতি অল্প সুদে এবং নিতান্ত সহজ নিয়মে টাকা ধার য়। মহাজন যথায় শতকরা ২০, হইতে ৪০, টাকা সুদ গ্রহণ করে কৃষকগণ তথায় এই সকল সভা ও ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ১০, টাকা সুদে টাকা পায়। মোট কথা জাপানের কি রাজা কি প্রজা দেশের জন্য চিন্তা করেন, যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ করিতে এবং গ্রহণ করাইতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না, দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণও গবর্মেণ্টের মস্তকে যে ভাবের, যে বুদ্ধির এবং উদ্দেশ্যের উদয় হয় তাহা প্রত্যেক কৃষকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং দেশশুদ্ধ প্রজা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয়। জাপানের সতর্কতা আজি কালি প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়াছে। গত রুষজাপান যুদ্ধে জাপান যে সতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল বলিলেও চলে। প্রত্যেক ইঞ্চি জমির আটঘাট বন্ধ করিয়া, কড়া ক্রান্তিতে আয় ব্যয়ের লাভ লোকসানের হিসাব করিয়া ভবিষ্যতে কি দাঁড়াইবে তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া, রাজা হইতে দরিদ্রতম প্রজার সহিত সম্বন্ধ সূত্রে গাঁথা হইয়া কিরূপে কাজ করিতে হয় জাপান এবং জাপানি লোক জানে। এখানে জাপানি সতর্কতার একটী দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাছে সকল স্কুল কলেজ, সভা সমিতি, বিধিবন্দোবস্ত সত্ত্বেও, ভেজাল দেওয়া সার ব্যবহারে কৃষিক্ষেত্রগুলির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বা অন্য কোন অনিষ্ট হয় তজ্জন্য এরূপ আইন করা হইয়াছে যে প্রত্যেক সার প্রস্তুতকারী ও ব্যবসাদারকে লাইসেন্স লইতে হইবে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যে কোন সময়ে ইন্‌সপেক্টর পাঠাইয়া মাল পরীক্ষা করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি সারে ভেজাল দিবে অথবা জ্ঞাতসারে ভেজাল দেওয়া সার বিক্রয় করিবে তাহার ১৫ দিন হইতে এক বৎসরের কারাদণ্ড বা ৪৫০, টাকা জরিমানা হইবে। তাহার সমস্ত মাল সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। উক্ত আইন প্রতিপালিত হইতেছে কি না দেখিবার জন্য একশতজন পরিদর্শক ভিন্ন ভিন্ন জেলায় নিযুক্ত আছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য রাসায়নিক নিযুক্ত আছেন। তাহাদের বেতন বাবদ ১৯০৩ অব্দে ২২১৯০০, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জাপানের বিস্ময়কর সতর্কতা ও দূরদর্শিতার ইহা অন্যতম দৃষ্টান্ত।

নিকলসন সাহেব বলেন জাপানী কৃষক ও জমিদারবর্গ গবর্মেণ্টের প্রস্তাবের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনারাই কোন

হিতকর বিষয়ে পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা স্বয়ং চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দেশের অভাব, সময়ের গতি, সভাসমিতি ও শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে রত হন। জাপানের জাতীয় দূরদৃষ্টি ও আত্মনির্ভরশীলতার স্বতঃপ্রবৃত্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত জাপানি কৃষির ইতিহাস। এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এমন সমুন্নত আদর্শ গৃহদ্বারে থাকিতে কৃষিগত-প্রাণ ভারত অসাড় হইয়া থাকিবে?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সমসাময়িক ভারত।

(পিরিউর ফরাসী হইতে)

গ্রাম্য-ভারত।

১

যে ভারত স্বকায় চিরন্তন নিশ্চলতার দ্বারা, কালের গতিকে প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে সেই লৌকিক ভারতকে যদি দেখিতে চাও, তবে ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত মেঠো রাস্তা ধরিয়া চল;—যে রাস্তায় চলিতে চলিতে তুমি জঙ্গলে বেষ্টিত হইয়া পড়িবে,-- সেই গরুর রাস্তা, সেই হাতীর রাস্তা।

হিন্দুগ্রামের দৃশ্য অনন্যসাধারণ। যে মাটীর দেয়াল, গ্রামকে প্রতিবেশী হইতে— মাঠময়দান হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, বিদেশীয় কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছে, মনে হয় যেন সেই দেয়ালই, গ্রামের সামাজিক জীবনকে, ধর্ম্মের জীবনকে, আর্থিক জীবনকে, পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে চিরকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার সাদৃশ্য আর কোথাও নাই-- এমন কি, যে দেশের সভ্যতা অনেকটা কাছাকাছি,- সেই সব দেশের মধ্যেও নাই। এই গ্রাম্য সভ্যতার আকার গঠন অতীব জটিল, অতীব নিয়মবদ্ধ, অতীব সুশৃঙ্খল; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন অতীব সুকুমার ও ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু এই গ্রাম্য পদ্ধতিই—কি অভ্যন্তরের, কি বাহিরের— সর্ব্বপ্রকার আক্রমণকেই প্রতিরোধ করিয়াছে, হটাইয়া দিয়াছে। ইহার নিয়মগুলি কতকটা বন্ধনসূত্রের ন্যায় ইহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অভ্যন্তরে,—পরিবর্ত্তনের কোন ইচ্ছা নাই, উন্নতির কোন মৃগতৃষ্ণিকা নাই, পথের কোন ক্ষয় নাই; এবং বাহিরের আঘাত, বাহিরের আক্রমণ, এই গ্রাম্যতন্ত্রকে ছিন্ন করিতে পারে নাই-- বরং উহাকে আরও দৃঢ়িষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত আর কোন সমাজে পাওয়া যায় না (আমি উন্নতিশীল সমাজের কথা বলিতেছিনা) পরন্তু যে জনসমাজ এইরূপ স্বাভাবিকরূপে অবরুদ্ধ, অপরিবর্ত্তনীয়, চিরন্তন, তাহারই কথা বলিতেছি।

ভারতীয় গ্রাম, শুধু যে পুরাতত্ত্বের হিসাবে আমাদের কৌতূহল উৎপাদন করে তাহা নহে; ইহা এখনও সমসাময়িক ভারতের সামাজিক কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ লোক— শতকরা ৯০ জন— গ্রামেই বাস করে। নাগরিক লোকের বিপুল সঙ্ঘ অতীব বিরল। কলিকাতা ও বোম্বায়ের অধিবাসী ৮ লক্ষের অধিক নহে নিউ-ইয়র্ক ও লণ্ডনের তুলনায়, কিংবা চীনের বিপুল মানব-মৌচাকের তুলনায়, এই সংখ্যা অত্যন্ত কম। ক্যাণ্টন্-নগরে যাহারা জলের উপর বাস করে, শুধু তাহাদেরই সংখ্যা ৮ লক্ষ। এ দেশে ব্যবসায়াদি বিনষ্ট হওয়ায় অনেক লোকে বাধ্য হইয়া কৃষিক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়াছে—বেকার লোকেরা কৃষি-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। তাই, প্রায় সমস্ত ভারতের লোক— যাহারা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে— তাহারা গণ্ড গ্রামেই বাস করে। এই সকল গণ্ডগ্রাম, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, দুর্গবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসনাধীন;— ইহাদের জনসংখ্যা, স্থল বিশেষে ১০০ হইতে ২০০০। ইহা একটি গুরুতর তথ্য। যে জনসমাজ এরূপ সুরক্ষিত, এরূপ অষ্টেপৃষ্ঠে অবরুদ্ধ যে, বাহিরের বাতাসও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না,— অবশ্য এরূপ জনসমাজ হইতে ভাবী-ভারত কখনই বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না। স্বাভাবিক যুক্তির বিরোধী হইলেও, এই অবিকৃত লৌকিক সমাজের গঠনপ্রণালী পণ্ডিত-মণ্ডলীর অনুশীলনের যোগ্য বিষয়। অবশ্য যুক্তিশাস্ত্রের হিসাবে, ইহা একটা জীবন্ত অসঙ্গতি,—পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য; ইহা জীবন ও পরিবর্ত্তনকে যেন এক করিয়া ফেলিয়াছে।

এই অদ্ভুত সমাজ গঠন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শান্তভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই বিষয় লইয়া, ঐতিহাসিক, ও ব্যবস্থা-শাস্ত্রজ্ঞেরা এখনও যুদ্ধ করিতেছেন। কেননা, মেন্-সাহেবের মতানু-

সারে, এই হিন্দু গ্রাম-তন্ত্র মানবসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আদর্শ, এবং ইহাই সমবেত ভূসম্পত্তির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই মত কতদুর সত্য তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। দুই তিনটি জাজ্বল্যমান ও অবিসম্বাদিত তথ্য হইতে এই মতবাদটি উৎপন্ন হইয়াছে। তথ্যগুলি এই—গ্রাম-পুঞ্জের ঘন সংহতি; গ্রামের অবিভক্ত ভূসম্পত্তি, ভূমির সাময়িক হস্তান্তরকরণ-পদ্ধতি মেন সাহেবের এই সম্ভবপর চিন্তাকর্ষক অভিনব মতবাদটি প্রচারিত হইবামাত্রই সকলে গ্রহণ করিল। অধুনা, Baden Powel সাহেব যে সকল তথ্য ও যুক্তি মেনের অজ্ঞাত ছিল, সেই সকল তথ্য ও যুক্তির দ্বারা এই মতবাদের ভিত্তিমূল ভগ্ন করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি, এমন কতকগুলি তথ্য আছে, যাহা অতিসূক্ষ্ম সুচতুর ব্যাখ্যার সাহায্যেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ভূমির সাময়িক হস্তান্তরকরণ এই সকল তথ্যের মধ্যে একটি। "সমবেত ভূসম্পত্তি"—এই কথাটায় কি তুমি শিহরিয়া উঠিলে? আচ্ছা, না হয় ইহাকে কোন বংশবিশেষের ভূসম্পত্তি বলা যাইতে পারে; ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকারের উপরে বংশগত স্বত্বাধিকার; ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বাধিকারকে বংশবিশেষ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে, কপুরথালা-রাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। উত্তর-ভারতে, নীহার-মণ্ডিত হিমাচলের পাদদেশে, একজন শিখ্ রাজা—একজন মহারাজা আছেন,—তিনি আমাদের দেশকে বড়ই ভাল বাসেন, আমাদের দেশে অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন, আর একথা ফরাসীরা সকলেই বেশ জানেন। যখনই কোন ফরাসী ভারতে ভ্রমণ করিতে আইসে,—তিনি তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং তাঁহার আদর আতিথ্যেরও কোন ত্রুটি হয় না। সেরূপ আতিথ্য রাজাদের পক্ষেই সম্ভব।

অভ্যাগতদিগের জন্য একটি, অতিথি-গৃহ আছে; এবং আমি শুনিয়াছি, কোন কোন ব্যক্তি সেখানে আসিয়া কিয়ৎ সপ্তাহ পর্য্যন্ত আড্ডা গাড়িয়া থাকেন, অথচ আগমন ও প্রস্থান কালে, রাজার সহিত একবারও সাক্ষাৎ করেন না। আমি কপুরথালায় এইরূপ একজন পরান্নপুষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম—তিনি জাতিতে আইরিশ্। হোটেল হইতে হোটেলান্তরে যাইবার মত, এই সব পরান্নভোজীরা, এক রাজার দরবার হইতে আর এক রাজার দরবারে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহারা তিব্বতে যাত্রা করিবে বলিয়া যতদিন না হিমালয়ের বরফ গলিয়া যায়, ততদিন এই সমস্ত সুখ-নীড়ে আরামে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। আমি বোধ করি, তাহার পরেও আরও কিছু কাল অপেক্ষা করে।

রাজা, আমার ব্যবহারের জন্য কতকগুলি গাড়ী, কতক-গুলি হাতী এবং আমার সাহায্যের জন্য একজন দোভাষী আমার নিকট রাখিয়া দিলেন; ইনি একজন চন্দননগরের স্থূলকায় বাবু, কপুরথালার কালেজে ফরাসী ভাষার শিক্ষা দেন।

কপুরথালার রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি পথ আছে। "হিজ্-হাইনেস্" (আমার বাবু ভক্তিভাবে এই উপাধিটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন) নিজেই রাজ্যশাসন করেন। হিজ্-হাইনেস্ একজন দেশ পর্য্যটক, ইহাই তাঁহার একটি ব্যসন। কিন্তু ইহারই দরুণ, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে আমাদের সমস্ত য়ুরোপীয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং সাধ্যমত তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়া থাকেন।

যেখানে যাইবার পথ নাই, সেই পথের অভাব হাতী সেইখানে পূরণ করিয়া থাকে। এই হাতী যেমন উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক, তেমনি চিত্তবিনোদন ভ্রমণ-সহচর! এই হাতী আগে আগে জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলে, ডালপালা অপসারিত করে, সর্পদিগকে পদদলিত করে, উচ্চ ঢালু জমি দিয়া উপরে আরোহণ করে, সাঁতরাইয়া নদী পার হয়, শুঁড় দিয়া জলের গভীরতা নির্দ্ধারণ করে; হাতী বেশ দেখিয়া শুনিয়া পথ চলে, এই হাতীর পথ বেশ নিরাপদ⋯পঞ্জাবের এই অংশটি আমাদের La Beance অপেক্ষাও সমতল। আমার এই দোদুল্যমান মান-মন্দির হইতে, চতুর্দ্দিকের অসীম ক্ষেত্রভূমি এবং বহু দূরে, উত্তরাভিমুখে, দীর্ঘপ্রসারিত একটা ধবলপিণ্ড দেখিতে পাইতেছি:—ইহা হিমাচলের প্রথম অধিত্যকা। মাঠের তৃণাদি একেবারে মুড়াইয়া কাটা। আজ ১০ই জানুয়ারী। জমিতে লাঙ্গলের একটিও কর্ষণ-রেখা নাই, একটিও আইল নাই, উদ্ভিজ্জের চিহ্নমাত্র নাই; কেবল দিগন্তদেশে কতকগুলা পুঞ্জীকৃত শীর্ণ তরু—ক্ষেত্রভূমির সাধারণ সমতল হইতে একটু উচ্চে অবস্থিত। আমার বাবু বলিলেন,—"ঐ যে স্থানটি দেখা যাইতেছে,

উহা একটি গ্রাম; ছিজহাইনেসের এলাকার একটি বড় গ্রাম।" সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। ক্ষেত্রটি মরুভূমির মত। কোন জনপ্রাণী দেখা যায় না। এখন চাষের মৌসম নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমাদের দেশে যাহা অনেক দেখা যায়—এখানে সমস্ত দিন পথ চলিয়াও হয়ত সেইরূপ একটি নিঃসঙ্গ কোঠাবাড়ী, একান্তে-অবস্থিত একটি ক্ষেত্রভূমি কিংবা একটি নিসঙ্গ কুটীর দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি 'ক্ষাওলা পড়া' ক্ষুদ্র দেবালয়ের চতুষ্পার্শ্বে এই তিনটি গৃহ পঞ্জীভূত—না, ইহাই গ্রাম; এখানকার লোকেরা এই দুর্গবদ্ধ গৃহগ্রামের আশ্রয়ে বাস করে। তাহাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া, দেশ আক্রমণকারী কত দস্যুর দল চলিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

আমার হাতী, একটা নদী পার হইয়া গেল; তাহার শুণ্ডের সশব্দ ফুৎকারে, জলের মধ্যে এক একটা গর্ত্ত খোদিত হইয়া ছোট ছোট জলস্রোত রচিত হইতে লাগিল। কার সঙ্গে কারবার বুঝিয়াই যেন নদীটি তাহার দুই পাশের কালো জলরাশি সভয়ে সরাইয়া দিতে লাগিল। হাতী তাহার সতর্ক ও সুনম্য শুণ্ড দিয়া নদীর কর্দ্দমরাশি টিপিয়া টিপিয়া তন্নতন্নরূপে পরোখ করিতে করিতে চলিয়াছে। যখন হাতীটার পায়ের থাবাগুলা মাটীর মধ্যে বসিয়া যাইতে লাগিল,—আমার মনে হইল এইবার বুঝি হাতীটা ফাঁদে আটকাইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা আদৌ নহে; সেই কালো কালো কর্কশ থাবাগুলা এক একবার উঠাইতেছে, আবার একটু দূরে মুদগর-হাতুড়ীর ন্যায় ভূমির উপর ফেলিতেছে,—অথচ সমস্ত দেহপিণ্ডটা সমানভাবে দুলিতে দুলিতে চলিয়াছে।

আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, লম্বরদারের সহিত গ্রামের প্রধানেরা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামটি এঁটেলমাটীর উপর অবস্থিত; ক্ষেত্রভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বহির্ভাগে, একটা শতবর্ষী বটবৃক্ষ, তাহার প্রত্যেক শাখা হইতে শিকড় নামিয়াছে; যাহারা জাতের বিচার ব্যবস্থা করে সেই পঞ্চায়ৎকে, ছোট ছোট বিচারালয়ের বিচারপতিদিগকে, এই বৃক্ষটি স্নিগ্ধ ছায়া বিতরণ করে...ইহা একটি সর্ব্বসাধারণের সমাগমস্থান। একটু বাঁ দিকে, গ্রামের বাহিরে, কৃষি-যন্ত্রগুলি, কাঠের লাঙ্গল, চাষের মই, এলোমেলোভাবে পড়িয়া রহিয়াছে—যেন এইগুলি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি।

তাহার পর, লম্বা এক সারি গরু ও বলদ—দুধে-কাফির রং, শীর্ণ ও সুশ্রী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রং-করা সিং, কিংবা শিঙের অগ্রভাগ তামার চাকৃতি দিয়া মণ্ডিত,—সিংগুলা কাঁধের উপর বাঁকাইয়া রহিয়াছে কিংবা, সোজা হইয়া উঠিয়াছে—চাঁচা, বাঁকা, বলয়াকার রেখার দ্বারা অঙ্কিত... ইহারা দুধের গরু, ককুদ্মতী গাভী, বলবান বলদ, কৃষিভূমির ও গ্রাম্য দেবতাদিগের শ্রমজীবী পশু! এই গ্রাম্যদেবতাদের কোন মন্দির নাই এবং এই শ্রমজীবী পশুদেরও জন্য কোন গো-শালা নাই। বোধ হয় তাহার কারণ, গ্রামটি দরিদ্র, অথবা এই গরম দেশে অনাবৃত স্থানে থাকাই বেশী আরামের।

আমরা এই দুর্গবদ্ধ চত্বরটির চারিদিক ঘুরিয়া আসিলাম। একটি মাটীর প্রাচীর, পুরু ও প্রায় দশগজ উচ্চ, প্রাচীরের স্থানে স্থানে বুরুজ, প্রাচীরের গায়ে গোবরের চাপ বসানো; সমস্তই কাপড়ে আচ্ছাদিত;—এই কাপড়গুলা প্রাচীরের উপর শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে, মাটীর কুঁড়েঘর; পুঞ্জীকৃত কুঁড়েগুলির ছাদ সমতল, উচ্চতায় প্রায় প্রাচীরেরই সমান; গঠন নিতান্তই আদিম ধরণের, দেখিলে মনে হয় যেন 'লিলিপুটের' নগর—যেন শিশুদের নির্ম্মিত খেলনা-ঘর, উহাতে কোন শিল্পনৈপুণ্য নাই... "লম্বরদার" দ্বারদেশে আসিয়া নতমস্তকে ও কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। আঁকাবাঁকা গলিরাস্তা দিয়া আমরা তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। গলিগুলা এমনি সরু যে সম্মুখে দুইজন করিয়া কোন প্রকারে চলা যায়। প্রধান গলির ভূমিটা একটু উচ্চ এই গলির দুই ধারে, দেয়ালে-দেয়ালে সংলগ্ন গৃহসমূহ; বড় বড় গোয়াল-ঘরের সম্মুখে একটা উঠান—সিঁড়ি দিয়া এই উঠানে উঠিতে হয়। উঠানে রমণীরা কাট্‌না কাটিতেছে। খুব বলবান দুইজন চাষাকে দেখিলাম—উহারা পাথরের হামামদিস্তায় কাঠের মুগুর দিয়া শস্য গাড়িতেছে। গৃহগুলা একতলা, এক-একটা ঘর, সমতল ছাদ, "চিম্‌নি" (ধূমনল) নাই, জান্‌লা নাই, কোন আসবাব নাই। রন্ধন খোলা-জায়গায় হইয়া থাকে। যাহাদের অবস্থা একটু সচ্ছল,

তাহাদের কুটীর-গৃহের সম্মুখে এক-একটা দড়ি-বোনা চারপাই খাট্ আছে,—ইহাই তাহাদের রাত্রের পর্য্যাঙ্ক ও দিনের সুখাসন।

হিন্দুগ্রামের একটি দ্রষ্টব্য জিনিস—কুম্ভকার। প্রত্যেক গ্রামেরই এক একটি নিজস্ব কুম্ভকার আছে। মাটীর হাঁড়ী একবার ব্যবহৃত হইলেই তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। এই জন্যই কারিগরদিগের এত খদ্দের, এবং এই জন্যই উহারা এত নিপুণ। অনেকবার আমি এই কারিগরদিগের (কারিগর না বলিয়া উহাদিগকে শিল্পী বলাই সঙ্গত) সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি কতবার উহাদের কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়াছি। একজন পাশ্চাত্যের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে গর্ব্বিত হইয়া উহারা উৎসাহের সহিত অসাধারণ নৈপুণ্য আমার নিকট প্রদর্শন করিল। গ্রামের লোকেরা, যে কুম্ভকারের গৃহে আমাকে লইয়া গেল, দেখিলাম সেই গৃহের অঙ্গনে স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অঙ্গনের বাঁ-দিকে কতকগুলি গুলি, কতকগুলি মাটীর গোলা এবং শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত হাঁড়ী ও কলসীর কতকগুলা 'পেট্'—এই পেট্গুলা, হাতল ও কাঁধার সহিত যুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একটা ছাঁচ যাহাকে পায়ের এক চাপে খুব দ্রুতগতিতে ঘুরাইয়া দিতেছে—এবং একটা ছোট কাঠী;—শিল্পীর এই দুইটি মাত্র যন্ত্র। যে সময়ে ছাঁচ্টা ঘুরিতেছে, (যে পা) হাতের মতনই সমান দক্ষ সেই পায়ের চাপে কখনও শীঘ্র, কখন আস্তে) সেই একই সময়ে কাঠীটা, মৃৎপিণ্ডটাকে খুলিতেছে, গড়িতেছে, গোলাকারে পরিণত করিতেছে, মসৃণ করিয়া তুলিতেছে···এবং বড়ই আশ্চর্য্য, ঐ মায়া-কাঠীর সংস্পর্শে উহা কেমন থাল হইয়া যাইতেছে, পাতলা হইয়া যাইতেছে, উহার মুখ খুলিয়া যাইতেছে, উহা বিভিন্নরূপ ও বিভিন্ন গঠন ধারণ করিতেছে··· কুম্ভকার স্মিতহাস্য সহকারে, সগর্ব্বে মৃৎপাত্রটি তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইতেছে। কতকগুলি শিশু কুম্ভকারকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; এবং এই বৈদেশিকের কৌতূহলে বিস্মিত হইয়া উহাদের মখমল-কোমল বৃহৎ আর্দ্র নেত্র বিস্ফারিত করিয়া রহিয়াছে।

গ্রামের প্রধানদিগকে আমার বাবু কি প্রশ্ন করেন একবার শোনা আবশ্যক। বাবু যে রকম ফরাসী বলেন তাহাতে তাঁহার চন্দননগরের গন্ধ যোজনপথ হইতেও উপলব্ধ হয়। বাবু তাহাদের প্রত্যুত্তর আমাকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছিলেন। বাবু বলিলেন, "এই একটি গ্রাম, ইহাতে একটি পরিবার বাস করে, এবং ইহাদের শিখধর্ম্ম।" আমার ত প্রচুর জ্ঞান লাভ হইল! এই গ্রামটি এবং ইহার চতুষ্পার্শে যে ভূমিখণ্ড আছে তাহা একটি বংশবিশেষের সম্পত্তি। ঐ বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা এই মধুচক্রটি রচনা করিয়াছে। এখানকার সকল চাষাই এ একজন সাধারণ পূর্ব্বপুরুষের নাম করে। এই গ্রামটি উহাদের অবিভক্ত যৌথ সম্পত্তি।

উহারা ব্রাহ্মণ্যিক সম্প্রদায়ভুক্ত নহে; উহারা একটি একেশ্বরবাদ সম্প্রদায়ভুক্ত। চারি শত বৎসর হইল, উত্তর-প্রদেশে নানক এই সম্প্রদায় স্থাপন করেন। শিখেরা সংখ্যায় প্রায় দুই কোটী। ভারতবর্ষের অন্য অংশে যেরূপ জাত-সংক্রান্ত অন্ধসংস্কার, ইহাদের মধ্যে ততটা নাই। ইংরাজ সরকার, এই বলবান ও সাহসী জাতি হইতে উৎকৃষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই শিখজাতি হইতে দুই পল্টন সৈন্য রাজাও গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে এক পল্টন, গত আফগান যুদ্ধে নিহত হয়।

এই আত্ম-পর্য্যাপ্ত গ্রামটিতে, রাজ মিস্ত্রী, ছুতার মিস্ত্রী, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, প্রভৃতি সকল ব্যবসায়েরই কারিগর আছে। আমি একটি দরিদ্রকুটীরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে দ্বার ছাড়া আর কোন পথ দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না। একজন লোক নত হইয়া মাকু চালাইতেছে, তাহার অৰ্দ্ধ-শরীর একটা চৌকোণা গর্ত্তের মধ্যে নিমজ্জিত। উহার কলাকৌশলটি যার-পরনাই আদিম ধরণের। একটা ফ্রেম্, কতকগুলা কাঠের পায়ার উপর স্থাপিত এবং কাপড়ের 'পড়েন' সূতাগুলা, একটা চলন্ত কাঠির দ্বারা পৃথক্ করা হইতেছে। গ্রামের এই তন্তুবায়, খুব বাহার দিয়া একটা লাল কোর্ত্তা পরিয়াছে;—এই পরিত্যক্ত পুরাতন পরিচ্ছদটা বোধ হয় কোন ইংরাজ সৈনিকের নিকট ক্রয় করিয়াছে!

গ্রামের দেবালয়টি কোথায়? গ্রামের কিনারায়—প্রাচীর বুরুজের নিকট। আমার বাবু আমাকে তাড়াতাড়ি সেখানে লইয়া গেলেন; কেন না, আমার প্রশ্নাদির ভাবে তিনি বুঝিলেন, (এবং বিস্মিতও যে হন নাই তাহা নহে) ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে আমার কতটা ঔৎসুক্য, এবং সেই সঙ্গে

তাঁহার নিজেরও এবিষয়ে কতটা অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য তাহাও কতকটা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। দেবালয়টি এই সময়ে জনশূন্য। ইহা একেবারেই লগ্ন,—কোন যজ্ঞবেদী নাই, কোন মূর্ত্তি নাই; এবং ইহা মস্‌জেদের আকারে গঠিত। হিন্দু দেবালয়ের সহিত কতটা তফাৎ—হিন্দু দেবালয়ে, রমণীরা কিংখাপের পরিচ্ছদে বিভূষিত পুত্তলিকার নিকট পিষ্টক ও ফুল লইয়া আইসে;—সেই গণেশ—হস্তীমুণ্ড দেবতা, বিশাল নগ্ন লম্বোদরের উপর যাহার বাহুদ্বয় বিন্যস্ত এবং আমার পাণ্ডার কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয় গণেশের পিতার এক চপেটাঘাতে গণেশের নাসিকা গজশুণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু মন্দিরটি একেবারেই শূন্য নহে। আমি কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—যেন তাহারা গান করিতেছে। উহারা কি মন্দিরের পুরোহিত? না, কতকগুলি অল্পবয়স্ক বালক উবু হইয়া বসিয়া আছে,—হাতে এক তাড়া তালপত্র; ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দুলিয়া দুলিয়া তার-স্বরে চীৎকার করিতেছে···উহারা পড়া শিখিতেছে। এই বেচারীরা, কৃষিকার্য্যে অশক্ত, দুর্ব্বল, খঞ্জ ও কুব্জ এবং উহাদের গুরু, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত ভাবে এক কোণে বসিয়া আছে এবং বালকদিগের এই শোকসূচক অবৃত্তি-সঙ্গীতের প্রতি একেবারেই বধির ও উদাসীন। আমি আসিবামাত্রই এই সুতীব্র ঝিল্লি-সঙ্গীত বাড়িতে লাগিল এবং বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে সপ্তমে চড়িল।

"লম্বরদার" অভিজাত ব্যক্তির ন্যায় শিষ্টতাসহকারে আবার আমাকে হাতীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। বিদেশী সাহেবের প্রস্থানকালে, প্রায় সমস্ত গ্রাম সেখানে উপস্থিত; কীটবৎ নগ্ন শিশু, কামিজ-পরা বালক; পূর্ণবয়স্ক লোক—দীর্ঘকায়, বলবান, গায়ের রং শাদা, নীল চোখ্। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল, তাহার টকটকে-লালরঙের শ্মশ্রু সে হাত দিয়া ঢাকিয়া আছে এই শ্মশ্রু কাক্‌-স্ক্রুর মত প্যাঁচালো এবং তাহাতে এক পোঁচ মোম্‌রওগান লাগানো। আমার পাণ্ডা বলিলেন,—"ইনি একজন সৌখীন লোক, ইনি দাড়ি রং করেন; কারণ, রমণীরা এখন আর ইহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। এখন এইরূপ লাল, একমাস পরে ইহা চিক্‌চিকে কালো হইয়া দাঁড়াইবে।" উপস্থিত লোকেরা, আমাদের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, খুব হাসিয়া উঠিল এবং এই সময়ে আমাদের বুড়ো মদনটি হাত দিয়া মুখ ঢাকিল।

পাঠকের যদি অনুমতি হয়, আমি আমার হাতী ও আমার অনুগামীবর্গকে বিদায় দিয়া, এক্ষণে গ্রামের ঐতিহাসিক, আর্থিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি।

ইহা বলা বাহুল্য,—ভারতের সকল গ্রামই যমক-সন্তানের ন্যায় একরূপ নহে। আমরা এখন পঞ্জাবের গ্রামে প্রবেশ করিয়াছি। মনে কর যদি আমরা বাঙ্গলা কিংবা দাক্ষিণাত্যের কোন গ্রামে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমরা কিরূপ ভাবে গ্রামের চিত্র আঁকিতাম? হয় ত অগত্যা দুই একটি নূতন রেখা যোগ করিয়া দিতে হইত, দুই একটি পুঁছিয়া ফেলিতে হইত, হয় ত গৃহনির্ম্মাণের প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতাম—চুনকাম-করা ছাদ কিংবা তাল-পাতার কথা বলিতাম; কিন্তু তুলিকার এইরূপ দুই একটা পুনঃস্পর্শ থাকিলেও, মোটের উপর চিত্রের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে না। ইহাও কম আশ্চর্য্যের কথা নহে—যে দেশের ভূমি, আব্‌-হাওয়া ও জাতির মধ্যে এত বৈচিত্র্য, তাহার মধ্যে তবুও একটা আদর্শগত একতা—একটা অভিন্নতা বিদ্যমান!

গ্রাম-শব্দের ঠিক্ অর্থটি কি এক্ষণে তাহাই নির্ণয় করা যাউক; সচরাচর যে অর্থে এই শব্দটি গৃহীত হয়, সেই অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে, ভ্রমে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমরা যে দুর্গবদ্ধ পুঞ্জীকৃত সমষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সেই গ্রাম আমাদের চোখে একটি পল্লী কিংবা কতকগুলি কুটীর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার অর্থ আরও কিছু বেশী।

আমরা যে গণ্ড-গ্রামটি দেখিতে গিয়াছিলাম উহা, বিভক্ত কিংবা অবিভক্ত একটি কৃষি-সম্পত্তির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং উহা ঐ সম্পত্তিরই অধিকারভুক্ত। গ্রামের ভূসম্পত্তি গ্রামের সহিত অনুবদ্ধ। একটিকে ছাড়িলে অপরটির অস্তিত্ব থাকেনা—এমন কি কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং, গ্রামকে হস্তান্তর না করিলে, তৎসংলগ্ন ভূসম্পত্তিও হস্তান্তর করা যায় না; ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা, বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারীগণকে অপসারিত করা যায় না; উহার

দ্বারা শুধু,—আর একটি নূতন স্বত্বাধিকার,—শ্রেষ্ঠতর স্বত্বাধিকার,—পুরাতন স্বত্বাধিকারের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় এই মাত্র। মনে কর, ভারত যেন একটি বিশাল শতরঞ্জের ছক—অসংখ্য চৌকায় বিভক্ত। মনে কর, এই চৌকাগুলি—গ্রাম্য এলাকা ও তন্মধ্যস্থ গ্রাম।

গ্রামের এই যে কৌতূহলজনক বিশেষ ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা ইহা বুঝিবার পক্ষে উপরে যাহা বলা হইল তাহাই বোধ হয় যথেষ্ট। এই কৃষিভূমিই গ্রামকে স্বাধীন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেই হয়। এই গ্রামসংলগ্ন কৃষিভূমি হইতেই যখন শ্রমজীবীরা জীবিকা লাভ করিতেছে, সকলেরই যথেষ্টপরিমাণে অন্নসংস্থান হইতেছে, তখন আর কিসের অভাব? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কিজন্য কৃষিই গ্রামের একমাত্র অবলম্বন।

যখন ভারত বিবিধ জাতি ও বংশের দ্বারা প্রথমে অধ্যুসিত, পরে আক্রান্ত ও বিজিত হয়—সেই গোড়ার ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ক্ষুদ্র সমাজগুলির জন্মবৃত্তান্ত জানিবার পক্ষে কতকটা সাহায্য হইতে পারে। মনে কর, একটা অনির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। একদল লোক যাহারা ভাগ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত, একদল লোক যাহারা মূল-বংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযাছে, হয়ত তাহার মধ্য হইতে একটি পরিবার কিংবা দুইটি পরিবার একত্র মিলিত হইয়া সেই ভূমিখণ্ড অধিকার করিল এবং সেখানে তাহাদের কুটীর ও দেবতা আনিয়া স্থাপন করিল। এই আদিম পরিবারগুলি, কিংবা সমবেত পরিবারগুলি, জঙ্গলের মধ্যে জমি লইয়া ও তাহা আবাদ করিয়া সেই জমি, প্রচলিত প্রথানুসারে, আপনাদের মধ্যে অংশে-অংশে বণ্টন করিয়া লইল, এবং যে পরিমাণে এই অভিনব মধুচক্রের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে উহার সীমানাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এমন একটা সময় আসিল যখন এই মধুচক্রে লোক বেশী হইয়া পড়িল এবং সেই সংকীর্ণ স্থানে আর তাহাদের সংকুলান হইল না, এবং পার্শ্ববর্ত্তী উপনিবেশগুলির সীমানাতেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহাদের মধ্যে আবার একটা দল, সেই জঙ্গলের মধ্যে পূর্ব্ব-গ্রামেরই অনুরূপ আর একটি অভিনব গ্রাম স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল।

গোড়ায়, কর্ষণযোগ্য ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিশাল কৃষিক্ষেত্র, একটি ক্ষুদ্র দল কর্ত্তৃক স্থাপিত ও কর্ষিত হয়; ইহাই গ্রাম;—ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং গোড়ায় যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। পরে উহাতে একদল কারিগর ও ভৃত্য সংযোজিত হইল, কিন্তু উহারা গ্রামেরই অধীনে থাকিয়া শুধু চাষাদের অভাব মোচনেই নিয়োজিত হইল। গ্রামের প্রান্তদেশে উহাদিগকে স্থান দেওয়া হইল, এমনকি কেহ কেহ গ্রামের বাহিরেও প্রেরিত হইল; গ্রাম্যসমাজের কার্য্যপরিচালনায় তাহাদের কোন হাত নাই। গ্রাম—কৃষক পরিবারদিগেরই নিজস্ব অধিকার; কেননা, তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ গ্রাম স্থাপন করিয়াছে।

এই দুর্ভাগ্য দেশের উপর মধ্যে মধ্যে যে সকল বৈদেশিক আক্রমণ হইয়া গিয়াছে,—এই আদিম গ্রাম্য সমাজ সেই সব আক্রমণ আশ্চর্য্যরূপে প্রতিরোধ করিয়াছে। সেই সকল আক্রমণের ফলে, ভূস্বামীরা স্থানচ্যুত হয় নাই। আদিম গ্রাম্যসমাজ, যে গ্রামের সহিত আবদ্ধ ছিল, সেই গ্রামেই তাহারা রহিয়া গেল; তবে, কখন কখন এইরূপ অদ্ভুত ঘটনাও হইয়াছে যে, শেষাগত কোন একটি ঔপনিবেশিকের দল, কোন একটি গ্রাম দখল করিয়া, সেই গ্রামবাসীদিগকে অধীন রায়তরূপে (দাসরূপে নহে) পরিণত করিয়া, আর একটি নূতন স্বত্বাধিকারের,—উচ্চতর স্বত্বাধিকারের সৃষ্টি করিল। মনে কর একটি তৃতীয় দল আসিয়া গ্রামটিকে অধিকার করিল। পূর্ব্বে যাহারা প্রধান ভূস্বামী ছিল, এক্ষণে তাহারাই আবার রায়তপদবীতে নামিয়া আসিল; এই রায়তদিগের অমুক অমুক স্বত্ব, অমুক অমুক অধিকার রহিয়া গেল—পূর্ব্ববর্ত্তী রায়তের স্বত্বাদি হইতে তাহারা বিচ্যুত হইল না। পক্ষান্তরে, শেষ-আগন্তুকেরা উপরিতন ভূস্বামী হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামের উপরিতন ভূস্বামী স্বয়ং ভূমির চাস করিতেছে ইহা কার্য্যতঃ প্রায় দেখা যায় না। সে আবার ঐ জমি অন্য রায়তকে বিলি করে; অধিকাংশ স্থলে ভূস্বামীকে তাহারা খাজনা দেয়। রায়তেরা, এমন-কি পেটাও-রায়তেরাও দখলীস্বত্ব ভোগ করে। উহারা স্বকীয় পৈতৃক স্বত্ব দান-বিক্রয় করিতেও পারে। হয়ত এই স্বত্বটি শুধু একমুঠা জোয়ারী,—ফসলের কিঞ্চিৎভাগ মাত্র। বোধ

করি, ইহা হইতেই স্বত্ব দর-স্বত্বের এতটা জটিলতা উৎপন্ন হইয়াছে ; যেন-তেন-প্রকারেণ এই সকল স্বত্বের সমন্বয় হইয়া থাকে— কিন্তু কোন স্বত্বই একেবারে বর্জ্জিত হয় না।

তাহার ফল এই হয়,—ভূমি অসংখ্য প্রকার স্বত্বে আবদ্ধ, ভারাক্রান্ত, এবং অফুরণ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ধরণের কোন সমাজ—বিবিধ বাধা বন্ধনে আবদ্ধ কতকগুলি জমির চাষ করাই যাহাদের একমাত্র কাজ—কখন সমৃদ্ধ হইতে পারে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ইংরাজ-শাসনের ব্যবস্থাধীনে, উহাদের দারিদ্র্য আরও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। ভূস্বামীর অবস্থাও রায়ৎ অপেক্ষা বিশেষ কিছু ভাল নহে। ভাল ফসলের বৎসরে, রায়ৎ খাইতে পায় ; কিন্তু যখন গরুরা অনাহারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়ে—(এই ভীষণ ঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে) তখন রায়ৎ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, তাহার জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণগ্রস্ত হয়। বন্ধকের সুদ-আদি বাড়িতে বাড়িতে, রায়ৎ পরে এতটা ঋণভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, সে আর সামলাইতে পারে না ; জমিটুকু,—কুসীদগ্রাহীর হস্তে, 'চেটী'র হস্তে, নগরে যে বাস করে সেই অনুপস্থিত ভূস্বামীর হস্তে চলিয়া যায়। এই সর্ব্ব-গ্রাসী সুদ-খোর মহাজনই গ্রাম্যভারতের কালস্বরূপ ; পূর্ব্বেকার সাময়িক দেশাক্রমণকারী অপেক্ষা, ইহারা আরও অনর্থকর, আরও 'নছোড়বন্দা' ; ইহাদের লুণ্ঠন আরও প্রণালীবদ্ধ।

স্বীয় যন্ত্রাদির প্রতি, স্বীয় কর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি এই চাষাদের যেরূপ অটল বিশ্বাস তাহা বড়ই অদ্ভুত। কিন্তু এস্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 'কর্ণ-হীন কাঠের লাঙ্গল—যাহা উপরের মাটীতে একটু আঁচড় কাটে, মাত্র—গভীররূপে ভিতরে প্রবেশ করেনা—উহা পৃথিবীর ন্যায় পুরাতন না হউক, গ্রামের উৎপত্তির ন্যায় পুরাতন। এই লাঙ্গলের মত সাদাসিধা আদিমধরণের যন্ত্র আর কিছুই নাই ; কিন্তু আমার বোধ হয়, অধিকাংশ হালকা ও নরম জমির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাই হোক সরকার যদি নূতন যন্ত্রাদি প্রবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা উত্তম সঙ্কল্প আর কিছুই হইতে পারে না। চাষা যেরূপ প্রথার দাস তাহাতে সে যে আপনা হইতে আধুনিক যন্ত্রাদি গ্রহণ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই—তা ছাড়া, উহারা এত দরিদ্র যে ঐ সকল যন্ত্র ক্রয় করিবারও উহাদের সামর্থ্য নাই। গ্রামের বাহিরে যে সকল নিরীহ সুন্দর গরুগুলি দেখিলাম, উহারাই উহাদের কাজের সহকারী ; উহাদের দিয়া কাজ করাইলে খরচ অনেক কম হয়। এই গরুরাই উহাদের ক্ষেত চসিয়া দেয়, উহাদের ফসল বহন করিয়া লইয়া যায়, এবং কূপ হইতে জল উঠাইয়া ক্ষেত্রের নালায় ঢালিয়া দেয়। এই সমস্ত গরম দেশে, লোকে জলকে যে পূজা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই ; এই পুণ্য জল, কূপ ও চৌবাচ্চা হইতে উত্তোলিত হয় এবং পবিত্র নদীর জল কৃত্রিম-উপায়ে খালের মধ্যে আনীত হয়। এই সমস্ত খাল-আদির নির্ম্মাণে, দেশীয় বাস্তু-শিল্পীগণ অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। ইংরাজ-সরকার এই সকল পুরাতন খালের চিহ্ন ধরিয়া এক্ষণে যে সব বড় বড় নূতন খাল কাটাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিত ভাবে অভিনন্দন করিতে পারিতাম যদি রায়ৎকে তাহার দরুণ দোকর কর দিতে না হইত এবং যদি তাঁহারা জলসেকের একটা জবরদস্তি পদ্ধতি উদ্ভাবন না করিতেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষক শ্রেণীই গ্রাম্য-উপনিবেশের সাস্-অংশ। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শুধু তাহাদের দ্বারা সমস্ত কাজ চলিতে পারে না। তাহারা জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র একটি গ্রামে বদ্ধ হইয়া আছে, সেইখানে বসিয়াই তাহাদের সমস্ত অভাব পূরণ করিতে হইবে,—সুতরাং তাহারা কতকগুলি সাদাসিধা উপায় উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে কৃষিসমাজ হইতেই একটা শ্রমজীবী শ্রেণী বিকশিত হইয়া উঠিল,—যাহারা গ্রামেরই অধীন থাকিয়া গ্রামের ইষ্ট সাধন ও অভাব মোচনে নিযুক্ত হইল ; তাহারা শুধু গ্রামেরই জন্য খাটিতে লাগিল, এবং এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের নিজ স্বাধীনতার কথা ভাবিল না। দেখ, তাহা হইতে শ্রমশিল্পের কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে ;—দেখিতে পাইবে, ৫০০ হইতে ২০০০ অধিবাসী-বিশিষ্ট গ্রামের মধ্যে শ্রমশিল্পের এক একটি কেন্দ্র অবস্থিত—তাহাতে একদল ব্যবসাদার পুরা মাত্রায় রহিয়াছে ; চাষারা নিয়ত অর্থের দ্বারা, বিশেষতঃ ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা, এই কারিগরদের পরিশ্রমের প্রতিদান করিয়া থাকে ; এই কারিগরগণ, শুধু গ্রামের হাটবাজারের জন্যই জিনিস

মিসরদেশের স্বদেশভক্ত,

স্বর্গীয় মস্তাফা কামেল পাশা।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

প্রস্তুত করে; সুতরাং ইচ্ছামত খাটিতে পারে না, ইচ্ছামত বিনিময় করিতে পারে না; তাই বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতা যারপর নাই কম হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রামের কতকগুলি কারিগরের সহিত আমি পূর্ব্বেই তোমাদের সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছি:—তন্তুবায় ও কুম্ভকার। উহারা নিম্নবর্ণস্থ। এখনকার সকল ব্যবসায়ের ন্যায় এই দুই ব্যবসায়ও পৈতৃক। যন্ত্রাদি যতই সাদাসিধা হউক না কেন, এই কারণেই উহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য জন্মিয়াছে। গ্রামের মাকু, অদ্ভুত কার্য্য সাধন করে। অবশ্য তাঁতী, মোটা ও টেকসই কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় যোগায় না—কেননা গ্রামবাসীরা শুধু ঐরূপ কাপড়ই চাহে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, কত শতাব্দি ধরিয়া, ঘাড় গুঁজিয়া এই কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাই তাহাদের বংশধরেরা এইরূপ অসাধারণ হস্তদক্ষতা লাভ করিয়াছে এবং যে গুণটি থাকায় ঢাকার তন্তুবায়রা বাষ্পসদৃশ সূক্ষ্ম "প্রভাত, শিশির" নামক মলমল প্রস্তুত করিতে পারে, সেই অসাধারণ ধৈর্য্য তাহাদের সেই পূর্ব্বপুরুষ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের কাজে লাগাইয়া কুম্ভকার তাহার শিল্পকলাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। মন্দিরের ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলি, দেবতাদের সিঁদুর-মাখানো মূর্ত্তিগুলি, সেই সরল সহাস্যবদন পুতুলগুলি, ভীষণ মুখভঙ্গীযুক্ত পুতুলগুলি—সমস্তই তাহাদের হাতে গড়া। নগরের পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে, উহারা ইঁট্ ও টালি প্রস্তুত করে এবং এইরূপে স্বকীয় অবস্থার উন্নতি-সাধন করে। আমি অনেকবার দেখিয়াছি, গ্রামের অঙ্গনে গরুরা একটা কল ঘুরাইতেছে। সেই কলে একটা জাঁতা চলিতেছে কিংবা একটা পেষণ-মুদ্গর উঠিতেছে পড়িতেছে; চীনা-বাদাম ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে এইরূপে তৈল বাহির করা হইতেছে। এই যে একটা ব্যবসায়—বৈদেশিক প্রতিযোগিতায়, বস্ত্র বয়নের ন্যায় ইহারও ক্ষতি হইয়াছে। কেরোসিন-তৈল পল্লিগ্রামেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রাম্যসমাজ, নিজের চিনি, কিম্বা নিজের গুড় প্রস্তুত করে। উহারা জাঁতায় আখ্ মাড়ে এবং সেই রস মাটীর উনানে জ্বাল দেয়। পঞ্জাবের কোন গ্রামে ইহার প্রকরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গুড় কিংবা চিনি কি উপায়ে শোধিত হয় তাহা তাহারা জানে না। দেশীয় লোকেরা অশোধিত চিনিতেই সন্তুষ্ট।

সমাজসোপানের আর এক ধাপ উপরে উঠা যাক্—(কেন না, পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবসায়গুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বর্ণের জন্য রক্ষিত) তাহা হইলে আমরা ছুতারকে, কামারকে, কাঁসারিকে, রাজ-মিস্ত্রীকে, প্রস্তর-খোদককে দেখিতে পাইব—আর একটি অদ্ভুত লোককে দেখিতে পাইব, যাহাকে য়ুরোপীয়েরা সেখানে দেখিবে বলিয়া বড় একটা প্রত্যাশা করে না—সে হচ্চে জহুরী—স্বর্ণকার-সরকারী পোদ্দার—যাহারা অলঙ্কার-প্রিয় নারীজাতির ধন শোষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যেমন তাঁতি ও কুমোর সেইরূপ স্যাক্‌রাও গ্রাম্য জীবনের একটি অপরিহার্য্য উপাদান। অপ্রত্যাশিত স্বর্ণকারকে দেখিয়া গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের একটি নূতন জ্ঞান জন্মিল। যে দেশে, ব্যাঙ্ক-পদ্ধতি তেমন পরিপুষ্ট হয় নাই, যেখানে মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তেমন স্থিরতা নাই, যেখানে কেহ বিশ্বাস করিয়া অল্প পুঁজির টাকা কোথাও গচ্ছিত রাখিতে সাহস পায় না, সেই দেশে তাহারা অন্য ব্যবসায় ছাড়িয়া জহুরী স্বর্ণকার প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।—ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাতে একসঙ্গে দুইটি কাজ হয়। কোন ধার-কর্জ্জের কাজ হইলে, অলঙ্কারাদি গচ্ছিদ রাখা হয়, এবং উৎসবের দিনে, শোভাযাত্রায়, বিবাহে, ভোজে, অভ্যর্থনা-কালে, উহাই পারিবারিক ঐশ্বর্য্যস্বরূপ নারীকণ্ঠে সগর্ব্বে প্রদর্শিত হয়। এই সকল অলঙ্কার—রত্নভাণ্ডার ও শিল্প-সঞ্চয়েরও কাজ করে। এইরূপ সঞ্চিত কোন কোন রত্ন-রাজির অসাধারণ উজ্জ্বলতা;—এ স্থলে আমি ধনীদের কথাই বলিতেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু একজন ফরাসী কন্‌সল্-পত্নীর মুখে যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট বলিতে পারি;—কোন বিবাহ উৎসবে তিনি অন্তঃপুরে গিয়া সেখানকার রত্ন-অলঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন;—মুক্তার মালা, হীরার সাত-লহর, বিবিধ রত্নের কণ্ঠহার দেখিয়া তিনি একেবারে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছিলেন। এই সমস্ত তিনি বোম্বাই নগরে, একজন খুব ধনাঢ্য বোরার গৃহে দেখিয়াছিলেন। এরূপ রত্নভাণ্ডার কোন গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি, প্রাচ্যলোক মাত্রেরই ন্যায় গ্রামবাসিরাও ভূষণপ্রিয়; তাহারা নূতন-প্রচলিত সুন্দর জিনিস ও

হাল্-কেতার বেশভূষাদি ভালবাসে; তাই তাহাদের মধ্য হইতে জহুরী ও শিল্পকারদের অনেক খদ্দের জোটে, হালকা বালা ও বাজুবন্দ, সর্পাকৃতি গুরুভার পাঁয়জোর, মুক্তাভূষিত নথ্, কণ্ঠহার; তাবা, সোনা, হাড়, শাঁখা, হীরা ও কাচের অসংখ্য প্রকার অলঙ্কার,—এই সমস্ত গলাইয়া আবার নূতন করিয়া গড়াইতে হয়। কাচের অলঙ্কার কপালের উল্কির সহিত সংযোজিত হওয়ায়, হিন্দু রমণীদিগকে রং-করা পুতুলের মত দেখিতে হয়।

গ্রামের রাজমিস্ত্রী একজন ট্যানা-পরা মজুর এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের বাস্তুকলা নিতান্তই আদিম ধরণের। কিন্তু তাহাতেই গ্রামের কাজ চলিয়া যায়। যে প্রস্তর-খোদক—সেই ভাস্কর; যে ছুতার—সেই কাঠের কারিগর, কাঠ-খোদাইয়েরও কারিগর। এই সকল কারিগরের প্রতি আজকাল অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়, এবং ইংরাজ সরকার, ইহাদিগকে আশ্রয় ও উৎসাহ দিতে সমর্থও নহে—ইচ্ছুকও নহে। এ তালিকার মধ্যেই আর দুই একটা ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতে আমি ভুলিয়াছি:—মন্দিরের নর্ত্তকী "দেবদাসী",—ইহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত; দৈবজ্ঞ—ইহারা, ক্ষেত্রকর্ম্ম আরম্ভের শুভ দিন ও ক্ষণ জ্ঞাপন করিয়া থাকে; তার পর, ওঝা—(এই সম্প্রদায়ের লোক জাপানেও অনেক) ইহারা ডাইন্ ধরিয়া দেয়। ইহাদের আবার কত শ্রেণীভেদ। অমরাবতী প্রদেশের (বেরার) কোন কোন গ্রামে, এক একজন বেতনভোগী "গাপাগারি" নিযুক্ত আছে; মন্ত্র পড়িয়া শিল-পড়া নিবারণ তাহাদের কাজ।

অবশেষে সমাজ-সোপানের শেষ ধাপ!—ভৃত্যগণ; যাহাদের কোন একটা ব্যবসায় আছে, সেই কারিগরদের সহিত ইহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই ভৃত্য-শ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য:—বেতনভোগী কৃষক, কুলিমজুর, নীচ ঘৃণিত কাজের কর্ম্মী, নাপিত, ধোপা, ভিস্তী, মুচি, ঝাড়ুবর্দার! নাপিতের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে:—মহিষের ক্ষৌরকর্ম্মকার ও মানুষের ক্ষৌরকর্ম্মকার। মানুষের যে ক্ষৌরকর্ম্ম করে সমাজে তাহার অনেক কাজ। বেশ-বিন্যাশের ভার তাহার উপর; চুলের ছাঁট্ দেখিয়া কোন ব্যক্তির বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ইহা একটা গুরুতর কাজ। নাপিত ক্ষুরক্ষত ও শোনিতাক্ত মুণ্ড ধরিয়া গৃহের দ্বারদেশে, অঙ্গনে, রাস্তায় গম্ভীরভাবে চুল ছাঁটিতে বসিয়াছে প্রায়ই দেখা যায়। এই নাপিতই চুল ছাঁটিতেছে, নখ্ কাটিতেছে, পায়ের কড়া অপনীত করিতেছে। তাহার ব্যবসায় ক্রমে অস্ত্রচিকিৎসায় পরিণত হইয়াছে; তাহার নরুন, ফোটকভেদী ছুরিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাপিতই গ্রামের সংবাদপত্র; বিবাহে ঘটকালি করাও তাহার একটা অতিরিক্ত কাজ; সে কি না করে? আর যত কাজ নিকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য বর্ণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। চর্ম্ম স্পর্শ করা একটা ঘোরতর অশুচি কাজ: এই জন্যই মুচির ব্যবসায়, গর্দ্দভের সংস্রব থাকায় ধোপার ব্যবসায়, চর্ম্ম-মশকে জল বহন করে বলিয়া ভিস্তীর ব্যবসায়, ও ঝাড়ুবর্দ্দারের ব্যবসায় এত ঘৃণিত। উহারা গ্রামের উপকণ্ঠে কিংবা গ্রামের বাহিরে কোন একটা ঘেরের মধ্যে বাস করে। ভিস্তিরা মৃত পশুর পচা মাংস ও মরা ইঁদুর ভক্ষণ করে; উহারা ধর্ম্মনীতির কোন ধার ধারে না। ঝাড়ু-বর্দ্দার পিপাসায় মরিবে, তবু কোন গ্রামবাসীর চৌকাঠ মাড়াইতে সাহস করিবে না। যতক্ষণ না গৃহস্থ দয়া করিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে ততক্ষণ গৃহদ্বারে তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্য হইতেই মজুর-কৃষকের ও কলকারখানার শ্রমজীবীদিগের আমদানি হয়। ইহারাই গ্রাম্যসমাজের দাস;—ইহারাই শূদ্র। উহাদের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া মনে হয়, উহারাই এদেশের আদিম নিবাসী লোক—উপনিবেশের পর উপনিবেশ আসিয়া উহাদিগকে পরাজিত করিয়াছে—দাসত্বে পরিণত করিয়াছে। উহারা কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পায়, স্থানীয় দেবতাদের পূজা অর্চ্চনা করিতে পায়। যে সকল নগর, কলকারখানার কেন্দ্র, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে উহাদের অবস্থা একটু ভাল। বড় বড় পাটের ও তুলার কলকারখানা,—উহাদিগকেই বেশী পছন্দ করে, উহাদিগকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করে। হিন্দুসমাজের উপকণ্ঠে বাস করায়, জাতের বাহিরে থাকায়, উহারা সব কাজেই প্রবৃত্ত হইতে পারে—কেননা উহাদের কোন কুসংস্কার নাই, সঙ্কোচ নাই।

এই দীর্ঘ তালিকার মধ্যে দুই তিনটা ব্যবসায় বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা কি লক্ষ্য কর নাই? যেমন পাঠশালার

গুরুমহাশয়, বৈদ্য, বেনিয়া; সত্য কথা বলিতে কি, তাহার কারণ, কৃষক-সমাজ এই সব অনাবশ্যক লোকের সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। এমন একটি গৃহ নাই যেখানে কুমোরের কিংবা তাঁতীর প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, এদেশে বিদ্যাশিক্ষা একটি বর্ণবিশেষের একচেটিয়া।

স্বকীয় সন্তানের শিক্ষার জন্য, শুধু ব্রাহ্মণেরই কিংবা ধনাঢ্য বেনিয়ারই শিক্ষাগুরু নিয়োগ করিবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু গ্রামে কোন পাঠশালা নাই; কেননা, কৃষক-সমাজ ইহার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না; তাই, যেখানে পাঠশালা আছেওবা, সেখানেও বড়জোর অর্দ্ধ শতাব্দি হইতে আছে, তাহার অধিক নহে। সেও তত্রস্থ রাজসরকার স্থাপন করিয়াছে, গ্রাম কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই। অর্থাৎ সেখানে কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই; লোকশিক্ষার জন্য গ্রামও কিছু করে নাই, ইংরাজ সরকারও কিছু করে নাই। গুরুমহাশয়ের ন্যায়, গ্রামে বেনিয়ারও কোন প্রয়োজন ছিল না। গ্রামের অভাব খুবই অল্প। নিজের ব্যবহারের জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার সমস্তই গ্রাম নিজে প্রস্তুত করিয়া যোগাইয়া থাকে; এবং যাহা কিছু উদ্‌বৃত্ত হয়, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত বিনিময় করে। তাই, অন্য কোন মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হয় না। এইরূপে ক্ষুদ্র সমাজটি যখন ক্রমে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, তাহার অভাব বৃদ্ধি হইল, যখন সে সুখ-আরামের একটু স্বাদ পাইল, বিলাস সামগ্রীতে তাহার একটু রুচি হইল, তখনই (অনেক পরে) বেনিয়ার ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইল। বেনিয়ার আগমনে সমাজ পূর্ণতা লাভ করিল। পূর্ব্বে সমাজের দ্বার বেনিয়া নিকট রুদ্ধ ছিল; আজও এই ধনাঢ্য শক্তিমান ঘৃণত 'পারিয়া', সমাজের বাহিরে রহিয়াছে। আমার বে মা পড়ে আমার ভৃত্য (যদিও খৃষ্টান) কিরূপ বিস্ময় ও ঘৃণার স্বরে একজন রাস্তার লোকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল:— "ও একজন বেনিয়া!"

আবার শ্রমজীবীর কথায় ফিরিয়া আসা যাক। তাহাদের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ আছে, পদমর্য্যাদার উচ্চ নীচতা আছে, কিন্তু তাহারা কৃষি-উপনিবেশের একেবারেই অধীন; উপনিবেশ-গ্রামের অভাব মোচন ও ইষ্টসাধন করাই তাহাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। যে গ্রাম প্রকৃত গ্রামের মত, সেখানে এই ভাবটি বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

এইরূপ অকাট্য অধীনতার ভাব বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। আপনাকে উন্নীত করিবার জন্য, গ্রাম-গণ্ডির বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিবার জন্য, কোন প্রকার প্রয়াস প্রযত্ন নাই। অবশ্য, বিবিধ শ্রেণী নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে মানমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেছে এবং তাহারা আবার পর্য্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর উপর চাপিয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সাম্যভাব অসম্ভব। বিশেষতঃ বেতনের ব্যবস্থাপ্রযুক্ত তাহারা তাহাদের মুরব্বির ইচ্ছাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

বৈধরূপে বেতন অর্জ্জন করা, পরিশ্রমের তুল্যমূল্য পারিশ্রমিক লাভ করা—ইহা হিন্দু-কল্পনা নহে। হিন্দুর ধারণা অনুসারে, শ্রমকর্ম্ম একটা সম্পত্তি বিশেষ—যাহার লেন-দেন হইতে পারে, বিনিময় হইতে পারে। এ ধারণাটি অভিজাতবর্গের মধ্যে নাই—আমাদের দেশেও নাই। যে শ্রমকর্ম্ম ভারতের কারিগরকে বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহার বিনিময়ে দান কিংবা পুরস্কার স্বরূপ সে একখণ্ড ভূমি কিংবা ফসলের কিঞ্চিৎ অংশ প্রাপ্ত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে যখন পুরস্কার দেওয়া না হয়, তখন পারিশ্রমিকের একটা ন্যূনতম ও অপরিবর্ত্তনীয় নিরিখ্ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে— লোকের সাধারণ অবস্থার যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, মূল্যের বাজার যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে পারিশ্রমিকের হার কমেও না (কমা অসম্ভব) বাড়েও না। শ্রমকর্ম্মের 'চাহিদা' সত্ত্বেও, রেল-স্থাপন সত্ত্বেও, পূর্ত্ত-বিভাগের বৃহৎ অনুষ্ঠানাদি সত্ত্বেও, ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, আক্‌বরের আমলে বেতনের হার যেরূপ ছিল এখনও তাহাই আছে। ফসলের সময়েই বেতনের হিসাব নিকাশ হয়। কুম্ভকার প্রত্যেক চাসার নিকট একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পায়; তাহার বিনিময়ে কুম্ভকার চাষাকে বৎসরে দুইবার হাঁড়িকুড়ি যোগাইয়া থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কখন চাষার হাঁড়িকুড়ির প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে দস্তরমত মূল্য দিতে হয়। ধোপা, প্রতিগৃহস্থের নিকট গড়পড়তায় বৎসরে তিন আনা করিয়া পায়; তা ছাড়া ফসলের, বিবাহ-বৃত্তির ও পশুবলিরও কিছু অংশ পায়। বলি-

মেষের মুণ্ডটা তাহার অংশে পড়ে। গ্রামের লোক নিজ ব্যয়ে তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহার গর্দ্দভ কিনিয়া দেয়, এবং প্রতিদিন দুইবার করিয়া একমুষ্টি চাউল কিংবা বাজ্‌রি তাহাকে দান করে। গ্রামের প্রতি চৌকিদারের ততটা মমতা নাই সে একটা কৌশল করিয়া গ্রামের লোকের নিকট হইতে বেতন আদায় করে। যদি লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, সে গ্রামের রক্ষক সেই চৌকিদারই, গ্রামে চুরি করে, লুট করে, ডাকাতি করে। তাহারও বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনীয়। ফসলের অবস্থার উপর, ফসলের অংশের ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে। এইরূপেই শুধু কৃষক নহে, সমস্ত গ্রামই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়।

এইরূপ সামাজিক অবস্থার পরিণাম যে কি শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে; ইহার প্রতি যতই মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ততই ভাল। ভারতের একটি স্তন শুকাইয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহারই ফলে, শ্রমজীবীগণ উচ্চতর শ্রেণীর অধীন হইয়া পড়িয়াছে। ভরণ পোষণের জন্য সেই উচ্চশ্রেণীর উপরেই তাহাদিগের নির্ভর করিতে হয়। সেই উচ্চশ্রেণীর তুষ্টি-সাধনার্থেই তাহার সমস্ত শ্রম নিয়োজিত, তাহার শিল্পের সমস্ত রহস্য সংরক্ষিত। শ্রমশিল্পী, গ্রামের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করে, কিন্তু গ্রামের কিম্বা দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে না। গ্রামের অন্নসংস্থান শুধু কৃষি-লক্ষ্মীর উপর এবং অনাবৃষ্টি ঘটিলে—ভারত-বিধাতা ইংরাজের উপর নির্ভর করে। দুর্ভিক্ষই ভারতের ভীষণ শত্রু, এবং ইহা সর্ব্বদাই আসন্ন। ব্রাহ্মণদের স্তবস্তুতিও দেবতার পাষাণ হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে পারে না। ভারত একথা অনেক সময় বলিতে পারে! হে ঈশ্বর! ইংরাজ-বিধাতার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা, যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের অভ্যাগতদিগের হস্ত হইতে শিল্পী-ভারতকে রক্ষা করিবার সময় আসে, তখন ইংরাজ-বিধাতা প্রায়ই রাহুগ্রস্ত কিংবা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার এই আচরণ অমার্জ্জনীয়। ভারতের অন্নসংস্থানের পক্ষে কৃষি যখন যথেষ্ট হইতেছে না, তখন শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া এবং আবশ্যক হইলে শিল্পকে রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু যিনি ভারতের বিধাতা এবং প্রবল পক্ষের প্রতিই যাঁহার মনের গুপ্ত টান, সেই ইংরাজ, কাপুরুষের ন্যায় ল্যাঙ্কেসিয়ারের কারখানাওয়ালাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেব-দূত।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাল—সায়াহ্ন। স্থান বারাণসী।

অরবিন্দ ও অজয়।

অজ। এই সেই হিন্দুদের তীর্থ-শ্রেষ্ঠ বারাণসী-ধাম;
যেথা হ'তে আজো শোন—শতকণ্ঠে সাম-
গান উঠিতেছে সমবেত স্বরে! লভিলে বিরাম
যেথা, মোক্ষ লভে নর। করিহে প্রণাম
ভ্রাতঃ, সেই পুণ্য তীর্থে। হের—জাহ্নবীর হেথা কিবা
প্রণয়-মন্থর গতি, সুবঙ্কিম বিভা!
লক্ষ দেবালয় হেথা দেখো চাহি'—বিশ্ব-শিব-ধ্যানে
উঠে'ছে অম্বর ভেদি' অনন্তের পানে।
এইখানে অগণিত ভকতের প্রেমাপ্লুত হিয়া
আদি-দেব-শ্রীচরণে পড়ি'ছে লুটিয়া
প্রতিদিন। এইখানে এসো করি অবনত শির:
এ ভূখণ্ড শীর্ষস্থান পঙ্কিল মহীর!
অর। হেথায় কোথাও সখা, নাহি কি ঘৃণিত জন কেহ?
শুধুই কি উচ্ছ্বসিত হেথা ভক্তি-স্নেহ
নিরন্তর? নাহি কি গো করে হেথা অভিশপ্ত নব
স্বার্থ-চিন্তা— পর-প্রপীড়নে অবসর
নাহি কিহে সুহৃদ্বর, হেথা কভু পাপী দুরাত্মার?
হেথায় সবাই কিগো স্বার্থ আপনার
পরহিতে করিতেছে অকাতরে নিত্য বলিদান?
বিশ্ব-প্রেমে হেথা কিগো সবারি পরাণ
উদ্বুদ্ধ হইয়া আছে? প্রেমভরে সবে কিহে, সহে
অদৃষ্টের কঠোর বিধান?
অজ। —তাহা নহে।
অর। তবে বন্ধু, এখানেও অবিরাম হয় অভিনীত
সে নাটক ভয়ঙ্কর! নিত্য নিগৃহীত

এখানেও জীবকুল তবে? বৃথা বলোনাক আর
তবে এরে তীর্থ-ভূমি। হেথাও আবার
যদি সেই মিথ্যাচার, সেই পাপ, নিগ্রহ, ক্রন্দন;
তবে, আর জনাকীর্ণ এ নগরে—কোন্
গুণে কহ পুণ্য-ধাম?
সর্ব্বস্থান হ'তে কহ কিহে,—
হেথাকার অধিবাসী বেশী তৃপ্তি নিয়ে
যাপিছে জীবন? কিম্বা, হেথাকার মানব সতত
সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প পাপে রত?
অজ। তা'ও নহে ভ্রাতঃ। তবু, মানি আমি এরে তীর্থ-ভূমি
অকপটে।
অর। —বুঝিনাক কি কহিছ তুমি।
আছে কিহে হেন কোন মাহাত্ম্য এ তীর্থ-মৃত্তিকার
যা'র লাগি মুক্তকণ্ঠে করিছ ইহার
জয়-গান?
অজ। তাই বটে। বদ্ধমূল এ মোর বিশ্বাস—
যুগ-যুগান্তর হ'তে যেথা বারোমাস
কোটি ভক্ত-বৃন্দ আসি' করিতেছে তাঁ'র আরাধনা,
ওঠে যে পবিত্র ক্ষেত্রে অনন্ত বন্দনা
সুমহান, সেথাকার তুচ্ছতম রেণু-কণাগুলি
মণিমুষ্টি, নহে তাহা মূল্যহীন ধূলি!
যেথা সমুত্থিত ভক্ত-কণ্ঠে নিত্য ব্যাকুল আহ্বান,
প্রত্যক্ষ দেবতা সেথা করে অধিষ্ঠান,—
সংশয় নাহিক তাহে।
অর। কহেছিলে তুমি— ভগবান
কাহারো করুণ ডাকে নাহি দেন কান।
তিনি যদি বিশ্ব-হিত-সাধনের তরে মগ্ন ধ্যানে,
কেন তবে পুনঃ হেথা স্তব-স্তুতি-গানে
জাগ্রত দেবতারূপে র'য়েছেন সদা বন্দীসম?
অর্থহীন যুক্তি তব!
অজ। নহে প্রিয়তম,
নিরর্থক উক্তি মম।
সর্ব্ব ভূত-স্থিত ভগবান,
সর্ব্বত্রই শক্তিরূপে তাঁ'র অধিষ্ঠান;
অনন্ত স্বরূপে তিনি প্রকাশে নিয়ত অপ্রকাশ,
তিনি নিরাকার। শুধু, প্রত্যক্ষ আভাস
যা'র—অনুভূতি মাঝে। অনুভব-সিদ্ধ ভক্ত-মন
তাই, তাঁ'র চিরন্তন মহা সিংহাসন।
হেথা সেই সংখ্যাতীত ভকতের অন্তর মাঝার
তাই, আমি হেরিতেছি—সে সূক্ষ্ম সত্তার
সম্পূর্ণ বিকাশ। হেথা কৃপাবশে রাজ-অধিরাজ
আপনি আসিয়া নাহি করেন বিরাজ।
ভকতের হৃদি-কুঞ্জে অনুভূতি-শ্বেত-পদ্মাসনে
নিত্য-প্রতিষ্ঠিত তিনি হেথা!
ভক্তগণে
হের—সন্ধ্যা-সমাগমে আসিতেছে জাহ্নবীর তীরে
কর্ম্মান্তে মালিন্যরাশি সে নির্ম্মল নীরে
প্রক্ষালিতে, সমর্পিতে বিশ্বেশ্বর-পাদ-পদ্ম'পরে
আপনার আত্মহারা প্রাণ ভক্তিভরে।
(স্তোত্র-পাঠনিরত কাশীবাসিগণের প্রবেশ ও প্রস্থান।)
অর। সুন্দর এ দৃশ্য বটে! হেরিলে উন্মত্ত হয় প্রাণ!
অজ। হের—ওই গঙ্গা-বক্ষে স্থির-দীপ্তিমান
লক্ষ প্রদীপের সারি! যেন, জাহ্নবীর বক্ষোপরে
দুলিতেছে মণি-মালা লহরে লহরে;
অথবা, যেনরে হ'লে ভকতের পূজা সমাপন
আলোকিয়া শুচি-স্বচ্ছ জাহ্নবী-জীবন,
বেড়িয়া এ কাশীধামে, জ্বলিয়া বেড়ায় দুলি' দুলি'
উদ্বেলিত ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিগুলি!

[পট-পরিবর্ত্তন।]

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

(পূজারতি-দর্শনার্থ সমবেত, অগণ্য জন-সঙ্ঘ।)

অজ। দেব-দেব, সর্ব্বলোক-মঙ্গল-নিদান বিশ্বনাথ!
এসো বন্ধু, কায়মনে করি প্রণিপাত
ত্রিলোক-আলয় সেই অনাথ-শরণ-শ্রীচরণে।
[নতজানু হইয়া অজয় প্রণত হইলেন।]
অর। কেন এবে এমন্দির অগণিত জনে
পরিপূর্ণ?
অজ। আসিয়াছে কুতূহলে সবে সন্ধ্যারতি
হেরিবারে দেবতার।
অর। (নিম্ন স্বরে) হায় ভ্রান্ত-মতি!

অজ। কি কহিলে—'ভ্রান্ত-মতি'? এ বিশাল ভারত অজ্ঞান,
আর একা তুমি জ্ঞানী! হেন অভিমান
কেমনে জন্মিল তব? এই স্পর্দ্ধা, হেন অহঙ্কার,
কণ্টক-বৃক্ষের মত কর পরিহার
চিত্ত হ'তে উৎপাটিয়া। কোন দোষে কহিছ সবারে
ভ্রান্ত তুমি?

অর। যেহেতু, নিবিড় অন্ধকারে
নিমগ্ন ইহারা। এই ক্ষুদ্র, মূক শিলাখণ্ড-মাঝ
ভাবে যা'রা—বিরাজেন বিশ্ব-অধিরাজ
মূর্খ তা'রা—অতি অন্ধ! অনন্ত-স্বরূপ ভগবানে
যাহারা এহেন তুচ্ছ, ক্ষুদ্র করি' আনে
তারা কি দুর্ভাগ্য নহে?

অজ। এ প্রধান মূর্খতার মাঝে
জেনো বন্ধু, সুনিশ্চয় কোন যুক্তি আছে।
সত্য বটে সর্ব্ব-শক্তি, অনন্ত, বিরাট্ ভগবান;
সর্ব্বভূতে চিরন্তন সে সত্তা মহান
বিরাজিত; তবু, তুচ্ছ মানবের সঙ্কীর্ণ কল্পনা
তাঁ'র সে অসীম সত্তা করিতে ধারণা
পারে নাক। তাই, তাঁ'রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মুখে
সীমাবদ্ধরূপে, সদা সর্ব্ব দুঃখে-সুখে
তাঁহারি উপরে করে জীবন নির্ভর। ভাবো মনে—
কতটুকু ক্ষুদ্র এই নর: ক্ষণে ক্ষণে
যা'র স্মৃতি লুপ্ত হয়, যা'র জ্ঞান কভু নাহি পারে
বুঝিবারে—কি যে আছে মৃত্যু-পর-পারে,
যা'র দৃষ্টি এই ক্ষুদ্র করতলে হ'লে অন্তরাল,
অন্ধ হ'য়ে নাহি হেরে—এ সৃষ্টি-বিশাল,
তুচ্ছতম সেই জীব কেমনে এ অখণ্ড মহিমা-
ভূমারে করিবে ধ্যান? তাই, সে প্রতিমা
গড়ি' আপনার প্রেমে, আত্ম-নিবেদিয়া, শান্তমনে
ধ্যানায়ত্ত করি' তাঁ'রে পূজে সঙ্গোপনে।
মানবের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি এই সৃষ্টির পাথারে
অস্থির হইয়া, শেষে শ্রান্ত আপনারে
কোথায় হারা'য়ে ফেলে! তাই, সে নীরবে, ধীরে ধীরে,
চিত্তেরে করিয়া স্থির, পশিয়া মন্দিরে,
প্রতিমারে করে পূজা ভাবিয়া বিশ্বের মূলাধার।

অজ। তবে বন্ধু, করিতেছ তুমিও স্বীকার
অনন্ত স্বরূপে তাঁ'র?—উত্তম। তা' হ'লে' সেই পূজা
প্রশস্ত—যা' বিরাট সত্তায়?

অজ। —যদি বুঝা যায়।

অর। তা' না হ'লে কহ প্রিয়, প্রাণ কিগো শান্তি পায়
জড়-আরাধনে? যাঁর স্তব্ধ মহিমায়—
বিচিত্র অসীম শক্তিবলে চলে ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ,
তাঁহারে করিলে মনে মৃত, জড়বৎ,
হয় কিহে তার পূজা? প্রাণ কি গো কভু তৃপ্তি লভে
হেরিলে তাঁহারে অচেতন? বলো—তবে,
কোন্ সুখে এ সাধনা করে নর! ভাবো দেখি—তাহে
কি আনন্দ যবে এই পবন-প্রবাহে
লভে জীব সুখ-স্পর্শ তাঁ'র; রাগ-দীপ্ত সূর্য্য-করে
হাস্য-শুচি হেরি' তাঁ'র উঠেগো শিহরে'
ভক্ত-হিয়া; 'কুলু-কুলু' প্রবাহিনী যবে বহমান,
আদিম কালের সেই সঙ্গীত মহান
শুনিয়া, সাধক তাহে হারাইয়া আপন পরাণ
প্রেমাবেশে মুহুর্মুহু হয় কম্পমান!
জলে, স্থলে, গগনেতে—চরাচরে যাহা কিছু সব,
তা'রি মাঝে হেন ভাবে করে অনুভব
যবে উপাসক তাঁর অস্তিত্ব নিয়ত, তবে তা'র
কি আনন্দ বল দেখি!—সে সুখ অপার!
এত শান্তি, এত তৃপ্তি লভিবারে পারে বল কিহে,
মন-গড়া, সীমা-বদ্ধ প্রতিমারে নিয়ে?

অজ। অতি সত্য কথা,—কভু এ তৃপ্তির নাহিক তুলনা!
কিন্তু সখা, এ অমৃত লভে যেই জনা
অবিরাম নশ্বর জীবনে, তা'রে সামান্য মানব
ভেবোনাক; নর-দেহে দেবত্ব-গৌরব
লভিয়াছে সেইজন। অনন্তেরে যে করিতে পারে
হেনভাবে আরাধনা, এ সংসারে তা'রে
দেবজ্ঞানে করি পূজা। সাধনার সর্ব্বোচ্চ শিখরে
ভূমানন্দে দেবতা সে বিচরণ করে।
কিন্তু, বন্ধু, এত উচ্চ নহে যা'রা তাহাদেরো প্রাণ
অতুলন শান্তি-সুধা-কণা করে পান।
পৌত্তলিক সাধকের করিওনা হেন অপমান।

জানিও—পরোক্ষে সে-ও করিতেছে ধ্যান
সেই সে অনন্ত ভগবানে।

অর। একথার নাহি পারি
মর্ম্ম বুঝিবারে। বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড ছাড়ি'
সে জন করিছে ধ্যান সামান্য মূরতি, প্রাণে তা'র
কেমনে সে সীমাহীন, অখণ্ড সত্তার
জাগিবে মহান অনুভূতি! অন্ধ কভু কহ দেখি—
প্রকৃতির শোভারাশি দেখিতে পারেকি?

অজ। প্রতিমাপূজক যবে শয্যা ত্যজি' দেখে গো চাহিয়া
শরতের স্বচ্ছ উষা উঠেছে ফুটিয়া
নীলাম্বর—সরোবরে একটি সোণার পদ্ম-সম,—
উজ্জল, নির্ম্মল, দীপ্ত, পূত মনোরম;
তবে, তা'র প্রাণ খানি হেরিয়ে সে সৌন্দর্য্য অপার
পড়ে নাকি ভক্তিভরে লুটি' বারম্বার
অনন্ত সে বিশ্বনাথে করি' অনুভব?
প্রতিমারে
পূজে ভক্ত এ চঞ্চল চিত্তে রাখিবারে
সংযত একাগ্র শুধু; সুখে, দুঃখে করিতে নির্ভর
একান্তে জীবনখানি তাঁহারি উপর!
সে সাধকো দেখে নিত্য প্রতিমার অন্তরালে আসি,'
বরাভয় দিয়া তা'রে, সসীমে প্রকাশি'
মহেশ্বর তা'রি পূজা করি'ছেন গোপনে গ্রহণ।

অর। এত কূট-চিন্তা নাহি করে মোর মন।
চাহি আমি—এ জীবনে লভিতে তাঁহারে প্রতিক্ষণে,
নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, নিত্য জীবনে, মরণে।
ওতপ্রোত ভাবে চাহি—অনুভব করিতে তাঁহারে
জ্ঞানানন্দে ভাসি' সেই অমৃত-পাথারে।
সকল ইন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রবৃত্তিরে উন্মুক্ত করিয়া,
সুখে, দুঃখে চেতনার সর্ব্বদ্বার দিয়া,—
জ্ঞানে, কর্ম্মে, চিন্তা মাঝে অনুভব করিতে তাঁহারে
বিথরিয়া এ আবদ্ধ ক্ষুদ্র আপনারে।

অজ। (সপ্রেমে বন্ধুর কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করিয়া,)
এ অতি মহতী চিন্তা! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সাধনা তব!
আপনারে বিস্মরিয়া লভ, বন্ধু, লভ
এ বিশ্বের চরম সম্পৎ। মগ্ন রহি' প্রিয়তম,
তাঁ'র মাঝে, হও ধন্য—সার্থক জনম।

(ভক্তকণ্ঠে স্তব-সঙ্গীত সহ বিশ্বেশ্বরের আরতি হইল।)

(আরতি-অন্তে)

প্রণাম—প্রণাম দেব, সর্ব্বভূত-স্থিত নারায়ণ!
অগতির গতি তুমি, ত্রিলোক-শরণ,
প্রণব-স্বরূপ তুমি, জনক-পালক ভগবান!
(অরবিন্দের প্রতি)
কি মহান্ এই দৃশ্য! এ পঙ্কিল প্রাণ
ধন্য হয় না কি মিত্র, পুণ্যতম এ দৃশ্য হেরিলে?

অর। (নীরব)

অজ। বন্ধু,—

অর। (নীরব)

অজ। ভ্রাতঃ, কি ভাবিছ?

অর। সত্য বলে'ছিলে
তুমি—কাশী পীঠ-স্থান!

অজ। (সবিস্ময়ে) অরু!

অর। শোন—শোন—মোর কথা,
—মোর এ বিশুষ্ক প্রাণে ব্যাকুলতা
আসিয়াছে।

অজ। (সাগ্রহে) প্রিয়বর!

অর। আর যদি কিছু নাহি হয়,
তবু—তবু বুঝিতেছি আজি সুনিশ্চয়-
ভকতের উচ্ছ্বসিত, ভক্তিপূর্ণ ইচ্ছা-শক্তি বলে
প্রমূর্ত্ত হ'য়েছে এই দেবালয়তলে—
এই পুণ্যক্ষেত্রে তাঁ'র অনুভূতি প্রত্যক্ষ, মহান!
তাই,—শুষ্ক, পাপী আমি,—আমারো পরাণ
উঠিতেছে শিহরিয়া! সহস্র বৎসর ভক্তগণ
হেনভাবে যথা করে তাঁ'র আরাধন,
সত্য বলিয়াছ বন্ধু,—জ্ঞানী তুমি,—সেথা ভগবান
নিত্য প্রতিষ্ঠিত; ধ্রুব—তাহা তীর্থস্থান।

[ক্রমশঃ।

গোরা।

১৯

বিনয় আনন্দময়ীর কথা কয়টি ভাবিতে ভাবিতে বাসায় গেল। আনন্দময়ীর মুখের একটি কথাও এ পর্য্যন্ত বিনয়ের কাছে কোনোদিন উপেক্ষিত হয় নাই। সে রাত্রে তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যেন একটা মুক্তির ভাব অনুভব করিল। তাহার মনে হইল গোরার বন্ধুত্বকে সে একটা খুব বড় দাম চুকাইয়া দিয়াছে। একদিকে শশিমুখীকে বিবাহ করিতে রাজি হইয়া সে জীবনব্যাপী যে একটা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে ইহার পরিবর্ত্তে আর একদিকে তাহার বন্ধন আল্‌গা দিবার অধিকার হইয়াছে। বিনয় সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করিবার জন্য লুব্ধ হইয়াছে গোরা তাহার প্রতি এই যে অত্যন্ত অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিল—এই মিথ্যা সন্দেহের কাছে সে শশিমুখীর বিবাহকে চিরন্তন জামিন স্বরূপে রাখিয়া নিজেকে খালাস করিয়া লইল। ইহার পরে বিনয় পরেশের বাড়ীতে নিঃসঙ্কোচে এবং ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

যাহাদিগকে ভাল লাগে তাহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া উঠা বিনয়ের পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নহে। সে যেই গোরারদিকের সঙ্কোচ তাহার মন হইতে দূর করিয়া দিল অমনি দেখিতে দেখিতে অল্পকালের মধ্যেই পরেশ বাবুর ঘরের সকলের কাছেই যেন বহুদিনের আত্মীয়ের মত হইয়া উঠিল।

কেবল ললিতার মনে যে কয়দিন সন্দেহ ছিল যে সুচরিতার মন হয় ত বা বিনয়ের দিকে কিছু ঝুঁকিয়াছে সেই কয়দিন বিনয়ের বিরুদ্ধে তাহার মন যেন অস্ত্রধারণ করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যখন সে স্পষ্ট বুঝিল যে সুচরিতা তাহার প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী নহে তখন তাহার মনের বিদ্রোহ দূর হইয়া সে ভারি আরাম বোধ করিল এবং বিনয় বাবুকে অসামান্য ভাল লোক বলিয়া মনে করিতে তাহার কোনো বাধা রহিল না।

হারান বাবুও বিনয়ের প্রতি বিমুখ হইলেন না—তিনি একটু যেন বেশি করিয়া স্বীকার করিলেন যে বিনয়ের ভদ্রতাজ্ঞান আছে—গোরার যে সেটা নাই ইহাই এই স্বীকারোক্তির ইঙ্গিত।

বিনয় কখনো হারান বাবুর সম্মুখে কোনো তর্কের বিষয় তুলিত না এবং সুচরিতারও চেষ্টা ছিল যাহাতে না তোলা হয়—এই জন্য বিনয়ের দ্বারা ইতিমধ্যে চায়ের টেবিলের শান্তিভঙ্গ হইতে পায় নাই।

কিন্তু হারানের অনুপস্থিতিতে সুচরিতা নিজে চেষ্টা করিয়া বিনয়কে তাহার সামাজিক মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত করিত। গোরা এবং বিনয়ের মত শিক্ষিত লোক কেমন করিয়া যে দেশের প্রাচীন কুসংস্কারগুলি সমর্থন করিতে পারে ইহা জানিবার কৌতূহল কিছুতেই তাহার নিবৃত্ত হইত না। গোরাও বিনয়কে সে যদি না জানিত তবে এ সকল মত কেহ স্বীকার করে জানিলে সুচরিতা দ্বিতীয় কোনো কথা না শুনিয়া তাহাকে অবজ্ঞার যোগ্য বলিয়া স্থির করিত। কিন্তু গোরাকে দেখিয়া অবধি গোরাকে সে কোনোমতে মন হইতে অশ্রদ্ধা করিয়া দূর করিতে পারিতেছে না। তাই সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়া ফিরিয়া বিনয়ের সঙ্গে সে গোরার মত ও জীবনের আলোচনা উত্থাপন করে এবং প্রতিবাদের দ্বারা সকল কথা শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিতে থাকে। পরেশ সুচরিতাকে সকল সম্প্রদায়ের মত শুনিতে দেওয়াই তাহার সুশিক্ষার উপায় বলিয়া জানিতেন। এইজন্য তিনি এ সকল তর্কে কোনোদিন শঙ্কা অনুভব বা বাধা প্রদান করেন নাই।

একদিন সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, গৌরমোহন বাবু কি সত্যই জাতিভেদ মানেন, না ওটা দেশানুরাগের একটা বাড়াবাড়ি?"

বিনয় কহিল "আপনি কি সিঁড়ির ধাপগুলোকে মানেন? ওগুলোও ত সব বিভাগ—কোনোটা উপরে কোনোটা নীচে।"

সুচরিতা। নীচে থেকে উপরে উঠ্‌তে হয় বলেই মানি—নইলে মানবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সমান জায়গায় সিঁড়িকে না মান্‌লেও চলে।

বিনয়। ঠিক বলেচেন—আমাদের সমাজ একটা সিঁড়ি—এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্চে নীচে থেকে উপরে উঠিয়ে দেওয়া—মানব জীবনের একটা পরি-

ণামে নিয়ে যাওয়া। যদি সমাজকে সংসারকেই পরিণাম বলে জানতুম তাহলে কোনো বিভাগ ব্যবস্থার প্রয়োজনই ছিল না—তাহলে য়ুরোপীয় সমাজের মত প্রত্যেকে অন্যের চেয়ে বেশি দখল করবার জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারি করে চলতুম—সংসারে যে কৃতকার্য্য হত সেই মাথা তুলত, যার চেষ্টা নিষ্ফল হত সে একেবারেই তলিয়ে যেত। আমরা সংসারের ভিতর দিয়ে সংসারকে পার হতে চাই বলেই সংসারের কর্ত্তব্যকে প্রবৃত্তি ও প্রতিযোগিতার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিনি—সংসারকর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে স্থির করেছি, কেন না কর্ম্মের দ্বারা অন্য কোনো সফলতা নয়, মুক্তিলাভ করতে হবে, সেই জন্যে একদিকে সংসারের কাজ অন্য দিকে সংসার-কাজের পরিণাম উভয়দিকে তাকিয়ে আমাদের সমাজ বর্ণভেদ অর্থাৎ বৃত্তিভেদ স্থাপন করেচেন।

সুচরিতা। আমি যে আপনার কথা খুব স্পষ্ট বুঝতে পারচি তা নয় অথচ একেবারে না পারচি তাও বলতে পারিনে। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, যে উদ্দেশ্যে সমাজে বর্ণভেদ প্রচলিত হয়েচে আপনি বলচেন, সে উদ্দেশ্য কি সফল হয়েচে দেখতে পাচ্চেন?

বিনয়। পৃথিবীতে সফলতার চেহারা দেখতে পাওয়া বড় শক্ত। গ্রীসের সফলতা আজ গ্রীসের মধ্যে নেই সে জন্যে বলতে পারিনে গ্রীসের সমস্ত আইডিয়াই ভ্রান্ত এবং ব্যর্থ। গ্রীসের আইডিয়া এখনো মানবসমাজের মধ্যে নানা আকারে সফলতা লাভ করচে। ভারতবর্ষ যে জাতিভেদ বলে সামাজিক সমস্যার একটা বড় উত্তর দিয়েছিলেন—সে উত্তরটা এখনো মরে নি—সেটা এখনো পৃথিবীর সাম্‌নে রয়েছে। য়ুরোপও সামাজিক সমস্যার অন্য কোনো সদুত্তর এখনো দিতে পারেনি, সেখানে কেবলি ঠেলাঠেলি হাতাহাতি চলচে—ভারতবর্ষের এই উত্তরটা মানবসমাজে এখনো সফলতার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে—আমরা একে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্ধতা বশত উড়িয়ে দিলেই যে এ উড়ে যাবে তা মনেও করবেন না। আমরা ছোট ছোট সম্প্রদায়েরা জলবিম্বের মত সমুদ্রে মিশিয়ে যাব কিন্তু ভারতবর্ষের সহজ প্রতিভা হতে এই যে একটা প্রকাণ্ড মীমাংসা উদ্ভূত হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর কাজ না হবে ততক্ষণ এ স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে।

সুচরিতা সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি রাগ করবেন না কিন্তু আপনি সত্যি করে বলুন, এ সমস্ত কথা কি আপনি গৌরমোহন বাবুর প্রতিধ্বনির মত বলচেন না, এ আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেচেন?"

বিনয় হাসিয়া কহিল—"আপনাকে সত্য করেই বলচি গোরার মত আমার বিশ্বাসের জোর নেই। জাতিভেদের আবর্জ্জনা ও সমাজের বিকারগুলো যখন দেখতে পাই তখন আমি অনেক সময়ই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি—কিন্তু গোরা বলে বড় জিনিষকে ছোট করে দেখলেই সন্দেহ জন্মে—গাছের ভাঙা ডাল ও শুকনো পাতাকেই গাছের চরম প্রকৃতি বলে দেখা বুদ্ধির অসহিষ্ণুতা—ভাঙা ডালকে প্রশংসা করতে বলিনে কিন্তু বনস্পতিকে সমগ্রকরে দেখ এবং তার তাৎপর্য্য বুঝতে চেষ্টা কর।"

সুচরিতা। গাছের শুকনো পাতাটা না হয় নাই ধরা গেল কিন্তু গাছের ফলটা ত দেখতে হবে। জাতিভেদের ফলটা আমাদের দেশের পক্ষে কি রকম?

বিনয়। যাকে জাতিভেদের ফল বলচেন সেটা অবস্থার ফল, শুধু জাতিভেদের নয়। নড়া দাঁত দিয়ে চিবতে গেলে ব্যথা লাগে সেটা দাঁতের অপরাধ নয় নড়া দাঁতেরই অপরাধ। নানা কারণে আমাদের মধ্যে বিকার ও দুর্ব্বলতা ঘটেছে বলেই ভারতবর্ষের আইডিয়াকে আমরা সফল না করে বিকৃত করচি—সে বিকার আইডিয়ার মূলগত নয়। আমাদের ভিতর প্রাণ ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ঘটলেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। গোরা সেই জন্যে বারাবার বলে যে মাথা ধরে বলে মাথাটাকে উড়িয়ে দিলে চলবে না—সুস্থ হও, সবল হও।

সুচরিতা। আচ্ছা তাহলে আপনি ব্রাহ্মণ জাতকে নর-দেবতা বলে মানতে বলেন? আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলোয় মানুষ পবিত্র হয়?

বিনয়। পৃথিবীতে অনেক সম্মানই ত আমাদের নিজের সৃষ্টি। রাজাকে যতদিন মানুষের যে কারণেই হোক্ দরকার থাকে ততদিন মানুষ তাকে অসামান্য বলে প্রচার করে। কিন্তু রাজা ত সত্যি অসামান্য নয়। অথচ নিজের সামান্যতার বাধা ভেদ করে তাকে অসামান্য হয়ে উঠতে হবে নইলে সে রাজত্ব করতে পারবেই না। আমরা রাজার কাছে

থেকে উপযুক্তরূপ রাজত্ব পাবার জন্যে রাজাকে অসামান্য করে গড়ে তুলি—আমাদের সেই সম্মানের দাবী রাজাকে রক্ষা করতে হয়, তাকে অসামান্য হতে হয়। মানুষের সকল সম্বন্ধের মধ্যেই এই কৃত্রিমতা আছে। এমন কি, বাপ মার যে আদর্শ আমরা সকলে মিলে খাড়া করে রেখেছি তাতে করেই সমাজে বাপ মাকে বিশেষ ভাবে বাপ মা করে রেখেচে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক স্নেহে নয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের জন্য অনেক সহ্য ও অনেক ত্যাগ করে—কেন করে? আমাদের সমাজে দাদাকে বিশেষভাবে দাদা করে তুলেচে অন্য সমাজে তা করে নি। ব্রাহ্মণকেও যদি যথার্থভাবে ব্রাহ্মণ করে গড়ে তুলতে পারি তাহলে সে কি সমাজের পক্ষে সামান্য লাভ! আমরা নরদেবতা চাই—আমরা নরদেবতাকে যদি যথার্থই সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বুদ্ধিপূর্ব্বক চাই তাহলে নরদেবতাকে পাব—আর যদি মূঢ়ের মত চাই তাহলে যে সমস্ত অপদেবতা সকল রকম দুষ্কর্ম্ম করে থাকে এবং আমাদের মাথার উপরে পায়ের ধূলো দেওয়া যাদের জীবিকার উপায় তাদের দল বাড়িয়ে ধরণীর ভার বৃদ্ধি করা হবে।

সুচরিতা। আপনার সেই নরদেবতা কি কোথাও আছে?

বিনয়। বীজের মধ্যে যেমন গাছ আছে তেমনি আছে, ভারতবর্ষের আন্তরিক অভিপ্রায় এবং অভাবের মধ্যে আছে। অন্য দেশ ওয়েলিংটনের মত সেনাপতি, নিউটনের মত বৈজ্ঞানিক, রথচাইল্ডের মত লক্ষপতি চায়, আমাদের দেশ ব্রাহ্মণকে চায়। ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যার "পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত"; যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়—সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমাদের সমাজের প্রত্যেক বিভাগকে প্রত্যেক কর্ম্মকে সর্ব্বদাই একটি মুক্তির সুর জোগাবার জন্যই ব্রাহ্মণকে চাই—রাঁধবার জন্যে এবং ঘণ্টা নাড়বার জন্যে নয়—সমাজের সার্থকতাকে সমাজের চোখের সামনে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করে রাখ্‌বার জন্য ব্রাহ্মণকে চাই। এই ব্রাহ্মণের আদর্শকে আমরা যত বড় করে অনুভব করব ব্রাহ্মণের সম্মানকে তত বড় করে করতে হবে। সে সম্মান রাজার সম্মানের চেয়ে অনেক বেশি—সে সম্মান দেবতারই সম্মান। এ দেশে ব্রাহ্মণ যখন সেই সম্মানের যথার্থ অধিকারী হবে তখন এ দেশকে কেউ অপমানিত করতে পারবে না। আমরা কি রাজার কাছে মাথা হেঁট করি, অত্যাচারীর বন্ধন গলায় পরি? নিজের ভয়ের কাছে আমাদের মাথা নত, নিজের লোভের জালে আমরা জড়িয়ে আছি, নিজের মূঢ়তার কাছে আমরা দাসানুদাস—ব্রাহ্মণ তপস্যা করুন, সেই ভয় থেকে, লোভ থেকে, মূঢ়তা থেকে আমাদের মুক্ত করুন—আমরা তাঁদের কাছ থেকে যুদ্ধ চাইনে, বাণিজ্য চাইনে আর কোনো প্রয়োজন চাইনে তাঁরা আমাদের সমাজের মাঝখানে মুক্তির সাধনাকে সত্য করে তুলুন।

পরেশ বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভারতবর্ষকে যে আমি জানি তা বলতে পারিনে এবং ভারতবর্ষ যে কি চেয়েছিলেন এবং কোনোদিন তা পেয়েছিলেন কি না তা আমি নিশ্চয় জানিনে কিন্তু যে দিন চলে গেছে সেই দিনে কি কখনো ফিরে যাওয়া যায়? বর্ত্তমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়—অতীতের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে সময় নষ্ট করলে কি কোনো কাজ হবে?"

বিনয় কহিল—"আপনি যেরূপ বলচেন আমিও ঐ রকম করে ভেবেচি এবং অনেকবার বলেওচি—গোরা বলে যে, অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি সে অতীত? বর্ত্তমানের হাঁকডাকের আড়ালে পড়ে সে আমাদের দৃষ্টির অতীত হয়েচে বলেই অতীত নয়—সে ভারতবর্ষের মজ্জার মধ্যে রয়েছে। কোনো সত্য কোনো দিনই অতীত হতে পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের এই সত্য আমাদের আঘাত করতে আরম্ভ করেছে। একদিন এ'কে যদি আমাদের একজনও সত্য বলে সম্পূর্ণ চিনতে ও গ্রহণ করতে পারে তাহলেই আমাদের শক্তির খনির দ্বারে প্রবেশের পথ খুলে যাবে—অতীতের ভাণ্ডার বর্ত্তমানের সামগ্রী হয়ে উঠবে। আপনি কি মনে করচেন ভারতবর্ষের কোথাও সে রকম সার্থকজন্মা লোকের আবির্ভাব হয় নি?"

সুচরিতা কহিল—"আপনি যে রকম করে এ সব কথা বলচেন ঠিক সাধারণ লোকে এ রকম করে বলে না—সেই

জন্যে আপনাদের মতকে সমস্ত দেশের জিনিষ বলে ধরে নিতে মনে সংশয় হয়।"

বিনয় কহিল—"দেখুন, সূর্য্যের উদয় ব্যাপারটাকে বৈজ্ঞানিকেরা একরকম করে ব্যাখ্যা করে আবার সাধারণ লোকে আর একরকম করে ব্যাখ্যা করে। তাতে সূর্য্যের উদয়ের বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি করে না। তবে কিনা সত্যকে ঠিকমত করে জানার দরুন আমাদের একটা লাভ আছে। দেশের যে সকল সত্যকে আমরা খণ্ডিত করে বিক্ষিপ্ত করে দেখি, গোরা তার সমস্তকে এক করে সংশ্লিষ্ট করে দেখতে পায় গোরার সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে কিন্তু সেই জন্যই কি গোরার সেই দেখাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে করবেন—আর যারা ভেঙেচুরে দেখে তাদের দেখাটাই সত্য ?"

সুচরিতা চুপ করিয়া রহিল। বিনয় কহিল, "আমাদের দেশে সাধারণত যেসকল লোক নিজেকে পরম হিন্দু বলে অভিমান করে আমার বন্ধু গোরাকে আপনি সেদলের লোক বলে মনে করবেন না। আপনি যদি ওর বাপ কৃষ্ণদয়াল বাবুকে দেখ্‌তেন তা হলে বাপ ও ছেলের তফাৎ বুঝতে পারতেন। কৃষ্ণদয়াল বাবু সর্ব্বদাই কাপড় ছেড়ে, গঙ্গাজল ছিটিয়ে, পাঁজি পুঁথি মিলিয়ে নিজেকে সুপবিত্র করে রাখবার জন্যে অহরহ ব্যস্ত হয়ে আছেন—রান্না সম্বন্ধে খুব ভাল বামুনকেও তিনি বিশ্বাস করেন না পাছে তার ব্রাহ্মণত্বে কোথাও কোনো ত্রুটি থাকে—গোরাকে তাঁর ঘরের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেন না—কখনো যদি কাজের খাতিরে তাঁর স্ত্রীর মহলে আসতে হয় তাহলে ফিরে গিয়ে নিজেকে শোধন করে নেন ; পৃথিবীতে দিনরাত অত্যন্ত আলগোছে আছেন পাছে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোন দিক থেকে নিয়ম ভঙ্গের কণামাত্র ধূলো তাঁকে স্পর্শ করে—ঘোর বাবু যেমন রোদ কাটিয়ে, ধূলো বাঁচিয়ে নিজের রঙের জেল্লা, চুলের বাহার, কাপড়ের পারিপাট্য রক্ষা করতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়ে থাকে সেই রকম। গোরা এরকমই নয়। সে হিন্দুয়ানির নিয়মকে অশ্রদ্ধা করে না কিন্তু সে অমন খুঁটে খুঁটে চল্‌তে পারে না—সে হিন্দুধর্ম্মকে ভিতরের দিক থেকে এবং খুব বড় রকম করে দেখে, সে কোনো দিন মনেও করে না যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ নিতান্ত সৌখীন প্রাণ—অল্প একটু ছোঁয়াছুঁয়িতেই শুকিয়ে যায় ঠেকাঠেকিতেই মারা পড়ে।"

সুচরিতা। কিন্তু তিনি ত খুব সাবধানে ছোঁয়াছুঁয়ি মেনে চলেন বলেই মনে হয়।

বিনয়। তার ঐ সতর্কতাটা একটা অদ্ভুত জিনিষ। তাকে যদি প্রশ্ন করা যায় সে তখনি বলে হাঁ আমি এ সমস্তই মানি—ছুঁলে জাত যায়, খেলে পাপ হয় এ সমস্তই অভ্রান্ত সত্য। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এ কেবল ওর গায়ের জোরের কথা—এসব কথা যতই অসঙ্গত হয় ততই ও যেন সকলকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বলে। পাছে বর্ত্তমান হিন্দুয়ানির সামান্য কথাটাকেও অস্বীকার করলে অন্য মূঢ় লোকের কাছে হিন্দুয়ানির বড় জিনিষেরও অসম্মান ঘটে এবং যারা হিন্দুয়ানিকে অশ্রদ্ধা করে তারা সেটাকে নিজের জিত বলে গণ্য করে এই জন্যে গোরা নির্ব্বিচারে সমস্তই মেনে চল্‌তে চায়—আমার কাছেও এসম্বন্ধে কোনো শৈথিল্য প্রকাশ করতে চায় না।

পরেশ বাবু কহিলেন—"ব্রাহ্মদের মধ্যেও এরকম লোক অনেক আছে। তারা হিন্দুয়ানির সমস্ত সংস্রবই নির্ব্বিচারে পরিহার করতে চায়, পাছে বাহিরের কোনো লোক ভুল করে যে তারা হিন্দুধর্ম্মের কুপ্রথাকেও স্বীকার করে। এসকল লোকে পৃথিবীতে বেশ সহজভাবে চল্‌তে পারে না—এরা হয় ভান করে নয় বাড়াবাড়ি করে, মনে করে সত্য দুর্ব্বল, এবং সত্যকে কেবল কৌশল করে রক্ষা করা যেন কর্ত্তব্যের অঙ্গ। আমার উপরে সত্য নির্ভর করচে, সত্যের উপরে আমি নির্ভর করচিনে এইরকম যাদের ধারণা তাদেরই বলে গোঁড়া। সত্যের জোরকে যারা বিশ্বাস করে নিজের জবরদস্তিকে তারা সংযত রাখে। বাইরের লোকে দুদিন দশদিন ভুল বুঝলে সামান্যই ক্ষতি কিন্তু কোনো ক্ষুদ্র সঙ্কোচে সত্যকে স্বীকার না করতে পারলে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি। আমি ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করি যে ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্ব্বত্রই নতশিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি—বাইরের কোনো বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখ্‌তে পারে।"

এই বলিয়া পরেশ বাবু স্তব্ধ হইয়া আপনার মনকে যেন আপনার অন্তরে ক্ষণকালের জন্য সমাধান করিলেন। পরেশ বাবু মৃদুস্বরে এই যে কয়টি কথা বলিলেন তাহা

এতক্ষণের সমস্ত আলোচনার উপরে যেন একটা বড় সুর আনিয়া দিল—সে সুর যে ঐ কয়টি কথার সুর তাহা নহে তাহা পরেশ বাবুর নিজের জীবনের একটি প্রশান্ত গভীরতার সুর। সুচরিতা এবং ললিতার মুখে একটি আনন্দিত ভক্তির দীপ্তি আলো ফেলিয়া গেল। বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সেও মনে মনে জানিত গোরার মধ্যে একটা প্রচণ্ড জবরদস্তি আছে—সত্যের বাহকদের বাক্যে মনে ও কর্ম্মে যে একটি সহজ ও সরল শান্তি থাকা উচিত তাহা গোরার নাই—পরেশ বাবুর কথা শুনিয়া সেকথা তাহার মনে যেন আরো স্পষ্ট করিয়া আঘাত করিল। অবশ্য, বিনয় এতদিন গোরার পক্ষে এই বলিয়া মনে মনে তর্ক করিয়াছে যে সমাজের অবস্থা যখন টলমল, বাহিরের দেশকালের সঙ্গে যখন বিরোধ বাধিয়াছে তখন সত্যের সৈনিকরা স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে পারে না—তখন সাময়িক প্রয়োজনের আকর্ষণে সত্যের মধ্যেও ভাঙচুর আসিয়া পড়ে। আজ পরেশ বাবুর কথায় বিনয় ক্ষণকালের জন্য মনে প্রশ্ন করিল, যে, সাময়িক প্রয়োজন সাধনের লুব্ধতায় সত্যকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা সাধারণ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক কিন্তু তাহার গোরা কি সেই সাধারণ লোকের দলে?

সুচরিতা রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলে পর ললিতা তাহার খাটের একধারে আসিয়া বসিল। সুচরিতা বুঝিল ললিতার মনের ভিতর একটা কোনো কথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কথাটা যে বিনয়ের সম্বন্ধে তাহাও সুচরিতা বুঝিয়াছিল।

সেইজন্য সুচরিতা আপনি কথা পাড়িল—"বিনয় বাবুকে কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগে।"

ললিতা কহিল—"তিনি কি না কেবলি গৌর বাবুর কথাই বলেন সেইজন্যে তোমার ভাল লাগে।"

সুচরিতা এ কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিতটা বুঝিয়াও বুঝিল না। সে একটা সরলভাব ধারণ করিয়া কহিল—"তা সত্যি, ওঁর মুখ থেকে গৌর বাবুর কথা শুনতে আমার ভারি আনন্দ হয়। আমি যেন তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাই।"

ললিতা কহিল—"আমার ত কিছু ভাল লাগে না—আমার রাগ ধরে।"

সুচরিতা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "কেন?"

ললিতা কহিল—"গোরা, গোরা, গোরা, দিনরাত্রি কেবল গোরা! ওঁর বন্ধু গোরা হয় ত খুব মস্ত লোক, বেশ ত ভালই ত—কিন্তু উনিও ত মানুষ।"

সুচরিতা হাসিয়া কহিল—"তা ত বটেই কিন্তু তার ব্যাঘাত কি হয়েছে।"

ললিতা। ওঁর বন্ধু ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেচেন যে উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারচেন না। যেন কাঁচপোকায় তেলাপোকাকে ধরেচে—ওরকম অবস্থায় কাঁচপোকার উপরেও আমার রাগ ধরে, তেলাপোকার উপরেও আমার শ্রদ্ধা হয় না।

ললিতার কথার ঝাঁজ দেখিয়া সুচরিতা কিছু না বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ললিতা কহিল, "দিদি তুমি হাসচ কিন্তু আমি তোমাকে বলচি আমাকে যদি কেউ ওরকম করে চাপা দিতে চেষ্টা করত আমি তাকে একদিনের জন্যেও সহ্য করতে পারতুম না। এই মনে কর তুমি—লোকে যাই মনে করুক তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখনি—তোমার সেরকম প্রকৃতিই নয়—সেই জন্যেই আমি তোমাকে এত ভালবাসি। আসল, বাবার কাছে থেকে তোমার ঐ শিক্ষা হয়েছে—তিনি সব লোককেই তার জায়গাটুকু ছেড়ে দেন।"

এই পরিবারের মধ্যে সুচরিতা এবং ললিতা পরেশ বাবুর পরম ভক্ত—বাবা বলিতেই তাহাদের হৃদয় যেন স্ফীত হইয়া উঠে।

সুচরিতা কহিল—"বাবার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা হয়? কিন্তু যাই বল ভাই বিনয় বাবু ভারি চমৎকার করে বলতে পারেন।"

ললিতা। ওগুলো ঠিক ওঁর মনের কথা নয় বলেই অত চমৎকার করে বলেন। যদি নিজের কথা বলতেন তাহলে বেশ দিব্যি সহজ কথা হত, মনে হত না যে, ভেবে ভেবে বানিয়ে বানিয়ে বলচেন। চমৎকার কথার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল লাগে।

সুচরিতা। তা রাগ করিস্ কেন ভাই! গৌরমোহন বাবুর কথাগুলো ওঁর নিজেরই কথা হয়ে গেছে।

ললিতা। তা যদি হয় ত সে ভারি বিশ্রী—ঈশ্বর কি বুদ্ধি দিয়েছেন পরের কথা ব্যাখ্যা করবার আর মুখ

দিয়েছেন পরের কথা চমৎকার করে বলবার জন্যে? অমন চমৎকার কথায় কাজ নেই।

সুচরিতা। কিন্তু এটা তুই বুঝচিস্‌নে কেন যে বিনয় বাবু গৌরমোহন বাবুকে ভালবাসেন—তাঁর সঙ্গে ওঁর মনের সত্যিকার মিল আছে।

ললিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল "না, না, না, সম্পূর্ণ মিল নেই। গৌরমোহন বাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়ে গেছে—সেটা দাসত্ব, সে ভালবাসা নয়। অথচ উনি জোর করে মনে করতে চান যে ওঁর সঙ্গে ওঁর ঠিক এক মত—সেই জন্যেই তাঁর মতগুলিকে উনি অত চেষ্টা করে চমৎকার করে বলে নিজেকে ও অন্যকে ভোলাতে ইচ্ছা করেন। উনি কেবলি নিজের মনের সন্দেহকে বিরোধকে চাপা দিয়ে চলতে চান পাছে গৌরমোহন বাবুকে না মান্‌তে হয়। তাঁকে না মানবার সাহস ওঁর নেই। ভালবাসা থাক্‌লে মতের সঙ্গে না মিললেও মানা যেতে পারে—অন্ধ না হয়েও নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়—ওঁর ত তা নয়—উনি গৌরমোহন বাবুকে মান্‌চেন হয় ত ভালবাসা থেকে অথচ কিছুতে সেটা স্বীকার করতে পারচেন না। ওঁর কথা শুনলেই সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আচ্ছা দিদি, তুমি বোঝনি? সত্যি বল!"

সুচরিতা ললিতার মত একথা এমন করিয়া ভাবেই নাই। কারণ গোরাকে সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্যই তাহার কৌতূহল ব্যগ্র হইয়াছিল—বিনয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার জন্য তাহার আগ্রহই ছিল না। সুচরিতা ললিতার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়া কহিল—"আচ্ছা, বেশ, তোর কথাই মেনে নেওয়া গেল—তা কি করতে হবে বল!"

ললিতা। আমার ইচ্ছা করে ওঁর বন্ধুর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে।

সুচরিতা। চেষ্টা করে দেখ্‌না ভাই।

ললিতা। আমার চেষ্টায় হবে না—তুমি একটু মনে করলেই হয়।

সুচরিতা যদিও ভিতরে ভিতরে বুঝিয়াছিল যে, বিনয় তাহার প্রতি অনুরক্ত তবু সে ললিতার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল।

ললিতা কহিল—"গৌরমোহন বাবুর শাসন কাটিয়েও উনি যে তোমার কাছে এমন করে ধরা দিতে আসচেন তাতেই আমার ওঁকে ভাল লাগে;—ওঁর অবস্থার কেউ হলে ব্রাহ্ম-মেয়েদের গাল দিয়ে নাটক লিখ্‌ত—ওঁর মন এখনো খোলসা আছে, তোমাকে ভালবাসেন আর বাবাকে ভক্তি করেন এই তার প্রমাণ। বিনয় বাবুকে ওঁর নিজেরভাবে খাড়া করিয়ে দিতে হবেই দিদি। উনি যে কেবলি গৌরমোহন বাবুকে প্রচার করতে থাকেন সে আমার অসহ্য বোধ হয়।"

এমন সময় দিদি দিদি করিয়া সতীশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনয় তাহাকে আজ গড়ের মাঠে সার্কাস দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। যদিও অনেক রাত্রি হইয়াছিল তবু তাহার এই প্রথম সার্কাস দেখার উৎসাহ সে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। সার্কাসের বর্ণনা করিয়া সে কহিল "বিনয় বাবুকে আজ আমার বিছানায় ধরে আন্‌ছিলুম। তিনি বাড়িতে ঢুকেছিলেন তার পরে আবার চলে গেলেন। বল্লেন কাল আসবেন। দিদি, আমি তাঁকে বলেছি তোমাদের একদিন সার্কাস্‌ দেখাতে নিয়ে যেতে।"

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল—"তিনি তাতে কি বল্লেন?"

সতীশ কহিল—"তিনি বল্লেন মেয়েরা বাঘ দেখ্‌লে ভয় করবে। আমার কিন্তু কিছু ভয় হয়নি।" বলিয়া সতীশ পৌরুষ অভিমানে বুক ফুলাইয়া বসিল।

ললিতা কহিল—"তা বই কি! তোমার বন্ধু বিনয় বাবুর সাহস যে কত বড় তা বেশ বুঝ্‌তে পারচি! না ভাই দিদি, আমাদের সঙ্গে করে ওঁকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতেই হবে।"

সতীশ কহিল—"কাল যে দিনের বেলায় সার্কাস হবে।"

ললিতা কহিল—"সেই ত ভাল। দিনের বেলাতেই যাব।"

পরদিন বিনয় আসিতেই ললিতা বলিয়া উঠিল "এই যে ঠিক সময়েই বিনয় বাবু এসেচেন! চলুন।"

বিনয়। কোথায় যেতে হবে?

ললিতা। সার্কাসে।

সার্কাসে! দিনের বেলায় এক তাঁবু লোকের সাম্‌নে মেয়েদের লইয়া সার্কাসে যাওয়া! বিনয় ত হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ললিতা কহিল—"গৌরমোহন বাবু বুঝি রাগ করবেন ?"

ললিতার এই প্রশ্নে বিনয় একটু চকিত হইয়া উঠিল।

ললিতা আবার কহিল—"সার্কাসে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে গৌরমোহন বাবুর একটা মত আছে ?"

বিনয় কহিল—"নিশ্চয় আছে।"

ললিতা। সেটা কিরকম আপনি ব্যাখ্যা করে বলুন। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে আসি তিনিও শুনবেন।

বিনয় খোঁচা খাইয়া হাসিল। ললিতা কহিল "হাসচেন কেন বিনয় বাবু! আপনি কাল সতীশকে বলেছিলেন মেয়েরা বাঘকে ভয় করে—আপনি কাউকে ভয় করেন না কি ?"

ইহার পরে সেদিন মেয়েদের লইয়া বিনয় সার্কাসে গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, গোরার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা ললিতার এবং সম্ভবত এবাড়ির অন্য মেয়েদের কাছে কিরূপ ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে সেকথাটাও বার বার তাহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

তাহার পরে যেদিন বিনয়ের সঙ্গে দেখা হইল ললিতা যেন নিরীহ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—"গৌরমোহন বাবুকে সেদিনকার সার্কাসের গল্প বলেচেন ?"

এ প্রশ্নের খোঁচা বিনয়কে গভীর করিয়া বাজিল—কেননা তাহাকে কর্ণমূল রক্তবর্ণ করিয়া বলিতে হইল—"না, এখনো বলা হয়নি।"

লাবণ্য আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"বিনয় বাবু আসুন না।"

ললিতা কহিল—"কোথায় ? সার্কাসে না কি ?"

লাবণ্য কহিল—"বাঃ আজ আবার সার্কাস কোথায় ? আমি ডাকচি আমার রুমালের চারধারে পেন্সিল দিয়ে একটা পাড় এঁকে দিতে—আমি সেলাই করব। বিনয় বাবু কি সুন্দর আঁকতে পারেন!"

লাবণ্য বিনয়কে ধরিয়া লইয়া গেল।

২০

সকাল বেলায় গোরা কাজ করিতেছিল। বিনয় খামখা আসিয়া অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে কহিল—"সেদিন পরেশ বাবুর মেয়েদের নিয়ে আমি সার্কাস দেখতে গিয়েছিলুম।"

গোরা লিখিতে লিখিতেই বলিল "শুনেছি।"

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল—"তুমি কার কাছে শুনলে ?"

গোরা। অবিনাশের কাছে। সেও সেদিন সার্কাস দেখতে গিয়েছিল।

গোরা আর কিছু না বলিয়া লিখিতে লাগিল। গোরা এ খবরটা আগেই শুনিয়াছে—সেও আবার অবিনাশের কাছ হইতে শুনিয়াছে, সুতরাং তাহাতে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কোনো অভাব ঘটে নাই—ইহাতে তাহার চিরসংস্কার বশত বিনয় মনের মধ্যে ভারি একটা সঙ্কোচ বোধ করিল। সার্কাসে যাওয়া এবং এ কথাটা এমন করিয়া লোকসমাজে না উঠিলেই সে খুসি হইত।

এমন সময় তাহার মনে পড়িয়া গেল কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত না ঘুমাইয়া সে মনে মনে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। ললিতা মনে করে সে গোরাকে ভয় করে এবং ছোট ছেলে যেমন করিয়া মাষ্টারকে মানে তেম্নি করিয়াই সে গোরাকে মানিয়া চলে। এমন অন্যায় করিয়াও মানুষকে মানুষ ভুল বুঝিতে পারে! গোরা বিনয় যে একাত্মা; অসামান্যতাগুণে গোরার উপরে তাহার একটা ভক্তি আছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া ললিতা যে রকমটা মনে করিয়াছে সেটা গোরার প্রতিও অন্যায় বিনয়ের প্রতিও অন্যায়। বিনয় নাবালক নয় এবং গোরাও নাবালকের অছি নহে।

গোরা নিঃশব্দে লিখিয়া যাইতে লাগিল আর ললিতার মুখের সেই তীক্ষ্ণাগ্র গুটি দুই তিন প্রশ্ন বারবার বিনয়ের মনে পড়িল। বিনয় তাহাকে সহজে বরখাস্ত করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মনে একটা বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া উঠিল। সার্কাস দেখিতে গিয়াছি ত কি হইয়াছে ? অবিনাশ কে, যে সে সেই কথা লইয়া গোরার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসে—এবং গোরাই বা কেন আমার গতিবিধি সম্বন্ধে সেই অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়! আমি কি গোরার নজরবন্দী! কাহার সঙ্গে মিশিব, কোথায় যাইব, গোরার কাছে তাহার জবাবদিহি করিতে হইবে! বন্ধুত্বের প্রতি এ যে বিষম উপদ্রব!

গোরা ও অবিনাশের উপর বিনয়ের এত রাগ হইতনা যদি সে নিজের ভীরুতাকে নিজের মধ্যে সহসা স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি না করিত। গোরার কাছে যে সে কোনো কথা

ক্ষণকালের জন্যও ঢাকাঢাকি করিতে বাধ্য হইয়াছে সেজন্য সে আজ মনে মনে যেন গোরাকেই অপরাধী করিতে চেষ্টা করিতেছে। সার্কাসে যাওয়া লইয়া গোরা যদি বিনয়ের সঙ্গে দুটো ঝগড়ার কথা বলিত তাহা হইলেও সেটাতে বন্ধুত্বের সাম্য রক্ষিত হইত এবং বিনয় সান্ত্বনা পাইত— কিন্তু গোরা যে গম্ভীর হইয়া মস্ত বিচারক সাজিয়া মৌনর দ্বারা বিনয়কে অবজ্ঞা করিবে ইহাতে ললিতার কথার কাঁটা তাহাকে পুনঃপুনঃ বিঁধিতে লাগিল।

এমন সময় মহিম হুঁকা হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডিবা হইতে ভিজা ন্যাকড়ার আবরণ তুলিয়া একটা পান বিনয়ের হাতে দিয়া কহিলেন—"বাবা বিনয়, এদিকে ত সমস্ত ঠিক—এখন তোমার খুড়োমশায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেই যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁকে তুমি চিঠি লিখেছ ত?"

এই বিবাহের তাগিদ আজ বিনয়কে অত্যন্ত খারাপ লাগিল, অথচ সে জানিত মহিমের কোনো দোষ নাই— তাঁহাকে কথা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কথা দেওয়ার মধ্যে সে একটা দীনতা অনুভব করিল। আনন্দময়ী ত তাহাকে এক প্রকার বারণ করিয়াছিলেন—তাহার নিজেরও ত এ বিবাহের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিলনা—তবে গোলেমালে ক্ষণকালের মধ্যেই এ কথাটা পাকিয়া উঠিল কি করিয়া? গোরা যে ঠিক তাড়া লাগাইয়াছিল তাহা ত বলা যায় না। বিনয় যদি একটু মনের সঙ্গে আপত্তি করিত তাহা হইলেও যে গোরা পীড়াপীড়ি করিত তাহা নহে কিন্তু তবু! সেই তবুটুকুর উপরেই ললিতার খোঁচা আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। সেদিনকার কোনো বিশেষ ঘটনা নহে কিন্তু অনেকদিনের প্রভুত্ব ইহার পশ্চাতে আছে। বিনয় নিতান্তই কেবল ভাল বাসিয়া এবং একান্তই ভালমানুষি বশত গোরার আধিপত্য অনায়াসে সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সেই জন্যই এই প্রভুত্বর সম্বন্ধই বন্ধুত্বর মাথার উপর চড়িয়া বসিয়াছে। এতদিন বিনয় ইহা অনুভব করে নাই কিন্তু আর ত ইহাকে অস্বীকার করিয়া চলে না। তবে শশিমুখীকে কি বিবাহ করিতেই হইবে!

বিনয় কহিল—"না খুড়ো মশায়কে এখনো চিঠি লেখা হয় নি।"

মহিম কহিলেন—"ওটা আমারই ভুল হয়েছে। এ চিঠি ত তোমার লেখবার কথা নয়—ও আমিই লিখিব। তাঁর পুরো নামটা কি বলত বাবা।"

বিনয় কহিল "আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আশ্বিন কার্ত্তিকে ত বিবাহ হতেই পারবেনা। এক অঘ্রান মাস— কিন্তু তাহাতেও গোল আছে। আমাদের পরিবারের ইতিহাসে বহুপূর্ব্বে অঘ্রান মাসে কবে কার কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেই অবধি আমাদের বংশে অঘ্রানে বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্ম্ম বন্ধ আছে। পৌষমাসকে ত তাড়া দিয়ে আগিয়ে আনতে পারবেন না।"

মহিম হুঁকোটা ঘরের কোণের দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া কহিলেন—"বিনয়, তোমরা যদি এ সমস্ত মানবে তবে লেখা পড়া শেখাটা কি কেবল পড়া মুখস্থ করে মরা? একে ত পোড়া দেশে শুভ দিন খুঁজেই পাওয়া যায় না তার পরে আবার ঘরে ঘরে প্রাইভেট্ পাঁজি খুলে বসলে কাজকর্ম্ম চলবে কি করে?"

বিনয় কহিল "আপনি ভাদ্র আশ্বিন মাসই বা মানেন কেন?"

মহিম কহিলেন—"আমি মানি বুঝি! কোনো কালেই না। কি করব বাবা—এমুলুকে ভগবানকে না মানলেও বেশ চলে যায় কিন্তু ভাদ্র আশ্বিন বৃহস্পতি শনি তিথি নক্ষত্র না মানলে যে কোনো মতে ঘরে টিঁকতে দেয় না। আবার তাও বলি—মানিনে বলচি বটে কিন্তু কাজ করবার বেলা দিনক্ষণের অন্যথা হলেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে— দেশের হাওয়ায় যেমন ম্যালেরিয়া হয় তেমনি ভয়ও হয় ওটা কাটিয়ে উঠতে পারলুম না।"

বিনয়। আমাদের বংশে অঘ্রানের ভয়টাও কাটবেনা। অন্তত খুড়িমা কিছুতেই রাজি হবেন না।

এমনি করিয়া সেদিনকার মত বিনয় কোনোমতে কথাটা চাপা দিয়া রাখিল।

বিনয়ের কথার সুর শুনিয়া গোরা বুঝিল বিনয়ের মনে একটা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে বিনয়ের দেখাই পাওয়া যাইতেছিল না। গোরা বুঝিয়াছিল বিনয় পরেশ বাবুর বাড়ি পূর্ব্বের চেয়েও আরো ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। তাহার পরে আজ এই বিবাহের প্রস্তাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় গোরার মনে খট্‌কা বাধিল।

সাপ যেমন কাহাকে গিলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে কোনো মতেই ছাড়িতে পারেনা—গোরা তেমনি তাহার কোনো সংকল্প ছাড়িয়া দিতে বা তাহার একটু আধটু বাদ দিতে একেবারে অক্ষম বলিলেই হয়। অপর পক্ষ হইতে কোনো বাধা অথবা শৈথিল্য উপস্থিত হইলে তাহার জেদ আরো চড়িয়া উঠিতে থাকে। দ্বিধাগ্রস্ত বিনয়কে সবলে ধরিয়া রাখিবার জন্য গোরার সমস্ত অন্তঃকরণ উদ্যত হইয়া উঠিল।

গোরা তাহার লেখা ছাড়িয়া মুখ তুলিয়া কহিল—"বিনয়, একবার যখন তুমি দাদাকে কথা দিয়েছ তখন কেন ওঁকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মিথ্যে কষ্ট দিচ্ছ ?"

বিনয় হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—"আমি কথা দিয়েছি—না তাড়াতাড়ি আমার কাছ থেকে কথা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ?"

গোরা বিনয়ের এই অকস্মাৎ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত এবং কঠিন হইয়া উঠিয়া কহিল—"কথা কে কেড়ে নিয়েছিল ?"

বিনয় কহিল—"তুমি।"

গোরা। আমি! তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার পাঁচ সাতটার বেশি কথাই হয়নি—তাকে বলে কথা কেড়ে নেওয়া!

বস্তুত বিনয়ের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই ছিলনা—গোরা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য—কথা অল্পই হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে এমন কিছু বেশি তাগিদ ছিলনা যাহাকে পীড়াপীড়ি বলা চলে—তবুও একথা সত্য গোরাই বিনয়ের কাছ হইতে তাহার সম্মতি যেন লুঠ করিয়া লইয়াছিল। যে কথার বাহ্য প্রমাণ অল্প সেই অভিযোগ সম্বন্ধে মানুষের ক্ষোভও কিছু বেশি হইয়া থাকে। তাই বিনয় কিছু অসঙ্গত রাগের সুরে বলিল—"কেড়ে নিতে বেশি কথার দরকার করে না।"

গোরা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"নাও তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে করেই নেব বা দস্যুবৃত্তি করেই নেব এত বড় মহামূল্য কথা এটা নয়।"

পাশের ঘরেই মহিম ছিলেন—গোরা বজ্রস্বরে তাঁহাকে ডাকিল "দাদা।"

মহিম শশব্যস্ত হইয়া ঘরে আসিতেই গোরা কহিল—"দাদা, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলিনি যে শশিমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ হতে পারেনা—আমার তাতে মত নেই!"

মহিম। নিশ্চয় বলেছিলে! তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ বলতে পারত না। অন্য কোনো ভাই হলে ভাইঝির বিবাহ প্রস্তাবে প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ করত।

গোরা। তুমি কেন আমাকে দিয়ে বিনয়ের কাছে অনুরোধ করালে?

মহিম। মনে করেছিলুম তাতে কাজ পাওয়া যাবে, আর কোনো কারণ নেই।

গোরা মুখ লাল করিয়া বলিল—"আমি এ সবের মধ্যে নেই। বিবাহের ঘট্‌কালি করা আমার ব্যবসায় নয়, আমার অন্য কাজ আছে।"

এই বলিয়া গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হতবুদ্ধি মহিম বিনয়কে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সেও একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। মহিম দেয়ালের কোণ হইতে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া টান দিতে লাগিলেন।

গোরার সঙ্গে বিনয়ের ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন অনেক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু এমন আকস্মিক প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের মত ব্যাপার আর কখনো হয় নাই। বিনয় নিজের কৃত কর্ম্মে প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পরে বাড়ি গিয়া তাহার বুকের মধ্যে শেল বিঁধিতে লাগিল। এই ক্ষণকালের মধ্যেই গোরাকে সে যে কত বড় একটা আঘাত দিয়াছে তাহা মনে করিয়া তাহার আহারে বিশ্রামে রুচি রহিল না। বিশেষতঃ এ ঘটনায় গোরাকে দোষী করা যে নিতান্তই অদ্ভুত ও অসঙ্গত হইয়াছে ইহাই তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল,—সে বরাবর বলিল, "অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়!"

বেলা দুইটার সময় আনন্দময়ী সবে যখন আহার সারিয়া সেলাই লইয়া বসিয়াছেন এমন সময় বিনয় আসিয়া তাঁহার কাছে বসিল। আজ সকাল বেলাকার কতকটা খবর তিনি মহিমের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন। আহারের সময়

গোরার মুখ দেখিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন একটা ঝড় হইয়া গেছে।

বিনয় আসিয়াই কহিল—"মা আমি অন্যায় করেছি। শশিমুখীর সঙ্গে বিবাহের কথা নিয়ে আমি আজ সকালে গোরাকে যা বলেছি তার কোনো মানে নেই।"

আনন্দময়ী কহিলেন,—"তা হোক্ বিনয়—মনের মধ্যে কোনো একটা ব্যথা চাপতে গেলে ঐ রকম করেই বেরিয়ে পড়ে। ও ভালই হয়েছে। এ ঝগড়ার কথা দুদিন পরে তুমিও ভুলবে গোরাও ভুলে যাবে।"

বিনয়। কিন্তু, মা, শশিমুখীর সঙ্গে আমার বিবাহে কোনো আপত্তি নেই সেই কথা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি।

আনন্দময়ী। বাছা তাড়াতাড়ি ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার একটা ঝঞ্ঝাটে পোড়ো না। বিবাহটা চিরকালের জিনিষ, ঝগড়া দুদিনের।

বিনয় কোনো মতেই শুনিল না। সে এ প্রস্তাব লইয়া এখনি গোরার কাছে যাইতে পারিল না। মহিমকে গিয়া জানাইল—বিবাহের প্রস্তাবে কোনো বিঘ্ন নাই—পৌষ-মাসেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে—খুড়ামহাশয়ের যাহাতে কোনো অমত না হয় সে ভার বিনয় নিজেই লইবে।

মহিম কহিলেন—পাণপত্রটা হয়ে যাক্‌না।

বিনয় কহিল—তা বেশ, সেটা গোরার সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন।

মহিম ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"আবার গোরার সঙ্গে পরামর্শ!"

বিনয় কহিল—"না, তা না হলে চলবেনা।"

মহিম কহিলেন—"না যদি চলে তা হলে ত কথাই নেই—কিন্তু", বলিয়া একটা পান লইয়া মুখে পূরিলেন।

দলিত কুসুম।

৩

তটিনীর কূলে বৃক্ষ লতা পাতা ঘেরা
সুমন্তের গৃহখানি, সম্মুখে তাহার
মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুবাস যাহার
মৃদু সমীরের বুকে আসিছে ভাসিয়া।
গৃহখানি দৃঢ় অতি কাষ্ঠের নির্ম্মিত
নীচু গৃহছাদ তার, সুন্দর প্রাচীর।
সম্মুখের দালানেতে লতা রাশি দিয়া
ঘিরেছে কেমন। চারিদিকে তার শুধু
বিহগের কলকণ্ঠ হতেছে ধ্বনিত।
মধুকর ভ্রমিতেছে পুষ্প মধু আশে।
গৃহপ্রান্তে রহিয়াছে ঘুঘুদের বাসা,
অবিরত জানাতেছে মধুর গুঞ্জনে
দম্পতীর প্রেমালাপ, কলহ কেমন।
স্তব্ধতার পুরীসম শোভিছে সে স্থান,
আলো ছায়া খেলা করে বৃক্ষ রাশি পরে
গৃহখানি ছায়াতলে শোভিছে সুন্দর।
সন্ধ্যায় সে গৃহ হতে নীল ধূম শিখা
বাহিরায়। উদ্যানের দুয়ার সম্মুখে
ক্ষুদ্র পথ এক, তার দুধারেই শুধু
বৃক্ষ শ্রেণী শোভা পায়, অস্তগামী রবি
ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, কিরণ তাহার
করিতেছে ঝলসিত তরু রাশি সব।
সেই পুষ্পোদ্যানে সেই শ্যামল ভূমিতে
অশ্বারোহী একজন, দেখিছে চাহিয়া—
আঁখি যেন তৃপ্তিভরা, অদূরে সকল
চরিছে ঘিরিয়া সেথা কত পশুদল,
কেহ বা আলসে পড়ি শ্যাম দূর্ব্বাপরে,
কেহ বা সে দূর্ব্বাদল করিছে চর্ব্বণ।
সহসা সে অশ্বারোহী করে শৃঙ্গ-ধ্বনি,
সন্ধ্যার সঙ্কেত জানে মূক পশুদল,
ত্রস্ত ভাবে মুহূর্ত্তেক সেই দিকে চেয়ে
যে যাহার বাসগৃহে করিলা গমন,
এক সাথে যেন কালো মেঘের মতন।
তার পর অশ্বারোহী গৃহপথে ফিরি
আসিবে যেমন, হেরে সম্মুখে তাহার
দাঁড়াইয়া দ্বার পথে বৃদ্ধ পুরোহিত,
সঙ্গে তাঁর দাঁড়াইয়া কুমারী নলিনী।
অগ্রসর হন দোঁহে হেরিয়া তাহায়।
অশ্ব ছাড়ি অশ্বারোহী, আনন্দে আকুল
বাহু বাড়াইয়া হল দ্রুত অগ্রসর।
দেখিল তাহারা চেয়ে, সুমন্ত তাদের
চির পরিচিত, কি আনন্দে পরিপূর্ণ
হল সবে। ডাকি লয়ে সাদরেতে
প্রবেশি আলয়ে, সকলে বসিল গিয়া,
কত পুরাতন কথা নূতন করিয়া
হল আলোচনা,—করি পুনঃ আলিঙ্গন
পূর্ব্ব কথা, পূর্ব্ব স্নেহ স্মরণ করিয়া।

ক্রমে এলো গাঢ়তর সন্ধ্যার সে ছায়া
নামিয়া ধরণী পথে। নলিনীর বুকে
চিন্তাভার নেমে এলো। "বিমল এখনো
আসিল না" কেন তাই করিতেছে মনে।
কহিল সুমন্ত পরে, "আসিলে যে পথে
বিমলের তরী সবে পাওনি দেখিতে?"
এই কথা শুনি যেন নলিনী আননে
পড়িল বিষাদ ছায়া, চোকে অশ্রুজল
পূর্ণ হয়ে এল শেষে, কম্পিত বচনে
কহিল সে "চলে গেছে — কবে চলে গেছে?"
তার পর রাখি মুখ সুমন্তের বুকে,
আর এই দুঃখ ভার সহিতে না পেরে
কাঁদিতে লাগিল বালা। সুমন্ত তখন
বিষাদ মিশ্রিত স্বরে কহিল তাহারে
"কেঁদোনা নলিনী, শুধু আজ চলে গেছে
নির্ব্বোধ বালক মোরে রাখিয়া একেলা
পশুপাল সনে শুধু। প্রতিদিন তার
মন হত শান্তিহীন, দুঃখের আবেগ
সহিতে না পেরে শুধু তোমারি কাহিনী
কহিত আমায় তার দুঃখভরা প্রাণে।
অবশেষে আর কিছু করিতে না পেরে
পাঠালেম তারে আমি বাণিজ্যের তরে।
যদি সেই কোলাহলে, কিছু ভুলে যায়
আনন্দে প্রফুল্ল হয় সে বিষণ্ণ মুখ
এই লাগি পাঠালাম। কেন কাঁদ তুমি
সে পারেনি বহু দূরে যাইতে কখনো,
উজানে বাহিছে তরী, কাল প্রভাতের
সেই রাঙা আলোটুকু জাগিবার আগে
আমরাও তার সাথা হইব নলিনী
বাঁধিয়া আনিব পুনঃ এই কারাগারে।"
আনন্দের কোলাহল আসিল ভাসিয়া
তটিনীর কূল হতে। বীণা লয়ে করে
সেই গ্রামবাসী বৃদ্ধ করিল প্রবেশ
'মহিমা' তাহার নাম। সুমন্তের সাথে
বহু দিন দুই জনে একই আলয়ে
কাটায়েছে তাহাদের জীবনের দিন।
জীবনে দুইটি শুধু অতি প্রিয় তার
সেই বীণাখানি আর শুভ্র কেশভার।
সকলে হেরিয়া তারে কহিল হরষে
"মহিমা অমর হও"। কি হাস্য উচ্ছ্বাস
ভাসিল সে পথশ্রান্ত মলিন আননে!
নলিনীরে লয়ে সাথে বৃদ্ধ পুরোহিত
অগ্রসর হইলেন আবাহন তরে।

বৃদ্ধ সে সুমন্ত হর্ষে উন্মাদের পারা
আলিঙ্গন করি তারে জড়ায়ে ধরিল।
তার পর প্রশ্ন রাশি প্রত্যেক আননে
কেহ করে এক প্রশ্ন, কেহ অন্য এক।
সকলে দেখিল চেয়ে সুমন্ত সে আজি
ধনবান, কাননের যেন অধিপতি।
দেখিল পশুর পাল অগণন যাহা
চারিদিক সুখৈশ্বর্য্য রয়েছে ছড়ায়ে।
শুনিল সুমন্ত মুখে কি দারুণ দুঃখে
কি অসীম ধৈর্য্য লয়ে স্থাপিল আলয়।
সকলে ভাবিল মনে এইরূপে তারা
সুমন্তের পদচিহ্ন ধরি অগ্রসর
হবে কার্য্যক্ষেত্র পানে। তার পরে সবে
আসিল গৃহের মাঝে, আহারের দ্রব্য
সজ্জিত সম্মুখে সুখে করিল আহার।
আহারে আনন্দে মত্ত, হয়েছে সকলে।
সন্ধ্যার আঁধার রাশি পড়িল ছড়ায়ে
চারিদিকে, তার পর রজত কিরণে
হাসিয়া উঠিল যেন প্রকৃতি সুন্দরী।
সকলি নীরব যেন, সমতল ভূমি
কুয়াসা আবৃত সেই চাঁদের কিরণে
হয়েছে উজ্জ্বল। উপরে চাহিয়া আছে
ছল ছল আঁখি লয়ে নক্ষত্র সকল।
গৃহের মাঝারে জ্বলে উজ্জ্বল প্রদীপ,
গৃহকর্ত্তা সকলেরে যোগায় আহার,
করাতেছে পরিতোষ সাদরে যতনে।
কহিল সুমন্ত সবে "প্রিয় মিত্রগণ
এতদিন গৃহ হারা, মিত্র হারা হয়ে
ভ্রমিয়াছ পথে পথে, এস গৃহে আজ
এই গৃহ চির দিন তোমাদের তরে
মুক্ত জেনো মিত্র সব। পুরাতন সেই
আমাদের জন্মভূমি, নিজ গৃহ হতে
এ গৃহ মধুর আরো। এখানে আসেনা
দুরন্ত হিমানী কভু তুষারের সম,
জমাট করেনা তাহা দেহের শোণিত
এখানেও নেই সেই প্রস্তর বন্ধুর
ভূমিতল। সমতল শস্যেতে শ্যামলা
এই ভূমি। সারাটি বরষ ধরে হেথা
নেবু গাছ ফুলময়, ফলে ভরা নত।
শ্যামল দূর্ব্বার তল চির বসন্তের।
উন্মুক্ত কানন হেথা পশুদের তরে।
আমরাও পাই স্থান মাগিলে রাজায়,
আপনারা কাট কাটি লইয়ে কুঠার

একবার আজ্ঞা যাচি, রচি গৃহদ্বার।
বর্ষগত না হইতে সোনার বরণ
হয়ে উঠে ধান্য ক্ষেত্র শস্য ভার লয়ে।
ইহা নহে অরাজক সে রাজ্যের সম,
গৃহ দ্বার হতে হেথা দিবেনা তাড়ায়ে,
তোমাদের ধন রত্ন লবেনা লুটিয়া।”
এই কথা বলি তার বিস্ফারিত আঁখি
নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন বহিছে নিঃশ্বাস,
সজোরে প্রহার করে সম্মুখের সেই
আসন উপরে, তার দৃঢ় মুষ্টি করে।
আগত অতিথি সবে চমকিত হয়ে
রহিল চাহিয়া শুধু। বৃদ্ধ পুরোহিত
যতনে দিলেন করি চেতনা তাহার।
হাসিয়া আবার লভি আপনার জ্ঞান
সুমন্ত কহিল “ইহা পীড়া শুধু এক
এর কথা মনে কিছু কোরোনা তোমরা”।
সহসা দুয়ার পথে হল কোলাহল,
পদশব্দ হল শ্রুত নিকটে তাদের।
সুমন্তের আজ্ঞা পেয়ে, দেশবাসী যারা
সুমন্তের তরণীতে এলো নির্ব্বাসনে,
নিকটেই রচি গৃহ আছে সুখে তারা,
এসেছে ভেটিতে তারা পুরাণ বন্ধুরে।
কি আনন্দময় সেই মিলন আবার,
বন্ধুসব পরস্পরে করে আলিঙ্গন,
যারা নির্ব্বাসনে ছিল, যেন অজানিত
পুন নব প্রেমডোরে করিছে বন্ধন।
আবার বাজায়ে বীণা সুমধুর স্বরে
মহিমা ধরিল গান, সেই গীতধ্বনি
বীণার মধুর ধারা মাদকের সম
পরশিল উল্লসিত হৃদয় সবার।
আনন্দে ভুলিয়া দুঃখ, পাশরি আপনা
সেই সুরে নৃত্য করে উন্মাদের মত।
নয়নে উজ্জ্বল জ্যোতি উড়িছে বসন
কি আনন্দ প্রভাসিত হল সেই ঘরে।
এই সব কোলাহলে না মিশে না মিলে,
পুরোহিত সাথে বসি সুমন্ত সুধীর
গোপনে কহিছে দূর ভবিষ্যৎ কথা।
নলিনী দাঁড়ায়ে দূরে মোহমুগ্ধ প্রায়,
পুরাতন স্মৃতি যেন উজ্জ্বল হইয়া
জাগিয়া উঠিছে সেই আনন্দ সঙ্গীতে।
শ্রবণে বাজিছে তার সমুদ্রের বাণী
বিষাদের ম্লান ছায়ে ভরিল হৃদয়।
নলিনী চলিল ধীরে উদ্যান ভিতরে
কেহ দেখিল না তায়, সুন্দর রজনী
কাননের কালো সেই প্রাচীর উপরে,
ছড়ায়ে রজত ধারা উঠিয়াছে শশী,
কম্পিত শাখায় জ্বলে শুভ্র সে জোছনা;—
প্রেমের মধুর যেন কল্পনার সম
প্রণয়ীর অন্ধকার মরুময় বুকে।
নলিনীর কাছে ফুটে সোনালী কুসুম
ঢালিছে সুবাস রাশি, ঈশ্বরের কাছে
সেই যেন তাহাদের প্রার্থনা জানায়।
তা হতেও পূর্ণ সেই প্রেমের সৌরভ
যেন রজনীর ছায়ে শিশিরেতে নত
জাগিছে নলিনী বুকে। নীরব জ্যোছনা
সেই কুহকের সম জাগাইয়া দিল
আকুল প্রাণেতে তার মিলন কামনা।
ছাড়ায়ে কানন দ্বার বৃহৎ পাদপ
নলিনী চলিল দূর কাননের পথে।
নীরব নিস্তব্ধ পথ জ্যোছনায় স্নাত
জোনাকীর দল করে আলো বিকিরণ
সংখ্যা নেই তার যেন। উপরে আকাশে
জাগিছে নক্ষত্রকুল, যেন তারা সব
দয়াময় ঈশ্বরের কল্পনার সম।
এই তারকার আর জোনাকীর আলো
পশিল নলিনী বুকে, আবেশে অধীর
কহিল সে মৃদু কণ্ঠে “বিমল আমার
কাছে আছ তবু প্রিয় পাইনা দেখিতে,
সে মধুর কণ্ঠস্বর পশেনা শ্রবণে,
কত দিন হেথা তুমি ভ্রমিয়াছ একা,
এই বনশোভা প্রিয় হেরেছ নয়নে।
কত দিন শ্রমক্লান্ত, পাদপের তলে
এই খানে এসে প্রিয় পড়েছ ঘুমায়ে।
স্বপনে আমার দেখা পেতে প্রতিদিন।
কবে আর বল প্রিয় হেরিব নয়নে
বাঁধিব বাহুর পাশে আবার তোমায় ?”
সহসা বিহগ এক উঠিল গাহিয়া,
তার সে মধুর স্বর কাননের বুকে
ভাসিল বাঁশরী সম, দূরে অতি দূরে
ঘন কাননের ছায় গেল মিশে ধীরে।
“শান্ত হও” ঘন শাখা দুলাইয়া ধীরে
কহিল পাদপ সব অন্ধকার হতে।
জ্যোৎস্নাস্নাত মুক্ত সেই প্রান্তর হইতে
উঠিল নিঃশ্বাস ধীরে “পাবে তারে কাল।”
উজ্জ্বল রবিরে নিয়ে এল পর দিন,
কাননের ফুলবালা, শিশিরাশ্রু দিয়া

ধুইল চরণ তাঁর ; কিরণ কিরীট
মধুর সমীরে দোলে যেন খেলা ছলে।
'বিদায়' কহিল সেই শান্ত পুরোহিত
দাঁড়াইয়া ছায়াময় প্রাঙ্গণে যাইয়া
"আনি সে প্রবাস হতে গৃহ হারাটিরে
বাঁধি দিও বালিকার কনক অঞ্চলে।"
বিদায় মাগিয়া নিয়া নলিনী তখন
সুমন্তের সাথে গেল তটিনীর তীরে।
ভাসিছে তরণী ক্ষুদ্র সলিল হিল্লোলে,
নাবিকেরা বসে ছিল আশা পথ চেয়ে।
বিমল প্রভাতে লয়ে উজ্জ্বল আলোক
চলিল আশায় ভাসি ; যে গিয়াছে চলে
অদৃষ্টের নিদারুণ ঝটিকার ঘায়
শুষ্ক পল্লবের সম মরুর মাঝারে,
তাহারে পাইতে পুনঃ ফিরায়ে আবার।
সেই দিন, তার পর আরো দুই দিন
হল গত, কোন চিহ্ন নাহি তার, বনে
কিম্বা তটিনীর তীরে, নাহি ক্ষুদ্র তরী।
কিছু দিন পরে তারা পাইল কিনারা,
অনিশ্চিত, লোক মুখে বার্ত্তা পেয়ে শুধু
চলিল তাহারা দূরে, অবশেষে দোঁহে
শ্রান্ত হয়ে ক্ষুদ্র এক নির্জ্জন নগরে
বাঁধিয়া তরণী গেল, ক্ষুদ্র পান্থশালা
সেই খানে। শুনে তারা গৃহ কর্ত্তা মুখে
বিমল সঙ্গীর সাথে অশ্বদল লয়ে
গিয়াছে ফিরিয়া পুনঃ পিতার আবাসে।

৪

দূর পশ্চিমের তীরে নির্জ্জন প্রদেশে
উচ্চ শৈল শোভিতেছে, তুষার ধবল।
দুই পার্শ্বে উচ্চ শৈল মধ্য দেশে তার
ক্ষীণ পথ শোভা পায়, শৈল চূড়া এক
প্রবেশের দ্বার পথে দ্বারীর সমান।
সেই খানে নামি সবে শকট হইতে
চলিল তরণী বুকে। আনন্দ আলসে
বহিতেছে স্রোতস্বিনী, অগণিত তার
ঝর ঝর বারি ধারা ঝরিছে সদাই
ছুটিছে সাগর মুখে। যেন বীণা বুকে
তারে তারে দ্রুত খেলা সঙ্গীত তরঙ্গে।
এই সব নদী তটে শ্যামল প্রান্তর
আলো আর ছায়া লয়ে সদা মধুময়
সদাই সুগন্ধী বায়ু পরাগ মাখিয়া
খেলিতেছে মুক্ত পথে, ফুটন্ত কুসুমে
আলো করে আছে সেই শ্যাম বনভূমি।
দূরে চরিতেছে সব পশুপাল যত
কোন খানে কাননেতে জ্বলিছে অনল
অন্ধকার গগনেতে বিজলীর প্রায়।
সারাদিন বহে ক্লান্ত হয়েছে পবন।
সেই বন ভূমে পূর্ব্বে কোন জাতি এক
গিয়াছিল যুদ্ধ তরে। সেই বন পথ
রঞ্জিত শোণিত ধারে। উর্দ্ধে গগনেতে
ছড়ায়ে বিচিত্র পক্ষ শকুনির দল
ঘুরিছে ফিরিছে শূন্যে, যেন তারা সব
সেনাপতি সম ফিরে অশান্ত অধীর।
দূরে কভু দেখা যায় শিবির হইতে
উঠিতেছে ধূম শিখা। নদী তীরে কোথা
রহিয়াছে কুঞ্জ সম কণ্টকে আবৃত
বৃক্ষরাশি। নদী তটে বৃক্ষ মূল তুলি
বনের ভল্লুক সুখে করিছে আহার।
উপরে অনন্ত সেই নীলিম গগন
ঈশ্বরের হস্ত সম রয়েছে প্রকাশ।
এই সব বন পথে পর্ব্বত মালায়,
বিমল আসিয়াছিল, সঙ্গীদের লয়ে।
প্রতিদিন সঙ্গী সাথে সুমন্ত নলিনী
অগ্রসরি যাইতেছে তাহাদের পানে।
কভু তারা দেখে কিম্বা কভু ভাবে মনে,
বিমলের শিবিরের অনলের শিখা
দেখা যায় অতি দূরে বিমল প্রভাতে ;
সন্ধ্যাকালে যবে তারা অতি শ্রান্ত হয়ে,
আসে পুনঃ সেই স্থানে দেখে শুধু তারা
অবশিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ড আর ছাই রাশি।
যদিও শরীর ক্লান্ত অশান্ত হৃদয়,
তবু আশা আলো সদা দেখাইছে পথ
আলেয়ার আলো সম ভুলাইয়া আঁখি।
একদা বসিয়া সবে জ্বালাইয়া আলো
হেনকালে এল এক সে দেশী রমণী
শিবিরে তাদের, মুখে তার মাখা যেন
দুঃখের মলিন ছায়া আর সহিষ্ণুতা।
বলিল সে আসিয়াছে অতি দূর হতে,
স্বামী তার হত কোন অন্যায় সমরে।
শুনি তার দুঃখ কথা করুণ অন্তরে,
খাদ্য দ্রব্য দিল তারে যতন করিয়া।
আহারান্তে শিবিরেতে শ্রমক্লান্ত হয়ে
পড়িল ঘুমায়ে সবে। শুধু একা বসি
নলিনী শিবিরে তার। ভিখারিণী গিয়া
কহে তারে আপনার দুঃখের কাহিনী।
নলিনীর বুকে যেন করুণার ধারা

বহে গেল, অশ্রুজলে আঁখি ছুটি তার
ভরিয়া উঠিল। সে বুঝিল নিজ প্রাণে
পরের বেদনা রাশি। তার পর ধীরে
আপন গোপন সেই প্রণয় কাহিনী
বলিল সে, শুনি তাহা স্তব্ধ সে রমণী;
যেন তারে কে ডুবাল আতঙ্ক আঁধারে।
তার পর ধীরে ধীরে কহিল তখন,
"কোন দেশে তুষারের বর একজন
লভেছিল নারী এক, বিবাহের পরে
হইলে প্রভাত তাহা মিলাইয়া গেল
রবির কিরণ পেয়ে। তার পর ক'নে
না হেরি সে স্বামী তার ছুটিয়া চলিল
দুর বনে অনুসরি, আসিলনা আর।"
পুনঃ নলিনীরে কহে "অন্য দেশে এক
কিশোরী কুমারী ছিল, ছায়া দেখি শুধু
সঁপেছিল প্রাণ মন, মনে হত তার
গাছের ছায়ার তলে সন্ধ্যার আঁধারে
আসিত সে। নিশ্বাস তাহার সন্ধ্যাবায়ু
সম পশিত শ্রবণে। মৃদু মর মর
কহিত তাহারে যেন প্রণয়ের কথা।
এইরূপে অনুসরি প্রণয়ীর পথ
চলিল কিশোরী বনে, আসিল না আর,
ফিরিয়া সে স্নেহময় পিতার আবাসে।"
নীরবে নলিনী শুনে বিচিত্র কাহিনী
যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে, ভয় ও বিস্ময়ে
ভরেছে হৃদয় তার, শুনিতে শুনিতে
এই ঐন্দ্রজালময় কাহিনী সকল।
ভাবে মনে চারিদিকে সবি মন্ত্রময়,
মায়াজালে বাঁধিয়াছে, সঙ্গিনী তাহার
যেন গো মায়াবী কোন রয়েছে বসিয়া।
ধীরে ধীরে উচ্চ সেই শৈল চূড় পরে
উঠিল মধুর শশী আলোকিত করি
সেই সে শিবির ক্ষুদ্র। পরশিল ধীরে
নিদ্রিত পল্লবদলে রহস্য মাখান
সে উজ্জ্বল আলো দিয়ে। সাদরেতে যেন
বনভূমি হৃদয়েতে পড়িল ছড়ায়ে।
কি মধুর মৃদুরবে ছুটিছে তটিনী,
বৃক্ষ শাখা ফেলি শ্বাস গোপনেতে যেন
কহে কথা তার সনে। নলিনীর বুকে
প্রণয়দেবতামূর্ত্তি, প্রণয়ের আলো
জ্বলিতেছে, কিন্তু তার হৃদয়েতে আজি
অজানা বিষাদ আর ভয় মিশে আছে।
পশেছে বিষাক্ত সর্প বিহগের নীড়ে।

ধরণীতে ভয় শুধু হারাতে তাহার।
আকাশ হইতে ভেসে স্বর্গরাজ্য হতে
পবিত্র নিঃশ্বাস যেন, রজনীর সেই
স্নিগ্ধ সমীরণ সনে যেতেছে বহিয়া।
সহসা সে মনে করে সেও যেন সেই
রমণীর মত ঘুরে ছায়ার পশ্চাতে।
এই সব চিন্তাবুকে, ক্লান্ত হয়ে বালা
ঘুমায়ে পড়িল, সব চিন্তা গেল দূরে।
পর দিন প্রাতঃকালে যাত্রার সময়
বাহির হতেছে সবে, অনাথা রমণী
কহিল তখন "ওই পশ্চিমের তীরে
পর্ব্বতরাশির মাঝে আছে ক্ষুদ্র গ্রাম
আছেন দয়ালু এক পুরোহিত জন
সাদরে শিখান সবে ধর্ম্মের কাহিনী।
শুনি সেই পুণ্য কথা ভাসে অশ্রুজলে
যত নরনারী সবে।" নলিনী তখন
সহসা ব্যাকুল হয়ে কহিল "ত্বরায়
চল তবে সেইখানে, শুভ সমাচার
আছে আমাদের তবে চল সেইখানে।"
সেই পথে তারা সবে হল অগ্রসর।
যখন ডুবেছে সূর্য্য পশ্চিম গগনে;
শুনিল সকলে তারা বাক্য কোলাহল,
নেহারিল দূরে সেই শিবির সকল।
বৃহৎ পাদপ তলে নতজানু হয়ে
পুরোহিত করিছেন প্রার্থনা তখন।
বৃক্ষ সেই ছায়াবৃত ঘন লতিকায়,
বসিয়াছে সারি সারি নত নরনারী
নতজানু হয়ে সেথা। প্রার্থনা মন্দির
তাহাদের বৃক্ষতল। মানব সঙ্গীত
গাহে, সেই সাথে, যেন বৃক্ষলতা মিলে
গাহিতেছে সমস্বরে। আগন্তুক সবে
অগ্রসরি সেই স্থানে হল উপনীত।
তারাও বসিল সবে নতজানু হয়ে
মিলাইল হৃদি প্রাণ প্রার্থনা সাহত।
প্রার্থনা হইল শেষ, আশীর্ব্বাদ ধারা
বরষিল পুরোহিত। যেন বপনের
বীজ ঝরে হস্ত হতে ঝর ঝর করি।
সদাশয় পুরোহিত ক্রমে উপনীত
হ'ল আগন্তুক পাশে, জিজ্ঞাসি কুশল
সাদরে আহ্বান করি। যবে তারা সবে
উত্তরিল বহুদিন পরে শুনি পুনঃ
মাতৃভাষা পুলকিত হল হিয়া তাঁর।
সাদরে ডাকিয়ে লয়ে আসিলেন গৃহে

তৃপ্ত করালেন সবে আহার যোগায়ে,
ঢালিয়া শীতল জল। তার পর তারা
নিবেদিল আপনার দুঃখের কাহিনী,
শুনি সেই সব কথা কহে পুরোহিত
"ছয় দিন সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে
বিমল আছিল হেথা। এই এ আসনে
যেখানে বসিয়া বালা, সেই খানে বসি
বলেছিল আপনার বিষাদ কাহিনী।"
পুরোহিত কণ্ঠস্বর বিষাদেতে পূর্ণ
অতি মৃদু নলিনার হৃদয়েতে যেন
বাজিল দুঃখের সম, যেন শীতকালে
পড়িল তুষার শূন্য বিহঙ্গের নীড়ে।
বলিলেন পুরোহিত "উত্তরেতে দূরে
গিয়াছে বিমল। পুনঃ শরতের কালে
করিয়া শীকার শেষ আসিবেক হেথা।"
নলিনী বলিল ধীরে "এইখানে পিতা
দয়া করে দাও স্থান এই দুঃখিনীরে।"
সকলে ভাবিয়া শেষে করে তাই স্থির,
সুমন্ত সঙ্গীর সাথে অশ্বারোহে চলি
গেল আপনার স্থানে। নলিনী একাকী
বিমলের পথ চাহি রহিল সেখানে।
ধীরে ধীরে কাটে দিন, এক যায়, আসে
আর গত হল ধীরে, সপ্তাহ প্রথমে,
পরে পক্ষ ক্রমে মাস। জনারের ক্ষেত
ক্রমে বিকশিত হয়ে উঠিল কেমন।
নলিনা আসিল যবে তারা শিশু সম
আছিল নবীন শ্যাম, এখন তাহারা
দুলাইয়া সুকুমার শাখা পাতাগুলি
উঠিছে উপর পানে। বিহঙ্গেরা এসে
তাদের সঞ্চয়গৃহ করেছে যতনে
সেই পত্রগুচ্ছ মাঝে। বসন্তের কালে
জনার তুলিল সবে। কুমারীর দলে
যদি লভে বিকশিত রক্তিম জনার
প্রবাদের বাণী আছে লভে সে প্রণয়ী।
কত লাল জনারেরে তুলিল নলিনী
এলোনা এলোনা তবু বিমল তাহার।
"ধৈর্য্য ধর" পুরোহিত বলেন সদাই,
"বিশ্বাস রাখিও হৃদে, প্রার্থনা তোমার
এক দিন এ জগতে হইবে সফল।
দেখ ওই ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রান্তরে কেমন
উত্তরের পানে চেয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ
হেরিতে চুম্বকে যেন। বিধাতা স্বজিত
এই পুষ্প, এরে হেরি পথিকের দল
দিক নিরূপণ করে, সমুদ্রের সম
দিকহীন সীমাহীন মরুর মাঝারে।
যেমন মানব প্রাণে বিশ্বাসের আলো।
আবার আকাঙ্ক্ষা পুষ্প ভুলায় কেমন
যেমন সুন্দররূপে, মধুর সৌরভ
তেমনি ভুলায় হিয়া। দিকহারা হয়ে
পথভ্রষ্ট হয় সবে মদির সৌরভে;
মোদের হৃদয়-বৃন্তে সুধু যে বিশ্বাস
সে মোদের দেয় আলো অন্ধকারপথে
সাজায় স্বর্গের ফুলে পূরায় কামনা।"
আসিল শরৎকাল, কাটিল আবার;
আসিল দুরন্ত শীত, বিমল তাহার
তবু আসিল না ফিরে। বসন্তে আবার
কুসুমিত হল ধরা, মধুর সুস্বরে
কাননে গাহিল পাখী;—এলো না বিমল!
গ্রীষ্মের সমীর বুকে এলো ভাসা কথা
যে কথা মধুরতর সুরভি হইতে
সুমধুরতর তাহা কলকণ্ঠ হতে,
উত্তরের পূর্ব্বে এক কোন বনপ্রান্তে
বিমল সঙ্গীর সাথে নদী তটে এক
করিয়াছে বাসা তার। শুনি এই কথা
নলিনী বিদায় লয়ে সেইখান হতে
চলিল উদ্দেশে তার। পথশ্রমে ক্লান্ত
দেহে অবশেষে উপনীত হল যবে,—
কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত না বিপদ
সহি, সেই স্থানে দেখে গিয়া শূন্য গৃহ
পড়ে আছে, কেহ নাই নিকটে তাহার।
এইরূপে কেটে যায় বিষাদেতে পূর্ণ
সুদীর্ঘ বরষগুলি। নানা পথে ঘুরি
বেড়ায় নলিনী একা। পথিকেরা তারে
দেখে কভু আহতের শিবির দুয়ারে
কখনো মন্দিরদ্বারে। কভু যুদ্ধক্ষেত্রে
করিছে আহতসেবা সে দীনা রমণী।
কখনো কুটীরে ক্ষুদ্র, কভু বা নগরে
ছায়ার মতন ফিরে সে যে একাকিনী,
অজানিত আসে যায় বিস্মৃতের মত।
যে রূপ মধুর ছিল প্রথম যখন,
আশার উৎসাহে বালা করে আগমন,
গেছে সে মধুররূপ, নিরাশার মাঝে
অতীতের ছায়া সম বেড়ায় ঘুরিয়া।
প্রতি বর্ষ এসে যেন চুরি করে যায়
তাহার সে রূপরাশি, রেখে যায় শুধু
শুভ্র কেশ দু'একটি ললাটে তাহার,

অন্য জীবনের উষা জানাইছে যেন ;
যা এসে জাগিবে তার জীবনের পারে
এ যেন জানায় এসে তারি সমাচার।

৫

কোন এক মধুময় তটিনীর তীরে
আছে শান্তিময় এক সুন্দর আশ্রম,
সেই আশ্রমের ধারে ঝরিছে সদাই
ঝরঝরে তটিনীর স্নিগ্ধ বারিধারা।
মধুর বহিছে বায়ু। ফল বৃক্ষগুলি
ফলভারে অবনত। সেই গ্রামবাসী
রেখেছে পথের নাম কাননের নামে।
সেই স্থানে অবশেষে লভেছে আশ্রয়
নলিনী বিষাদময়ী। সেই সে আশ্রমে
ছিলেন ধার্ম্মিক এক। তাঁহার নিকটে
তাঁহার শিষ্যের দলে রহিল সে গিয়া।
যবে সে ধার্ম্মিক জন ছারতনু ত্যজি
গেলেন স্বরগপথে, শত শিষ্য মাঝে
নলিনী একাকী ছিল তাঁহার নিকটে।
এ দেশ তাহার যেন সবি পরিচিত।
হৃদয় তাহার যেন হল মুগ্ধ প্রায়।
সেই গ্রামবাসী সবে শান্ত ও সরল,
মনে পড়ে দেখিলেই, অতীত বিস্মৃত
আপন জনমভূমি যেথানেতে তারা
সকলে সবার ছিল ভ্রাতার সমান।
বিফলে নৈরাশ্যে ঘুরি গ্রাম হতে গ্রামে
অবশেষে শান্তভাবে রহিল সেথায়।
জগতের আশা তার গিয়াছে ফুরায়ে,
যেমন আলোর পানে পল্লবের দল
চেয়ে থাকে, সে ত সেই মত চেয়ে আছে
পরলোক পানে শুধু। যেমন পর্ব্বত
হতে প্রভাতের কুয়াসা আঁধার যায়
দেখে চেয়ে অতি নিম্নে হাসিছে কেমন
রবিকরে আলোকিত শ্যাম উপত্যকা,
ছুটিছে তটিনী, জাগে কত গ্রাম, দেশ,
তেমনি অন্তর হতে গিয়াছে আঁধার
দেখিছে সে অতি দূরে রয়েছে এ ধরা
নহে সে আঁধার আর, প্রেম আলোময়।
যত পথ দেখা যায় প্রশান্ত মধুর,
বিমল বিস্মৃত নহে অন্তরে তাহার
রয়েছে আসন সেথা প্রেমদেবতার।
তেমনি প্রণয়ে পূর্ণ, সোহাগে মধুর,
আরও মধুরতর স্মৃতি আজি তার
হয়েছে নলিনীপ্রাণে বিরহে তাহার।
বর্ষ যায় কত, তবু স্মৃতি সেই মত
তাহা কভু আর নাহি হবে অন্যরূপ।
ধৈর্য্য ধরি করিয়া সে আত্মবিসর্জ্জন
পরের সেবার তরে, করে সমর্পণ
আপন জীবন তার। দুঃখ ও বিরহে
শত পরীক্ষায় শিক্ষা লভেছে সে আজ।
সর্ব্বজীবে সমভাবে করিছে করুণা
ভালবাসা ছড়াইয়া পড়ে চারিধারে ;
যেমন সুবাস কোন সুগন্ধ হইতে
বাহিরিলে, সে সুগন্ধ নষ্ট নাহি হয়।
জগতের আশা আর, জীবনের আশা
নাহি তার, কায়মনে জুড়াইতে চায়
ত্যজিয়া জীবন সেই অনন্তের পায়।
এইরূপে বহুকাল কাটাল নলিনী,
আহত রুগ্নের সেবা করিল সেবিকা।
কখনো নির্জনে কোনো দরিদ্র কুটীরে,
কখনো সে জনাকীর্ণ কোনো গৃহমাঝে
যেখানেতে দরিদ্রতা, বিষাদ, অভাব,
গোপনে লুকায়ে আছে সূর্য্যকর হতে,
যেখানে দুঃখে ও রোগে বিষাদ মাঝারে
অনাথা পড়িয়া আছে। প্রতি রজনীতে
ধরণী ঘুমায় যবে, প্রহরী হাঁকিয়া
যায়, দেখে রাজ্য মাঝে সমস্ত মঙ্গল,
দেখে সেও কোনো গৃহে জ্বলিতেছে আলো
নলিনী একাকী করে দুঃখীদের সেবা।
প্রভাতের উষালোকে গ্রামবাসী যবে,
ফল ফুল লয়ে যায় বিক্রয়ের তরে,
দেখে তারা, শান্ত সেই মলিন আননে
নলিনী ফিরিয়া যায় গৃহেতে আপন।
সহসা সে গ্রামে যেন ঘিরিল বিপদ,
আশ্চর্য্য ঘটনা হল, বন্য পারাবত
ঢাকিয়া সূর্য্যের কর উড়িল গগনে
শস্য মুখে লয়ে। সহসা শরৎকালে
সমুদ্র জোয়ারে যথা ভাসায় প্রান্তর,
ছুটে রজতের ধারা ক্ষীণা স্রোতস্বিনী,
তেমনি মৃত্যুর বাণ আসিল ভাসিয়া
ভাসাল জীবন নদী। ধন রত্নরাশি
কিছুতেই পারিল না রোধিতে তাহায়।
রূপ ছায় ভুলিল না নিঠুর শমন।
সকলেরি সমভাবে করিল সংহার।
কেবল দরিদ্র যারা, যাহাদের নাই
আপনার প্রিয়জন, নাহি গেহ যার,
তাহারা আশ্রয় লভে অনাথ আশ্রমে,

যে আশ্রম ছিল সেই কাননের বুকে
প্রান্তরের কাছে। সেই আশ্রমের মাঝে
অনাথ দুর্ব্বল চাহে অনাথশরণে,
মৃত্যুর মাঝারে লভে অমৃতপরশ।
সেবিকা নলিনা সেথা নিশীথে দিবসে
করিছে শুশ্রূষা সবে, মৃত্যু কোলে যারা
লভিবে বিশ্রাম, তারা যেন তার মুখে
হেরিছে স্বর্গের আলো। সে যেন গো তথা
স্বর্গের দূতের চিত্র, চিত্রকরকরে।
অথবা স্বর্গের আলো স্বর্গের দুয়ারে,
যেন তার মুখচ্ছবি, দেখাইছে পথ
যে পথে বিশ্রাম লভি যাইবে সত্বরে।
বিশ্রামের দিনে এক নির্জ্জন সে পথে,
নলিনী আশ্রমমুখে করিল গমন।
আশ্রমের দ্বারে যবে করিল প্রবেশ
কি মধুর সুধাগন্ধে ভরিল হৃদয়।
তুলিল সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর কুসুম,
ভাবিল অন্তরে, যদি কেহ মৃত্যুকালে
হেরি সে সুন্দর পুষ্প, লভি সে আঘ্রাণ
হয় সুখী। যেমন সে সোপানেতে করে
আরোহণ, স্নিগ্ধ বায়ু গেল পরশিয়া,
মন্দিরেতে ঘণ্টাধ্বনি হইল মধুর।
প্রান্তর হইতে আসে সঙ্গীতের ধ্বনি
বিভুগান গায় সবে। যেন মোহময়
শান্ত, আহত করিয়া পশিল পরাণে।
কে যেন অন্তরে তার কহিল ডাকিয়া
"তোমার পরীক্ষা শেষ"; নয়নেতে তার
জ্বলিল স্বর্গের আলো। রোগীদের গিয়া
করিল সান্ত্বনা, তৃষ্ণার্ত্তেরে দিল বারি,
মৃতের নয়ন মুদি ঢাকিল বয়ান।
যারা সব তুষারের সম পথ পার্শ্বে
পড়েছিল। কত শ্রান্ত যাতনা অধীর
চাহিল তাহার পানে। যেন রবিকর
কারাগারে পশিয়াছে। চারিদিকে চেয়ে
দেখিছে নলিনী, কেমন মৃত্যুর হস্ত
শান্তি ও সান্ত্বনা দেয় অভাগা মানবে।
কত পরিচিত দেহ নাহি সেথা আর,
কত যে নূতন জন এসেছে সেথায়
সংখ্যা নাহি তার।
সহসা অন্তর
কাঁপিয়া উঠিল তার, যেন চরাচর
উঠিল ঘুরিয়া, স্থির অচেতন সম
রহিল দাঁড়ায়ে, হস্ত হতে ঝরে ফুল,
নয়নের জ্যোতি তার যেন নিভে গেল।
কি আকুল দুঃখপূর্ণ করুণ কণ্ঠের
উঠে মর্ম্মভেদী স্বর। মৃতপ্রায় যারা
তারাও চমকি চায়। সম্মুখে তাহার
শয্যাপরে পড়ে আছে বৃদ্ধ একজন,
দীর্ঘ শুভ্র কেশগুচ্ছ পড়েছে ললাটে।
কিন্তু সে প্রভাতকালে, সেমুখে তাহার
সহসা সে যৌবনের চিত্রপটখানি
জাগিয়া উঠেছে যেন। মৃত্যু কাল এসে
আপনার পূর্ব্ব বেশ দিয়াছে ফিরায়ে।
উত্তপ্ত অধরে যেন রাঙিমা প্রকাশ
হইয়াছে। কোন একদেশবাসী যারা
রক্ত চিহ্ন দিয়া মৃত্যু করে নিবারণ,
যেন আজ সেই চিহ্ন করেছে ধারণ
মলিন অধর আজি, সেই সে কারণে।
নীরব নিশ্চলভাবে রয়েছে পড়িয়া,
যেন জীবনের স্বপ্ন ডুবিছে আঁধারে।
মরণের ঘুমে মগ্ন হতেছে পরাণ।
আত্মা তার সেই রাজ্যে করে বিচরণ।
সহসা করুণ কণ্ঠ পশিল শ্রবণে।
কে যেন যন্ত্রণাভরা মৃদু কণ্ঠস্বরে
"বিমল হৃদয়রত্ন" বলিল তাহারে।
তারপর কণ্ঠস্বর মিলাল নীরবে।
হেরিল সে স্বপ্নে যেন শৈশবের সেই
প্রিয় গৃহ, সে শ্যামল মধুর প্রান্তর।
রজতের ধারা সম বহে স্রোতস্বিনী,
সেই গ্রাম, সেই বন, পর্ব্বতের শ্রেণী,
সেইখানে ছায়াতলে করিছে ভ্রমণ
কিশোরী নলিনী তার হৃদয়ের ধন।
বহিল অশ্রুর ধার নিমীলিত চোকে
খুলিল মুদ্রিত আঁখি, স্বপ্ন অবসান!
কিন্তু যে নলিনী তার শয্যা পার্শ্বে বসি,
বৃথা চেষ্টা নাম তার হলনাক বলা,
অধরে আসিয়া কথা মিলাল অধরে।
বৃথা চেষ্টা উঠিবার। নলিনী আসিয়া
চুমিল অধরপুটে, হৃদয়ে তাহার
রাখিল মস্তক তার। মধুর সে দৃষ্টি
সহসা আঁধারে যেন হইল মগন।
সহসা আসিয়া বায়ু করিল নির্ব্বাণ
প্রদীপের ম্লান আলো। ফুরাল সকলি।
সব শেষ হয়ে গেল, আশা, ভয়, দুঃখ,
হৃদয় বেদনারাশি, আকুল বিরহ-
ব্যথা, সে অসীম ধৈর্য্যবল হল শেষ।

একবার শেষবার হৃদয়ে আপন
টানিয়া মস্তক তার, নত করি শির,
কহিল নলিনী মৃদু, "দয়াময় পিতা
ধন্যবাদ।" তার পর সব অবসান।
এখনো প্রাচীন বন রয়েছে সেথায়,
ছায়া হতে বহুদূরে, পাশাপাশি দোঁহে
অনন্ত নিদ্রার কোলে করেছে শয়ন।
সেই ক্ষুদ্র গ্রামে, সেই প্রাচীরের মাঝে
সেই নগরের বুকে, অচেনা অজানা।
কত সহস্রেক লোক আনন্দ উল্লাসে
করিতেছে বিচরণ, আনন্দ অন্তরে।
তাহাদের দুটি হৃদি শান্ত চিরতরে,
সহস্র হৃদয় ব্যস্ত শত কার্য্যভারে,
তাহারা নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেইখানে।
সহস্র মানব শ্রান্ত জীবনের পথে,
তাদের জীবনপথ হইয়াছে শেষ।
সেই পুরাতন বনে, ছায়াতলে তার
অন্য জাতি করে বাস। তাহাদের ভাষা
তাহাদের প্রথা আদি বিভিন্ন সকলি।
এখনও সিন্ধুতটে দুচারিটি ঘর
পুরাতন গ্রামবাসী বাস করে তথা,
যাহাদের পিতা আসি নির্ব্বাসন হতে,
লভিল বিশ্রাম শান্তি মরণের কোলে
আপনার জন্মভূমে। সেই সব গৃহে
এখনো সুখেতে সবে কাটায় জীবন,
কিশোরী বালিকা পরে রঞ্জিত বসন।
সন্ধ্যার আঁধারে বসি গৃহের মাঝারে
কহে নলিনীর কথা। শুনি সেই বাণী
কঠিন প্রস্তর খণ্ডে করি প্রতিধ্বনি
কাঁদে সিন্ধু। নির্জ্জন অরণ্য সেই সুরে
কাঁদিয়া জানায় যেন বিষাদকাহিনী।

সমাপ্ত।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

দুই রাজনৈতিক দল।*

এতকাল পরে, আজ ভারতবাসীর গৌরব-পতাকা ধূলি-ম্লান হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার যাহা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, আজ সেই জাতীয় মহাসমিতির ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। ভারতের প্রকৃত সন্তানগণের অন্তরে আজ নিদারুণ শোক-বহ্নি প্রজ্জলিত। যে কংগ্রেসের অভ্যুত্থানে আমরা দূরকে নিকট, অজ্ঞাতকে জ্ঞাত, অপরিচিতকে আপনার করিতে পারিয়াছিলাম; যাহার অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব প্রীতি-মন্দাকিনীর বিশ্ব-বাঞ্ছিত সুধা-ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, আজ সেই বিধাতার দুর্লভ দান আমরা স্বেচ্ছায় —আত্ম-মদে পদদলিত করিয়া শতধা বিচূর্ণ করিয়াছি। হা—অদৃষ্ট!

এ ক্ষেত্রেও যাঁহারা প্রবীণ, দূরদর্শী দার্শনিকের ভাষায় বলিতে চাহেন যে, "মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের বীজ নিহিত রহিয়াছে," আমি বলি—তাঁহাদের অমৃত-স্রাবী মুখে প্রসূন বর্ষিত হোক; কিন্তু আমি সে কথায় আর আশ্বস্ত হইতে প্রস্তুত নহি। অদৃষ্টের দোহাই দিতে দিতে, অবিরাম দার্শনিকতার রহস্য-সাগরে নিমগ্ন হইতে হইতে আমরা ক্রমে নরকতামিস্রের গুহাদ্বারে প্রবেশোদ্যত হইয়াছি। আজ আর উপযাচিত, সুখ-শ্রাব্য এ সকল আশ্বাসবাণী শুনিতে চাহি না।—ঢের হইয়াছে!

অস্বাভাবিক বা অশোভন হইলেও, যাহাদের দেহে শক্তি সঞ্জাত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে অকারণ, অবিশ্রান্ত তাণ্ডব-নৃত্য তাদৃশ অনিষ্টের হেতু হয় না। কিন্তু, ব্যাধি-ক্লিষ্ট, শীর্ণ দেহে, যাহারা মত্ত মাতঙ্গের অনুকরণে, দমনেচ্ছায়, হিংস্র পশুর সহিত বিবাদ বাধাইয়া দিয়া, আপনাদেরি অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে তাহাদের প্রতি যমরাজ কখনোই বিমুখ নহেন। এই সকল হতভাগ্যেরা যদি শিশু হইতেন তবে তাঁহাদের সংঘর্ষে গুরুমহাশয়ের বেত্র-দণ্ডের কাঠিন্য পরীক্ষিত হইত। কিন্তু কি বলিব?—ইঁহাদের অনেকেরই এক্ষণে এককাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে!

কংগ্রেসের "দক্ষ-যজ্ঞ"-ব্যাপারে কেহ কেহ আজো যে উল্লাস-প্রকাশে কুণ্ঠিত ন'ন, তাহা দেখিয়া মনে হয়—ঐ হাস্য-বিভার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিবা আজ বড় আশার দিনমণি ভারতের অদৃষ্টাকাশ ক্ষণতরে উদ্ভাসিত করিয়া প্রলয়-সন্ধ্যারি সূচনা করিতেছে। "আসন্ন কালের বিপরীত বুদ্ধি" আর কাহাকে বলে?

কংগ্রেস তো গেল। কিন্তু যাইবার সময়ে যে গরলটুকু রাখিয়া গেল তাহা কি কোন ব্যক্তি বিশেষকে পান করিতে

* এই প্রবন্ধ গত পৌষ মাসে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। স্থানা-ভাবে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই।—প্রবাসী সম্পাদক।

হইবে?—না, দশ ভা'য়ের মধ্যে তাহার বণ্টন হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে? আমার মনে হয়—ইহাই এ ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। দশজনে ভাগ নিলে, অবশ্য এ বিষের তিক্ততায় কিছুক্ষণ সকলেরি কিছু কষ্ট পাইতে হইবে; কিন্তু, একার পক্ষে তাহা—মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ-পদবী-লাভের উপায় হইলেও- মৃত্যুর কারণ!

দুই দলের মতানৈক্যাতেই কংগ্রেসের আজ অবসান হইয়াছে।' এই দুই দলের বিবাদের মূল কোথায় এবং কিসে, ইহাই প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

দুই দলই স্বাধীনতা-প্রয়াসী। নহেন কি?—নিশ্চয়! মুখে অন্য ভাব প্রকাশ করিলেও, মানুষ কখনো শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে চাহে না,—ইহা চিরদিনের অকাট্য সত্য। সামান্য যে পাখী—রৌদ্রে, শীতে, বর্ষায় আহারের অন্বেষণ করিয়া বনে বনে ফেরে তাহাকেও যদি সোনার শিকলে বাঁধিয়া, অসীম যত্নে আহার করাও, এবং হৃদয়ের ধন ভাবিয়া, সাদরে সাধের বুলি পড়িতে শিখাও,—তবু, তাহার মনে সে সুখ আর থাকিবে না! বনে বনে না খাইয়া মরুক,—অসংখ্য দুঃখ, বিমুক্ত বিশ্বের অপ্রতিহত অত্যাচার সে সেখানে সানন্দেই বহন করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তবু—এ সম্ভোগ সে চাহে না। মুক্ত বায়ুই তাহার প্রাণ, কাননেই তাহার আনন্দ, অনন্তপ্রসারিত নীলাম্বরেই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা!

তবে, এই দুই সম্প্রদায়ে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য—মূল লক্ষ্যলাভের উপায়-ভেদে। এক দলের কর্ম্ম-প্রণালীর লক্ষ্য—সম্ভবের বা যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত, সুলভ প্রত্যক্ষের লাভাকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত, ধীর-সাধনায়; অপর দলের লক্ষ্য—চরমাদর্শের ভাবোন্মেষে, তন্ময় মত্ততায়। প্রথম পক্ষ—ক্রমোন্নতি-প্রয়াসী, শান্তিবাদী; দ্বিতীয় পক্ষ—চরমোন্নতিকামী, বিপ্লব-বাদী। এই দুই দলের বিবাদের দরুণেই এই অনর্থ ঘটিল।

কিন্তু, এস্থলে কথা উঠিতে পারে—"আত্ম-কলহ তো কোন দলেরই লক্ষ্য নহে! তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে এরূপ ভৌতিক কাণ্ড কেন হইল?" এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইলেই তো একটু ঘনাইয়া দেখিতে হইবে।

ইহার প্রকৃত কারণ—"নরম-পন্থী"রা ধ্রুব, প্রত্যক্ষ বা দৃশ্যমানের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া চলিতে চাহেন; অর্থাৎ, ইংরাজ-রাজের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া "শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পন্থা" অগ্রসর হইতে চাহেন। আর, "গরম-পন্থী"রা ইংরাজের ব্যবধানকে গ্রাহ্য করিতেই প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কর্ম্ম-প্রাণ চিন্তাকে তাঁহাদের চিত্তে স্থান না দিয়া, ভাবকেই জাগ্রত রাখিতে উদ্বিগ্ন।

এই জন্যই, "ধীর-সাধক" "নরমপন্থী"রা যে জাতীয় সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এতদিন চালাইয়া আসিতে-ছিলেন,—"গরমদলে"র অদম্য ভাব-প্রবণতায় তাহা এক্ এক নিশ্বাসে উড়িয়া গেল! অর্থাৎ, "নরমদল" বা কর্ম্মেচ্ছু সম্প্রদায় "গরমদলে"র চরম লক্ষ্যলাভের আশু কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে না পারায়, এবং তাঁহাদের কল্পনার বায়ু-গতির সহিত সমভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে অশক্ত হওয়ায়, মিলনক্ষেত্রে এই নিদারুণ বিবাদ সূচিত হইল ও কংগ্রেস ভাঙিয়া গেল।

"গরমদল"কে আমি নিন্দা করিতেছি না বা তাঁহাদের কার্য্যকারিতার অপ্রশংসাও করিতেছি না। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁহাদের উপরে ব্যক্তিগত-ভাবে আমার এবং সমগ্র দেশের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। আমি শুদ্ধ এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে চাহি যে, তাঁহারা কর্ম্মী বা সংগঠক নহেন, তাঁহারা ভাবুক ও ধ্বংশক। তাঁহাদের কার্য্যকারিতার স্থায়ী বিকাশ—আভ্যন্তরীণ ভাবো-দ্দীপনে, এবং অস্থায়ী বাহ্যিক বিকাশ—ধ্বংশ বা বিলোপ-সাধনে। নিজেদের সম্বন্ধে এই নিত্য-সত্য কথাটি মনে রাখিয়া তাঁহারা যদি জননীর ঐকান্তিক সেবায় নিযুক্ত হন তবে আর কাহারো সাধ্য নাই যে, তাঁহাদের সে বল-দর্পিত গতিরোধ করে। কিন্তু তাঁহাদের উচিত—সম্প্রতি ধ্বংশ-বৃত্তি অন্তরতলে সংরুদ্ধ রাখিয়া, বিধিবাদী কর্ম্মিগণের পরামর্শ ও প্ররোচনানুসারে ভাবোন্মেষেই শক্তি নিয়োজিত করা। ভাব-স্ফুরণ ব্যতীত তাঁহারা অদ্যাপি প্রত্যক্ষ কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে সাফল্যলাভ করেন নাই। অতএব, যে পর্য্যন্ত না স্থায়ী কোন কল্যাণকর্ম্ম করিয়া, তাঁহারা দেশের জন-সাধারণের চিত্তে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন, ততদিন যাহা আছে তাহারো যেন নিধন-কার্য্যে লিপ্ত না হন। সেরূপ হইলে—দেশের ক্ষতি, তাঁহাদের দুরপনেয় অপযশ; এবং

লাভের মধ্যে শুদ্ধ ঐ শত্রুদের স্পর্দ্ধিত, বক্র বিদ্রূপ-হাস্য! এই তো গেল "গরম দলে"র কথা।

এক্ষণে "নরম দলে"র প্রতিও আমার কিঞ্চিৎ কথা আছে। এক হাতে কখনো তালি বাজে না, এবং এস্থলেও তাহা কখনো সম্ভব হয় নাই।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে, "নরম-পন্থী"রা আজো যদি তাঁহাদের গৌরাঙ্গানুরাগ কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত, উপশমিত না করেন তবে দেশের ও দশের মুখ-পাত্রস্বরূপ নেতৃপদবীতে অধিষ্ঠিত রহিবার তাঁহারা কোনমতেই যোগ্য নহেন। আজো যাঁহারা "ভয়ে ভয়ে যাই; ভয়ে ভয়ে চাই!"—এই নীতির অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের শান্তি-প্রিয়তার যতই কেন প্রশংসা না করি, অন্তরে তাঁহাদিগকে অনিবার্য্য রোষে ও দুঃসহ মনস্তাপে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারি না। পর-নির্ভরশীলতা বা পর-মুখাপেক্ষিতা যোগ্যের—সমর্থের ও নেতার ধর্ম্ম কোনকালেই হইতে পারে না,—স্বাধীন কি পরাধীন উন্নতিকামী জাতির চিরন্তন ইতিহাসই এ উক্তির সমর্থক সাক্ষীস্বরূপে আজিও বিশ্বে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আত্ম-বিকাশেই আত্মপ্রসাদ বা আনন্দের উদ্ভব। আত্ম-শক্তির চর্চ্চা দ্বারা আপনাকে না জানিতে পারিলে, পরানুগ্রহে সাফল্য লাভের কামনা দুর্লভ দুরাশা মাত্র। পরে হাতে তুলিয়া দিবে তবে খাইব,—ইহা জাগ্রতের ধর্ম্মানুমোদিত নহে।

স্বীকার করি—"নরম দলের"ই চেষ্টা ও উদ্যোগে, জড়-ভাবাপন্ন বঙ্গদেশেও আজ জাতীয় শিক্ষানুষ্ঠানের—ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই জন্যই, আমি তাঁহাদেরি প্রসঙ্গে—তাঁহাদেরি স্কন্ধে এই কর্ম্ম না করার চাপটা ফেলিতে চাই। "গরম দল" যাঁহাদের দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না, তাঁহাদের প্রতি নিষ্কর্ম্মার বা অলসের কোন অভিযোগ উত্থাপন করা, অনাবশ্যক। কিছু করিয়াছেন বলিয়াই, কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় পাইয়াই, আমি "নরম দলে"র প্রতি আমার বর্ত্তমান বক্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিলাম। কিছু করিয়াছেন বটে; কিন্তু, তাহাই কি প্রচুর? দুর্ভিক্ষে, অনশনে, রোগে নির্য্যাতনে দেশের এই যে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতৃবৃন্দ আজ পিপাসায় শুষ্ক-তালু হইয়া, মৃত্যুর হিমাঞ্চলের অন্তরালে তাহাদের ঐ যাতনা-জীর্ণ দেহাস্থিগুলি লুক্কায়িত করিতে লালায়িত, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য—তাহাদের ঐ ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর শরীর সুখাদ্যপানীয়ে পরিপুষ্ট রাখিয়া, তাহাদের লজ্জা নিবারণের জন্য কয়জন "নরম-পন্থী" নেতার উদ্যোগ বা আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে? ইহাই কি অকৃত্রিম দেশ-হিতৈষণা?—ইহাই কি নেতার স্বধর্ম্ম? কোথা গেলে আজ "দয়ার সাগর" বিদ্যাসাগর, কোথা রহিলে আজ—ধর্ম্ম-পথ-নির্দ্দেশক রাম-কৃষ্ণ, রামমোহন, আইস তোমরা এই পথ-ভ্রান্ত পথিকবৃন্দের নয়ন ঝলসিয়া, তোমাদের ঐ অকৃত্রিম, দিব্য আদর্শের আলোকে ও পুণ্যে এই তমসাবৃত বঙ্গ উদ্ভাসিত, আমোদিত করিয়া;—আমরা তোমাদের রাজীব-চরণে ভক্তি-বিনম্র-কোটিশির বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

যাঁহারা আজ মনে ভাবিতেছেন—রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের একমাত্র মুক্তিপন্থা আবিষ্কৃত হইবে, আমি তাহাদিগকে বলিতে চাহি—শান্ত হৌন, আশ্বস্ত হৌন, ক্ষান্ত হৌন্!—দশ দিকে আজিও দেশের দারিদ্র্য দুর্দ্দশা বিমোচিত হইবার নানা উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যশোলিপ্সার কুহক-জাল হইতে ক্ষণকালের জন্য আপনাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, বক্তৃতা ও সভার কারা-মোহ হইতে কিয়ৎপরিমাণে অপসৃত হইয়া, তাঁহারা একবার দেশের প্রকৃত উপকার-সাধনে,—মায়ের দুঃখের যথার্থ নিদান অবগত হইয়া, তাঁহার চক্ষের ঐ দর-দরিত ধারা-প্রবাহ ক্ষণেক সংরুদ্ধ রাখিতে যত্নশীল হৌন।—দেশের দুঃখ ঘুচিবে, মায়ের দীর্ঘশ্বাসে দেশ আর এমনভাবে জ্বলিয়া যাইবে না, লক্ষ-সিদ্ধি-পক্ষে প্রকৃত পন্থা উদ্ঘাটিত হইবে; এবং তাঁহারাও তখন একতার অমৃতনির্ঝরে স্নাত ও শুদ্ধ হইয়া প্রকৃত স্বরাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইবেন।

আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী নহি। আমিও যে স্বরাজ-লাভ-কামনা হৃদয়ে পোষণ করি না, এমত নহে। তবে, আমি শুদ্ধ এই কথা বলিতে চাই যে, রাজ-নীতিতেই আমাদের মোক্ষলাভের কোন আশা নাই। সত্য সত্য দেশের ও আপনার হিতানুষ্ঠান করিতে হইলে, আমাদের সাধ্যায়ত্ত অন্যান্য দিকেও নেতৃগণের দৃষ্টি ও শক্তি প্রসারিত হওয়া, প্রয়োজন। স্বদেশকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিবার জন্য ভাল করিয়া তাহাকে জানা চাই ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ সেবা করা চাই।

ঘরে ঘরে আজ বর-বঞ্চিতা বা যোগ্য মূলের ক্ষতি-পূরণে অক্ষমা, শত শত কুমারীর দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে; গৃহে গৃহে উন্নতিকামী প্রবাস-যাত্রীর চিরবিরহ-দুঃখে জনক জননী ও আত্মীয়-স্বজনের অশ্রুধারা নিয়ত ঝরিয়া যাইতেছে; চির-দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অজাতগুম্ফ যুবক সকল জায়াপুত্রের স্বাস্থ্য-চিন্তায়- রক্ষণ-পোষণের কঠোর দুর্ভাবনায়—অদৃষ্ট-বাদী, মুমূর্ষুর মত, সঙ্কীর্ণ চিত্তে, "মরণেরে শ্যাম-সমান" জ্ঞানে দুর্ব্বহ, লাঞ্ছিত, অকাল-জীর্ণ-জীবন-জ্বালায় জ্বলিতেছে; আর, ঐ দূরে—সৌরভ-স্রাবী, নন্দন-জাত পারিজাতের ন্যায় অনুপমা, লক্ষ লক্ষ অকলঙ্ক কল্যাণ-প্রতিমা কুলীন বিধবাগণের বিমলিন বদন-সুধাংশু দৃষ্টিগোচর হইতেছে;—এসকলের প্রতি— এই সব সর্ব্বনাশকর সামাজিক পরিণামের প্রতি—কই, কাহার, কোন্ বিশ্রুত-কীর্ত্তি নেতার যত্ন ও অধ্যবসায় লক্ষিত হইতেছে?

আমরা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-প্রার্থী। সত্য বটে!—তবে কেন এখনো বদ্ধমূল বিদ্বেষে পাকশালার অন্ন-ব্যঞ্জন হইতে পাক-পাত্রাদি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত, সংস্কৃত ও নবীভূত করিবার জন্য ঐ প্রখ্যাতনামা নেতৃবরের আজ এ হাস্যকর ঔদ্বিগ্ন? হা—স্বরাজ! হা—স্বদেশী!

তার পর, ঐ দেখো, ঐ গ্রামখানি!—ব্যাঘ্রশৃগালের বিহার-গহনে পরিণত, জনমানবহীন, পরিত্যক্ত, অনাদৃত, উপেক্ষিত। কেন? ঐখানেই না তোমার পিতৃপিতামহ আপনাদের কীর্ত্তি-কলাপ বজায় রাখিয়া, অসংখ্য স্বজন-পূর্ণ পরিবার শত শত বৎসর ধরিয়া, প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন? তবে, আজ ওখানে তোমার মন বসেনা কেন? কোন্ অপরাধে আজ ঐ প্রমুক্ত প্রকৃতির শ্যাম-রম্য অঙ্গ-খানিতে হেলায় পদ-প্রহার করিয়া, আজ এই কোলাহল-ক্ষুব্ধ, অট্টালিকাকণ্টকিত, সহানুভূতিশূন্য বিভ্রম-আবর্ত্তে তুমি নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছ? বিলাসলালসার সেখানে বুঝি এত অবকাশ ছিল না? "ল্যাজারস-আরমি-ন্যাভি"র কৌচ-সোফা "কামফর্ট-লাক্সারি" বুঝি এতটা সে সরল গ্রাম্য-জীবনে মিলিত না? বলি—ওহে কপটাচারী, হতভাগ্য "স্বদেশী"-নেতা, মা-ধরণীর অঙ্গে তোমাকে ধারণ করিয়া রাখিবার বল যে আর নাই! এখনো তোমার কণ্ঠ-স্বর চিরতরে নীরব হইল না? হা—মধুসূদন!

ঐ গ্রামে ছিল একদিন—যে দিন মোটা কাপড় পরিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় নামাবলীর অন্তরালে তাঁহার সরল, নিস্পৃহ সবল হৃদয় খানি লুকাইয়া, পথদিয়া হাঁটিয়া যাইতেন; আর, তাঁহার সেই দেব-প্রসাদোজ্জ্বল পুণ্য-প্রভার পদতলে চতুষ্পার্শ্বস্থ, প্রফুল্লানন অধিবাসিবৃন্দ বিনতমস্তকে আনুগত্য স্বীকার করিতে গর্ব্বিত হইত। আরো ছিল ঐখানে—ঐ গ্রামে—প্রতি সম্পন্নের গৃহ-প্রান্ত-বিস্তৃত, সুনীল স্বচ্ছ, কমল-দল-সমুজ্জ্বল, প্রশস্ত দীর্ঘিকা; গোয়ালে অমৃতবতী গাভী ছিল; গোলায় কাঞ্চন-সুন্দর ধান্য ছিল; গৃহস্থের বাহুল্য-বর্জ্জিত, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার স্বাস্থ্য ছিল, সৌন্দর্য্য ছিল, সঙ্গতি ছিল! আর আজ?—"নাই নাই, কিছু নাই, শুধু হাহাকার!" এখন যাহারা সেই গ্রামে বসতি করিতেছে তাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই, সামর্থ্য নাই; এখন তাহাদের—"সম্পদ মাত্র জঠর ভরা পীলে!" বলি ওগো স্বদেশ-প্রাণ "স্বদেশী" নেতা, লাজের মস্তকটি দংষ্ট্রা-নিপিষ্ট করিয়া, এমনভাবে উদরসাৎ করিতে একটুও কি কুণ্ঠিত হইলে না? স্বদেশের জন্য বড়ই প্রাণ কেমন করে,—না?

যাহাকিছু দেশের নূতন হইয়াছে বা হইল তাহা ইঁহাদেরি দ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিয়া, "গরমদলে"র প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, "নরমদলে"র উদ্দেশেই আমি এ সকল অপ্রিয় কথার অবতারণা করিলাম।—"বুঝে' দেখো যে জানো সন্ধান!" যশের গোলাপ-গরিমা-দীপ্ত বর-মুকুট পরিতে হইলে কণ্টকা-ঘাত সহিবার সাধ্য থাকা চাই।

আমি বলিতেছিলাম—ইহাই আমার মুখ্য কথা যে, "রাজ-নীতির চর্চ্চা একটু অল্প পরিমাণে করিয়াও, আমরা আত্ম-শোধনে—আত্মোন্নতি-সাধনে—যথার্থ স্বদেশীর ন্যায় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ। কিন্তু, দেশের কল্যাণ অপেক্ষাও ঢাক পিটাইয়া গলা ও তৎসহ নাম জাহির করাই যাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ও চরম অভিপ্রায় তাঁহাদের নিকটে রাম-গুণ-কীর্ত্তন বা ধর্ম্মের কাহনীসর্ব্বথা সুফল-দায়ী হইবে কি? তবু, কি করিব?—'স্বভাব না যায় ম'লে!'"

আবার, তাহাও বলি—রাজনীতির বড় একটা ধার না ধারিলেও, জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, "সাধিয়া সোহাগ" ও "যাচিয়া মান" না করিয়াও রাজনীতির সাগর-মন্থন, সম্ভব কিনা? একতা-বিরহিত, স্বার্থান্ধ, কপটাচারী-

দের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, উদারনৈতিক মহাজনেরা তাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের কাম্য ঐ বিমান-কুসুম ধরিয়া আনিয়া দিবেন কি? সাধ্যায়ত্ত বিভাগে যাঁহাদের শক্তির কোন পরিচয় নাই,—তৈল-মৃক্ষণ-ক্ষম, ঢাকার এই প্রখ্যাত-নামা নেতৃবরের ন্যায়—রাজ-কুল বিশ্বাস করিয়া অন্যান্য ব্যাপারে (বিশেষ স্বায়ত্ত-শাসনে) তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষম বা সুযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

রাজ-নীতিরই যদি চর্চ্চা করিতে চাও তবে দেশের ঐ প্রকৃতি-পুঞ্জকে—অশিক্ষিত জন-সমষ্টিকে শাসন-প্রণালী-সম্পর্কে, উদ্ধতভাবের দমন ও সংযমের বিষয়ে অথবা অন্যান্য ব্যাপারে শিক্ষিত করিয়া তোল। তাহাদের মধ্যে আপনা-দিগকে মিশাইয়া দিয়া তাহাদের অন্ধকার দূর কর,—তাহা-দের নয়ন জ্ঞানাঞ্জনে অনুলিপ্ত কর; আর সেই সঙ্গে নিজেরা শক্ত হও, যোগ্য হও, এক হও। কিন্তু, এ কথায় কি রাজ-নৈতিক মোক্ষাভিলাষীদের মনে তৃপ্তি আসিবে?—বোধ হয় তো না! কারণ তাঁহাদের রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া, ইংরাজকে গালি দিয়া, সংবাদপত্র সহায়ে নিজেদের নাম প্রচার করা চাই-ই!

এস্থলে কেহ কেহ কহিবেন—"তাহাই বা পারি কই? জন-সাধারণের সহিত মিলিবার পথও তো বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তাহাদের কাছে পাইবার চেষ্টা করিতে হইলেও কি শাসক-সন্তোষ-বিধান, সুপরামর্শ নহে?" আমি তদুত্তরে বলিতে চাই—ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গে, দুরভিসন্ধিহীন সত্যানু-সন্ধানে ও জ্ঞান-বিস্তৃতিব্যাপারে বাধাদান করিতে কেনই বা রাজ্য-রক্ষণ-প্রয়াসী ইংরাজ-সমাজ আপত্তি করিবেন? আর যদি সেরূপ বাধা দেনই তবে যতদিন পারা যায় তত-দিনই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে, "ফন্দী" আছে, পদ্ধতি আছে। যে যেমন তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা, ত্যাগীর পক্ষে সঙ্গত না হইতে পারে; কিন্তু, বাসনা-পূর্ণ-চিত্ত সংসারী বা পার্থিব সুখ-সম্পদ-কামীর পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। যদি যথার্থই স্বদেশী জন-সাধারণকে সুবুদ্ধি দিতে চাও তবে তাহার যথেষ্ট সদুপায় আছে; কিন্তু মর্কট-সুলভ চাঞ্চল্য বা নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় কোনদিনই শাসকগণ দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা অবিমিশ্র ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতেই এদেশে আসেন নাই; তাঁহারা রাজ্যশাসনও করিবেন!

"গরমদলে"র প্রতি এক্ষণে ক্ষুদ্র দু'একটি কথা বলিয়া আমি এখন আমার এতৎসম্পর্কীয় বক্তব্যের উপসংহার করিতে চাই। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য—তাঁহারা কি চাহেন? "স্বদেশীভাবে স্বরাজ-লাভ"?—উত্তম! কিন্তু, কথা হইতেছে এই যে, বর্ত্তমান কংগ্রেস-পণ্ড-ব্যাপারে কেন তবে তাঁহারা বিলাত ও অন্যান্য দেশেরই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে-ছেন যে, "যখন স্বাধীনরাজ্যেও এহেন দলাদলি ও মনো-মালিন্য আছে তখন আর আমাদের পক্ষে ইহা দোষের কেন হইবে? ইহা তো জীবনের লক্ষণ, প্রাণেরি তো স্পন্দন ইহাতে দৃষ্ট ও অনুভূত হইতেছে!" এ কথা শুনিয়া দুঃখও হয়, রাগও হয়। বলি—তোমার কোন্ স্বদেশী দৃষ্টান্তে দেখায় যে বিবাদেই—বিপ্লবেই শান্তি ও একতা স্থাপিত হইবে? আমাদের দেশ গেলই তো ঐ দোষে। কুরু-পাণ্ডবে যুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ, ভা'য়ে ভা'য়ে বিরোধ, গৃহে গৃহে মতান্তর! এ সবের ফলে বড় উন্নতি-মঞ্চেই আজ আমরা অধিষ্ঠিত হইয়াছি,—না? কল্পনা হইতে একটু প্রত্যক্ষে নামিয়া আইস। দেখো—গৃহবিবাদ ও মনোমালিন্যেই এ সোণার দেশ আজ দাব-দগ্ধ হইয়াছে! তবু যদি বল—"ঐ সব স্বাধীন জাতিরা তো বিলোপ পাইতেছে না? তাহারা দলাদলি করিয়া তো বরং দেশেরি উপকার করিতেছে!" তবে সে কথার আমার উত্তর—তাহারা স্বাধীন জাতি! মূলে তাহারা এক; তাহাদের সকলেরি মনটি দিক্-নির্ণয়-যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় ঐ স্বদেশেরি দিকে নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে দেশ-স্বার্থে নিমগ্ন করিয়া চরম স্বার্থে উপনীত হইতে শিখিয়াছে। তাহাদের পক্ষে এরূপ দলাদলি পরিণামে একতার বিঘ্ন না জন্মাইয়া, বরং দৃঢ়ীভূত করে ও দেশের হিতানুষ্ঠানেই তাহা নিঃশেষ হয়।—তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। চাঁদের সহিত পেচকের উপমা? হায়, তাহা হইবার নহে! আগে এক হও, যোগ্য হও; তারপর, ঐ সব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনুকরণে প্রবৃত্ত হইও। এখন কেন এ সব অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া দেশের ও নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধিতেছ? অনেক কাজ আছে, তারপর ঐ সব হইবে;

অনেক সাধনা আছে, তারপর সিদ্ধির কামনা অন্তরে স্থান দিও; অনেক দিন এখনো বাকি আছে তারপর এ ঘন-ঘোরা অমানিশান্তে আনন্দ-তপন সমুদিত হইবে। কিন্তু এখনি কেন?

তবে কি এখন তোমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই?—আছে। গৃহে গৃহে দুর্ভিক্ষ আছে, ব্যাধি আছে, শোক আছে, দুঃখ আছে;—সহানুভূতির শান্তি-বারি-সিঞ্চনে সে সব জ্বালা জুড়াইয়া দাও! গ্রাম আছে, ক্ষেত্র আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে;—অধ্যবসায়ের অদম্য প্রভাবে সুপেয়, সু-অন্ন, সু বস্ত্র, স্বাচ্ছন্দ্য দেশ ভরিয়া ঢালিয়া দাও!—দেশে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসুক, মনে আনন্দ ও বলের সঞ্চার হৌক, শরীরে শক্তি ও স্ফূর্ত্তির সংস্থান হৌক; তখনি এক হইতে পারিবে, তখনি স্বার্থকে দেশের পায়ে বলিদান দিতে ব্যাকুলতা জন্মিবে, এবং তখনি জানিবে—

"ভাই ভাই—এক ঠাঁই!
ভেদ নাই,—ভেদ নাই"!

নতুবা এ বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াও তেমন কোন ফল নাই; আর প্রেত-দৌরাত্ম্যের অনুকরণে প্রলয়-সাধনে নিযুক্ত হইয়াও কোন লাভ নাই!

সমাজ রহিল অন্ধকূপে পরিণত হইয়া!—তাহাকে বিশ্ব-সমাজ পারাবারের সহিত সম্মিলিত কর, তাহার উপরে মুক্ত বায়ুর ও বিশ্ব-চক্ষু জগজ্জ্যোতির আলোক ও ঔজ্জ্বল্যের অবাধ অধিকার প্রদান কর। নতুবা, এ পঙ্কিল আবর্ত্তের বারিপানে তোমরাই যে সুনিশ্চিত মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইবে! সমাজ সংস্কার কর, মুসলমানকে আপনার কর, ভা'য়ের দুঃখ দুর্দ্দশা বিমোচিত কর; সুস্থ হও, এক হও, সমাহিত হও;—তোমাদের মধ্যে সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্য নিত্যবিরাজিত হৌক্!

একি বিতণ্ডা বা বিরোধের সময়? এক হও, এক হও, এক হও! নিজেদের অন্তরে কল্পনা ও লক্ষ্যের যদি সত্য সত্যই কোন পার্থক্য থাকে, থাকুক্ তাহা। মিলের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া, আগে একতাবদ্ধ হও, গুণবান হও, সমর্থ হও। মায়ের প্রতি একবার চাহিয়া দেখো দেখি? কি দেখিতেছ?—মুমূর্ষু! মুমূর্ষু জননীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কোন্ সুসন্তান কলহ করে—চাঞ্চল্য প্রকাশ করে—শক্তি ও সৌজন্যের অপচয় করে? স্থির হও, দৃঢ় হও, এক হও। যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যুগে যুগে সম্ভব হ'ন, সেই বিপদ-ভঞ্জন দীনবন্ধুই তোমাদের সহায়, সেই অনাথ-শরণ বিশ্বেশ্বরই তোমাদের আশ্রয়, সেই শ্রীভগবানই তোমাদের বল-বিধাতা!

তোমাদের কিসের ভাবনা? একবার—একবার অক-পটে নিজেদের ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, সেই মহান্ অনন্ত দেবাধিদেবে আপনাদের সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, তাহারি প্রতি অসীম নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক, অকুতোভয়ে দেখো দেখি—মায়ের দুরবস্থা; ভাবো দেখি—দেশের কল্যাণ; কর দেখি—প্রকৃত কর্ম্ম।—ভ্রান্তি কুহক জাল অপসারিত হইয়া যাইবে; দেশে আবার শান্তি ও সকল সৌন্দর্য্য সমুচ্ছ্বসিত হইবে; লক্ষ্য লাভের সকল পন্থা অনায়াস-মুক্ত হইবে; সত্যযুগ পুনরাগত ভাবিয়া, নিখিল-ভূলোক রোমাঞ্চিত-তনু হইয়া, সাগ্রহে, শ্রদ্ধা-বিস্ময়পূর্ণ, অনিমেষনেত্রে তোমাদেরি প্রতি চাহিয়া দেখিবে; আর, তখন এখানে—এই বঙ্গেরই গৃহাঙ্গণে তোমাদের অগণ্য কর-প্রকোষ্ঠে রাখী বাঁধিয়া দিয়া, তোমাদের ভগিনীগণ তাঁহাদের কল্যাণ-করস্থিত, অমৃত শুভশঙ্খ মুহুর্মুহুঃ ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবেন; এবং তোমরা ভক্তি-পরিপ্লুত অন্তরে,—মা'কে হৃদয়-শতদল-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া,—আনন্দো-দ্বেলিত সমস্বরে, সুললিত কণ্ঠে, নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া উঠিবে—বন্দে মাতরম্!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

লর্ড কেল্‌ভিন্।

মানুষ কখনই চিরজীবী হয় না। সুতরাং অশীতিপর বৃদ্ধ লর্ড কেলভিন্ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ও অপরিমেয় শক্তিকে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া জীবনের সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন কাল যদি তাঁহাকে তাহার শান্তিময় উদারক্রোড়ে টানিয়া লইয়া থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভের কারণ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, ডারুইন্, ম্যাক্সওয়েল, হক্সলি ও টিন্‌ডাল প্রভৃতির মৃত্যুর পরও অতীত ও বর্ত্তমানের চিন্তা ও ভাবের

মধ্যে যে নিগূঢ়বন্ধন রক্ষা হইয়া আসিতেছিল, লর্ড কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে বুঝি বা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। নানা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বিজ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা যেমন এক মহাদোষ, বাহিরের নানা অবান্তর ব্যাপার ও আবর্জ্জনাকে তাহার ভিতরে স্থান দেওয়াও ততোধিক মহাদোষ। লর্ড কেল্‌ভিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত নিষ্কলুষ ছিল। এই মহারথীর অভাবে সার্ অলিভার লজ্ প্রমুখ নব্য নেতাদিগের দ্বারা ইংলণ্ডের পরীক্ষাগারে ম্যাকিন্‌ভূতের আবির্ভাব অসম্ভব হইবে না। ঐই ভৌতিক নৃত্যে নিউটন্ হার্শেলের কর্ম্মক্ষেত্র ইংলণ্ডের পূর্ব্ব পবিত্রতা ও মহিমা কতদূর অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা এখন নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে।

রাজার মৃত্যুতে রাজসিংহাসন শূন্য থাকে না, এবং ব্যূহবদ্ধ সমাজে অধিনায়কের অভাব হইলে, অধিনায়ক আপনা হইতে আসিয়া শূন্যস্থান অধিকার করে। কিন্তু লর্ড কেলভিনের মত রাজা ও অধিনায়ক কোথায়? যে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতার অপূর্ব্ব সম্মিলন লর্ড কেলভিনকে বৈজ্ঞানিকসমাজের নেতৃত্ব দিয়াছিল, ইংলণ্ডে কোন পণ্ডিতেই ত তাহা দেখা যাইতেছে না। আধুনিক বিজ্ঞানকে যাঁহারা নিজের হাতে গড়িয়া মহিমাময় করিয়াছেন, অতি অল্পদিনের মধ্যে আমরা তাঁহাদের তিন চারিটিকে হারাইয়াছি। রসায়নবিদ্ মেণ্ডেলিফ এবং ফরাসী পণ্ডিত কোরি ও বাঁৎলোর মৃত্যুতে য়ুরোপের বিভিন্ন দিক্ হইতে সত্যই এক একটি দিক্‌পালের পতন হইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিনের মৃত্যুতে য়ুরোপের আর এক দিক্ হইতে যে আর একটি দিক্‌পালের পতন হইল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

লর্ড কেল্‌ভিন্ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতাও একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুকাল গণিতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ইনিও সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই প্রকার পিতার পর্য্যবেক্ষণের অধীনে থাকিয়া পুত্র যে সুশিক্ষিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেল্‌ভিন্ দশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একুশ বৎসরে কেম্‌ব্রিজের শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বহু সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জড়তত্ত্বের গবেষণার উপযোগী ভাল পরীক্ষাগার ইংলণ্ডে মোটেই ছিল না। কেম্‌ব্রিজের অবস্থা তখনো খুব শোচনীয়। নিউটনের সময়ে পরীক্ষাগারের অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহার তখনকার অবস্থা প্রায় তদ্রূপই রহিয়া গিয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিতদিগের সুযশ এই সময়ে জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক কেল্‌ভিন্ তাঁহার সেই অদম্য জ্ঞানলিপ্সায় চালিত হইয়া সেই বিজ্ঞানের কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক রেনো (Regnault) তখন পূর্ণ উদ্যমে জলীয় বাষ্পের তাপ রক্ষার ব্যাপার লইয়া গবেষণায় নিরত। লর্ড কেল্‌ভিন্ ইহাঁরি অধীনে কিছুদিন পরীক্ষাগারের কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে তাঁর আর অধিক দিন থাকা হইল না। এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জড়বিজ্ঞানের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুদীর্ঘ ৫৩ বৎসরকাল লর্ড কেল্‌ভিন্ ঐ অধ্যাপকের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন, এবং যে সকল মহাবিষ্কার ইহাঁকে অমরত্ব দিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইনি গ্লাস্‌গোর অধ্যাপকের আসন হইতেই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এক কেলভিনেরই জন্য গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিকজগতের এক মহাতীর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

লর্ড কেল্‌ভিন্ তাঁহার অধ্যাপকজীবনের প্রারম্ভেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের উৎপত্তিকাল নিরূপণ করিয়া পৃথিবীর বয়ঃকাল নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাঁরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন, পৃথিবী সহস্র কোটী বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই গণনার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাপক্ষয় দ্বারা এখনকার শীতল অবস্থায় আসিতে পৃথিবী কত বৎসর অতিবাহন করিয়াছে তাহা স্থির করিবার জন্য গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গণনায় পৃথিবীর বয়স দশকোটী বৎসরের অধিক হইল না। এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্-

গণের সহিত লর্ড কেল্‌ভিনের অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল, এবং শেষে কেল্‌ভিনই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে বুঝিয়াছিল লর্ড কেল্‌ভিন্ সাধারণ অধ্যাপক নহেন।

তাপ ও কার্য্যের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ (Thermodynamics) আজ বিজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত, লর্ড কেল্‌ভিনই তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মেয়ার, জুল ও কার্নো (Carnot) প্রভৃতির সহিত লর্ড কেল্‌ভিনও এই এই আবিষ্কারের সমান যশোভাক্ বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া তাপসম্বন্ধীয় আরো অনেক গবেষণা ও আবিষ্কারে ইনি অসাধারণ প্রতিভার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার বৈদ্যুতিক গবেষণাতেই বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৮৫৫ সালে যখন সমুদ্রতলে টেলিগ্রাফের তার বসাইবার কল্পনা চলিতেছিল, লর্ড কেল্‌ভিন্ সেই সময়ে গণনা করিয়া দেখাইলেন, তারের দৈর্ঘ্য যতই অধিক হয় সঙ্কেত চলাচলে ততই বিলম্ব আসিয়া পড়ে। গণনার ফলে অনেকে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ কেল্‌ভিনের গণনার প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেল্‌ভিন্ কাহারো কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তড়িৎপ্রবাহের অত্যল্প পরিবর্ত্তন ধরিবার উপযোগী কোনও যন্ত্র উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে অতি অল্পদিন মধ্যে বার্ত্তাবহনের উপযোগী ভাল তার, এবং অতি সূক্ষ্ম তড়িৎবীক্ষণযন্ত্র (Mirror Galvanometer) উদ্ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রপারে বার্ত্তাবহন যাঁহারা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, কেল্‌ভিনের কৃতকার্য্যতায় তাঁহারা অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই সময়ে লর্ড কেল্‌ভিন্ কর্ত্তৃক বিদ্যুৎ ও চুম্বক সম্বন্ধীয় আরো অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছিল। অপর কোনও নূতন যন্ত্র অদ্যাপি সেই সকল পুরাতন যন্ত্রের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে নৌচালনার উপযোগী ভাল দিক্‌দর্শন যন্ত্রের বড় অভাব ছিল, এবং অভ্রান্তরূপে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল না। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই দুইটি ব্যাপার লইয়া অনেক পরীক্ষাদি করিয়াছিলেন। শুনা যায় এক দিক্‌দর্শন যন্ত্রটিকেই নির্ভুল ও সুব্যবস্থিত করিতে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে যে নূতন যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। চলিষ্ণু জাহাজ হইতে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের উপযোগী যন্ত্র এই সময়ে অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি এই দুই যন্ত্র প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত হইতেছে।

সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ডাল্‌টন্ (Dalton) কর্ত্তৃক আণবিক-সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে, পদার্থবিশেষে অণুগুলি কি প্রকারে সজ্জিত থাকে এবং অণুর পরস্পর ব্যবধানই বা কি জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার উপায় খুঁজিয়া পান নাই। লর্ড কেল্‌ভিন্ এই সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রায় বাইশ বৎসর হইল এই গবেষণার ফল প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু আজও তাহার বিবরণী পাঠ করিলে কেল্‌ভিনের অত্যাশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শন ও অসাধারণ গণিতজ্ঞান দেখিলে অবাক না হইয়া থাকা যায় না। ঈথর-সাগরে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ তুলিয়া আলোক যখন কাচ বা অপর কোনও স্বচ্ছপদার্থের ভিতর দিয়া বাহির হয়, তখন তাহার গতির দিকের পরিবর্ত্তন (Refraction) ঘটে। পদার্থস্থ অণুগুলিই বাধা দিয়া ঈথরতরঙ্গকে এই প্রকারে বাঁকাইয়া দেয় বলিয়া জানা ছিল। লর্ড কেল্‌ভিন্ আলোকবিশেষের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং তাহার গতির দিক্ পরিবর্ত্তনের মাত্রা অতি সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করিয়া, পদার্থের অণুর আয়তন নির্দ্ধারণের এক সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তা' ছাড়া কৈশিকাকর্ষণের (Capillary attraction) সাহায্য লইয়াও তিনি অণুর আয়তন নির্দ্ধারণের আর একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক ইঞ্চিকে আড়াই লক্ষ সমানভাগে বিভক্ত করিলে যে এক অতি সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়, এই হিসাবে পদার্থের অণুগুলির ব্যাস তাহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। লর্ড কেল্‌ভিনের এই সূক্ষ্ম গণনা লইয়া অনেকে পরবর্ত্তী কালে অনেক নাড়া চাড়া করিয়াছেন, কিন্তু গণনার অণুমাত্র ভুল পাওয়া যায় নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, এই প্রকার সূক্ষ্ম গণনা এক কেল্‌ভিনের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। তাঁহার অসীম অধ্যবসায় ও অত্যাশ্চর্য্য গণিতজ্ঞান তাঁহার প্রত্যেক গবেষণাকে সাফল্য দিয়াছিল।

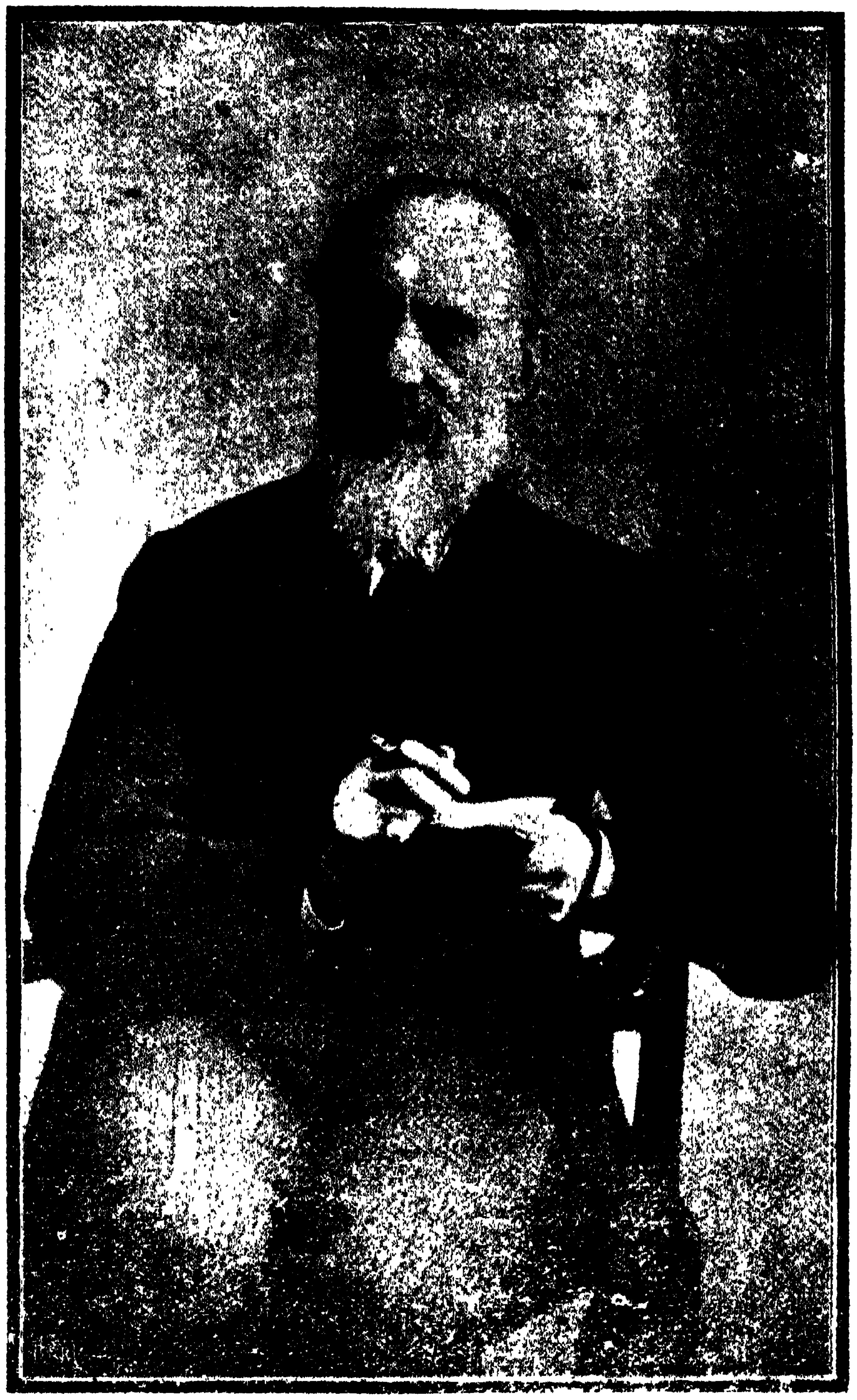

লর্ড কেল্‌ভিন।

স্ত্রী।　　　মন্দ নাগা।　　　পুরুষ।

পুরুষ।　　　নাগা।　　　স্ত্রী

লর্ড কেলভিনের প্রধান গবেষণাগুলির মধ্যে কেবল দুই একটি উল্লেখ করা গেল মাত্র। ইহা ছাড়া তিনি আরো যে সকল গবেষণা করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব ও সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ দিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। পঞ্চাশ বৎসরে তিনি নানা বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রায় তিনশত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেক প্রবন্ধই এক এক নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিত। জড়বিজ্ঞানের কোন শাখাই তাঁহার গবেষণা হইতে বাদ পড়ে নাই। জড়ের উৎপত্তিতত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন গণিতিক ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া জলের কল প্রস্তুত করা প্রভৃতি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। সকল বিজ্ঞানেই তিনি এ প্রকার ছাপ রাখিয়া গেছেন যে, তাহা আর মুছিবার নহে। বিধাতা যেমন তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদগুলি দ্বারা ভূষিত করিয়া কেলভিনকে জগতে পাঠাইয়াছিলেন, জগতের লোকও সেই সকল আশীর্ব্বাদের সমুচিত সম্মান দেখাইতে ভুলে নাই। মান ও ঐশ্বর্য্য অযাচিতভাবে তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিল। দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং দেশবিদেশের বিখ্যাত বিদ্বৎসমাজ মাত্রেই তাহাদের শ্রেষ্ঠ উপাধিগুলি কেল্‌ভিনকে দান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিল।

প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার আপনা হইতেই আমাদের নজরে পড়ে। মনে হয় অনেক প্রাচীন বৈজ্ঞানিকই তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে মানুষের প্রাত্যহিক কার্য্যে লাগাইতে যেন ঘৃণা বা অবমান জ্ঞান করিতেন। বড় বড় প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের জীবনের নানা কার্য্যে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা হাতেকলমে কাজ করার কৌশল তাঁহারা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন। সুতরাং ঐ ভাবটা তাঁহাদের বুদ্ধির জড়িমা প্রসূত নয়। কাজেই স্থানকালপাত্রের এক অদ্ভুত সম্মিলনজাত ঘৃণা বা অবমান বোধকেই তাহার উৎপত্তি বলিতে হয়। কথিত আছে মার্সিলসের (Marcellus)এর নৌবাহিনী সিরাকিউসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে জানিয়া, সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্ অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তুলনায় নৌবাহিনীর ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ। বলা বাহুল্য আর্কিমিডিসের নৌচালনযন্ত্র তখন প্রস্তুতই হয় নাই, কেবল কাগজকলমে তাহার উপযোগিতা দেখিয়া, তিনি মার্সিলসের নৌবাহিনীকে অকিঞ্চিৎকর সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহারি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানকে কাজে লাগাইবার জন্য রাজা হায়রোকে (Hiero) কত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল পাঠক তাহার গল্প অবশ্যই শুনিয়াছেন। ইউডক্সস্ (Eudoxus) ও আর্কাইটাস্ নামক দুইজন প্রাচীন পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে জ্যামিতিকে ব্যবহারিক জ্যামিতিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই জ্যামিতিকে পুঁথির পাতা হইতে বাহির হইয়া মুটে মজুর ও কলকারখানার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো তখন জীবিত ছিলেন। এ পর্য্যন্ত যে শাস্ত্র কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীরই সম্পত্তি ছিল, তাহার এই দুর্দ্দশা তাঁহার সহ্য হয় নাই। প্লেটো পরুষ ভাষায় ঐ স্বেচ্ছাচারীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের জীবনে এই দুঃসহ পাণ্ডিত্যাভিমান এখন আর মোটেই নাই। ইঁহারা একাধারে কঠোর তপস্বী ও অক্লান্তকর্ম্মী।

লর্ড কেলভিনের জীবনে বৈজ্ঞানিকদিগের এই আধুনিক আদর্শটি সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জড়তত্ত্বের অতি গূঢ়রহস্যের সুমীমাংসার জন্য তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন মুনির ন্যায়ই গবেষণানিরত দেখা যাইত, এবং স্বাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে সাংসারিক কাজে লাগাইবার সময় তিনি সাধারণ শ্রমজীবীরই মত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। বোঁৎলো, ল্যাংলে ও টিনডাল প্রভৃতি অনেক স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে স্বহস্তে নানা কার্য্যে লাগাইয়া মানুষের সুখসাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় কেহই লর্ড কেল্‌ভিনের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। নব নব যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া ইনি জগতের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতুলনীয়।

আত্মশক্তির উপর সন্দেহ ও বিশ্বাসের শিথিলতা মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান অন্তরায়। ইহারা ঘাড়ে চাপিলে মানুষ কোনক্রমে মাথা তুলিতে পারে না। লর্ড কেল্‌ভিনের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি এই দুই শত্রুকে

সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন, এবং জয় করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি জগতে অমরত্বলাভ করিতে পারিবেন। ছাত্রগণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় লর্ড কেল্‌ভিন শাস্ত্রে অটল বিশ্বাস স্থাপনের জন্য প্রায়ই উপদেশ দিতেন। কোন ছাত্র তাঁহার কোন উক্তিতে অবিশ্বাস করিলে তিনি বোর্ডের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিতেন,—"এই উক্তি আমার নয়, যে শাস্ত্রকে মানুষ প্রথম জ্ঞানোন্মেষের দিন হইতে অভ্রান্ত বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, সেই গণিত শাস্ত্রই তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছে।"

আজ কয়েক বৎসর হইল কোন বৈদ্যুতিক গবেষণা করিতে গিয়া লর্ড কেল্‌ভিন্ দেখিয়াছিলেন যে, যে তড়িৎ-প্রবাহের স্পর্শে প্রাণীর জীবনসংশয় হয়, অবস্থাবিশেষে দেহের ভিতর দিয়া তাহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রবাহ চালাইলে প্রাণীর কোনই অনিষ্ট হয় না। এই প্রকার একটা ব্যাপারে তিনি প্রথমে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ গণনা করিয়া যখন হিসাবের ভুল বাহির হইল না, তখন আর তিনি ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ছাত্র-মণ্ডলীকে ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু এই জীবনসংশয় পরীক্ষার জন্য কেহই প্রস্তুত হইতে পারিলেন না। শেষে বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া অবিচলিতচিত্তে নিজের শরীরের ভিতর দিয়া প্রবল বিদ্যুতের প্রবাহ চালাইয়া দিলেন। প্রবাহ তাঁহার শরীরে একটুও বেদনা দিল না। বৃদ্ধ ছাত্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কখনো বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব ও গণিতের মূলসূত্রগুলিতে অবিশ্বাস করিও না। এই অবিশ্বাসই কৃতিত্ব লাভের প্রধান অন্তরায়।" এই অটল বিশ্বাসই কেল্‌ভিনকে এত বড় করিয়াছিল।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

আসামের নাগাজাতি।

বোরি দিহিং নদীর বাম তীর, নওগাঁ জেলার কপিলি নদী, বরাক নদীর বৃহৎ দক্ষিণ বাঁক, এবং ত্রিপুরার পূর্ব্বসীমান্তের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে নাগাদিগের বাস। ধনশ্রী নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নাগাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

নাগাদিগের নাম 'নগ্ন বা 'নাগ' শব্দের অপভ্রংশ তাহা পণ্ডিতের আলোচ্য। নাগাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদের নামের ব্যুৎপত্তি উভয় শব্দ হইতেই সম্ভবপর মনে হয়। নাগারা আবরণ অপেক্ষা ভূষণ অধিক ভালো বাসে এবং স্বভাব বাস্তবিকই নাগবৎ।

ধনশ্রী বা ধনেশ্বরী নদীর পূর্ব্ব শাখা দোয়াং নদীর পূর্ব্বদিক-বাসী নাগাগণ বহু শাখায় বিভক্ত। প্রত্যেক শাখা পুরুষানুক্রমাগত দলপতির অধীন। আপন দলের উপর দলপতির অত্যন্ত প্রভাব। তাহারা বড় বড় গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; কোনো কোনো গ্রামে ৩০০ ঘর গৃহস্থ থাকে। গ্রামসকল পর্ব্বতচূড়া বা অধিত্যকার উপর বেশ নিরাপদ ও বহুদূর পর্য্যন্ত দর্শনসক্ষম স্থানে গঠিত হয় এবং পথসকল সুরক্ষিত ও খাড়া পর্ব্বত গাত্রও যথাসম্ভব অগম্য করা হয়। গ্রামের মধ্যে দলপতির গৃহই বৃহৎ হয়; ২৫০। ৩০০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর সুগঠিত গৃহ দলপতির। সাধারণ লোকের গৃহ অনেক ছোট, কিন্তু সকল গুলিই বেশ সুগঠিত। দলপতির গৃহের সম্মুখে ও অভ্যন্তরে শিকার ও বিবিধ উৎ-সবের স্মারক চিহ্নসকল এবং অপর একটি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত গৃহে নৃশংসতা ও প্রতিহিংসার স্মরণীয় বস্তুসকল সজ্জিত থাকে। নরকরোটিসকল তাকের উপর সারবন্দী করিয়া সাজানো থাকে, ইহা সাম্প্রতিক বীরত্বের নিদর্শন; এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের হিংস্র কর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ ঝুড়ি ঝুড়ি করোটিখণ্ড সকলও রক্ষিত থাকে। নাগা রাজ্য ইংরাজ-অধিকৃত হওয়ার পর শীতল শোণিতে হত্যাকাণ্ড অনেক বন্ধ হইয়াছে।

নাগাদের মধ্যে যাহারা মুখে বিচিত্র উল্কি পরিয়া মুখ-মণ্ডল যথাসম্ভব কদর্য্য করিতে পারে, তাহারাই শুধু বিবাহ করিতে পায়। এজন্য এক এক জনের মুখ অস্বাভাবিক কালো হইয়া যায় এবং গৌর মুখে অস্বাভাবিক কৃষ্ণতা অতি ভীষণ দেখায়। যতদিন না কোনো পুরুষ একটা মানুষের মাথা বা মাথার খানিকটা চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে ততদিন তাহার উল্কি পরিবার অধিকার হয় না। এই সকল মাথা বা মাথার চামড়া যে গৌরবাত্মক যুদ্ধে বা কোন শত্রুরই সংগ্রহ করিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই; নিজের দল

ছাড়া আর যাহার হৌক এবং যে কোন প্রকারেই সংগৃহীত হৌক সকল মাথাই প্রিয়ার যোগ্য উপহার বলিয়া গণ্য হয়। বহু জাতি এই ভীষণ প্রথা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই প্রথার পরিবর্ত্তে নাগাপ্রিয়ারা যে কোন্ উপহার পাইয়া এক্ষণে তৃপ্ত থাকিতেছে তাহা জানা যায় নাই।

নাগা পর্ব্বতের বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামসকল পরস্পরের মধ্যে দিব্য সংযোগ রক্ষা করে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথসকল খাড়া এবং দুর্গম হইলেও পথগুলিকে আঁকাবাঁকা করিতে এবং সাঁকো নির্ম্মাণে তাহারা বিলক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারী নিপুণতা দেখাইয়া থাকে। পর্ব্বতগাত্রে তাকের উপর থাকে থাকে সজ্জিত ক্ষেত্র সকলে জল সেচন দ্বারা স্থায়ী ভাবের কৃষিকার্য্য করে; রবি শস্যের জন্য প্রায়ই সুন্দর মহান বনসকল নষ্ট করিয়া ফেলে; কারণ তাহাদের প্রতিবেশী অন্যান্য জাতির মত ইহারা বনদেবতার ভয় করে না। ইহারা গাছ কাটিয়া বন পরিষ্কার করে না, গাছগুলিতে ঘা মারিয়া মারিয়া পত্রশূন্য ও শুষ্ক করিয়া ফেলে, তৎপরে তাহাতে আগুন লাগাইয়া জমি সাফ করে এবং জমি একটু আঁচড়াইয়া বীজ বপন করিয়া দেয় এবং ইহাতেই দুই এক বৎসরের উপযুক্ত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। গ্রামসন্নিহিত পথিপার্শ্বে সযত্নে আম, কাঁঠাল ও বাঁশ গাছ রোপণ করে এবং সেই সকল ছায়াশীতল স্থানে ছোট ছোট ঘর তৈয়ারি করিয়া শবকঙ্কাল রক্ষিত হয়।

শব প্রথমে নৌকার মত আকারের শবাধারে রাখিয়া গ্রামপ্রান্তে খোলা অবস্থায় গাছে টাঙাইয়া রাখে। শব সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া গেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শব কোনো খ্যাত ব্যক্তির হইলে দুইটা মহিষ, কতকগুলা শূকর এবং বহুসংখ্যক মোরগ বলি দেওয়া হয়। নিকটবর্ত্তী সকল গ্রাম হইতেই বন্ধুগণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, ঢাল, বল্লম ও দাত্র বা কুঠার লইয়া এবং কাঁসর ও ঢোল বাজাইতে বাজাইতে শবদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া নাচিতে গাহিতে আরম্ভ করে। গানে তাহারা তাহাদের বন্ধুচোর মৃত্যুদানবকে বিশ্বাসঘাতক শত্রু বলিয়া সম্বোধন করে এবং বীর বিক্রমে মৃত্যুর উদ্দেশে সকলে মিলিয়া অস্ত্র-আস্ফালন করে এবং মূল গায়েন এক এক পালা গালি বর্ষণ শেষ করিলে সকলে সমস্বরে হাঁ গো হাঁ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। নৃত্যগীত ও ভোজ সমস্ত রাত্রি ও তৎপর দিন ধরিয়া চলে। অবশেষে একদল যুবতী আসিয়া পুষ্পপল্লব ছড়াইয়া ছড়াইয়া শবদেহ সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে এবং তখন যথারীতি শবের সৎকার করা হয়। কেহ কেহ অস্থি দাহ করে, কেহ বা কবর দেয়, কেহ বা বৃক্ষতলে ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে অস্থিকঙ্কাল রক্ষা করে।

নাগাদিগের কোন মন্দির বা পুরোহিত দেখা যায় নাই এবং তাহাদের যে কোনো রকম পূজাপদ্ধতি আছে তাহাও জানা যায় নাই। তাহাদের মধ্যে দৈবশক্তির যে ক্ষীণ ও অস্ফুট ধারণা আছে তাহা না থাকার সামিল; তাহাদের বিশ্বাস পরজন্মে তাহারা ঠিক এজন্মের মতই থাকিবে।

ইহাদের বিবাহ অধিক বয়সে হয়। ইহার কারণ বিবাহাভিলাষী ব্যক্তিকে ভাবী বধূর তুষ্টির জন্য শোণিতময় উপহার সংগ্রহ করিতে হয়; এবং ইহার পরেও বধূর অভিভাবকের অনুমতি লাভের জন্য বিবাহপণের আয়োজন করিতে করিতে বরের বয়স বাড়িয়া চলে। অনেক বিবাহপণ সংগ্রহ করিতে অক্ষম যুবক শ্বশুরালয়ে দাসত্ব করিয়া পণশুল্ক শোধ করে; তখন তাহার শ্বশুর জামাতাকে সাহায্য করিয়া স্থিতি করে। নাগারা এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীকে গৃহকর্ম্মে গুরু পরিশ্রম করিতে হয়, অন্যথা তাহাদের প্রতি স্বামিগণ সদ্ব্যবহারই করে। সকল ভোজ বা সামাজিক উৎসবে পত্নীগণ স্বামিদিগের সহিত তুল্যভাবে যোগদান করিতে পারে।

নাগাদিগের সমরতাণ্ডব মিথ্যাযুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। যোদ্ধাগণ বল্লম, কুঠার বা দাত্র এবং সর্ব্বশরীর আবরণসক্ষম দীর্ঘ মহিষচর্ম্মের বা ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুচর্ম্মাবৃত বাঁশের তৈয়ারি ঢাল লইয়া বিস্তৃত হইয়া শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হয়। এই সময় জমির উপর দিয়া অগ্রসর কৃষ্ণঢালের শ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; এমত অবস্থায় তাহারা বাণে অভেদ্য, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে অভেদ্য নহে। যখন তাহারা কল্পিত শত্রুর নিকটবর্ত্তী হয় তখন তাহারা লাফাইয়া উঠিয়া বল্লম নিক্ষেপ করে এবং তাহা দ্বারা শত্রু হত হইয়াছে ধরিয়া লইয়া এক গোছা ঘাস ধরিয়া কুঠার দিয়া মাটির চাপড়া সুদ্ধ ঘাসের গোছা কাটিয়া লয় এবং কল্পিত শত্রুর মুণ্ডের অনুকরণে স্কন্ধে

ঝুলাইয়া লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। তৎপরে বিজয়গীত ও নৃত্য আরম্ভ হয়, ইহাতে রমণীগণও যোগদান করে।

বহু নাগাপ্রধান সমতলে নামিবার সময় বাঙালীর মত ভদ্র পরিচ্ছদ ধারণ করে; কিন্তু গৃহে তাহাদের জাতীয় অদ্ভুত বিচিত্র অথচ সুন্দর পোষাক পরে। বড় বড় শঙ্খ কাটিয়া তাহার মুকুট মাথায় দেয়; এবং মাথার চালুতে সূক্ষ্মাগ্র বাঁশের টুপি ময়ূরপুচ্ছ ও লাল রং করা ছাগলোমে সজ্জিত করিয়া পরে। পুঁতি, কড়ি, পিত্তল বা বেত্র নির্ম্মিত হার, বাজু, বালা প্রচুর পরে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য বস্ত্র একটুও পরিধান করে না। পিত্তলের পালিশ করা কোমরবন্ধের নীচে কেহ কেহ ছোট ছোট কড়ি দ্বারা সজ্জিত কালো কাপড়ের ছোট ঘাগরার মত পরে এবং অনেকে এই আবরণ-টুকুও অনাবশ্যক মনে করে। লাল রং করা বেতের বেড় পায়ে পরে। ইহাদের অস্ত্র লাল রঙের ছাগলোমভূষিত ছোট কালো বাটের চকচকে কুঠার; একটা বোচ বাহির করা চৌড়া ফলার বল্লম; এবং ৪।৫ ফুট লম্বা মাহষচর্ম্মের ঢাল। বল্লমের বাটে বুরুষের মত করিয়া লোহিত লোম লাগানো থাকে। স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ নিতান্ত অনাড়ম্বর, হার ও একটা ঘাঘরা, কাহারো বা ঘাগরাও থাকে না।

প্রধান দলপতিদের বসিবার কেদারা থাকে; দলপতির কেদারা সর্ব্বোচ্চ; যুবরাজের একধাপ ছোট এবং পরিবারস্থ অপর পরিজনদিগের আরো ছোট। একবার এক দলপতির পুত্র ১৫।২০ হাত উচ্চ বাঁশের মাচায় বসিয়া ইংরাজ দৌত্যের সাক্ষাৎ করিয়াছিল।

সকল নাগাপল্লীর সুরক্ষিত প্রবেশ পথে এক একটা বৃহৎ অত্যুচ্চ গৃহ দেউড়ির মত থাকে; তাহাতে একদল যুবক প্রতি রাত্রে প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। বিপদবার্ত্তা ঘোষণার জন্য তাহাদের নিকট আস্ত গাছ খুদিয়া তৈরি ঢাক থাকে, এবং অগ্নিসঙ্কেতও করে।

যুবক দলপতিগণ প্রায়ই বেশ সুশ্রী হয় এবং প্রায়ই দীর্ঘায়ত পুরুষ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ নাগাগণ উত্তরের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হীনশ্রী। তাহারা ক্ষুদ্রাস্থি, অপুষ্ট-পেশী এবং অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের মুখ গোলাকার ও চেপ্টা মতন এবং চক্ষু ক্ষুদ্র। বহু আসামী নাগা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু মুখাকৃতি দেখিলে তাহাদিগকে চিনিয়া পৃথক করা যায়। নাগারমণীগণ খর্ব্বকায়, কুশ্রী এবং তাঁহাদের কোমর নাই, ডাগর পেট বলিয়া বুকে পেটে একাকার। রমণীগণ হয়ত গুরু পরিশ্রমে সুন্দরী হইতে পায় না।

দনেশ্বরীর শাখা দোয়াং নদীর পূর্ব্বপ্রদেশস্থ নাগাগণ কোন দলপতি বা প্রধান স্বীকার করে না। জ্ঞানে বা সাধারণত ধনে শ্রেষ্ঠ বর্ষীয়ানকে তাহারা গ্রামের মুখপাত্র নির্ব্বাচন করে; কিন্তু তাহাকে কোনো ক্ষমতা প্রদত্ত হয় না, এবং তাহার কথা শুনিয়া চলিতেও কেহ বাধ্য থাকে না। এই পদ বংশানুক্রমিক ত নহেই, অনেক সময় আজীবনও নহে। কখন কখন বিবাদ বিসংবাদ মিটাইবার জন্য বৃদ্ধদের বৈঠক বসে, কিন্তু তাহাদের বিচার কাহাকেও কোনো বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে না। এক দলের মধ্যে দুই জনের বিবাদ ক্রমে জ্ঞাতিযুদ্ধে পরিণত হইয়া উঠে; কিন্তু ইহাতে সমাজে যে দুঃখ আনয়ন করে তাহাই ইহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। কোনো বিধি নিষেধ না থাকিলেও ক্রোধ প্রকাশের ফলের ভীষণতাই সকলকে ক্রোধসংযমে বাধ্য করে। তথাপি বৎসরে দুই একবার ইহাদের যুদ্ধ-সাধ ভালো করিয়াই মিটাইয়া লয়। কোনো সুবিধাজনক সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সকলে মিলিত হয় এবং এক হুটোপুটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়; নখ দন্তাদি স্বাভাবিক আয়ুধ ছাড়িয়া দিলে সকলেই নিরস্ত্র হইয়া সকলেরই সহিত যুদ্ধ করে।

এই সকল নাগারা 'সেমিশ' নামক ধনদেবতার নিকটে মাহষ-মিথুন, গাভী প্রভৃতি বড় পশু বলি দেয় এবং ফসলের দেবতা 'কুচিম্পাই' শুধু ছাগ, মোরোগ ও ডিম্ব বলি গ্রহণ করে। এই সকল দেবতাই মরণশীল এবং তাহাদের পরম দেবতা সৃষ্টিকর্ত্তার কোনো ধারণা ইহাদের নাই। এ সম্বন্ধে ইহারা চুলকাটা মিশমীর অনুরূপ। অনিষ্টকারী দেবতার মধ্যে 'রাপিয়ারা' প্রধান; কুকুর ও শূকর বলি দিয়া ইহার তুষ্টিসাধন করিতে হয়। ইহার সহকারী 'কাংনিবা' ভূত অন্ধ ও অতি ক্রূর; কিন্তু সে অন্ধ, মূল্যবান ও সামান্য বলির পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম বলিয়া তাহাকে অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য দিয়া ভুলানো হয়। যখন সমগ্র সমাজের পক্ষ হইতে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য তুকতাক করা হয় তখন সমগ্র

পল্লীর সহিত অপরের সংস্রব নিষিদ্ধ হয়; কেহই তৎকালে গ্রামে প্রবেশ করিতে বা গ্রাম হইতে বাহির হইতে পায় না, এবং দুই দিনের জন্য সকল কার্য্য বন্ধ থাকে। এই অবস্থাকে 'গেন্না' বলে। যদি নূতন ক্ষেত্রকর্ষণের প্রারম্ভে গেন্না হয়, তাহা হইলে গ্রামস্থ সকল অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ করিয়া নূতন অগ্নি উৎপাদন করে; সেই অগ্নিতে একটি মহিষ দগ্ধ করে; মহিষ উৎসর্গ ও ভোজনের পর সেই নবোদ্ভূত অগ্নিতে মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া সকলে মিলিয়া কর্ত্তিত বন দগ্ধ করিতে যায়।

ইহাদের গৃহের সম্মুখের চাল উচ্চ হয় এবং পশ্চাতের চাল একেবারে ঢালু হইয়া মাটিতে গিয়া ঠেকে। ইহাদের গৃহে উচ্চ পোতা থাকে না। প্রতি গৃহে দুইটা করিয়া কক্ষ থাকে; ইহার একটা শয়নার্থ নির্দ্দিষ্ট থাকে, অপরটা শূকর, মোরগ প্রভৃতির জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক পরিবারেরই পৃথক পৃথক গৃহ থাকে; কিন্তু কুমারদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ থাকে, সেখানে শিকারের জয় চিহ্ন সকল এবং যুদ্ধাস্ত্র সমূহ টাঙানো থাকে; এই গৃহই সাধারণ সরাই বা আড্ডারূপে গণ্য হয়।

নাগারা খুব নৃত্যপ্রিয়। সমরতাণ্ডবে পূর্ব্ববর্ণিত প্রথায় যুদ্ধাভিনয় হয়; অপর এক প্রকার নৃত্যে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নাচে; আর এক প্রকার নাচে শুধু স্ত্রীলোকেরই অধিকার। এই শেষোক্ত নৃত্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

ইহারা অলঙ্কার খুব ভালবাসে। বাহুতে পিত্তলের তার জড়ানো ইহাদের এক অসাধারণ অলঙ্কার। এক প্রকার পীতাভ হরিৎ অনচ্ছ পদার্থের মালা ইহাদের খুব প্রিয়; কিন্তু সম্পূর্ণ ইহাদেরই একছড়া মালা কাহারো নাই। পুরুষের এক টুকরা ধুতিই সম্পূর্ণ পরিচ্ছদ; স্ত্রীলোকের নাভি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে। বিবাহিতা নারীগণ দীর্ঘকেশ রক্ষা করে ও পশ্চাতে বিনাইয়া রাখে। কুমারীগণ সম্মুখের চুল সামনের দিকে আঁচড়াইয়া ভ্রূ পর্য্যন্ত রাখিয়া কাটিয়া ফেলে। মণিপুরী কুমারীদিগেরও এই রীতি।

কন্যার জনকজননীকে বিবাহের শুল্করূপে গাভী, শূকর, মুরগী বা সুরা দান করিলেই বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজ দেওয়া হয়; যাহারা নিমন্ত্রিত হয় তাহারা নবদম্পতির জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া যায়। স্ত্রীলোকের বংশমর্য্যাদা বা সৌন্দর্য্য অপেক্ষা শারীর বলই ইহাদের সমাদৃত, কারণ পুরুষেরা দিব্য অলসভাবে বসিয়া রোদ পোহায় এবং স্ত্রীলোকদিগকে অবিশ্রাম খাটিতে হয়।

নাগারা গাছের গুঁড়ি শূন্যগর্ভ করিয়া তাহাতে শব ভরিয়া গৃহের নিকটেই প্রোথিত করে। সেই কবরস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য সেস্থানে একখণ্ড বড় পাথর রাখা হয় এবং এই সকল পাথরের সংখ্যাবাহুল্য হইতে সেই গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রকাশ পায়। মৃত জনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ইহারা গ্রামের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হয়।

ইহারা সর্ব্বভুক; ব্যাং, টিকটিকি, সাপ, ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর, বানর প্রভৃতি সকল জন্তুই ইহাদের সুখাদ্য। স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তুর মাংস বা হত জন্তুর মাংস ইহাদের নিকট তুল্য উপাদেয়। তাহারা প্রত্যহ ধেনো মদ পান করে। তামাকের নলের মধ্যে যে তামাকের তেল জমে তাহাও চাঁছিয়া লইয়া জলের সহিত মিশাইয়া পান করে; এই মাদক সেবনের উপায় উহাদের নিতান্ত নিজস্ব।

উত্তর কাছাড়ের পূর্ব্বাংশে অঙ্গমী ও কচু নাগাদের বাস। ইহাদের বিবিধ শাখা পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধলিপ্ত থাকে; কিন্তু এই আন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দলের রমণীগণ পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নির্য্যাতিত হইবার ভয় না করিয়া যাতায়াত করে। কিন্তু ভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সশঙ্ক থাকিতে হয়, কারণ অপর জাতির সহিত যুদ্ধের সময় স্ত্রী বা শিশু কাহাকেও শত্রুরা খাতির করে না। অঙ্গমী নাগারা সম্প্রতি বন্দুক ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, এবং বহু বন্দুকও সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের জাতীয় অস্ত্র বল্লম ও দা। তাহারা ৩।৪ হাত লম্বা ঢাল বহন করে; এই ঢাল মাদুরের মত কাঠি বুনিয়া প্রস্তুত, ব্যাঘ্র বা ভল্লুক চর্ম্মে আবৃত, এবং ইহার কিনারা ও ঊর্দ্ধ ভাগ রঙিন ছাগ-লোম ও পালক দ্বারা ভূষিত হয়।

দোয়াং নদীর পশ্চিমদিকস্থ নাগারা মোটের উপর মণিপুরী বা চীনা শান জাতির জ্ঞাতি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বদিকের নাগা ও কুকিরা সিংফো প্রভৃতি জাতির নিকট সম্বন্ধী মনে হয়। ভাষাতত্ত্ব বিচার করিলেও কুকি মণিপুরী ও

বর্ব্বর কুকি দিগকে নিকট আত্মীয় মনে হয়। মণিপুরীদিগের নিজস্ব লিখিত ইতিহাসেও এই কুকিজ্ঞাতিত্ব বিবৃত হইয়াছে। ক্রমশ আমরা জাতিতত্ত্বের এই কৌতুকপ্রদ বিবরণ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।*

মুদ্রা-রাক্ষস।

আদিনা।

পাণ্ডুয়ার পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে "ছোট দরগা" এবং "বড় দরগা" মুসলমানসমাজে পুণ্যতীর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া, তথায় পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, কখনও লোকসমাগমের সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত হইতে পারে নাই। পাণ্ডুয়ার অন্যান্য কীর্ত্তিচিহ্নের--সোনা মসজেদের, একলক্ষির, আদিনার এবং সাতাইশঘরার কথা স্বতন্ত্র। দীর্ঘকাল লোকসমাগম প্রচলিত না থাকায়, এই সকল পুরাতন অট্টালিকা নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বেও সে অরণ্যে ব্যাঘ্রভীতি এরূপ প্রবল ছিল যে, বিশেষভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, কোনও পর্য্যটক তথায় গমন করিতে সাহসী হইতেন না। সকল অট্টালিকাই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছিল; তাহার উপর কত বৃক্ষলতা অঙ্গ বিস্তার করিয়া, গঠনসৌন্দর্য্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহাতে এক নূতন শোভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বনান্তরাল হইতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত, তা বিস্ময়বিজড়িত স্বপ্নালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইত। বনের পর বন,—নির্জ্জন,—নীরব,—শ্বাপদসঙ্কুল,—তাহার মধ্যে এরূপ অজ্ঞাতপূর্ব্ব দর্শনমোহ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে হৃদয় মন পরিপূর্ণ করিয়া দিত! এখন আর সেদিন নাই। এখন পাণ্ডুয়ার বিজন বনের মধ্যে ডাকবাংলা,—পুরাতন অট্টালিকার অঙ্গে জীর্ণসংস্কার,—বনভূমির ভিতর দিয়া রাজপথ!† তথাপি পাণ্ডুয়া সম্পূর্ণরূপে আতঙ্কশূন্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। জল এখনও বিষাক্ত,—বায়ু এখনও অস্বাস্থ্যকর। কীর্ত্তিচিহ্নের মধ্যে প্রধান কীর্ত্তিচিহ্ন আদিনা। তাহার জন্য কত পর্য্যটক পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পদার্পণ করিয়া থাকেন! আদিনা ভুবনবিখ্যাত হইবার যোগ্য; এত বড়, অথচ এমন সুন্দর, মুসলমান মসজেদ আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে? ইহাই আদিনার প্রধান গৌরবের কথা। তাহা বৃহৎ এবং সুন্দর। এখন একাংশের উপর অল্প কয়েকটি গম্বুজ বর্ত্তমান আছে; অন্যান্য গম্বুজ, খিলান, স্তম্ভ এবং ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে! তথাপি আদিনা বঙ্গদেশের এক অতুলনীয় অট্টালিকা। যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, গঠনপ্রতিভার পরিচয় গ্রহণের জন্য কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠে। গঠন প্রতিভার কথা চিন্তা করিবার পূর্ব্বে, গঠনকাহিনীর আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সে কাহিনী এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

গঠন-কাহিনী।

বরেন্দ্রমণ্ডল বহুবিপ্লবের লীলাভূমি। মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার সময়েও তাহা বহুবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণ সহসা সকল স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। তাহার জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ কলহ,—দীর্ঘকাল রক্তপাত,—দীর্ঘকাল জয়পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল। এই প্রদেশ বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতির অধীন ছিল; স্থানে স্থানে তাঁহাদের রাজধানী এবং রাজদুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত সামন্ত প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গৌড়েশ্বরকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতেন, কিন্তু স্বরাজ্যে স্বতন্ত্র শাসনক্ষমতার পরিচালনা করিতেন। গৌড়েশ্বরের রাজধানী মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলেও, এই সকল সামন্ত নরপতি সহসা পরাভব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা স্বাধীনতারক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং মুসলমানশাসনের প্রথমযুগে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে তাঁহাদের আত্মরক্ষার কথা স্থানলাভ করে নাই। কিন্তু অনুসন্ধাননিপুণ ইংরাজলেখকেরা তাঁহাদের আত্মরক্ষাকাহিনী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন

---

* এই প্রবন্ধ কর্ণেল ডাল্টন, সি, এস, আই, প্রণীত বঙ্গের জাতিতত্ত্ব (Descriptive Ethnology of Bengal) নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

† প্রথম যখন আদিনা দর্শন করি, তখন রাজপথ নির্ম্মিত হইলেও বৃক্ষলতা দূরীকৃত হয় নাই, কোনরূপ জীর্ণ সংস্কারের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখনও শ্বাপদশঙ্কা প্রবল ছিল; হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিতে হইত। এখন গোশকট, অশ্বশকট, চলাচল করিতে পারে; যান বাহনের অপ্রতুল হইলে, পদব্রজে গমন করিবারও অসুবিধা নাই।

নাই।* এই সকল কারণে, বক্তিয়ার খিলিজি এদেশে আসিয়া, যাহা পাইয়াছিলেন তাহা লইয়াই রাজ্যগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা বড় অধিক নহে;—পুনর্ভবাতীরে দেবকোট নামক একটি পুরাতন দুর্গের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি মাত্র পরগণা। তজ্জন্য দেবকোটের মুসলমানশিবির এদেশের প্রথম মুসলমান রাজধানী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর গৌড়, এবং তাহার পর পাণ্ডুয়া মুসলমান রাজধানীরূপে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সহসা কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই,—তথায় অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ কীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল। সামসুদ্দীন ইলিয়াস পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার সময় হইতে পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করে। তিনিও পাণ্ডুয়ার অধিক পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিতে হইয়াছিল,—দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের আক্রমণ হইতে পাণ্ডুয়া রক্ষা করিয়া, সন্ধি সংস্থাপিত করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধ কলহে বিপর্য্যস্ত হইয়া সামসুদ্দীন ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র শেকন্দর শাহের দীর্ঘ শাসন সময়েই পাণ্ডুয়ার সবিশেষ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়।

সেকন্দর শাহ মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্‌জেদ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা সে কালের মুসলমান বাদশাহগণের সাধারণ প্রবৃত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বক্তিয়ার খিলিজি ইহার পথপ্রদর্শক বলিয়া উল্লিখিত। মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে তাহা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আদিনার ইষ্টকপ্রস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহা যে পুরাতন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ইষ্টক প্রস্তর তাহাতে সংশয় উপস্থিত হয় না।† কেহ কেহ এহ বলিয়া গিয়াছেন,—আদিনা যে ভূমিখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা একটি দেব-মন্দিরের স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল।* শেকন্দর শাহের আদেশে তাহাই মস্‌জেদরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মধ্যস্থলে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন,—তাহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ,—তাহা এখন "আদিনা" নামে সুপরিচিত। বহুসংখ্যক প্রস্তর স্তম্ভের উপর বহুসংখ্যক খিলান,—তাহার উপর বহুসংখ্যক গম্বুজ, দেখিবামাত্র মনে হয়,—বহুকালের চেষ্টায় সুস্তবক্‌ল দেবমন্দির মস্‌জেদরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। শেকন্দর ইহাকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রিয়পুত্র ঘিয়াসুদ্দীন বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে বৃদ্ধ শেকন্দর শাহের মৃত্যু সংঘটিত হয়। আদিনার গঠন কাহিনীর সঙ্গে এই অকীর্ত্তিকর সমর কাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। গঠন কালে যে সকল হিন্দু বা বৌদ্ধ মূর্ত্তি ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ পড়িয়াছিল। অনেকে তাহা দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আদিনা ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর কোন কোন প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাও অনেকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার অধিকাংশই স্থানান্তরিত হইয়াছে; যাহা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও জীর্ণসংস্কার কালে পুনরায় ভিত্তিমধ্যে প্রোথিত হইয়া পড়িতেছে।

গঠন কৌশল।

গঠন কৌশলের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় আশ্চর্য্য গঠন-সামঞ্জস্য। তাহার জন্যই আদিনা বৃহৎ এবং সুন্দর। বাহিরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্যই অধিক। বাহিরে বৃহত্ত্বে সৌন্দর্য্য পরাভূত; ভিতরে সৌন্দর্য্যে বৃহত্ব পরাভূত আদিনা উত্তর দক্ষিণে ৫০০ ফুট, পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩০০ ফুট;—এত বড় বলিয়াই ইহার সমগ্র অবয়বের ফটোগ্রাফ গৃহীত হইতে পারে নাই। এত বড় মস্‌জেদের

* The Rajas of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the time of Bakhtyar Khiligi, when Devkot, near Dinajpur, was looked upon as the most important military station towards the North.—H. Blockmann's Geography and History of Bengal.

† In one of its corners stands a beautifully carved pulpit, below the steps of which a large slab of stone, now fallen, bears the features of a Hindu God on its reverse side,—Ravenshaw's Gour, p. 64.

* ইলাহিবক্‌স এতৎ প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন,—It is worth observing that in front of the *Chaukath* of the Adina mosque, there was a broken and polished idol, and that there were other idols lying about, and that under the steps near the pulpit, there was another broken idol. So it appears, that in fact, this mosque was originally an idol-temp

একটিমাত্র প্রবেশদ্বার, তাহা পশ্চিম দিকে অবস্থিত, আয়তনে নিতান্ত খুদ্র। তাহা সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এই ক্ষুদ্র দ্বারের উপরে একখানি প্রস্তর ফলক; তাহাতে লিখিত আছে,—

"হিজরী ৭৭০ সালের ৬ রজব তারিখে (১৩৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী দিবসে) লিখিত হইল যে, বাদশাহ ইলিয়াসের পুত্র পরম ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ শেকন্দর শাহ কর্তৃক এই মসজেদ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।"*

গোলাম হোসেন যখন "রিয়াজ-উস-সলাতিন" রচনা করেন, তখনও আদিনার ভগ্নদশা। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, —"হিজরী ৭৬৬ সালে আদিনা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্তু শেকন্দর শাহের মৃত্যু সংঘটিত হইলে, আদিনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।"† আদিনা কোন সময়ে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ করে, দ্বারফলকে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাই। তাহাতে লিখিত আছে,—সেকন্দর শাহ আদিনা নির্ম্মাণের আদেশ দিয়াছিলেন, এবং সে কথা হিজরী ৭৭০ সালের ৬ রজব তারিখে খোদিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং দ্বার ফলকের তারিখকে নির্ম্মাণারম্ভের তারিখ বলিতে সাহস হয় না। গোলাম হোসেন হিজরী ৭৬৬ সালকে নির্ম্মাণারম্ভের তারিখ বলিয়া ঘোষণা করায়, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তিনি এই তারিখের সন্ধান কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। গোলাম হোসেনের এই উক্তি সত্য হইলে, হিজরী ৭৬৬ সাল হইতে শেকন্দর শাহের মৃত্যু পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে আদিনার অর্দ্ধেক গঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কলিন লিখিয়া গিয়াছেন—আদিনায় ২৬০ স্তম্ভ ছিল।‡

অভ্যন্তরের দৃশ্যাবলীর মধ্যে পশ্চিম প্রকোষ্ঠের উত্তরাংশের "বাদশাহের তখত," নামক ৮০ ফুট দীর্ঘ, ৪০ ফুট প্রস্থ, ১২ ফুট উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত উপাসনামঞ্চ,—তাহার সম্মুখস্থিত ভিত্তিগাত্রে কৃষ্ণমর্ম্মরের উপর বিচিত্র কারুকার্য্য, তখতের দক্ষিণে, পশ্চিমভিত্তিসংলগ্ন উপাসনাবেদী ও তাহার সোপানাবলী, বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কি ইষ্টক, কি প্রস্তর, সমস্তই কারুকার্য্য খচিত। দেখিলে, দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। প্রস্তর খোদিত শতদল দেখিলে, বৌদ্ধশিল্পের কথা স্মরণ পথে উদিত হইয়া থাকে। দুই স্থানে দুইটি পুরাতন চিতা ভস্মাধারের বিচিত্র প্রতিকৃতি। মসলমান মসজেদের তাহার প্রয়োজনাভাব,—বোধ হয় কেবল সুন্দর বলিয়াই তাহা অন্যান্য কারুকার্য্যের সঙ্গে মসজেদে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।*

আদিনার অসমাপ্ত সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য এমন ধ্বংশদশায় পতিত হইয়াও বিস্ময় উৎপাদন করিতে নিরস্ত হয় নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আদিনার সকল শোভাই অনন্য-সাধারণ। গৌড় এবং পাণ্ডুয়ায় সুদৃশ্য অট্টালিকার অভাব নাই; কিন্তু তাহার একটিও আদিনার সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারে না। কৃষ্ণমর্ম্মরের মসৃণ ফলকে এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই অনন্যসাধারণ গঠন-কৌশলের মূলে কাহার অনন্যসাধারণ গঠন প্রতিভা বর্ত্তমান ছিল, এত কালের পর তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। প্রাচ্য শিল্পী আত্মঘোষণা না করিয়া শিল্পগৌরব ঘোষণার জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ভারতবর্ষে কত বিচিত্র মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে কাহার গঠনপ্রতিভা বিকশিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। ইহাই প্রাচ্য প্রবৃত্তির সাধারণ লক্ষণ;—আদিনাতেও সে লক্ষণ দেদীপ্যমান।

আদিনার কারুকার্য্য সর্ব্বাংশেই উপাসনালয়ের উপযোগী। তাহার উপর ভক্তিবিশ্বাসবিজ্ঞাপক কোরাণ-শ্লোক

* এই প্রস্তর ফলকের সাল ও তারিখ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক প্রচলিত আছে। এস্থলে গোলাম হোসেনের মত গ্রহণ করাই সঙ্গত বোধ হয়।

† And in the year 766 A. H. he built the Adina Mosque; but before he could finish it, death overtook him, and the building remained half-finished.—The Riaz-us-Salatin, p. 105.

‡ A mere description must fall short in attempting to delineate the features of this magnificient pile. It requires the pencil of the artist.—Major Francklin.

* Among other decorations, its western compartment contains a most extraordinary piece of sculpture resembling a funeral urn of an antique fashion, the only thing of its kind I have ever beheld in any part of Asia. Another urn, nearly resembling this, is to be seen on the front of the Killah.—Major Francklin.

পুরুষ। পার্ব্বত্য নাগা। স্ত্রী।

নাগা দলপতী।

অঙ্গমী নাগা।

১ম চিত্র। ভেড়া পোঁকা।

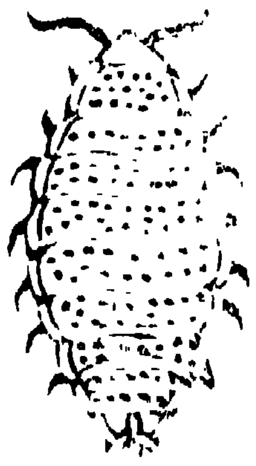

২য় চিত্র। ক।
স্বাভাবিক আকার
ছারপোকার মত।

২য় চিত্র। (খ)

৩য় চিত্র।

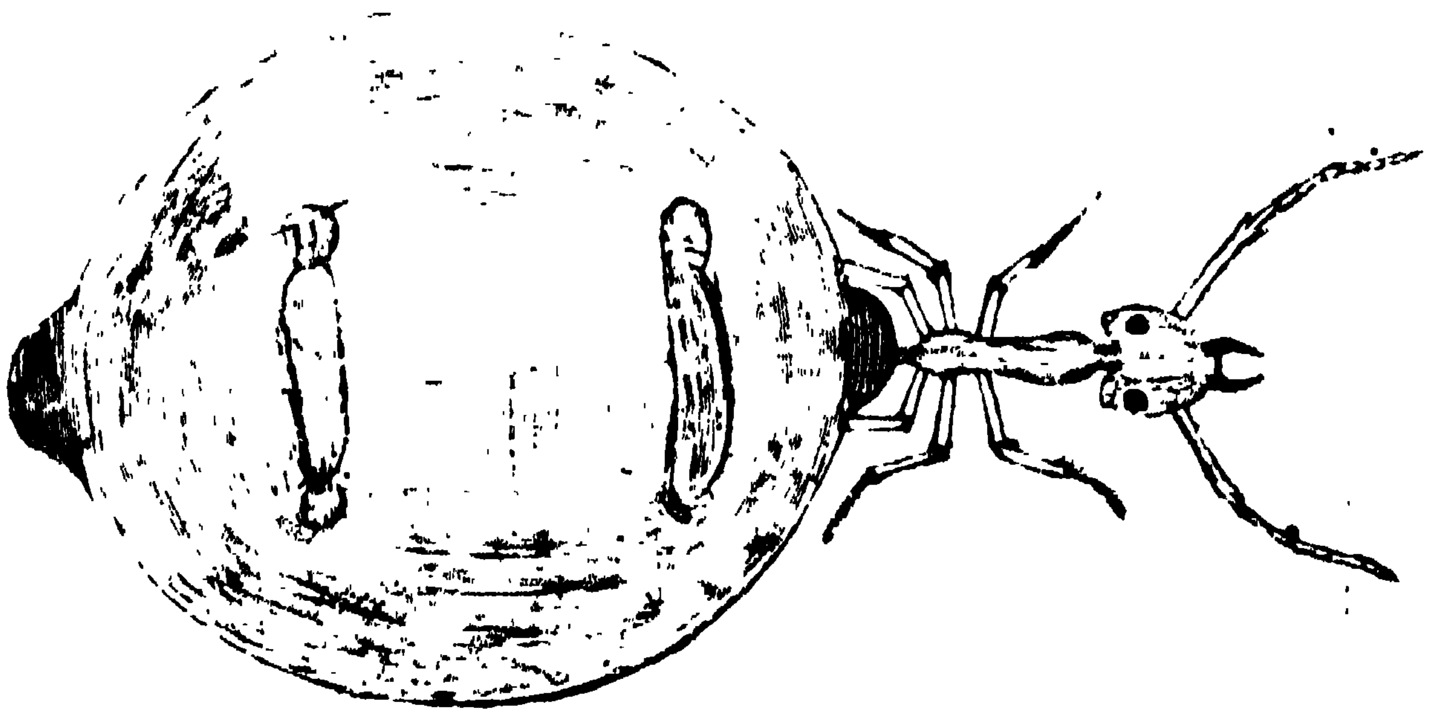

৪র্থ চিত্র। ৮।০ গুণ বর্দ্ধিত।

উৎকীর্ণ। তাহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে, এতবড় মস্‌জেদের একটিমাত্র ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বারের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু যখন উপাসনাবেদীর সম্মুখীন হইয়া দেখিতে পাওয়া যায়,—বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—"হে বিশ্বাসী! মস্তক অবনত কর—পতিত হও—আরাধনা কর,"—তখন মনে হয়, প্রবেশকালে উপাসকের মন অবনত করিবার জন্যই প্রবেশদ্বার এরূপ ক্ষুদ্রায়তন গ্রহণ করিয়া থাকিবে। তাহাতে রচনা কৌশলও সার্থক হইয়া রহিয়াছে। অভ্যন্তরে কোন্ স্বপ্নালোক কুহক বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, বাহির হইতে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। প্রবেশ করিবামাত্র বাহিরের সহিত ভিতরের পার্থক্য সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া, অজ্ঞাতসারে দর্শকচিত্ত অভিভূত করিয়া দেয়! এই সকল কারণে, আদিনাকে ইষ্টকপ্রস্তরের ভগ্নস্তূপ বলিয়া বর্ণনা করিলে, তাহার অবমাননা করা হয়। আদিনা একখানি সুলিখিত মহাকাব্য।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পিপীলিকা।*

জীবজগতে মানুষ অবশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের সহিত বাঁদরের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য যে অন্য সমুদায় জীব অপেক্ষা অধিক সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বুদ্ধিও যে বাঁদরের না আছে তাহা নহে, তথাপি সমাজগঠন-ক্ষমতা, বাসগৃহনির্ম্মাণ-কৌশল, খাদ্য-সঞ্চয়, "পশু"-পালন ও দাস-রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে পিপীলিকাদিগকে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও উন্নত জীব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং জীবজগতে উহারা মানুষের নীচেই স্থান পাইবার যোগ্য।

উহারা তিন প্রধান জাতিতে (families) বিভক্ত:—ডেয়ে, সুড়সুড়ে বা ধাওয়া, এবং কাঠপিঁপড়ে বা মেঝেল। ডেয়েদের দাড়া খুব বড় ও ধারাল, কিন্তু হুল দেখা যায় না; কাঠপিঁপড়েরা বড় বিষাক্ত; ধাওয়াদের দাড়া বড় নহে এবং হুলও নাই।

পিপীলিকাদের সকলের আকার একরূপ নহে; কেহ খুব বড়, কেহ আবার বামন অবতার।

প্রাচীন পাশ্চাত্য সাহিত্যে পিপীলিকাসম্বন্ধে অনেক কৌতুকজনক বিষয় লিখিত আছে। প্লীনী বলেন যে উত্তরভারতে এক প্রকার পিপীলিকা ছিল; উহারা মৃত্তিকার ভিতর হইতে সোনা খুঁড়িয়া বাহির করিত এবং বাসার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিত। দেশের লোকেরা গ্রীষ্মকালে বাসা খুঁড়িয়া সঞ্চিত সুবর্ণ সংগ্রহ করিত। পিপীলিকারা অনেকে শীতকালের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে বটে কিন্তু স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া থাকে এরূপ ত কখন শুনি নাই; দেখা ত দূরের কথা।

পিপীলিকাদের মধ্যে বৃত্তিভেদ দেখা যায়—কেহ কৃষিজীবী, কেহ বা শিকারী, কোন কোন জাতি "পশু"-পালন করিয়া থাকে, আবার কেহ কেহ "দাস" পোষে। ইহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে মাংসাশী; অনেক সময় মৃত কীট পতঙ্গ বহিয়া বাসায় সঞ্চয় করিতে দেখা যায়। কৃষিজীবী পিপীলিকারা বীজ (ant rice) সঞ্চয় করিয়া রাখে; উহা হইতে নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। উত্তর আমেরিকায় একপ্রকার পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। উহাদের গর্ত্তের মুখের চারি পার্শ্বে অনেক দূর এমন কি আট দশ ইঞ্চ পরিমিত স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখে। সেখানে অন্য কোনরূপ গাছপালা দেখা যায় না কেবল মধ্যে মধ্যে এক প্রকার ঘাস দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকারা কেবল উহাদিগকে নষ্ট করে না, অন্যান্য সমুদায় উদ্ভিদ খাইয়া ফেলে। কেহ কেহ অনুমান করেন পিপীলিকারা বীজ (ant rice) বুনিয়া ঐ ঘাসের চাষ করে। কিন্তু তাহা না হইলেও উহারা যে ঐ গাছ মারে না তাহাতেই অনুমান করা যায় পিপীলিকারা উহাকে খুব পছন্দ করে; উহার বীজ বাসার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে এরূপ দেখা গিয়াছে।

একবার ধানের "খোলা"র নিকটে এক প্রকার ছোট মেটে লাল পিপীলিকা দেখিয়াছিলাম। ধান "মাড়া" শেষ হওয়ার পর ঐ গোলাকার স্থানের একপার্শ্বে বহুসংখ্যক পিপীলিকা পরিত্যক্ত ধান্য সঞ্চয় করিতেছিল। উহারা অনতিদূরবর্ত্তী বাসায় ঐ সংগৃহীত ধান্য বহন করিতে ব্যস্ত

* বোলপুর শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক-সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধের একাংশ।

ছিল। কিছু দিন পরে একদিন অনেকগুলি তুঁষ বাহির করিতে দেখি। বিশেষরূপ লক্ষ্য করার পর দুই চারিটা ধান দেখিতে পাই। শীতপ্রধানদেশে কোন কোন পিপীলিকারা (Pogonomyrmex barbeatus) শস্য রৌদ্রে দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মাটির উপরে তুলিয়া থাকে কারণ অন্যথা মৃত্তিকারসসিক্ত বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত ও নষ্ট হইয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার পত্র-কর্ত্তক পিপীলিকা দেখা যায়: উহাদের অত্যাচারে কাফি প্রভৃতি কয়েক জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর। উহারা ঐ সব উদ্ভিদের পাতা কাটিয়া দলে দলে বহন করিয়া লইয়া যায়। ম্যাকবেথের বির্ণাম বন চলিতে দেখার ন্যায় পাতার আড়ালে পিপীলিকারা অদৃশ্য থাকায় পাতা চলিতেছে দেখিয়া দর্শক অবাক হইয়া যান; মনে হয় যেন বৃহৎ ছত্র লইয়া একদল বামন যাত্রী তীর্থে চলিয়াছে। ইহাদিগকে ছত্রবাহী পিপীলিকা বলা হয়। ইহারা যে শুধু গাছের পাতা লইয়া যায় তাহা নহে রাত্রিতে ঘরের মধ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়। ইহারা এত পাতা সংগ্রহ করে যে শুনিলে অবাক হইতে হয়। মেক্‌সিকো উপসাগরের নিকটস্থ টেক্‌সাস্ প্রদেশে ম্যাককুক (McCook) সাহেব এই জাতীয় পত্রকর্ত্তকের একটি বাসা দেখিয়াছিলেন। তত্রত্য কৃষকেরা গর্ত্ত খুঁড়িয়া পিপীলিকাদিগকে নষ্ট করিয়াছিল; গর্ত্তটি ১২ ফুট ব্যাসও ১৫ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট অর্থাৎ একটি ছোটখাট ঘর বিশেষ ছিল। ঐ বাসার মধ্যে অনেকগুলি কুঠুরী (Chambers) ছিল; বড় কুঠুরীটি সকলের নীচে দেখা যায়; উহা একটা আলকাতরার পিপার মত বড় ছিল। এই বৃহদায়তন গর্ত্তের অর্দ্ধেক স্থান পাতা দ্বারা একবার পরিপূর্ণ করিতে হইলে কতগুলি বৃক্ষকে অকালে নষ্ট হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পিপীলিকারা অত পাতা লইয়া কি করে? বেণ্ট সাহেব অনুমান করেন ঐ সকল পাতা পচাইয়া সার প্রস্তুত করে। সেই সারের সাহায্যে এক প্রকার Fungus (বেঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ)এর চাষ করে। বাসাটি যেরূপ বৃহৎ, উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথও তদনুরূপ বৃহৎ ও বহু-সংখ্যক। যাহাতে বৃষ্টির জল পথের মুখ দিয়া বাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য প্রবেশ দ্বারে খিলান থাকে। কুক সাহেব বলেন যে পত্রকর্ত্তকেরা পাতার রস খাইয়া অবশিষ্টাংশ দিয়া ঐ সব খিলানের ছাদ প্রস্তুত করে।

আমাদের দেশে সচরাচর দুই জাতীয় সামরিক পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম—জিঙে। ২য়—ক্ষুদে বা লাল-পিঁপ্‌ড়ে। নবদ্বীপ অঞ্চলে জিঙের অত্যাচার খুব বেশী দেখিয়াছি। উহারা যে পথ দিয়া চলে সে পথে কোন জীবের পক্ষে "তিষ্ঠান" আদৌ সম্ভবপর নহে। কারণ উহারা অত্যন্ত বিষাক্ত। ডেয়ে, মেঝেল বা কাঠপিঁপ্‌ড়ে, সুড়সুড়ে বা ধাওয়া প্রভৃতি পিপীলিকারা আহারান্বেষণের জন্য প্রায়ই একাকী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু রাঙী ও জিঙেরা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া চলে। কেঁচো বা উই শিকারের জন্য জিঙারা যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে চলে তখন মনে হয় যেন আর্থার বন্দর দখল করিবার জন্য দলবদ্ধ জাপানী-সৈন্য অগ্রসর হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলে শাখা সারি বাহির হয় এবং দেখিতে দেখিতে নদীর ন্যায় সম্মুখদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন মনে হয় শত্রুদিগকে ঘিরিবার জন্য আয়োজন করিতেছে। এই সময় অনেক অগ্রগামী বীর (Scouts) ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়; নূতন নূতন বীর তাহাদের স্থান অধিকার করে এবং কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে শিকারদিগকে ঘিরিয়া ফেলে। যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত যেরূপ রসদস্থান বা মূলের (base) যোগ থাকে জিঙাদিগেরও সেইরূপ আহারান্বেষণ স্থানের সহিত বাসার যোগ থাকে। বাসা হইতে ১৬০ ফুট দূরে উহাদিগকে উই সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছি; বর্ষাকালে মাঠে উহারা কেঁচো ও উই ধরিয়া থাকে। এই জাতীয় পিপীলিকারা আরবদেশীয় বেদুইন জাতির ন্যায় দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস করে না; বাসায় খাবার জিনিষ সঞ্চিত না করায় সর্ব্বদাই নূতন নূতন স্থানে আহারান্বেষণের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। অগ্রগামী পিপীলিকারা পোকা মাকড় শিকার করিয়া পিছনদিকে চালান করে; পশ্চাতের সকলে সাইবিরিয়া দেশের নেক্‌ড়েদের (wolves) মত হতভাগ্যদিগকে ছিঁড়িয়া খায়। পিপীলিকাদের মধ্যে ইহারা নেক্‌ড়ে বিশেষ।

ইহারা বহুসংখ্যক একত্রে দলবদ্ধভাবে আহারান্বেষণ করে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক এক বাসায় যে কতগুলি জিঙা বাস করে তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। একবার

পরীক্ষা করিয়া দেখি আপনাদের শরীরের ১৫০০ গুণেরও অধিক দূরে উহারা শিকার অন্বেষণের জন্য এক সারিতে প্রায় সকলেই পরস্পরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে মাঝে মাঝে সামান্য ফাঁক্ থাকিলেও ২।১০টা আগে পিছে চলিতেছিল। সুতরাং সারিটিকে অবিচ্ছিন্ন মনে করিলে উহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ১৫০০ হয়। বাসার মধ্যে এইরূপ আরও কত ছিল তাহা বলা যায় না। বাসার মধ্যে আরও ১৫০০ ছিল, এইরূপ অনুমান করিলে উহাদের সংখ্যা ৩০০০ হয়। এম্ ফোরেল (M. Forel) বলেন কোন কোন বাসায় পাঁচ লক্ষ পর্য্যন্ত পিপীলিকা দেখা যায়। কলিকাতায় আট লক্ষ লোকের বাস। সুতরাং এক একটি বাসাকে এক একটি নগর বলা যাইতে পারে।

নরভুক বৃহৎ ব্যাঘ্র (Royal Bengal tiger) যেরূপ উচ্চবৃক্ষে উঠে না বলিয়া শোনা যায়, জিঙাদিগকে সেইরূপ উচ্চবৃক্ষে বা চালের উপরে উঠিতে দেখি নাই; উঠে বলিয়া বোধ হয় না। নীচে অসংখ্য জিঙে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু দুই তিন হাত উচ্চে চালের উপরে বহুসংখ্যক উই, খড়, দড়ি খাইয়া গৃহস্থের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। নীচে বাঘ ঘুরিয়া বেড়াইলেও যেমন মানুষেরা উচ্চ টংয়ের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করিতে পারে উইরাও সেইরূপ যমদিগকে নীচে বিচরণ করিতে দেখিয়াও নিরুদ্বেগে গৃহস্থের বুকে মাটি ঠেকাইতে থাকে। রান্নাঘরেই জিঙাদের উৎপাত বেশী দেখা যায়; কারণ সেই ঘরেই মাছ মাংস থাকে। সরাঢাকা হাঁড়ির মধ্যস্থিত ভাজামাছ খাইয়া শুধু হাড়গুলি ফেলিয়া রাখিয়াছে এরূপ দৃশ্য ২।৩ দিন দেখিয়াছি। ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মেয়েরা একটাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়া রাখে। দেখিতে দেখিতে সেইখানে দুই একটি সঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপন্ন সঙ্গীর নিকটে আশু বিপদের কথা শুনিয়া সভয়ে গর্ত্তের দিকে প্রস্থান করে। পথিমধ্যে যাহার সহিত দেখা ঘটে তাহাকেই এ সংবাদ প্রদান করে; কারণ মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদায় জিঙে গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হয় এবং মেয়েদিগকেও নিশ্চিন্ত করে। মেয়েরা সুযোগ বুঝিয়া এই সময় গর্ত্তের মুখ গোবর দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়।

এই জাতীয় পিপীলিকারা এত ভীষণ যে ইহাদের হাত হইতে মানুষের পক্ষেও সহজে নিস্তার পাওয়া ভার। আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গোপ্রদেশে একজন ইতালীদেশীয় পাদ্‌রী একদল সামরিক পিপীলিকা দ্বারা নিদ্রাবস্থায় আক্রান্ত হন; চাকরেরা সংবাদ দেওয়ায় উঠিবার পুর্ব্বেই তাঁহার পা পর্য্যন্ত উহারা ছাইয়া ফেলিয়াছিল। আগুন দিয়া না মারিলে পাদরী সাহেবকে উহাদের দংশনযন্ত্রণায় হয়তঃ অকালে ভবলীলাখেলা সাঙ্গ করিতে হইত। কয়েকটা ভীমরুলের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; বহুসংখ্যক বিষাক্ত পিপীলিকার উগ্র বিষ সহ্য করা সহজ কি? গৃহপালিত অনেক জীবকে ইহাদের দ্বারা নিহত হইতে শোনা গিয়াছে।

রাঙী পিঁপড়েরা জিঙাদের অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট এবং অত বিষাক্ত নয়; তবে উহাদের দংশন কম যন্ত্রণাদায়ক নহে। উহারা সমবেত ভাবে আক্রমণ করে; একাকী চলে না। বর্ষাকালে বৃহৎ বৃহৎ কেঁচোকে অনেকে মিলিয়া শিকার করে, এ দৃশ্য বিরল নহে। ইহারা জিঙাদের মত মাটির উপরে চলিতে ভাল বাসে না; যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে চলে তখন প্রায়ই মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ করে; মধ্যে মধ্যে উপরে উঠিবার পথ রাখে মাত্র। বৃষ্টির পর ইহারা বাসার মধ্য হইতে অনেক মাটি তুলিয়া গর্ত্তের চারিধারে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করে, সামান্য লক্ষ্য করিলেই উহা অনেকেই দেখিতে পাইবেন।

পশুপালক দিগের মধ্যে ডেয়ে ও নাল্‌শোকে প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা চাষ বা অন্যরূপে খাদ্য সংগ্রহ করা বড় একটা পছন্দ করে না। সিম, ধুতুরা ও ফুলগাছে ভেড়ার মত দুইটী শিং এবং পৃষ্ঠদেশে চীনেদের বেণীর মত শিখা বিশিষ্ট এক প্রকার পোকাকে * ডিম পাড়িতে দেখিয়াছিলাম। ১ম চিত্র। উহাদিগকে ভেড়াপোকা নাম দেওয়া যাইতে পারে। উহারা উড়িতে পারিলেও দল ছাড়িয়া বহুদূরে পলায় না। ডেয়েরা উহাদের পুচ্ছের নিকটে শুং বুলাইয়া আদর করে এবং প্রদত্ত রস বা দুগ্ধ পান করিয়া থাকে।

ভেড়াপোকারা যখন উড়িতে পারে তখন উৎপাত করিলে অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই সম্ভব কিন্তু কখন উহাদিগকে

* ইহারা Membraceae জাতির অন্তর্গত। ইহারা Little devils of Geoffroy নামে পরিচিত।

উত্যক্ত হইয়া উড়িয়া যাইতে দেখি নাই। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে ডেয়েরা উহাদিগকে বিরক্ত না করিয়া বরং যত্ন করে। যে গাছে ভেড়ীরা ডিমপাড়ে সেই গাছের গোড়ায় অথবা নিকটেই ডেয়েরা বাসা করিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় পিপীলিকাকে শিকড়ভোজী একপ্রকার পোকা পুষিতে দেখা গিয়াছে।

পশুরক্ষা বিষয়ে নাল্‌শো বা লাশাদের কৌশল অতি চমৎকার। আম, ক্ষীরকুল প্রভৃতি বৃক্ষের তলায় উপস্থিত হইলে সময়ে সময়ে একপ্রকার পোকা চোখে মুখে পড়ে, অনেকে হয়তঃ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহারা পিপীলিকাদিগের একজাতীয় গরু। ঐ সকল গাছের পাতা ও ডালের উপরে সাদা রঙের একপ্রকার জাব পোকা (aphides) বাস করে (২য় চিত্র ক)। নাল্‌শোরা উহাদিগকে পুষিয়া থাকে। পোকাগুলি* উড়িতে পারে না কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একস্থানে থাকিতে পছন্দ করে না। বিশেষতঃ ছানাগুলি সর্ব্বদাই চলিয়া বেড়ায়। ইহারাও এক প্রকার গরু।

গরুগুলি যাহাতে পলাইতে না পারে সেইজন্য নাল্‌শোরা জাল বুনিয়া উহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে আম প্রভৃতি গাছের পাতায় তুলার আঁশের মত একপ্রকার সাদা রঙের পদার্থ দ্বারা জোড়া বাসা অনেক সময় দেখা যায়। ঐ সকল বাসায় কমলা রঙের এক প্রকার ডেয়ে বাস করে, উহাদের হুল নাই; তীক্ষ্ণ দাড়াদ্বারা ক্ষত করিয়া উদরের অগ্রভাগ পৃষ্ঠের উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া উহারা ক্ষত স্থানের উপর এক প্রকার রস বা বিষ নিক্ষেপ করে। ইহারা মাটির মধ্যে অন্ধকারে বাস করে না, এই পিপীলিকার নাম নাল্‌শো উসো বা লাসা। এই নাল্‌শোদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত গরু (ক) দিগের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অনেক বাসায় ঐ গরু দেখা যায় না। সেইসব বাসায় নাল্‌শোরাও বাস করে না। যে সকল বাসায় ঐ গরু দেখা যায় কেবল সেই সকল বাসায় উহারা বাস করে। ইহা হইতে স্পষ্টই মনে হয় না কি যে নাল্‌শোরা উহাদিগকে পুষিয়া থাকে? নতুবা অনায়াসে উদরসাৎ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও খায় না কেন? বরং মধ্যে মধ্যে ২।১টি পিপীলিকা গরু মুখে করিয়া একবাসা হইতে অন্য বাসায় লইয়া যায়।

বাসার মধ্যে যেখানে যেখানে বড় বড় গরু দলবদ্ধ হইয়া বাসকরে সেই সকল "বাথানে" (প্রশাখা বা পত্রবৃন্তে) পিপীলিকারা সর্ব্বদা ঘোরা ফেরা করে। গরুগুলির উদরের অগ্রভাগে পিঠের উপরে দুইটী বাঁট থাকে (২য় চিত্র খ)। ঐ বাঁট হইতে বিন্দু বিন্দু মিষ্ট রস বাহির হয়। ঐ রস বা দুগ্ধ নাল্‌শোদের বড় প্রিয় খাদ্য। যখন কোন পিপীলিকার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় বা অন্য কারণে গরু দোহনের প্রয়োজন হয় তখন সে কোন একটী গাভীর বাঁটের নিকটে শুং দিয়া সুড়সুড়ি দেয়। কিছুক্ষণ পরেই গাভীর বাঁট হইতে দুধ বাহির হয়। পিপীলিকাটী উহা জিহ্বার সাহায্যে বিড়ালের দুগ্ধ পানের ন্যায় চাটিয়া খায়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডারবিন (Darwin) বলেন গাভীগুলি ঐ দুধ না দোহা পর্য্যন্ত রক্ষা করে। প্রসূতির ন্যায় দুগ্ধ পান করাইতে না পারিলে অসুবিধা মনে করে। আশ্চর্য্য বটে। সামান্য একটু চেষ্টা করিলে সকলেই নাল্‌শোর দুগ্ধপান পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গাভীগুলি কামধেনুবিশেষ। পিপীলিকারা পুনঃ পুনঃ দোহন করিলেও বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া উহাদের নিকট হইতে অন্যত্র যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পোকা পুষিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিপীলিকারা সাধারণতঃ অন্ধকারময় স্থানে—মৃত্তিকাভ্যন্তরে বা বৃক্ষকোটরে বাসা প্রস্তুত করে। এই অন্ধকারময় বাসায় সর্ব্বদা থাকায় কোন কোন জাতীয় গরু (aphides) অন্ধ হইয়া যায়।* তখন অন্ধদিগের পোষণের ভার চালকদিগের উপরে পড়ে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লেস্পিস্ (Lespes) একবার দেখেন যে একটী পিপীলিকা একটী গরুকে (Lome chusa) আহার করাইতে ছিল। কতকগুলি পিপীলিকা চিনি খাইতেছিল। গরুটি একটী পিপীলিকার নিকটে গিয়া শুং দিয়া উহার মাথায় কয়েকবার সুড়সুড়ি দেয়। পিপীলিকাটি হাঁ করিয়া উহাকে আহার করায়। আশ্চর্য্য এই যে গরুটি চিনির উপর চলিলেও উহা খাইতে সক্ষম বলিয়া বোধ হয় নাই।

* Platyarthrus Hoffmanseggii.

* Beckia, claviger, platyanthrus এইরূপ অন্ধ গরু।

স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য অনেক সময় পাঁটার পা ধোওয়াইতে হয় এইরূপ প্রবাদ আছে কিন্তু দুধের জন্য গরুকে নিজ শিশুর মত আহার যোগাইতে হয় এরূপ কে শুনিয়াছেন? গাভীরা সাধারণতঃ যে সকল বৃক্ষের রস খাইয়া থাকে পালকেরা সেই সকল গাছে উহাদিগকে লইয়া বাস করে। গাভীরা পাতা হইতে রস সংগ্রহ করে এবং পিপীলিকারা গাভীদের দুগ্ধ পান করিয়া বাঁচে। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের স্বার্থ একরূপ হওয়ায় বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকে না। যতবারই নাল্‌শোর বাসা পরীক্ষা করিয়াছি, তত বারই বাসার মধ্যে গাভীর বৎস ও পিপীলিকার বাচ্ছা একত্রে দেখিয়াছি। পালকেরা গাভীর ডিম ও বাচ্ছা যত্নের সহিত রক্ষা করে। দেখিলে সহসা মনে হয় ডিমগুলি পিপীলিকাদের নিজের—গাভীর নহে। এই সকল পিপীলিকাকে গোপজাতীয় বলা যাইতে পারে না কি?

যুদ্ধপ্রিয় কোন কোন জাতি* ভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার বাচ্ছা অথবা গুটি ধরিয়া আনে। বাচ্ছাগুলি বড় হইয়া প্রভুদিগকে আহার যোগায়। দাস ভিন্ন প্রভুদের গতি নাই। কারণ উহারা নিজেদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ, সন্তানপালন, এমন কি আহার গ্রহণ পর্য্যন্ত আপনারা করিতে অক্ষম। ইহা কাল্পনিক বর্ণনা নহে। উহাদের মুখের গঠন দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যখন কোন প্রভু ক্ষুধা অনুভব করেন তখন কোন একটা দাসের অন্বেষণ করেন এবং শুং দিয়া উহার গা চাপড়ান। প্রভু ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন বুঝিয়া দাস অমনি শোষকথলী বা অন্তর্জঠর হইতে সঞ্চিত খাদ্য উদ্গিরণ করিয়া প্রভুকে খাওয়ায়।†

প্রভুরা অকর্ম্মণ্য হইলেও অত্যন্ত সাহসী, অন্ততঃ দাস সংগ্রহের সময় সেইরূপ পরিচয় প্রদান করে। জিঙা বা কাঠপিঁপড়েদের মত উহাদের হুল নাই; অথবা দূরে বিষ নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও নাই; তথাপি বুদ্ধি ও সাহসের গুণে দাস সংগ্রহ করিয়া থাকে।

দাস সংগ্রহের জন্য যখন উহারা বাহির হয় তখন খুব বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। দূত মুখে অথবা অন্য কোন উপায়ে দাস জাতির বাসা স্থির করিয়া একদল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়। ঐ দলে কেবলমাত্র শ্রমিক বা দাসীরা (workers) থাকে। উহাদের মধ্যে অধিনায়ক না থাকায় অনেকে ফিরিয়া আসে। আবার পশ্চাৎ হইতে নূতন নূতন যোদ্ধা অগ্রসর হইয়া উহাদের স্থান পূর্ণ করে। বাসার নিকটে পৌছিয়া এই "ছেলেধরার দল" প্রবল বেগে বয়স্ক পিপীলিকাদিগকে আক্রমণ করে। দাস জাতিরা এই আকস্মিক বিপদে অভিভূত হইয়া ডিম ও বাচ্ছা মুখে লয় এবং বাসা পরিত্যাগ করিয়া রক্ষা পাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে কিন্তু সকলে মিলিয়া ছেলে ধরার দলকে বাধা দিবার চেষ্টা করে না। তৃতীয় চিত্র। আগন্তুকেরা দাসদিগকে পরাজিত করিয়া—অসম্ভব বোধ হইলে—গুটি ও বাচ্ছা লুট করিয়া পলায়ন করে। আক্রমণকারীদিগের চুয়াল বা দাড়া (mandibles) অত্যন্ত বলশালী ও সূচ্যগ্র। কাযেই কোন নির্ব্বোধ দাসী শিশুরক্ষার জন্য পা কামড়াইলে তাহার মস্তক সুতীক্ষ্ণ দাড়া দ্বারা চাপিয়া ধরে; তাহাতেও না ছাড়িলে এরূপ চাপ দেয় যে হতভাগ্য দাসীর মস্তিষ্ক বিদ্ধ হইয়া যায় ও স্নায়ু মণ্ডল অসাড় হইয়া পড়ে; কাযেই দাসী অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও শত্রুর পা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। "ছেলে ধরার" দল বয়স্ক রক্ষীদিগকে একেবারে মারিয়া ফেলে না, কেবল অজ্ঞান করিয়া বাচ্ছা ও গুটি লইয়া পলায়ন করে। রক্ষীদিগকে বা অন্যান্য দাস পিপীলিকাকে মারিলে যে কেবল দাস বংশ শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংস করা হয় তাহা উহারা বেশ বুঝে।

অপহৃত বাচ্ছা ও গুটি বাসায় আনিয়া পুরাতন ভৃত্যদিগের প্রতি উহাদের প্রতিপালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। বাচ্ছাগুলি বড় হইয়া দাসের কাজ করে। এইরূপে প্রভুদের দাসের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। এই দাস-শ্রমিকেরা কুন্‌কী হাতীর ন্যায় উত্তরকালে স্বজাতি অপহরণ সময়ে প্রভুদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। মনুষ্য সমাজেও সামরিকেরা এইরূপে দাস বংশ ধ্বংস না করিয়া, যাহাতে নিজেদের কাযে লাগিতে পারে দাস শিশুদিগকে বাল্যকাল হইতেই স্বজাতিদ্রোহী পুরাতন পোষা-দাসদিগের দ্বারা সেইরূপ ভাবেই তৈয়ারি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

* Polyergus rufeaceus (২) Formica fusca.

† এই অন্তর্জঠর (gizzard) বা শোষকথলীর (Sucking stomach) গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত কৌতূহলজনক। প্রবন্ধান্তরে ইহার সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এই লুঠ তরাজের কায উহারা এত শীঘ্র সম্পন্ন করে যে আধ ঘণ্টার মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ বাসা জয় করিয়া ফিরিয়া আসে। বাসার মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যেরা বেশ সদ্ভাবে বসবাস করে, উন্নত ও সভ্য মানুষের মত অত্যাচার করে না। প্রভুরা কেবল দাস সংগ্রহ করিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। আর দাসেরা গৃহনির্ম্মাণ, সন্তানপ্রতিপালন, খাদ্যসংগ্রহ প্রভৃতি সমুদায় গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। গৃহকার্য্য সম্পাদন করাইবার জন্যই দাসীর প্রয়োজন। সেই জন্যই পিপীলিকারা যে সকল গুটি হইতে শ্রমিক বা দাসী জন্মিবে, সেই সকল গুটি অপহরণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় গুটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর। সুতরাং তাড়াতাড়ির মধ্যেও বাছিয়া লইতে বিশেষ কোন বেগ পায় না।

অতিরিক্ত প্রভুত্বের ফল দাস অপেক্ষা প্রভুদিগের পক্ষে যে অধিকতর ক্ষতিকর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় চাকরে জুতা ঘুরাইয়া না দেওয়ায় অযোধ্যার নবাব পলাইতে পারেন নাই; ইংরাজ হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বাদসাহি আলস্যের ফলে নবাব স্বাভাবিক শক্তি হইতে এতদূর বঞ্চিত হইয়াছিলেন যে আসন্ন বিপদের সময়েও স্বহস্তে জুতা ঘুরাইয়া লইতে পারেন নাই।

দীর্ঘকাল যে অঙ্গের বা যে মনোবৃত্তির ব্যবহার না করা যায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। বীরশ্রেষ্ঠ রাজপুত জাতি এখন বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভীত হইয়া উঠে। পিপীলিকাদের বেলায় এ নিয়মের অন্যথা হইবে কেন?

দাসব্যবসায়ী (Slave-making) আর এক জাতীয় পিপীলিকা * আছে উহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও পূর্ব্বোক্ত ছেলেধরার পিপীলিকাদিগের মত অন্য এক জাতীয় দাস পিপীলিকাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই দাস জাতিরা দুর্ব্বল না হওয়ায় আক্রমণকারীরা প্রায়ই মারা পড়ে কিন্তু তথাপি যে তাহারা জয়লাভ করে সে কেবল তাহাদের প্রতিপালিত দাসদিগের আনুকূল্যে। স্বজাতি শত্রু না হইলে মহাকায় হস্তী কখন মানুষের দাস হইত কি? পূর্ব্ব সংগৃহীত দাস-শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অতিমাত্রায় প্রভুভক্ত হইয়া পড়ে। প্রভুদিগের প্রায় সর্ব্ববিধ কার্য্য আপনারাই সম্পন্ন করিয়া দেয়; কাজেই পরিশ্রমের অভাবে প্রভুদিগের শারীরিক বলবীর্য্য ক্রমশঃ অবনতিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। শেষে দাসেরাই প্রবল হইয়া পড়ে। উপরোক্ত জাতির মধ্যে এইরূপেই অধঃপতন পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে। মানুষের মধ্যেও কি এ দৃষ্টান্ত বিরল?

Anergates নামক এক প্রকার পিপীলিকার এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে উহারা এখন দাসদিগের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পিপীলিকাতত্ত্ববিদ্ লবক (Lubbock) সাহেব অনুমান করেন উহাদের বহুপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা মধু ও শিকারের উপর নির্ভর করিত। ক্রমে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে দাসব্যবসায়ী (Slave-making) হইয়া পড়ে। উহারা কিছুকাল আপনাদিগের শক্তি ও দ্রুতগতি রক্ষা করিয়াছিল বটে কিন্তু অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে প্রকৃত স্বাধীনতা—স্বাবলম্বন হারাইয়া ফেলে। গৃহনির্ম্মাণ, সন্তানপালন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ হারাইয়া এবং দাসের উপরে সমুদায় কার্য্যের ভার দিয়া নিজেরা অলস হইয়া পড়ে। সেই আলস্য ও পরনির্ভরতার ফলে বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শরীরে শক্তি নাই, মনে আর পূর্ব্বপুরুষদিগের মত বল নাই; সংখ্যায় দিন দিন, কমিয়া যাইতেছে। এখন ইহারা দাসজাতির অনুগ্রহপ্রার্থী—হীন মোসাহেব (parasite) মাত্র। যখন দাসেরা বাসা পরিবর্ত্তন করে তখন তাহারা উহাদিগকে মুখে করিয়া অন্য বাসায় লইয়া যায়। * এতদূর অধঃপতন হওয়া কি সম্ভব? পেটের দায়ে উন্নত মানুষ যখন অত্যন্ত হেয়বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে তখন পিপীলিকারা যে পূর্ব্বগৌরব বিস্মৃত হইয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিবে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কি? উহাদের বাসায় শ্রমিকসম্প্রদায় দেখা যায় না; কেবল পুরুষ ও স্ত্রীজাতি থাকে মাত্র। সুতরাং আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কে? এমন কি শিশুদিগের ন্যায় আহার করাইয়া না দিলে উহারা নিজে আহার গ্রহণ করিতেও অক্ষম †।

---

* Strongylognathus testaceus.

* Lubbock কৃত "Ants, Wasps and Bees" নামক পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ঐ পুস্তকের ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অষ্ট্রেলিয়ায় এবং মেক্সিকো প্রদেশে এক জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা মাটির মধ্যে বাস করে। উহাদের বাসায় স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক বা দাসী ভিন্ন আরও এক রকম পিপীলিকা দেখা যায়। উহাদিগকে মধুবাহী (honey-bearers) বলে। উহারা অত্যন্ত অলস; সর্ব্বদাই বাসার মধ্যে থাকে এবং বাসাস্থ সকল শ্রমিকের সঞ্চিত মধু আপনাদের উদরে সঞ্চয় করিয়া রাখে। উহাদের উদর অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক; কাজেই যথেষ্ট মধু ধরিতে পারে। (৪র্থ চিত্র)। যখন দরকার হয় তখন উহারা সঙ্গীদিগকে মধু-উদ্গিরণ করিয়া খাওয়ায়। উহারা জীবন্ত মধুথলী বিশেষ। এক এক বাসায় ৭।৮টী কুঠরী থাকে। ম্যাক্কুক্ (McCook) সাহেব এক বাসার প্রত্যেক কুঠরীতে গড়ে ৩০টা মধুবাহী দেখিয়াছিলেন। আমরা উন্নত জীব কিন্তু এই নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় আমাদের কেহ কি সকলের সঞ্চিত দ্রব্য গচ্ছিত রাখিতে সক্ষম ও বিশ্বাসপাত্র?

প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল; বারান্তরে পিপীলিকার মনোবৃত্তি, বন্ধুত্ব, বিজাতিবিদ্বেষ, গৃহযুদ্ধ, সেবক-সম্প্রদায়, রাজভক্তি প্রভৃতি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ধ্রুবতারা—সামাজিক উপন্যাস—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। ৩৬৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। বহুকাল এমন সুচিত্রিত উপন্যাস পড়ি নাই; এখানি পড়িয়া পরম প্রীত হইয়াছি। কতকগুলি চিত্র-পরম্পরায়—যথা, ছাত্রাবাস, পল্লী, হিন্দু পরিবার, ব্রাহ্ম পরিবার, ইঙ্গ-বঙ্গসমাজ প্রভৃতি একত্র গ্রথিত হইয়া—পুস্তকখানি অগ্রসর হইয়াছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা সুন্দর লাগ্নিকতা আছে যে তাহা শুধু 'উড়িষ্যার চিত্র' প্রণেতারই সাধ্য মনে হয়। গ্রন্থকারের চরিত্র-চিত্রণশক্তি, বর্ণনচাতুর্য্য ও দর্শননিপুণতা চমৎকার। সকল চরিত্রগুলি জীবন্ত, সকল দৃশ্যগুলি ফটোগ্রাফের মত যথার্থ। 'পায়রা বকবকুম করিতেছে, তাহাদের গলা ফুলিয়া উঠাতে নীলবর্ণের মধ্য হইতে সবুজ আভা বিকীর্ণ হইতেছে' দেখে অনেকে; দেখাইতে যে পারে সে কবি। 'প্রভাবতীর শরীরের বর্ণ বাল্যে কিছু কালো ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে প্রাবৃটকালের মেঘাবৃত মধ্যাহ্নকালীয় আকাশের ন্যায় তাঁহার মধ্য হইতে লাবণ্যচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইয়া তাহাকে কতকটা আলোকিত করিয়াছিল। এখন আবার বেলা শেষ হইতেছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই চাকচিক্য অন্তর্হিত হইয়া অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে * * * তাহার সম্মুখের দুইটি দাঁত উঁচু * * * তাঁহার মুখখানি (কাজেই) সর্ব্বদাই বিমর্ষ। তিনি মাসে চারি পাঁচটি কথা বলেন, আর বছরে তিন চারিবার হাসেন'।" এমন suggestive রূপবর্ণনা আর পড়িয়াছি বলিয়া মনে ত হয় না। এই গ্রন্থখানিতে এইরূপ সুন্দর চিত্র ভূরি ভূরি পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থগত সকল চিত্রের মধ্যে হিন্দু ও ব্রাহ্মপরিবারের ও সমাজের চিত্র যেন এক অপরের foil বা back ground হইয়াছে। ঘটনাগুলি এমন ভাবে অগ্রসর হইয়াছে যে পড়িলেই এ দিককার একটা চরিত্রকে অন্য দিকের একটা চরিত্রের সহিত তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয়। একদিকে হিন্দুবিধবা শরৎশশী অপর দিকে ব্রাহ্মবিধবা প্রভাবতী; একদিকে হিন্দু যুবক উপেন, অপর দিকে অরুণ; একদিকে বনলতা, অপর দিকে চারু; একদিকে উপেনের বন্ধু বীরেন, অপর দিকে পরেশ বাবুর বন্ধু ডাক্তার চক্রবর্ত্তী; একদিকে হিন্দুর গুরু শশীশেখর বিদ্যানিধি বা হরকান্ত বিদ্যালঙ্কার, অপর দিকে ব্রাহ্ম উপাচার্য্য অনন্ত বাবু; এইরূপ বহু চরিত্রের তুলনায় হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব গ্রন্থকারের বিনা টীকা টিপ্পনীতে ঘটনাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে। দত্তপরিবার typical হিন্দুপরিবার বা পরেশ বাবুর পরিবার typical ব্রাহ্মপরিবার বলিয়া গ্রন্থকার গ্রহণ না করিলেও তাঁহার একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুসমাজের উজ্জ্বলতম চিত্রের পাশে ব্রাহ্মসমাজের কৃষ্ণতম চিত্র স্থাপন করা গ্র... উচিত হয় নাই। বুঝিতেছি যে তাঁহার নায়ক উপেনের মহৎ অথচ ভাবপ্রবণ জীবনের অসাবধান পরিণতি দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এইরূপ ঘটনার সমাবেশ করিতে হইয়াছে, তথাপিও এক সমাজের শ্রেষ্ঠ নমুনার পার্শ্বে অপর সমাজের হীন নমুনা স্থাপন করাতে ... পাঠকের ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। সাবধান গ্রন্থকা... বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াই দত্তপরিবারকে আদর্শ পরিবার করে... গ্রন্থের নায়ক উপেন রেলপথে ভ্রমণ করিবার কালে একজন ... রেলকর্ম্মচারীকে একজন স্ত্রীলোকের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিতে দেখিয়া সেই ফিরিঙ্গির চৈতন্য-সম্পাদন করে; ইহাতে দত্তপরিবারে কান্নাকাটিতে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়; উপেনের মা ভৎসনা করিয়া বলিলেন, 'ওমা! এমন অসম সাহসের কাজ তুই করলি কেন? সেই সাহেবকে মারিবার জন্য যদি তোকে ফাটকে দেয়, তবে কি হবে?' আর এই ঘটনার জন্য ব্রাহ্ম চারুলতা উপেনকে পত্র লিখিয়া বলিতেছে 'আপনি বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন'। উপেনের স্ত্রী বনলতাও বলিতেছে 'কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া এ বিপদ ঘাড়ে করিলে?' উপেনের মহৎ প্রাণের উচ্চ-ভাব তাহার পরিবারের অশিক্ষিতা মহিলামণ্ডলী অনুধাবন বা appreciate করিতে পারিলেন না। শিক্ষার অভাবে চরিত্রের অসম্পূর্ণতা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদের নাম দিয়াছেন 'হিতে বিপরীত' কিন্তু হিন্দু পরিবারের এই অসম্পূর্ণতা যাহাতে লোকের চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত না হয় এই ভয়েই যেন গ্রন্থকার তাড়াত... 'যেখানে স্নেহের বাহুল্য, সেইখানেই অত্যাধিক বি... এই জন্যই বুঝি, আদর্শ পতিপ্রাণা সাধ্বী জানকী ... আশ্রম হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে যাইতে পথে মু... রাক্ষসবধসমুদ্যত রামচন্দ্রকে মৃদু ভৎ'সনা করিয়াছিলেন' ... গ্রন্থকার স্ত্রীশিক্ষার অভাবের কুফল আরো দেখাইয়াছেন। উ... তাহার স্ত্রী বনলতা একেবারে নিরক্ষর; উপেন স্ত্রীর স... আলাপ করিতে পারে না, তাহার কথা পরিবারস্থ ... বুঝেন না; কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া উপেন ... হিন্দু-মহিলার সহজবোধ্য রকম খুঁজিয়া পায় না। উপেন নিজ পরিবারের স্নেহমমতার শত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে পর্ণছাড়া মনে করিতে লাগিল; সরলতার প্রতিমা সুপ্রমহৎ বনলতাকে পাইয়াও শিক্ষিতা বাক্পটু চারুলতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ...

না করিলে হিন্দু [illegible] সুশিক্ষিত [illegible] তাঁহারা বুঝেন না। [illegible] আলাপ শুধু [illegible] সম্বন্ধে কথোপকথনে নহে। উভয়পক্ষ হইতে [illegible] না জুটিলে আলাপ অগ্রসর হয় না। গ্রন্থকার ইহা [illegible] দেখাইয়াছেন। ভুক্তভোগী যাঁহারা তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিবেন [illegible] জীবনের ইতিহাস শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের [illegible]। উপেনের সহিত শেষ দর্শনকালে [illegible] বনলতার মুখ দিয়া গ্রন্থকার বলাইয়াছেন, [illegible] আমি যেন আর জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন তোমাকে সুখী করিতে পারি।' আর এজন্মে বনলতা বুঝিয়া বলিতেছে, 'আমি জানি, আমার কোন গুণ নাই যাহা দিয়া তোমাকে সুখী করিতে পারি। * * * আমি মরিলে যদি তুমি চারুলতাকে বিবাহ করিতে পার, তবে আমি * * * তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না।' বনলতা এই জন্য ফুটন্ত যৌবনে অগাধ আশা বুকে লইয়া এজগৎ হইতে বিদায় লইল। সেই বিদায়দৃশ্য কি করুণ, কি নিদারুণ।

উপেনের পথ ত মুক্ত হইল, কিন্তু ঘটনার তীব্র আঘাতে চারুলতা অরুণকে বিবাহ করিল। ইহার কারণ, চারুলতা উপেনকে কখনো বন্ধুত্ব প্রীতির অধিক ভালবাসে নাই, এবং যখন সে নিরাশ্রয় তখন অরুণ তাহার কপট মোহজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। চারুলতা যখন অরুণের প্রকৃত পরিচয় পাইল ও উপেনের মহত্ত্ব বুঝিল, তখন সে অরুণকে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইল, জীবিকার জন্য চাকুরী অবলম্বন করিল। বনলতা ও চারুলতা উভয়েরই স্বামী অন্যাসক্ত— [illegible] উপেন ভাবের সংগ্রামে পরাজিত মাত্র, আর অরুণ দুশ্চরিত্র, কুকর্ম্মী। বনলতা দত্ত পরিবারের জীব, সে বাহিরের কিছু জানে না, বুঝে না, [illegible] সে বিলাতপ্রত্যাগত স্বামীর নিকটও সমগ্র পরিবার হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকিতে স্বীকৃত হইল না, দিক্‌বিদিক্‌ স্থির করিতে না পারিয়া মরিল। আর [illegible] জগতের নাড়ীস্পন্দন টের পাইয়াছে, সে আপনার স্বতন্ত্র পথ স্থির করিয়া লইল। এই পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের সহিত আমাদের কোনো বিবাদ নাই। কিন্তু উপেনের সহিত চারুলতার শেষ-দর্শনের সময় গ্রন্থকার চারুলতার ব্যবহারটা নিতান্ত বিলাতী নাটকীয় [illegible] অঙ্কিত করিয়া চারুলতাকে দিয়া বলাইয়াছেন, 'আমিই তোমাকে [illegible] অতর্কিতভাবে প্রলুব্ধ করিয়াছিলাম'। কিন্তু গ্রন্থকার বরাবরই ত উপেনকেই active ও চারুলতাকে passive রাখিয়াছেন; চারুলতা [illegible] প্রতি উপেনের ঐকান্তিক প্রেমের পরিচয় পাইয়াছিল যখন উপেন বিলাত গিয়া অরুণের কুকীর্ত্তির প্রমাণ পাঠাইল, যখন ঢাকায় [illegible] স্ত্রীর সহিত চারুর পরিচয় হইল।

গ্রন্থকার ব্রাহ্ম উপাচার্য্যকে একজন বেল্লিক বানাইয়া পাশ্চাত্য [illegible] প্রেমের পার্থক্য বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য [illegible] হইতে পারিত; এজন্য কোনো সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ [illegible] বেল্লিক সাজানো ঠিক হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থকার [illegible] পক্ষপাতী নহেন। একজন পাকাচুলে টেড়িকাটা হিন্দুর [illegible] বেল্লিক করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের [illegible] দত্তপরিবারে, দোষাধিক্য তেমনি শ্যামচাঁদের পরিবারে [illegible]। বহু ব্রাহ্ম কুচরিত্রের পার্শ্বে পরেশ বাবুর সাধুচরিত্র যেমন উজ্জ্বল হইয়া prominent হইতে পারে নাই, তেমনি বহু সুন্দর উজ্জ্বল হিন্দুচিত্রের পার্শ্বে হিন্দুর কৃষ্ণচিত্রগুলি লোকলোচনে অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে হিন্দুসমাজ দোষে গুণে কি ছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে কি হইতেছে এবং সেই পাশ্চাত্যভাবের গতি অপ্রতিহত হইলে কিরূপ হইবে তাহাই দেখানো হইয়াছে। ইহা সমাজের transition period এর চিত্র, ইহা প্রাচ্যপাশ্চাত্য-ভাবসংঘাতের চিত্র। পাশ্চাত্য সমাজের ভাব সকল ব্রাহ্মসমাজ অধিক গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ আখ্যায়িকার উপলক্ষ। গ্রন্থকার Dinner Partyর যে চিত্র দিয়াছেন তাহা বিলাতফেরত ব্রাহ্মসমাজেও এখনো আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয় সাবধান' করা; উন্নত সমাজের নরনারীগণ যদি এ সব চিত্র পড়িয়া বিরক্ত (indignant) হন, তবে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে। খাঁটি নির্জলা পাশ্চাত্যভাব আমাদের সমাজে প্রবেশ করে ইহা কোনো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিবেন না। ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হইলে অতিরঞ্জন অনিবার্য্য হয়। তাই এ গ্রন্থে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে।

এই গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'বিষাদময় সংসারে মানবজীবনের সান্ত্বনা কি? আমি বলি, উচ্চভাব (noble ideas)। উচ্চভাবকে জীবনের ধ্রুবতারা করিলে, মানুষ তাহার দুঃখ ভুলিয়া কোন-ক্রমে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। চারুলতার ধ্রুবতারা উপেন, উপেনের ধ্রুবতারা বনলতা।' ভাবরাজ্যে বনলতা জীবনের ধ্রুবতারা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবজীবনে বনলতার অসম্পূর্ণতা, চারুলতার যে গুণে উপেন আকৃষ্ট হইয়াছিল সেই গুণের অনুশীলন দ্বারা পূর্ণ না হইলে পরিবারে অতৃপ্তি অশান্তি লাগিয়া থাকিবে। স্ত্রী শিক্ষা যে সমাজে কত আবশ্যক তাহা ধ্রুবতারার পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন।

[ক্রমশঃ।

চিত্র পরিচয়।

স্বর্গীয় মুস্তাফা কামেল পাশার মৃত্যু কালে ৩৪ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তিনি মিসর দেশে জাতীয় স্বাধীনতা-প্রার্থীদিগের নেতা ছিলেন। তিনি মিসরীয়দিগের মধ্যে নূতন আশা, নূতন তেজ, নব জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লঙ্কায় অবরুদ্ধা সীতাদেবীর বিরহশীর্ণা মূর্ত্তির একটি অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহা নানা বর্ণে সুরঞ্জিত। আমরা এক বর্ণে ইহার একটি সামান্য প্রতিলিপি দিলাম।

৬১, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।